





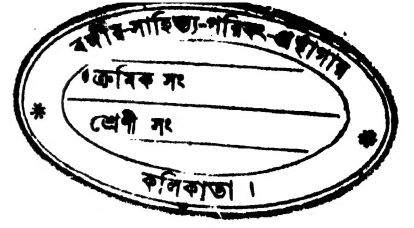


$$\frac{928}{8}$$





# প্রতিভা



ঢাকা সাহিত্যপরিষৎ কর্তৃক পরিচালিত

সচিত্র মাসিক পত্র

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল  
সম্পাদিত

৪র্থ বর্ষ

১৩২১

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বি এল কর্তৃক

ঢাকা সাহিত্যপরিষৎ হইতে

প্রকাশিত।



# সূচিপত্র

প্রতিভা, ১৩২১ সন, ৪র্থ বর্ষ

অ

১। অক্ষুণ্ণপতিগণের কালনির্ণয় ...	শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, পি, আর, এস ...	৪৯
২। অক্ষুণ্ণশাসনকালে দেশের অবস্থা ...	শ্রীশঙ্করবল্লভ ভট্টাচার্য্য বি, এ, বি, টি ...	৪৪০
৩। অসময়ে ( কবিতা ) ...	শ্রীভীষ্মেন্দ্রকুমার দত্ত ...	১৭৯

আ

৪। আগণে ( কবিতা ) ...	শ্রীকুলচন্দ্র দে ...	৩৬
৫। আবুল মুল্লফর রচিত কবিতা ও ইট। রাজবংশ ...	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি. এ, বি, টি, ...	৪২২, ৪৮৬
৬। আয়ুর্কেন্দ্রে অশ্ব চিকিৎসা ...	শ্রীকেশবচন্দ্র দাস ...	১১৭
৭। আলোচনা ...	শ্রীযোগেন্দ্র কিশোর রক্ষিত ...	২৮০
৮। ঐ ...	... ...	২৯৮
৯। আসিবে ( কবিতা ) ...	শ্রীদুর্গামোহন কুমারী ...	৪৬২
১০। আহোম আকবর রুদ্রসিংহ অধ্যাপক	শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিজ্ঞাবিনোদ এম্ এ ...	৩৪৪
১১। আহ্নান ( কবিতা ) ...	শ্রীপারশুরাম কুমার ঘোষ বি, এ ...	২৭১

উ

১২। উদাত্তবর, টোন বা Accent ...	শ্রীদেবেন্দ্রকুমার বিজ্ঞারস, এম্ এ, ...	৪৩১
---------------------------------	---	-----

এ

১৩। একখানি প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্য ...	... ...	
ও তাঁহার কবি ...	কবিরাজ শ্রীমদনমোহন শীলদাস ...	৪৬৯
১৪। এক ডালা দুর্গ ...	শ্রীবীরেন্দ্র নাথ বসুঠাকুর ...	১২৯

ক

১৫। কবি ককন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ ...	শ্রীচিত্তাহরণ দে ...	৩৬৯
---	----------------------	-----

১৬। কবিতার কথা ...	...	ঐতিহ্যরঞ্জন দাস ব্যারিষ্টার এট-ল	...	৪১০
১৭। কবির বিয়ে ( কবিতা )	...	" কুলচন্দ্র দে	...	২০৩
১৮। কবির মৃত্যু ( ঐ ) ...	...	" ঐ	...	৩৪৮
১৯। কর্ণ ও চিত্তার স্বাধীনতা	...	" উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ এম্ এ, বি এল	...	৩৯৭
২০। কিশোরী	...	" কালিদাস রায় বি, এ,	...	৫৭
২১। কুলের মাগনের ছড়া	...	" মহিমচন্দ্র নন্দী	...	৪৫৭
২২। ৮ কৈলাসচন্দ্র সিংহ	...	" মনিন্দ্র কিশোর সেন	...	৪৪৭
		খ		
২৩। খঞ্জন	...	" পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	...	৪৫৫
২৪। খেলা	...	" মন্থধ নাথ মজুমদার	...	৪৯৭
		গ		
২৫। গুণীকে! ( কবিতা )	...	" দুর্গামোহন কুমারী	...	৩০৯
২৬। গেদেরিড়ি বা গেদেরিডয়	...	" রেবতীমোহন গুহ	...	২২১
২৭। গ্রহ সমালোচনা	...		...	৪৫,২২৬,৩৪৪
		চ		
২৮। চন্দ্রকান্ত প্রসাদ	...	" কালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী	৩০,৬২,১১৭,২০৪,৩০৯,৪০৬,৪৬৩	
২৯। চাউলের কথা	...	" তারকচন্দ্র দেব এল্ এম্ এস	...	৪০৭
৩০। চাকুরিয়া লোকের দুঃখ	...	" যোগেন্দ্র কিশোর রক্ষিত	...	২৮১
৩১। চাঁদসী প্রচলন মতে গ্রন-বিজ্ঞান	...	" কেশবচন্দ্র দাস	...	৬৯,১১৭
		জ		
৩২। জীবন মৃত্যু ( কবিতা )	...	" সত্য ব্রত শর্মা	...	১১৭
		ড		
৩৩। ডালিমকুল ( কবিতা )	...	" স্বীবেন্দ্রকুমার দত্ত	...	৪৪০
		ড		
৩৪। ঢাকা সাহিত্য পরিষদের তৃতীয় বার্ষিক কার্য বিবরণী	...		...	কাল্পন সংখ্যা
৩৫। ঢাকা সাহিত্য পরিষদের নিয়মাবলী	...		...	ঐ

## ত

৩৬। ভুচ্ছ ( কবিতা )	...	.. কুলচন্দ্র দে	...	...	১০৩
৩৭। ভূমি ( কবিতা )	...	.. হুর্গামোহন কুমারী	...	...	৪৫৭

## দ

৩৮। দানবীর হুর্গাচরণ ( কবিতা )	...	.. যোগীন্দ্রনাথ সমস্কার,			
		বি, এ, এফ, আর, হিট এল	...	...	১৬৬
৩৯। হুই বহু ( কবিতা )	...	.. অবনীমোহন চক্রবর্তী	...	...	১১৭
৪০। দোবে মহারাজ ( কবিতা )	...	.. কুলচন্দ্র দে	...	...	৪৪

## ন

৪১। নটিকতা ( কবিতা )	...	.. শশীকুমোহন সেন বি, এল	...	২২৮, ২২৯
৪২। নন্দহুলাল ( গল্প )	...	.. নরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ শর্মা বি, এ,	...	৩৭৩

## প

৪৩। পল্লী ( সমালোচনা )	...	...	...	...	৫০১
৪৪। পর্যটক ( কবিতা )	...	.. হুর্গামোহন কুমারী	...	...	২১৩
৪৫। পাঁচদোনার দেওয়ান দর্প নারায়ণ	...	.. মহিমচন্দ্র নন্দী	...	...	২৪২
৪৬। পাটুনী ( কবিতা )	...	.. হুর্গামোহন কুমারী	...	...	২৩৬
✓ ৪৭। পাবনা জেলার প্রচলিত প্রবাদ বচন	...	.. অম্বনাথ মজুমদার	...	...	৩৩৩
৪৮। পুরীর সিদ্ধান্তরত্ন ( কবিতা )	...	.. অম্বনাথ রায় চৌধুরী	...	...	১৮১
৪৯। পুস্তক পরিচয় ( সাগর সঙ্গীত, পল্লী, গাথাণের কথা )	...	..	...	...	১৮০
৫০। পুষ্প ...	...	.. ঐতিহ্যবাহন দে	...	...	২২৪
✓ ৫১। পূর্ববঙ্গের মেরেলি শ্লোক	...	.. যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত	...	...	২৩৬
৫২। ঐ ...	...	.. গোপীনাথ দত্ত ১ গৌর, ১৩ মাঘ, ১৭ কাশ্য, ২১ চৈত্র	...	...	
৫৩। পূর্ববঙ্গের স্বভাব কবিগোবিন্দ দাস...	...	.. কামিনীকুমার সেন এম্ এ, বি এল,	...	...	৩৮২
৫৪। প্রকাশ ( কবিতা )	...	.. পরিমল কুমার ঘোষ, বি, এ,	...	...	১৬৮
৫৫। প্রণব ( কবিতা )	...	.. হুর্গামোহন কুমারী	...	...	২৩
৫৬। প্রতীক ( কবিতা )	...	.. চারু ওড়া	...	...	১৭৭



৫৭। প্রভাত ( কবিতা ) ...	...	,, পরিমল কুমার বোম্ব বি, এ, ...	... ১০১
৫৮। প্রেমের কবর ( গল্প ) ...	...	,, রবীন্দ্রনাথ সেন ...	... ১২০
৫৯। প্রেমের বসন্ত ( কবিতা ) ...	...	,, কালিদাস রায় বি, এ, ...	... ৪৫

অ

৬০। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ইতিহাস...	...	,, রমেশচন্দ্র বসুসদায় এম্, এ, পি আর এস ...	... ৭০
৬১। বঙ্গের রঘুনাথ শিরোমণি ...	...	,, উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি, এ, বি, টি, ...	... ১৪৬, ১২২
৬২। বঙ্গের ডালি ( কবিতা ) ...	...	,, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ...	... ৪৮৫
৬৩। বর্ষা বিরহ ( কবিতা ) ...	...	,, কালিদাস রায় বি, এ, ...	... ১৫২
৬৪। বংশোৎকর্ষ বিজ্ঞান ও বর্তমান ...	...	... ..	...
হিন্দু সমাজ ...	...	,, সত্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এস সি ...	... ২৭
৬৫। বাঙ্গলা সাহিত্যের দৃষ্ট কাব্য ...	...	,, নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য এম্ এ ...	... ২৮৪
৬৬। বাঙ্গলা সাধু ভাষা ও উচ্ছৃঙ্খল ভাষা	...	,, দেবেন্দ্রকুমার বসুপাধ্যায় এম্ এ ...	... ১৮২
৬৭। বাঙ্গালীর উচ্চারণ ...	...	,, গিরীশচন্দ্র বেন্দ্যোপাধ্যায় ...	... ২৩৯

৬৮। বালচরিত ( মহাকাব্য ভাস্কর্য )	...	,, গুরুবঙ্গ ভট্টাচার্য্য বি, এ, বি, টি... ২৩২, ৩১৬, ৩৬৩	...
৬৯। বাসনা ও সংঘর্ষ ( কবিতা ) ...	...	,, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ...	... ৭৩
৭০। বিগত ত্রিশ বৎসরে ঢাকা জিলার	...	...	...
বাহ্য ...	...	,, বিলাসচন্দ্র দাস ...	... ৩৬
৭১। বিরহী ( কবিতা ) ...	...	,, পরিমল কুমার বোম্ব বি, এ, ...	... ৭৩
৭২। বৈষ্ণব জাতির পুরাতন ...	...	,, শীতলচন্দ্র চক্রবর্তী এম্ এ বিভাণিধি ...	... ১০১
৭৩। বৈষ্ণব কবির ত্রিরাশিকা ...	...	,, জ্যোতির্শ্রী গুপ্ত ...	... ২১০

উ

৭৪। উত্তরাল গান ...	...	,, বোম্বেন্দ্র কিশোর রক্ষিত ...	... ২১
৭৫। উ ...	...	,, গোপীনাথ দত্ত ...	... ৩১, ৫৬৫
৭৬। উত্তরাল গান সম্বন্ধে কয়েকটি কথা...	...	,, হরেন্দ্রকুমার কর ...	... ১২৩
৭৭। উত্তরবর্ষের প্রাচীন নগর ...	...	,, শীতলচন্দ্র চক্রবর্তী এম্, এ বিভাণিধি ...	... ৩০৫

৭৮। ভারত শিল্পের নবজাগরণ ...	.. উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ এম্. এ, বি, এল ...	১৬৯
৭৯। ভারতে বৃত্তিপুজার আদিযুগ ...	.. নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য এম, এ, ...	২২
৮০। ভারতীয় ধর্ম বনাম সাহিত্য ...	.. শ্রীশ্রীমোহন সেন বি, এল ...	৩০১
৮১। ভাস্কর্য পঞ্চরত্ন ...	.. গুরুবল্লভ ভট্টাচার্য বিএ, বিটি, ...	৪৮০
৮২। ভোঁঙরের ত্রীতীজুবনেশ্বরী দেবী...	.. দেবেন্দ্রগতি রায় ...	৪৮০
~		
৮৩। বদীরাম মাধুরী (কবিতা) ...	.. কালিদাস গায় বি এ, ...	১৮৫
৮৪। মরমনসিংহজেলার প্রাচীন কীর্তি...	.. বিবেকনাথ নিয়োগী বি এ, ...	৫৭
৮৫। ময়নামতীর গান ( আলোচনা) ...	.. নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য এম, এ, ...	৯৪
৮৬। ময়নামতীর গানের ভূমিকা ...	.. " " " " ...	প্রাথমিক
৮৭। মরমনসিংহের প্রাচীন কীর্তি (প্রতিবাদ )	.. পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ...	১৪৪
৮৮। মহীপাল প্রসঙ্গ ( আলোচনা)...	.. বিনোদবিহারী রায় ...	৪১৮
৮৯। মহানির্দোষ তন্ত্র ( আলোচনা)...	.. উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ এম, এ, বিএল ..	১১৩
৯০। মহাকবি ভাস ...	.. গুরুবল্লভ ভট্টাচার্য বি এ, বিটি, ...	৮৪
৯১। মাতৃভোজ ( কবিতা ) ...	.. নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী ...	১৪৫
৯২। মায়াময়ী ( কবিতা ) ...	.. জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ...	৩২৪
৯৩। মীনচেন্তন ( প্রাচীন পুস্তক )...	.. নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য এম, এ, সম্পাদিত অগ্রহারণ, পৌষ, ফাল্গুন ।	
✓৯৪। মাধবের গান ...	.. পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ...	১৮৫/২৯৮
৯৫। মঙ্গলশিল্পের ইতিহাস ...	.. অক্ষকুলচন্দ্র সরকার M. A, P. R S. Phd. ...	১
৯৬। মেঘনাদবধের রাসানিক ভায়	.. নলিনীকান্ত বসু ...	৩২৫/৩৫৫
৯৭। মল্লীচরিত্র ...	.. চিত্তাহরণ দ ...	৪৭৬
৯৮। মল্লীনারায়ণের ব্রত ...	.. মহিষচন্দ্র নন্দী ...	৪৭০
~		
৯৯। শকট ভরাণীর ব্রত ...	.. শ্রীগুরুবল্লভ ভট্টাচার্য বি, এ, বি, টি, ...	২৮২
১০০। শঙ্করাচার্য ...	.. উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি, এ, বি, টি, ...	৩৪২
১০১। শরঙ্গিণী ( কবিতা ) ...	.. জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ...	২৪৩

১০২। শারদীয়া ( কবিতা )	...	,, কুলচন্দ্র দে	...	...	২৬০
১০৩। শিলা পূজার মূলতত্ত্ব	...	,, শীতলচন্দ্র চক্রবর্তী বিজ্ঞানিধি এম, এ	...	...	২১৪
১০৪। শূণ্য পূরণ ( সঙ্কলিত )	...	...	...	...	৩৭২
১০৫। শ্রীহট্টের রঘুনাথ ও বঙ্গের রঘুনাথ (প্রতিবাদ)	...	,, গোলকনাথ ভট্টাচার্য্য,	...	...	১২৬

ম

১০৬। মঞ্জী ব্রত	...	,, গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য বি, এ, বি, টি,...	...	...	৪২
-----------------	-----	---	-----	-----	----

স

১০৭। স্বপ্ন বাসবদত্তা ( নাটক )	...	,, গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য বি, এ, বি, টি,	...	১০৪, ৫৩, ১৮৪	
১০৮। সন্তান পালন	...	,, জানেন্দ্র নারায়ণ বাগ্‌চী এল. এম, এস,	...	...	২৬৩
১০৯। সন্ধ্যা ( কবিতা )	...	,, চারু গুপ্তা	...	...	২৪২
১১০। সন্ধ্যা ( কবিতা )	...	,, পরিমল কুমার ঘোষ বি, এ,	...	...	৩৪০
১১১। সন্তা মঙ্গল ( কবিতা )	...	,,	...	...	৪১৭
১১২। সাধুতাবা বনাম প্রাদেশিক ভাষা	...	,, সুশীল চক্রবর্তী	...	...	২৫৪
১১৩। সের গঙ্গা বা শিরগঙ্গা পাখী	...	,, পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	...	...	১৭

হ

১১৪। হাড়ি চাচা	...	,, পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	...	...	১৩৬
১১৫। হিন্দুসমাজ নীতির বৈবয়িক ভিত্তি	...	,, উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ এম, এ, বি, এল,	...	...	৩৪১



৪র্থ বর্ষ

বৈশাখ ১৩২১

১ম সংখ্যা

## রঞ্জন-শিল্পের ইতিহাস

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে, এ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক ভঙ্গিতে বাহ্যিক কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা সমস্তই আধুনিক কালে তাঁহাদেরই প্রতিভা বলে সম্পাদিত; অর্থাৎ এক কথায়, প্রাচ্যাদিগের এ বিষয়ে গৌরব করিবার কিছুই নাই। উক্তরূপ সিদ্ধান্তের মূলে কতটুকু সত্য নিহিত আছে এবং উহা অত্রাক্ষরপে গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না সে প্রশ্নের নীমাংসা বা আলোচনা করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু প্রতীচ্যগণ নিজের জ্ঞান-গৌরব ঘোষণার যতই একদেখ-দর্শিতার পরাকাষ্ঠা দেখান না কেন, একটি বিষয়ের জন্য তাঁহারা যে প্রাচ্যজ্ঞাতিসমূহের নিকট গুণী, তাহা অমানভাবে স্বীকার করিয়া থাকেন। সে বিষয়টি ‘রঞ্জন-বিদ্যা’।

কৃত্রিম উপায়ে সৌন্দর্য-বর্ধনের প্রবৃত্তি কি সত্য কি অসত্য সকল জাতির মধ্যেই লক্ষিত হইয়া থাকে। উক্তরূপ প্রবৃত্তি হইতেই রঞ্জন-কলার প্রথম উৎপত্তি হইয়াছে। অতি প্রাচীন কালে মানবজাতির সত্যতা-

লোক প্রাণ্ডির সঙ্গে সঙ্গেই নানা-রঞ্জন কলার উৎপত্তি প্রকার বৃক্ষপত্র পুষ্প বকল বা মূলের কাথ এবং বিভিন্ন প্রকার কলের রস দ্বারা অস্থায়ী (fugitive) রঞ্জন কার্য সম্পা-

দিত হইত, এবং উহা গৃহকার্যের মধ্যেই পরিমণ্ডিত ছিল। গৃহস্থ ললনাগণ সূত্র প্রস্তুত এবং বস্ত্র-বরনের ভার স্বয়ং পরিবারের ব্যবহার্য বস্ত্রাদি স্বহস্তে রঞ্জিত করিতেন। এখনও নিউ জীল্যান্ডের (New Zealand) “মেওরিনের” মধ্যে এবং অস্ট্রেলিয়ার আদিম অসভ্যজাতির মধ্যে উক্তরূপ রঞ্জনপ্রথা প্রচলিত আছে। কালে রং দ্বারা করিবার জন্য রঞ্জক উপকরণের সঙ্গে রক্তবন্ধকারী (mordant) রূপে লৌহ বা ফিটকারি সংযুক্ত মৃত্তিকা মিশ্রিত করিয়া লওয়া হইত। এই রূপে অতি প্রাচীন কালেই রঞ্জন-কলার সৃষ্টি হইয়াছে।

কিন্তু রঞ্জন-কলা প্রকৃত শিল্পরূপে ভারতবর্ষেই প্রথম প্রতিষ্ঠালাভ করে। বহু ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে অতি প্রাচীনকালেই ভারতবর্ষে নানা প্রকার সুন্দর বর্ণে সজ্জিতভাবে রঞ্জন করিবার বিধি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, এবং রঞ্জিত বস্ত্রাদি ভারত-বর্ষে সর্বত্রই ও সর্বদাই ব্যবহৃত হইত। আমাদের

প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে ইহার রঞ্জন শিল্পের উৎপত্তি যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

হোমর, হেরোডোটাস প্রমুখ পাশ্চাত্য লেখকগণও এ বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেবতাদিগের মধ্যে কেহ সর্বদা পীতবর্ণে রঞ্জিত পরিচ্ছদ ধারণ করিতেন বলিয়া পীতাবরণ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন;

কেহ নীলবর্ণের পোষাকে শোভিত হইতেন বলিয়া নীলাধর নামে অভিহিত হইয়াছেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ আজীবন পীতবর্ণ কোপীন পরিধান করিতেন। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে রঞ্জিত বস্ত্রাদি, বর্ণের স্থায়িত্ব এবং উজ্জলতার জন্য, পশ্চিমে পাংশু ও আরব হইতে পূর্বে গ্রাম ও মলয়দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ এসিয়ার সমগ্র দক্ষিণাংশেই আদৃত এবং উচ্চমূল্যে বিক্রীত হইত। ক্রমে ভারতবর্ষের রঞ্জিত বস্ত্রাদি আরববণিকদিগের দ্বারা পারস্য ও আরব উপসাগরের পথে ফিনিসিয়া এবং মিশর দেশে প্রেরিত হইতে থাকে। এইরূপে অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষ এবং মিশর দেশে বিশেষ লাভজনক একটি ব্যবসায় প্রবর্তিত হইয়াছিল। পরবর্তী কালে ভারতবর্ষ হইতে রজন উপকরণসমূহ সংগ্রহ পূর্বক ভারতবর্ষীয় রজন-প্রণালী অনুকরণ করিয়া মিশরীয়গণ নিজেরা বস্ত্রাদি রজন করিতে আরম্ভ করে। ঐতিহাসিক প্লিনি ( Pliny ) দ্বিসহস্র বৎসর পূর্বে, মিশরীয়গণ কি কি উপায়ে রজন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিত, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

রজন-বিজ্ঞা বা রজনশিল্প কোনও সময়ে কোনও এক স্থানে সীমাবদ্ধ ছিল, এরূপ নহে; পক্ষান্তরে প্রত্যেক সভ্যজাতির প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে দেখা যায়, যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রত্যেক দেশে অল্লাবিক মাত্রায় রজন কলার জ্ঞান ছিল। প্রকৃত অর্থকরী শিল্পরূপে রজন ব্যবসায় যখন যে দেশে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে এ প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করা হইতেছে।

খৃষ্ট জন্মের সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে এসিয়ার পশ্চিম প্রান্তে ফিনিসিয়া দেশের টায়ার ( Tyre ) নামক সমুদ্রোপকূলবর্তী জনপদ হইতে এক প্রকার বেগুনী রং আবিষ্কৃত হয় এবং অল্পকাল মধ্যেই টাইরিয়েন পারপল ( Tyrian Purple ) নামে চতুর্দিকে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করে। উক্ত রঙ্গের ব্যবসাতে অনতি-

কাল মধ্যেই টায়ার একটি সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত হইয়া উঠে, এবং টায়ার ও সিডন ( Sidon ) নামক নগরদ্বয় বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত সমৃদ্ধি এবং ধনগৌরবে সমগ্র পশ্চিম এসিয়ার আদর্শ স্থান ছিল। প্লিনি বর্ণনা করিয়াছেন, পূর্বোক্ত ব্যবসায় টায়ার নগরে এতটা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল যে ঐ স্থানে তৎকালে সাধারণ লোকের বাসের কোনও সুবিধা বা সম্ভাবনা ছিল না।

প্লিনি এবং তৎসমসাময়িক এসিয়ার পশ্চিম লেখকগণ টাইরিয়েন পারপল প্রাপ্তে রজনশিল্পের দ্বারা বস্ত্রাদি রজন করিবার প্রণালী বর্ণিত। সুবিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়া

গিয়াছেন। প্রাচীন মিশরে শক্তি-রূপিণী আইসিস ( Isis ) দেবী ও ভৈরব অসাইরিস ( Osiris ) দেবের মন্দিরের সেবাইংগণ নিজেদের পদমর্ম্মাদ্য প্রকাশের জন্য টাইরিয়েন পারপল দ্বারা রঞ্জিত পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন। পরবর্তী সময়ে যখন রোমকগণ পূর্বদেশ-সমূহ জয় করেন, তখন রাজকীয় বিধান অনুসারে ভূমধ্যসাগরের চতুর্দিকে বিস্তৃত রোম-সাম্রাজ্য মধ্যে একমাত্র রাজপরিবারস্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ব্যতিরেকে অপর সকলের পক্ষে 'টাইরিয়েন পারপল' দ্বারা রঞ্জিত পোষাক ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

এসিয়ার পশ্চিম উক্ত কঠোর রাজবিধানই টাই-প্রাপ্তে রজনশিল্পের রয়ান পারপল শিল্পের অবনত অধঃপতন এবং লুপ্ত হইবার অত্যন্ত কারণ। টায়ারের বণিকগণ

নিজেদের অধীত বিজ্ঞা অথবা কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতেন না। এইরূপে ক্রমে ফিনিসীয়দের অধঃপতনের সঙ্গে উক্ত শিল্প সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়া যায়। প্লিনি-বর্ণিত পদ্ধতিসরণে বহুচেষ্টায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক-গণ "টাইরিয়ান পারপল" দ্বারা বস্ত্র-রজন প্রণালীর পুনরাবিষ্কার করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইতিহাস এই বিশ্রুত রঙ্গ উজ্জল্য এবং স্থায়িত্ব উভয়

হিসাবেই আধুনিক অপেক্ষাকৃত স্বল্পব্যয়-সাধ্য রঙ্গসমূহ অপেক্ষাও নিম্নতর স্তরের। এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে ঐচ্ছল্য এবং স্থায়িত্ব হিসাবে টাইরিয়ান পারপল অতি নিম্নস্তরের রঙ্গ হইয়াও প্রাচীন কালে এতটা কি প্রকারে প্রতিপত্তি এবং প্রসার লাভ করিল, এ প্রশ্নের মীমাংসায় উপনীত হইতে হইলে তৎকালীন সভ্যজগতে বৈজ্ঞানিক উন্নতি এবং বহির্বাণিজ্যের অবস্থার বিষয় মনে করিতে হইবে। সে সময় দক্ষিণ এশিয়ার বহির্বাণিজ্য যেরূপ অনেকটা আরব বণিকদের হস্তে গুপ্ত ছিল, ভূমধ্য-সাগর-কূলস্থিত দেশসমূহের বাণিজ্যও সেইরূপ অনেকটা ফিনিসিয় বণিকদের আয়ত্ত ছিল। এরূপ অবস্থায় স্বদেশজাত পণ্যের প্রচলনে যে তাহারা সমাধিক চেষ্টা করিবে ইহা অতি স্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ, ২৩ সহস্র বৎসর পূর্বে তৎকালীন সভ্যজগতে ভারতবর্ষ এবং চীন ব্যতিরেকে অল্প কোনও দেশে প্রকৃত অর্থকরী শিল্পরূপে রঞ্জন-শিল্পের প্রচলন ছিল না। কাজেই গ্রীস ও মিশর দেশের অতি সন্নিহিত-বর্তী টায়ার নগরে আবিষ্কৃত একমাত্র রঙ্গ ফিনিসিয় বণিকদের হস্তে যে আশাতীত প্রতিপত্তি লাভ করিবে তাহা সহজেই অল্পম্যে। বিশেষতঃ, ভারতবর্ষে রঞ্জিত বস্ত্রাদি সে সময়ে গ্রীক, রোমক প্রভৃতির নিম্নতম বিশেষ সহজ-লব্ধ ছিল না। বর্তমান সময়ে জার্মানী যেরূপ রঞ্জন-শিল্পের কেন্দ্রস্থান, খৃষ্টাব্দের সহস্রাব্দিক বৎসর পূর্বে ফিনিসিয়া দেশের অবস্থাও অনেকটা সেইরূপ ছিল। উক্ত কারণেই টায়ার নগরের রঞ্জন-শিল্প সম্বন্ধে এ স্থলে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা করা গেল।

পাশ্চাত্য লেখকগণের গ্রন্থাদি হইতে দেখা যায় যে প্রাচীন কালে বাহারা রঞ্জিত পোষাক পরিধান করিতেন তাঁহারা অভ্যস্ত সম্মানের চক্ষে দৃষ্ট হইতেন, এবং কেবল বিশিষ্ট উপলক্ষেই রঞ্জিত বস্ত্রাদি ব্যবহৃত হইত। অগাষ্টাইন যুগের রোমক লেখকগণের রচনা হইতে প্রমাণিত হয়, যে তৎকালে রঞ্জিত বস্ত্রাদির মহাব্যতী

নিবন্ধন সাধারণ লোকে উহা ব্যবহার করিতে পারিত না।

টমসন (Thomson) এবং সাঙ্ক (Schunk) নামক পুরাতত্ত্ব-সত্যানুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিকদ্বয় মিশর দেশীয় প্রাচীন শবদ্বাধারে সংরক্ষিত শবের পরিধান-বস্ত্রের রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, অতি প্রাচীন কালে মিশরবাসিগণ নীল ও মঞ্জিষ্ঠা (Alizarin) দ্বারা রঞ্জিত রঞ্জন প্রণালী অবগত ছিলেন। ঐ প্রাচীন মিশরে শবসমূহ (mummy) যে খৃষ্টাব্দের রঞ্জন-শিল্প বহু পূর্বেই তাগ ইতিহাস পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। কিন্তু

প্রকৃতপক্ষে উক্ত বস্ত্রাদি মিশর দেশেই অথবা ভারত বর্ষে রঞ্জিত হইয়াছিল তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। আফ্রিকায় নানা প্রকার বন্য নীলগাছ পাওয়া গেলেও তথাপি অতি প্রাচীনকালে মিশরবাসিগণ কোনও প্রকার রঞ্জনপ্রণালী জানিতেন না। এমন কি কোনও রঙ্গের বিষয়ও তাঁহারা অবগত ছিলেন না। ক্রমে তাহারা ভারতবর্ষ হইতে রঞ্জন-উপকরণসমূহ সংগ্রহ করিয়া ভারতবর্ষীয় প্রণালীর অনুসরণে রঞ্জন-কার্য শিক্ষা করিতেন। \*

ফিনিসিয় এবং আলেকজেন্দ্রিয়া বণিকগণ দ্বারা ক্রমে রঞ্জন উপকরণসমূহ এবং রঞ্জন মধ্যযুগে ইউরোপে প্রণালী গ্রীসে নীত এবং প্রবর্তিত। রঞ্জনশিল্পের অধঃ-পতন হয়। কিন্তু গ্রীস বা রোমে কি ভাবে এবং কি প্রণালীতে রঞ্জন-কার্য সম্পাদিত হইত, তাহার কোনও বিবরণ পাইবার উপায় নাই। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক শত বৎসর পর্যন্ত ইউরোপ যে বর্ণরতার লালভূমিতে পরিণত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রতিঘাতে তৎকালীন পাশ্চাত্য রঞ্জন-

\* Encyclopaedia Britannica—দশম সংস্করণ, সপ্তবিংশ খণ্ড, ৫৫৫ পৃষ্ঠা।

বৈশাখ ১৩২১

শিল্প সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, এবং রোমক বা গ্রীকদিগের এ বিষয়ে বাহ্য অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান ছিল, কালে তাহাও বিশ্বস্তির ভিত্তিরগর্ভে ডুবিয়া যায়। কিন্তু ইটালিদেশে, বিশেষতঃ সিসিলিতে, রজনশিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও সম্পূর্ণ লুপ্ত হইবার অবকাশ পায় নাই।

নানাবিধ প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে এই দীর্ঘকাল পর্যন্ত অর্থাৎ খৃষ্টীয় পঞ্চম পঞ্চম হইতে শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়ো- ত্রয়োদশ শতাব্দী দশ শতাব্দী পর্যন্ত এসিয়ার পশ্চিম মধ্যে পশ্চিম প্রান্তবাসী ইহুদীগণ রজন এসিয়ার রজন ব্যবসায়টা তাহাদের নিজস্ব বা শিল্পের অবস্থা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিল।

তাহারা কোনও মতেই তাহাদের রজন প্রণালীর বিষয় কাহারও নিকট ব্যক্ত করিত না। মিসেস মেরিফিল্ডের মতে দ্বাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত পরি- ত্রাজক, ইহুদি-বৈজ্ঞানিক-ভিলক, টুডেলা (Tudela) নিবাসী বেঞ্জামিন ( Benjamin ) খ্রীঃ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত গ্রন্থে লিখি- রাছেন যে, তিনি যখন ১১৬০ হইতে ১১৭৩ খৃষ্টাব্দের মধ্য- বর্তী সময়ে জেরুজালেমে (Jerusalem) ভ্রমণ করিতে যান, তখন ঐ নগরে মাত্র ২০০ জন ইহুদি বাস করিত। তাহারা সকলেই পশমী বস্ত্রাদির রজনের ব্যবসায় ব্যাপৃত ছিল এবং উহা সম্পূর্ণ রূপে তাহাদের করায়ত্ত ছিল। বেকমেন ( Beekman ) প্রমাণ করিয়াছেন যে ঐ সময়ে ইটালির রজন ব্যবসায় ইহুদীদিগের ( Israelites ) অধিকারে ছিল। ক্রমে সিসিলীয়াদের নিকট হইতে ইটালিবাসীগণ রজনপ্রণালীসমূহ পুনরায় শিক্ষা করেন। সিসিলি হইতেই ইউরোপে রজনশিল্প পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভেনিসের বণিকগণ প্রাচ্য রজন-ব্যবসায়ের আমদানী করিয়া পাশ্চাত্য রজনশিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট সহায়তা করেন। ঐ সময় হইতে রজনশিল্প অতি দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে আরম্ভ করে ও চতুর্দিকে বিস্তৃত হইতে থাকে।

ফ্লোরেন্স ( Florence ), ভেনিস ( Venice ) প্রভৃতি নগরে রজন ব্যবসায়ীদের নূতন নূতন দলের সৃষ্টি হইতে থাকে।

প্রায় ঐ সময়েই রুসেলেই ( Rucellai ) নামক জনৈক ফ্লোরেন্সনিবাসী বৈজ্ঞানিক চতুর্দশ শতাব্দীতে পশ্চিম এসিয়ার উপকূলভাগে সামু- ইয়ুরোপে রজন ত্রিক আগাছা বিশেষ হইতে শিল্পের পুনরুদ্ধার অরচিল ( Orchill ) নামক বেগুনী রং প্রস্তুত প্রণালীর পুনরাবিষ্কার করেন। ইটালি হইতে ক্রমে জার্মানী ফ্রান্স ও ফ্লান্ডার্সে ( Flanders ) রজনশিল্প বিস্তৃত হয়। শেখোক্ত স্থান হইতে ১৪৭২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের তৃতীয় এডওয়ার্ড একদল শিল্পী আনায়েয়া লণ্ডন নগরে রজন- ব্যবসায়ের একটি কোম্পানি স্থাপনের বিশেষ সহায়তা করেন।

ফরাসী দেশের জাতীয় পুস্তকাগারে রক্ষিত কয়েক- খানা প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি হইতে রজনপ্রণালী সম্বন্ধে প্রথম লিপিবদ্ধ বিবরণী পাওয়া যায়। এই হস্তলিখিত পুঁথিসমূহের অধিকাংশ গুলিতে সাধারণ চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতি, সম্বন্ধে প্রথম চিত্রকরের রঙ্গ প্রস্তুত এবং তাহা- লিপিবদ্ধ বিবরণী দের প্রয়োগপ্রণালী সম্বন্ধে উপদেশ পাওয়া যায়। অবশ্য ২১৯ খানা পুঁথিতে রঙ্গ প্রস্তুত করিবার নিয়মা- বলী এবং তাহাদের ব্যবহারও সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত হই- রাছে। তন্মধ্যে আলক্রিয়াস (Alchreus) লিখিত পুঁথিখানাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নানাবিধ আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে দেখা যায় যে ঐ পুস্তকখানা অন্ততঃ ১৪১০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে লিখিত হইয়াছিল এবং উহার কিয়দংশ তাহারও ৩০ বৎসর পূর্বে লিখিত। আলক্রিয়াস ব্রেজিল কাঠ ( Brazil wood ), অরচিল, নীল, কারমেস ( Kermes ) প্রভৃতি দ্বারা রজনপ্রণালীর বিবরণ লিপি-

বহু করিয়া গিয়াছেন। তৎব্যতিরেকে উক্ত পুথিতে রং পাকা করিবার জন্য ফিটকারি ও দৌহ, শিকান্ন, এবং কবারিণ (Tannin) প্রভৃতি পদার্থের উল্লেখ আছে। ১৪২৯ খৃষ্টাব্দে ভেনিস্ হইতে রঞ্জনবিজ্ঞা সম্বন্ধে ইউরোপে প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়। ঐ পুস্তকে তৎকালে প্রচলিত রঞ্জনপ্রণালীসমূহের বিস্তারিত বিবরণ সংগৃহীত হয়। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে

উহা পুনর্মুদ্রিত হয়। ১৫৪৮ সনে রঞ্জনবিজ্ঞা সম্বন্ধে রসেটি (Rosetti) ভেনিস্ হইতে প্রাচীন গ্রন্থাদি তৎকালীন রঞ্জনবিজ্ঞা সম্বন্ধে এক খানা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। মেরিফিল্ড (Merrifield) তৎপ্রণীত প্রাচীন রঞ্জন পদ্ধতি (Ancient Practice of Dyeing) নামক গ্রন্থে বোলগনা (Bologna) নগরস্থ সেন্ট সেলভের ধর্মমন্দিরে সংরক্ষিত পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লিখিত কয়েকখানা প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির অনুবাদ করিয়াছেন। ঐ সমস্ত হস্তলিখিত পুথিতে আলক্রিয়াস বর্ণিত রং সমূহ ছাড়া ওয়াড (Woad), বাগাদন বা বাগাদেল (Bagadon or Bagadel) নামে অভিহিত ভারতবর্ষজাত নীল, চন্দনকাষ্ঠ, লাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা, প্রভৃতি কতকগুলি রংএর বিশেষ উল্লেখ আছে। পূর্ণোক্ত তালিকা হইতে দেখা যায় যে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে শিল্পিগণ বহু প্রকার রংএর ব্যবহার জ্ঞাত ছিলেন।

১৪২২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা এবং ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে উত্তরাংশ অস্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া পূর্বভারতে গমন করিবার পথের আবিষ্কারের ফলে রঞ্জন ব্যবসায় প্রভূত উন্নতি লাভ করে। এই সময় হইতে পূর্বভারতজাত নানা প্রকার নুতন রং ইউরোপে আমদানী হয় এবং রঞ্জন কাঠের (dye-woods) ব্যবসায় ইটালিয়াদের নিকট হইতে

পর্টুগিজ ও স্পেনীয়দের হাতে যায়। কারণ পূর্বভারতজাত পণ্যাদি পশ্চিম এশিয়ার পথে প্রেরিত না হইয়া, উত্তরাংশ অস্তরীপের পথে গোজা ইউরোপের প্রেরিত হইতে থাকে। প্রাত বৎসর অধিকতর পরিমাণে প্রাচ্য শিল্পসম্ভার ইউরোপে আমদানী হইতে আরম্ভ করে।

ক্রমে ইউরোপে রং উৎপন্নকারী বৃক্ষের (Dye plants) চাষ আরম্ভ হয় এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রায় ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে জার্মানি, ফ্রান্স, ও হলণ্ড দেশে ওয়াড (woad) এবং মঞ্জিষ্ঠা (madder) উভয়ের আবাদ আরম্ভ হয়। ওয়াড নীল উৎপন্নকারী এক প্রকার বৃক্ষবিশেষ। মঞ্জিষ্ঠা একপ্রকার ভারতবর্ষীয় লতা; উহার মূল হইতে সুন্দর লাল রং (Alizarin) পাওয়া যায়। স্পেনীয়দের সংস্পর্শে আসিয়া ওলন্দাজগণও রঞ্জন ব্যবসায় যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে।

১৫১৮ খৃষ্টাব্দে স্পেনীয়গণ মেক্সিকো আমেরিকা আবিষ্কারে সিকোতে উপনীত হইয়া তৎদেশস্থ আদিম অধিবাসীদের মধ্যে কচিনিল (Cochineal) নামক এক প্রকার জৈব রঞ্জন-উপকরণের (Animal dye) ব্যবহার দেখিতে পান, এবং পরীক্ষায় জ্ঞাত হইতে পারিলেন না। কিন্তু কচিনিল হইতে কারমেস অপেক্ষা দশগুণ অধিক রং পাওয়া যায়, এবং এই কারণেই কচিনিলের ব্যবহার ইউরোপে দ্রুতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে ড্রেবল (Drebbel) নামক জর্মনিক ওলন্দাজ রাসায়নিক ঘটনাক্রমে আবিষ্কার করেন যে, কচিনিলের সঙ্গে টিনজব মিশ্রিত করিয়া লইলে পশম অতি সুন্দর এবং উজ্জল রক্তবর্ণে রঞ্জিত করা যায়। এই সময় নবাবিহিত আমেরিকাতে লগ্‌কাষ্ঠ (Logwood) নামে এক

\* Manuscript of John Le Byone No 6741 (French National Library).

† Mariogola del Arte de Tentori.



একর কাঠ পীত রংএর জন্য ইউরোপে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করে। কিন্তু উক্ত রংএর অস্থায়িত্ব নিবন্ধন প্রত্যক্ষ ভাবে রঞ্জককার্যের ( Direct dyenig ) জন্য লগকাঠের ব্যবহার শীঘ্রই উঠিয়া যায়, এবং কেবল মাত্র অত্যন্ত রংএর সহিত সহিত মিশ্রিত অবস্থায় ব্যবহৃত হইতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ডাক্তার বেনক্রফট ( Bancroft ) লগকাঠ এবং তৎকালে প্রচলিত অজ্ঞান্য পীত রংএর পরিবর্তে আমেরিকা হইতে Quercitron Bark নামক একপ্রকার কাঠের প্রচলন করেন। Quercitron Bark অনেকটা কটকি কার্যের তায়। প্রায় এই সময় হইতে রঞ্জককার্যের জন্য খয়েরের ব্যবহারও এ স্থলে উল্লেখযোগ্য।

১৬৬২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি ( Royal Society ) রঞ্জনশিল্পের সাহায্যার্থ তৎকালে প্রচলিত রঞ্জনপ্রণালীসমূহের বিবরণ একত্র লিপিবদ্ধ করিয়া ইংরেজী ভাষায় এ বিষয়ে প্রথম সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে রঞ্জনশিল্পের উন্নতি চেষ্টা।

ইংরেজী ভাষায় এ বিষয়ে প্রথম পুস্তক প্রকাশ করেন \*। দশ বৎসর পর ফরাসী মন্ত্রী কলবার্ট ( Colbert ) প্রচলিত রঞ্জনপ্রণালীর সমূহের উন্নতিকল্পে, শিল্পীদিগের পরিচালনার জন্য

নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়া প্রকাশিত করেন। এই সময় হইতে ফরাসী গভর্ণমেন্ট রঞ্জনশিল্পের উন্নতি চেষ্টায় সর্বদাই বিশেষজ্ঞ রাসায়নিক নিযুক্ত রাখিয়াছেন। ১৭০৮ হইতে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ মধ্যে যে সমস্ত ফরাসী রাসায়নিক রঞ্জনশিল্পটাকে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক শিল্পে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে হেলট ( Hellot ), মেকিয়্যার ( Macquer ), বারথেলো ( Berthelot ) শেভরিউল ( Chevreul ) প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নব্য রসায়ন বিজ্ঞান উৎপত্তি এবং ইউরোপে প্রাশিয়ান ব্লু ( Prussian Blue )—১৭১০ খৃঃ, ইনডিগো একসট্রাক্ট ( Indigo extract )—১৭৪০ খৃঃ,

সালফিউরিক এসিড ( Sulphuric Acid )—১৭৭৪ খৃঃ, মরেক্সাইড ( Maurexide )—১৮৮ খৃঃ, পিকরিক এসিড ( Picric acid )—১৭৮৮, কার্বনেট অব সোডা—১৭৯০ খৃঃ, ব্লিচিং পাউডার ( Bleaching powder )—১৭৯৮ খৃঃ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় রাসায়নিক ঔষধির আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জনশিল্প অতিক্রান্ত উন্নতি লাভ করিতে থাকে। এই সময়ে ইংলণ্ডে টমাস হেনরী ( Thomas Henry ), হোম ( Home ), বেনক্রফট ( Bancroft ) এবং ফরাসি দেশে ডেমবরণে ( Dambourney ), গণফ্রেবিল ( Gonfreville ) প্রমুখ বহু রাসায়নিক মৌলিক গবেষণা দ্বারা রঞ্জনবিজ্ঞান সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রঞ্জককার্যের জন্য কেবলমাত্র প্রাকৃতিক রঞ্জন উপকরণই ব্যবহৃত হইত। এই সময়ে কৃত্রিম রং আবিষ্কৃত হয় এবং রঞ্জনশিল্পে এক নূতন যুগ আদায়ন করে। কারণ কৃত্রিম রংসমূহ ক্রমে প্রাকৃতিক রংসমূহের স্থান অধিকার করিতে থাকে এবং এই অল্প কাল মধ্যেই প্রাকৃতিক রঞ্জন-কৃত্রিম রং আবিষ্কারের উপকরণ সমূহের ব্যবহার এক পূর্বে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক প্রকার সম্পূর্ণ লুপ্ত হইবার রং সমূহের বিবরণ উপক্রম হইয়াছে। কৃত্রিম রঞ্জন উপকরণ সমূহের আবিষ্কারের

পূর্বে ইউরোপে বিভিন্নবর্ণে বস্ত্রাদি রঞ্জনের জন্য কি কি প্রাকৃতিক উপকরণ ব্যবহৃত হইত এবং কি কি উপায়ে উহারা সংগৃহীত হইত, নিয়ে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা ও বিবরণ দেওয়া গেল।

রক্তবর্ণ—আক্সাইড অব টিন ( Oxide of Tin ) সহযোগে কচিনিল দ্বারা পশমী বস্ত্রাদি রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইত। সার্ক দুইশতাধিক বৎসর পূর্বে হইতেই উক্ত রঞ্জন প্রণালী প্রচলিত ছিল : কিন্তু এই প্রকার রঞ্জন-কার্যে বিশেষ নিপুণতা এবং শিল্পকৌশলের প্রয়োজন হইত।

অলঙ্কবর্ণ ( Crimson ) :—ফিটকারি ( Alum )

সহযোগে কচিনিল ব্যবহৃত হইত।

আতাত্র ( Pink ) বা পদ্মবর্ণ ( Rose-Red ) :—  
কচিনিল দ্বারা সম্পাদিত হইত।

পূৰ্বোক্ত কার্খ্যের জন্ত কখনও কখনও কচিনিলের পরিবর্তে লাক্ষা ব্যবহৃত হইত। লাক্ষা দ্বারা রঞ্জন-প্রণালী সৰ্ব্বতোভাবে কচিনিলের ব্যবহারের মত। লাক্ষা ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত হইয়া ইউরোপে প্রেরিত হইত।

কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটি কথা এ স্থলে উল্লেখযোগ্য। ইউরোপীয়গণ যদিও আমেরিকা আবিষ্কারের পর কচিনিলের নাম জ্ঞাত হন এবং মেক্সিকো ( Mexico ) হইতে কচিনিল আমদানী করিয়া প্রথম ব্যবহার করিতে থাকেন, ভারতবর্ষে কিন্তু বহুপূর্বেই কচিনিলের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ‘রসার্ণব’ এবং ‘রস-

রত্নসমুচ্চয়’ গ্রন্থে “ইন্দ্রগোপ” বা

প্রাচীনকালে ভারত- “ইন্দ্রগোপক” নামে কচিনিলের বর্ষে “কচিনিলের” উল্লেখ আছে। এই ব্যবহার উভয় গ্রন্থই তাত্ত্বিক রসগ্রন্থ।

ডাক্তার রায়ের মতে ‘রসার্ণব’ দ্বাদশ শতাব্দীর এবং “রসরত্নসমুচ্চয়” ত্রয়োদশ শতাব্দীর গ্রন্থ। ইহা হইতে বুঝা যায় যে ৮।৯ শত বৎসর পূর্বেও ভারতবর্ষে রঞ্জনকার্খ্যের জন্ত কচিনিল ব্যবহৃত হইত।

রক্তবর্ণ :—কচিনিল দ্বারা পশম ( wool ) সুন্দররূপে রঞ্জিত হইলেও কার্পাসের ( cotton ) উপর উহা ব্যবহার করা যায় না। কার্পাস বস্ত্রাদি রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিতে হইলে মজ্জিষ্ঠা ( madder ) ব্যবহৃত হইত। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে কার্পাস-বস্ত্র রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিবার নিমিত্ত ফিটকারি সহযোগে মজ্জিষ্ঠার ব্যবহার

চলিয়া আসিতেছে। \* মজ্জিষ্ঠার ব্যবহার ক্রমে ভারত-বর্ষ হইতে তুর্কি এবং গ্রীসে

ভারতবর্ষে রঞ্জন-প্রবর্তিত হয়, কিন্তু মজ্জিষ্ঠা দ্বারা কার্খ্যের জন্ত মজ্জিষ্ঠার বস্ত্ররঞ্জনপ্রণালী একমাত্র তুর্কি ব্যবহার এবং গ্রীকরাই জানিতেন এবং

ঐ ব্যবসায় সম্পূর্ণরূপে তাহা-দেবই হস্তে ছিল। উক্তরূপ রঞ্জিত কার্পাস-বস্ত্র একমাত্র পূর্বদেশ হইতেই পাওয়া যাইত বলিয়া উহা টার্কি রেড ( Turkey Red ) বা এড্রিয়ানোপল রেড ( Adrianople Red ) নামে অভিহিত হইত এবং বর্তমান সময়েও প্রথমোক্ত নামেই প্রচলিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে বহু প্ররোচনায় কয়েকজন গ্রীক-শিল্পী ফ্রান্সে গমন করিয়া মজ্জিষ্ঠা দ্বারা বস্ত্ররঞ্জনপ্রণালী তথায় প্রবর্তিত করেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসি গভর্ণমেন্ট মজ্জিষ্ঠা দ্বারা বস্ত্ররঞ্জনপ্রণালীর বিবরণ ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া শিল্পীদের মধ্যে বিতরণ করেন। কয়েক বৎসর পর পেপিলন ( Papillon ) নামক জনৈক ফরাসি শিল্পীর নিকট হইতে বহু অর্থব্যয়ে ইংরেজ গভর্ণমেন্ট উক্ত রঞ্জন-প্রণালীর বিবরণ অবগত হন। পরবর্তীকালে এই ব্যবসায় ইংলণ্ডে বিশেষ উন্নতি লাভ করে।

কপিশবর্ণ ( Brown ) :—পিচ কাষ্ঠ ( Peach wood ) সপান কাষ্ঠ ( Sapan wood ) এবং লিমা কাষ্ঠ ( Lima wood ) কপিল বর্ণে বস্ত্রাদি রঞ্জনের জন্ত কখনও কখনও ব্যবহৃত হইত। ঐ কাষ্ঠসমূহ সাধারণতঃ মধ্য আমেরিকা, পূর্বভারতদ্বীপপুঞ্জ এবং পেরু হইতে সংগৃহীত

\*Encyclopædia Britannica—নবম সংস্করণ সপ্তম খণ্ড, ৫৭৬ পৃষ্ঠা—“From very remote times the Hindus have possessed a process for dyeing a brilliant and extremely permanent Red upon cotton fabrics by means of madder. This process travelled westward through the Levant into Turkey and Greece.”

হইয়া ইউরোপে প্রেরিত হইত। কিন্তু পূর্বোক্ত কাঠজাত রং সমূহ স্বর্য়্যালোকে অস্থায়ী বলিয়া উহাদের ব্যবহার অনেকটা সীমাবদ্ধ ছিল। সপানকাঠ বঙ্গদেশে 'বকম' কাঠ নামে পরিচিত। বকম কাঠ অতি প্রাচীন কাল হইতে রঞ্জনকার্যের জন্য এ দেশে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে 'বকম' কাঠের উল্লেখ পাওয়া যায়। পূর্বে ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে 'বকম' কাঠ ইউরোপে রঞ্জনকার্যের জন্য প্রেরিত হইত।\* তামিল ভাষায় বকমকাঠের নাম "সম্পু"। "সম্পু" শব্দ হইতেই সপান শব্দ হইয়াছে।

কার্পাস্ বস্ত্র কপিসবর্ণে রং করিবার জন্য খয়েরও ব্যবহৃত হইত। উক্ত কারণে গড়ে প্রতিবৎসর ৩৬, ১৬, ১০৬ টাকা মূল্যের খয়ের ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে প্রেরিত হইত। খয়ের পশমী বস্ত্রাদি রঞ্জনের জন্য উপযোগী নহে। কিন্তু অধুনা সৈনিকদের পোষাকের নিমিত্ত পশমের উপর থাকি রং করিবার জন্য তুখাক (Copper Sulphate) সহযোগে খয়ের ব্যবহৃত হইতেছে।

কপিশ-পাটলবর্ণ (Brownish pink) :—ফেম-কাঠ (Cam wood) বার কাঠ (Bar wood) এবং সেণ্ডারস্ (Sanders wood) প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। নানা কারণে উহাদের ব্যবহারও অনেকটা সীমাবদ্ধ ছিল। এই সমস্ত কাঠ সাধারণতঃ আফ্রিকা হইতে সংগৃহীত হইত।

সেণ্ডার্স কাঠ রক্তচন্দনের ভাষান্তরিত নাম মাত্র। রক্তচন্দন কাঠ বহুকালাবধি রঞ্জনকার্যের জন্য এ দেশে ব্যবহৃত হইতেছে এবং পূর্বে উক্ত কার্যের জন্য

প্রচুর পরিমাণ কাঠ প্রতি বৎসর ইউরোপে প্রেরিত হইত।\*

পীতবর্ণ :—পীতবর্ণে বস্ত্র রঞ্জন করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য এবং উক্ত কার্যের জন্য সাধারণতঃ কুসুম ফুল, তুত্ জাতীয় পূর্ণভারতবীপপুঞ্জজাত একপ্রকার বৃক্ষ কাঠ (old fuslie) এবং আমেরিকার উত্তর প্রদেশস্থ দেবদারু জাতীয় একপ্রকার বৃক্ষের বৃক্ক (Quercitron Bark) ব্যবহৃত হইত। এস্থলে কটকিকাঠ ও হরিজ্জার নামও উল্লেখযোগ্য।

পিঙ্গলবর্ণ (Orange) :—পিঙ্গলবর্ণে রেশমী বস্ত্র রঞ্জনের জন্য লটকান (Arnotto) ব্যবহৃত হইত। লটকানের আদিস্থান আমেরিকা, কিন্তু বহুকাল হইতেই ভারতবর্ষে লটকানের আবাদ চলিয়া আসিতেছে ‡ এবং প্রচুরপরিমাণে লটকান প্রতি বৎসর এ দেশ হইতে পাশ্চাত্য দেশ সমূহে প্রেরিত হইত।

আরক্তনীলবর্ণ (purple) :—লৌহসংযোগে মজিষ্টা দ্বারা কার্পাস রঞ্জিত হইত। পশম এবং রেশম রং করিতে হইলে মজিষ্টার পরিবর্তে অরচিল ব্যবহৃত হইত।

নীলবর্ণ :—নীল (Indigo) দ্বারা সম্পাদিত হইত। ভারতবর্ষকে নীলের জন্মভূমি বলা যাইতে

\* Sir George Watt—The Commercial Products of India :—"In former years the great use of the wood of this species was as a dyo and large shipments were made annually from Madras to Europe, where it was employed as a colouring agent in Pharmacy, for dyeing, leather and staining wood.....It dyes cloth a beautiful Salmon-pink."

‡ Buchanan Hamilton—Statistical Account of Dinajpur (1883) P. 155. "The Bixa (লটকান) an American plant is now rapidly spreading over Bengal".

\* Sir George Watt.—The Commercial-Products of India, Page 195—"Balkan wood yields a valuable red dye, which before the days of anilino was exported very largely from India to Europe."

পারে। অতি প্রাচীন কালেও ভারতবর্ষে নীলের ব্যবহার জানা ছিল। ভারতবর্ষ হইতেই ইয়ুরোপে নীলের ব্যবহার প্রচলিত হয়।

হরিৎ বর্ণ ( Green ) :—উনবিংশ শতাব্দির মধ্য পর্য্যন্ত প্রকৃত হরিৎবর্ণের কোনও রঞ্জন উপকরণ ইউরোপীয়দের জানা ছিল না। হরিৎ-বর্ণে বস্ত্র রঞ্জন করিতে হইলে পীত ও নীল রং একত্রে মিশ্রিত করিয়া লওয়া হইত। ঐ সময়ে হরিৎ বর্ণের কতকগুলি কার্পাস

বস্ত্র চীনদেশ হইতে ফ্রান্সে পাশ্চাত্য রঞ্জনশিল্পে প্রেরিত হয়। ফরাসিগণ বর্ণ-হরিৎ রংএর অভাব। সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন এবং জানিতে পারেন যে ঐ হরিৎ রং নীল এবং পীত রংএর সংমিশ্রণ জাত নহে, পরন্তু তৎকালে ইয়ুরোপে অজ্ঞাত লো-কাও ( Lo-kao ) নামক চীনদেশজাত একপ্রকার মূল্যবান রঞ্জন-উপকরণ। পরে কতকটা লো-কাও সংগৃহীত হইয়া ফ্রান্সে প্রেরিত হয়। কিন্তু বহু চেষ্টায়ও ফরাসি রাসায়নিকগণ উহা দ্বারা সুলভরূপে রঞ্জনকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন নাই।

কৃষ্ণবর্ণ :—পূর্বে নীল, পীত এবং লোহিত এই তিন রংএর সংমিশ্রণে কৃষ্ণবর্ণের বস্ত্রাদি রঞ্জিত হইত। প্রকৃত পক্ষে তিনবার রং করিতে হইত, কাজেই সময় এবং ব্যয়-সাপেক্ষ বলিয়া উক্ত প্রণালী ক্রমে লুপ্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তী সময়ে হরিৎ কিংবা তৎজাতীয় কোনও প্রকার কষায়িণ ( Tannin ) উপকরণ লৌহ সংযোগে এবং কখনও কখনও বা ২১০ প্রকার বন্ধকারি ( mordant ) সহযোগে ব্যবহৃত হইত। ভারতবর্ষে কষায়িণ উপকরণের অভাব নাই।

দৃষ্টান্তস্বলে বলা যাইতে পারে, প্রতি বৎসর ৫০ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের হরিতকিই এ দেশ হইতে বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। এ স্থলে নীল অথবা কালো রং করার জন্য মধ্য-আমেরিকাজাত লগ্-কাঠ নামক একপ্রকার কাঠের ( Log wood ) ব্যবহারও

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, কৃত্রিম রং ( Artificial dye-stuffs ) প্রস্তুত প্রণালীর আবিষ্কারের পূর্বে পর্য্যন্ত ইয়ুরোপীয় শিল্পীগণ রঞ্জন উপকরণ সমূহের জন্য ভারতবর্ষ বা আমেরিকার অনেকটা মুখাপেক্ষী ছিল, এবং অধিকাংশ স্থলেই ভারতবর্ষে প্রচলিত রঞ্জনপ্রণালীসমূহই অনুসরণ করিত।

পূর্বেবর্ণিত তালিকা হইতে আরও দেখা যায় যে, ইয়ুরোপীয় শিল্পীগণ অত্যন্তসংখ্যক রঞ্জন উপকরণের ব্যবহারমাত্র জ্ঞাত ছিল। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল হইতেই রঞ্জন কার্য্যের জন্য বহুপ্রকার প্রাকৃতিক উপকরণ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল।

পাঠকগণের বোধসৌকর্য্যার্থ ইয়ুরোপে পুষ্পজাত এ স্থলে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ রংএর ব্যবহার। করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পাশ্চাত্য শিল্পীগণ ভারত জাত কুম্ভুম এবং কুম্ভুম ফুল ব্যতিরেকে পুষ্পজাত অল্প কোনও রঞ্জন উপকরণের ব্যবহার জানিতেন না। অথচ পুষ্পবহুল ভারতবর্ষে বহুকালাবধি পলাশ ফুল, গেন্দা ফুল, শেফালিকা, কুম্ভুম, শিমুল ফুল, মান্দার ফুল, ভবা ফুল, কুম্ভুম ফুল প্রভৃতি অসংখ্য প্রকারের ফুল বস্ত্রাদি রং করার জন্য ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।\*

\* দেলীয় রঞ্জন-উপকরণ সমূহের বিবরণ ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা ভবিষ্যতে করিবার আশা রহিল।—প্রবন্ধ লেখক

‡ Agricultural Ledger. 1908. No 2. 'Dyes from Flowers' by I. H. Burkill Page 9—  
“It is difficult to ascertain from the literature available if and where flower petals are used for dyeing in foreign countries as in India. Europe of course has used for long saffron and safflower, both of which come from the East ; and China and Japan have had a trade with

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে পার্কিন ( W. H. Perkin ) মভিন ( mauvine ) নামক প্রথম কৃত্রিম রং প্রস্তুতের পর হইতে রঞ্জনশিল্পে এক অভিনব নূতন যুগ প্রবর্তিত হয়, এবং উক্ত শিল্প অতি দ্রুতভাবে আশ্চর্যরূপ উন্নতি লাভ করিতে থাকে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ২৬শে আগষ্ট মভিনের প্রস্তুত প্রণালী পার্কিন পেটেন্ট প্রথম কৃত্রিম রং ( Patent ) করেন, কিন্তু ইংরেজ ব্যবসায়ীগণ কেহই আর্থিক সাহায্য করিতে প্রস্তুত না হওয়াতে, পার্কিন প্রস্তুত প্রথম কৃত্রিম রং মভিন তৎকালে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই। অবসর পাইয়া ভারগুই ( Verguin ) নামক জর্নিক ফরাসি রাসায়নিক ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে মেজেন্টা প্রস্তুত করেন এবং লায়ন্স ( Lyons ) নগরস্থ রেগার্ড ফ্রাইয়েরসের ( Renard Frires ) কারখানায় অংশিদাররূপে ব্যবসায় প্রচলিত করিবার জ্ঞাত মেজেন্টা প্রস্তুত করিতে থাকেন। পার্কিন-প্রস্তুত মভ ( mauve ) বা মভিন এবং মেজেন্টা একই জিনিষ, উহাদের রাসায়নিক স্বরূপ বা প্রকৃতিতে কোনও প্রভেদ নাই। মেজেন্টা নামের ইতিহাসটা কৌতূহলপ্রদ। যে দিবস ভারগুইন মেজেন্টা প্রথম প্রস্তুত করেন, ঐ দিন মেজেন্টা ( Magenta ) নামক ভূক্ষেত্রে ফরাসি এবং অঙ্গীয়দের মধ্যে বোরতর যুদ্ধ হইতেছিল। উক্ত যুদ্ধ-ক্ষেত্রের নামানুসারেই নূতন রংএর নাম মেজেন্টা রাখা হয়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে নেটেনসন ( Natenson ) এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে হফমেন ( Hoffmann ) জার্মানিতে

সম্পূর্ণ বিভিন্ন উপায়ে এবং স্বাধীনভাবে মেজেন্টা প্রস্তুত করেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে নিকলসন ( Nicholson ) গ্রিয়ার্ড ( Griard ) এবং ডিলেয়ার ( De Laire ) মেজেন্টা প্রস্তুতের অভিনব সহজ উপায় আবিষ্কার করেন, এবং ঐ বৎসরেই শেখোক্ত রাসায়নিক মেজেন্টা হইতে রোজ-নিলিন ব্লু ( Rosaniline Blue ) নামক প্রথম “কৃত্রিম নীল রং” প্রস্তুত করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে লথ ( Lauth ) প্রথম কৃত্রিম কমলা রং ( methyl violet ) নিকলসন প্রথম কৃত্রিম কমলা রং ( Phosphine ), এবং ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে লাইটফুট ( Lightfoot ) প্রথম কৃত্রিম কাল রং ( Aniline Black ) ও চেরপিন ( Cherpin ) প্রথম কৃত্রিম সবুজ রং ( Aldehyde Green ) প্রস্তুত করেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, পার্কিন ( W. H. Perkin ) আধুনিক রঞ্জনশিল্পের প্রবর্তক বা জন্মদাতা। এবং বাহারা এই নবশিল্পের স্তম্ভিকাগারে গাত্রীর কার্য্য করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে হফমেনের ( Hoffmann ) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মেজেন্টা প্রস্তুতের স্ত্র প্রকৃতপক্ষে তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। ১৮৫৮ হইতে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ মধ্যে পাশ্চাত্য রঞ্জনশিল্পের অবস্থার প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয়, কারণ এ সময় হইতে শিল্পীগণ প্রাকৃতিক রঞ্জন উপকরণের পরিবর্তে কৃত্রিম রংসমূহের ব্যবহার আরম্ভ করেন। কৃত্রিম রংসমূহের আবিষ্কারে আনন্দোৎসুক হইয়া ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে হফমেন ( Hoffmann ) বলিয়াছিলেন,

“এখন হইতে আর প্রতি বৎসর

কৃত্রিম রংসমূহ লক্ষ লক্ষ টাকা রঞ্জন উপকরণ সম্বন্ধে হফমেনের সংগ্রহের জ্ঞাত বিদেশে প্রেরণ ভবিষ্যদ্বাণী করিতে হইবে না। পক্ষান্তরে অল্পদিন মধ্যেই ইংলণ্ড রং প্রস্তুত ব্যপারে পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিবে; এবং ইংলণ্ডে প্রস্তুত কৃত্রিম রংসমূহ অন্যান্য দেশে প্রেরিত হইবে; হয়ত সূদূর ভবিষ্যতে নীলের ( Indigo )

Europe in the flower-buds of ‘Sophora Japonica’ which contain a yellow dye ; but beyond these three which are in no way obscure products, it is not improbable that in various countries of the world, flowers which are of no account in the European Art of dyeing, have been or are used as in India.”

আদিহান ভারতবর্ষে কৃত্রিম নীল, কচিনিলের কেম্পহান মেক্সিকোতে কৃত্রিম লাল রং বা কুম্ভুমফুলের দেশ জাপান চীনে কৃত্রিম পীত রং এবং সম্ভ্রান্ত অন্যান্য যে দেশ হইতে যে রং আমদানী হইয়া থাকে সেই সেই দেশে তাহারই অল্পরূপ কৃত্রিম রং সমূহ পণ্যরূপে ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত হইবে।” হফমেনের দান্তিকতাপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী যে বর্ষে বর্ষে সত্যে পরিণত হইয়াছে রঞ্জনশিল্পসংশ্লিষ্ট যে কোনও ব্যক্তিই এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন।

১৮৬২ হইতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে মার্টিয়াস কর্তৃক (Martius) বিসমার্ক ব্রাউন নামক (Bismark Brown) বাদামী রং, মার্টিয়াস ইয়োলো (Martius yellow) নামক পীত রং, পেলাটিন অরেঞ্জ (Palatin Orange) নামক পিঙ্গল রং, এবং ক্লেভেল (Clavel) কভুক মেগডেলা রেড (Magdela Red) নামক লাল রং প্রস্তুতের বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কয়েক বৎসর মধ্যেই শত শত কৃত্রিম রং প্রচলিত হইয়া পড়ে।

এ স্থলে দুইটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ এ যাবৎ যে সমস্ত কৃত্রিম রং প্রস্তুত হইয়াছিল তাহাদের দ্বারা কেবল মাত্র পশমী বা রেশমী বস্তাদিই সুন্দররূপে রঞ্জিত হইত, পরন্তু কোনও প্রকার রং বন্ধকারির সাহায্য ব্যতিরেকে কার্পাস বস্তাদি রঞ্জন করা যাইত না এবং উহাদের কোনটিই বিশেষ স্থায়ী রং (fast dye) ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, এ পর্যন্ত রাসায়নিকগণ কোনও বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া রং প্রস্তুত করিতেন না। তাহারা অনেকটা অহুমানের

উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতেন; ১৮৬৫ খৃঃ পর্যন্ত কাজেই কি ভাবে যে কোনও কৃত্রিম রং প্রস্তুত একটি রং প্রস্তুত হইত তাহার প্রকৃত প্রণালী। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন না, এবং কি প্রকার পদ্ধতিসূত্রে কি প্রকার রং পাওয়া যাইবে তাহা সন্দেহ বলিতে পারিতেন না।

কৃত্রিম রংসমূহের প্রস্তুতের আদি ভূত (starting substance) ধ্বংসকরকার অস্তর্ধূম বিপাক (Destructive distillation) দ্বারা প্রাপ্ত বেনজিন (Benzene) নামক উদ্বায়ী তৈল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কেকিউল (Kekule) বেনজিন পরমাণুর অন্তর্গঠন এবং রাসায়নিক প্রকৃতি সম্বন্ধে স্বীয় মত প্রকাশ করেন।

কেকিউলের মত (Benzene Theory) প্রবর্তনের পর প্রত্যেকটি পূর্বাভিজ্ঞত কৃত্রিম রংএর রাসায়নিক প্রকৃতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং কৃত্রিমরং-প্রস্তুতকারকগণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিবদ্ধ প্রণালী অহুসরণে নির্দ্ধারিত রাসায়নিক প্রকৃতিবিশিষ্ট ইচ্ছাক্তরূপ রং প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে গ্রােবা (Graebe) ও লিবারমেন (Liebermann) কৃত্রিম উপায়ে এলিজেরিন (Alizarin) প্রস্তুত করেন। এলিজেরিন প্রাকৃতিক রংএর প্রথম মঞ্জিষ্ঠামূলজাত প্রাকৃতিক সংশ্লেষণ। উক্ত রাসায়নিকদ্রব্য ও পার্কিন সমবেত হইয়া কৃত্রিম এলিজেরিনের ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং অল্পকাল মধ্যেই প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন।

রঞ্জনশিল্পের ইতিহাসে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ চিরস্মরণীয়। উক্ত বৎসরে বায়ার (Bayer) কৃত্রিম উপায়ে প্রথম নীল (Indigo) প্রস্তুত করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বটিগার (Bottiger) কঙ্গো রেড (Congo Red) নামক নূতন একশ্রেণীর একটি রং প্রস্তুত করেন।

১৮৮০-৯০ মধ্যে উক্ত রং দ্বারা কোনও প্রকার রং-রঞ্জনশিল্পের অবস্থা বন্ধনীর সাহায্য ব্যতিরেকেও কার্পাস অতি উজ্জ্বল রক্তবর্ণে রঞ্জিত করা যায়। পরবর্তী কয়েক বৎসর মধ্যে কঙ্গো রেড শ্রেণীর শতাধিক রং প্রস্তুত হইয়াছে এবং সহজে ও অল্প ব্যয়ে কার্পাস বস্ত্ররঞ্জনের পন্থা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। ১৮৮৭ সনে গ্রিন (Green) প্রিমুলিন (Primuline) নামক একটি রং প্রস্তুত করেন। প্রিমুলিন প্রস্তুত প্রণালীতে একটু বিশেষত্ব আছে। যে যে রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে রংটি প্রস্তুত হইবে তাহাদিগকে বস্ত্রতন্ত্র মধ্যে একত্র করা হয়, অর্থাৎ বস্ত্রতন্ত্র মধ্যেই রংটি প্রস্তুত হয়। ঐরূপ ভাবে রংটি প্রস্তুত হওয়ার উহা বস্ত্রতন্ত্রন্যে সূক্ষ্মভাবে নিবদ্ধ থাকে এবং ধোঁত করিলে বা অত কোনও প্রক্রিয়ায় অপস্থত হয়না; অর্থাৎ রংটি অত্যন্ত পাকা বা স্থায়ী হয়। পরে এই শ্রেণীর আরও বহু রং প্রস্তুত হইয়াছে।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জার্মেনিতে “Badische Anilin and Soda Fabrik” কোম্পানী কৃত্রিম নীল ব্যবসায়ে প্রচলিত করেন এবং ঐ সময় হইতে কৃত্রিম কৃত্রিম নীল নীল প্রাকৃতিক নীলের স্থান

অধিকার করিয়া বসিয়াছে। ১৯০১ সন হইতে কৃত্রিম নীল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রাকৃতিক নীলকে সম্পূর্ণ পরাভূত করিয়াছে। রঞ্জনব্যবসায়ীদের হিসাবে, বিগত কয়েক বৎসর মধ্যে গন্ধকাণু সম্বন্ধিত এক শ্রেণীর রংয়ের (Sulphur colours) আবিষ্কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু উহাদের কোনটিরই রাসায়নিক স্বরূপ এ পর্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় নাই, কাজেই বৈজ্ঞানিক হিসাবে উহার ততটা মূল্যবান নহে। ১৯০১ সন হইতে কৃত্রিম নীল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কৃত্রিম নীলকে পরাভূত হইয়াছে।

বর্তমান সময়ে প্রতি বৎসর ৩০ কোটি টাকা মূল্যের রং কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হইতেছে। উহার ১ অংশই জার্মানিতে প্রস্তুত হইতেছে। বাকি ৭ কোটি টাকার কৃত্রিম রং ইংলণ্ড ফ্রান্স সুইজারলণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রস্তুত হয়। ১৯১০ সনে জার্মানি হইতে ১৫ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের কৃত্রিম রং বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। জার্মানির এক একটি কৃত্রিম রং প্রস্তুতের কারখানা এক একটি ক্ষুদ্র নগরবিশেষ। রং প্রস্তুতকারক বিখ্যাত বাডিশা কোম্পানিতে (Badische Anilin and Soda fabrik) ১৯৭ জন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত কৃতবিদ্য রাসায়নিক, যন্ত্রাদি পরিচালনের জন্য ১৫ জন ইঞ্জিনিয়ার, ৭০২ জন কেরানী এবং ৭৫০০ সাধারণ শ্রমজীবী দৈনিক কাজ করিয়া থাকে।

কৃত্রিম উপায়ে রং প্রস্তুত বিষয়ে উৎকর্ষ সাধনের জন্য জার্মান বৈজ্ঞানিকগণ কি প্রকার অক্লান্ত চেষ্টা করিতেছেন একটি মাত্র দৃষ্টান্ত হইতে তাহা সম্যক্ জদয়জম হইবে। ১৯০০ সনের ২০শে অক্টোবর জার্মান রাসায়নিক সমিতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নবনির্মিত হফমেন মন্নিয়ের হারোয়াটনদিবসে বৈজ্ঞানিকদিগের এক সভা আহত হয়। সভায় কৃত্রিম উপায়ে নীল প্রস্তুত প্রণালীর আবিষ্কারক অধ্যাপক বায়ার (Bayer) এবং বাডিশা কোম্পানির অধ্যক্ষ ডাক্তার ব্রাঙ্ক ও (Dr Brunck) উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে ডাক্তার ব্রাঙ্ক ঘোষণা করেন যে, ঐ পর্যন্ত বাডিশা কোম্পানি কৃত্রিম নীল প্রস্তুতের চেষ্টায় ২ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ ১ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছে। কিন্তু এত টাকা উত্তমেষ্টে ব্যয়িত হইলেও তৎক্ষণাৎ তিনি কিছুমাত্র চূর্ণিত ছিলেন না, কারণ তাহার প্রব আশা ছিল যে, অচিরকাল মধ্যেই অতি মূল্যে এবং সহজে কৃত্রিম নীল ব্যবসায়ে প্রবর্তিত করিতে সক্ষম হইবেন। বৈজ্ঞানিক পাঠকমাত্রই অবগত আছেন

যে, ডাক্তার ব্রাঙ্কের আশা সম্পূর্ণরূপে সত্যে পরিণত হইয়াছে।

অনেকের একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, শুধু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কখনও কোনও দেশের অর্থগণের পথ পরিষ্কৃত হইতে পারে না, বা কোনও শিল্প উন্নতি লাভ করিতে পারে না। ইংলণ্ডও এই সময় সত্য মত উপলব্ধি করিতে পারে নাই বলিয়াই রাসায়নিক শিল্প আজ সম্পূর্ণরূপে জার্মানদের আয়। প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডেই প্রথম পার্কিন (Perkin) কর্তৃক কৃত্রিম রং প্রস্তুত হয়; কিন্তু তৎকালে ইংরেজ ব্যবসায়ীগণ পার্কিনকে কোনও প্রকার আর্থিক সাহায্য বা উৎসাহিত করেন নাই, কারণ কৃত্রিম উপায়ে রং প্রস্তুত করিয়া প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা তাহাদের নিকট অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। উৎসাহ ও চেষ্টায় জার্মান রাসায়নিকগণ অসম্ভবকৈ সম্ভবে পরিণত করিয়াছেন, এবং এক্ষণে কৃত্রিম রং প্রস্তুতের শিল্পকে তাহাদের জাতীয় শিল্প বলিয়া ঘোষণা করিয়া গৌরব প্রকাশ করিয়া থাকেন। বর্তমান সময় একমাত্র জার্মানিতেই সহস্রাধিক রাসায়নিক কৃত্রিম রং সম্বন্ধে নানা প্রকার মৌলিক গবেষণায় নিযুক্ত রাখিয়াছেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যে ব্যবসায়ের কথা কল্পনায়ও আনিতে পারিতেন না বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে আজ সেই ব্যবসায়ে লক্ষ লক্ষ লোক জীবিকা নির্বাহ করিতেছে এবং কোটি কোটি টাকা উপার্জিত হইতেছে।

রঞ্জনব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্ত এবং যাহাতে উক্ত শিল্পসম্বন্ধীয় আবিষ্কার-রঞ্জনশিল্পের বর্তমান সমূহ সকলে জানিতে পারেন অবস্থা।

তৎক্ষণাৎ রঞ্জনশিল্পসংবাদবাহক বহু পত্রিকা পরিচালিত হইতেছে। প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম রঞ্জন উপকরণ সমূহ ও তাহাদের ব্যবহার-প্রণালী সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। অবশ্য-গ্রন্থগুলির আধিকাংশই জার্মান ভাষায় লিখিত—কিন্তু এ যাবৎ অনেকগুলি ইংরেজিতে অনূদিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত পুস্তক সাহায্যে অশিক্ষিত ব্যক্তিও অতি সহজেই সূচাঙ্করূপে বস্ত্রাদি রঞ্জিত করিতে পারে। লিড্‌স নগরে (Leeds) বস্ত্রব্যবসায়ীগণ স্রবৎ রঞ্জনগার স্থাপন পূর্বক বিখ্যাত কয়েক জন রাসায়নিককে উচ্চ বেতনে রঞ্জনশিল্পের উন্নতিকল্পে মৌলিক গবেষণায় নিযুক্ত রাখিয়াছেন। তাহাদের আর কোনও কার্য



নাই। জার্মানিতে কৃত্রিম রং প্রস্তুতের অনেক কারখানায় বিশেষত্বাধিক বিশেষজ্ঞ রাসায়নিক বহু শিষ্যসহ নিত্য নূতন রং আবিষ্কারের জন্য এবং প্রচলিত রঞ্জনপ্রণালী সমূহের উন্নতি-চেষ্টায় অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। পূর্বোক্ত দুটি দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইবে যে আধুনিক রঞ্জনশিল্পের উন্নতিকল্পে কি প্রকার প্রবল চেষ্টা ও প্রতি-দ্বন্দ্বিতা চলিতেছে।

বাহাদের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে আধুনিক রঞ্জন শিল্প বর্তমান পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে পার্কিনের নামই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। তিনি কৃত্রিম উপায়ে কুইনাইন প্রস্তুত করিতে বাইয়া ঘটনাক্রমে প্রথম কৃত্রিম রং প্রস্তুত করেন।

রঞ্জনশিল্পে প্রথম ইংলণ্ডে বৈজ্ঞানিক হফমেন (Hoffmann) মেলডলা (Meldola), গ্রিন (Green), নেট্টে

(Knechet) প্রমুখ রাসায়নিকগণ, এবং জার্মানিতে লিবারমেন (Liebmann), নিট্জক (Nietzki), বেরার (Bayer), বটিগার (Bottiger), শুলটজ (Schultz), গ্রিস (Griess), উইট (Witt), কেরো (Caro), কনিগ (Konig), লেভিনষ্টেইন (Levinstein), এনসাক্স (Anochutz), ওলার (Oehler), কিরকফ (Kirchoff), লিমপেক (Limpach), গ্রাবা (Graebe), গোল্ড স্মিডট (Goldschmidt), ফিসার (Fischer), নেথেনসন (Nathenson), লাউথ (Lauth), হিউমেন (Heumann), সেগমায়ার (Sandmeyer), শ্রাবা (Schraube), প্রমুখ বহু রাসায়নিকের নাম এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বদিও ইংলণ্ডেই প্রথম কৃত্রিম রং প্রস্তুত হয়, জার্মেনগণ এ বিষয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রথম মনোযোগ দেন, এবং বিগত ৪০।৫০ বৎসরের চেষ্টায় বর্তমানে তাহারা রঞ্জনশিল্পে এতটা উন্নতি লাভ করিয়াছেন যে, সুদূর ভবিষ্যতেও যে অল্প কেহ প্রি-দ্বন্দ্বিতায় তাহাদের সঙ্গে আঁড়িয়া উঠিতে পারিবে সেরূপ আশা করা আকাশ-কুসুম কল্পনা মাত্র। বস্ত্র এবং অধ্যবসায়ের বলে বৈজ্ঞানিক

আধুনিক রঞ্জন-শিল্পে জার্মেনগণ হান। উপায়ে ক্ষুদ্রতম শিল্পেরও কতদূর উন্নতি সাধিত হইতে পারে ইহা তাহার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। জার্মান রাসায়নিকগণ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিলে, হয়ত কৃত্রিম রং প্রস্তুতের শিল্পটা অনাদরে এবং উপযুক্ত পরিচর্য্যার অভাবে মাতৃকোড়েই ধংস প্রাপ্ত হইত, এবং রসায়ন-ইতিহাসের কোনও কোণে উল্লিখিত থাকিয়া, “মধ্যযুগে কৃত্রিম উপায়ে স্বর্ণ প্রস্তুতের চেষ্টা”র ভায়, “প্রকৃতিকে জয় করিবার পার্কিনের নিফল প্রয়াস” নামে ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিকগণের পরিহাসের বিষয় হইয়া দাঁড়াইত।

ইউরোপে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, জার্মান রাসায়নিকগণ প্রতিদিন একটি নূতন রং প্রস্তুত না করিয়া জলগ্রহণ করেন না। প্রবাদের মূলে অনেকটা সত্য নিহিত আছে। বিগত ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যে প্রায় ২০ হাজার কৃত্রিম রং আবিষ্কৃত হইয়াছে। অবশ্য সকলগুলিই যে পরীক্ষায় খ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়া নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষণে সমর্থ হইবে এরূপ আশা করা যায় না। বর্তমান সময়ে দুই সহস্রাধিক কৃত্রিম রং রঞ্জনশিল্পে সর্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য ইহাদের অধিকাংশই জার্মেনিতে প্রস্তুত। জার্মান শিল্পীগণ কাম-ধেনুর মত ঘেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ কৃত্রিম রং অনায়াসে প্রস্তুত করিতেছেন।

পূর্বে শিল্পীগণ হাতে হাতে রঞ্জনকার্য সম্পন্ন করিতেন। বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জনশিল্পে যন্ত্রাদির রঞ্জনকার্যের জন্য নানা প্রকার প্রচলন। কল ও যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং বর্তমান সময়ে রঞ্জন সং-শ্লিষ্ট প্রায় সমস্ত কার্যই যন্ত্রাদি সাহায্যে সম্পাদিত হইয়া থাকে। \* এই সমস্ত যন্ত্রাদির প্রচলনই আধুনিক পাশ্চাত্য রঞ্জনশিল্পের দ্রুত উন্নতির একটি প্রধান কারণ। যন্ত্রাদির প্রচলনে শিল্পীগণের বহু সুবিধা হইয়াছে। প্রথমতঃ, উহাতে সময় ও ব্যয় সংক্ষেপ হয় অথচ একটি কারখানায় বহুলোকের দরকার হয় না। দ্বিতীয়তঃ, রঞ্জনকার্যও অধিকতর সূচাঙ্করূপে সাধিত হয়। কাজেই বর্তমান সময়ে কোনও রঞ্জনব্যবসা চালাইতে হইলে হাতে রঞ্জন করিয়া প্রতিযোগিতা করা অসম্ভব। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি

\* কথা— 1. Journal of the Society of Dyers & Colourists.  
2. Dingler's Polytechnisches Journal.  
3. Zeitschrift fuer Farben und Textile-chemie.



সাধারণ আধুনিক রঞ্জনপ্রণালীসমূহ অবলম্বন করিতে হইবে।

বর্তমান অবস্থায় পাশ্চাত্য রঞ্জনশিল্পের ইতিহাস সম্বন্ধেই এ পর্যন্ত আলোচনা করা দেশীয় রঞ্জন শিল্পের হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে মধ্যে মধ্যে ইতিহাসের অভাব সামান্য উল্লেখ ব্যতিরেকে রঞ্জন শিল্পের জন্মভূমি ভারতবর্ষে উক্ত শিল্পের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে অত্যন্তই বলা হইয়াছে। ইহার প্রথম কারণ এই যে, প্রাচীন কালে এবং মধ্যযুগে ভারতবর্ষের রঞ্জনশিল্প বা দেশীয় রংসমূহ দ্বারা রঞ্জনপ্রণালী সম্বন্ধে কোনও গ্রন্থাদিতে কিছুই বিবরণ পাওয়া যায় না। অবশ্য বিভিন্ন সময়ে নানাদেশীয় বৈদেশিক পরিব্রাজকদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্তাদি হইতে মধ্যে মধ্যে দেশীয় রঞ্জনশিল্প এবং তৎকালে প্রচলিত রঞ্জন প্রণালী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণী সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কিন্তু উক্তরূপ বিবরণী হইতে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্পূর্ণ যুক্তিবিগর্হিত। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে নানা প্রকার দেশীয় রং এর নামের উল্লেখ পাওয়া যায় মাত্র।\*

পূর্বোক্তরূপ বিবরণের অভাবের কারণ এই যে এ দেশে পূর্বে রঞ্জनावट्टाটি ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে বংশানুক্রমে “রংরাজ” নামক এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বস্তাদি রঞ্জন করাই “রংরাজ”দের ব্যবসায় ছিল। “রংসাজ” নামে আর দেশীয় রঞ্জন এক শ্রেণীর লোক নৌকা, পালকি শিল্পের অবস্থা। প্রভৃতি কার্যের নির্মিত দ্রব্যাদি রঞ্জন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। যাহারা নীল দ্বারা বস্তাদি রঞ্জন করিত। তাহারা “নীলগার” নামে পরিচিত ছিল।

\* এ বিষয়ে সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করিলে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাঠ করিতে পারেন। (1) “A Manual of dyeing” by Knecht Rawson and Lowenthal, (2) “Dyeing of Cotton Fabrics” by Frankland Beech. (3) “Dyeing of Woollen Fabrics” by Frankland Beech.

\* ভারতীয় রঞ্জনশিল্প এবং রঞ্জনপ্রণালী সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য কোনও বিবরণ পাওয়া যায় এরূপ কোনও প্রাচীন গ্রন্থের নাম পাঠকদিগের মধ্যে যদি কাহারও জানা থাকে, অথবা গ্রন্থ করিয়া জানাইলে বিশেষ বাঞ্ছিত হইবে।—লেখক

উক্ত শ্রেণীসমূহের লোক ছাড়া অন্য কেহ রং এর কাজ করা হয় এবং অপমানসূচক মনে করিত। উহারও নিজেদের অধীত বিজ্ঞা সম্বন্ধে অন্য কাহারও নিকট প্রশ্নোত্তরে কিছু ব্যক্ত করিত না। জাতিগত সঙ্গীততা ভুলিয়া পাশ্চাত্য সর্বজনীনতার ন্যায় উদারতা লইয়া ভারতবাসীগণ কখনও ব্যবসারে প্রবৃত্ত হন নাই। শিল্প ও ব্যবসারে সাম্প্রদায়িকতা চরকালই চলিয়া আসিতেছে। দুষ্টান্তসত্ত্বে বলা যাইতে পারে এই ঢাকা নগরেই যাহারা মহিষ শৃঙ্গের ও হস্তিদন্তের শিল্পে ব্যাপ্ত, তাহারা বংশানুক্রমে উক্ত কাজেই লিপ্ত আছে এবং “বন্দেকার” নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এইরূপে যাহারা হকার নল প্রস্তুতের ব্যবসারে লিপ্ত, তাহারা “নইচাবন্দ”, এবং যাহারা শাল ‘রিপ’ এবং পরিষ্কার করে তাহারা বংশানুক্রমে “শালকর” নামে পরিচিত। অথচ “বান্দেকার” “নইচাবন্দ” বা “শালকর” নামে কোনও জাতি নাই। উহার ব্যবসায়িক সম্প্রদায়মাত্র। এরূপ প্রকৃত পক্ষে রংরাজ নামে কোনও জাতি ছিল না। রঞ্জনশিল্পটি অশিক্ষিত সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় উহাদের নিকট হইতে কোনও রূপ বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পাওয়া যাইত না।

আজ কাল পাশ্চাত্যদেশসমূহে যেরূপ এক একটা রঞ্জন শালায় শত শত লোক নিযুক্ত থাকিয়া কল ও যন্ত্রাদি সাহায্যে রঞ্জন কার্য সম্পাদিত করিতেছে, সেরূপ ভাবে পরিচালিত শিল্প এ দেশে কখনও দেশীয় রঞ্জন ছিল না। প্রত্যেক নগরে এবং শিল্পের অব- বড় বড় গ্রামে “রঙ্গরাজেরা” স্থানীয় নতির প্রথম ব্যবহার্য বস্তাদি রঞ্জন করিত। কারণ। প্রয়োজনানুসারে রঞ্জিত বস্তাদি স্থানান্তরে প্রেরিত হইত বা পাইকারগণ

কর্তৃক রপ্তানী হইত। এই সমস্ত কারণে দেশীয় রঞ্জন প্রণালী সমূহের কোনও উন্নতি হয় নাই। বিসম্বাদ বা তদুর্দ্ধ কাল পূর্বেও যে প্রণালীতে বস্তাদি রঞ্জিত হইত বর্তমান সময়েও অনেকটা সেই সেই প্রণালীই অবলম্বিত হইয়া থাকে। “রঞ্জন বিজ্ঞা” অশিক্ষিত সম্প্রদায় বিশেষের নিত্য সম্পত্তি রূপে পরিগণিত হওয়া ভারতীয় রঞ্জনশিল্পের অবনতির একটি প্রধান কারণ।

দেশীয় রঞ্জনশিল্পের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল কৃত্রিম রংসমূহের আবিষ্কারের পর ক্রমে তাহাও ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে।

তাহার কারণ দেশীয় রংসমূহ অপেক্ষা কৃত্রিম রং সমূহ সহজে সংগ্রহ করা যায় এবং তাহাদের মূল্যও অপেক্ষাকৃত কম। দেশীয় রংসমূহের ব্যবহার সম্বন্ধে কোনও পুস্তকাদি নাই। পক্ষান্তরে পুস্তকাদি সাহায্যে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও কৃত্রিম রংসমূহের সাহায্যে রঞ্জনক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারেন। অনেক সময় কৃত্রিম রংসমূহের টিন বা বাস্তের সঙ্গেই উহা দ্বারা ক্রিপে বস্তাদি রঞ্জন করিতে হয় তাহার বিশদ উপদেশ দেওয়া থাকে। তদ্ব্যতিরেকে প্রয়োজন বোধ করিলে রংপ্রস্তুতকারকগণ ক্রেতৃগণের কারখানায় বিশেষজ্ঞ পাঠাইয়া রঞ্জন-প্রণালী

শিক্ষা দিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য দেশীয় রঞ্জনশিল্পের বণিকগণ দেশীয় রঞ্জনশিল্পের ধ্বংস করিলে যতপ্রকারে হয় সহায়তা করিয়াছেন। তাহারা কৃত্রিম নীল (Artificial Indigo) এবং এলিজেরিন (Alizarin) প্রস্তুত করিয়া ব্যবসায় প্রবর্তিত করিয়াছেন এবং অন্যান্য দেশীয় রংসমূহের অল্পকরণে কৃত্রিম রং প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। এমন কি, অনেক স্থলে নামটি পর্য্যন্ত অল্পকরণ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত পুরুষ ধরুন, যুদ্ধের প্রভৃতি অঞ্চলে গাভীকে আশ্রয়িতা খাওয়াইয়া পরে এই গাভীর মূত্র হইতে এক প্রকার পীত বর্ণের রং প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহা “পীউরি” নামে প্রচলিত। সম্প্রতি উক্ত “পীউরি” অল্পকরণে “Poori dye” নাম এক প্রকার কৃত্রিম রং বাজারে প্রচলিত হইয়াছে।\*

(২) নীল এবং মঞ্জিষ্টা (Alizarin) ব্যতিরেকে প্রাকৃতিক রংগুলি কৃত্রিম রংসমূহ অপেক্ষা স্থায়িত্ব হিসাবে অনেক নিকৃষ্ট;—বিশেষতঃ পীত এবং হরিত বর্ণের দেশীয় রং গুলি অত্যন্ত অস্থায়ী। বর্তমানে ঢাকা কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার ওয়াটসন (Dr. Watson) শিবপুরে অবস্থান কালে কয়েকটি আদর্শ কৃত্রিম রং এবং প্রচলিত দেশীয় রং সমূহের স্থায়িত্ব বৈজ্ঞানিক উপায়ে নির্ধারণ পূর্বক প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, দেশীয় রংগুলি স্থায়িত্ব হিসাবে কৃত্রিম রংসমূহ অপেক্ষা নিম্ন স্তরের।†

কৃত্রিম রং প্রচলনে দেশীয় রংসমূহের কি ভীষণ অবনতি হইয়াছে দুইটি দৃষ্টান্ত হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

১। নীল সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক রঞ্জন উপকরণ। পূর্বে বঙ্গদেশে প্রচুর পরিমাণে নীল কৃত্রিম রংএর উৎপন্ন হইত। বর্তমান সময়ে বঙ্গদেশে নীলের চাষ মোটেই হয় না। দেশীয় রংসমূহের পূর্বে ঢাকা জেলায় ফুলবেরিয়া অধঃপতন। লক্ষ্মীপুর, আটিগ্রাম, হুয়াপুর প্রভৃতি বহুস্থানে নীল কুঠি ছিল। এক্ষণে তাহাদের ধ্বংসাবশেষ সমূহ স্বতীত গৌরবের স্মৃতিস্বরূপ দণ্ডায়মান থাকিয়া ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকগণের গবেষণায় উপাদান প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছে। ১৮৯৪-৯৫ খৃষ্টাব্দে ৪,৭৪,৫২,১৫৩ টাকার এবং ১৮৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্দে ৫,৩৫,৪৫,১১২ টাকা মূল্যের নীল ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। কৃত্রিম নীল প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে ১৮৯৬ সন হইতে নীলের ব্যবসায়ের অবনতি আরম্ভ হইয়াছে। ১৯০৯-১০ সনে মাত্র ৩৫,১৪,১৫৪ টাকা মূল্যের নীল ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হইয়াছে।\*

অর্থাৎ ১০।১২ বৎসর মধ্যে নীলের রপ্তানি ষোড়শাংশের একাংশে পরিণত হইয়াছে। আগামী ১০। ১৫ বৎসর মধ্যে নীলের চাষ ভারতবর্ষ হইতে বোধ হয় এক প্রকার উঠিয়া যাইবে। আশ্চর্যের বিষয় দেশীয় নীলের যে, ১৯০৫-৬ সনে ১,১২,২৪৩ টাকার ব্যবসায়ের কৃত্রিম নীল জার্মানি হইতে এ দেশে অবনতি আমদানি হইয়াছে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জেলায় ৩০টি নীলকুঠি ছিল ও একলক্ষ বিঘা জমিতে নিয়মিত নীলের চাষ হইত এবং প্রতি বৎসর অন্তত ২৫০০ মণ নীল উৎপন্ন হইত।†

নীলের আয় পূর্বে প্রচুর পরিমাণে কুসুমফুলও ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে প্রেরিত হইত। ১৮৭৪-৭৫ খৃষ্টাব্দে ৬,৫০,৮২৭, টাকা মূল্যের কুসুমফুল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে দেশ হইতে ফুলের ব্যবসায় এক প্রকার লুপ্ত হইয়াছে। প্রতি বৎসর

\* Sir George Watt,—Commercial Products of India P. 345. “Nothing is left undone that could expedite the complete overthrow of the Indigenous crafts”

† E. R. Watson, Asiatic Society of Bengal (Memoirs) 1907.

\* Statistics of British India, Fourth Issue 1911. Part II.

† Taylor's Topography of Dacca (১৮৪০ খৃঃ) ১৬৩ পৃষ্ঠা

হংকং ও জাপানে অতি অল্প পরিমাণ কুল পেরিত হইয়া থাকে মাত্র। কৃত্রিম রংসমূহের প্রতিযোগিতা নিবন্ধন কুসুমকুলের মূল্য গত ১০। ১৫ বৎসর মধ্যে পূর্ব মূল্যের এক পঞ্চমাংশে পরিণত হইয়াছে। পূর্বে ছাকা জেলা কুসুমকুলের চাষের জন্য বিখ্যাত ছিল। বুড়িগঙ্গা এবং ধলেশ্বরী নদীর উভয় কূলস্থিত ভূখণ্ডে প্রচুর পরিমাণ কুসুমকুল উৎপন্ন হইত। কুসুম কুলের বিলাসপুর এবং পাটের গোটা ব্যবসায়ের কুসুমকুলের জন্য বিখ্যাত ছিল। অবনতি। ১৮২৪-২৫ সনে ২,২০,৬১৬। ১০

মূল্যের ৮৪৪৮ মণ কুসুমকুল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল,—উক্ত পরিমাণের ৩ অংশ ঢাকা জেলার উৎপন্ন। ১২। ১৩ বৎসর পূর্বেও ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গা নদীর উভয় কূলে অসংখ্য কুসুমকুলের ক্ষেত্র দৃষ্ট হইত। বর্তমান সময়ে সে নয়নানন্দদায়ক দৃশ্য আর দেখা যায় না।†

পরিবর্তনশীল ভূগতের প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে রজন-শিল্পের জন্মস্থান প্রকৃতিদেবীর লীলাভূমি ভারতবর্ষে উদ্ভিজ্জ রংএর পরিবর্তে বহু ঢাকা মূল্যের কৃত্রিম রং অধুনা প্রতি বৎসর আমদানী হইতেছে। ১৯০৯-১০ সনে আমরা ১, ১০, ১০, ১০৪ টাকা মূল্যের কৃত্রিম রং বিদেশ হইতে ক্রয় করিয়াছি। কৃত্রিম রংসমূহের প্রচলনের বিরুদ্ধে মধ্যে মধ্যে অস্বাভাবিক আন্দোলন হইয়াছে—কিন্তু পরিণামে তাহাতে বিশেষ কোনও ফল দর্শে নাই।

ধ্বংসোন্মুখ দেশীয় রজনশিল্পের রক্ষাকল্পে গভর্ণমেন্টও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন ও দেশীয় রজনশিল্পের করিতেছেন। বিভিন্নপ্রদেশপ্রচলিত রক্ষাকল্পে গভর্ণ- দেশীয় রং ও রজনপ্রণালীসমূহের ঘেঁটের চেষ্টা। বিবরণ সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।\* বর্তমান সময়ে দেশীয় রজন উপকরণ, রজন শিল্প, ও রজনপ্রণালী সম্বন্ধে পুস্তকাদির অভাব নাই।

দেশীয় রজনশিল্পের পুনরুদ্ধার বা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে নিম্নোক্ত দুই প্রকার পন্থার একটি অবলম্বন করিতে হইবে। (১) দেশীয় রং দ্বারা রজনপ্রণালীসমূহের

উন্নতি সাধিত করিয়া উহাদিগকে প্রচলিত করিতে হইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, দেশীয় রংগুলি প্রাকৃতিক রংসমূহ হইতে অপেক্ষাকৃত অদারী। কিন্তু একরূপ সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য বলিয়া দেশীয় রজনশিল্পের গ্রহণ না করিবার একটি বিশেষ পুনরুদ্ধার সম্ভাবনা। কারণ আছে। প্রাকৃতিক রংসমূহের মধ্যে এ যাবৎ নীল এবং এলিজেরিন মাত্র কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হইয়াছে, সন্দের উহাদের রাসায়নিক গঠন, প্রকৃতি এবং উহাদের দ্বারা প্রকৃত রজনপ্রণালীও নির্দ্ধারিত ও আবিষ্কৃত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম রংএর সমবেত তালিকায় স্থায়িত্ব হিসাবে নীল ও এলিজেরিন সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহা হইতে মনে হয় যে, যদি অগ্রাঙ্ক দেশীয় রংগুলির রাসায়নিক গঠনপ্রকৃতি নির্দ্ধারিত এবং তাহাদের দ্বারা প্রকৃত রজনপ্রণালী আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইলে তাহারাও স্থায়িত্ব হিসাবে কৃত্রিম রং সমূহের উচ্চ স্থান পাইবে।

কিন্তু সুদূর ভবিষ্যতেও যে আমরা বৈজ্ঞানিক মার্গে ততটা অগ্রসর হইতে পারিব সন্দেহ কল্পনা করাও ষ্টম্ভতামাত্র। আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত দেশীয় রংগুলির অধিকাংশের নাম পর্য্যন্ত জানেন না। পঞ্চাশেরে আমাদের দেশীয় উদ্ভিজ্জ রংসমূহ সংগ্রহ করিয়া জার্শে-গিতে কস্টেনেসকি ( Kostenski ) ও ইংলণ্ডে এ, জি, পারকিন ( A. G. Perkin ) প্রমুখ রাসায়নিকগণ উহাদের রাসায়নিক প্রকৃতি প্রভৃতি নির্দ্ধারণের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করিতেছেন।

( ২ ) রজন কার্খের জন্য কৃত্রিম রং ব্যবহার করিতে হইবে। এদেশে কৃত্রিম উপায়ে রং প্রস্তুতের কোনও কারখানা নাই এবং সুদূর ভবিষ্যতেও যে স্থাপিত হইবে সন্দেহ আশাও অতি অল্প। কাজেই ইয়ুরোপ হইতে কৃত্রিম রং আনিয়া ব্যবসায় চালাইতে হইবে। দেশে একটি রজনশালা স্থাপন পূর্বক কৃত্রিম রং দ্বারা স্বত্র ও বস্ত্রাদি রঞ্জিত করিয়া ব্যবসা চালাইলে, কিরূপ লাভজনক হইবার সম্ভাবনা, ইত্যাদি বিষয় প্রবন্ধান্তরে পূর্বে § আলোচনা করা হইয়াছে।\*

শ্রীঅম্বকুল চন্দ্র সরকার

† Taylor's Topography of Dacca ( ১৮৪০ ) ১৩০-৩৫ পৃষ্ঠা।

\* ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে রজনশিল্পের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আলোচনা করার আশা রহিল।

§ প্রতিভা ১৩২০ সন বৈশাখ “রজনশালা স্থাপন”

\* এই প্রবন্ধ ঢাকা সাহিত্য পরিষদে পঠিত।

## সেরগঙ্গ বা শিরগঙ্গা পাখী \*

এই পাখীকে কেহ কেহ সেরগঙ্গ বা সেরগং বলে।  
কেহ বা শিরগঙ্গা বলে।

শিরগঙ্গা দেখিতে অতি সুন্দর। ইহাদের শরীরের বর্ণ হরিদ্রাজাত নীল। দূর হইতে বেশ চক্চকে দেখা যায়। ঠোট লাল। ঠোটের উভয় পার্শ্ব শক্ত এবং ঝারাল। এই পাখীর মাথার উপরের কতিপয় পালক গাঢ় হরিদ্রাজাত নীল। দূর হইতে ‘জাহ্নবীর ফেনলেখার’ মত দেখা যায়। জানি না কোনও ভাবুক কবি এই জন্তই ইহার নাম শিরগঙ্গা রাখিয়াছেন কি না? মাথার এই টোপটার শিরগঙ্গার সৌন্দর্য্য অনেক বৃদ্ধি করিয়াছে। চক্ষু দুটি উজ্জ্বল। তাহার চারি পার্শ্বে লাল একখানা সরু চামড়ার বেটন। এই ভ্রুগলে চক্ষুর সৌন্দর্য্যও বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই লাল ভ্রু চতুর্দিকে কাল পাখার বেটনী। ইহাদের পা দুইটি অপেক্ষাকৃত মোটা। কুম্ব রঙ্গের পা দুইটির মধ্যে ঈষৎ সবুজ বর্ণের আঙ্গুল। আঙ্গুলে চারিটি পক্ষ। নখ বক্র এবং ভীক্কাগ্র। লেজের পাখার মধ্যে মধ্যে কাল দাগ আছে। এই পালকগুলির উপরের দিকের রঙ বতটা গাঢ় নীচের দিকের রঙ তেমন নয়, অনেকটা ফিকে এবং খোঁতাভ। উড়িবার সময় ইহারা ক্রমে পাখার ঝাণ্টা দিতে দিতে একবার উপরের দিকে একবার নীচের দিকে কখন সরল, কখন বা বক্রগতিতে উড়িয়া যায়।

শিরগঙ্গা কখন কখন লোকালয়ের সান্নিধ্যে ভ্রমণ করিয়া থাকে।

ইহারা ফড়িং, তেলাপোকা, প্রভৃতি ও নানাবিধ কীট পতঙ্গ ভক্ষণ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। অনেক সময় উজ্জয়মান ফড়িং বা কীট, তীর বেগে ছুটিয়া গরিতে শিরগঙ্গা খুব তৎপরতা প্রদর্শন করে।

শিরগঙ্গের আর এক গুণাদী আছে। সে সব পাখীর বুলিতেই ডাকিতে পারে। গৃহপালিত শিরগঙ্গা কখনও কাকের মত ডাকিয়া অস্ত্রান্ত্র কাককে উৎকণ্ঠিত করে, কখন বা শালিকের মত শব্দ করে, কখন বা ময়েল কিছা ফিঙ্গার মত শব্দ দিয়া থাকে। ইহাদের শব্দানুকরণ ক্ষমতা এমন আশ্চর্য্য যে, যে জাতীয় পক্ষীর শব্দের অনুকরণে ইহারা যখন ডাকে, সেই জাতীয় পক্ষীই তাহাতে প্রভাবিত হয়। অপর জাতীয়ের স্বরবৈচিত্র্য বা স্বরের কম্পন কিছা কোনও ক্রীড়া লক্ষ্য করিয়া শিরগঙ্গা আপন বুলি ছাড়িতে কল্পন করে না। এত শক্তি থাকাতোও শিরগঙ্গাকে মানুষের বুলি বলিতে শোনা যায় নাই। বহু চেষ্টায়ও ইহাদের মুখে “রাধা কৃষ্ণ” বুলি বা ময়না, টিয়া, শালিক প্রভৃতির মত মানুষের মত কথা বলিতে শিখা দেওয়া যায় নাই।

শিরগঙ্গা নিবিড় জঙ্গলে উচ্চ গাছে বাসা নির্মাণ করে। গাছের কোটরে বা খোড়লে খড়, কুটা, শুক অথচ নরম পাতা ইত্যাদি বিছাইয়া বাসা নির্মাণ করিয়া থাকে। মাঘ মাসেই ইহাদের গর্ভ ধারণের সময়। তিন মাস কাল গর্ভ ধারণের পর বৈশাখ বা কখন কখন জ্যৈষ্ঠ মাসে শিরগঙ্গা আপন বাসার ডিম্ব প্রসব করে। ইহারা তিন চারিটির অধিক ডিম্ব প্রসব করে না। ইহাদের ডিম্ব শালিকের ডিম্বের মতই বড়। পনের হইতে পঁচিশ দিন তা দিবার পর ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হয়। কখন কখন পক্ষিণী ফাঙ্কন মাসেও ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। এই সকল ডিম্ব হইতে বৈশাখ মাসেই ছানা হয়। সাধারণতঃ বৈশাখের শেষ ভাগ হইতে আষাঢ় মাস পর্যন্ত শিরগঙ্গের ছানা দৃষ্ট হয়। ছানাগুলি দীর্ঘকাল পর্যন্ত কোটরে থাকিয়াই বা বাপের সংগৃহীত আহাৰ্য্য ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে।\*

ত্রিগুণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

## ভাটিয়াল গান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২২

দাদা, জিজ্ঞাসিয়ে দেখ চাই

কার রমণী কাল জলে যায়।

ধীরে ধীরে যায় গো রাধে হীরার কলসী কাখে,

মাঝা চিকন হেইলে ডুইলে যায়।

আগে পাছে পকড়াসী, মধ্যে রাধা রাই রূপসী,

চন্দ্রবদন কেমন দেখা যায়।

মাঝা—কটি।

দেখ চাই—দেখ দেখি।

২৩

ভক্ত যেমন ভগবানের লজ পাগল, ভগবানও ভেমনই  
ভক্তের লজ উতলা; তাই কৃষ্ণ সুবলস্বাকে বলিতে—  
ছেন :—

ও সুবল রে গুণের তাই রে সুবল,

আমার লীজ এনে দেখা রে সুবল

ব্রজেশ্বরী রাধা।

হস্ত দিয়ে দেখ রে সুবল আমার হৃদয়ে,

বিনা কাঠে জলছে আনল আমার অন্তরে।

আনল—অনল।

২৪

কৃষ্ণ রাধার উল্লেখে বলিতেছেন :—

ওগো উন্মাদিনী রাই,

প্রেমভোরে বাধব তোরে, কাইল সকালে যদি লাগুর পাই

কি ক্ষেপে জল ভরতে গো আইলা এত সকালে,  
রূপ দেখিরে ডুইলে গো রইলাম, দিলে না যানে।  
সজনী তোর হাতে গো ধরি শোন বলি তোরে,  
এনে দেও মোর প্রাণের গো প্রিয়া মরণের কালে।  
দিলে—অন্তরে

২৫

সুবল বল বল, চল বাই—কেমন আছে,  
কমলিনী রাই।

ভরে তার কারণে বৃন্দাবনে সুবল,  
রাই বইলে বাঁশী বাজাই।

গেলাম রাইয়ের মান সাধিতে

ধরলাম রাইয়ের চরণেতে,

তবু রাইয়ের মান ভাঙ্গিল না ;

আমার দিল আশা, দিল দাগা রে—

সুবল আমার আর পিরীতের কার্য্য নাই।

শ্রীশঙ্কর চরণ ভরসা—

হৃদিরামের মনের আশা—

চল আমরা ব্রজধামে বাই।

একবার এনে দেখাও তারে রে সুবল

আম জন্মের মত দেইখে বাই।

প্রকৃত প্রেমিক-ভক্তের সঙ্গে তাহার প্রাণারামের  
এই রূপই মান অভিমান সাধাসাধি—পারে ধরাধরি এবং  
কাণক ছাড়াছাড়ি হয় বটে। কিন্তু সেই মনচোয়ের  
বাঁশী ত নীরব থাকিতে পারে না,—সে সংসার-বৃন্দা-  
বনের কুঞ্জে কুঞ্জে “রাই ব’লে” বাজিতে থাকে, অনন্তর  
এমনই আকর্ষণ

হৃদিরাম—এই গানটির রচয়িতা।

২৬

অরুণের রূপ প্রাণে অহুতব করিয়া মন পাগল  
হইয়া উঠিয়াছে—সংসারের আলা ত আর সহ্য হয় না—

উপায় কি? তাই রাধা বলিতেছেনঃ—

রূপসাগরে ডুবল নরন উপায় কি বল না।

যরের আলা কাল ননদী দেয় সদা বাতনা।

কাঁচাসোনা নীলবরণ, রমণীর মন করে হরণ,

মন চলে না গৃহে যেতে—উপায় কি বল না।

কালিন্দী যমুনায় ঘাটে, রূপসী সব দেখলাম তাতে,

কাঁথের নলসী ভূমে থুইয়ে, মন চলে না গৃহে যেইতে

উপায় কি বল না।

কাঁচাসোনা নীলবরণ—এখানে বোধ হয় “কাঁচাসো-  
নার” চলচল ভাবটার সঙ্গে উপমা দেওয়াই কবির উদ্দেশ্য।

২৭

রাধা সখীদিগকে ক্লেশদর্শনে আহ্বান করিতেছেন!  
সে মনোমোহনরূপ একা দেখিয়া যে আশ মেটে না—  
অন্তকে তাহার ভাগ না দিলে যে প্রাণের তৃপ্তি হয় না  
তাই রাধার এ আহ্বানঃ—

তোরা কে কে যাবি জল ভরিতে চল গো অবলা,

কদমতলার নট গো বর ডাক্ছে চিকন কালা গো।

শ্রামের গলে মোহনমালা, হাতে মোহনবাঁশী গো।

আমি মনে করি ভুলি ভুলি, ভুলিতে না পারি গো,

আমার গৃহে বাইতে মন চলে না আমি যাব

কদমতলা গো।

ওগো পিরীত কইরে যে জন বরে, আগো সফল

জুনব তার গো।

আঁরি সহিতে না পারি আঁরি গো—শ্রাম পিরীতের

আলা গো।

“নট গো বর” এরূপ কোন একটি শব্দের মধ্যভাগে  
“গো” শব্দের প্রয়োগ ভাটিয়াল গানে প্রায়ই দেখা যায়।

২৮

রাধিকা ক্লেশভাবে বিভোরা—সে তাঁহাকে দেহ প্রাণ  
সব সমর্পণ করিয়াছে।

দেহ প্রাণ সঁপিলাম গো বার লাগি ও বঁধুরে।

পদর উপর পদ থুইয়া, কদম্ব হেলান দিয়া,

বাক্সাও বাঁশী রাখার নামটি লইয়াবো।

কাড়িয়া মাথারই চুল, খোপায় দিতাব চম্পা কুল,

খোপার উপর ত্রবরা গুজরে।

গোকুলের বত নারী সবই তোমার আজ্ঞাকারী,

বঁধু তোমার লাগি আমার চিত্ত বাঁধারে।

২৯

রাধা কহিতেছেন—“সখি, এতদিন বেশ ছিলাম,  
কিন্তু যে অবধি সেই মনটোরকে দেখেছি সে অবধি  
আমার প্রাণে একি ভয়কর আলায় উত্তব হইয়াছে?”—

নিদাঘাতে দাগ লাগাইল প্রাণ বঁধু কালিয়া

আরে প্রেমজ্বালায় প্রাণ যায়।

বল সজনী প্রাণ সজনী বংশীর ধনি শুনা যায়,

ওগো কদম্বের ডালে বংশী বাজার শ্রাবসায়।

হাইটা যাইতে পাড়ার লোকে বত মন ব'লে যায়

( ও প্রাণ সই প্রাণ সই গো )

ওগো শোকের মন পুণ-চন্দন—

অলঙ্কার পরেছি গায়।

৩০

প্রাণবঁধু কালিয়া—

ও বঁধুরে আমি অতি রাঙ্গা রে পতি—

কদম্বের কুল,

তুমি নি রাখিবা বঁধু রাখার দ্বাতি কুল।

ও বঁধু রে আকাশেতে ওঠে রে তার।

আতে যায় ঘেরিয়া ;

বাইবার কালে নিঠুর বঁধু না চাহিলা ফিরিয়া

( স্মরন বঁধু )

আমি ত “কদম ফুলেরই” মত অমল পুষ্পের  
পরিমলপূতা। তবে হে আমার প্রাণেশ্বর আমার জাতি  
ফুলের দিকে না চাহিয়া তুমি চলিয়া বাইবে ইহা কি  
সম্ভব? কিন্তু হার তাহাই যে হইল। বধু আকাশের  
তারারই মত তুমি আমার নিকট উদ্ভিত হইয়াছিলে,  
আবার সে যেমন মেঘের কোলে অন্তর্হিত হয় তুমিও  
তেমনি চলিয়া গেলে! তোমাকে “সুন্দর” বলিয়াই  
জানিতাম, কিন্তু এমনি “নিষ্ঠুর” তুমি, যে “বাইবার  
কালে” একবার কিরিয়াও চাহিলে না।

৩১

এখন আমার কি অবস্থা একবার এসে দেখ :-  
সময় ছাড়িয়া রইলা রে শ্রাম গুণমণি,  
আমি পাড়ার পাড়ার ঘুরা ফিরি—হইয়াছি  
পাগলিনী রে।

পুরুষ ভ্রমর জাতি, আগে ত না জানি,  
প্রেম কইরে ছেইড়ে গেল কইরে কলঙ্কিনী রে।  
সোহাগে সোহাগে প্রেম শিখাইয়াছি আমি,  
এত কষ্ট দিবা বইলে আগে ত না জানি রে।

৩২

কৃষ্ণ-বিরহে হতাশ হইয়া এখন রাধা বলিতেছেন :-  
ওগো কালার পিরীতে কুলমান হারাইলাম সই,  
আর বাব কই।  
না জাইনে কঠিনের সনে কেন প্রাণ সঁপিলাম,  
আর বাব কই।  
বার ভাঙে পাগলী হইলেব সেবা কই আর আমি কই,  
পান খাইয়া চুনে বইলেব—মনে ছিল কাঁচা হই।

৩৩

এবার রাধাকৃষ্ণের প্রেমের গান ছাড়িয়া একবার  
পন্নীগ্রামের গৃহস্থালীর একটি অপ্রীতিকর চিত্র গানে  
কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই দেখাইব। এই গানটি  
খণ্ডরগৃহে নন্দা প্রণীড়িত হতভাগিনী বধুর উক্তি। কত  
গৃহে এইরূপ “বধুর মধুর খনি মুখ-শতদল” উৎপীড়নের  
অপ্রশ্রবাহে ভাসিয়া বাইতেছে কে তাহার খবর লয়?  
গানটি এই :-

আমি নন্দের আলায় বাঁচি না,  
কাল যমে আমার নিল না!  
দেইখে বাও গো বইন সকলে,  
এত বিটুকাল কার বাড়ীতে  
নিভাই বিটুকাল ভাল লাগে না!

ওগো নন্দে ভাল কইতে নন্দ বোঝে গো!  
বাপ তাইয়ে দিছেন বিয়া,  
সুখের কামাই খাব গিয়া,  
সুখ হবে তার ছুখই গেল না!  
নন্দ = নন্দ।  
বইন = ভগিনী।  
বিটুকাল = অতীত = অতৃপ্তি-জনিত নিন্দা।  
কামাই = রোজগার।

৩৪

সংসারের জীব প্রকৃতির একটানা স্রোতে পা চালিয়া  
দিয়া অসাড়বৎ চলিতে থাকে। নিরলিখিত গানটিতে  
কাহারও মুখাপেকী না হইয়া সর্বাঙ্গে পুরুষকার অবলম্বন  
পূর্বক আত্মপ্রকৃতিতে নির্ভর করিয়া সংসার-সাগরের  
উজান দিকে নৌকা ওঁপাইতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

আগের নাইয়া বড় ভাল,  
ভাটা ছাইড়া উজান ধর—পড়বি না ঘোলায়।  
আরে প্রেমবদীর কূলে বইসে, তুমি শরীল জুড়াও  
প্রেম বাতানে,

আরে ভাটাও গেল, জোয়ারও গেল, কোন সন্ধানে  
বাইবা রে তুমি।

গুরুগোসাই কোনরকমে আমার বেঁধেছে বরখানি—  
বন্দে বন্দে যোরা,  
মহাজনের মাল ভরিয়ে প্রেম নদীতে বইসে আছ রে  
তুমি।

খোলায়—যুগ্মজলে।

একদা বর্ষার সময় কর্ণোপলক্ষে বঙ্গবীর বেদার-  
জননীর সমাধি-মঠ-সংলগ্ন পদ্মাতীরে নৌকার গুইয়া  
ছিলাম। গভীর নিশীথে ভগ্ননিজ হইয়া শুনিতে পাই-  
লাম নাবিককণ্ঠে সারিন্দাসহযোগে গীত হইতেছে :—

ওরে দয়াল তোমায় ডাইকা সানাল (জ্বর)  
না পাই কুল রে ;

ওরে দয়াল আমার কাণ্ডারী হইও রে।

ওরে তোমার নামের গুণে রে দয়াল,—

দয়াল আমার কাণ্ডারী হইও রে।

তোমার বালক রে দয়াল,  
ডাইকা সানাল না পায় কুল রে ;  
তোমার নামের গুণে রে দয়াল  
কিরিয়া ত লইও রে।

তোমার আসন, তোমার বসন রে দয়াল,  
সানাল কিরিয়া ত লইও রে।

ওরে দয়াল আমার কাণ্ডারী হইও রে।

আগে যদি জানতাম রে ভাই, মাঝির এতই চোট,  
ওরে তবে কি রে দিতাম বা'গা তেমান্নার উপর—

আরে মাঝি বাইয়া যাও রে,  
মাঝি বাইয়া যাও রে—এলাহ দরিয়ার মাঝে  
আমার ভাঙ্গা নাও  
আরে মাঝি বাইয়া যাও রে।

মুচ্চিঙে গানটি শুনিলাম। গানের সুরে প্রাণ  
আকুল হইয়া উঠিল—মানসনেজে দেখিলাম ভয়ঙ্করী  
পদ্মা যেন উধলিয়া উঠিয়াছে—দেখিলাম

“বিদ্যাৎ চমকে জাশি,” হাং করে ফেন রাশি,  
ভীকু খেত কুজহাসি লড়প্রকৃতির।”

আর সেই ভয়লগরলভরা উন্মাদিনী—

“রোষে, জাশে উর্জ্বাসে, অটরোলে, অটহাসে  
উন্মাদ গর্জনে,  
ফাটিয়া ফুটিয়া উঠে, চূর্ণ হয়ে যার টুটে,  
খুঁজিয়া মরিছে ছুটে আপনার কুল।”

সেই ভীষণ তরঙ্গমালার উপরে এক অসহায় ভয়ঙ্গী  
“কলার খোলার”, মত আন্দোলিত হইতেছে। কর্ণধার  
হতাশ হইয়া অসময়ের কাণ্ডারীকে প্রাণের অগ্নিশ্রু হইতে  
আহ্বান করিয়া বলিতেছে “দয়াল আমার কাণ্ডারী  
হইও রে।” সেত “বালক” মাত্র, তাহার কি ক্ষমতা  
যে এ ভয়ঙ্করী পদ্মার গ্রাস হইতে নৌকা রক্ষা করে ?  
হে “দয়াল, তোমার নামের গুণে” তুমি “কাণ্ডারী হও”।  
তাহার বাহা কিছু সবই “দয়াল, তোমার”, তুমি এ সব  
“কিরিয়া ত লইও রে।” হায় আগে যদি সে জানিত যে  
“মাঝির এতই চোট” তবে কি সে “তেমান্নার উপর”—  
তিন তাল্য দালানের সমান উঁচু চেউয়ের উপর নৌকা,  
ধরিত ? কিন্তু এখন আসিয়া পড়িয়াছে, আর উপায় নাই।  
তাই সে ভগবানকে ডাকিয়া নিজের মনকে বলিতেছে  
“মাঝি, বাইয়া যাও রে।” এই “এলাহ—প্রকাণ্ড—  
পার কুলহীন—“দরিয়ার মাঝে” তাহার এই “ভাঙ্গা নাও”  
ইহা কি রক্ষা পাইবে ? সে “দয়াল” কে “কাণ্ডারী”  
হইবার জন্ত ডাকিয়াছে। তিনি অবশ্য শুনিবেন—অবশ্য  
এ তরী কুলে ভিরাইয়া দিবেন—তাই সে পুনরায় তাহার  
মনকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছে “আরে মাঝি, বাইয়া  
যাও রে।”

কিন্তু এ উদাস করা গানে শেষটা যে সেই ভব-সমুদ্রের  
কথাই মনে পড়ে। আকুল কণ্ঠে ডাকিতে ইচ্ছা হয়  
“দয়াল আমার কাণ্ডারী হইও রে।” এই “এলাহ দরিয়ার  
মাঝে আমার ভাঙ্গা নাও” লইয়া ইহার ভীষণ তরঙ্গাতি-  
বাহতে হাবু ডুবু খাইতে খাইতে সেই “দয়ালের” উপর



বৈশাখ ১৩২১

পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়া বন্ধুকে বলিতে পারা যাইবে কি  
“আরে মাঝি, বাইরা য়ওয়ে ?” \*

শ্রীবোমেন্দ্রাকিশোর রক্ষিত

## ভারতে মূর্তিপূজার আদ্যুগ

( উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের পাবনা  
অধিবেশনে পঠিত ) ।

ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, পদার্থগঠিত, বাবতীয় স্থূল অবয়ব যেরূপ ক্রমশঃ পরিণতির দিকে ছুটিয়াছে মানসগ্রাহ্য ভাব-পুরুষপরাও তেমনি বিন্দুরূপে প্রথম দর্শন দিয়া বিরাট হইতে বিরাটতর রূপে পরিণত হইতে চলিয়াছে। পরিণতি কোথায় এবং উৎপত্তি কোথা হইতে তাহা চিরদিন রহস্যের অন্ধকারে নিমগ্ন রহিয়াছে, থাকিবেও,—কিন্তু প্রথম দর্শন কবে দিল তাহা চেষ্টা করিলে বাহির করা যাইতে পারে, সন তারিখ ঠিক না মিলিলেও

\* আমি বহুদিন হইতে “ভাটিয়াল গান” সংগ্রহ করিতেছি ; কিন্তু অধিকাংশ সময় আমাকে সহরে থাকিতে হয় বলিয়া আমার সংগ্রহকার্য আশাহীনরূপে অগ্রসর হইতেছে না। অতএব আমার সনির্লভ অল্প-বোধ “প্রতিভার” পাঠকবর্গ যে যাহা পারেন দেশের এই লুপ্তপ্রায় গানগুলি অল্পগ্রহ পূর্বক সংগ্রহ করিয়া যেন “প্রতিভা” সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দেন। প্রতি প্রবন্ধেই সংগ্রহকারীর নাম উল্লেখ করিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হইবে।

বর্তমান প্রবন্ধের কতকগুলি গানসংগ্রহে আমার বন্ধু বিক্রমপুর হাসানানিগামী শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র সেন, বি, এ মহাশয়ের বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। কয়েকটি গান জালমোহন দে নামক জটনক মাঝির নিকট হইতে লিখিয়া লইয়াছি।—প্রবন্ধ লেখক।

মোটামোটি সময়টা নির্ধারণ বোধ হয় অসম্ভব নাও হইতে পারে।

পরিদৃষ্টমান ভগবতের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, সমাদি জীব-প্রবাহ এক অনন্ত শক্তিময় সত্তা কর্তৃক পরিচালিত ও পরিচালিত, সর্বত্র ঋষিদিগের ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ইব ভব দিবি তিষ্ঠত্যেক পুরুষঃ—“ময়ি সর্মমিদং প্রোক্তং স্ত্রে মনিগণা ইব” ইত্যাদি ইত্যাদি একই মহাতাবের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। সেই মহাতাব এই যে, এক মহাসত্তা ভগৎ ব্যাপিয়া তিষ্ঠিতেছে—তিনি আছেন—বাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ সেই সত্তা হইতে উদ্ভূত ও তাহার অঙ্গুগত।

এই বিষয়ে অল্প কোন কথা বলিবার পূর্বে একটি কথা বলিয়া রাখিতে চাই যে আমি আলোচনার জন্য যে বিষয়টি লইয়াছি তাহার পক্ষপাতহীন পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিব ; তাহাতে ক্ষমত এমন অনেক প্রস্তাবের অবতারণা করিতে হইবে যাহা আমার নিজের শিক্ষা দীক্ষা ও সংস্কারের বিরোধী এবং যাহা ভক্তের নিকট গুণে মোটেই অতি-মধুর হইবে না। তাহার জন্য পূর্নাঙ্কেই তাহাদের ক্ষমা ও ধৈর্য্য ভিক্ষা করিয়া রাখিতেছি।

এই যে অস্তি-ভাবটি ইহা যুগে যুগে মানুষকে শান্তি দিয়া আসিয়াছে, অথবা যুগে যুগে এই ভাবটিকে দৃঢ়ভাবে আকড়িয়া ধরিয়া মানুষ মনে করিয়া আসিতেছে যে সে শান্তি পাইতেছে। কিন্তু তবুও ইহা একটি ভাবমাত্র ; ইহারও উৎপত্তি, প্রকাশ, বিকাশ ও পরিণতি আছে। সমস্ত ভাবের মত এই ভাবেরও উৎপত্তি কি করিয়া হইল তাহা ঠিক করা যায় না, এবং এই ভাবের বর্তমান অবস্থাকেই পরিণতি বলিয়া স্বীকার করা সমীচীন নহে। এই ভাবটির প্রকাশ ও বিকাশের ইতিহাসই ভগবতের ধর্মের ইতিহাস।

মানব-সমাজে এই ভাবটি যখন প্রথম প্রকাশ পাইয়াছিল তখন ইহার বর্তমান আকৃতি ছিল না। নদীর যেমন যে কোনস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া উদান বাইরা

অবশেষে আমরা নদীর উৎপত্তিহানের করণ। করটির নিকট উপস্থিত হইতে পারি, তেমনি ধর্মেরও বর্তমান প্রবাহ হইতে উৎপত্তি হইতে দূর অতীতের এমন এক সময়ে বাইরা উপস্থিত হইতে পারিব যে সময়ের কথা ইতিহাস ভুলিয়া গিয়াছে। সে কোন সময়?

ধর্মভাব বাহুর মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে : বাহুর আবার ককেসিয়, মোঙ্গোল, সেমিটিক ইত্যাদি নানা জাতিতে বিভক্ত।

ধর্মের ইতিহাসই বাহার আলোচ্য ধর্মের সভ্যসভ্য তাহার বিচার্য না হইলেও চলে। ধর্মের ককেসিয় ধারার আদি প্রকাশ আর্যাদের আদিম সাহিত্য-চেষ্টা ঋগ্বেদের মধ্যে। ঋগ্বেদের প্রাচীনতম সূক্তগুলিতে ধর্মের যে মূর্তি দেখিতে পাই তাহা কি আর্যাদেরই নিজের সম্পত্তি না অথবা কোন অপর জাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত ন্যাস তাহা তাহা জানা যায় না। আর্যাদের নিজের সম্পত্তি হইলেও হইতে পারে কারণ ঋগ্বেদের প্রাচীনতম সূক্তগুলিতে ধর্মের যে মূর্তি আমরা দেখিতে পাই উহাই ধর্ম-ভাবের সনাতন আদিম মূর্তি। আর্যা তর জাতির মধ্যেও যখন ধর্মভাব প্রথম দেখা গিয়াছে তখন এই মূর্তি লইয়াই দেখা গিয়াছে।

এই মূর্তিটি কি? এই মূর্তিটি—জলে, স্থলে অন্তরীক্ষে, অগ্নিতে, বায়ুতে বাহ্য। কিছুই নহে দৈনিক জীবন-বাহ্যার মানবের পরিচয় হয়, তাহাতেই একটি দেহাতিরিক্ত হস্ত চিন্তার সত্তার কল্পনা এবং তাহাতে মানবের শক্তির অতীত শক্তির অর্থাৎ দেবত্বের আরোপ। ঋগ্বেদে এইরূপ দেবতার অভাব নাই। অগ্নিদেবতা, বায়ুদেবতা, ইন্দ্রদেবতা, সূর্য্যদেবতা, বিষ্ণুদেবতা ইত্যাদি। ধর্মের এই পর্য্যন্ত প্রকাশ সমস্ত আদিম ধর্মেই এক। কিন্তু যে দিন আর্যাঋগ্বেদ আন-নেত্রে সহসা এই সত্য দেখিতে পাইলেন যে অগ্নি বায়ু বরুণ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন দেবসত্তা নহে, এক মহাদেবতারই বিভিন্ন প্রকাশমাত্র, জগতের ধর্মের

ইতিহাসে তাহা এক অরণীয় দিন। সেই দিন হইতে আর্যাধর্মের স্রোত এক সম্পূর্ণ নূতন পথে প্রবাহিত হইল, ককেসিয় জাতির ভারতীয় শাখার সাধনা বিধের মধ্যে স্রোতস্রাব লাভ করিল। অত্যাগত জাতি এমন কি ককেসিয় জাতির অত্যাগত শাখাও যখন অগ্নিকে, বায়ুকে, জলকেই চরম জানিয়া প্রথম তাহাদে। কল্পনামূর্তি ও পরে তাহাদের বাস্তবমূর্তির সম্মুখে প্রণত হইতেছিল, উপনিষদযুগের আর্যাগণ তখন গভীর অরণ্যতলে ‘বৃক্ষইবন্তকৃদ্বিবি’ পরমজ্ঞানের মহিমায় বিভোর হইয়া গাইতেছিলেন—ইণাবাস্তমিহং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

উপনিষদ যখন নবলব্ধ মহাসত্যের আবেগে পুলক-কল্পিতকণ্ঠে সুখসুপ্ত ভারতবাসীকে ডাকিতেছিল “উত্তীর্ণত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণিবোধত,” তখন সেই মহাবাহী কি নিজাত্মের সকলের কর্ণেই প্রবেশ করিয়াছিল? তাহা নহে। বায়ু, বরুণ, অগ্নিকে চরম বলিয়া জানে এমন লোকেরও অভাব ছিল না। তাহার। তাহাদের দেবতার রূপকল্পনা করিয়া লইয়া তাহার সম্মুখে প্রণত হইতেছিল। বেদে সেরূপ কল্পনা এতই স্পষ্ট যে তাহা বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত বাস্তবমূর্তিতে কেন যে পরিণত হয় নাই তাহা এক মহা আশ্চর্যের বিষয়। কারণ আশে পাশে মূর্তিপূজার ত অভাব ছিল না!—৫০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ হইতে মিশর আইসিস ও সাইরিসের মূর্তি গড়িয়া পূজা আরম্ভ করিয়াছিল, আসিরিয়া কেলডিয়া ও তাহার কিঞ্চৎ পরেই সামাস ইষ্টর, মিলিটার মন্দির গড়িয়া তুলিতেছিল। নালন্দা ও ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিসের বাতাস যে পূর্ব দিকে বাহত না একথা কিছুতেই বলা যায় না; কিন্তু কই, সেই বাতাস ত কিছু সরস্বতী গঙ্গার তরঙ্গ তুলিতে পারে নাই! উপনিষদ-বেদান্তের প্রভুত্বের ইহার চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

মূর্তি নির্মিত হয় নাই কিন্তু অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, বরুণের বাক্যবোধী অধরহঃ রক্তে প্রাণিত হইতেছিল। এমনি

সবর শাক্যসিংহের আবির্ভাব। শাক্যসিংহ বুদ্ধ লাভ করিয়া জীবন দয়া, কর্তব্যে তৃপ্তি আনন্দ এবং অধ্যাত্ম ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, ঈশ্বর আছেন কি নাই সেই বিচারকে ঘোটেই প্রাধান্য দিলেন না—উপনিষদ-বেদান্তের প্রভুত্বের মূল শিথিল হইয়া গেল। কল্পনাকে এককাল ধ্বংস করিয়া রাখা হইয়াছিল, এখন ভক্তি কল্পনাকে সহায় করিয়া জ্ঞানকে ঠেলিয়া ফেলিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল।

খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীর শেষভাগে গৌতম বুদ্ধ বিবে তাহার মহাবাহী প্রচার করিয়া তিরোহিত হন। খৃষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দীর শেষভাগে মহাবীর আলিক সম্রাট প্রবল প্রভাবের মত আসিয়া পশ্চিম ভারতের উপর পতিত হন। এই দুই শত বৎসরে বুদ্ধের বাণী ভারতের জনসাধারণের উপর কি কাজ করিয়াছে তাহা অবগত হইতে হইলে আলিকসম্রাটের ভারত-বিজয় কাহিনী সাবধানে পর্যালোচনা করা আবশ্যিক।

ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন যে বিপাশা নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া আলিকসম্রাটের সৈন্যসমূহ আর অগ্রসর হইতে অস্বীকৃত হইল। তাহার কয়েক (Koinos) নামক অধ্যক্ষকে অগ্রবর্তী করিয়া আলিকসম্রাটকে জানাইল যে যদিও তাহার পার্শ্ববর্তী শত্রুকে ভয় করে না, তবু দৈববিপৎপাতের আশঙ্কায় তাহার আর অগ্রসর হইতে পরাঙ্মুখ। আলিকসম্রাট অনিচ্ছার সহিত তাহাদের মতে মত দিতে বাধ্য হইলেন। তিনি কতদূর পর্যন্ত ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহার চিহ্ন রাখিবার জন্য বিপাশার অপর তীরে স্বাধীন বৌদ্ধ নিশ্চিত করাইলেন এবং তাহা স্বাধীনজন শ্রেষ্ঠ দেবতার নামে উৎসর্গ করিলেন। আলিকসম্রাট ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া গেলে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য দিগ্বিজয়ে আসিয়া এই বৌদ্ধ পূজা অর্চনা করিতেন, গ্রীক ঐতিহাসিকগণ একপঙ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই বিবরণ হইতে দেখা যাইবে যে তখনও দেবতার উদ্দেশে পূজা অর্চনা ইত্যাদি স্থানী বা বৌদ্ধিতে নিমগ্ন হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ

কবির প্রতিজ্ঞা-যোগদ্ধারণ মাটিকেও বাসবদত্তার যক্ষ্মণীপীঠে পূজা দিতে যাইবার কথাই আমরা অবগত হইতে পারি।

খৃষ্ট পূর্ব ৪র্থ ও ৩য় ও ২য় শতাব্দীতে ভারতের ধর্মের অবস্থা এই—বৈদিক যোগদ্ধারণের প্রভাব কমে নাই, দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ উপনিষদের ঈশ্বরতত্ত্বও আলোচনা করিতেছেন, এ দিকে দেবদেবীর উদ্দেশে নীচে বা বৌদ্ধিতে পূজাও আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের সর্বপ্রাচীন ভাস্কর্য্য নিদর্শন বরহাট স্তূপে এই ব্যাপারের মনোরম নিদর্শন রহিয়াছে।

মৌর্যবংশের পতনের পর খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বর্গদেবের অধিকার কালে বরহাটস্তুপ নির্মিত হয়। স্তুপ বলিতে আমরা সচরাচর বৌদ্ধস্তুপ বলিয়াই বুঝি এবং এই স্তুপটিও যে বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে অবতারের কোনদিনও অভাব হয় নাই। যুগে যুগে অবতার বা আদর্শ চরিত্রের মানবগণ অভিযুক্ত হইয়া জলদগড়ীরস্বরে আদেশ করিয়াছেন—“মানবগণ এই পথে চল তোমাদের জীবন সার্থক হইবে”। তাহাদের ভৈরববাণী সমাজের মধ্যে একটা সাময়িক আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে কিন্তু আমাদের দেশের জলবায়ুর কি গুণ, দুই তিনশত বৎসর যাইতে না যাইতেই লোকসকল বলিয়াছে, আমরা বুদ্ধি গড়িয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তোমার পূজা আরম্ভ করিয়া দেই, তুমি দুই হাতে আমাদের বুদ্ধি বিতরণ করিতে থাক”। আমাদের দেশে বহুগুলি ধর্ম উদ্ভূত হইয়া পুনরায় পতিত হইয়াছে সকলগুলিরই পতনের পূর্বকালে এই লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে বরহাটস্তুপ নির্মিত হয়, বুদ্ধ তাহার তিন শত বৎসরের পূর্বে নির্মাণ লাভ করিয়াছেন। এরি মধ্যে কিন্তু বুদ্ধের পূজা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

বরহাট স্তূপে দেখা যায়—বুদ্ধের মূর্তি এখনও গঠিত হয় নাই, কিন্তু বুদ্ধের আসন, বুদ্ধের পদচিহ্ন, বুদ্ধের দেহের ভাস্বাশেষের উপর নির্মিত স্তূপ, যে বুদ্ধতলে বসিয়া তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন সেই বটরক্ষ. এই সমস্তই দেবতার মত পূজা পাইতেছে। মানুষ ও অতিমানুষ ভক্তগণ বুদ্ধের মূর্তির পরিবর্তে এই সমস্ত আসন পদচিহ্ন ইত্যাদির চতুর্দিকে সমবেত হইয়া অবনত শিরে পূজা প্রদান করিতেছে। বৌদ্ধধর্মের প্রধান মর্ম্মই এই যে কঠোর আত্মচেষ্টায় মুক্তি বা নির্বাণ লাভ করিতে হইবে। অশোক তাহার ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের এই মূল সূত্রটি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাই তিনি পাহাড়ের গায়ে লিখিয়া গিয়াছেন—“ছোট বড় যেই হও আত্মোন্নতির চেষ্টা কর।” ধর্ম্মপদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উচ্চতম সূত্র ঘোষণা করিয়া গিয়াছে। গম্ভীর স্বরে মানবসাধারণকে ডাকিয়া বলিয়াছে—“মানবগণ ভীত হইও না, আমরাই পাণের পিচ্ছিল পথে পদস্থলিত হই, আমরাই দুঃখের নিষ্ঠুরচক্রে নিম্পিষ্ট হই। আমরাই আবার পাপপথ পরিত্যাগ করিয়া দৃঢ় হইয়া দাঁড়াই, আমাদেরই চতুর্দিকে আবার পবিত্রতার দিব্য জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠে। আমরা নিজেই নিজের বিনাশকর্তা ও রক্ষাকর্তা, আর কাহারও বিনাশ করিবার বা রক্ষা করিবার ক্ষমতা নাই। পথ আমাদেরই চলিতে হইবে বুদ্ধগণ কেবল আগে আগে পথ দেখাইয়া লইয়া যান।” ব্যক্তিকে এমন প্রাধাত্য বোধ হয় আর কোন ধর্ম্ম দেয় নাই, কিন্তু এই নিঃসহায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য লইয়া কয়টি লোক সমাজের পথে চলিতে পারে? তাহার চায় সম্ভায় মুক্তি, তাহার চায় বুদ্ধের পথ দেখান নহে, বুদ্ধের হাতে ধরিয়া ষাড়ে করিয়া ভবসাগরের পারে লইয়া যাওয়া। তাই আমরা বুদ্ধের নির্বাণের তিনশত বৎসর পরেই দেখিতে

পাই যে আত্মোন্নতির কঠোর চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া বরহাট স্তূপের নির্মাতাগণ বুদ্ধের শূন্য আসনের পূজা আরম্ভ করিয়াছে,—শূন্য আসনে কি করিয়া অচিরেই মূর্তির আবর্তিত হইল তাহা পরে দেখাইতেছি।

শিল্পীগণ বুদ্ধের আসনের পূজা দেখাইয়াই কান্স হইয়াছে, কিন্তু পিতৃপিতামহগণ যে দুই একটি দেবদেবীর মূর্তি গড়িয়া পূজা ইতিপূর্বেই আরম্ভ করিয়াছিল তাহা-দিগকে তাহারা ভুলিয়া যায় নাই। এখানে সেখানে’ এ কোণে সে কোণে সিংহবারের শীর্ষে সেই সকল দেবদেবীর মূর্তি খোদিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। বেদের দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র ও ব্রহ্মার মূর্তি দুই এক স্থানে দেখা যায়। কিন্তু তাহাদের দিন কুরাইয়া আসিয়াছিল, উদীয়মান পৌরাণিক ধর্ম্ম তাহাদের প্রভাব কমিতেছিল, অন্তিম অবস্থায় বরহাট স্তূপে মূর্তি ধরিয়া আসিয়াও তাহারা আসর জমাইতে পারিলেন না।

প্রসঙ্গান্তোস্তাসিতাননা বিকশিতকমলকরা করি-করোথিত কুণ্ডলের জলে অভিষিচ্যমান। একটি দেবী মাত্র বরহাট স্তূপে সম্মানের আসন পাইয়াছেন,—তিনি বিধের সৌন্দর্য্যলক্ষী শ্রীদেবী। বরহাট স্তূপে এবং পরবর্তী অগ্রাশ্র ভাস্কর্য্য নিদর্শনও শ্রীদেবীকে সিংহদরজার উপরে যেরূপ প্রকাশ ও সম্মানের স্থান দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে সহজেই মনে হয় যে এই সুষমাময়ী দেবী বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারের পূর্বে এবং পরেও অনেক দিন পর্য্যন্ত ভারত-বর্ষের জাতীয় দেবী ছিলেন। শ্রীর মূর্তি বরহাট, সাঁচি ভিলসা, অমরাবতী ইত্যাদি সমস্ত প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপে খোদিত আছে। খৃষ্টাব্দের তৃতীয় শতাব্দীর শেষে শ্রী উদীয়মান গুপ্তরাজাদের কুলদেবীরূপে পূজা প্রাপ্ত হন, ক্রমে রাজকীয় মুদ্রায় ও টাকায় শ্রীর মূর্তি ব্যবহৃত হইতে থাকে। করিমপুরের কোটালিগাড়া হইতে আবিষ্কৃত শেষ গুপ্তরাজাদের আমলের শাসনগুলিও শ্রীমূর্ত্য-যুক্ত। শ্রীর এমন প্রভাব ছিল যে বিদেশী রাজা আকিঅলস পর্য্যন্ত ভারতের একাংশ অধিকার করিয়া শ্রীর

\*কলিকাতার যাহ্নবরে বরহাট স্তূপের অনেক অংশ আনিয়া রাখা হইয়াছে, প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই এই প্রাচীন ভাস্কর্য্য নিদর্শন দেখিয়া আসা উচিত।—লেখক।

মূর্তি অঙ্কিত করিয়া মূর্ত্য প্রচারিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন (Cunningham's Stupa of Bharhut p. 117) এবং কৈনদের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরের জননী ত্রিশলা পর্যন্ত মহাবীরকে গর্ভে ধারণ করিবার পূর্বে পদ্মাসনোবিষ্টা করিকরধৃত কুন্তের জলে অভিষিচ্যমানা ত্রীকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। (Stevenson's Kalpa-sutra S. 44-45) ভারতের কি গৌরবের দিনট ছিল, যে দিন শুভতোয়া সরস্বতীর তীরে তীরে শারদপূর্ণিমার নির্মল জ্যোৎস্না প্রাণনে সৌন্দর্যালক্ষীর পূজা হইত।

শ্রীদেবী কিরূপে যে ভারতবর্ষের মর্মস্থানে আপনার আসন স্থাপন করিলেন তাহা ঠিক নিরূপণ করা কঠিন। ইহার মধ্যে অনেক রহস্য লুকাইয়া আছে বলিয়াই বোধ হয়। মহাভারতে বিষ্ণুপুরাণে এবং অজ্ঞাত গ্রন্থেও শ্রীর জন্মকাহিনী বিবৃত আছে। বিষ্ণুপুরাণে কাহিনীটি যে ভাবে লিখিত আছে তাহাতে নানা সন্দেহ মুখরিত হইয়া উঠিতেছে।

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশের অষ্টম অধ্যায়ে পরাশর মৈত্রেয়কে ব্রহ্মার কল্পসর্গ বলিতেছেন ; তাহাতে বলিয়াছেন যে ভৃগুর পত্নী খ্যাতি ধাতা বিধাতা নামে দুই দেব ও লক্ষ্মীকে প্রসব করেন যিনি দেবদেব নারায়ণের পত্নী। মৈত্রেয় এই কথা শুনিয়াই তাহাকে জেরা করিলেন। “মৈত্রেয় কহিলেন, লক্ষ্মী অমৃত মখন সময়ে ক্রিরাক্ষিতে উৎপন্ন। শুনিতে পাওয়া যায়, আপনি ভৃগু হইতে খ্যাতির গর্ভে উৎপন্ন। কিরূপে বলিতেছেন ?” এই প্রশ্নে কিছু বিব্রত হইয়া পরাশর ব্যাক্যজাল বিস্তার পূর্বক যে উত্তর দিলেন তাহার মর্ম এই যে বিষ্ণুচর্য্যচরের মধ্যে বিষ্ণুই পুরুষ এবং লক্ষ্মীই প্রকৃতি। মৈত্রেয় কি বনে করিয়াছিলেন জানি না, কিন্তু আমাদের ত মনে হইতেছে যে মৈত্রেয়ের প্রশ্নের যে উত্তর পরাশর দিয়াছেন তাহাতে সন্তুষ্ট হওয়া কঠিন। পরাশরও বোধ হয় বুঝিয়াছিলেন যে তাহার উত্তরটি ঠিক প্রাসঙ্গিক হয় নাই, তাই পরের অধ্যায়ে লক্ষ্মীর ক্রিরোদ মখন

জন্মকাহিনী মৈত্রেয়কে শুনাইয়া তাহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পরের অধ্যায়ে কাহিনীটির এইরূপ আরম্ভ হইয়াছে—পরশর কহিলেন, “হে মৈত্রেয়, তুমি এ স্থলে বাহা জিজ্ঞাসা করিলে এই শ্রী সম্বন্ধে ইতি হাস আমি মরিচীর নিকট শুনিয়াছি শ্রবণ কর।” কাহিনীটি সকলেই জানেন তবু এইখানে অতি সংক্ষেপে বলিতেছি।

দুর্ভাসা এক বিষ্ণুধরীর নিকট হস্তে একটি স্তম্ভানক পুষ্পের মালা চাহিয়া লইয়া ঐরাবতে চড়িয়া দেবরাজ বাইতেছেন দেখিয়া মালাটি তাহাকে দিয়াছিলেন। ইঙ্গ মালাটি লইয়া হাতীর মাথার উপরে রাখেন এবং নির্দোষ হাতী শুড় দিয়া টানিয়া সেই মালা মাটিতে ফেলিয়া দেয়। তাহা দেখিয়া দুর্ভাসা ইঙ্গকে শাপ দেন যে তুমি লক্ষ্মীছাড়া হও। দুর্ভাসার শাপে লক্ষ্মীছাড়া হইয়া দেবগণ হীনবীৰ্য্য হইয়া পড়িলেন এবং অনুরাগ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। নিরুপায় দেখিয়া দেবগণ ব্রহ্মার শরণ লইলেন। তিনি তাহাদিগকে ক্রিরোদ সিন্ধুর উত্তর-তীরে স্থিত বিষ্ণুর শরণ লইতে পরামর্শ দিলেন। বহু স্তব-জুতির পরে বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া ক্রিরোদসমুদ্র মখন পূর্বক অমৃত আহরণ করিয়া তাহার পান দ্বারা বল সংগ্রহ করিতে দেবতাদিগকে পরামর্শ দিলেন এবং এই কার্য্য সম্পাদনের জন্য অমৃতের লোভ দেখাইয়া অনুরাগণের সহিত সন্ধি করিতে পরামর্শ দিলেন। “দেবদেব এইরূপ বলিলে অনুরাগ অনুরাগণের সহিত সন্ধি করিয়া অমৃতের জন্য যত্ববান হইলেন।” অবশেষে দেবানুরের যত্নে ক্রিরোদ-সমুদ্র মথিত হইল এবং তাহা হইতে বধাক্রমে সুরভি (হবিধাম) উৎপন্ন হইল। তাহার পরে বাক্ষী দেবী উৎপন্ন হইলেন, তাহার পরে পারিজাত তরু, তাহার পরে অঙ্গরা, তাহার পরে অমৃত তাহার পরে বিকশিতকমলস্থিতা যতপদ্মকা লক্ষ্মীদেবী উৎপত্ত হইলেন। দিগ্গজগণ হেমকুণ্ডের জলে তাহাকে স্নান

করাইয়া দিলেন, মহর্ষিগণ আনন্দিত হইয়া শ্রীহুকে তাহার স্তব করিলেন, সর্বদেবতার সমক্ষে তিনি যাঁহা হরির বক্ষস্থল আশ্রয় করিলেন। জীর্ণপথারণ করিয়া বিষ্ণু দানবদিগকে প্রতারিত করিলেন—অমৃতপানদৃষ্ট দেবগণ দানবদিগকে আক্রমণ করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।”

কাহিনী শেষ করিয়া পরাশর মৈত্রেয়কে বুঝাইলেন যে ভৃগুর পত্নী খ্যাতিতে উৎপন্ন শ্রী দেবদানবের যত্নে অমৃত মধুনে পুনর্বার প্রসূতা হন।

এই কাহিনীটির মধ্যে গুরুতর ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে বলিয়া মনে হইতেছে। সকলেই জানেন আর্য্যগণের এক শাখা ভারতবর্ষে আসে, আর এক শাখা বর্তমান পারস্ত তুরস্কে চলিয়া যায়। অসুরউপাসকগণ ভারতবর্ষে আশ্রয় করে, এবং অসুরউপাসকগণ পারস্ত তুরস্কে আবাস স্থাপন করে। বেদে যেমন অসুরগণ নিন্দিত, তেমন জৈন আবেশ্বায় আবার অসুরগণ নির্দিত। আর্য্যজাতির এই দুই শাখার মধ্যে মোটেই সম্ভাব ছিল না, ভারতে যেমন প্রবল রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আসিরিয়া অর্থাৎ অসুর-উপাসকদিগের দেশেও সেরূপ প্রবল রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সেই দেশের অসুরবানীপাল অসুরনাজিরপাল প্রভৃতি রাজগণের নাম বিখ্যাত। পাশাপাশি স্থিত এই দুই রাজশক্তির মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ উপস্থিত হইত।

ক্ষিরোদসমুদ্র মধুনের কাহিনীতে দেখা যায় যে অসুররাজশক্তি যখন অত্যন্ত প্রবল তখন কোন বিপুল কার্য্য \* সম্পাদনের জন্য দুই রাজশক্তি সম্মিলিত হয়। ক্ষিরোদসমুদ্রের উত্তরভীরে এই কার্য্য সম্পাদিত হয়। বর্তমানে যাহাকে আমরা আরব সমুদ্র বলিয়া জানি

\* এই বিপুলকার্য্যটি একটা প্রকাণ্ড জলা বায়গার জল বহিকৃত করিয়া দিয়া বায়গাটিকে লক্ষ্মীর জন্মস্থান অর্থাৎ চাখের উপযুক্ত ভূমি করিয়া তোলা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই বিষয়ে প্রমাণপ্রয়োগ সহ ভবিষ্যতে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

তাহা হইলে পূর্বে ক্ষিরোদ সমুদ্র বলিয়া খ্যাত ছিল তাহা প্রমাণ করা কঠিন নহে। এমন কি পালরাজাদের সময়েও এই খ্যাতি লুপ্ত হয় নাই। ( দেবপালদেবের তাম্র-শাসন ১৫শ শ্লোক )। এই সমবায়ের ফলে আর্য্যগণ মাধন ( হবির্ধাম সুরভি ) মদ ( বারুণী ) গন্ধদ্রব্য ( পারিজাত ) অমৃত, অর্থাৎ অমৃতোপম ঔষধি সমূহ প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করেন। নাগগণ সে সর্প নহে, এক জাতীয় মানুষ তাহা অনেকেই অবগত আছেন। নাগগণ সুরাহুরের এই সম্মিলনে উপস্থিত ছিল এবং শারীরিক পরিশ্রমের কাজটা বোধ হয় তাহারা করিয়া ছিল। এই বিপুল কার্য্য উপলক্ষে লক্ষ্মীদেবীর অর্চনা হইয়াছিল, এই স্থান হইতেই ভারতীয় আর্য্যগণ লক্ষ্মীর পূজা শিখিয়া আসেন এবং পূর্বপরিচিত ভৃগুর জীর্ঘ্যাক্তি কর্তৃক প্রচারিত এবং বেদের শ্রীহুকে স্তব শ্রীর সহিত অভিন্ন করিয়া নুতন-দেবীকে গ্রহণ করেন।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে বরহাট স্তূপ এবং অত্যাশ্চর্য্য স্তূপে লক্ষ্মীর মূর্তি অঙ্কিত আছে। ক্ষিরোদ-মধুনে নাগগণের উপস্থিতির বিষয় অবগত হইলাম। তিব্বতের ঐতিহাসিক তারানাথের কথা হইতে আভাস পাইয়াছি যে ক্ষিরোদ মধুনে লক্ষ্মীপূজার প্রচার নাগগণই করিয়া ছিল। তারানাথ লিখিয়া গিয়াছেন যে ভারতের যক্ষগণ আদিশিল্পী, এবং তাহাদের পরেই নাগগণের স্থান। বরহাটস্তুপ নির্মিত করিতে নাগ ও যক্ষগণই নিযুক্ত হইয়াছিল তারানাথের কথা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা অত্যাশ্চর্য্য নহে। তাহাই যদি হয় তবে বরহাট স্তূপের লক্ষ্মীমূর্তি নাগগণেরই কীর্তি এবং ক্ষিরোদ-মধুনে তাহারা লক্ষ্মীপূজার প্রচার করিয়াছিল বলিয়া আভাস পাইতেছি।

বরহাটস্তুপের দ্বিতীয় শিল্পী যক্ষগণও স্তূপে তাহাদের দেবদেবীগণের মূর্তি আঁকিয়া যাইতে ক্রটি করে নাই। স্তূপের চারি দরজায় চারিভোড়া যক্ষদম্পতি অঙ্কিত হইয়াছে। প্রত্যেক যক্ষদম্পতির নীচে প্রাচীন

ব্রাহ্মীলিপিতে তাহাদের নাম লেখা আছে। কুবেরকে বক্ষরাজ বলা হইয়াছে। যাক্শীদিগের মধ্যে সুদর্শনা যাক্শীণীর মূর্তি সর্বাঙ্গপেক্ষা উত্তমরূপে অঙ্কিত বলিয়া হ্যাবেল সাহেব প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ( Indian Sculpture and Painting ).

যক্ষের পূজা যে এক সময়ে ভারতবর্ষে খুব বেশী প্রচলিত ছিল নানাস্থানে তাহার আভাস পাওয়া যায়। বৌদ্ধশাস্ত্রগুলির তীক্ষ্ণতীর সংস্করণে লিখিত আছে যে কুবের যক্ষ শাক্যদের কুলদেবতা ছিলেন ( Asiatic Researches Vol 20 p 300 )। সেই পুস্তকেই লিখিত আছে যে বৈশালীর অধিবাসীগণ যক্ষের এক মূর্তি নির্মাণ পূর্বক নগরের সিংহদরজায় স্থাপন করিয়া পূজা করিয়াছিল। ( Sciefnor's Tibetan Jales from Khahgayur Rapson's translation Page 81 ) ভাস কবির প্রতিজ্ঞাযোদ্ধারায়ণ নাটকে বাসবদত্তার যাক্শীণী পীঠে পূজা দিতে যাইবার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বরহাটস্থ প ছাড়াও যক্ষপূজার ভাস্কর্য্য নিদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে পাটনাতে দুইটা মনুষ্যপ্রমাণ যক্ষের মূর্তি মৃত্তিকা নিম্ন হইতে খুঁড়িয়া তোলা হইয়াছিল। পাটনার তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট টিটলার মূর্তি দুইটাকে কলিকাতা যাহুঘরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেই মূর্তি দুইটা এখনও তথায়ই আছে।

মূর্তিপূজার আদিযুগের আর একটি দেব ও দেবী মাত্র উল্লেখযোগ্য, একটি সূর্য্য ও অপরটা পৃথিবী। ভারতবর্ষের সূর্য্য পূজার ইতিহাস বিচিত্র রহস্তে পরিপূর্ণ। সবিভা অর্থাৎ সূর্য্য বেদের একজন প্রধান দেবতা। বেদমন্ত্রের শ্রেষ্ঠ গায়ত্রী মন্ত্র সূর্য্যেরই স্তব। কিন্তু গায়ত্রী মন্ত্রে সূর্য্যের বরগীর জ্যোতিঃকে ধ্যান করা হইয়াছে; তাহাতে সূর্য্যের মূর্তিকল্পনার লেশমাত্রও নাই। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ভাস্কর্য্য-নিদর্শনগুলিতে সূর্য্যের যে মূর্তি দেখা যায়, তাহা ভারতের নিজস্ব সম্পত্তি অথবা বিদেশের আমদানী নির্ণয় করা কঠিন। গ্রুণ্ডই-

ডেল ( Grunwedel ) প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত এই যে সূর্য্য মধ্য এশিয়া হইতে আসিয়া ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। সূর্য্যের বেশভূষায় কিন্তু আমরা এমন কিছু দেখিতে পাই না বাহা বিজাতীয়। সূর্য্যের পায়ে বুটজুতার মত এক রকম লম্বা জুতা আছে দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ইহাই সূর্য্যের বিদেশ হইতে আগমনের বিশেষ প্রমাণ। সূর্য্যপরে উপানয় লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। সেই সব আলোচনার সমালোচনা করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না, সংক্ষেপে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে সূর্য্যপদের উপানয় সূর্য্যেরই একটা বিশেষত্ব। অথ কোন দেবতার পদে এইরূপ অদ্ভুত ধরণের উপানয় দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এক মাত্র এইটাকেই অবলম্বন করিয়া সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নহে যে সূর্য্যমূর্তি বিদেশ হইতে আসিয়াছে। যদিও অধিকাংশ সূর্য্যমূর্তির পায়েই এই রকম উপানয় দেখা যায়, তবুও উপানয়শূন্য সূর্য্যমূর্তিও একেবারে বিরল নহে। বেণ্ডাল ( Bendall ) সাহেবের “নেপাল” নামক গ্রন্থে একটা সূর্য্যমূর্তির ছবি আছে, তাহার পায়ে উপানয় নাই। মূর্তির নিম্নস্থ লিপি হইতে জানা যায় যে মূর্তিটা ১০৮০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত। প্রাচীনতম সূর্য্য মূর্তি বুদ্ধগয়ার অশোকের সময়ের প্রস্তরবেষ্টনীর মধ্যে দেখা যায়। সেই মূর্তিতে দেখা যায় যে সপ্তাশ্ববাহিত রথে সূর্য্য আরুঢ়। তাহার দুইদিকে দুইটা জ্বী মূর্তি আলীঢ় ও প্রত্যালীঢ় পদে ধনুর্ধারণ লইয়া দণ্ডায়মান। পরবর্তী সূর্য্যমূর্তিগুলিতেও এই জ্বী-মূর্তি দেখা যায়। কিন্তু সূর্য্যপত্নীষয় সারথী অরুণ, লেখনী মন্ত্যধারহস্ত ঋশ্লদণ্ড ও মুক্তাসাধারী পিঙ্গল, পরবর্তী বোজন। বুদ্ধগয়ার সূর্য্য রথের মধ্যে এমন ভাবে দাড়াইয়া আছেন যে রথের গর্ভে তাহার পদদ্বয় অদৃশ্য। প্রাচীনতম সূর্য্য মূর্তিগুলির পদদ্বয় প্রায়ই এরূপ রথগর্ভে অদৃশ্য। বোধ হয় সূর্য্যের পদদ্বয় অদৃশ্য করিয়া বোদিত করিবার প্রথা



এইরূপে প্রচলিত হইয়া থাকিবে। এই প্রথা বধন দৃঢ়-মূল হইল তখন শিল্পশাস্ত্র স্বর্ঘ্যের পাদদ্বয় অঙ্কিত করা নিবিড় করিয়া দিল। কিন্তু শিল্পীগণ দেখিল যে পদশূন্য স্বর্ঘ্যের মূর্তি কিছুতেই মনোরম করিয়া গঠিত করা যায় না। শিল্পশাস্ত্রের নিষেধ এবং শিল্পীর সৌন্দর্য্যপ্রবণতাই বোধ হয় স্বর্ঘ্যপদের উপানয় ও তদ্বিষয়ক কাহিনীগুলির জন্ম দিয়াছে। আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থ সকলে উল্লিখিত আছে যে শকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ এ দেশে প্রথম স্বর্ঘ্য পূজা প্রচলিত করিয়াছিলেন বোধ হয় এই কাহিনীর মূলে সত্য নিহিত আছে। কিন্তু সপ্তাশ্ববাহিত স্বর্ঘ্যমূর্তি ভারতবর্ষের কল্পনা বলিয়াই মনে হইতেছে! কারণ শকরাজা কণিষ্কের মুদ্রায় যে স্বর্ঘ্য মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে সপ্তাশ্ব অথবা দশ পিজল ইত্যাদির কোন চিহ্নমাত্রও নাই। স্বর্ঘ্যমূর্তির পূজা হয়ত শকদ্বীপ হইতে আমদানী হইয়াছিল, কিন্তু ভারতবর্ষে আসিয়া স্বর্ঘ্যের মূর্তি নূতন করিয়া কল্পিত ও গঠিত হইয়াছিল।

প্রাচীন আর্য্যসমাজে পৃথিবীদেবীর সম্মানও কম ছিল না। পীপ্‌রাহা হইতে যে সব প্রাচীন জিনিষ সংগৃহীত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে দুইখানা স্বর্ণপাতের উপর পৃথিবীদেবীর মূর্তি অঙ্কিত দেখা যায়। পরলোক-গত ডাক্তার ব্লকের মতে এই প্রাচীন জিনিষগুলি ৫০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বুদ্ধগয়া নামক পুস্তকে ২০নং ছবিতে পৃথিবীদেবীর মূর্তি আছে। এই মূর্তি অবশ্য পীপ্‌রাহা মূর্তির অনেক পরিবর্তী কালের। এই মূর্তিতে দেখা যায় যে পৃথিবী এক কুর্ঙ্গপৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া মস্তকে ছত্র এবং পার্শ্বদেশে এক জন অশ্বচর। পৃথিবী দেবী বোধ হয় বেশী দিন পূজা পান নাই; কারণ পরবর্তী ভাস্কর্য্য নিদর্শনে আমরা পৃথিবীদেবীর সাক্ষাৎ আর বড় বেশী পাই না।

মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতন হইতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থান পর্য্যন্ত সময়ের ভারতবর্ষের ইতিহাস ভাল করিয়া পাওয়া

যায় না। পুস্তকিত্র শুদ্ধ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কিন্তু তাহার চেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে কুষণ রাজা কণিষ্ক আসিয়া ভারতের পশ্চিমার্দ্ধ অধিকার করিয়া বসেন। কণিষ্ক তাহার সঙ্গে গ্রীস পারস্য আসিরিয়া, মিশর ইত্যাদি দেশের মূর্তিপূজা লইয়া আসেন। তিনি ভারতবর্ষে আসিয়াই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। ইহার পর হইতেই দেশ মন্দিরে এবং মন্দির দেবমূর্তিতে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। বুদ্ধদেবের শূন্য আসনে অচিরে বুদ্ধমূর্তির আবির্ভাব হইল এবং দেখিতে দেখিতে কার্তিক, গণেশ, শিব ও পার্শ্বতীর মূর্তি নির্ম্মিত হইয়া পূজা পাইতে লাগিল। এই সময় হইতে ভারত বর্ষে মূর্তিপূজার দ্বিতীয় যুগ আরম্ভ হইল। কাজেই মূর্তি পূজার আদি যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে এইখানেই শেষ করিতে চাই।

ত্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।



## প্রণব

আম্বার বৃকে তোমার আসন,  
তোমার বৃকে বাণী;  
রিক্ত-পাণি বাণীর বৃকে  
শুভ্র বাণীধানি।  
বাণার বৃকে ছন্দে গানে  
উৎসলে উঠে মুর;  
সুরের বৃকে কুণ্ডলিনী  
ওঙ্কার মধুর।  
জাগ্‌বে যে দিন মহাকণী  
উদ্ধ-ফণা হয়ে—  
ভূমানন্দে মরব “আমি”  
সপ্ত লোক লয়ে।

শ্রীহর্গামোহন কুশারী।



## চন্দ্রকান্ত প্রসঙ্গ

### সংক্ষিপ্ত জীবনী

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুর নগরে ভারতের গৌরব পণ্ডিত-শ্রুত স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পিতা পণ্ডিত-প্রবর স্বর্গীয় রাধাকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় পুত্রের বিজ্ঞানসুজ্জিয়া সম্পাদন করতঃ পঞ্চমবর্ষ বয়সেই তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় স্বল্পকাল মধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়া উঠিলে তাঁহাকে দৈন্য প্রাথমিকের কলাপ ব্যাকরণের সূত্র-গণ-অভিধান (অমরকোষ) প্রভৃতি আবৃত্তি করিতে দেওয়া হয়। অসাধারণ মেধা ও প্রতিভা বলে তর্কালঙ্কার মহাশয় অল্পকাল মধ্যেই সুসকল কঠোর করিয়া ফেলেন। এইবার সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় পুত্রের প্রতিভা দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহার পাঠের সুব্যবস্থার জন্ত নিজের ছাত্র-দিগের মধ্যে দুইজনকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তাঁহাদের নাম রামমোহন বিজ্ঞানচাম্পতি ও গোলোক ত্রায়ালঙ্কার। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় একজন শাস্ত্রব্যবসায়ী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন। তিনি বহুতর ছাত্রকে অন্নদান সহকারে বিজ্ঞানদান করিতেন। তৎকালে তিনি একজন প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত বলিয়া সে দেশে পরিচিত ছিলেন। পিতৃ-নিযুক্ত পণ্ডিত মহাশয়দের নিকট তর্কালঙ্কার মহাশয় ব্যাকরণের পাঠ সমাপ্ত করিয়া তাহাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তখনকার নিয়ম ছিল যে বাঁহারা স্বতি-শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য কামনা করিতেন তাঁহারা ত্রায়-শাস্ত্রের ব্যাপ্তিবাদ ও শব্দধর্মের অন্ততঃ কতকখানা পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া লইতেন। সেই নিয়মামুসারেই তর্কালঙ্কার মহাশয় ব্যাপ্তিবাদ পাঠের জন্ত পূর্ব-ময়মনসিংহ 'ইটাল্লতলা' গ্রামনিবাসী স্বর্গীয় সোমোদন বাচম্পতি মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হন এবং সেখানে

ভাষাপরিচ্ছেদ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাপ্তিবাদের কিয়দংশ অধ্যয়ন করতঃ পিতৃসমীপে উপনীত হন। সিদ্ধান্ত-বাগীশ মহাশয়ের টোলে তখন স্বতিশাস্ত্রের অনেক ছাত্র ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে তর্কালঙ্কার মহাশয় পিতার নিকটে স্বতিশাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন এবং তৎসহ কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র আলোচনা করিতে থাকেন। কাব্য এবং অলঙ্কারে তর্কালঙ্কার মহাশয় যেরূপ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন স্বতিশাস্ত্রের পাঠেও তিনি তেমনই নিত্য নূতন প্রতিভার পরিচয় প্রদানে পিতৃশিষ্যগণের, বিশেষতঃ পিতৃদেবের, বিশেষ প্রীতি ও বিশ্বাস উৎপাদন করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে তর্কালঙ্কার মহাশয় সেরপুরের নিকটবর্তী 'জালকাটা' গ্রামের পণ্ডিত স্বর্গীয় বিশ্বেশ্বর বিজ্ঞানচাম্পতি মহাশয়ের নিকট কলাপ ব্যাকরণের 'ধাতুসূত্র' প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া আসেন। তৎপর পিতৃসমীপে কয়েক বৎসর স্বতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় পিতৃদেবের আদেশক্রমে বিক্রমপুর "কোড়াপাড়ার" প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত মহামহোপাধ্যায় দীননাথ ত্রায়পঞ্চানন মহাশয়ের নিকট স্বতিশাস্ত্রের অবশিষ্ট গ্রন্থ অধ্যয়নের জন্ত উপস্থিত হন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বিজ্ঞানবৃত্তা ও বুদ্ধিমত্তা দর্শন করিয়া তৎকালে পূর্ববঙ্গের সর্বপ্রধান পণ্ডিত ত্রায়পঞ্চানন মহাশয় বিশ্বাসাভিভূত হইয়াছিলেন। তিনি তর্কালঙ্কার মহাশয়কে পরম যত্নের সহিত স্থান দান করেন। সেখানে নবীন গ্রন্থের অধ্যয়ন, অধীত শাস্ত্রের পুনরালোচনা, নবনব পূর্বপক্ষ ও উত্তরপ্রণালীর উদ্ভাবন এবং শাস্ত্রীয় নিগূঢ় রহস্যের নব প্রবর্তনা দ্বারা তর্কালঙ্কার মহাশয় বিক্রমপুর সমাজে অতি অল্পকাল মধ্যেই বিশেষ প্রতিপন্ন হইয়া উঠেন এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বিচারসভায় অপূর্ব বিচার-কৌশল প্রদর্শন পূর্বক সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা ও গৌরব-ভাজন হইয়া উঠেন। সে সময়ে ত্রায়পঞ্চানন মহাশয়ের সম্প্রদায়ে প্রচলিত অনন্তমূলভ পূর্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ ও স্মার্ত্তসম্পর্কের স্থানবিশেষের সংযোজনা-বৈচিত্র্য প্রভৃতি

বিশেষ বিবেচনার সহিত সংগৃহীত করিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় দেশে প্রত্যাগত হন।

এই সময়ে তাঁহার পিতৃদেব সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় মানবলীলা সংবরণ করেন। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হইলেও পুত্রদের ঞ্জ কিছু সংস্থান রাখিয়া গিয়া ছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় তখন কৃতদার, তিনি কোন রকমে সংসারভার নামাইয়া রাখিয়া ভারতের বিজ্ঞাতীর্থ নবদ্বীপে চলিয়া যান। তখনও নবদ্বীপের প্রভা চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইতেছিল। একদিকে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহন বিজ্ঞানরত্ন, স্বর্গীয় হরমোহন চূড়ামণি, স্বর্গীয় শ্রীনন্দন তর্কবাগীশ মহাশয় প্রভৃতি জ্ঞানশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেছিলেন। অত্ৰদিকে দেশের সর্বপ্রধান স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় ব্রজনাথ বিজ্ঞানরত্ন মহাশয় প্রমুখ পণ্ডিতগণ স্বতিশাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা নবদ্বীপের পূর্বেগোরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় নবদ্বীপে সেই বারম্বার অধীত স্বতিশাস্ত্র লইয়াই ব্রজনাথ বিজ্ঞানরত্ন মহাশয়ের টোলে উপস্থিত হইলেন। তিনি যত কাল স্বতিশাস্ত্র পড়িয়া ছিলেন ততদিনে সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারিতেন। বুদ্ধিমান তর্কালঙ্কার মহাশয় তাহা করিলেন না। তিনি চিন্তা করিয়াছিলেন “একাবিজ্ঞা সুশিক্ষিতা” তাই আবার নূতন উদ্যমে অধীতস্বতির পুনরাবলোচন এবং সর্বত্রদ্বলিত প্রাচীনস্বতির আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রতিভা দর্শনে প্রীত হইয়া প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীনন্দন তর্কবাগীশ মহাশয় তাহাঁকে বস্ত্রের সহিত ‘বাদার্থ’ পড়াইতে আরম্ভ করেন। এক দিকে নব্য ও প্রাচীন স্বতির গভীর আলোচনা, অত্ৰদিকে “শব্দশক্তি প্রকাশিকা” “ব্যুৎপত্তি বাদ” প্রভৃতি বাদার্থগ্রন্থের ভাষ্যকাঠিন্য ভেদ করিয়া নিগূঢ়ার্থ গ্রহণ, সহজ প্রতিভার পরিচায়ক নহে। তর্কালঙ্কার মহাশয় এইবার প্রাচীন স্বতির দ্বলভগ্রন্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। “হারলতা” নামক একখানি উৎকৃষ্ট স্বতিগ্রন্থ ব্রজনাথ বিজ্ঞানরত্ন মহাশয়ের

বিশেষ আত্মকুল্যে লিপিবদ্ধ করিয়া আনেন। এই সময়ে পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় মাধব তর্কসিদ্ধান্ত ও কাশীনাথ শাস্ত্রী মহাশয়দের নিকটও তর্কালঙ্কার মহাশয় ন্যায় এবং বেদান্তাদি শাস্ত্র কিছু কিছু অধ্যয়ন করেন। অসাধারণ মেধাশুণে সে সকল শাস্ত্রেও তিনি প্রাবল্ল হইয়া উঠেন। অনন্তর তর্কালঙ্কার মহাশয় নবদ্বীপ হইতে প্রশংসার সহিত “তর্কালঙ্কার” উপাধি লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। তিনি নবদ্বীপে ও বিজ্ঞানরত্ন মহাশয়ের সম্প্রদায়ে প্রচলিত সমস্ত ‘মতামত’ ও ব্যবস্থা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেরপুর আসিয়া তিনি স্থানীয় জামিদারদিগের বিশেষ শ্রদ্ধা উপার্জন করতঃ তাহাঁদেরই আত্মকুল্যে নিজগৃহে এক বৃহৎ চতুপাঠী সংস্থাপন করেন। দেখিতে দেখিতে নানা দেশীয় ছাত্র-গণে চতুপাঠী পূর্ণ হইয়া গেল। এইবার পিতৃসম্বিত ধনের ব্যয় আরম্ভ হইল। নানাশাস্ত্রের গ্রন্থরাশি ক্রয় করা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জীবনের ব্রত হইল। তিনি একদিকে যেমন নূতন নূতন গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, অত্ৰদিকে তেমনই মনোযোগ ও পরিশ্রমের সহিত রাত্রিতে সে সকল অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। সে সময়ে বিক্রমপুরের সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় প্রসঙ্গ তর্করত্ন মহাশয়ও মধ্যে মধ্যে সেরপুর যাইতেন। তাঁহার সঙ্গে অক্লান্তভাবে আলোচনা করিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় নব্যজ্ঞানেরও মৌলিক তথ্য সম্বন্ধে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন। বলা বাহুল্য তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বিজ্ঞান উন্নতিকল্পে সেরপুরের শিক্ষিত ভূম্যধিকারিগণ বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। সাহায্যকারীদিগের মধ্যে বিদ্যোৎসাহী স্বঃ সুপণ্ডিত হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের নাম সর্ব প্রথম উল্লেখযোগ্য। উক্ত চৌধুরী মহাশয়ের স্বন্ধেও আত্মকুল্যে “চাক্রবর্তী” নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র সেরপুর হইতে প্রকাশিত হইত। তর্কালঙ্কার মহাশয় সেই পত্রে নিয়মিতভাবে লিখিতেন।

তঁাহার ভাৎকালিক বাঙ্গালা রচনা শিক্ষিত সমাজে বিশেষ আদরের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি ধারাবাহিক রূপে ভারতবর্ষের শিক্ষাসংস্কার বিষয়ে কতিপয় সূচিস্থিত প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। পরে সেগুলি পুস্তকাকারে “শিক্ষা” নামে প্রচারিত হইয়াছিল।

তর্কালঙ্কার মহাশয় তখন হইতেই সংস্কৃত কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন। “আনন্দ তরঙ্গিনী” নামক একটি সুললিত স্তোত্র তঁাহার সর্বপ্রথম রচনা। “সতী-পরিণয়” তঁাহার প্রথম মহাকাব্য, তৎপর “চন্দ্রবংশ” নামক আর একখানি মহাকাব্য লিখেন। কলিকাতা সংস্কৃতকলেজে প্রবেশের পূর্বে “কৌমুদী সুধাকর” নাটক, গোষ্ঠিলু গৃহের ‘ভাব্য’ এবং ‘তত্ত্বাবলী’ প্রভৃতি আরও কতিপয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

ষে বৎসর সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষার প্রথম সৃষ্টি হয় সেই বৎসরই তঁাহার একজন ছাত্র নব্যস্বাভার উপাধি পরীক্ষায় প্রাশংসার সহিত উত্তীর্ণ হন এবং তাহার পর বৎসর আর একজন ছাত্র প্রাচীন গ্রায়ের উপাধি পরীক্ষায় উপস্থিত হন। জনশ্রুতি এইরূপ, স্বার্থের ছাত্র গ্রায়ের উপাধি পরীক্ষার্থী হইয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া তিনি অন্তায়রূপে পরীক্ষক মহাশয় কর্তৃক নিগৃহীত হন। কিন্তু পর বৎসরই সেই ছাত্রটি গ্রায়ের উপাধি পরীক্ষায় সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া হরকুমার ঠাকুরের প্রদত্ত কেয়ূর লাভ করিয়াছিলেন। তঁাহার দেশের চতুষ্পাঠী হইতেও ব্যাকরণ কাব্য গ্রায় স্মৃতি পদার্থ অলঙ্কার এবং মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বহু ছাত্র অধ্যাপক হইয়া গিয়াছেন। দেশের চতুষ্পাঠীর জ্ঞান তঁাহাকে বিশ্বর অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল, এবং তুলভগ্রন্থ সংগ্রহ ব্যয়পারেও পিতৃসঞ্চিত অর্থ অনেকটা নষ্ট হইয়াছিল। “অধিকরণমালা” “বিকুপুরাণ” প্রভৃতি তখনকার দিনে এ দেশে অপ্রাপ্য অনেক গ্রন্থ তর্কালঙ্কার মহাশয় বহুব্রহ্ম ও প্রয়াস স্বীকার করিয়া জার্মানি, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বাহা হউক ইতিমধ্যে

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জীবনস্রোত অল্প পথে ধাবিত হইবার উপক্রম করিল। কলিকাতার ভূতপূর্ব রেজিষ্টার ত্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, সর্বজনস্ববিদিতপণ্ডিত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, এবং অনারবল কৃষ্ণদাস পাল এই তিন জন গুণগ্রাহী মহাত্মার দৃষ্টি একটা সাধারণ সংক্রান্তির বাবস্থা উপলক্ষে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ইহাদেরই যত্নে তিনি গোষ্ঠিলের ভাব্য সম্পাদনে নিযুক্ত হন। ভাব্য দর্শনে প্রীত হইয়া ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তঁাহারা তর্কালঙ্কার মহাশয়কে কলিকাতা আহ্বান করেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া গুণগ্রাহী পণ্ডিত-প্রবর মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় মহেন্দ্রচন্দ্র গ্রায়রত্ন মহাশয়ের অধীনে সংস্কৃতকলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। যদিও তিনি স্মৃতির অধ্যাপক ছিলেন, কিন্তু কিছুকাল পর হইতেই তঁাহাকে প্রায় সমস্ত শাস্ত্রেরই অধ্যাপনা করিতে হইত, এবং কলেজবিভাগেও এম এ ক্লাস পর্যন্ত পড়াইতে হইত। সংস্কৃতকলেজে প্রবেশ করিয়াও তর্কালঙ্কার মহাশয় পিতৃ-প্রদর্শিত পন্থা পরিত্যাগ করেন নাই। সেখানে পরমবহু প্রতাপ বাবুর প্রদত্ত বাড়ীতে নিজে বাস করিতেন এবং স্বতন্ত্র বাসস্থান ভাড়া করিয়া দিয়া দশ বার জন ছাত্রকে অন্নদান পূর্বক বিদ্যাদান করিতেন। তঁাহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্তও ছাত্রগণ তঁাহার সঙ্গে ছিলেন। কলিকাতা আসার পরেও তঁাহার বহু ছাত্র সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। কলিকাতা আসিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটীর অনেক গ্রন্থের সংস্করণ করেন। তাহাতেও তঁাহার পাণ্ডিত্য বিশেষরূপে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে দীর্ঘ চতুর্দশবর্ষ রাজকর্ম্য সম্পাদনের পর “মহামহোপাধ্যায়” উপাধি ভূষণে ভূষিত হইয়া তিনি কার্যে অবসর গ্রহণ করেন। অনন্তর তর্কালঙ্কার মহাশয় ত্রীগোপাল বসুমত্নিক মহাশয়ের ফেলোসফের লেকচার প্রদান করেন। পাঁচ বৎসর কাল অসীম পরিশ্রম সহকারে সমস্ত

দর্শনের সার সংগ্রহ করতঃ প্রবন্ধাকারে বিধ্বংসমাজে প্রচারিত করেন। সেই প্রবন্ধগুলি পাঁচখণ্ডে মুদ্রিত হইয়া “ফেনোলিকের লেকচর” বা “হিন্দুদর্শন” নামে বর্তমান সময়ে সর্বত্র প্রচারিত হইতেছে। এই কার্যের পুরস্কার স্বরূপ তিনি পঁচিশ হাজার টাকা প্রাপ্ত হন। অবসর গ্রহণ কালেও তিনি বহুবিধ মৌলিক গ্রন্থ ও টীকা প্রণয়ন করেন। ইদানীং তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রায়ই কাতর থাকিতেন। রুমাবস্থাতেও শাস্ত্রালোচনা পরিত্যাগ করেন নাই। চিকিৎসকগণ অধ্যাপনা বন্ধ রাখিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতেন কিন্তু তিনি তাহা পারিতেন না। তিনি মৃত্যুর এক সপ্তাহ পূর্বেও সাধামত শাস্ত্রোপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বেই ৬ কাশীধাম গিয়া যান। সেখানে গিয়া ক্রমশঃ অরোগ্য, অকীর্ণ ও অরুচি প্রভৃতিতে বিশেষ কাতর হইয়া পড়েন। মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তিনি নির্বিকারচিত্তে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন। মৃত্যুর তিন দিবস পূর্বে তাঁহারই উপদেশ মত তাঁহাকে মণিকর্ণিকাতে নেওয়া হয়। সেখানে তিন দিন বাস করিয়া সম্পূর্ণ জ্ঞানে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে ১০১৬ সনের ২০শে মাঘ বুধবার বেলা প্রায় ৯ ঘটিকার সময় ভারতের উজ্জলরত্ন চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। ব্রহ্মনালে পাদপীঠের পার্শ্বে চন্দ্রনচিতায় নখর দেহ মুহূর্ত্ত নধ্যে ভস্ম হইয়া গেল। তাঁহার চিত্তাপার্ষে বহুতর গণ্যমাণ লোক উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় গভর্ণমেন্ট তাঁহার শব দাহ করিবার জন্য পাদপীঠের স্থান বিনা মাগুলে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। অপরূপে চিতাবহি নির্মাণ হইলে কাশী প্রবাসী একদল বাদ্যাদী বিজ্ঞার্থী ও অধ্যাপকমণ্ডলী শ্রেণীবদ্ধ ভাবে শোকসঙ্গীত গান করিতে করিতে নগরপদে সন্মান ভূমিতে সমাগত হন, এবং সাক্ষরেন্দ্রে চিতাভূমি প্রদক্ষিণ করতঃ লগাটে চিতাভস্ম লৈপন করিয়া মহাত্মা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রতি বিশেষ সন্মান প্রদর্শন করেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় দুই পুত্র দুই কন্যা পুত্রবধূ পৌত্র ও

পৌত্রী প্রভৃতি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বকৃত বিদ্যাসম্পত্তিও ব্রাহ্মণপণ্ডিতের পক্ষে সামান্য নহে। তর্কালঙ্কার মহাশয় সংসাহসী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিবেকের বিরুদ্ধে কখনও কোন কার্য্য করিতে তাঁহাকে দেখা যায় নাই। বিনয় ও সদব্যবহারের জন্য তিনি সর্বসমাজে বিশেষ প্রশংসিত ছিলেন। তাঁহার মত জ্ঞানানুরাগ অতি অল্প লোকেই দেখা গিয়া থাকে। সংস্কৃত কলেজে কার্য্য করিবার সময়ে একবার তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়াছিল। তিনি এক বৎসরের জন্য বিদায় নিয়া ৬ কাশীধামে চলিয়া যান, এবং সেখানে পূজ্যপাদ বিদ্যাবানন্দ স্বামীজী প্রভৃতির সঙ্গে বেদান্তাদি শাস্ত্রের বিশেষভাবে আলোচনা করেন এবং মীমাংসা দর্শনেরও বিশেষ আলোচনা দ্বারা গুঢ় রহস্য অবগত হন। তর্কালঙ্কার মহাশয় নিজে বলিয়াছেন তাহার মত পরিশ্রম করিয়া অধ্যয়ন করিতেছে এরূপ ছাত্র তাহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তিনি সারা জীবন পরিশ্রম করিয়া সরস্বতীর আরাধনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, সরস্বতীও সাধনার অনুরূপ সিদ্ধিই তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মৃত্যুর ৫।৬ মিনিট পর বঙ্গের অলঙ্কারপণ্ডিতশ্রেষ্ঠ মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় কৃষ্ণনাথ জায়পঞ্চানন মহাশয় প্রভৃতি মণিকর্ণিকার ঘাটে গিয়াছিলেন। ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় আক্ষেপ করিয়া আবেগভরে বলিয়াছিলেন “এরূপ ব্যক্তি বিগত দুই শত বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন নাই”।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে আশিও অনেক গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই। তিনি প্রায় সমস্ত শাস্ত্রেই গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার “স্মৃতি চন্দ্রালোক” যদি সম্পূর্ণ হইত, তবে একদিন আর্ডেট্টারিয়ার রুম্বল্ডেনের অষ্টাবিংশতিতমের সুবর্ণসিংহাসন অধিকার করিয়া বসিত কি না তাহা কে বলিতে পারে ?

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সৌভাগ্যও তাঁহার প্রতিভা-

রই অল্পরূপ ছিল। তাঁহার রচিত “কৌমুদী সুধাকর” নামক দৃষ্টকাব্য রাজধানী কলিকাতাতেই তাঁহার জীবনকালের অভিনীত হইয়া পণ্ডিত সমাজেব প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিল। কবিকুলভিতিক ভবভূতির ন্যায় তাঁহাকে আক্ষেপ করিয়া, বলিতে হয় নাই “কালোহর্যঃ নিরবধিরিপিপ্লাচ পৃথ্বী”। কি প্রাচ্য, কি প্রতীচ্য সকল দেশের সকল সুধীসমাজেই তাঁহার সমান প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার রচিত “বৈশেষিকভাষ্য” “কাতন্ত্র-চ্ছন্দঃপ্রক্রিয়া” ও গোতিলভাষ্যাদি দর্শনে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ যে সকল অল্পকুল সমালোচনা করিয়াছেন, এবং তৎকালের বড় বড় পণ্ডিত ‘মোক্শমূলর’ প্রভৃতি যে সকল প্রশংসাবাদ করিয়াছেন, তাহা আধুনিক পণ্ডিত-সমাজের গৌরবের বিষয় বলিয়াই আমরা মনে করি। জীবনকালের এরূপ উচ্চতম সম্মান অনেকের ভাগ্যেই ঘটে না।

তর্কালঙ্কার মহাশয় ইংরেজী জানিতেন না, তথাপি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষার পরীক্ষকের পদ অলঙ্কৃত করিতেন। তিনি এরূপ নিপুণতার সহিত পরীক্ষকের কার্য সম্পাদন করিতেন যে তাঁহার বিরুদ্ধে এ বিষয়ে কোনও অভিযোগ এ বাবৎ কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই। প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষাসম্পর্কিত কাগজপত্র তিনি নিজহাতে ‘সেনেটে’ লইয়া বাইতেন। ঈদানীং অল্পহ-দশার কর্তৃপক্ষের অল্পমতানুসারে বিষণ্ণ ছাত্র দ্বারা তাহা সুরক্ষিত ভাবে ‘সেনেটে’ পাঠাইয়া দিতেন।

তিনি একান্ত পরোপকারী ও বিনয়ী ছিলেন। একজন সুবককে দেখিয়াও তিনি দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনা করিতেন এবং বাসার সদর দরজা পর্যন্ত তাঁহাকে পৌছাইয়া দিয়া তবে ফিরিতেন। তাঁহার ধর্মবুদ্ধি এত প্রবল ছিল যে তিনি হিন্দুধর্মের প্রত্যেকটি কার্য যথা-সাধ্য প্রদ্বার সহিত সম্পাদন করিতেন। তাঁহার মত আন্তিক লোক বর্তমান সমাজে বিরল। তিনি নিজের ধর্ম ও আচারকে সর্বাপেক্ষা ভালবাসিতেন। ধর্ম ও

আচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান অতিবড় ধনবান চির-বান্ধবগণকেও তিনি প্রোহ্য করিতেন না,—সাময়িক স্বার্থের মন্দিরদ্বারে নিজের বিবেকটিকে কখনও বলিদান করিতেন না। এই সকল বিষয়ে তাঁহার জীবনে অনেক-বার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। আমরা সময়ান্তরে এই মহাপুরুষের অনন্তসাধারণ সদৃশ্যাবলীর যথাসক্তি আলোচনা করিব ইচ্ছা রাখি। বর্তমান প্রবন্ধে তাহার স্থান ও অবসর নাই।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের স্বদেশোন্মুখাগণও একান্ত প্রবল ছিল। তিনি প্রায় জীবনের অধিকাংশ সময় স্বদেশের ও স্বসমাজের কল্যাণ চিন্তা করিতেন। তাঁহার মধ্য-বয়সে মদ্রমনসিংহ সহরে একটি সংস্কৃত কলেজ সংস্থাপনের জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। তৎকালে মদ্রমনসিংহ বারের সঙ্গপ্রধান উকীল স্বর্গীয় জৈশান চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় ও বর্তমান বারের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত অনাথবল্লভ গুহ মহোদয় প্রভৃতি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের শুভ চেষ্টার সহযোগী ছিলেন। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ও সে সময়কার মাননীয় ডিরেক্টার সাহেব বাহাদুরের সাহায্যাত্মকতার ও অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের পরিপুষ্ট চেষ্টা অনেকটা সফলতার দিকেই অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কোনও অপ্র-কান্ত কারণে সেই চেষ্টা সে বারে ব্যর্থ হইয়া যায়। যত্নের কিছুকাল পূর্বেও তর্কালঙ্কার মহাশয় মদ্রমনসিংহ সংস্কৃত কলেজের জন্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি দেশের উন্নতি কল্পে আরও অনেক প্রকার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। সে সমস্ত উল্লেখ করিবার এ স্থান নহে! আমরা সেই মহাপুরুষের অসামান্য প্রতিভা ও চরিত্র বিশ্লেষণের উপযুক্ত শক্তি লইয়া লজ্জা প্রহণ করি নাই। যদি কোনও যোগ্যতর ব্যক্তি তাঁহার জীবনচরিত্র সং-কলন করেন সে সকল কথা সত্যসম্মুখে অবশ্যই প্রচারিত হইবে। আমরা দীর্ঘকাল সেই অবিপ্রতিত মহাপুরুষের চরণতলে বসিয়া অধ্যয়ন করিবার সৌভাগ্য লাভ করি-

রাহিলাম। সেই অবসরে তাঁহার সম্বন্ধে যতটুকু জানিতে পারিয়াছি আমরা সাধ্যমত তাঁহার কিছু কিছু আলোচনা করিব। ভবিষ্যতে যাঁহারা তাঁহার জীবনচরিত সংকলন করিবেন আমাদের এই কৌণ চেষ্টা দ্বারা যদি তাঁহাদের এতটুকুও সাহায্য হয় তবে নিজকে কৃতার্থ মনে করিব।

আমরা নিম্নে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের রচিত, মুদ্রিত ও অমুদ্রিত গ্রন্থের একটি তালিকা প্রকাশ করিলাম। এই সকল গ্রন্থের প্রতিপাত্ত বিবরণ ও তৎসম্বন্ধে দুই চারিটি কথা আমরা যথাস্থানে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রাখি। ভগবান্ আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিবেন কিনা জানি না।

## তালিকা

- ১। গণেশ স্তোত্রম্
- ২। জৈশ্বর স্তোত্রম্
- ৩। গুরু স্তোত্রম্
- ৪। দুর্গা স্তোত্রম্
- ৫। শিবস্তোত্রম্
- ৬। বিষ্ণু স্তোত্রম্
- ৭। ব্রহ্ম স্তোত্রম্
- ৮। গঙ্গা স্তোত্রম্
- ৯। কাশী স্তোত্রম্
- ১০। সরস্বতী স্তোত্রম্
- ১১। ভাবপুঞ্জালিঃ
- ১২। আনন্দভরঙ্গিনী
- ১৩। সুবরাঙ্গ প্রশস্তিঃ
- ১৪। বীর প্রশস্তিঃ
- ১৫। রস শতকম্
- ১৬। প্রবোধ শতকম্
- ১৭। সতী পরিণয়ম্ ( মহাকাব্য )
- ১৮। চন্দ্রবংশম্ ( মহাকাব্য )

- ১৯। কৌমুদী সুধাকরম্ ( বৃণ্ডাকাব্য )
- ২০। অলঙ্কার সূত্রম্
- ২১। কাতন্ত্র্যস্বয়ং প্রক্রিয়া ( বৈদিক ব্যাকরণ )
- ২২। বেদ প্রামাণ্যম্
- ২৩। তত্ত্বাবলী
- ২৪। কুসুমাকাল ব্যাখ্যা বিভাগঃ
- ২৫। বৈশেষিক ভাষ্যম্
- ২৬। মীমাংসাসিদ্ধান্তসংগ্রহঃ
- ২৭। চলসংক্রান্তি নির্ণয়ঃ
- ২৮। গোষ্ঠিলগ্ন্যসূত্র ভাষ্যম্
- ২৯। গৃহনা সংগ্রহ ভাষ্যম্
- ৩০। শ্রাদ্ধকল্প ভাষ্যম্
- ৩১। উদাহ চন্দ্রালোকঃ
- ৩২। ঔর্দ্ধদেহিক চন্দ্রালোকঃ
- ৩৩। শুদ্ধিচন্দ্রালোকঃ
- ৩৪। আন্থিক চন্দ্রালোকঃ
- ৩৫। ব্যবহার চন্দ্রালোকঃ
- ৩৬। দায়ভাগ চন্দ্রালোকঃ
- ৩৭। কর্মপ্রদীপ টীকা প্রভা
- ৩৮। অমৃতভূতি প্রকাশ টীকা।

## বাস্তালা গ্রন্থ ।

- ৩৯। শিক্ষা
- ৪০। সত্যবতী ( চম্পু )
- ৪১। ফেলোসিফের লেক্চর ( ১ম বর্ষ )
- ৪২। ঐ ২য় বর্ষ
- ৪৩। ঐ ৩য় বর্ষ
- ৪৪। ঐ ৪র্থ বর্ষ
- ৪৫। ঐ ৫ম বর্ষ

শ্রীকালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী ।

## বিগত ত্রিশ বৎসরে ঢাকা জেলার স্বাস্থ্য

( ঢাকা সাহিত্য পরিষদে পঠিত )

আমার বক্তব্য বিষয় বিগত ত্রিশ বৎসরে ঢাকা জিলায় স্বাস্থ্যের অবস্থা। আমি এ বিষয়ে কতকগুলি ভাব ও বিষয় সংগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু লিখিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া ঐগুলিকে বেশ সাজাইতে পারি নাই। সুতরাং সাধারণ ভাষায় ভাব ও বিষয়গুলি প্রকাশ করিয়াছি।

আমাদের দেশে সর্বত্র প্রাচীন দীর্ঘি পুষ্করিণীগুলি এখন প্রায় ধ্বংস হইয়াছে। কিন্তু উহাদের সুন্দর সুন্দর ঘাটগুলি এবং বাধান চারিটা ধার দেখিলে মনে হয় আমাদের পূর্বপুরুষেরা পানীয় জলের পবিত্রতা রক্ষা বিষয়ে অজ্ঞ কিম্বা উদাসীন ছিলেন না। হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মকর্মের সঙ্গে বিগত জলের বিশেষ সম্পর্ক। মনু ও অত্যাচার শাস্ত্রকারগণ জলের পবিত্রতা রক্ষা হেতু নানা শাস্ত্রবিধি প্রচার করিয়াছেন। তন্মধ্যে কয়েকটা উল্লেখ করিতেছি। তব্জ মনু ঋষির নিবেদ্যবিধি এই যে নাপস্থ মূত্রং পুরীষং বা স্ত্রিবনং বা সমুৎসৃজেৎ।

অমেব্যালিপ্তমত্ত্বা লোহিতং বা বিবাণি বা ॥

মনু অধ্যায় ৪ শ্লোক ৫৬।

মল, মূত্র, খুত, রক্ত, বিষ, কিম্বা অজ্ঞ কোন দ্রবিত পদার্থ জলে ফেলিবে না।

মল লিখিত প্রায়শ্চিত্ত বিবেকের কঠোর শাস্তিবিধি এই যে

রেতো মূত্র পুরীষাণি উদকে কৃষা ত্রিরাত্রো

পোষিতঃ “ইদমাপঃ প্রবহতঃ” ইতি অপেৎ

রেত মলমূত্র জলে ভাগ করিলে শাস্তি স্বরূপ তিন রাত্রি উপবাস করিয়া “ইদম আপঃ প্রবহতঃ” ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিতে হইবে।

মল পুনঃ পুনঃ জল অশুচিকারীর শাস্তিবিধান করিয়াছেন। যথা:—

ক্ষিপ্তা অশৌ অশুচি ত্রব্যং তৎএব অশুচি মানবঃ  
মাসমেকং ব্রতং কুর্য্যাৎ।

আবার বলিয়াছেন যে—

অপ্-শ্রমৌ বা মেহতঃ তপ্তকৃচ্ছঃ ভবেৎ।

জলে অশুচি ত্রব্য নিক্ষেপ করিলে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ একমাস ব্রত করিতে হইবে। তিনি জলে প্রস্রাবকারীর তপ্তকৃচ্ছ নামক প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পানীয় জলের বিশুদ্ধতা রক্ষা ব্যতিরেকেও আমাদের দেশের স্বাস্থ্যতত্ত্বের অনেক প্রাচীন রীতি প্রচলিত আছে। গ্রাম সহর সর্বত্রই বাসস্থানগুলির নির্মাণপ্রণালী, জল-নিকাশের জন্ত খালগুলির অবস্থা খাতাখাত, ও অত্যাচার ব্যংহ্যার মূলে আমাদের অতীত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

বিগত ত্রিশ বৎসরে ঢাকা জিলায় স্বাস্থ্যের অবস্থা আলোচনা করিবার জন্ত আমি এই বিষয়ে সরকারী রিপোর্টগুলি পাঠ করি। তাহাতে সাধারণতঃ দেখা যায়, পশ্চিম বাদলা অপেক্ষা পূর্ববাদলার স্বাস্থ্য ভাল। এবং চট্টগ্রাম বিভাগ সব চেয়ে স্বাস্থ্যকর। ঢাকা জিলায় স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল। লোক সংখ্যাই হ্রাস বৃদ্ধি কিম্বা দ্রব্যমৃত্যুর হার এবং জ্বর কলেরা বসন্ত প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধিগুলির প্রকোপ আলোচনা করিলে এ বিষয়টা বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইবে। ঢাকা জিলায় জয়ের হার মৃত্যুর হার অপেক্ষা বেশী। মারাত্মক ব্যাধিগুলির আক্রমণ ও সেই হিসাব কম। সুতরাং ঢাকা জিলায় লোক সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ১৮৮১ খৃঃ অঃ ঢাকা জিলায় ২০ লক্ষ লোকের বসতি ছিল। ৩০ বৎসরে ১০ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রথম দশ বৎসর পরে ২০ লক্ষ, দ্বিতীয় দশ বৎসর পরে ২৬ লক্ষ এবং তৃতীয় দশ বৎসরে জনসংখ্যা ২৯ লক্ষে পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ প্রত্যেক দশ বৎসর লোকসংখ্যা ক্রমাগতঃ শতকরা ১২, ১৫ এবং ১৩ জন হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং মোটের উপর ত্রিশ বৎসরে ঢাকা জিলায় শতকরা ৬৪ জন হিসাবে বাড়ি-



রাছে। এই সময়ে ময়মনসিংহে ৬৬, বাখরগঞ্জে ৩২ জন, ত্রিপুরায় ৭৫ জন, পাবনার, ৮ জন, বর্ধমানে ৯ জন, দিনাজপুরে ৭ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু নদীয়া, বশোর প্রভৃতি জিলায় লোকসংখ্যা শতকরা ৫ হইতে ১০ জন হ্রাস পাইয়াছে। সুতরাং দেখা বাইতেছে এই পার্শ্ববর্তী জিলাগুলির মধ্যে ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহের পরেই ঢাকার স্থান। কিন্তু বিগত ১০ বৎসরে ইহার জনসংখ্যা কেন পূর্বের তায় বৃদ্ধি পায় নাই, সে বিষয় অনুসন্ধান করা উচিত। বাৎসরিক বৃষ্টিপাত, খাদ্যভ্রমে মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি, শীতের আতিশয্য প্রভৃতির সহিত জন্মমৃত্যুহারের তারতম্য হইয়া থাকে। যে বৎসর ঢাকা জিলায় বর্ষা বেশী হয়, সেই বৎসরে মৃত্যুসংখ্যা কমে। ইহার কারণ এই যে বর্ষার জলে সমস্ত ময়লা ধুইয়া যায় এবং অতিরিক্ত আর্দ্র কিছা জলমগ্ন ভূমিতে মেলেরিয়ার কীটাপু জন্মিতে পারে না। ঈষদ্রুষ্ণ আর্দ্র ভূমিই রোগকীটাপুর জন্ম ও বাসস্থান। সুতরাং বর্ষাকালই বগদেশে স্বাস্থ্যকর সময়। উহার পরে কার্তিক অগ্রহায়ণ ও পৌষমাসে বর্ষার জল সরিয়া গেলে চারিদিকে ম্যালেরিয়ার জর ও কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়। এই সময়টাকে যমষ্টক বলে। চলিত কথায় যমের দুয়ার খোলা থাকে বলা হয়। লোকেরা নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কলেরার মড়ক এই সময়ই সর্বাপেক্ষা বেশী। কারণ বর্ষান্তে ঢাকা জিলায় পুষ্করিণী, খাল ভোবাগুলির অবস্থা অতি জঘন্য হইয়া থাকে। নদীর স্রোতের সঙ্গে উহাদের আর বোগ থাকে না। উহাদের ধারে পায়খানা থাকে। জলে বাঁশ কাঠ প্রভৃতি পড়ে। এমন কি কোন কোন পুকুরের ধারে দুই একটা পায়খানাও দেখা যায়। লোকেরা এই জলে নিজেদের স্নান করে, - গরু কুকুর স্নান করায়, আবার এই জল পানের জন্য ব্যবহার করে; সুতরাং কলেরার প্রাদুর্ভাব হওয়া বিচিত্র কি? ইহার উপর কখন গরম হাওয়া কখনও ঠাণ্ডা হাওয়ার দ্রুপ শারীরিক অবস্থা প্রকৃতিস্থ থাকে না। ফলে

লোকেরা অতি সহজেই রোগবীজে আক্রান্ত হয়। এই কারণে শীতগ্রীষ্মের সন্ধ্যা সময় কার্তিক ও কাশ্বন চৈত্র মাসে কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়।

ঢাকা জিলায় বসন্তের মারী বিশেষ হয় না। কিন্তু এখানে যক্ষ্মা ও কাশির ব্যারাম কলিকাতা ও হাংড়া তিন্ন অত্যন্ত জিলা অপেক্ষা বেশী। ইহার কারণ অনুসন্ধান করা উচিত। আরো একটা গুরুতর কথা এই যে ঢাকা জিলায় আত্মহত্যার সংখ্যা ও হার, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের মধ্যে, অপেক্ষাকৃত অত্যন্ত বেশী। পুরুষের বিশৃঙ্খল স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করে। প্রতি বৎসর ঢাকা জিলায় ২০০ শতাধিক লোক আত্মহত্যা মারা যায়।

দুগ্ধপোষা শিশুর মৃত্যুর হারও অত্যধিক। প্রত্যেক চারিটা শিশুর মধ্যে একটা ১ বৎসর মধ্যেই মারা যায়। শিশুমৃত্যুর হার বিগত ত্রিশ বৎসর একই ভাবে চলিয়াছে। পেটের অসুখ, জর, সর্দি কাশি এবং আতুর ঘরের কুবন্দোবস্ত প্রভৃতি শিশুমৃত্যুর কারণ। তন্মধ্যে পেটের অসুখ কিছা দুধহারার রোগই সর্বপ্রধান। পৈত্রিক ও মাতৃক দুর্বলতাহেতুও কতক শিশু মারা যায়।

ঢাকা জিলায় প্লেগের ব্যারাম নাই। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে—যে সকল ইন্দুরের শরীরে প্লেগের মাছি কিছা পিশু থাকে, ঐরূপ ইন্দুর খোলার ঘরের চালে বাস করে। এখানে খোলার ঘরের সংখ্যা খুব কম, সুতরাং ঢাকা জিলায় সে ইন্দুর দেখিতে পাওয়া যায় না।

ঢাকা জিলায় বচা, জলমগ্ন, ঝড়াবাত, প্রভৃতি আকস্মিক কারণেও অপমৃত্যুর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। গরপড়তায় হাজার করা মৃত্যুর হার ২৫ হইতে ৩০ জন কিন্তু জর, কলেরা, বসন্ত ও আত্মহত্যা এইসকল কারণে মৃত্যুসংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী। তন্মধ্যে ম্যালেরিয়ার জরই সর্বপ্রধান। গত সনের সরকারী মৃত্যু তালিকায় প্রকাশ ঢাকা জিলায় হাজার করা ১৬ জন অর্থাৎ মোট মৃত্যু-



সংখ্যার অর্ধেকের বেশী অররোগে মারা গিয়াছে। আড়াই জন কলেরা রোগে, আশি জন বসন্ত রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ম্যালেরিয়া রোগে দেশ উচ্ছন্ন বাইতেছে। মাসিকগঞ্জ সবডিভিসন উহার প্রধান আক্রমণস্থল। তথায় বিগত ৪ বৎসর যাবৎ জরের প্রকোপ সর্বাধিক। ১৯০৮ সনে হাজার করা ১৬ জন, ১৯০৯ সনে ২৩ জন, এবং ১৯১১ সনে ২২ জন লোক অররোগে মারা গিয়াছে। বিগত কয়েক বৎসরে কেন ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কম ছিল তাহা অনুসন্ধান করা উচিত। ঢাকা জিলার ম্যালেরিয়াজরে মৃত্যুসংখ্যা সমগ্র প্রদেশ অপেক্ষা সামান্য কম।

জীলোকের মৃত্যুর হার কম। শতকরা ৮ জন পুরুষ বেশী মারা যায়। অর্থাৎ যে স্থলে ১০০ জন জীলোকের মৃত্যু হয় সে স্থলে ১০৮ জন পুরুষ মরে। বঙ্গদেশের দেশীয় জীলানদিগের মধ্যে মৃত্যুর হার হিন্দু মুসলমানের হার অপেক্ষা কম। কিন্তু ঢাকা জিলায় সবই সমান।

জরের হার সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় ঢাকা জিলার হাজার করা জয়ের হার প্রতি বৎসর ৩৫ হইতে ৪২। আশ্বিন—কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসেই জন্মসংখ্যা অত্যধিক। ১৮৯২-১৯০১ দশ বৎসরের গড়পরতার হিসাবে এ বিষয়টা বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। ফেব্রুয়ারীতে তিন জন (২.৯৮) মার্চে সোয়া তিন (৩.০১), এপ্রিলে পোনে তিন (২.৩১), জুলাইয়ে আড়াই (২.৩২), আগস্টে পোনে তিন (২.৭২), সেপ্টেম্বরে পোনে তিন, অক্টোবরে সাড়ে তিন (৩.৪১), নবেম্বরে সাড়ে তিন (৩.৪১), ডিসেম্বরে সাড়ে তিন (৩.৫০), জানুয়ারীতে সোয়া তিন (৩.২৫), মোট সাড়ে পঁয়ত্রিশ (৩৫.৬) অর্থাৎ মার্চ, অক্টোবর, নবেম্বর ডিসেম্বর ও জানুয়ারীতে জন্মসংখ্যা সর্বাধিক। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে মনে হয় মাঘ ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসই অত্যন্ত পণ্ডপক্ষীর জায় মাসুকের গর্ভধারণের উপযুক্ত সময়। ঐ সময় খাদ্যদ্রব্য অপেক্ষাকৃত স্থূলত

থাকে এবং সাধারণ স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। বঙ্গদেশের সর্বগ্রাসী ম্যালেরিয়া জরের প্রকোপ তখন কম থাকে। এই সময় সকলে সর্বাধিক সুখে কাটায়। বসন্তের আগমনে মল্লহিল্লোল সকলের স্বদয়ে নূতন বল, নূতন আশা, নূতন ভাব জাগাইয়া তোলে। প্রকৃতি বসন্তের অনুপ্রাণে যেন অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে। বৃক্ষগুলি মনোহর পুষ্পপত্রে সুশোভিত হয়। মনুষ্য পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ সকলেই প্রেমে বিভোর হইয়া উঠে। মহাকবি কাগিদাস “কুমার সম্ভবে” ধ্যাননিরত শিবের তপোভঙ্গ করিবার জন্য কামদেবকে পত্না রতি ও সহচর বসন্ত সহ উপস্থিত করিয়াছেন। পুষ্পবাণের আঘাতে আসক্তিহীন ধ্যাননিরন্ত মহাদেবও অস্থির হইয়াছিলেন।

বাস্তবিক বসন্ত কালেই শারীরিক ও মানসিক অবস্থা গর্ভধারণের জন্য সর্বাধিক অনুকূল থাকে। এই জন্যই আশ্বিন—কার্তিক অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে জন্মসংখ্যা সব চেয়ে বেশী। আবার জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাস স্বাস্থ্য-কর হওয়াতে ফাল্গুন ও চৈত্র মাসেও জন্মসংখ্যা বেশী। অবশিষ্ট মাসগুলি বিশেষতঃ বর্ষাকাল গর্ভধারণের পক্ষে প্রতিকূল। এখানে একটা বিবরণ অনুসন্ধান করা যাইতে পারে যে কি কারণে “পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্ঘ্যা” মন্ত্রের ব্যবস্থাকার হিন্দুশাস্ত্রমতে গর্ভধারণের অনুকূল মাসগুলি অর্থাৎ মাঘ ফাল্গুন, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাস বিবাহের জন্য বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট করিয়াছেন।

যেমন কয়েকটা বিশেষ মাসে জন্মসংখ্যা বেশী, তেমনি কতকগুলি বিশেষ স্থানেও জয়ের হার খুব বেশী। এবিষয়ে মধ্য প্রদেশ ও যুক্ত প্রদেশ ভারতে সর্ব প্রথম স্থান লাভ করিয়াছে। বিহারে মুন্সের জিলায় জয়ের হার অত্যধিক। বঙ্গদেশে ত্রিপুরা, নোয়াখালি, নদীয়া মালদহ ও মুরশিদাবাদ জিলায় জয়ের গড়পরতা সব-চেয়ে বেশী—হাজার করা ৪০ হইতে ৪৪ জন। ঢাকা জিলায় বিগত পাঁচ বৎসরে হাজার লোকের সন্তানের সংখ্যা ছেলে ১৮টি ও মেয়ে ১৭টি মোট ৩৫টি।

কম্পা অপেক্ষা পুত্রের জন্ম ও মৃত্যুসংখ্যা। এই বেনী। কলে এখানে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক পাঁচ হাজার অধিক। কলিকাতা সহরে জন্মের হার অত্যন্ত অল্প, মাত্র হাজারকরা ১৯টি। গ্রামে জন্মের হার সহরের প্রায় দ্বিগুণ। ইহার কারণ এই নয় যে সহরগুলি শিশুজন্মের প্রতিকূল স্থান কিন্তু সহরের গর্ভবতী স্ত্রীলোকেরা প্রসবের সময় গ্রামে চলিয়া যাওয়ার গ্রামের জন্মের হার বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোটের উপর ঢাকা জিলার জন্মের হার মৃত্যুর হার অপেক্ষা হাজার করা ৫—১০ জন বেনী। নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় বিশেষতঃ রায়পুরা থানায় জন্মের গড়পড়তা সবচেয়ে বেনী। আমার মনে হয় মুসলমান প্রধান স্থানগুলিতে জন্ম সংখ্যা বেনী।

স্বাস্থ্যনীতি পালন করিলে বহু ব্যাধির আক্রমণ হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, এবং জার্মান দেশীয় বিগত অর্ধশতাব্দীব্যাপী বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও স্বাস্থ্যবিবরণ আলোচনা দ্বারা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে অল্প বসন্ত কলেরা রোগগুলি নিবারণযোগ্য; অর্থাৎ এই ব্যাধিগুলি ব্যক্তিগত, কিন্তু পুরুষাভ্যুত্থিক নহে; সাবধানতা দ্বারা ঐগুলিকে অনেকাংশে নিবারণ করা যায়। কলিকাতা ও তৎনিকটবর্তী স্থানসমূহের মৃত্যু তালিকা তুলনা করলে দেখা যায় যে কলিকাতায় স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় উন্নত ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে উহার মৃত্যুর হার পার্শ্ববর্তী হাবড়া, ২৪ পরগণা প্রভৃতি জিলার হার অপেক্ষা হ্রাস পাইতেছে।

ষাট বৎসর পূর্বে ইংলণ্ডে কলেরা ও বসন্ত রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। মৃত্যুর হার প্রায় বঙ্গদেশেরই মত ছিল। হাজারকরা প্রতি বৎসর ৩০ জন লোক মারা যাইত। তখনও লন্ডনে বিশুদ্ধ পানীয়জলের ব্যবস্থা ছিল না। রাস্তার পার্শ্বে ডোবাতে পচা কুর্জুর বিড়াল দেখা যাইত। গরীব লোকেরা রাস্তার কল হইতে জল সংগ্রহ করিত। দিবসে কয়েক ঘণ্টা মাত্র কলে জল পাওয়া যাইত। এক ঘণ্টার জন্য অফিসের ঘরেরা জলসংগ্রহের জন্য

ছুটি পাইত। তখন রাস্তার কলের নিকট পাত্রহস্ত মেঘদের ভিড় জমিয়া উঠিত। টেমস্ নদীর জল এত ময়লা যে উহা দ্বারা কোন কাজ করা যায় না। অনেক কাজই কুয়ার জলে সাধিত হইত। কুয়াগুলি প্রায়ই গির্জার নিকট ছিল। গির্জাস্থিত কবরখানা হইতে গলিতপদার্থ কুয়ার জল দূষিত করিত। লোকে দূষিত জলবায়ু সেবন করিয়া আমাদেরই মত পীড়ায় ভুগিত। কিন্তু ইংরাজপ্রাতি বড় বুদ্ধিমান ও কর্মঠ। তাহারা যখনই বুঝিতে পারিল যে নানাপ্রকারে নিবারণযোগ্য ব্যারামে বহুসংখ্যক লোক মারা যাইতেছে, তখন উহারা পূর্ণউত্তমে ব্যাধিগুলি নিবারণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। উহার ফলে ইংলণ্ডের মৃত্যুহার অর্ধেক অপেক্ষাও কমিয়া গিয়াছে। এখন হাজারে ১৪ জন মারা যায়। উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যজনক বিশুদ্ধ পানীয়জল ও নির্মল বায়ু সেবনের ব্যবস্থা হেতু ইংলণ্ডে আর বসন্ত ও কলেরা রোগ দেখা যায় না। ঐগুলি তথায় শব্দবিশেষে পরিণত হইয়াছে। ইংলণ্ডের লোকেরা এখন অধিকতর সুস্থ হওয়াতে তাহাদের জীবনীশক্তি ও কার্যশক্তি অনেক বাড়িয়াছে। বিগত ৬০ বৎসরের স্বাস্থ্যবিবরণ এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা বর্তমান স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের (Hygiene) উৎপত্তি হইয়াছে। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের মূলধর্ম এই যে স্বাস্থ্যবিধিগুলি পালন করিলে লোকেরা অধিকতর সুস্থ অধিকতর কর্মঠ ও অধিকতর দীর্ঘজীবী হইবে এবং জরা অধিকতর বিলম্বে আসিবে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মেনী ও আমেরিকার লোকেরা এখন এই সকল অমূল্য ফলগুলি ভোগ করিতেছে।

আমাদের প্রাচ্যদেশে ইউরোপীয় উপনিবেশগুলির স্বাস্থ্যের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে। এডেন, মলয়, সিংহল প্রভৃতি স্থান স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের নিয়মগুলি প্রচলিত হওয়াতে তথাকার লোকের মৃত্যুর হার কমিতেছে।

আমাদের দেশে যদিও স্বাস্থ্যবিবরণ অত্যন্ত আধুনিক এবং উহা দ্বারা নিশ্চিতরূপে কোন মতের মীমাংসা করা

যায়, না, তথাপি আমাদের জানা দুই একটা দৃষ্টান্ত  
যারা দেখান যাইতে পারে যে স্বাস্থ্যবিধি পালন করিয়া  
আমরাও কলেরা বসন্ত, জ্বরোগগুলি কোন কোন  
স্থানে নিবারণ করিতে পারিয়াছি। বঙ্গদেশের মধ্যে  
নারায়ণগঞ্জ ও বরিশাল সহরে কলেরা রোগের বিশেষ  
প্রাদুর্ভাব ছিল। তথায় বিত্তপূর্ণ পানীয় জলের ব্যবস্থা  
যেহেতু কলেরার প্রকোপ বহু পরিমাণে কমিয়াছে। বিগত  
২০ বৎসরে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের কলেরায় মৃত্যুর হার  
পরকারি রিপোর্ট হইতে উল্লেখ করিতেছি।

১৮৯০ ১৮৯৫ ১৯০০ ১৯০৭ ১৯০৮ ১৯১২

ঢাকা ২.৫ ৭.০০ ২.০০ ১ ১.২৫ ৩.৫  
নারায়ণগঞ্জ ১০ ১৫.০০ ১১ ৩.৫ ১.২০ ৩.২৫

অর্থাৎ পূর্বে নারায়ণগঞ্জে কলেরায় মৃত্যুর হার ঢাকার  
চতুর্গুণ ছিল। কিন্তু ১৯০৮ এনে নারায়ণগঞ্জে জলের  
কলে বিত্তপূর্ণ পানীয় জলের ব্যবস্থা হওয়ায়, ঐ বৎসর  
হইতেই নারায়ণগঞ্জে মৃত্যুর হার ঢাকা অপেক্ষা কমিয়া  
গিয়াছে। শুনা যায় গত বৎসর জলের কল হওয়ায়  
বরিশালেও পূর্বের ত্রায় কলেরার প্রকোপ হয় নাই।  
সুতরাং বিত্তপূর্ণ জলের ব্যবস্থা যারা কলেরার আক্রমণ  
অনেক পরিমাণে নিবারণ করা যায় সে বিষয়ে আর  
সন্দেহ নাই।

বসন্তব্যারাম নিবারণ করিবার জন্ত গোবীজের  
টিকার কার্যকারিতা সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও গণনা  
যারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, বাহাদের টিকা হয় নাই  
ঐরূপ রোগীদের মৃত্যুর হার শতকরা ৫০ জনের উপর।  
বাহাদের একবারমাত্র টিকা হইয়াছে, সেইরূপ রোগীদের  
মৃত্যুর হার শতকরা ৩০-৩৫ জন। যে সব বসন্ত রোগীদের  
দুইবার টিকা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে মৃত্যুর হার  
শতকরা ৫-৭ জন। বাহাদের তিনবার কিম্বা ততোধিক  
বার টিকা হইয়াছিল তাহারা বসন্তে আক্রান্ত হইলে  
শতকরা ১ জনের ও অনেক কম মারা যায়।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি ম্যালেরিয়া জ্বরই সর্বা-  
পেক্ষা মারাত্মক। উহাতে অর্ধেক হইতে দুই তৃতীয়াংশ  
লোক মারা যায়। মেলেরিয়া জ্বর স্থানবিশেষে হয়।  
কোন কোন স্থান ইহার অগুরু ও কোন কোন স্থানে  
ইহার প্রতিকূল। ম্যালেরিয়া জ্বরের অনেক রোগী  
বৈজ্ঞানিক গিরাধ মধুপুর প্রভৃতি স্থানে যাইয়া বিশেষ ভাবে  
আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। আমি ম্যালেরিয়ার কারণ  
স্বরূপ কীটগু ও তৎবাহী মশার সম্বন্ধে আলোচনা  
করিব না। এইমাত্র বলিতে চাই যে ম্যালেরিয়া প্রধান  
স্থানগুলি মানা উপায়ে স্বাস্থ্যপ্রদ করা যায়। দুই একটা  
সামান্য দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমাদের ঢাকা সিভিল ট্রুয়িং  
হওয়ার পূর্বে 'রমণা' অত্যন্ত ম্যালেরিয়া প্রধান স্থান ছিল।  
ঐ স্থানের অধিবাসীরা বলে যে বৈশাখ মাস হইতে  
বর্ষা পর্যন্ত, চলিত কথায় যখন গজারি গাছের ফুল  
ফোটে, তখন ঘরে ঘরে লোকেরা জ্বরে ভুগিত। কিন্তু  
এখন জঙ্গল পরিষ্কৃত হওয়াতে ও জলনিকাশের ব্যবস্থা  
যারা রমণা ঢাকাসহরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর স্থান  
হইয়াছে। আমি তিন বৎসর রমণায় ছিলাম। আমার  
বাড়িতে ১২১৪ জন লোক থাকিতেন। এই তিন বৎসর  
আমাদের কাহারও জ্বর হয় নাই। অধিকন্তু তিন জন  
যাহারা ম্যালেরিয়া জ্বর নিয়া রমণার বাড়ীতে আসিয়া  
ছিলেন, তাহারা রোগমুক্ত হইয়াছিলেন।

রমণার স্বাস্থ্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে ৬৭ বৎসরে যত  
উন্নতি লাভ করিয়াছে, ঢাকায় অন্যান্য অংশ উন্নতি  
প্রভৃতি স্থান উপযুক্ত জলনিকাশের ব্যবস্থা ও জঙ্গল  
পরিষ্কৃত না করাতে সেরূপ উন্নতি হইতে পারে নাই।  
কলিকাতা নানা উপায়ে ক্রমশঃ স্বাস্থ্যকর হইতেছে।  
চতুঃপার্শ্ববর্তী স্থানগুলি অপেক্ষা কলিকাতাতে ম্যালেরিয়ার  
প্রকোপ অনেক কম।

	১৯১২	১৯০৫	১৯০১	১৮৯০
কলিকাতা—	৩.১৬	৫	৭	৮
২৪ পরগণা—	১৬	১৮.৭০	১৬	১৬

বিগত ২০ বৎসরে ২৪ পরগণা জিলার ম্যালেরিয়ার মৃত্যু হারসমভাবেই আছে কিন্তু কলিকাতা ক্রমশঃ কমিতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে আমাদেরই চেষ্টা দ্বারা ম্যালেরিয়া প্রধান স্থানগুলিকে আমরা প্রভূত পরিমাণে স্বাস্থ্যকর করিতে পারি। এ বিষয়ে গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। কিছু কিছু কার্যও আরম্ভ হইয়াছে। ডাক্তার বেক্টলি কয়েকজন দেশীয় ডাক্তার সহ মেলেরিয়া জর নিবারণ করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়া মাণিকগঞ্জ মহকুমাতে কার্য করিয়াছেন। তিনি কুইনাইন দ্বারা ম্যালেরিয়া রোগের মুক্তি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, উহার সবিশেষ ফল এখনও জানা যায় নাই। তবে গবর্ণমেন্ট বর্তমান সময়ে আরো ভাল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। কুইনাইন দ্বারা কীটগু বিনাশ করিয়া আরোগ্য করা অপেক্ষা রোগ নিবারণের ব্যবস্থা অনেক ভাল।

ম্যালেরিয়াকীটগু মশা দ্বারা মানুষের শরীরে আসে। বাহাতে মশা জন্মিতে না পারে সেইজন্য জঙ্গল পরিষ্কার এবং জননিকারের ব্যবস্থা হইতেছে। কারণ জঙ্গলেই মশা বাস করে, আবদ্ধ জলে মশা জন্মে। মশা বিনাশ করিলে ম্যালেরিয়া রোগবীজগু আর মানুষ শরীরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। গবর্ণমেন্ট স্বাস্থ্য সচিবীয় কার্যাবলীর ভার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড মিউনিসিপালিটি প্রভৃতি অর্ধ সরকারী আফিসগুলির উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। উহাদের সাহায্যে গবর্ণমেন্ট উন্নতিকর কার্য সাধন করেন। এই জন্য গবর্ণমেন্ট আংশিক ব্যয়ও বহন করেন। স্বাস্থ্যবিভাগ (Sanitary Board) সেনিটারী কমিশনারের সাহায্যে ও পরামর্শে স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করে। ইহার সমস্ত ব্যয়ভারই গবর্ণমেন্ট বহন করেন। বর্তমান সময়ে গ্রামে গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য গবর্ণমেন্ট সরকারী বেসরকারী লোকদিগের সহিত পরামর্শ করিতেছেন। স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে গবর্ণমেন্ট ও

সাধারণের উভয়ের সাহায্যই দরকার। ইংলণ্ড ফ্রান্স জার্মানী সব দেশেই গবর্ণমেন্ট ও সাধারণের সাহায্যে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে। সুতরাং আমাদেরও গবর্ণমেন্টের সহিত একযোগে কার্য করিতে হইবে। পাশ্চাত্যদেশ ও বোধে নগরীতে সাধারণের টাকাতে অধিকাংশ উন্নতি করা হইয়াছে। বম্বের ধনীগণ হাসপাতাল জলের কল প্রভৃতি হিতকর ব্যাপারের জন্য অকাতরে অর্থদান করেন। আমাদের ঢাকা জিলায় স্বনামধন্য মিটফোর্ড সাহেব হাসপাতালের জন্য, দানবীর গণি মিয়া আসামুদা নবাব সাহেবদয় জলের কল বৈদ্যুতিক আলো প্রেগ হাসপাতাল, ইতিমধ্যে প্রভৃতির জন্য অনেক টাকা দিয়াছেন। মুন্সিগঞ্জে জলের কলের খরচ ভাণ্ডারগুলির জমিদারগণ বহন করিয়াছেন। কিন্তু এই সব দানে সহরের উন্নতি হইয়াছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক, ২০ লক্ষের মধ্যে ২৮ লক্ষ লোক, গ্রামে বাস করে। গ্রামগুলি বড়ই অস্বাস্থ্যকর। ধনীগণ সহরে চলিয়া যাওয়াতে ঐগুলি হতশ্রী হইয়াছে। সুন্দর সুন্দর দীর্ঘি-গুলি ভরিয়া যাওয়ায় গ্রামে গ্রামে জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। পূর্বের তায় সমস্ত মজুর পাওয়া যায় না বিধায় ঐ পুকুরগুলির পুকোদ্ধার করা হয় না। ইহার উপর ঢাকা জিলার গ্রামগুলি অতি নীচ, সর্বদা ডিঙ্গা স্রাবস্রোতে থাকে—সুতরাং কলেরা ও মেলেরিয়ার আবাস স্থান। দেশের লোক অগ্রসর হইয়া গ্রামে বিস্তৃত পানীয় জলের উপায়, জঙ্গল পরিষ্কার ও জননিকারের ব্যবস্থা করিলে, জর বসন্ত কলেরার প্রকোপ নিবারিত হইবে। সকলেই সুস্থদেহে সুখে দীর্ঘজীবন যাপন করিতে পারিবে।

শ্রীবিলাস চন্দ্র দাস।

## বগ্নী ব্রত

( ১ )

ত্রিপুরা জেলায় চলিত কথায় এই ব্রতের নাম বগ্নী ব্রত, কিন্তু কেহ কেহ ইহাকে ভামাই বগ্নী বলিয়া থাকে। এই ব্রতের দেবী অরণ্য-বগ্নী, সুতরাং অরণ্য বগ্নীর পূজাই এই ব্রতের প্রধান অঙ্গ।

জ্যৈষ্ঠের শুক্লা বগ্নীতে অরণ্য-বগ্নীর পূজা হয়। পূজার আগের দিন পরিবারের মেয়েরা বাঁশের 'করুল' বা শালুকার (শটীর) ডিগের (ডগা) সঙ্গে ফুলের কুঁড়ি, কড়মচা, ধান, দুর্কা, গোছা গোছা করিয়া বাঁধিয়া লয়। ধানগুলি রন্ধিন কাপড়ের ছোট ছোট পুঁটুলি করিয়া গোছার সঙ্গে বাঁধা হয়, এবং হলদে রঙের সূতা ও হলদে রঙের কাপড়ই সাধারণতঃ ব্যবহার হইয়া থাকে। এই গোছাগুলিকে 'বানার' 'মোঠা' কহে।

একটা কাঠের পিঁড়ি বা জলচৌকীর উপর বগ্নী মূর্তি নির্মিত হয়। সাধারণতঃ মেয়েরাই এই বগ্নী দেবীর মূর্তি তৈয়ার করে। মূর্তিতে শিল্প জ্ঞানের একান্তই অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বগ্নী দেবীর কোলে সাতটি ছেলে, আসনে একটি গোটা কলার কাঁদি, এবং একটি মাটির বাছুর তৈয়ার করিয়া দেওয়া হয়। আবার ছুটি কাঁঠাল পাতায় কতগুলি মাটির তৈয়ারি 'শৈল' মাছের পনার সহিত কড়মচা কাটিয়া আসনে দেওয়া হইয়া থাকে। পরে আসনটি হলদে রঙের এক টুকরা নেকরা দিয়া ঢাকিয়া পাশে একটি 'বানার' 'মোঠা' রাখিয়া দেওয়া হয়।

ব্রতের দিন সকালে পরিবারের সকল স্ত্রীলোক প্রত্যেকে একটা বিচূনের (ব্যজনী) মধ্যে বানার মোঠা, আম, কলা, গোটা শুপারি লইয়া গাছ 'বেড়িতে' যায়। গাছ বেড়ার অর্থ, সূতা দিয়া গাছকে সাতবার বেড়িয়া দেওয়া। সাধারণতঃ কাঁঠালী, কাঁটাল, বাঁশ, কিংবা চেনা গাছই বেড়া হইয়া থাকে।

গাছ বেড়ার পরে সকলেই পুকুরে নামিয়া স্নান করে। একটা ঝাকিতে করিয়া বিচুন ও অন্নাক্ত সকল দ্রব্য ঝাটে লইয়া যায়। জলে-নামিয়া 'বিচুন' ধুইয়া নাভিতে জল দেয় ও 'ঝাট' করিয়া থাকে। তখন অন্নাক্ত জিনিস-গুলিও বিচূনের উপর থাকে।

স্নানের পর গাছ বেড়া হয়। তখনও গাছের উপর বিচূনের জল দিয়া 'ঝাট' করে। 'ঝাট' করার অর্থ ঝাট বলা। 'ঝাট' করার পর গাছটাকেও একটা মোঠা দিয়া আসে। এইরূপে ব্রতের পর উপযুক্ত আত্মীয় স্বজনকে পরিবারের স্ত্রীলোকেরা যথযথ রূপে 'ঝাট' করিয়া থাকে।

স্নানের পর ঝাকি সহ সকল জিনিষ বগ্নীর সম্মুখে পূজার ঘরে সাজাইয়া রাখা হয়।

গাছ বেড়ার সময় গাছের নীচে বিষ্ণুর উদ্দেশে একটি নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হয়। পরে উপযুক্ত রূপে বগ্নী দেবীর পূজা হয় \*

পূজার পর ব্রতের কথা বলিতে বলিতে মেয়েরা রন্ধিন সূতার ফুলের পাঁপড়ি, দুর্কা ও ফুলের কুঁড়ি বাঁধিয়া কতগুলি মালা গাঁধে। ব্রতের কথায় যখনই 'ঝাট' কথার উল্লেখ হয়, তখনই মালায় এক একটি গিরে পড়ে। এই রূপ মালা গাঁথাকে ঝাট, বাঁধা কহে।

( ২ )

### কথা

এক গৃহস্থ বোঁর এক ছেলে, ও ছেলের এক বোঁ। জ্যৈষ্ঠের শুক্লা বগ্নীর দিন গৃহস্থ বোঁ গাছ বেড়িতে গেল, ছেলের বোঁ বলিল, "আমি আসি।" গৃহস্থ বোঁ ধানিক ক্ষণ অপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেল। এই অবসরে ছেলের বোঁটা কলা বাগান হইতে একটা কলার 'ডিঙ্গ' নখে

\* বগ্নীঃ কনকগৌরবর্ণাং, দ্বিভুজাং, নানালঙ্কার-ভূষিতাং, বামকোড়ার্পিত পুত্রিকাং, মার্জারোপরি সংস্থিতাং, বিদ্যাবাসিনীং, কন্দমণীং।

কাটিয়া আনিল, এবং ব্রতের উপকরণের ‘আগ্’ লইয়া বেশ করিয়া খাইল। কলা পাতাটি মুড়িয়া একটা গাইকে খাওয়াইল। বাড়ীতে ‘কালী’ ও ‘ধলী’ দুটি বিড়ালী ছিল, দৈ-মাখা হাতটি এই বিড়ালী দুটিকে দিয়া চাটাইল।

শ্রাবস্তী বরে ফিরিয়া দেখিল, পূজার সমস্ত আয়োজনেরই আগ্ খাইয়া ফেলিয়াছে—তাহার মনে বড় কষ্ট হইল। বুঝিল বোঁ-ই এই কাজ করিয়াছে, তাহাকে খুব গালাগালি দিল, “ছুচি, আমি আমার যাহুরে ‘বান’ দিতে পারলাম না, দুঃখ তুই আমার বাড়ী থাক্য।” গালাগালি দিয়া বোঁকে বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দিল। বোঁ লেবু বাগানে আশ্রয় লইল। তার মৃন্দর একটি ছেলে হইল। হওয়া মাত্রই ষষ্ঠী ঠাকুরাণী মায়া করিয়া ছেলেটিকে লইয়া গেল, বোঁ মায়ার প্রভাবে কিছুই বুঝিতে পারিল না।

কয়েক দিন পরে গাইটার একটা বাছুর হইল, কিন্তু বাছুরটা পাওয়া গেল না। যে কলাগাছের ডিগ কাটিয়া আনিয়াছিল, সেই গাছটার একটা কান্দি হওয়া মাত্রই কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। ষষ্ঠী ঠাকুরাণী মায়া করিয়া সমস্ত হরণ করিয়া লইলেন।

প্রতি বৎসর ক্যেঠের শুক্লা ষষ্ঠীর দিন বোঁ এইরূপ করিতে লাগিল, এবং প্রতি বৎসরই একটি ছেলে, একটা বাছুর, এক কান্দি কলা ষষ্ঠী ঠাকুরাণী হরণ করিয়া লইতে লাগিলেন। সাত বৎসর গেল, সাতটি ছেলে ষষ্ঠী ঠাকুরাণী লইয়া গেলেন। পর বৎসর শ্রাবস্তী এত রাগিয়া গেল যে, বোঁকে গালাগালি দিয়া একেবারে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিল। “পোড়া কপালী, তোর পেটে হয় ছুঁয়ে দেখ না, যা তুই আমার বাড়ী থাক্য।”

ষষ্ঠীর ব্রতের দিন গাছ বেড়া দেখিতে দেখিতে বোঁ চলিতে লাগিল। গ্রাম ছাড়াইয়া বনে পড়িল ও বনের গথে চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে ষষ্ঠী ঠাকুরাণীর মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ষষ্ঠী ঠাকুরাণী

মন্দিরে বসিয়া আছেন—পাশে সাতটি ছেলে, সাতটি কলার কান্দি, সাতটা বাছুর। ষষ্ঠীর গায়ে ‘ধশ্ পাচড়া’। দেখিয়া বোঁ “ঐশট পাচড়াগুলি” টিপিতে ও গালিতে লাগিল। ষষ্ঠীর বড় আরাম বোধ হইল। আশ বোঁজা তোখে ষষ্ঠী বলিলেন, “আমার ঐশট পাচড়া কে গাল, আইও রাণী পুত্রবতী আইঅ।” ষষ্ঠী দেবী তিন বার এই বর উচ্চারণ করিলেন। তখন বোঁ দেবীর সম্মুখে গলবস্ত্র হইয়া বলিল, “মা, তোমার বরে আমার পুত্র আইব, কিন্তু তুমি যে আমার সাত পোলা নিছ হেইগুলি ফিরাইয়া দেও।” ষষ্ঠী চোক মেলিয়া দেখিয়া বোঁকে গালাগালি দিতে লাগিল,

“তুই ছচা খাইবি, ডগা খাইবি,

তুই কেমনে পুত পাইবি।”

অনেক অমুনয়ের পর দেবী প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, যদি তুই ‘ষাট্’ মানাইয়া নিতে পারছ ত নে। পথ্(অ) যাইতে যাইতে সাত পোলা তেইল্যার তেলের হাঁড়ি ভাঙ্গব তেইল্য বেড়া কিছু না কইব, যাইট, যাইট কইয়া কোল্(অ) লইব (এখানে ষাটের গিরো)। আউল্লার (হাল চাষী) ক্ষেত পাড়াইয়া যাইব ‘যাইট্……লইব’। এই রকম অইলে তুই পুত পাইবি।

সাত পোলারে বাড়ীত্ নিয়াই তখন তখন বিয়া করাইবি।”

ষষ্ঠীর কথা শেষ হইলে ছেলেরা বলিতে লাগিল, বাড়ীত্ গিয়াই পাটে উঠব—যা চাই তখন তা দিবা না অইলে চইল্য পড়ব। নদীর এপার থাক্য বুকের দ্বখ গাইল্য দিবা, হেই পারে আমার মুখ্(অ) পরব। ঘরু(অ) গিয়া মাসীর রাম-লক্ষণ শঙ্খ ভাইল্য ফালারাম্, মাসী কিছু না কইব, যাইট্……লইব। পিশির শারী ছিরা ফালারাম্ পিশি কিছু না কইব……লইব। তোমার শ্রাবস্তীরে এই হগল কথা জিঞ্জাসা কৈরা আইও, যদি অন্ন তবে নিভা পারবা।”

বোঁ বাড়ী আসিয়া সকল বিষয়ের উপায় ও বন্দোবস্ত

করিল। “আউল্লাকে টেকা দিল, তেইল্যা বেডারে  
টেকা দিল। ধোয়ার মাঝিরে কৈয়া রাখল, আমি যখন  
দুখ গাইল্যা দেই তখন তুমি “হেওৎ” \* দিয়া জল হিচ্যা দিবা,  
পোলার মুখে জগের কোটা পরলে কৈবা দুখ পরছে”

এক ছেলে বলিল, “আমাকে হৈলের পোনা আর  
লাল হাগের অঙ্কল পাট্ (অ) তুইল্যা দিবা।” আর  
এক ছেলে বলিল, “আমারে তপ্পা পুলি দিবা।” তৃতীয়  
ছেলে বলিল, “আমারে বার বছরের জল দিবা।”……যষ্ঠ  
ছেলে বলিল, “দিদিমার নাট কাটতে দিবা।” সপ্তম  
ছেলে বলিল, “বো আমাকে বাট্ করবে।”

গৃহস্থ-বো স্বীকৃত হইয়া ছেলে লইয়া বগীর পুরী হইতে  
বাহির হইল। চাবীর ধান ক্ষেত ভাঙ্গিল, চাবী— যাট্  
বাট্ বাঁগিয়া কোলে তুলিয়া লইল। তেলীর তেলের  
ভাঁড় ভাঙ্গিল, তেলী বলিল,

“গেছে গেছে তেলের মাইট।

তবু আমার বাইট্ বাহট্ ॥”

বো ছেলে লইয়া বাড়ী আসিল। বিবাহের আয়োজন  
হইল। ছেলেরা তখনই পাটে উঠিল। ছেলেদের কথা  
মত সকল কাজ করা হইল। দিদি মা নাকের উপর  
একটি পিঠালীর নাক বসাইয়া নাতির কাছে গেল, নাতি  
ধারাল ছুড়ি দিয়া নাক কাটিয়া ফেলিল, দিদি মা বাইট্  
বাইট্ করিলেন। সপ্তম ছেলে বলিল, “বো আমারে  
বাইট্ করুক।” বো বলিল, “স্বামীকে কে কবে বাট্  
করে— লাঙের কথা।” অনেক অত্যাচার উপরোধের  
পর বো স্বীকার করিয়া বলিল,

জিউক প্রভু কুলের নন্দন

যার পস্ সাদে পিন্দমু সিন্দুর চন্দন।”

পরে ঘট। করিয়া সকলে বগীর পূজা করিল ও  
সকলকে বান্ধা দিল। এইরূপে বগীর পূজা মর্ত্তে প্রচারিত  
হইল। ‡

শ্রীগুরুবদ্ব ভট্টাচার্য্য

\* সেচনী

‡ জিপুরা জেলায় বাট্টেরদের মধ্যে বগীর বান্ধা লওয়া  
অবশ্য কর্তব্য। আশীতিপর বৃদ্ধ আমাতা বগীর দিন  
বগীর বাড়ীতে উপস্থিত হন— প্রাপ্তি বার আনা মূল্যের  
একখানা ধূতি ও ‘বান্ধা’। লেখক।

## দোবে মহারাজ

“জীতে রহো”—পায়ের লাগি

দোবে মহারাজ।

আট্টা সাট্টা মাংকোচা

গাল পাট্টা খোঁচা খোঁচা

গর্জিত গুফের গোছা

শ্রবণে বিরাজ

গলা ভরা সোনাদানা—

মুণ্ডমালা লাজ

মোটা মোটা মস্ত মর্দ

মুণ্ডিত মস্তক অর্ধ

তালুতে সালুর ফর্দ

পালোয়ানী-তাজ

লাল লম্বা লাঠি কাঁধে

দোবে মহারাজ।

মুপ্রভাতে লোটাহস্ত

কাণে গোঁজা ডাল আন্ত

বিজয়ী জবরদস্ত

মস্ত মহারাজ।

চরণে “নাগরু” রাখে

রণে সে নারাজ।

মুছক্রে উর্ধ্বনেত্র

দোবে মহারাজ।

চানা-ছুটা-খোটা-খাত

প্রচুর পূজার পাত

প্রলয়ের ঢোল বাজ

প্রমত্ত আওরাজ।

চন্দনে চার্জিত-অঙ্গ

দোবে মহারাজ।

হামেশা হরষ চিত্ত

ন’গড়া নগদ বিস্ত



সুদেব তাগিদ নিত্য

বিঠেকড়া কাঁজ্

নিত্য নাকে নেয় নস্ত

চাবী বত চির বস্ত

“কর্কশত্র মিদং কস্ত”—

পাকা পোক্ত কাজ।

“বধোহবধঃ”—অধমর্ণ

গুয়াপানে গালপূর্ণ

কোটাভরা কড়া চূর্ণ

কটিতে বিরাজ

সন্ধ্যা হ'লে সিদ্ধিপান

ফাগুনে ফাগুর গান

“ছ্যাড়-রে-রে-”ছাড়ে তান্—

গাছারে দেবাজ

আজু রাম-রঘু বীর

আবিরে বিরাজ।

আজু,

ফাগুন আগুন হানে

জিউ কাঁদে পিউতানে

“লছমিয়া”—জাগে প্রাণে—

পিয়লপেশোয়াজ

মিঠি-মিঠি চিঠি ভেঙ্গে

দোবে মহারাজ।

ত্রীকুলচন্দ্র দে

## প্রেমের বসন্ত

( জালালুদ্দিন রুমী হইতে )

বসন্তে জনমে বাহা নিদাষ পবনে তাহা

শুক বৃন্তহীন,

প্রেমের গোলাপ ব্যাগে সুচির বসন্তে জাগে

কুটন্ত নবীন।

দেহের বায়সে ভরা

এ ভড় শীতের রাণ্যে

সবি অন্ধকার,

চির চম্বালোকে হেথা

কোয়েলে ডাকায় শুধু

প্রেমের “বাহার”।

শ্রীকালিদাস রায়।

## গ্রন্থ-সমালোচনা

### ১। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক কার্যবিধি—

শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক সঙ্কলিত এবং প্রকাশিত। ঢাকা শ্রীনাথ প্রেসে মুদ্রিত। ছাপা ও কাগজ উত্তম। ১৬৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ৯০ আনা।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে, আই, সি, এস, মহোদয় এই পুস্তকখানির ভূমিকা লিখিয়াছেন। মিঃ দে বহু বৎসর পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের সমবায়-সমিতি সমূহের রেজিষ্টার ছিলেন। ভূমিকাতে সমবায়-সমিতির উদ্দেশ্য ও উপকারিতা তিনি সূচাক্রমে এবং বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

বাংলা সাহিত্যে সমবায়-সমিতি বিষয়ক কোন গ্রন্থ এই পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। জ্যোতিশ বাবু এই পুস্তক সঙ্কলন করিয়া সাহিত্যের সেই অভাবটা মোচন করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে তিনিই এই বিষয়ে প্রথম পথ দেখাইলেন, তজ্জন্ম তিনি ধন্তবাদী। আজ ১০ বৎসর হইল সমবায়-সমিতির আন্দোলন আমাদের দেশে আরম্ভ হইয়াছে, এবং আন্দোলনের গোড়া হইতেই তিনি গভর্ণমেন্টের এই বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট। সুতরাং নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই তিনি সব লিখিয়াছেন এবং সেই জন্ত অতি বিশদভাবে তিনি বিষয়গুলি বুঝাইতে পারিয়াছেন। সমিতি সংগঠন প্রণালী, সমিতির অর্থ সংগ্রহের উপায়, সমিতির কার্য-পরিচালন-পদ্ধতি, ঋণ-দান, ঋণগ্রহণ, আমানত হিসাবপত্র রক্ষণ প্রণালী প্রভৃতি সব বিষয়ই তিনি সূচাক্রমে বর্ণনা করিয়াছেন। পরিশেষে



কয়েকটি আদর্শ সমিতির আমূল বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে এবং ইহাতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। মোটের উপর, সমবায়-ঋণদান-সমিতি বিষয়ক বহু প্রয়োজনীয় তথ্য এই পুস্তক হইতে অবগত হইতে পারা যায়। সমবায়-সমিতির আইনও এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। হী।

২। সেন্সা,—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বরিশাল শাখা কর্তৃক প্রকাশিত। এই গ্রন্থখানি বরিশালবাসীর সাহিত্যসেবার পরিচয়। তত্রত্য সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশনে পঠিত সাতটি প্রবন্ধে এই গ্রন্থের কলেবর গঠিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলির নাম ‘পরলোক,’ ‘দার্শনিক পরলোকবাদ ও আত্মার অবিনশ্বরত্ব,’ ‘জন্মাপ্তর ও কর্ম,’ ‘আত্ম-দর্শন,’ ‘আর্য্য সভ্যতার প্রাচীনতা,’ ‘অসমীয়া ভাষা,’ ‘কাব্য সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ’। প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই স্থূলিখিত। আত্ম-দর্শন প্রবন্ধে উক্ত ইংরাজি অংশের বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া উচিত ছিল। যে সকল পরিষৎশাখা দ্বারা স্বতন্ত্র পত্রিকা পরিচালিত হয় না, তাহাদের কার্য্যপরিচয় একরূপভাবে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিবার ইহাই প্রথম দৃষ্টান্ত। ইহাতে সম্পাদক দেবকুমার বাবুর সাহিত্যের উন্নাতকল্পে নুতন উপায় উদ্ভাবন করিবার শক্তির আরও একটি পরিচয় পাইলাম। তবে বরিশাল শাখার আর্থিক অবস্থার যে পরিচয় কার্য্যবিবরণীতে দেখা যায়, তাহাতে পুস্তকখানির ছাপা ও কাগজের উন্নতি বাঞ্ছনীয়।

৩। অল্পতুল্যতা,—শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১০ আনা। অতুল বাবু এক শ্রেণীর গ্রন্থ রচনায় যথার্থ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। বালকবালিকারা বাহাতে হিন্দু রীতিনীতি ও পুরাতন পুণ্যকাহিনীগুলির সহিত সুপরিচিত হইয়া উঠে, তজ্জন্ম অতুল বাবু অনেকগুলি গ্রন্থই রচনা করিয়াছেন। যথোপযুক্ত ভাবে পরিবর্জন ও দেবতা-বিষয়ক গুণোদ্ভাসিত সংযোজন দ্বারা

এই শ্রেণীর গ্রন্থের কার্য্যকারিতা ও উপাদেয়ত্ব বৃদ্ধি করিয়া অতুল বাবু তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলিকে এই শ্রেণীর বাঞ্ছনীয় গ্রন্থগুলির শ্রেষ্ঠ স্থানে বসাইয়াছেন। এই গ্রন্থখানির বাহ্য দৃশ্যও সরল সৌন্দর্য্যে মনোহারী হইয়াছে।

৪। সনেট পঞ্চাশত,—শ্রীপ্রথম চৌধুরী প্রণীত। মূল্য আট আনা। সনেট বলিলে যে ছোট কবিতা বুঝায়, কেবল চতুর্দশপদী বলিলে সেই অর্থ প্রকাশিত হয় না। এই চৌদ্দটি পংক্তিতে মিল ও ভাবগুলি এক বিশেষ বাধাবাধি নিয়মে সজ্জিত থাকে। বাঙ্গলা ভাষায় রচিত চতুর্দশ পংক্তির কবিতাগুলি অনেক সময়ই সনেট হয় না। চৌধুরী মহাশয় ইটালীয় কবি পেত্রার্কার ধরণে লিখিত এই সনেটগুলি প্রকাশিত করিয়া নব্য কাব্যশঃপ্রার্থীগণের জন্য একটি প্রয়োজনীয় আদর্শের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সনেট কয়টির পুনঃ পুনঃ পর্যালোচনা করিলে, বাহ্যরূপ ও অন্তরবস্ত এই উভয়ের সামঞ্জস্য গঠিত সনেটের প্রকৃতি সঘনো স্থির ধারণা জন্মিবে। সনেট পঞ্চাশতের অনেক সনেটেই পেত্রার্কার সনেটের ভাবের জোয়ার ভাঁটার পরিচয় পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ‘বাঙ্গালার যমুন’ কবিতাটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ‘বীরবলের’ ত্রায় সাহিত্য-রসিকের সম্মুখে যতপ্রকাশ হৃৎসাহসের কার্য্য। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, ভাবের এই অগ্রসার ও পুনরাবর্তনের প্রকাশে ক থ থ ক, ক থ থ ক, গ ব ও, গ ব ও, এইরূপ মিল গঠিত আদর্শের সনেটই সম্যক উপযুক্ত এবং এই আদর্শের সনেটই শিক্ষার্থীর অধিক উপকারে আসিত। নবম ও দশম পংক্তিতে মিল দিলে, ‘বীরবলের’ ত্রায় ত্রুকোশলী শিল্পীর হাতে না পড়িলে শেষের চারি লাইন ছাড়া ছাড়া বোধ হইবে, এবং সনেটের প্রকৃতি ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইবে।

অ।

## ময়মনসিংহ জেলার কতকগুলি প্রাচীন কীর্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ \*

(ঐযুক্ত রমনীমোহন দাস এম্ এ মহাশয়ের ইংরাজি নোটস্  
হইতে সংগৃহীত।)

### গড়জরিপার দুর্গ

(১)

ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমার অন্তর্গত  
টাউন সেরপুর নামক স্থানের ৮ মাইল উত্তরে  
গরজরিপায় একটি মুসল্ল দুর্গের উল্লেখ আছে।  
ইহাতে স্থাপত্যবিদ্যার বাহাদুরি বিশেষ কিছু নাই,  
কিন্তু ইহা আকারে অতি বৃহৎ। তিনটি প্রাচীর এই  
দুর্গটিকে বেষ্টিত করিয়া ছিল। সকলের বাহিরের প্রাচীর  
ও মধ্যের প্রাচীরের অভ্যন্তরে একটি পরিখা এবং  
মধ্যের প্রাচীর ও সকলের ভিতরের প্রাচীরের মধ্যে  
আর একটি পরিখা। দুর্গের চারিদিকে চারিটি দ্বার।  
পূর্বের দ্বারের নাম “কামদুয়ারী”; পশ্চিমেরটির নাম  
“পানিদুয়ারী”; দক্ষিণেরটির নাম “শ্রামশেখরদুয়ারি”  
এবং উত্তরেরটির নাম “খিরকিদুয়ারী”। পানিদুয়ারির  
পাশে দুইখানি প্রঃর পড়িয়াছিল; সম্ভবতঃ উহা ঐখানের  
দুয়ারের অংশবিশেষ। উহা ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই  
জুনের ভূমিকম্পে মৃত্তিকায় প্রোথিত হইয়া গিয়াছে।  
ভিতরের পরিখার দক্ষিণ ও পশ্চিমস্থ অংশদ্বয়ের মধ্যে  
নৌকার আকৃতি একটা দ্বীপ ছিল; উহাকে “ডিকা”  
বা “কোবা” বলিত। পূর্বোক্ত ভূমিকম্পে উহাও  
লুপ্ত হইয়াছে। দুর্গ মধ্যে অনেক গুলি দীঘি ছিল;  
তন্মধ্যে “মতিমিঞার তালাও” নামক দীঘিটি বিশেষ  
পরিচিত। দীঘিগুলি এখন প্রায় ভরিয়া গিয়াছে।

ভিতরকার প্রাচীর দ্বারা ১, ১৭০ বিঘা ভূমি পরি-  
বেষ্টিত। এই প্রাচীর এখন নানাস্থানে ভাঙ্গিয়া পড়ি-  
য়াছে। মাপিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহার উচ্চতা  
সকল স্থানে সমান নহে। উচ্চতা ২৫ ফুটের কম  
কোথাও নয়; ৪০ ফুট পর্য্যন্তও আছে। পরিবেষ্টিত

স্থানের দৈর্ঘ্য মুনপক্ষে ৭০ ফুট, অধিক পক্ষে ৮০ ফুট।  
এই প্রাচীরটির পরিধি ৩৬ মাইল। যে সব পরিখা  
এখনও আছে, মাপিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহাদের বিস্তার  
১৫০ হইতে ৩০০ গজ পর্য্যন্ত।

কথিত আছে যে, প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্বে দীলিপ  
নামক একজন সর্দার এই দেশে রাজ্য স্থাপন করিয়া  
গারো এবং অত্যাশ্চর্য পর্বতবাসিগণের উপদ্রব হইতে  
আশ্রয়ক্ষার জন্য এই দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন।  
কিরোজ শাহ রাজত্বকালে (১৩৫১-৮৭ খৃঃ অঃ) মজলিস-  
শাহ মামুন নামক এক সেনাপতি দীলিপ সামন্তকে হত্যা  
করিয়া তাঁহার রাজ্য ও দুর্গ অধিকার করেন। তদবধি  
গড়জরিপায় মুসলমানেরাই রাজত্ব করেন। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে  
যখন কুচবেহারের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের সহিত তাঁহার  
প্রতিদ্বন্দ্বী পটকানোয়ারের বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন  
বঙ্গের শাসনকর্তা মানসিংহ কিছুকাল এই গড়জরিপার  
দুর্গে বাস করিয়াছিলেন। দুর্গমধ্যে মজলিস শাহ মামুনের  
সমাধি-প্রস্তর-লিপি এখনও আছে। ঐ সমাধি-শিরে  
আর একখানি প্রস্তর ছিল। উহাতে তাজা আরবি  
অক্ষরে একলিপি উৎকীর্ণ ছিল। সেরপুরের ভূতপূর্ব  
জমিদার বাবু হরচন্দ্র চৌধুরী ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে উহা  
এসিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়মে প্রেরণ করেন।  
ব্রহ্মদেব সাহেব উহার যে ইংরেজী অনুবাদ করেন, নিম্নে  
তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল।

“করুণাময় ভগবানের নাম স্মরণ করিতেছি। এক  
ঈশ্বর ব্যতীত আর দেবতা নাই; মহম্মদ সেই ঈশ্বরের  
দূত (prophet.) \* \* \* হে ঈশ্বর, মহম্মদকে দয়া  
করুন; এবং ভগবানের মনোনীত আলি এবং পবিত্র-  
জন্ম কতেমা এবং \* \* \* হোসেন এবং \* \* \* হাসেন  
তাঁহার আশিষ প্রাপ্ত হউন। \* \* \* এই কালের  
নরপতি শেইফল দোনেজা ওয়াদিম আবদুল ফেরোজ শাহ  
আদেশে নিম্নিত। ভগবানের ইচ্ছায় তাঁহার রাজ্য ও  
রাজত্ব চিরস্থায়ী হউক। পবিত্র রমজানের ৮ তারিখে

এই খিলান সম্পূর্ণ করা হইল।”

প্রস্তর-ফলকখানির পাঠ সর্বত্র উদ্ধার করা যায় না; কতগুলি শব্দ কালবশে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। ফলকখানি ৪ ফুট লম্বা, ২ ফুট প্রশস্ত। ফলকের চারি কোণে চারিটি ক্ষুদ্র চতুর্ভুজ মধ্যে খলিকাকুলের প্রথম চারি জনের এক এক জনের নাম উৎকীর্ণ আছে। বামের দুই চতুর্ভুজ এবং দক্ষিণের দুই চতুর্ভুজ এক একটি লম্বরেখা দ্বারা সংযুক্ত, এই লম্ব রেখার গায়ে কিছু লেখা আছে; কিন্তু উহা একেবারেই পড়া যায় না। এলিগাটিক সোলাইটিতে পাঠাইবার কিছুকাল পূর্বেও ফলকখানি আচ্ছাদিত ছিল; কিন্তু অব্যবহিত পূর্বে একটি হস্তী উহার উপর পদ স্থাপন করায় উহা দুই খণ্ডে ভাঙ্গিয়াছে। ব্রহ্মা-ন্যাস সাহেব যে লিপির অনুবাদ করিয়াছেন, আরবি ভাষায় উহা চারি ছত্র মাত্র।

ভিত্তিকার প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থান অনেকদিন হইল সেরপুরের জমিদার রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুরের নিজস্ব ভোগাধিকারে আছে। ঐ প্রাচীরের বহির্ভাগের জমি গভর্ণমেণ্টের খাসদখলে; উহাও সম্প্রতি উক্ত রায় বাহাদুরকে বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রাচীরের অনেক স্থান পড়িয়া গিয়াছে ও বৃষ্টির জলে ধুইয়া গিয়াছে। ঐ স্থানের উপর এখন প্রকারা ঘরবাড়ী করিয়াছে। পরিখাগুলির অধিকাংশ স্থান ভরিয়া গিয়াছে এবং তথায় চাষ হইতেছে। সমস্ত দুর্গের স্থানের পরিমাণ ৩,৩০০ বিঘা; উহাতে এখন ১২০০ খৃঃ (অঃ) শতাব্দিক হিন্দু ও মুসলমান পরিবার বাস করিতেছি।

(২)

কিশোরগঞ্জের লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির।

কিশোরগঞ্জের এই মন্দিরের ৩১ টি চূড়া। ইহার

সংলগ্ন অত্যন্ত গৃহগুলির নাম জলটঙ্গি (গ্রীষ্মাবাস) রাসবাড়ী, দুর্গাবন্দ্রি এবং শিবমন্দির। ইহা ব্যতীত আরো কয়টি ক্ষুদ্র গৃহ আছে।

যখন এ প্রদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মসজিদের ব্যবসা খুব চলিতেছিল, সেই সময়ে ব্রজকিশোর পরাম্বাণিক নামক এক ব্যক্তি কিশোরগঞ্জে অত্যন্ত সমৃদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ইনি ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মীনারায়ণের এই মন্দির এবং তৎসংলগ্ন গৃহগুলি নির্মাণ করান। তিনি ভিন্ন চারিটি দীঘিও খনন করান। ইহার একটি ২৬০ গজ লম্বা এবং ১৪০ গজ প্রশস্ত। এইটি লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরের পূর্বদিকে অবস্থিত। কথিত আছে যে, যে উনসত্তরের মন্বন্তরে বাল্মীকির এক তৃতীয়াংশ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে, সেই মন্বন্তরের সময় লোকদিগকে কেবল মাত্র আহার দিয়া তাহাদের দ্বারা এই দীঘিগুলি খনন করান হইয়াছিল।

পূর্বোক্ত জলটঙ্গি গৃহ তৃতল; উহা পূর্বোন্নিখিত বড় দীঘির মধ্যস্থলে নির্মিত। লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির এবং তৎসংলগ্ন গৃহগুলি ২,২১৬ বর্গফুট স্থান ব্যাপিত ছিল। সবগুলি গত ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুনের ভূমিকম্পে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। মন্দিরের এক উচ্চস্থানে একখানি প্রস্তর ফলকে সংস্কৃত শ্লোক লিখিত ছিল; উহা এখন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে প্রোথিত।

ক্রমশঃ

শ্রীবিজ্ঞান নাথ নিরোগী।



৪র্থ বর্ষ

জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

২য় সংখ্যা

## অন্ধ্র নৃপতিগণের কালনির্ণয়

(ঢাকা সাহিত্য পরিষদে পঠিত)

রাণা শালিবাহন এই নাম আমাদের দেশে অনেকের নিকটই সুপরিচিত। ইহার সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের পরাজয়-সাধন, এবং শকজাতীয় আক্রমণকারীদেরকে পরাভূত করিয়া শকাব্দ প্রতিষ্ঠাই সমধিক প্রসিদ্ধ। কিন্তু ঐতিহাসিকগণের অমূল্যজ্ঞান ও বিচার-ফলে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, শালিবাহন বস্তুতঃ কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে, একটি রাজবংশের উপাধি মাত্র। ইতিহাসে ও পুরাণে যে পরাক্রান্ত রাজবংশ অন্ধ্ররাজবংশ নামে বিখ্যাত তাহারই অপর নাম শাতবাহন, এবং এই শাতবাহন শব্দই কালক্রমে লোক-মুখে শালিবাহনে পরিণত হইয়াছে। কালক্রমে আরও একটি পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে। শাতবাহন বা শালিবাহন যে কোন রাজবংশের নাম লোকে তাহা বিশ্বস্ত হইয়াছে, এবং উক্ত বংশের কার্যকলাপ সমুদয় শালিবাহন নামধেয় কোন ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারাই অঙ্কিত হইয়াছিল এই ধারণা লোক-সমাজে বদ্ধমূল হইয়াছে। বস্তুতঃ, শালিবাহন রাজ্যের সম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে তাহার অধিকাংশই মোটামুটি অন্ধ্রবংশের সম্বন্ধে প্রযুক্ত।

সকলেই জানেন ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে রাজবংশের কালনির্ণয় একটি বিষম সমস্যা। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় পুরাণ প্রভৃতি হইতে কয়েকটি মূল-স্থত্র পাওয়া যায়, এবং তদবলম্বনে এই কার্য অনেক সহজ-সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। বায়ু, মৎস্য, বিষ্ণু, ভাগবত, এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের শেষভাগে ভবিষ্যবর্ণন বলিয়া একটি অধ্যায় আছে। তাহাতে উত্তরকালে মগধে কোন বংশ কত কাল রাজত্ব করিবেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সুপ্রসিদ্ধ মৌর্য বংশ ১৩৭ বৎসর রাজত্ব করেন, তৎপরে শূন্য ও কাশ্যবংশ যথাক্রমে ১১২ ও ৪৫ বৎসর রাজ্য শাসন করিলে মগধ রাজ্য অন্ধ্রগণের হস্তগত হয়। মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত আলেকজান্ডারের সমসাময়িক, সুতরাং এই অন্ধ্রগণ যে-প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষের মধ্যে একটি সুপ্রসিদ্ধ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন তাহা দৃষ্টব্যে কোন সন্দেহ নাই; কারণ সুপ্রাচীন ঐতরের ব্রাহ্মণে ইহাদের উল্লেখ আছে। পরবর্তী কালে এই রাজবংশ ভারতবর্ষের ইতিহাসে কিরূপ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন তাহা ইতিহাসের পাঠকবর্গ অবগত আছেন, কিন্তু তথাপি সর্বসাধারণের নিকট ইহার তত সুপরিচিত নহেন, ইহা ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য। আমার মূল বক্তব্য বলিবার পূর্বে অন্ধ্রজাতির প্রসিদ্ধি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া লইলে সমগ্র বিষয়টি সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা হওয়ার সম্ভাবনা, এই

## প্রতিভা

বৈষ্ঠ ১৩২১

নিম্নে নিম্নে অতি সংক্ষেপে সুপরিচিত হইলেও তাঁহাদের সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ কথা লিপিবদ্ধ হইল।

প্রথমতঃ, রাষ্ট্রীয় শক্তি হিসাবে দেখিতে গেলে অন্ধ্র গণের সম্বন্ধে দুইটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত। প্রাচীনকাল হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আর্য্যাবর্ত বাসীগণই দাক্ষিণাত্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, রামায়ণ-মহাভারতের সাহিত্য হইতেও ইহা জানা যায়, এবং সুপ্রসিদ্ধ মৌর্য্যবংশের ইতিহাসও ইহার প্রধান সাক্ষী। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রশক্তিসম্বন্ধে মধ্যে অন্ধ্রগণই প্রথমে আর্য্যাবর্ত পর্য্যন্ত স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া এই চির প্রচলিত প্রথার পরিবর্তন সাধন করেন। আমাদের দিক হইতে দেখিতে গেলে ইহা অগৌরবের বিষয় বটে, কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের দিক হইতে বিচার করিলে ইহা একটি সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা বলিতে হইবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশসমূহে যে আশ্চর্য্য সমাজগত ও ধর্ম্মগত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এই রূপ ঘটনা তাহার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল ইহা আমরা কল্পনা করিতে পারি। বর্তমান পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্য কেবল আর্য্যাবর্তের রাষ্ট্রশক্তির নিকট পরাভূত হইয়াই আসিতেছিল, ততদিন উভয়ের মধ্যে “ঐক্যজিত বিবর্তন” বিদূরিত হইয়া সম্পূর্ণ ঐক্য সাধনের পক্ষে বিষয় অন্তরায় বর্তমান ছিল। কিন্তু অন্ধ্র গণ যখন নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন করিলেন যে, রাষ্ট্রীয় শক্তি হিসাবেও দাক্ষিণাত্য উপহাসের স্থল নহে, তখন এই বাধা দূর হইয়া মিলনের পথ সুপ্রশস্ত হইল। বর্তমান কালের রুশ-জাপান যুদ্ধ এবং পরবর্তীকালে জাপানের সহিত ইউরোপের সখ্যতা ইহার তুলনীয় ঘটনা।

দ্বিতীয়তঃ, যে সময়ে অন্ধ্র রাজগণ দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করেন সেই সময়েই পদ্মপালের দ্বারা বিদেশীয় শত্রু ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। কাশ্মীর হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশ গ্রীক, শক পার্শ্বিক প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত হয়; এবং ইহার দাক্ষিণাত্যেও অগ্রসর হইতে

এই সঙ্কট সময়ে অন্ধ্র বীর গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি থাকে। ইহাদের গতিরোধ করেন, এবং দাক্ষিণাত্য হইতে বিতাড়িত করিয়া মালব ও গুজরাটে ইহাদিগকে পরাভূত করেন। এই অন্ধ্র রাজগণের বাহুবলে বহুকাল পর্য্যন্ত বিদেশীয় আক্রমণকারীগণ দাক্ষিণাত্যে প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই। ইহাও এ স্থলে বল কর্তব্য যে, এই বিদেশীয়গণের হস্ত হইতে দাক্ষিণাত্য রক্ষা করিতেই শেষ অন্ধ্র রাজগণের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হয়, এবং ইহারই ফলে তাঁহাদের ধ্বংস সাধন হয়। যদিও শকজাতি তখন দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিল, তথাপি তাহাদের প্রথম প্রবল বেগ প্রতিহত হওয়াতে তাহারা অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। এই হিসাবে অন্ধ্র রাজ গৌতমীপুত্রকে আক্ষা ক্রাসের চালস্ মাটেলের সহিত তুলনা করিতে পারি।

তৃতীয়তঃ, অন্ধ্র রাজগণের যুদ্ধের উপর অর্থবণোত অধিত আছে; ইহা হইতে জানা যায় যে, তাঁহারা প্রবল নৌশক্তিরও অধিকারী ছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইহা একটি স্মরণীয় ঘটনা।

ধর্ম্ম এবং ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও অন্ধ্রগণের প্রাধান্ত স্বীকার করিতে হইবে। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষ প্রবল ছিল। কিন্তু গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি এই বৌদ্ধ বিপ্লবের হস্ত হইতে ব্রহ্মধর্ম্মের ক্ষমতা অব্যাহত রাখিতে বহুপরিকর হইয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মকে উৎসীড়িত করেন নাই, কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বাহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম কণ্টকিত করিয়াছিলেন। বর্তমান কালের হিসাবে তাঁহার এই চেষ্টা প্রশংসনীয় কি না বর্তমান প্রবন্ধ তাহার বিচার করিবার স্থল নহে; কিন্তু বর্তমানে বাহাকে আমরা হিন্দুধর্ম্ম বলি, তাহার নিমিত্ত আমরা অন্ধ্রগণের নিকট কি পরিমাণ ঋণী তাহাই দেখান আমাদের উদ্দেশ্য।

অত্যাধিক বিষয়েও অন্ধ্র গণের বিশেষ প্রাধান্ত পরিলক্ষিত

হয়। হর্ষচরিত প্রণেতা কবি বাণভট্ট যে সপ্তশতী গ্রন্থকে নীতিমালার অক্ষর ভাণ্ডার বলিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, তাহাও অক্ষরাজ্য হাল-বিরচিত। এই অক্ষরাজ্য-সভাতেই কাতন্ত্র ব্যাকরণ ও বৃহৎকথা লিপিবদ্ধ হয়।

“পেরিপ্লাস অব দি এরিথ্রিয়ান সি” নামক গ্রন্থ ও টলেমি লিখিত বিবরণ হইতে ইউরোপ আফ্রিকার সহিত দাক্ষিণাত্যের যে বিপুল বাণিজ্য সমৃদ্ধির বিবরণ পাওয়া যায় তাহাও এই অক্ষরাজ্যের রাজ্যকালের ঘটনা।

এই অক্ষরাজ্যগণের সময়ে “নিগম সভা” প্রকৃতি দ্বারা ভারতবর্ষের নগরী-সমূহ স্বায়ত্ত-শাসন উপভোগ করিত। যে ব্যাঙ্ক প্রথা ( Banking system ) ইউরোপে সমুদ্ভূত বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস এই অক্ষরাজ্যে আমরা তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাই। গন্ধবণিক বা তৈলবণিকের ব্যাঙ্কে লোকে টাকা জমা রাখিত এবং প্রতি বৎসর বখা নিয়মে ইহার সুদ হইতে ধর্মকার্য্য সকল নির্বাহ হইত। এতদ্ব্যতীত শিল্পকলারও এই সময়ে সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল।

যে অজস্রা গুহা লইয়া আজ আমরা পৃথিবীর সমক্ষে গর্জ করি তাহা অক্ষরাজ্যগণ কর্তৃক আরম্ভ হয়। কাণেড়ীর যে চৈত্যা মন্দির কারুকাকার্যের কুশলতার ফাণ্ডেশন ও বার্গেশ সাহেবের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল তাহাও এই সময় নির্মিত। এই অক্ষরাজ্যগণের রাজ্যকালে নির্মিত সুন্দর শিল্পকলাশোভিত শত শত বিচিত্র গুহা-মন্দির সকল এখনও সগর্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া ইহাদের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

এ বিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্য। যতদূর বলা হইয়াছে আশা করি তাহাতে সকলের মনেই এই ধারণা বদ্ধমূল হইবে যে, অক্ষরাজ্যের ইতিহাস ভারতবর্ষের পক্ষে নগণ্য নহে।

এই অক্ষরাজ্যীয় রাজ্যগণের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। প্রথমে তাহার কোন

সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন ইহারই আলোচনা করিব।

মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাকাল খৃঃ পূঃ ৩২১ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। পুরাণোক্ত উল্লিখিত বর্ণনা অনুসারে ইহার ( ১০৭ + ১১২ + ৪৫ ) = ২৬৪ বৎসর পরে, ( অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ২৭ অব্দে ) কাশ্যবংশের ধ্বংস ও অক্ষরাজ্যের অভ্যুদয় বলিয়া নিরূপিত হয়।

এই হিসাবে অক্ষরাজ্যের উৎপত্তি কাল খৃঃ পূঃ ২৭ বর্ষে বলিয়া অনুমিত হয়। এসম্বন্ধে কোন গোলযোগ থাকিত না। কিন্তু যেরূপ ঐতিহাসিক প্রমাণাবলী পাওয়া যায় তাহাতে আপাততঃ পুরাণোক্ত এই কাহিনী ভ্রান্তিমূলক বলিয়াই বোধ হয়। এ সম্বন্ধে দুই একটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি।

১। পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, অক্ষরাজ্য ৪৫৭ বৎসর রাজত্ব করেন। যদি ইহাদের উৎপত্তি কাল খৃঃ পূঃ ২৭ বর্ষ ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে ইহার ৪৩০ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন এইরূপ অনুমিত হয়। কিন্তু ইহার অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বে মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত দিখিজরে বহির্গত হইয়া প্রায় সমুদয় ভারতবর্ষ জয় করেন। এলাহাবাদ গুপ্ত ( অশ্বশাসন ) লিপিতে তৎকর্তৃক বিজিত রাজ্য-সমূহের যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে তন্মধ্যে অক্ষরাজ্যের কোন উল্লেখ নাই। এতদ্ব্যতীত অগাধ প্রমাণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ৪৩০ খৃঃ অব্দের বহু পূর্বেই অক্ষরাজ্যের রাজ্য শেষ হইয়াছিল।

২। পুরাণে অক্ষরাজ্যের প্রত্যেক রাজার যে রাজত্বকাল দেওয়া হইয়াছে তদনুসারে, উক্ত বংশের অগ্রতম রাজা গৌতমীপুত্র শতকর্ণি এই বংশ প্রতিষ্ঠার ৩০৫ বৎসর পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন। যদি এই বংশের প্রতিষ্ঠাকাল খৃঃ পূঃ ২৭ বর্ষে ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে গৌতমীপুত্রের রাজ্যাভ্যাস কাল ২৭৮ খৃঃ অঃ স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু আমরা জানি যে, গৌতমীপুত্র শতকর্ণপ নহণনের সমসাময়িক ছিলেন, এবং সুবিখ্যাত ভৌগোলিক টলেমি

তৎপুত্র পুলুমারীর উল্লেখ করিয়াছেন। নহপনের রাজ্য-কাল ১২৪ খৃঃ অব্দ এবং টলেমি আনুমানিক ১৫০ খৃঃ অব্দে উক্ত পুস্তক লিপিবদ্ধ করেন। সুতরাং গৌতমীপুত্রের রাজ্যকাল ১২৪ ও ১৫০ খৃঃ অব্দের মধ্যবর্তী। অতএব ২৭৮ খৃঃ অব্দে তাঁহার সিংহাসনারোহণ অসম্ভব।

এতদ্ব্যতীত আরও প্রমাণ দ্বারা দেখান যাইতে পারে যে, খৃঃ পূঃ ২৭ বর্ষে অন্ধ্রগণ রাজ্যলাভ করেন বলিয়া যে পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে তাহা আপাতদৃষ্টিতে ভ্রমাত্মক বলিয়াই বোধ হয়।

এমতাবস্থায় অন্ধ্ররাজগণের রাজ্যকাল নিরূপণে দুইটি বিভিন্ন পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে। ইউরোপীয়গণ পুরাণের বর্ণনায় কোন আস্থা স্থাপন না করিয়া স্বাধীনভাবে অন্ধ্র-গণের কাল নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহাদের মতে, মহারাজ অশোকের মৃত্যুর পরেই মৌর্য সাম্রাজ্য হীনবল হইয়া পড়ে; সুতরাং ইহাই সম্ভব যে, তৎকালে প্রাক্তরাজ্যসমূহ মৌর্যরাজগণের অধীনতাশাশ্বত হইতে ভিন্ন হইয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিল। এই যুক্তি অনুসারে আঃ খৃঃ পূঃ ২২০ বর্ষে ইহারাজ অন্ধ্ররাজ্যের আরম্ভকাল বলিয়া নির্ণয় করেন।

ডাক্তার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর এ বিষয়ে অল্প পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ইউরোপীয়গণের দ্বায় তিনি পুরাণোক্ত বর্ণনা একেবারে অগ্রাহ্য না করিয়া তাহার সামঞ্জস্য বিধানের যত্নপর হইয়াছেন। ১৮৭৪ সালে ভিয়েনানগরে প্রাচ্য মহাসম্মিলনের (Oriental Congress) অধিবেশনে তিনি প্রথমে তাঁহার মত প্রতিপাদন করেন; পরে উহাই সুসংস্কৃত আকারে তাঁহার সুবিখ্যাত “দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে” স্থান লাভ করিয়াছে।

পুরাণ অনুসারে অন্ধ্রবংশে ৩০ জন রাজা ছিলেন, এবং তাঁহার ৪৫৭ বৎসর রাজত্ব করেন। কিন্তু বায়ুপুরাণে একটি শ্লোকাঙ্কে লিখিত হইয়াছে যে, “অন্ধ্রা ভোক্ত্যন্তি বসুধাং শতে যে চ শতং চ বৈ”। ইহা হইতে জানা যায় যে, অন্ধ্রগণ তিন শত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন এইরূপ একটি

প্রবাদও পূর্বে প্রচলিত ছিল। বায়ুপুরাণে অন্তর্ভুক্ত লিখিত হইয়াছে যে, ৩০ জন অন্ধ্ররাজ ৪১১ বৎসর রাজত্ব করেন। এতদ্ব্যতীত বায়ুপুরাণে যে রাজগণের নামের তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ১৭ জন মাত্র রাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তাঁহাদের রাজ্যকালের সমষ্টি ২৭২ বৎসর।

ডাক্তার ভাণ্ডারকর এই সমুদয় পর্যালোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, অন্ধ্রগণের রাজ্যকাল সম্বন্ধে পুরাণে দুইটি বিভিন্ন প্রবাদ দৃষ্ট হয়। প্রথম প্রবাদ অনুসারে এই বংশের ৩০ জন রাজা ৪৫৭ বৎসর রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় প্রবাদ অনুসারে ১৮ কি ১৯ জন রাজা ৩০০ বৎসর রাজত্ব করেন। আমরা জানি যে, অন্ধ্রগণের দুইটি বিভিন্ন রাজধানী ছিল যথা, প্রতিষ্ঠান ও ধনকটক। ভাণ্ডারকরের মতে অন্ধ্রবংশীয় রাজা ধনকটকে রাজত্ব করিতেন, এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী প্রতিষ্ঠানপুরীতে প্রতিনিধিক্রমে শাসন করিতেন। পরে রাজার মৃত্যু হইলে তিনি ধনকটকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতেন, এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী প্রতিষ্ঠানপুরীতে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইতেন। ভাণ্ডারকর বলেন যে, বায়ুপুরাণে কেবলমাত্র ধনকটকে যাঁহারাজ রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম ও রাজ্যকাল লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সমুদয় পুরাণে ৩০ জন অন্ধ্ররাজ ৪৫৭ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া যে প্রবাদ লিখিত আছে তাহা ধনকটক ও প্রতিষ্ঠান এই উভয় স্থানের রাজগণের নাম ও তাঁহাদের রাজ্যকালের সমষ্টি মাত্র। প্রতিষ্ঠান পুরীর অনেক রাজপ্রতিনিধি ধনকটকের রাজার পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা কখনও ধনকটকে রাজা হন নাই, এবং তাঁহাদের নাম ও রাজ্যপরিমাণ এই কারণে বায়ুপুরাণের তালিকাভুক্ত হয় নাই। এই জন্যই বায়ুপুরাণের মতে রাজসংখ্যা ১৮ ও রাজত্বকাল ৩০০ বৎসর, এবং পুরাণোক্ত সাধারণ প্রবাদ অনুসারে রাজ-সংখ্যা ৩০ ও রাজত্ব-পরিমাণ ৪৫৭ বৎসর।



ভাণ্ডারকর মহাশয় যখন উপরোক্ত মত লিপিবদ্ধ করেন তখন ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ পুরাণোক্ত কাহিনীতে কোনই আস্থা স্থাপন করিতেন না। এই জন্তই ভাণ্ডারকর মহাশয় পৌরাণিক বর্ণনার সামঞ্জস্য দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এবং এই হিসাবে তাঁহার চেষ্টা নিতান্ত সন্মানার্থ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তিনি যে মতবাদ প্রচারিত করিয়াছেন আমরা তাহা গ্রহণ করিতে অক্ষম। এ বিষয়ে কয়েকটি মাত্র সাধারণ আপত্তির উল্লেখ করিব।

১। ডাক্তার ভাণ্ডারকরের সমগ্র মতবাদের প্রধান ভিত্তি এই যে, প্রতিষ্ঠানপুরী ও ধনকটকে অন্ধ রাজবংশের দুইটি বিভিন্ন রাজধানী ছিল, এবং একই সময়ে এই দুই স্থানে দুই জন রাজা রাজত্ব করিতেন। কিন্তু ইহার কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। টেলমির প্রতিষ্ঠানপুরীকে পুলুমায়ীর রাজধানী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে এইমাত্র প্রমাণিত হয় যে, ধনকটকের ঋষি প্রতিষ্ঠানপুরীও অন্ধবংশের অন্যতম রাজধানী ছিল। পরবর্তী কালে অযোধ্যা শ্রাবস্তী প্রভৃতিও গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্যতম রাজধানী ছিল। ইহাতে এমন প্রমাণিত হয় না যে, একই সময়ে দুই জন রাজা দুই রাজধানীতে রাজত্ব করিতেন। এ বিষয়ে ভাণ্ডারকরের অজ্ঞতর প্রমাণ পুলুমায়ীর রাজত্বে খোদিত ২৬নং নাসিক শিলালিপি। ইহাতে অন্ধরাজ গৌতমীপুত্রের মাতা বালত্রীকে “মহারাজ-মাতা মহারাজপিতামহী” বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ভাণ্ডারকর বলেন যে, ইহাতে অস্বীকৃত হয় যে, গৌতমীপুত্র ও তাঁহার পুত্র একই সময়ে রাজত্ব করিতেন, অতথা “মহারাজমাতা, মহারাজপিতামহী” ইহার বিশেষ কোন অর্থ হয় না, কারণ প্রায় প্রত্যেক মহারাজপিতামহীই তো মহারাজমাতাও বটে। ১. এ যুক্তি যে তাবুশ বলবতী নহে ইহা সহজেই অস্বীকার করা যায়; কারণ যদিও অধিকাংশ স্থলেই মহারাজের পিতামহী মহারাজমাতাও বটেন, তথাপি অনেক স্থলেই পিতামহীর জীবিতাবস্থায় পৌত্রের রাজত্ব

লাভ হয় না। সুতরাং যে পিতামহী পুত্র ও পৌত্র উভয়কেই মহারাজ পদবীতে আদর দেখাইয়াছেন তিনি স্বতাবতঃই গর্ভ করিয়া বলিতে পারেন যে, তিনি মহারাজ-মাতা ও মহারাজপিতামহী আর যে লিপিকর বালত্রীকে উক্ত বিশেষণে অভিহিত করিয়াছিল, তাহার মনে এরূপ কোন বিশেষ প্রকাশের ভাব নাও থাকিতে পারে, বাহা সর্বজনবিদিত ঘটনা হয়ত তাহাই মাত্র সে লিপিবদ্ধ করিয়াছিল।

সুতরাং দেখা গেল যে, যে প্রধান ভিত্তির উপর ভাণ্ডারকরের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত, তাহা কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয় না। এ বিষয়ে অধিক প্রমাণ অনাবশ্যক; কারণ সম্প্রতি নাসিকের নিকটবর্তী জোগলখম্ব নামক স্থানে যে ধনভাণ্ডার আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে ভাণ্ডারকরের মতবাদ ভিত্তিশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, ভাণ্ডারকরের যুক্তি অনুসারে, কেবলমাত্র যে সমস্ত রাজগণ ধনকটকে রাজত্ব করিতেন তাঁহাদেরই নাম বায়ু পুরাণে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই হিসাবে তিনি অন্ধ-রাজত্বের ইতিহাস গঠন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, গৌতমীপুত্র প্রতিষ্ঠানে রাজত্ব করেন নাই। তাঁহার গ্রন্থমধ্যে তিনি এইটিই বিশেষভাবে প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; কারণ তাঁহার হিসাবে গৌতমীপুত্র ১৩০ খৃঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। যদি ধরা যায় যে, গৌতমীপুত্র প্রতিষ্ঠানে রাজত্ব করিতেন, তাহা হইলে তৎপুত্র পুলুমায়ী টেলমির পরবর্তী বলিয়া প্রতিপন্ন হন, অথচ টেলমির পুলুমায়ীর নামো-ল্লেখ করিয়াছেন। এই জন্তই ভাণ্ডারকর প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, গৌতমীপুত্র ও পুলুমায়ী একই কালে স্বাধিক্রমে ধনকটক ও প্রতিষ্ঠানের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু জগলখম্ব নামক স্থানে যে প্রায় দশ সহস্র যুজ্ঞা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে গৌতমীপুত্রের নামাঙ্কিত বহুসংখ্যক যুজ্ঞা পাওয়া গিয়াছে। ইহার অনেক যুজ্ঞের প্রথমে নহপনের নাম অঙ্কিত ছিল, পরে



অত্যাধিক গৌতমীপুত্রের নাম অঙ্কিত হইয়াছে। সুতরাং মাসিক প্রকৃতি অঙ্কে গৌতমীপুত্র যে রাজত্ব করিতেন তাহা নিয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং ডাক্তার ভাণ্ডার করের মতবাদ আমরা কোন মতেই গ্রহণ করিতে পারি না।

বিশেষতঃ, কোন বিরুদ্ধ প্রমাণের অভাবেও ভাণ্ডার করের মত গ্রহণের পক্ষে বিশেষ অগ্ররায় আছে। প্রায় সমুদয় পুরাণকারের মতে অঙ্গবংশীয়েরা ৪৫৭ বৎসর রাজত্ব করেন। ডাক্তার ভাণ্ডারকরও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মতে ইহা ধনকটকে ও প্রতিষ্ঠান নগরে বাহারা রাজত্ব করিয়াছিলেন এই উভয়ের রাজ্যকালের সমষ্টি,—অর্থাৎ তিনি বলেন যে, উভয়েই এক কালে রাজত্ব করিতেছিলেন। ইংলণ্ডের রাজ্যগণের রাজ্যকাল ও তাঁহাদের ভারতবর্ষীয় প্রতি-নিধিগণের শাসনকালের সমষ্টিকে মোট বর্তমান কাল পর্যন্ত ইংরাজ রাজত্বের পরিমাণ কাল বলিয়া গণ্য করিলে ইহার অঙ্গরূপ গণনা হইবে। কোন সাধারণ বোধশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি এইরূপ গণনা করিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নহে, এবং পুরাণকারগণের যে সাধারণ বোধশক্তি ছিল, বিশেষ প্রমাণ ব্যতিরেকে আমি তাহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি।

পূর্বেই বলিয়াছি, ভাণ্ডারকর মহাশয়ের উদ্দেশ্যে বিশেষতঃ এই যে তিনি ইউরোপীয়গণের মত পুরাণকে একেবারে অগ্রাহ্য না করিয়া, তাহারই সামঞ্জস্যবিধান দ্বারা ইতিহাস গঠনে যত্নবান ছিলেন। আমাদের বিবেচনায় মতদূর সম্ভব প্রাচীন ইতিহাস গঠনে এই প্রণালী অবলম্বন করাই উচিত, এবং আমাদের বিশ্বাস পুরাণে যাহা আপাততঃ পরস্পর বিরোধী বলিয়া বোধ হয় তাহারই সাহায্যে অঙ্গগণের প্রকৃত কাল নির্ণয় হইবে।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিভিন্ন পুরাণের উক্তির বিশেষ অসামঞ্জস্য এই যে, প্রায় সমুদয় পুরাণে অঙ্গগণের রাজ্যকাল ৪৫৭ বৎসর বলিয়া লিখিত হইয়াছে, কিন্তু

বাহুপুরাণের একটি প্রোক্তাক্ষে, তাঁহার তিন শত বৎসর রাজত্ব করিবেন এইরূপ একটি উক্তি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভাগবৎপুরাণকারও যে এইরূপ একটি ঘটনা অবগত ছিলেন তাহা তাঁহার গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায়।

আমাদের বিবেচনায় অঙ্গজাতির ইতিহাস একটু আলোচনা করিলেই এই পরস্পরবিরোধী উক্তির সামঞ্জস্য লক্ষিত হইবে। সকলেই জানেন অঙ্গগণ দাক্ষিণাত্যের একটি সুপ্রসিদ্ধ জাতি। মহারাাজ অশোকের শাসনলিপি প্রমাণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহার মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীন ছিলেন, এবং পুরাণ হইতে জানিতে পারি যে, তাঁহার কালক্রমে মগধের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। সুতরাং ইহা স্পষ্টই অস্বীকার্য হয় যে, অশোকের মৃত্যুর পর কোনও সময়ে তাঁহার স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, পরে তাঁহাদের প্রভাব ও ক্ষমতা এতদূর বর্ধিত হয় যে, তাঁহার মগধ পর্যন্ত অধিকার করেন। এক্ষণে মনে করিবার কোন কারণ নাই যে, যে সময় তাঁহার স্বাধীন হন, ঠিক সেই সময় বা তাহার অব্যবহিত পরেই তাঁহার মগধ আক্রমণ ও অধিকার করেন। বরং ইহাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় যে, তাঁহাদের স্বাধীনতা লাভ ও মগধ অধিকার এই উভয়ের মধ্যে কিছু দীর্ঘকালের ব্যবধান ছিল। এই কথাটি স্মরণ রাখিয়া পুরাণোক্ত বর্ণনা পাঠ করিলে ইহার সামঞ্জস্য বিধান হইবে বলিয়া মনে হয়। পুরাণকার প্রথমই বলিয়াছেন যে, মগধের রাজবংশ বর্ণনা করা তাঁহার উদ্দেশ্য। মৌর্য, শুল, কাষ এই সমস্ত রাজবংশেরই মগধে উৎপত্তি ও ধ্বংস। সুতরাং ইহাদের বর্ণনা সম্বন্ধে কোন গোলযোগ উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের অঙ্গরাজা যখন শেষ কাষ রাজাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখন অঙ্গরাজ্যের বর্ণনা, মগধ রাজ্যের ইতিহাসলেখকের পক্ষে সমস্তার বিস্ময় হইয়াছিল সন্দেহ নাই। মগধ রাজ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে অঙ্গদের রাজত্ব

কায়দের পরেই আরম্ভ সম্ভব নাই, কিন্তু অন্ধ্রগণের মোট রাজত্বকাল লিখিতে হইলে মগধ বিজয়ের পূর্বে দাক্ষিণাত্যে তাঁহাদের রাজত্বকাল গণনা না করিলে ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষিত হয় না। আমাদের বিবেচনায় পুরাণে মগধ রাজ্যের কালপরিমাণসূচক যে দুইটি সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা এই সমস্তারই পরিচায়ক। তাহা হইলে, বুঝিতে হইবে যে, অন্ধ্রগণ যখন দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন রাজ্য আরম্ভ করেন, তখন হইতে তাঁহাদের স্থিতি পরিমাণ ৪৫৭ বৎসর এবং মগধ বিজয়ের পর হইতে তাঁহাদের রাজ্য শেষ পর্য্যন্ত কালপরিমাণ ৩০০ বৎসর।

আমাদের অনুমান যে নিতান্ত ভিত্তিহীন নহে এই উত্তর সংখ্যার বিরোধাকুল, অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভ হইতে অন্ধ্রগণের মগধ বিজয় পর্য্যন্ত কাল-পরিমাণই ইহার প্রমাণ। এই দুইটি সংখ্যার বিরোধাকুল ১৫৭ এবং সূর ও কাশ্যবংশের রাজত্ব পরিমাণের সমষ্টিও ১৫৭। সুতরাং আমাদের অনুমান সত্য হইলে বলিতে হইবে যে, যে সময় পুষ্পমিত্র শেষ মৌর্য রাজাকে নিহত করিয়া মগধে সূরবংশের প্রতিষ্ঠা করেন, ঠিক সেই সময়েই দাক্ষিণাত্যে অন্ধ্রগণ মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করেন। পরে যে ১৫৭ বৎসর সূর ও কাশ্যবংশ মগধে রাজত্ব করেন, সেই সময়ে অন্ধ্রগণ দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন; পরে কাশ্যবংশের ধ্বংস হইলে মগধ অধিকার করিয়া ৩০০ বৎসর রাজত্ব করেন। মৌর্য সাম্রাজ্যের সম্বন্ধে যতটুকু বিবরণী আমরা অবগত আছি ইহার সহিত এই সিদ্ধান্তের এক দূর সামঞ্জস্য লক্ষিত হয় যে, অল্প প্রমাণাভাবেও নিশ্চিত ঘটনা না জানা পর্য্যন্ত আমরা এই অনুমানকেই ঐতিহাসিক বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। অতর্বিজ্ঞোহে মৌর্যবংশের ধ্বংসের পরেই যে মগধ সাম্রাজ্যের অধীন দূরবর্তী প্রদেশসমূহ স্বাধীনতা অবলম্বন করিবে, ইহা কেবল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ঘটনা নহে, ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারাও সমর্থিত। পশ্চিমে বরন সৈন্ত (গ্রীক-বাক্ট্রিয়ান) সিদ্ধ পার

হইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, এবং পুষ্পমিত্রের সমসাময়িক গ্রীকবীর ডিমিট্রিয়াস গ্রীক ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক ভারতবর্ষীয় রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। জৈন গ্রন্থে দেখিতে পাই অবতী এই সময়ে স্বাধীন হয়, এবং কলিঙ্গরাজ ধারবৈলের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, কলিঙ্গ রাজ্যও ঐ সময়ে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। মালবিকাগ্নিমিত্রে দেখিতে পাই বিদর্ভ রাজ্যও সম্প্রতি অর্থাৎ পুষ্পমিত্রের সময়ে স্বাধীন হইয়াছে, কারণ বিদর্ভরাজকে লক্ষ্য করিয়া অগ্নিমিত্র এক স্থলে বলিয়াছেন 'অচিরাদিষ্ঠিত রাজ্য-শত্রু'। বিশেষতঃ অন্ধ্ররাজ্য যে পুষ্পমিত্রের সময়ে স্বাধীন ছিল, ইহার বিশিষ্ট প্রমাণও আমরা মালবিকাগ্নিমিত্রে প্রাপ্ত হই। উক্ত নাটকের প্রথম অঙ্কে অগ্নিমিত্রের শালক বীরসেনের সম্বন্ধে উল্লিখিত আছে যে তিনি নর্মদা তীরে (বিদর্ভ) সীমান্ত দুর্গের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত আছেন। সুতরাং ইহাতে নর্মদা নদীর দক্ষিণে গোদাবরী-তীরে অন্ধ্ররাজ্য যে তৎকালে স্বাধীন ছিল এই তথ্য প্রমাণিত হয়। এই সমুদয় পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, যখন পুষ্পমিত্র সৈন্তদর্শনব্যাপদেশে শেষ মৌর্য রাজা বৃহদ্রথকে নিহত করেন, তখন এই অন্তর্বিজ্ঞোহানলে সমগ্র সাম্রাজ্য ভস্মীভূত হইতে থাকে। সুযোগ বুঝিয়া গ্রীক যবনগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করে এবং তাহাতেই মগধ সাম্রাজ্যের ধ্বংস হয়; এবং সুযোগ বুঝিয়া সামন্ত প্রদেশসমূহ স্বাধীনতার পতাকা উড্ডান করে। গার্গী সংহিতায় কয়েকটি শ্লোকও আমাদের অনুমান সমর্থন করে।

“ততঃ সাকোভমাক্রমা পঞ্চাশং বধুরাং তথা  
ববনো দুষ্ট বিক্রান্তঃ প্রাপ্যতি কুসুমধ্বজম্।

ততঃ পুষ্পপুরে প্রাপ্তে কর্দ্দম প্রথিতে হিতে  
অকুলা বিষয়াঃ সর্কে ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ”।

এই শেষ পংক্তি হইতে বুঝা যায় যে, গ্রীক আক্রমণের কালে বিভিন্ন প্রদেশ সমূহে মগধ সাম্রাজ্যের ক্ষমতা লোপ পাইয়াছিল। এবং আমরা দেখিয়াছি যে, পুরাণে

মোট ১০২১

স্বাধীন আপাতবিরোধী বলিয়া বোধ হয়, এই অল্পমানে তাহার সামঞ্জস্য সাধিত হয়; অর্থাৎ, মৌর্য সাম্রাজ্য ধ্বংসের পরেই (খ্রিঃ পূঃ ১৮৪ বর্ষে) অন্ধ রাজগণ স্বাধীনতা লাভ করেন, পরে ১৫৭ বৎসর পরে কাশ্যবংশের শেষ রাজাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া মগধ অধিকার করেন। ইহার ৩০০ শত বৎসর পরে মগধ সাম্রাজ্যের লোপ হয়। তবে শেষ ৫২ বৎসরে যে সাত জন রাজা রাজত্ব করেন তাঁহারা অতিশয় ক্ষীণবল ছিলেন। পুরাণে তাঁহাদিগকে ঐপর্কজীয় অন্ধ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং তাঁহারা মূল বংশের শাখা। বায়ুপুরাণে ইহাদের উল্লেখ নাই; বায়ু পুরাণকার এই স্তম্ভ মোট রাজত্ব-পরিমাণ ৪১১ বৎসর ধরিয়াছেন। অস্তান্ত পুরাণে ইহাদিগকে অন্ধ-বংশের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, সুতরাং মোট রাজত্ব-পরিমাণ ৪৫৭ বৎসর লিখিত হইয়াছে। এই উভয় গণনায় যে ছয় বৎসরের প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, অন্ধ বংশের এই শাখার রাজ্য প্রবর্তিত হওয়ার পরও অন্ধ বংশের শেষ রাজা ছয় বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এইরূপে বায়ুপুরাণ ও অন্ধ পুরাণের বিরোধ মীমাংসা করা যাইতে পারে।

উপরে যে মতবাদ লিপিবদ্ধ হইল তাহা সুনিশ্চিত প্রমাণ দ্বারা এখনও সমর্থিত হয় নাই। তবে পুরাণের বর্ণনার সহিত ইহার সম্পূর্ণ ঐক্য আছে, এবং ঘটনাগত প্রমাণ যতদূর পাওয়া যায় তাহাতে ইহা সমর্থিত হয়। এমন কি পুরাণে বাহা আপাতবিরুদ্ধ বর্ণনা বলিয়া মনে হয়, এবং এ পর্যন্ত যাহার কোন সুমীমাংসা হয় নাই, এই

মতবাদের দ্বারা তাহারও সুন্দর সামঞ্জস্যবিধান হয়। আর যুজ্জা, শিলালিপি প্রভৃতি হইতে আধুনিক কালে অন্ধ গণের যে বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, উপরোক্ত মতবাদ কোন অংশে তাহার বিরোধী নহে। ইহার বিরুদ্ধে কেবলমাত্র একটি তর্ক উঠিতে পারে যে, পুরাণ-কার অন্ধ বংশের প্রথম রাজাকেই কাশ্যরাজার পরাজয়কারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু উপরোক্ত মতবাদ সমর্থিত হউক বা না হউক, পুরাণকারের এ বচনটি যে ভ্রমাত্মক তাহা ভাণ্ডারকরের মতবাদ খণ্ডনের সময় উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রকার ভ্রমের উৎপত্তি খুবই স্বাভাবিক। অন্ধ গণ কর্তৃক কাশ্যরাজ নিহত ও রাজ্যভ্রষ্ট হন, ইহা জানা ছিল, এবং অন্ধ রাজগণের নামের তালিকাও লিখিত ছিল। পরবর্তী কালে, লোকে যখন বিশ্বস্ত হইল যে, অন্ধ গণ দাক্ষিণাত্যে বহুকাল রাজত্ব করিবার পর মগধ জয় করেন, তখন স্বভাবতঃই প্রথম অন্ধ রাজা কাশ্যরাজার পরাজয়কারী বলিয়া উল্লিখিত হইলেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আমরা অস্তান্ত পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছি যে, পুরাণ বা এতদ্দেশীয় অস্তান্ত প্রাচীন গ্রন্থোক্ত কাহিনীগুলি সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া না দিয়া, আধুনিক কালের আবিষ্কারের সহিত তাহার যতদূর সম্ভব সামঞ্জস্যবিধান করিয়া ইতিহাস রচনা করাই প্রকৃষ্ট পদ্ধতি, এবং বর্তমান ক্ষেত্রেও মাত্র তাহারই চেষ্টা করা হইয়াছে।

শ্রীরমেশচন্দ্র বসুমদার।

## কিশোরী

দো কিশোরী প্রিয়া মোর পলিত ধরারে আজি কুরেছ  
কিশোরী

কীর্ণ জগতের বত অবগত কীর্ণ কথা দিয়াছ পাশরি'।  
জন্মের জড়তা গেছে নিত্যদৃষ্ট মান মানি সবে গেছে দূর,  
সবি বেন রাঙা রাঙা কচি কচি টল টল পেলব মেদুর।  
পুরাণসঙ্গীত মাঝে আজি মোর প্রাণে বাজে অভিনব তান,  
তুফান জীবন-নদী বস্ত্রায় উধলি আজ বহিছে উজান।  
মৃত্যু আলোকে হেরি আজি সবি অভিনব লাবণ্য-চঞ্চল,  
এক গাল হাসি হেসে, ভাল টিপ, ধরা বেন বেঁধেছে কুণ্ডল।  
কিশোরী দেবীর মোর সত্যিকার আশ্রানে আজ পুণ্য  
আয়োজনে  
কীর্ণ জগতের দেবালয়ে দেবতা জাগিল, 'তব সখ্য বণ্টা-বনে।  
কত বর্ষ পুণ্যহীন উত্তানে ফুটিল মোর অশোক-বকুল  
পূরবী তুলিয়া ঐ আশ্রয় সাহানা গায় বিহগ ব্যাকুল,  
বিবাহের রকে সেজে মাতে আজি বাহা কিছু বিবর্ণ মলিন  
ধরায় বসন্ত জাগে অসময়ে সরোবরে নলিনী-নলিন।  
পুরাণ অলির গান ফুল-হাসি নদী-তান সবি লাগে ভাল  
হরির স্বপন স্নেহ জগতে জাগিল মোর প্রভাতের আলো।  
আজিকে যৌবন-লক্ষী মানবের ঘারে ঘারে জাগল জীবন,  
অভিসারে রসাবেশে পুলক রোমাঞ্চে আজি ভরিল ভুবন।  
কায় গৃহ-লক্ষী হতে প্রকৃতি বালিকা করে সীমন্তে সিন্দূর  
উষাহ আভিনা তলে দাঁড়িয়েছে সালকারা হাসিয়া মধুর।

শ্রীকালিদাস রায়।

## ময়মনসিংহ জেলার কতকগুলি প্রাচীন কীর্তির সংক্ষিপ্ত

### বিবরণ \*

গড়জরিপার দুর্গ

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

( ৩ )

আটিয়ার মসজিদ।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে বাজইদখাঁর পুত্র সৈয়দ  
খাঁ পানী নামক পানিগোত্রের এক জন আফগান  
টাকাইল মহকুমার অন্তর্গত আটিয়া নামক স্থানে একটি  
বড় মসজিদ নির্মাণ করান। আটিয়া সৈয়দ খাঁ পানির  
জায়গায়ের প্রধান নগর ছিল। ঐ মসজিদের পবিত্রতা  
ও খ্যাতির কারণ এই যে, উহা পীর সাহীনশাহ বাবা  
আদম কান্দীরির সমাধির উপর সংস্থাপিত। মসজিদের  
সম্মুখে ঘরের উপরে একখানি প্রস্তরেতে আরবী  
ভাষায় বে লিপি আছে, তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

( ১ ) সা মুহুদ্দিন জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে অনেক  
সমৃদ্ধ মসজিদ নির্মিত হইয়াছে।

( ২ ) সৈয়দ খাঁ পানিও একটি মসজিদ নির্মাণ  
করাইলেন। তিনি যেন ইহার জন্ত পরলোকে উপযুক্ত  
পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

( ৩ ) যখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কে আবার  
প্রাণের ভিতরে বলিল “কে এই সৈয়দ জাহাঙ্গীর রাজা”  
হে সৈয়দ, জীবন তোমাকে ইহ পর-লোকে আশীর্বাদ  
করুন।

( শ্রীমত রমণীমোহন রায় এন্ড এ মহাপ্রের ইংরাজী বোর্ড  
হইতে সংগৃহীত। )

ইহাতে হিজরি তারিখ পাওয়া যায় (খৃঃ অঃ ১০৬২-৬৩)। বর্ষন এই বড় মসজিদটি তাজিয়া বার, তখন এক ব্যক্তি ইহার স্থানে একটি ক্ষুদ্র মসজিদ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে। রোসন খাতুন চৌধুরী নামক একজন লম্বা মহিলা এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া ভয় বড় মসজিদই পুনরায় নির্মাণ করিবার সংকল্প করেন। ঐক্যে ও আরব হুজুর মন্দির আর প্রস্তুত হয় না। বড় মসজিদের প্রস্তর লিপি পাঠে জানা যায় যে, সাহীনশা বাবা আদম কাস্মীরি ১০০৭ খৃষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর মাসখালী সাংসারণ করেন। এই শিলালিপিতে ইহাকে “বাবা কাস্মীরি,” না বলিয়া “বাবা কাস্মীর” বলা হইয়াছে; এটা নিশ্চয়ই ভুল। “বাবা কাস্মীর” কথা হয় না। এই মসজিদের সন্নিকটে বঙ্গ প্রচলিত রীতিতে নির্মিত একটি পুরাতন মসজিদ আছে। লোকেব সংস্কার যে উহা মুলতান গারেস উদ্দীন আজম সা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহার নিকটে ইষ্টক নির্মিত একটি সমাধির ধ্বংসাবশেষ আছে; লোকে বলে উহা মুলতানের সমাধি।

সৈয়দ বাঁ পানি মোগল সম্রাটের সেনা বিভাগে চাকরি করিতেন। কার্যদক্ষতার পুরস্কার স্বরূপে তিনি দিল্লী আকবরের নিকট হইতে আটটি পরগণা জায়গীব প্রাপ্ত হন। ইনিই করটিয়া জমীদার বংশের স্থাপয়িতা।

(৪)

### আগর সিদ্দুর গ্রামে মসজিদ।

ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণ সীমায় ব্রহ্মপুত্রতীরে আগর সিদ্দুর গ্রামে একটি অতি সুন্দর মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আছে। এই মসজিদের সমুখ ভাগে ও দুই দিক দিক দিক বেটন করিয়া যে সকল কারুকার্য আছে তাহা অতি সুন্দর। ইহার ছাদের কেন্দ্রস্থলে একটি বৃহৎ মসজিদ আছে। এবং চারি কোণে ঐশ্বর্য্য বিশিষ্ট চারিটি মসজিদ আছে। মসজিদটির অনেক স্থানে প্রাচীর ফাটিয়া

গিয়াছে এবং উহা অগ্ন্যহ্নার পরিপূর্ণ হইয়াছে। সমুখের মসজিদের উপর প্রস্তর কলকে তৈরি আরবি অক্ষরে এই শ্লোক প্রদীপিত আছে —

“আল্লা ব্যতীত আর কোন ঈশ্বর নাই এবং মহম্মদ তাঁহার রুত (prophet). আল্লা বলেছেন যে, যে ঈশ্বরে এবং পরলোকে বিশ্বাস করে সে ই মসজিদ নির্মাণ করে। মহম্মদ বলেছেন যে, যে পৃথিবীতে একটি মসজিদ নির্মাণ করে আল্লা তাহার জন্য স্বর্গে ৬০ খানি গৃহ নির্মাণ করিয়া রাখেন। পৃথিবীর রাজগণের শিরে মুকুট স্থাপনকারী (the bestower of crowns on the kings on the world) রাজারাজ, চন্দ্রকলার দ্বিতীয় অধীশ্বর (the second Lord of the two horns) সাল্লাহান বাদশা গাজীর রাজত্বকালে ১০৬২ হিজরি সনের (১৬৪০ খৃষ্টাব্দের) রবিউল আউল মাসে মীর্জার পুত্র সাদির তত্ত্বাবধানে আল্লার মেহের-বানিত্ত এই মসজিদ নির্মাণ কার্য সমাধা হইল।

দ্বিতীয় লোকে এই মসজিদের অত্যন্ত সম্মান করে। আকবরের রাজত্বকালে যে ভারত ও বঙ্গদেশে, শাসন করিতেন ইসাক খাঁ তাহাদের মধ্যে এক জন ছিলেন। পূর্বে বর্ণিত মসজিদের নিকটে যে একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে লোকে বলে যে, উহা ইসাক খাঁর আদেশে নির্মিত। এই স্থানে বঙ্গালার শাসন কর্তা মানসিংহের সহিত ইসাক খাঁর এক যুদ্ধ হয় এবং মানসিংহ পরাজিত ইসাক খাঁকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে লইয়া যান। নিকটেই মাটির একটি উঁচু ভিটি আছে। প্রবাদ এই যে, মানসিংহ এখানে দোলাৎসব করিয়াছিলেন।

(৫)

### বোকার নগরের দুর্গ।

বোকার নগর যে এককালে বেশ বড় নগর ছিল তার প্রমাণ এই যে; উহা রেনেল সাহেবের হিন্দু-হাঙ্গের ব্যাপে সুনিরূপিত আছে। মুসলমান রাজত্ব-কালে ইহার সমৃদ্ধি ও খ্যাতি ছিল। বোকার নগর

নামক নব্বইটি স্থান জরিয়া একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ প্রদর্শিত আছে। চারিটি ইটক ভূপ আছে ; লোকে বলে ওগুলি দুর্গপ্রাচীরের চার কোণের প্রহরীদের আবাস-কক্ষ ছিল। কুবকেরা এখনো দুর্গসীমার মধ্যে কুর্খিচিহ্নে চব্বিভে ভূমিতে গুলিগোলাবশেষ পায়। যুদ্ধেরা বলে, তাহার বাল্যকালে দুর্গপ্রাচীরে অংশ বিশেষ দেখিয়াছিল। এই প্রাচীরের শেষ নিদর্শন গত ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের ভূমিকম্পে লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে।

বোকারনগর যে মুঘলমান রাজত্বকালে একটি বড় নগর ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহই হইতে পারে না। বর্তমানে স্থানকে বোকারনগর বলে উহা এখনো নিম্নলিখিত পল্লীগুলিতে বিভক্ত—(১) বালুরচর, (২) পাঠানটোলা, (৩) ফকীরটোলা, (৪) পিরাতাটোলা, (৫) মহাজনটোলা, (এইখানে সন্ন্যাসী ও রাজপুত্রেরা বাস করিত), (৬) পটুয়াটোলা, (৭) কায়স্থটোলা, (৮) জিশ্বর, (৯) মহলাগড়পাড়া, (১০) চকপাড়া, (১১) মহলা অউশ্বর, (১২) মহলা বাইশ্বর, (১৩) মহলা দ্বিরিকপুর, (১৪) কুহুলা মায়দনগর, (১৫) মমিরপুর, (১৬) দিহিরিকান্দা, (১৭) মহলা কাজিপাড়া, (এখানে এখনো কয়েক ঘর কাজি বাস করেন), (১৮) মহলা ছোটরয়। এই নগরে অনেক পটুয়া (ইহার ভাগা, ঝালর প্রভৃতি প্রস্তুত করে), অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুতকারী কামার, বাজী প্রস্তুতকারী হাউইকর, দরজি (ইহাদের তিন ঘর এখনো আছে) এবং স্বর্ণকার বাস করিত। বোকারনগরের দরজিরা এখনো এই প্রদেশে তাহাদের নৈপুণ্যের ক্ষমতা বিস্তারিত।

পরগণা ময়মনসিংহের বর্তমান অধিদায়গণের অধিদায়ী স্থাপনকর্তা রাজসাহী জেলার অধিকাংশ ছিলেন। তিনি এ জেলার আসিয়া প্রদেশে বোকারনগরে বাস স্থাপন করেন। ইহাতে বোধ হয় তাহার সময়ে বোকারনগরে এ প্রদেশের মুঘলমান শাসনকর্তার রাজ-

ধানী ছিল। কথিত আছে যে, এই বোকারনগরের দুর্গ একপুত্রের ভীয়ে সংস্থাপিত ছিল; তখন তা হলে একপুত্রনদী এই স্থান দেখিয়া বহিত। সে কালেই নিদর্শন বরূপ এখনো এখানে একটি দীর্ঘ মসজিদ আছে। উহার ছাদের কেন্দ্রে একটি বড় গুহ, এবং চারিকোণে চারিটি বটপাখিবিধিষ্ট স্তম্ভ। এই মসজিদের অবস্থা এখন বড় শোচনীয়। ইহার প্রাচীর সকল ভেদ করিয়া অনেক ছোট ও বড় বটের গাছ জন্মিয়া ইহাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। ইহাতে নানাবিধ কারুকার্যের চিহ্ন এখনো লক্ষিত হয়। সমুদ্রের দেয়ালে নানাবর্ণের কাঁচ বসান ছিল তাহা, বুদ্ধিতে পারা যায়।, দ্বারের উপর ফারসী ও আরবী ভাষায় এক খানি লিপি খোদিত আছে। উহার এই কথাগুলি এখনো পড়িতে পারা যায়—“লায়লাহিলামা মহম্মদ রহুল্লাহা ... আবু বোকার ... সাজাহানের রাজত্বকালে।”

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, সম্রাট সাজাহানের রাজত্বকালে এই মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। মসজিদের নিকটে একটি দীঘি ছিল। এখন উহা ভরিয়া গিয়াছে। নিকটেই একটি দরগা আছে। প্রবাদ এই যে, এখানে নিজামুদ্দিন আউলিয়া নামক একজন পীর বাস করিতেন ও ধর্ম প্রচার করিতেন। এই দরগা অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসে এখানে এক মাস কাল ব্যাপী একটি মেলা হইয়া থাকে। এই মেলায় সময়ে দরগাতে প্রতিদিন ২০১২ টাকার সিনি দেওয়া হয়। দরগাতে যে কাহার সমাধি তাহা কেহই নিশ্চিত বলিতে পারে না। এই স্থানে একটি ইটের পুলের ভগ্নাবশেষ এখনো আছে। লোকে বলে সন্ন্যাসীরা উহা নির্মাণ করিয়াছিলেন। বোকারনগরে এখনো কয়েক জন সন্ন্যাসী থাকেন।

প্রবাদ এই যে, সম্রাট আকবরের সময়ে খাজেন ওসমান খাঁ নামক উহার একজন উকীর নানা কীর্তি ও মান্য ধর্মাবলম্বী ৭২৮ জন অমুচর সহিত এই স্থানে

আইসেন। তিনি এই স্থান বোকারকোট, নামক স্থানের পার্শ্বস্থ সর্দারের পালনাধিকারে দেখিতে পান। অল্পকাল ধীরে সৈন্তসামন্ত দেখিয়া বোকা পলায়ন করে। স্থানটি তিনি অধিকার করিয়া লন। বোকার স্থান অনুসারেই স্থানের নাম বোকারনগর হয়, এবং ওসমানের অনুচরগণ এখানে বসতি স্থাপন করে। ওসমান ধী এখানে অল্পকাল থাকেন; পরে দ্বিগ্লিতে চলিয়া যান। তাঁহার স্থানে মুকীল ধী নামক একব্যক্তি তহশীলদার হইয়া বোকারনগরে আইসেন। এই মুকীল ধীই পূর্ব বর্ণিত মসজিদ ও দীঘি করেন। তাঁহার নাম অনুসারে দীঘির নাম হয় “মুকীল ধীর তলব।”

( ৬ )

### চারিপাড়ার রাজবাটি ।

বরেন্দ্রসিংহ জেলার পূর্বভাগে হাজরাধি পরগণার চারিপাড়া গ্রাম। ইহা রাজা নবরজ রায়ের রাজধানী ছিল। ইহার বংশধরগণের মধ্যে এই কিংবদন্তি আছে যে, বিজয়রাম দাসনন্দন নামক একব্যক্তি রাঢ় দেশ হইতে চারি পাড়ার আগমন করেন। নবরজ নামক তাঁহার পুত্র অল্পকাল মধ্যে মহা সূর্য ও বলশালী হইয়া এইখানে একটি রাজ্য স্থাপন করেন; চারিপাড়া রাজধানী হয়। অতঃপর এক বিবরণ এই যে, নবরজ রাঢ় দেশের এক রাজ্য ছিলেন; সেখানে বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় তিনি সে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সশস্ত্রে ও সপারিতনে বরেন্দ্রসিংহ আসিয়া চারিপাড়ার রাজ্য স্থাপন করেন। কতগুলি প্রমাণ প্রয়োগে ইহা একরূপ নিশ্চয়পূর্ণ হইয়াছে যে, নবরজ রায় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে সময়ে জীবিত ছিলেন।

এই পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্য সময়ে পূর্ববঙ্গের সরকার হাজরাধি ইলফ ধী ও তাঁহার বংশধরগণ প্রবল হইল। তাঁহাদের সহিত ইহার শক্ততা আরম্ভ হয়। অতঃপর এই বিবাহে নবরজ সপরিবারে নিহত

হয়। রাজার একটি স্ত্রী কোনরূপে শত্রু শিবির হইতে পলায়ন করেন। তিনি সে সময়ে গর্ভবতী ছিলেন। ইহার গর্ভে একটি পুত্র জন্মে; ইহার ধারা বংশ ধকা হয়। এই বংশের শেষপুরুষ বাবু গিরিশচন্দ্র রায় সম্প্রতি পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার পৌত্রপুত্র এখন নাবালক। চারিপাড়ার রাজধানী ভিত্তি সূর্য ছিল বলিয়া বোধ হয়; উহা ২১০ মাইল ব্যাপিয়া ছিল। উহা একটি দীঘির পশ্চিম তীরে সংস্থাপিত ছিল। নিকটে বনভূত একটি উচ্চভূমি আছে; অনুমিত হয় যে, এই খাল্পে দুর্গ ছিল। রাজা নবরজ রায়ের চার স্ত্রী বা সেকাপতি তাঁহার রাজধানীর সন্নিকটে বাস করিতেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই চারিজনদের সংগ্রহে হাজির নাম চারিপাড়া হয়।

নবরজ অনেকগুলি দীর্ঘিকা খনন করান; তার মধ্যে তিনটিই খুব বড়। উহাদের নাম ও পরিমাণ নিচে দেওয়া গেল—

- ( ১ ) কাটার দীঘি ... কর্ণ পরিমাণ, ৩৫ বিঘা;
- ( ২ ) নয়া দীঘি ... কর্ণ পরিমাণ, ২৩ বিঘা;
- ( ৩ ) সংসার দীঘি ... কর্ণ পরিমাণ, ১৮ বিঘা।

রাজা নবরজ রায়ের জামাতা সংসার রাজের নাম অনুসারে শেখোক্ত দীঘির নাম হয়।

চারি পাড়ার রাজ বাড়ির ৩ মাইল উত্তরে গোপীনাথ জিন্ন মন্দির। এই বিগ্রহটিকে ভোগবেতালের গোপীনাথ বলিত। যে সঙ্কোচবরের তীরে রাজবাটি এবং যে পুষ্করিণীর তীরে মন্দির একটি খাল দ্বারা এই দুইটি সংযুক্ত ছিল। রাজা নবরজ সরোবরের বাটে নৌকার উঠিয়া পুষ্করিণীর বাটে গোপীনাথজীর ক্ষত্রিয়ের সোপানে নামিতেন।

( ৭ )

### মদনপুরের সমাধি ।

মেত্রাকোনা হইতে প্রায় ৪ মাইল দক্ষিণে মদনপুর গ্রাম, ইহা খুব প্রাচীন। এই গ্রামে প্রাচীনতম কবির



( ৮ )

ভোগ বেতালের গোপীনাথের মন্দির।

ভোগ বেতাল গ্রাম কাতিরাধি পুলিশ ঠেশের সরিষিক প্রধান মন্দিরটি বলরামের। ইহার শীর্ষ ভাগে ৩টি বিলা ও ৩টি চূড়া। মন্দিরের পূর্বদিকে ৩টি ইটক-নির্মিত গৃহ, একটি ভোগঘর, দ্বিতীয়টিতে রাস এবং তৃতীয়টিতে রুলন বাজা হয়। মন্দিরের পশ্চিমে আর একটি দ্বিতীয় গৃহ; সে গৃহে বৈশাখের অক্ষর্য তৃতীয়ার দিনে ঠাকুর বাজা উৎসব হয়। মন্দিরের দক্ষিণে একটি দ্বিতীয় গৃহ ইহার শীর্ষ “পকরস্থ দ্বিতীয়”। ঘরের উপরে এই কথা খোদিত আছে—“সচীন্দ্র সাহা, সাগরদি, ১১৬৭ সন।” হয়তো এই ব্যক্তি এই গৃহ নির্মাণ করাইয়াছিলেন দক্ষিণে আরো একখানি গৃহ আছে; উহাতে উৎসব কালে ছদ্ম লাল দেওয়া হয়। এই সকল ব্যক্তি-বাসিন্দা লোক একখানি পাকা বড় ঘর আছে। ইহারই সামনে একটি বাঠ। উহাতে দোলঘর; এইখানে দোলোৎসব হয়। মন্দির গায়ে এই কথা গুলি খোদিত আছে—“বলরাম গোপীনাথ ঠাকুরের পাদপদ্মে উৎসব।” কাতিরাধি নিবাসী শ্রীজগন্নাথ পোন্ধর, ১২০৪ সন। রথ-বাজার দিনে ঠাকুরকে রথে তুলিয়া এইস্থান হইতে আছমতিয়া নামক গ্রামে লইয়া যাওয়া হয়; আবার রীতি অনুসারে ২ দিন পরে ফেরৎ আনা হয়। আছমতিয়া পর্যন্ত রাজ্য ৫০ হুট প্রায় এবং ৫ মাইল লম্বা। গোপীনাথের মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের মূর্তিই প্রধান। ইহাদের উভয়ের মাথার সোনার মুকুট আছে। শ্রীকৃষ্ণ-মুকুটের চূড়া ৩ সোনার। শ্রীরাধিকার মূর্তি রূপার; মাথার সোনার মুকুট ও গায়ে অনেক বহুমূল্য অলঙ্কার। আজ চারশত বৎসর হইল এই গোপীনাথের মন্দির বিস্তারিত আছে। এই মন্দিরের দেবোত্তর বামদিকের দ্বার এখন এক হাজার টাকা। রথ-বাজার দিনে এইখানে বেলা হয়; তখন জিগুয়া ও কীট বেলা ও

এইমত মতাদি ইহাকে রুমি বলা হয়, কেন না জন-এইমত ইহা ইনি রুম বা কনটাসিনোগল হইতে আসিয়াছিলেন। হানীর মুসলমানেরা এই সমাধির অল্পত সমান করে। ইহার রুমার জন্ত ইহার চতুঃপার্শ্বে বেঁধে করিয়া একটি ইটের দেয়াল আছে। সপ্তাহে দুই দিন মুসলমান বাজীরা এখানে সিন্নি দিতে আসে। বাজীপন নিকটবর্তী পুষ্করীতে স্নান করিয়া প্রতি পদ-ক্ষেপে সেলাম করিতে করিতে সমাধির ঘারে উপস্থিত হয়; পরে সিন্নি দিয়া আবার সেলাম করিতে করিতে নিজস্ত হয়। সমাধির এককণ বাজীদিগের দানে বৎসরে ৪৫ হাজার টাকা লাভ করিয়া থাকেন।

এবার এই যে, মদন কোচ নামক হানীর এক শাসন-কর্তার নানাস্থানে এই গ্রামের নাম মদনপুর হয়। এই সবরে এ প্রদেশ কোচ রাজ কাবতাপুরের (কোচবিহারের) অন্তর্গত ছিল। কথিত আছে যে, শা মুলতান কাম কেবলবাজ ৩৯ জন অস্ত্রচর লইয়া মদনপুর আক্রমণ করেন। মদন কোচ বৃদ্ধ না করিয়াই পলায়নপর হন। কিন্তু মাইবার পুর্বে নিজের ধন সম্পত্তি একখানি নৌকার তুলিয়া ঐ নৌকা মদনসাগর নামক দীঘিতে ডুবাইয়া রাখিয়া বান। ঐ দীঘি এখনো আছে। প্রায় একশত বৎসর হইল ইসাক ককৌর নামক একব্যক্তি ঐ গুপ্তধন পাওয়ার আশায় ঐ দীঘির জল সেচিয়া ফেলাইয়াছিল। সে কিছু পাইয়াছে কি না তাহা কেহ বলিতে পারে না।

সমাধির ঘরের উপরে আরবি অক্ষরে খোদিত আছে—

“১০৬৬ হিজরি আউল, ৪৪৫ হিজরি।”

এই তারিখে রুমি না কি পরলোক গমন করেন। ইহার কোন কোন অস্ত্রচরের বংশধরগণ এখনো এখানে আছে। ইহাদিগকে “খাদিমী ককৌর” বলে। ইহার কিছু কিছু লোক প্রকাশ করে।



মুন্সিফের নানা স্থান হইতে প্রায় ১০ হাজার লোক এখানে সমবেত হইয়া থাকে।

( ৮ )

হাভাতনগর গ্রামে শ্রামশুন্দরের মন্দির।

হাভাতনগর গ্রাম কিশোরগঞ্জের নিকটবর্তী। কথিত আছে যে, গোসাই ব্রজবল্লভ নামক এক চৈতন্যভক্ত ব্যক্তি এই গ্রামে এই মন্দির স্থাপন করেন। এই মন্দির-পার্শ্বে তাহার সমাধি আছে। হিন্দুরা এই সমাধির বহু সন্মান করিয়া থাকে। ইহাতে শ্রামশুন্দর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। ইহার দ্বারের উপরিভাগে নিম্নলিখিত শ্লোক উৎকীর্ণ আছে :—

ইন্দ্রঃ সুরপতিশ্চৈব বজ্রহস্তো মহাবলঃ ।

ঐরাবতগজারূঢ়ো বরাজোনমস্ততে ॥

ভৈরবিশ্চ সূর্য্যস্ত চৈশ্বম্পাদিন এবচ ।

গৌলভ্যঃ পুলহাশ্চৈব পক্ষে তে বজ্রাবারণঃ ॥

শকা ১৬৩৫। সন ১১৩৮। ২ চৈত্র।

শ্রামশুন্দরের মন্ডকে সোনার মুকুট ও গাত্রে অনেক বহুল্য অলঙ্কার। ঝুলনের সময়ে এখানে বড় মেলা হয়। শ্রামশুন্দরের দেবোত্তর সম্পত্তির বাৎসরিক আয় ৬ হাজার টাকা।

শ্রীমদ্বৈক্যনাথ নিয়োগী।

## চন্দ্রকান্ত প্রসঙ্গ

শিক্ষান্তবাগীশ মহাশয় ও সমসাময়িক  
সেরপুর।

( ২ )

যে কোনও একজনকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে তাহার বংশ, সমাজ, পিতা, মাতা, পরিবারবর্গ ও পারিবারিক অবস্থা প্রভৃতির সঙ্গে পূর্বেই পরিচয় করিয়া

লওয়া আবশ্যিক। রত্নুবা তাহাকে আমরী ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। তাহার জীবনের কেয়লোমুখ্য লক্ষণ ও ক্রিয়ার সঙ্গে, তাহার জীবনের নিত্য-সংস্কৃত লক্ষণ কাল সমাজ, তাহার জীবনের ভাব ও ধারণার দ্বারা প্রবর্তক পরিবারবর্গ, এবং সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ ভাবে শারীরিক ও মানসিক দোষ গুণ সকলের নিদানভূত—পরন্তু জীবন-দাতা জনকজননীর প্রভাব, কতটুকু কি ভাবে সংক্রমিত হইয়া আসিয়া তাহার বর্তমান জীবনে অত্যাশ্চর্য্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহযোগে ক্রম বিকাশ লাভ করিয়া তাহাকে ব্যাড়াইয়া তুলিয়াছে আমরা যদি পূর্বেই বিষয়-গুলির প্রতি উদাসীন থাকি তবে এই ক্রমবিকাশের স্তরটিকে কখনো বুঝিতে পারিয়া লইতে পারি না। চিত্তাশীল ব্যক্তিগণ একটা সামান্য মানুষের মধ্যেও তাহার বংশ, সমাজ, বংশ, কাল ও পারিবারিক প্রভাব, লক্ষ্য করিয়া থাকেন, পিতা মাতার গুরু-শোণিত-সম্বৃত সমানে তাঁহাদের একখানি সজীব আলোচ্যই থাকিয়া যায়। অবস্থার বৈলক্ষণ্যে অনেক স্থলে তাহা স্পষ্টতঃ লক্ষিত না হইলেও অল্পসঙ্কিৎসুর চক্ষু এড়াইতে পারে না। আমরা মহাপুরুষ দ্বিগের জীবন চরিত পাঠ করিয়া বিম্বিত হই। তাঁহাদিগের অলৌকিক প্রতিভা, অসামান্য গুণ-গৌরব, অসাধারণ মনোবৃত্তি ও উদারতা দর্শনে আশ্চর্য্যাবিত হইয়া থাকি, ভাবি, একটা জীবনে অত সামান্য কালের মধ্যে মানুষ কি করিয়া এত উন্নতি করে? কি করিয়া এরূপ উদারতা, মহত্ব, ত্যাগশীলতা, ও মহাত্ম্যবতার অধিকারী হইয়া গুণতের শিক্ষাগুরু পদ অলঙ্কৃত করে? কিন্তু যদি আমরা নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখি, তবে দেখিতে পাই মানুষ যে কোনও প্রকার উন্নতি কল্পক না কেন, তাহার সমুদায় উন্নতির বীজ, সমুদায় গুণ-গৌরব-মার উপাদান, সমুদায় সংক্রিয়ার প্রেরণী শক্তি, সে কেবলই নিজে উপার্জন করিয়া লয় নাই, ঝুল তাহেই হউক আর হস্ততাবেই হউক সে তাহার বংশ, সমাজ, পরিবারবর্গ, মাতা পিতা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে

উপাদান সংগ্রহ করিয়াছে। বংশ, সমাজ ও মাতাপিতা প্রভৃতির পুরুষ-পরিবারগত দোষগুণ অথবা স্বোপার্জিত দোষগুণের ফল বা ফলস্বরূপ তাহার জীবনকে গঠিত করিয়া তুলিয়াছে। সে জ্ঞানভঃ হউক অজ্ঞানভঃ হউক, তাহাদের নিকট খণী, তাহাদেরই মূলধন ব্যবসায় বুদ্ধির-সহযোগে আজ অভটুকু বাড়াইয়া তুলিয়াছে, এবং তাহারই আয় হইতে জগতের অশেষ কল্যাণ সাধনের জন্ত কিছু কিছু বিতরণ করিয়া যাইতেছে। সুতরাং এক জনকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে বিশেষতঃ যাহাকে বুঝিবার জন্ত আমাদের একান্ত আগ্রহ, যাহাকে বুঝিতে পারিলে আমাদের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে, যাহাকে বুঝা আমাদের একান্ত আবশ্যক এবং না বুঝিলে নিঃশেষেরই যথেষ্ট ক্ষতি এবং অপরাধের সম্ভাবনা, সেই মহাপুরুষ,—যিনি আমাদের জন্ত তাঁহার চিরজীবনের শ্রম-লব্ধ বিভ্রামার্জিত অনন্ত জ্ঞানরত্ন সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন, সেই বিভ্রাবিনয়-ভূষিত আদর্শ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত,—যাঁহার আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, অঙ্গুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান প্রকৃত পক্ষেই হিন্দুগণের আদর্শ ও অনুকরণীয়, এবং যিনি সমস্ত প্রাণ চালিয়া দিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত নীরব ধ্যানে দেশ ও সমাজ মাতৃকার পাদপদ্ম অর্চনা করিয়া গিয়াছেন, যাঁহার জীবনের প্রত্যেকটি ক্রিয়ার সহিত মুখ্য ও গৌণভাবে দেশের সর্ব সাধারণের বোণ গ্রহি রহিয়াছে, সেই মহাত্মা দেবকল্প-তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মর্ত লোকের জীবন চিত্রের বিশ্লেষণ করিতে হইলে কেবল তাঁহাকে লইয়া আলোচনা করিলেই চলিবে না, তাঁহার মাতা, পিতা, বংশ, সমাজ, ও পারিবারিক অবস্থা প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের একটু পরিচয় করিয়া লইতে হইবে। মহাপুরুষদিগের জীবনীর সংকলন কেবল সংসাহিত্যের অঙ্গ বলিয়া মনে করা সঙ্গত নহে। ইহাদের জীবনী আমাদের প্রত্যেকের জীবনের অঙ্গ, বিশ্ব মানব-সাহিত্যের অপরিহার্য্য পরিচ্ছেদ।

কাছেই আমরা আজ যাহাকে বুঝিতে চাহিতেছি,

তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝিতেই চেষ্টা করিব। বলা বাহুল্য এই জন্তই আমাদের বর্তমান প্রবন্ধে মহাত্মা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পিতা স্বর্গীয় রাধাকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের এবং তাত্‌কালিক সেরপুর সমাজের অতি সামান্য দুই চারিটা চিত্র প্রদর্শিত হইবে। সুপ্রসিদ্ধ ভট্টমারায়ণের বংশধর শান্তিস্যাগোত্র রাধাকান্ত সিদ্ধান্ত বাগীশ মহাশয়ের পিতা পৈতৃক বাসস্থান (ময়মনসিংহ) মুক্তাগাছার নিকটবর্ত্তী মানকোন্ গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া সেরপুর নগরে অতি সামান্য ভাবেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অল্পকাল ভাল ছিল না, কিন্তু একটা উজ্জল রক্ত ছিল, সেইটী একমাত্র পুত্র রাধাকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশ। সিদ্ধান্ত-বাগীশ মহাশয় পিতৃ-বিয়োগে সাংসারিক হইয়াছিলেন, কিন্তু অধ্যয়ন পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি অল্পবয়সেই মনোযোগ ও অধ্যবসায়-বলে ব্যাকরণ ও শব্দশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁহার পিতৃদেহ তাঁহার জন্ত বিষয় সম্পত্তি বিশেষ কিছু রাখিয়া যান নাই, এমন কি তাঁহাকে বিবাহ পর্যন্তও করাইয়া যাইতে পারেন নাই। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় অতুল প্রতিভা-বলে স্থানীয় জমিদারবর্গের বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া লইলেন। তাঁহারা তাঁহার প্রতি একান্ত সদয়তায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বলিতে গেলে তাঁহাদেরই যত্নে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন, তাঁহাদেরই বিভ্রামুগুণে চিরজীবন চতুর্ঙ্গাঙ্গী রক্ষা করিতে সমর্থ হন, এবং তাঁহাদেরই বদান্যতা শুধে বাড়ী-ঘর বিত্ত-বিত্তব সমস্ত সংস্থাপন করিয়া যান।

ময়মনসিংহ সেরপুর অতিদীর্ঘকালের উন্নত জনপদ। এইখানে বহু জমিদার, তালুকদার, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও কবিদ্বন্দ্বিতসম্পন্ন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। জমিদারগণ পুরুষপরম্পরাক্রমে বিভ্রামুগুণী, সংক্রিয়ান্বিত, দাতা ও পণ্ডিত-প্রতিপালক। তাঁহারা উক্ত জেলায় অতি প্রাচীন জমিদার, ইহাদের দেবতা, ব্রহ্মা ও গভর্নী দেওলা তালুক অপরিগণ্য; প্রত্যেক গৃহে দেবতা ও

অভিবিপ্লব, প্রত্যেক গৃহে বিদ্যাক্ষ ও কলাবিদগণের  
দৈনন্দিন সন্নিগন, প্রত্যেক গৃহে সদাচার ও ধর্মপ্রাণতা  
এবং প্রত্যেক গৃহেই লক্ষী ও বরষতীর অবৈর সংস্থিতি  
তৎকালে সেরপুরকে অতিবড় পৌরবাধিত করিয়া  
ভূমিয়া ছিল। তৎকালে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের মধ্যেও  
কতিপয় বেধাবী ও মনস্বী, সেরপুরের মুখ উজ্জ্বল করিতে  
ছিলেন। সেই সময়েই পণ্ডিত রাধাকান্তের অভ্যুদয়।  
সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় দরিদ্রতার মধ্যেই নিজের সম্মানের  
আগুনটী অধিকার করিয়া লইয়া ছিলেন। দরিদ্র যুবক,  
সহসা ঘুর হইতে আসিয়া স্থানীয় প্রশংসিত পণ্ডিতগণের  
প্রতিভা একটু জান করিয়া দিতেছেন দেখিয়া কেহ কেহ  
তাঁহাকে ঈর্ষ্যার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। জনশ্রুতি  
এইরূপ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়কে অপদস্থ করিবার  
জন্তও না কি কোন কোনও মহাত্মা (?) চেষ্টা পাইয়া  
ছিলেন, কিন্তু তৎকালে আড়াই আনির বড় হস্তার  
জমিদার স্বর্গীয় নবকুমার চৌধুরী মহোদয়ের জন্ত  
তাঁহার কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই  
মহাত্মা বর্তমান সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী স্বয়ং বিদ্বান্ ও  
বিভাবস্বামী শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী এম্. এ,  
মহোদয়ের পিতামহ। ইঁহারা পুরুষ-পরম্পরা-ক্রমে  
পণ্ডিত-প্রতিপালক। শ্রীযুক্ত গোপাল দাস বাবুর পিতা  
সন্তোষচন্দ্রাণী স্বর্গীয় গোবিন্দ কুমার চৌধুরী মহোদয়ও  
তর্কালঙ্কার মহাশয়কে চিরকাল সাহায্য করিয়াছেন,  
তাঁহা বখাওয়ানে বিবৃত হইবে। স্বর্গীয় নবকুমার চৌধুরী  
মহাশয়ের সময়ে সেরপুরে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিত-  
গণের সমাক্ষ ছিল। তাঁহাদের গুণগ্রামের বর্ধাধি বিচার  
হইত, এবং গুণগ্রামের পণ্ডিতগণ পুরস্কৃতও হইতেন।  
একথা বলিলে বোধ হয় বিধ্যা বলা হইবে না যে, তাবুশ  
গুণগ্রামী ভূম্যধিকারিগণের সাহায্যে নিশ্চিতচিত্তে  
পণ্ডিতগণ বেক্ষণ শাস্ত্রাভিলাষের সুযোগ পাইতেন এবং  
বেক্ষণ আশ্রয়ী হুঁজিলাত করিতে সমর্থ হইতেন, বর্তমান  
সময়ে আশ্রয়ের যেনের সেক্ষণ অবস্থা নহে। এবং

সেই জন্তই মনে হয় বিগত ৫০ বৎসর পূর্বে যে সকল  
পণ্ডিত জগৎগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের গাভিত্য এবং  
তাঁহাদের জীবনের ধারা স্বতন্ত্র ও স্পৃহনীয়। বাহা  
বলিতে ছিলাম, সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় প্রতিপক্ষের চেষ্টায়  
অনেক সময়ে নিজের প্রতিভার সম্যক্ বিকাশ করিতে  
পারিতেন না, কিন্তু স্বয়ং বিদ্বান্ নবকুমার চৌধুরী মহাশয়  
তাঁহাকে বেশ বুঝিয়া লইয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে সর্বত্র  
সুপরিচিত করিয়া দিতেন, এবং সর্বদা উৎসাহ প্রদান  
করিতেন।

ইতিমধ্যে সেরপুর নগরে পাবনার কাওয়া খোলা  
নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় নিমাই শিরোমণি মহাশয়  
আহুত হন, এবং লিগ্‌বিজয়ী শিরোমণি মহাশয়ের  
আগমনে সেরপুর আনন্দমুখর হইয়া উঠে। সভায়  
বিচার হইবে, শাস্ত্র সমালোচনা হইবে, এইজন্ত পণ্ডিত-  
সমাজ অভিযাত্র ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিত। নবকুমার চৌধুরী  
মহাশয়ের একান্ত আগ্রহ ও অভিলাষ যে, এই সুযোগে  
সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়কে ভাল করিয়া চিনিয়া লইবেন।  
ইতিপূর্বেই স্থানীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের সহিত একটি  
ব্যবস্থা লইয়া সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের মত-বৈধ উপস্থিত  
হয়। অল্পপনীত ব্রাহ্মণ পিতামহাতার শ্রাদ্ধে শ্রায়ত্রী পাঠ  
করিতে পারে কি না এই নিয়ম মত-বৈধ হয়। পণ্ডিত-  
কেশরী শিরোমণি মহাশয়কে মধ্যস্থ রাখিয়া প্রতিপক্ষের  
সহিত সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় বিচারে প্রবৃত্ত হন।  
অনেকক্ষণ বিচার হইয়াছিল। সভাগৃহ ধনবান্ ও জ্ঞানবান্  
দশক মণ্ডলীতে পূর্ণ হইয়া উঠিল, স্থানীয় জমিদারগণ  
শাগ্রহচিহ্নে বিচার-কল দর্শনের জন্ত এক দিকে  
বসিয়াছেন। নেতা নবকুমার চৌধুরী মহাশয় আজ সন্নিধ  
চিহ্ন, কিছু উন্নয়ন। তিনি সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়কে  
প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। আজ এই  
মহতী সভায় তাঁহার প্রকার দেবতাটী কি ভাবে সাধারণের  
নিকট গৃহীত হইবেন, কিরূপ সম্মানে সম্মানিত হইবেন  
অথবা যেরূপ অপমানই বা লাভ করিয়া চিরকালের জন্ত

তাহার মুখ মলিন ও ধারণা ভ্রান্ত করিয়া তুলেন এসকল চিন্তায় তাহার হৃদয় একান্ত আচ্ছন্ন। বহুক্ষণ বিচারের পর সভাপতি বা মধ্যস্থ শিরোমণি মহাশয় সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের জন্য ঘোষণা করিলেন।

তিনি মুক্তকণ্ঠে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের শাস্ত্রজ্ঞান ও বিচার-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিলেন। সভার সকল শ্রেণীর শোভা পরম আনন্দিত হইলেন। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় সকলের সম্মুখে ধর্মবাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তিনি আজ রুতরুতা, তাহার জীবনের একটি প্রধান চাপ আজ নামিয়া গেল। তাহার প্রতিভা-সমুজ্জ্বল চক্ষু আনন্দ-বাপে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে ভগবানের পদে লুটাইয়া পড়িলেন। আর যে মহাত্মা এই দরিদ্র, বিদেশাগত ব্রাহ্মণ যুবকটিকে প্রাণের মধ্যে স্থান দিয়াছেন, যাকে তিনি সকলের অপেক্ষা অধিক ভালবাসেন এবং অধিক বুদ্ধিতে পারিয়াছেন বলিয়া গৌরব বোধ করেন, আজ তাহার সেই শ্রদ্ধার দেবতাটি সভামধ্যে এগারুশ সম্মান ও পূজা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন দেখিয়া তিনি আনন্দ ও শ্রদ্ধায় একেবারে অভিভূত হইয়া সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। তাহার চক্ষে জল, হৃদয়ে আনন্দ ও শ্রদ্ধার তীব্র উচ্ছ্বাস, দেহে সাত্ত্বিক ভাবের পূর্ণ পরিষ্কৃতি। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় তাহাকে সাদরে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন, ইতিমধ্যে সভা ভঙ্গ হইল।

এই দিন হইতে নবকুমার চৌধুরী মহাশয় আরও বিশেষ করিয়া বুঝিলেন তিনি কি রকম পাইয়াছেন। এবার সিদ্ধান্ত বাগীশ মহাশয় চৌধুরী মহাশয়কে জানাইলেন তিনি আর এদেশে বাস করিতে চাহেন না। তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। অকারণ-শত্রুতাকারী অভিমানী পণ্ডিতগণ বিশেষ ভাবে অপদস্থ হইয়াছেন, তাহাদের স্থান মর্যাদা ও পাণ্ডিত্যের অভিমান প্রায় চূর্ণ হইয়াছে, এখন আর এখানে থাকিয়া বিবাদ করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। তিনি ৮ কাশীধাম যাইবেন প্রস্তাব করিলেন।

বলা বাহুল্য চৌধুরী মহাশয় এপ্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি তাহাকে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়া লইবার জ্ঞা এবং সংসারের বন্ধনটা আরও সুদৃঢ় করিয়া দিবার জ্ঞা সেরপুর বাগ রাখমা গ্রামে ( সিদ্ধান্ত-বাগীশ মহাশয়ের ) বাসের উপযোগী বাড়ী খর প্রস্তুত করাইয়া দেন, এবং বহুতর জমাজমি প্রদান করেন। বাড়ীর সম্মুখে একটি বড় রকম প্রকুর কাটাইয়া দিবেন প্রতিশ্রুত হইলেন। ইতি মধ্যেই কাশীধামগ্রামে সিদ্ধান্ত-বাগীশ মহাশয়কে বিবাহ করাইলেন। ইহারই গর্ভে ভার-তের উজ্জল রত্ন চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। সিদ্ধান্ত বাগীশ মহাশয় স্ত্রীলা পত্নী ব্রহ্মযমী-দেবীর সংসার-নৈপুণ্যে বিশেষ সুখে কালান্তিপাত করিতে লাগিলেন। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের শাস্ত্রচর্চা প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জ্ঞা নবকুমার চৌধুরী মহাশয় নয় আনির বাড়ীর সহিত মিলিত হইয়া তাহার গৃহেই একটি চতুষ্পাঠী করিয়া দেন। চৌধুরী মহাশয় ধানের বন্দোবস্ত পূর্বেই করিয়া দিয়াছেন। এই বার দুই হিন্দু মিলিত হইয়া চতুষ্পাঠীর মাসিক বায় নির্বাহার্থ দশটি টাকা মাসিক বৃত্তি করিয়া দিলেন, এবং সমগ্র সেরপুরে সিদ্ধান্ত-বাগীশ মহাশয়কে গীতাবৃত্তি সংস্থাপিত করিয়া দিলেন। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার পরিচয় পাইয়া এইবার দূরদেশের ছাত্রগণ তাহার নিকট অধ্যয়নের জ্ঞা আসিতে লাগিলেন। তিনি ছাত্র নিয়াই সর্বদা থাকিতেন। জমিদারগণ তাহাকে একান্ত শ্রদ্ধা করিতেন এবং সাহায্য করিতেন সত্য কিন্তু তিনি কর্তব্যকর্ণে ঔদাসীন্য করিয়া তাহাদের মোসাহেবী করিতেন না। তিনি সকলেরই বন্ধু ছিলেন কিন্তু স্তম্ভিপাঠক ছিলেন না। তিনি বড়লোক দিগের সংসর্গে আত্মবিস্মৃত হন নাই। আত্মসম্মানবোধটি তাহার বড়ই প্রবল ছিল। তিনি সকলের পক্ষেই “অশুভ শচাধগম্য” ছিলেন। দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়া ছাত্র পড়াইতেন, এবং নিজের ভক্তি বিশ্বাস অমুসারে দেবতর্জুন ও সন্ধ্যা আহিক করিতেন।

জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

এইবার জলকষ্ট উপস্থিত হইল, চৌধুরী মহাশয় প্রতিশ্রুতি পালনের বিলম্ব করিতেছেন দেখিয়া সিদ্ধান্ত-বাগীশ মহাশয় তাঁহাকে দ্রুততার সহিত জানাইলেন এবং দুই চারি কথা বেশ শুনাইয়া দিলেন। অবিলম্বে চৌধুরী মহাশয় স্বর্গীয় পদ্মমৈত্র মহাশয়কে লইয়া স্বয়ং পুকুরের স্থান দেখিবার জন্ত আসিলেন। স্থান নির্ধারিত হইল, পুকুর কাটানও আরম্ভ হইয়া গেল। অল্পদিনের মধ্যেই পুকুর কাটা শেষ হইয়া গেল। চৌধুরী মহাশয় এক দিন বিকালবেলা পুকুর দেখিবার জন্ত আসিলেন এবং সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়কে যুহু হান্তে বলিলেন “সিদ্ধান্ত-বাগীশ, আর কি অভিলাষ? এইবার আপনার মনো-বাসনা পূর্ণ হইল, কেমন?” সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় যুহু হাসিয়া বলিলেন “আপনাদের অমুগ্ধাহ আমার সমস্তই হইয়াছে—আমি একান্ত সন্তুষ্ট ও পরিতুষ্ট।”

চৌধুরী মহাশয় আবার বলিলেন, “তবু কিছু চাই কি না?” এইবার সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় বলিলেন, “আপনার নিকট আমার অবজ্ঞব্য কিছুই নাই, আপনি যদি নিতান্তই আমার আকাঙ্ক্ষা জানিতে চাহেন, তবে আমি অবশ্যই বলিতে বাধ্য। আমার একান্ত অভিলাষ যে, এই সমুদ্রের উত্তরাংশ সংক্রান্তিতে পুকুরটা উৎসর্গ করি।” চৌধুরী মহাশয় উচ্চ হাসিয়া বলিলেন, “সিদ্ধান্ত-বাগীশ, আমি যোগবলে আপনার সকল আকাঙ্ক্ষা বুঝিতে পারি, তাই আপনাকে এত পীড়াপীড়ি করিলাম, আচ্ছা, এই সংক্রান্তিতে পুকুর উৎসর্গ করিবেন।” চৌধুরী মহাশয় চলিয়া গেলেন, যথা সময়ে তাঁহার প্রেরিত সমস্ত আয়োজনে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের গৃহ পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি যতটুকু অমুষ্ঠান করিবেন তাবিয়াছিলেন কার্য্যতঃ তাহার অধিক বেশী হইয়া গেল। এই কার্য্যের সমস্ত ব্যয়ভার নবকুমার চৌধুরী মহাশয় বহন করিলেন। উত্তরাংশ সংক্রান্তিতে সিদ্ধান্ত-বাগীশ মহাশয় জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। তখনও বহুলোকে সেই ব্রাহ্মণের গৃহ পরিপূর্ণ। অপরাহ্নকালে

চৌধুরী মহাশয় স্বয়ং সেই গৃহে উপস্থিত হইলেন। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় সানন্দহৃদয়ে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন, এবারও যুহু হান্তে চৌধুরী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, “সিদ্ধান্তবাগীশ, আর কি চাই? কিছু অভিলাষ হইতেছে কি?” সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় একটু বিষমযুখে বলিলেন, “হাঁ হইতেছে বটে, কিন্তু অসময়ে। পূর্বে প্রস্তুত হওয়া উচিত ছিল।” “তবু শুনিতে বাধ্য কি?” “বাধ্য নাই আমার আকাঙ্ক্ষা হইতেছে আজ রাএই এই পুকুরের জল দিয়া একটা কালীপূজা করি।”

এই কথা বলিতে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের চক্ষে জল দেখা দিয়াছিল। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় প্রকৃতই এক জন গোঁড়া ভক্ত ছিলেন। শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল, ধর্ম্ম অচলা মতি ছিল। অকৃত্রিম এক নবকুমার চৌধুরী মহাশয় সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের প্রাণের আকাঙ্ক্ষাটি পূর্ণ করিবার জন্ত একান্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি ক্ষিপ্ততার সহিত তৎক্ষণাৎ কালীপূজার সকল আয়োজন করিতে লাগিলেন। ‘কুমার’ আনাইয়া প্রতিমা গড়াইতে আদেশ করিলেন, চারিদিকে ‘হৈ চৈ’ পড়িয়া গেল, সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় এ যাবৎ সস্ত্রীক জলগ্রহণও করেন নাই। দেখিতে দেখিতে পূজার আয়োজন হইয়া গেল, প্রতিমাও প্রস্তুত হইল। রাত্রিতে যথাকালে সিদ্ধান্ত-বাগীশ মহাশয় স্বয়ং পূজার আসনে বসিলেন। পতি-প্রাণা ভার্যা ব্রহ্মময়ী দেবী নিজহস্তে সমস্ত সাজাইয়া দিলেন। এবং দেবীর ভোগ রাধিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পূজা হইয়া গেলে সদলবলে সকলের সহিত প্রসাদ পাইলেন। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় কৃতার্থ হইলেন। ততোর্হাধিক কৃতার্থ হইলেন ভক্তের সর্সকার্য্যে পরম-সহায় চৌধুরী মহাশয়। এরূপ শত শত দৃষ্টান্তে সের-পুরের ভূম্যধিকারিগণের সহায়তা গুণগ্রাহিতা ও দানশীলতার সমর্থন করা যাইতে পারে। তখনকার সেরপুরের অবস্থা আমরা যে রূপে শুনিতে পাই তাহা বাস্তবিকই আজকালকার দিনে দুর্লভ।

সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়কে জমিদারগণ মন্ত্রণাকাণ্ডেও প্রশ্রয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা সেই নির্ভীক, সত্যবাদী, বুদ্ধিমান যুবকের কথা অনেক সময় শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতেন। শুনা যায় নবকুমার চৌধুরী মহাশয় একবার না কি সেরপুরের সমস্ত ব্রহ্মত্রা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কি কারণে জানি তিনি তথাবিধ বিস্তৃত-ভোগীদের প্রতি একান্ত বিরক্ত হইলেন। তিনি বলিতেন, এ সকল ব্রহ্মত্রা পারিতোষিক। ব্রহ্মগণ এখানে বাস করিতেন, অন্ন-বস্ত্রের অভাব নবৃত্তির জন্য জমিদারগণ সাময়িক সাহায্য করিয়াছেন, কিন্তু চিরকালই তাঁহারা উহা যথেষ্ট উপভোগ করিবেন বা দান বিক্রয় করিবেন এরূপ হইতে পারে না। পরন্তু তাঁহারা এখানে থাকিয়া উপভোগ করিতেছেন না। তাঁহারা মোটেই উহা পাইতে পারেন না।” এ সকল যুক্তি অপেক্ষা প্রতাপের প্রাবল্যে ব্রহ্মত্রা-বিস্তৃতভোগী অনেকেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। প্রায় পাঁচ হাজার টাকার ব্রহ্মত্রা বাজেয়াপ্ত হইয়া গৃহদেবতার সম্পত্তি রূপে পরিগণিত হয়, তখনও আত্মভোগের প্রতি তেমন দৃষ্টি ছিল না। বহুলোকে বহুপ্রকার অমুনয় বিনয় করিয়াও নবকুমার চৌধুরী মহাশয়ের কার্য্যে বাধা দিতে পারেন নাই। অনেকে ভয়েই সন্মুখীন হইয়া কোনও কথা বলিতে সাহস করেন নাই। কিন্তু সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় নির্ভীকচিত্তে চৌধুরী মহাশয়কে যথেষ্ট স্পষ্ট কথা শুনাইলেন, এবং জেদ করিয়া বহু সম্পত্তি ছাড়াইয়া লইলেন। জনপ্রতি এইরূপ অর্দ্ধাংশের ও বেণী সম্পত্তি আবার সেই সকল ব্রাহ্মণকেই তিনি দেওয়াইয়াছিলেন।

এরূপ পণ্ডিত এবং এরূপ জমিদার হয় কি? আমরা বর্তমান প্রবন্ধে নবকুমার চৌধুরী মহাশয়ের কথাই বেশী ভাগে উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু সেরপুরের সকল জমিদারই অল্প বিস্তর রকমে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়কে সর্ববিধে সাহায্য করিয়াছেন। সেরপুরের জমি-

দার মণ্ডলীর একটি অজ্ঞাতসাধারণ গুণ ও মহত্ব, তাঁহারা চিরকাল গুণবানের সম্মানকারী ও আশ্রিত-বৎসল। আমরা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জীবনেও এ দৃষ্টান্তের অভাব দেখিতে পাই নাই। তর্কালঙ্কার মহাশয় সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের প্রথম পুত্র। তিনি ছোট কাল হইতেই পিতামাতার বিশেষ আদরের ছিলেন। নবকুমার চৌধুরী মহাশয়ও তাঁহাকে একান্ত ভাল বাসিতেন ও “চুড়ামণি” বলিয়া ডাকিতেন। জানি না কোন সর্বশক্তি-শালিনী ঐশী শক্তির প্রেরণায় শিশু তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রতিভামণ্ডিত মুখখানি দেখিয়াই চৌধুরী মহাশয় তাঁহার ভারতবর্ষের ভাবি চুড়ামণিদের ভবিষ্যৎবাণী করিয়া গিয়াছেন।

তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিয়াছেন, শিশুকালে তাঁহার একবার খুব জ্বর হয় এবং গ্ৰীহা হয়, তিনি একান্ত কাতর হইয়া পড়েন। বাঁচিবার ভরসা ছিল না। চৌধুরী মহাশয় নিজের গৃহচিকিৎসক নিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। কবিরাজ মহাশয় ভাল করিয়া দেখিলেন। চৌধুরী মহাশয় সাশ্রুনেত্রে গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন “চুড়ামণি” ভাল হইবে ত?” কবিরাজ মহাশয় বলিলেন “হাঁ, ভাল হইবে।” এইবার চৌধুরী মহাশয় সিদ্ধান্ত বাগীশ মহাশয়ের শিক্ষা মত বলিলেন, “চুড়ামণি, তুমি বল রোজ একবারের বেণী আহার করিবে না।” কবিরাজ মহাশয়ও তাহারই প্রতিশ্রুতি করিলেন। প্রাণা হইলে সাধারণতঃ ভোজন-স্পৃহা না কি বেশি হইয়া থাকে, তর্কালঙ্কার মহাশয় বেশী মাত্রা আহার করিতেন এবং পাঁচ সাত বার খাইতে বসিতেন। চৌধুরী মহাশয় আবার বলিলেন, “চুড়ামণি, কবিরাজ যৎদিন পর্য্যন্ত দুবার পাতে বসিতে না বলিবেন তত দিন এক বার পাতে বসিতে হইবে, তুমি স্বীকার কর।”

প্রতিভাশালী তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রমাদ গণিলেন। রোগের প্রভাবে ভীত বুদ্ধিমান জালা কি প্রকারে জুড়াইবেন? ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া তিনি বলিলেন

জ্যৈষ্ঠ ১০২১

“অবশ্য একবারই পাতে বসিব, কিন্তু বসিব বাবার সঙ্গে, উঠিব মার সঙ্গে।”

উপস্থিত সকলে বুঝিলেন বালকটি সহজ নহে। জৈশ্বরীশীর্ষাদে তর্কালঙ্কার মহাশয় রক্ষা পাইলেন। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় একান্ত ধর্মভীরু, শাস্ত্রবিদ্বানী এবং পবিত্রস্বভাব ছিলেন। ভগবানের নামে তাঁহার চক্ষে জল আসিত, প্রাণে আনন্দের উৎস ছুটিত, তর্কালঙ্কার মহাশয় এ সকল পিতৃ-গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় গল্প করিয়াছেন সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় এক বার পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে ৬ জগন্নাথ দর্শন করিতে যান। এক দিন সহরে একটি ক্ষুদ্র গলির ভিতর দিয়া যাহতে যাইতে সহসা এক জন ময়লাবাহী মেথর তাঁহার দৃষ্টি পথে পতিত হইল। তিনি দেখিলেন তাঁহারই দিকে সেই ময়লাবাহী মেথর ধীরে ধীরে আসিতেছে, তাহার মাথায় ময়লার হাঁড়ি, শরীরের কোনও কোনও স্থানে ময়লার অংশ লাগিয়া রহিয়াছে, মাথার উপর মাছি ‘ভন্ ভন্’ করিতেছে। সে জইমনে জগন্নাথের প্রসাদী পিষ্টক খাইতে খাইতে তাঁহার কেবল কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, তিনি মুহূর্তে দেখিলেন সেই মেথর ভূতাবশিষ্ট পিষ্টকখানা তাঁহার মুখের কাছে ধরিয়াছে, মুহূর্তে তাঁহার আপাদমস্তক বিহ্ব্য সাড়া দিয়া গেল, এবং ভক্তপ্রধান সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় জাতিধর্ম, সমাজ, আত্মজীবনের সংস্কার, এবং সর্কোপেক্ষা বলবত্তর রূপা ও তিতিকার কথা বিস্মৃত হইয়া মুহূর্তমধ্যে তাহা গ্রহণ করিলেন,—এ হেন প্রসাদ গ্রহণ করিতে পারিলেন বলিয়া জগন্নাথের চরণে বার বার প্রণাম করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার গুণঘর বাহী প্রেমাত্মধারায় ভগবানের পাদপদ্ম ধোত করিয়া দিলেন। এই গল্পটি বলিবার সময় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের রোমাঞ্চ হইত। তাঁহার চক্ষু ছল ছল করিত, এহেন ধর্মপ্রাণ প্রতিভাশালী মহাত্মার পুত্র তর্কালঙ্কার মহাশয় এত বড় হইবেন না ও

কে হইবে? ভূনিয়াছি তাঁহার জননী ব্রহ্মময়ী দেবীও অত্যন্ত গুণবতী ছিলেন, অত্যন্ত পতিভ্রতা ছিলেন। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের সর্কবিধ উন্নতিকামী নবকুমার চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে বহু জমি ব্রহ্মদাত্ত এবং “চাঙ্গির ভিটা” প্রভৃতি তালুক প্রদান করিলেন। এখন তাঁহার কিছুরই অভাব নাই, বহুতর ছাত্রকে অন্নদান ও বিদ্যাদান করিয়া সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় দেশের মধ্যে বিশেষ যশস্বী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে ৬ কালীমোহন তর্কভূষণ, ৬ গোলোক চন্দ্র আয়ালঙ্কার, ৬ ভোলানাথ তর্কবাগীশ ও ৬ রাম মোহন বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তর্কালঙ্কার মহাশয় পিতৃদেবকে একান্ত ভয় করিতেন, সেই জন্তই সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় নিজের ছাত্র বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় ও আয়ালঙ্কার মহাশয়কে পুত্রের পাঠ শিখাইয়া দিবার জন্ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সিদ্ধান্ত বাগীশ মহাশয়ের চারি পুত্র দুই কন্যা। সর্কজ্যেষ্ঠ তর্কালঙ্কার মহাশয়, আর তিন ভাই রামচন্দ্র, শিবচন্দ্র ও রঘুনাথ, ও বামা-সুন্দরী ও বরদা সুন্দরী। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় পুত্রদিগকে উপযুক্ত করিয়াছিলেন। রঘুনাথ অল্পবয়সেই মারা যান। তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে রামচন্দ্রও বিশেষ প্রতিভাশালী ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষায় বিশেষ ব্যৎপন্ন ছিলেন। তিনি দুইখানি কি এক খানি বাঙ্গলা খণ্ডকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় গল্প করিয়াছেন উহার কবিপ্রতিভা না কি সবিশেষ প্রশংসনীয় ছিল। রামচন্দ্র অধ্যাপনার দিকে লক্ষ্য না করিয়া গবর্ণমেন্ট চাকুরী লইলেন। ময়মনসিংহ সদরে জজের পেশ্কার হইলেন। মাসিক একশত টাকা বেতন পাইতেন। তখনকার জজ সাহেবগণ রামচন্দ্রকে দণ্ডি হস্ত মনে করিতেন। রামচন্দ্রের অধ্যবসায়ের কথা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পাঠ সৌকর্য্যের নিমিত্ত প্রায় একশত পঁচিশ খানা সংস্কৃত পুস্তক স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছেন। তিনি এসকল পুস্তক অবসর মত



লিখিতেন, তাঁহার হাতের অক্ষর মুক্তার মত ছিল। তিনি বিষয় সম্পত্তিরও অনেক উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। রামচন্দ্র অপূত্রক অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় তাঁরধাড়া উদ্দেশে সপরিবারে নৌকাযোগে মুর্শিদাবাদ যান। তখন তাঁহার শেষ বয়স। তিনি মুর্শিদাবাদে সজ্ঞানে গঙ্গা লাভ করেন। তিনি বলিতেন, “আমি যেন ছাত্রের হাতে অগ্নি-সংকার লাভ করি।” তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছিল। তখনও সঙ্গে দুই একটা ছাত্র ছিলেন। তাঁহারাই সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া ছিলেন। এই আকাঙ্ক্ষাটি আমরা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মধ্যেও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি, তিনি আমাদের সন্মুখাই এই কথা বলিতেন। দারুণ ব্যাধির যন্ত্রণায় যখন অস্থির হইতেন, ছাত্র আসিয়া একটু বাতাস করিলেই যেন কত আরাম বোধ করিতেন! তাঁহার ত মুতু্যকাল পর্য্যন্ত ছাত্রগণ সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। এ বৃত্তিটীও তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি। এইরূপ বহু গুণ আমরা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মধ্যে দেখিতে পাই, যাহা তাঁহার নিত্যসঙ্গী হইয়াছিল। বংশানুক্রম চরিত্র, সমাজ ও দেশ কালের অনুরূপ চিন্তা শক্তি, এবং পিতা মাতার হৃদয়ের বৃত্তির অনুরূপ বৃত্তি ও প্রতিভা লইয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তা ছাড়া তাঁহার স্বোপার্জিত জ্ঞানগুণের শুভাদৃষ্ট এবং ইহজন্মের পরিশ্রম ও অধ্যবসায় প্রভৃতি তাঁহাকে এত বড় করিয়া তুলিয়াছিল। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় তাঁহার পুত্রের জীবনটী নিজের ত্যাগ, মহত্ব, প্রতিভা ও সদাচারের মধ্য দিয়া গড়িয়া তুলিয়া ছিলেন। আর আজ তাঁহার সেই পুত্রের একটা মাত্র জীবন, পৃথিবীর অনন্ত নরনারীর জীবনধারা গঠনের উপযুক্ত সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। এ সামগ্রী-সংগ্রহের মূলভূত কারণ যাহারা তাহাদের নিকট পৃথিবী চিরকাল রুতজ থাকিবে।

(ক্রমশঃ)

ঐকালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী।

## আয়ুর্বেদে—অস্ত্রচিকিৎসা।

চাঁদসী প্রচলনমতে

### ত্রণ বিজ্ঞান

প্রদাহিত স্থানে পুঁজ উৎপন্ন হইয়া কোন গঠনাবলীর মধ্যে জমা হইলে তাহাকে ত্রণ বলে। পুঁজের চারিদিকে প্রৈয়িক ঝিল্লির একটা আবরণ এবং তাহার চারিদিকে শুষ্ক মাংসাস্তরের প্রাচীর বিস্তৃত থাকে।

ত্বক, মাংস, শিরা, স্নায়ু, অস্থি, সন্ধি কোষ ও মর্শ এই আটস্থানের দোষে এক বা পরস্পরের আশ্রয়ে ত্রণ জন্মিয়া থাকে। এই সব স্থানের মধ্যে ত্বক ভেদ করিয়া যে সব ত্রণ উৎপন্ন হয়, তাহা সুখসাধ্য; অবশিষ্ট স্থানোৎপন্ন ত্রণ, বিশেষতঃ যাহার আকার অস্বাভাবিক অর্থাৎ গোল নহে তাহা কষ্টসাধ্য। ত্রণ দুই প্রকার—সম্ভ ও পুরাতন। তন্মধ্যে পুরাতন ত্রণ পুরাতন প্রদাহ স্থানে বিস্তারিত বর্ণিত হইবে।

সদ্য ত্রণ—সম্ভ ত্রণ ছয় প্রকার, বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতিক, রক্তজ ও আগন্তুক। এর মধ্যে বাতজ ত্রণ বিষমভাবে ও বিলম্বে, পিত্তজ ত্রণ অপেক্ষাকৃত দ্রুত দোঁরিতে, কফজ ত্রণ সঘরই পাকিয়া থাকে। সান্নিপাতিক ত্রণ কোথাও বিলম্বে কোন স্থানে সঘর ও আগন্তুক ও রক্তজ ত্রণ পিত্তজ ত্রণ সদৃশ পাকিয়া থাকে।

লক্ষণ—বাতজ ত্রণে নানা প্রকার উদ্বেগ উপস্থিত হয়, কিন্তু কোনটাই বেগী সময় স্থায়ী হয় না। সচরাচর ছেদন, ভেদন, তাড়ন, আকুঞ্জন, শেলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা, স্পর্শ-শক্তির অভাব, এবং ছাই, কপোত, অরুণ বা রক্ত বর্ণ হয়।

পিত্তজ ত্রণ, নীল, পীত, হরিৎ, কৃষ্ণ, রক্ত,



কপিল বা পিঙ্গল বর্ণ বিশিষ্ট হয়; বিশেষতঃ ত্রণ পাকিবার সময়, শরীরে অগ্নিনিষ্কেপ করিয়াছে বলিয়া অনুমান হয়, এবং গলিয়া গেলে ক্ষতে ক্ষারদ্রব্য জ্বালাপোড়া বিদ্যমান থাকে।

**কফজ ত্রণ**—চুলকানিযুক্ত ও অল্প বেদনা বিশিষ্ট, শীতল ও স্নিগ্ধ, শেত ও পাণ্ডু বর্ণ, এবং শুষ্ক ভাব যুক্ত।

সান্নিপাতিক ত্রণে এই তিন প্রকার ত্রণের লক্ষণাবলি মিলিতভাবে প্রকাশিত হয়, এবং বর্ণ ও বেদনাদ্বির হঠাৎ পরিবর্তন হয়, তন্ময়ক জ্বালাপোড়া বিদ্যমান থাকে, রোগী অল্পসময়ের মধ্যে নিশ্বেজ হইয়া পড়ে। এই ত্রণ দেখিলেই সহজে অনুমান করা যায়।

রক্তজ ত্রণে পিত্তজ ত্রণের লক্ষণাবলিই প্রকাশিত হইয়া থাকে।

**স্রাব**—ত্রণের আশ্রয়স্থানের মধ্যে ত্রকে ত্রণ উৎপন্ন হইলে কাচা মাংসের গন্ধবিশিষ্ট স্রব পীত বর্ণ জলের মতন পূঁজ নিঃসৃত হয়। মাংস মধ্যে ত্রণ জন্মিলে স্বতের স্থায় ঘন সাদা পিচ্ছিল পূঁজ নিঃসৃত হয়। শিরাগত ত্রণ হইলে অল্প করা মাত্রই অত্যন্ত রক্ত নিঃসৃত হইতে থাকে, অথবা জলনালীর জলনির্গমের মতন লাল বা লোহিত সদৃশ পিচ্ছিল কৃষ্ণবর্ণ পূঁজ ছিন্ন স্রবের স্থায় অতি সূক্ষ্ম ধারে নির্গত হইতে থাকে। স্নায়ুগত ত্রণ হইলে স্নিগ্ধ ঘন রক্ত মিশ্রিত পূঁজ বা নাসিকা হইতে নিঃসৃত স্নায়ুর মতন পূঁজ বাহির হয়। অস্থিগত ত্রণ হইলে অস্থি অসার হইয়া পড়ে, এবং বিলুপ্ত ঘোয়া জলের মতন স্নিগ্ধ স্রাব বা রক্ত মজ্জার সহিত মিশ্রিত হইয়া বাহির হয়। সন্ধিগত ত্রণ ভাল রকম উখিত হয় না, বা টিপিলে তাহা হইতে বিশেষ কোন স্রাব হয় না, কিন্তু গমন, আকৃষ্টন প্রসারণ দ্বারা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কোষদেশগত ত্রণ হইলে তাহা হইতে রক্ত-মূত্র, পুরীষ, পাতলা পূঁজ বা রস নিঃসৃত হয়। মর্ষদেশগত ত্রণ হইলে সেই মর্ষ যে জাতীয় স্রাবও সেই প্রকার হইয়া থাকে।

ইহাই স্রাবের সাধারণ নিয়ম, কিন্তু বাতাদি দোষের প্রকারভেদে স্রাবেরও তারতম্য হইয়া থাকে।

বাতজ ত্রণ হইলে স্রাব কিছু ঠাণ্ডা ও কৃষ্ণবর্ণ হইবে। দধিমত্ত, ক্ষার, জল বা মাংস দ্ব্যত জলের মত স্রাবের বর্ণ হইবে।

পিত্তজ ত্রণ হইলে স্রাব গরম এবং গোমেদ, গোমূত্র, ছাই অথবা সাদা বর্ণ বিশিষ্ট, কষায় বা মধুর রসযুক্ত।

কফজ ত্রণ হইলে স্রাব শীতল, এবং নবনীত, মজ্জা, চাউলের গুঁড়া বা বরাহচর্কি সদৃশ বর্ণ বিশিষ্ট হয়। কিন্তু কোন স্থলে হিরাক্ষ বা নারিকেল জল সদৃশ স্রাবও নিঃসৃত হইয়া থাকে।

রক্তজ ত্রণ হইলে পিত্তজ ত্রণবৎ স্রাব হয়, অধিকতর আমিষ গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। সান্নিপাতিক ত্রণ হইলে স্রাব গরম এবং নানা বর্ণ বিশিষ্ট হয়, তবে কাণ্ডী, ষষ্ক, মুগের ঘূষ, কাকুড়ের রস সদৃশ বর্ণ বিশিষ্ট স্রাবই সচরাচর হইয়া থাকে।

সাধ্য, অসাধ্য, দোষ-দুষ্ণ ও স্থানের প্রকারভেদে চিকিৎসাকালে এই সব ত্রণ চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা, সুখসাধ্য, কষ্টসাধ্য, অসাধ্য ও বাপ্য। যথা কালে প্রতিকার না হইলে সুখসাধ্য ত্রণও অসাধ্য হয়, অথবা রীতিমত চিকিৎসা হইলে অসাধ্য ত্রণও অনেক স্থলে আরাম হইয়া থাকে। রোগী যুবা, দৃঢ়-শরীর, ক্রেশসবিক্ষু ও বলবান হইলে হস্ত, পদ, ললাট, গণ্ড, ঙ্গ, ক্ষিক (পাছা) ওষ্ঠ, পৃষ্ঠ ও মুখমধ্যে জাত ত্রণ সুখসাধ্য।

রোগী বৃদ্ধ বা কৃশ, ভীক, অল্পপ্রাণ হইলে, এবং উপস্থ, কর্ণ, কোষ, উদর, সন্ধি, চক্ষু, দন্ত, নাসিকা, অপান, কঠর, সেচনী, পার্শ্ব, কুক্ষি, বক্ষ, বগল, স্তন ও অস্থিজাত ত্রণ কষ্টসাধ্য। মধ্যমুখ ভগন্দর, সেচনোস্থানে, অস্থিগত ত্রণ এবং ত্রণের উপর ত্রণ হইলে ত্রণ কষ্টে আরাম হয়। প্রমেহ, মধুমেহ, শর্করামেহ, কুষ্ঠ, বিষাক্ত রোগীর ত্রণ

কষ্টসাধ্য। ত্রণ বিসর্পিত হইলে বা সঞ্জন পুঞ্জরক্ত বাহির হইলে কষ্টসাধ্য।

বাতকুণ্ডলী, অণ্ডিনা, দন্তবেধ, উপকূশ, কঠ, সান্থ উরুক্ষত ত্রণগ্রাসি ও মূত্রাশয় পাকায় আমাশয় ও ফুসফুস প্রাত ত্রণ যাপ্য, অর্থাৎ সহজে প্রাণ নাশক হয় না; কিন্তু চিকিৎসায় আরাম হয় না। যে এণ কঠিন গোশৃঙ্গবৎ উন্নত দূষিত কৃধির বা পাতলা পিচ্ছল আইস ধোয়া জলের মত শ্রাব যুক্ত স্নায়ুজাল সমন্বিত (টিউমার) সেই ত্রণ অসাধ্য। ক্রীণমাংস ব্যক্তির অধিক পুঞ্জ ও রক্ত বাহী ত্রণ হইলে বা ত্রণের চারিদিকে শোথ ও মাংসের বৃদ্ধি জন্মিলে বা অরুচি, অপাক, শ্বাস, কাশ, জ্বর, প্রভৃতি উপদ্রব ঘটিলে ত্রণ অসাধ্য। মন্তকে বা কঠে শব্দবাহী ত্রণ হইলে ত্রণ অসাধ্য। মন্তকের হাড় ভাঙিয়া মগজ দৃষ্ট হইলে এবং সঙ্গে কাশ ও শ্বাসরুদ্ধতা ঘটিলে ত্রণ অসাধ্য। পাকায় হইতে ত্রণ ধোয়া জল এবং আমাশয় হইতে কলাইর জল ও রক্তাশয় হইতে ক্ষারজলবৎ শ্রাব হইলে ত্রণ অসাধ্য।

**পঞ্চাপেক্ষ**—সচরাচর প্রদাহের পচ্যমান অবস্থা আরম্ভ হইলে তিন দিন মধ্যেই পুঞ্জ উৎপন্ন হয়। প্রদাহের মধোর গলনকার্য শেষ হইলেই ত্রণ সুপক হইয়াছে বলিয়া জানিবে। এই সময়ে প্রদাহের লক্ষণাবলি কমিয়া যাইবে, অকুলী দ্বারা চাপ দিলে মধ্যে পুঞ্জের ঢেউ অনুভব হইবে। এই অবস্থায়ই অস্ত্র করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। নচেৎ পুঞ্জ ত্রণ-প্রাচীরের সহ্য মাংস ধ্বংস করিয়া পুঞ্জ ও গহ্বরের আকার বৃদ্ধি করিতে থাকিবে। তাহা হইলে অস্ত্রের পরে ক্ষত অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত হইয়া থাকে, অধিকন্তু ত্রণের উপরিভাগের চামড়া পাতলা হইয়া যায় এবং শেষে এই পাতলা চামড়া নীচের মাংসের সহিত সংযুক্ত হইতে চাহে না।

**দ্বিতীয়তঃ**—পুঞ্জের স্বাভাবিকগতি নিম্ন দিকে। কাজেই

নিম্নগতি হইয়া কোন এক স্থানে আবদ্ধ হইয়া সেখানেও একটা গ (কেভীটা) উৎপাদন করে, এবং উপরের মুখ দ্বারা সামান্য পুঞ্জ বাহির হইয়া অবশিষ্ট পুঞ্জ উক্ত গর্তেই আবদ্ধ থাকে। তখন সেখানেও অস্ত্র করিয়া পুঞ্জ নিঃসরণের পথ সরল করিয়া দিতে হয়। আর যদি যথা কালে এই পুঞ্জ নিঃসরণের বন্দোবস্ত না হয়, তবে সেখান হইতে অত্র গতি হইয়া নালী বৃদ্ধি করিতে থাকে অথবা পুঞ্জ জমা থাকায় পুঞ্জের উত্তেজনায় রোগীর জ্বর ও অরুচি প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয় এবং কালে এই জ্বরই ক্ষয়কারী জ্বর রূপে পরিণত হইয়া রোগী ক্রমে দুর্বল হইতে থাকে, এবং উপসর্গাদি বৃদ্ধি পাইয়া রোগী মৃত্যু-মুখেও পতিত হয়।

**তৃতীয়তঃ**—প্রদাহের নিকটবর্তী যদি কোন স্বাভাবিক গহ্বর বা মূত্রাশয় (কিডনি) ফুস ফুস প্রভৃতি বিস্তারিত থাকে, তবে তাহা আক্রান্ত হইবার একান্তই সম্ভাবনা; হইলে, ব্যারাম কষ্টসাধ্য হয়, অনেক স্থলে অসাধ্যও হইয়া পড়ে। অস্থিসন্ধি আক্রান্ত হইলে, অস্থি বিচ্যুতি ঘটয়া থাকে এবং এই অস্থি প্রায়ই আর স্বাভাবিক হয় না।

**চতুর্থতঃ**—যদি কোন রক্তবাহী শিরা বা শিরামণ্ডল বিস্তারিত থাকে তবে পুঞ্জে ঐ শিরা ধ্বংস করিয়া দেওয়ায় অস্ত্রের পর হঠাৎ এমত রক্তস্রাব হইতে থাকে যে, রোগী ২১ দণ্ড মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অতএব যথা নির্দিষ্ট কালেই ত্রণ বিদারণ পূর্বক পুঞ্জ বাহির করিয়া দেওয়া চিকিৎসকের কর্তব্য। রোগী বালক, বৃদ্ধ, অসহিষ্ণু ও ভীক হইলে, ভেদক ঔষধ দ্বারা ত্রণ-প্রাচীর ভেদ করিয়া পুঞ্জ বাহির করিয়া দিবে। সোলা বা পলিতা দ্বারা মুখ বড় করিয়া চিকিৎসা করিবে। অনেক অজ বৈজ্ঞ এই প্রকার রোগীকে ঔষধ দ্বারা ত্রণ ফাটাইয়া দিবে বলিয়া আশঙ্ক করিয়া নানা প্রকার চাতুরী দ্বারা অথবা ঔষধ ব্যবহার করিয়া অনর্থক সময় নষ্ট ও অর্থশোষণ করে। ইহারা প্রকৃতই কুবৈজ্ঞ। ভেদক

জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১

ঔষধ ব্যতীত এমত ঔষধ নাই যাহাতে ত্রণ ফাটিতে পারে, তবে যে তাহার অনেক স্থলে বাহাদুরী লইয়া যায় তাহা তাহাদের কৃতিত্ব নহে। সময়ের বিলম্বে স্বতঃই পুঁজ বৃদ্ধি হইয়া বা পুঁজ বৃদ্ধিকারক ঔষধ বা পুঁটিসে পুঁজ বৃদ্ধি হইয়া ত্রণের উপরের চামড়া পাতলা হইয়া যায় এবং পুঁজের চাপে আপনা হইতেই ত্রণ ফাটিয়া যায়। অপর পক্ষে অনেক বৈজ্ঞানিক প্রদাহের পচ্যমান অবস্থাই পাকা ভ্রমে, অথবা রক্তজ ত্রণের রক্তের তরঙ্গকেই পুঁজের ঢেউ মনে করিয়া অস্ত্রোপচার (অপারেশন) শেষ করিয়া থাকেন। ইহা পক্ষ ত্রণকে ভাগ করা অপেক্ষাও বিপদজনক। পক্ষ ত্রণ ভাগ করিলে অবশ্য পূর্নোক্ত দোষ ঘটয়া রোগী মারাও যাইতে পারে, কিন্তু তাহা বড় ঘটনা। কিন্তু কাচা ত্রণ কাটিলে প্রায় সর্বত্রই অল্লাধিক ক্ষতি হইয়া থাকে। প্রদাহের আক্রমণ অবস্থায় তাহার উপরে অস্ত্রের উত্তেজনা হওয়ায় প্রদাহ আরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অনর্থক কতগুলি রক্ত বহিয়া হইয়া যাওয়াতে রোগী দুর্বল হইয়া পড়ে। ত্রণ যদি বাত, অথবা পিত্তজ বা সান্নিপাতিক হয়, অথবা রোগী যদি বাতপিত্তপ্রধান প্রকৃতিবিশিষ্ট হয় তবে ত্রণ সাংঘাতিক ভাবে বিসর্পিত হইয়া পড়ে। রোগীর মধু মেহ শর্করামেহ বা নিরক্তাবস্থা থাকিলে অস্ত্রোপচার করিবার চোটে রোগী মারা যাইতে বাধ্য হয়। বিসর্পিত হউক বা না হউক প্রদাহের যে বিস্তৃতি ঘটবে তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই, এবং সচরাচর এই স্থলেই প্রায় নালী দেখা যায়। এই জন্যই

“যো স্নেক্সা তমজ্ঞানঃ যো বা পক্ষ মুপেক্ষতে”

### অস্ত্র চিকিৎসা।

অস্ত্র ক্রিয়া আট প্রকার (শস্ত্রতদেব)। যে রোগে যে ক্রিয়া আচরণীয় তাহা সেই সেই রোগ বর্ণন কালে বিস্তারিত বর্ণিত হইবে। ত্রণ চিকিৎসায় ভেদক ও বিশ্রাব্য ক্রিয়াই আচরণীয়।

অস্ত্র করিবার পূর্বে গ্ৰাকরা, গরম জল, শীতল জল,

কষায় দ্রব্যের জল, তুলা, ঔষধ যন্ত্র যন্ত্র, সলাকা সংগ্রহ করিয়া রোগী পশ্চিম মুখে ও চিকিৎসক পূর্বমুখে অবস্থান করিয়া ভগবানের নাম স্মরণ পূর্বক অস্থি ধমান মর্ষ প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যথা নিয়মে অস্ত্র করিবে।

**ভেদক ক্রিয়া।** ত্রণে যদি পুঁজ উৎপত্তি সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে, বিশেষতঃ কুস্কুস্, উদর-গহ্বর, বিজ্রম্বি, উরুস্তম্ভ প্রভৃতি বড় জাতীয় ত্রণ বা যে ত্রণের চারিদিকের প্রাচীর অম্লভব হয় না সেই সব স্থলে বোমা যন্ত্র দ্বারা ত্রণ ভেদ করিয়া লওয়াই কর্তব্য।

বোমা ঠিক সরল ভাবে ধরিয়া তাহার ফাটা দিক নিজের দিকে রাখিয়া, ত্রণের যে স্থান পাতলা বলিয়া অনুভব হইবে সেই স্থলে বোমা বসাইয়া দিবে। বোমা ত্রণ-গহ্বর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে একটুকু ধীরে সমুখের দিকে চাপ দিলেই ত্রণ-বস্ত্র বোমার ফাক দিয়া বাহির হইবে। মধ্য হইতে রক্ত বা মাংস ধোয়া জলবৎ পদার্থ বা চালিতার বিজল সদৃশ পুঁজ বাহির হইলে কখনও ত্রণে অস্ত্র করিবে না। সে দিবস পরিত্যাগ করিয়া ২৪ দিবস ত্রণ পাকান পুলটীশ, প্রলেপ দিয়া পুনরায় অস্ত্র করিবে। আর সুস্থ অথবা দূষিত পুঁজ দোষের প্রকোপ অনুসারে যে বর্ণেরই বাহির হউক না কেন অস্ত্র করিবে।

**প্রাচীর-প্রকিয়া।** ক্ষিপ-হস্ততাই অস্ত্র চিকিৎসকের প্রধান গুণ। অতএব অতি ক্ষিপ্রতার সহিত চিকিৎসক ত্রণ-প্রাচীর বিদীর্ণ করিবে। এই উদ্দেশ্যে “হোগল পাতি” যন্ত্রের ফলক বুদ্ধানুষ্ঠ ও মধ্যমা দ্বারা জোরের সহিত ধারণ করিয়া মাংসপেশীর লম্বা লম্বি ভাবে, ত্রণ গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে। এবং উক্ত অস্ত্র দক্ষিণে কিম্বা বামে চাপ দিয়া ধরিলে অস্ত্রের পার্শ্ব দিয়া পুঁজ বাহির হইবে, অস্ত্রের পার্শ্বদ্বারা পুঁজ বাহির না হওয়া পর্যন্ত ত্রণ প্রাচীর কাটা সমীচীন নহে। উক্ত প্রকারে পুঁজ বাহির হইলে ভিষক আপন অভিজ্ঞতা অনুসারে ত্রণ-প্রাচীর কাটিয়া দিবে। এই সময়ে ত্রণের পার্শ্ব অথবা নিম্ন প্রাচীর আহত না হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে

হইবে। ব্রহ্ম-প্রাচীর আহত হইলে নূতন প্রবাহ  
আরম্ভ হইবে, অথবা অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইয়া রোগী  
ক্লীণ ও দুর্বল হইয়া পড়িবে। আধুনিক চিকিৎসক-  
গণের এদিকে দৃষ্টি নাই বলিয়া অনেক কুফল ঘটিয়া  
ধাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকেশবচন্দ্র দাস।

## বাসনা ও সংযম

বাসনা বস্তার সম প্রবল প্রবাহে  
ভাসাইয়ে নিয়ে যায় মানব-জীবন,—  
সংযম ঋষির ছেন নিশিদিন চাহে  
হৃদি তার করে দেয় পবিত্র শোভন।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

## বিরহী

আমার এ ক্ষুধাতুর জুজু ছিয়া মাঝে  
শিথিল কামনা আজি মরিছে গুমরি,  
অভীত স্বপন রাশি অপরূপ সাজে,  
আকুল পরাণখানি রয়েছে আবরি।

লো প্রেমসি! প্রবাসিনি! বাজে কি পরাণে  
এ সুদূর প্রবাসীর ব্যস্তিত নিশাস!  
নিভৃত ভবন মাঝে জাগে কি স্মরণে  
পিপাসিত অন্তরের সলাজ আভাষ?  
মনে কি পড়ে না আজ, হে প্রিয়া আমার  
বিরহীর বিদায়ের তপ্ত আধি-ভল?  
বাতায়নে মুখখানি বিষাদ-আধার!  
করুণ আকুল দিঠি বেদনা-বিভল?  
—এ প্রবাসে, এ বিজনে বুধা ভাবি হায়,  
নয়নের জল শুধু নয়নে মিশায়!

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

## বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ইতিহাস

এবারে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন চারি শাখায় বিভক্ত  
হইয়াছিল। একই সময়ে এই চারি শাখার যুগপৎ  
অধিবেশন হওয়ায় কাহারও ভাগ্যেই একাধিক শাখার  
কার্য্য প্রণালী দর্শন ঘটিয়া উঠে নাই। সাহিত্য বলিতে  
ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি সমস্তই বুঝায় এবং যাহারা  
বঙ্গীয় সাহিত্যের বর্তমান গতি-প্রকৃতি প্রকৃতির বিষয়  
অবগত হইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা সমুদয় বিভাগের সম্বন্ধেই  
কিছু কিছু সংবাদ রাখিতে অভিলাষী। উত্তর বঙ্গ  
সাহিত্য সম্মিলনের পাবনা অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ সম্মিলনীর  
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বাহা বলিয়াছিলেন, আমাদের মনে হয়  
তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভাবে এপর্য্যন্ত কেহই সম্মিলনার উদ্দেশ্য  
ব্যাখ্যা করিতে যত্ববান হন নাই। তাঁহার মতে,

জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

সাহিত্যক্ষেত্রের একনিষ্ঠ সাধকগণ সমুদয় বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে যে ফল লাভ করিয়াছেন তাহাই সর্বসমক্ষে প্রদর্শিত করিবার সুযোগ প্রদান করা সম্মিলনীর মূল উদ্দেশ্য। এবার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে রবীন্দ্রনাথ কথিত এই মহান উদ্দেশ্য কতদূর সাধিত হইয়াছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। সাধারণ সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বঙ্গ সাহিত্যে কিরূপ কার্য্য হইতেছে, তাহা জানিবার কোন সুযোগ এবার সম্মিলনীতে দেওয়া হয় নাই। তাহার ফলে সমগ্র বঙ্গ সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করিবার যে একমাত্র সুযোগ ছিল আমরা বুद्धির দোষে তাহা হারাইয়াছি।

গত বিষয়ে অনুশোচনা করিয়া কোন ফল নাই। কিন্তু যাহাতে বর্তমান বৎসরের অসাধু দৃষ্টান্ত চিরস্থায়ী না হয় প্রত্যেকেরই তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। এবৎসরের যুগপৎ অধিবেশনের কুফলও যাহাতে যথা-সম্ভব মন্দীভূত হয় তাহারও চেষ্টা করা কর্তব্য। এই শেষোক্ত উদ্দেশ্যে আমরা নিম্নে ঐতিহাসিক বিভাগের কার্য্যপ্রণালীর যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করিলাম। ঐহারা ঐতিহাসিক বিভাগে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই তাঁহারা যাহাতে এই বিভাগের সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানলাভ করিতে পারেন ইহাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

২৯শে চৈত্র শনিবার ইতিহাস শাখার প্রথম অধিবেশন হয়। প্রথমতঃ সভাপতি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ওজস্বিনী ভাষায় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। এই অভিভাষণ মাসিক পত্রে মুদ্রিত হইবে, এবং অন্ততঃ এ বিষয়ের বিশদভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে,

সুতরাং বর্তমানে এবিষয়ে অধিক বলা নিম্প্রয়োজন। মৈত্রেয় মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে পুরাতত্ত্ব-অনুসন্ধান-প্রণালী বিশদরূপে বিবৃত করেন। এবিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর এবং প্রয়োজনীয়। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস নাই, অথচ যে সমস্ত উপাদানে এই ইতিহাস গঠিত হইতে পারে তাহার যে নিতান্ত অভাব একথা স্বীকার করা যায় না। উপাদান অনেক আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এখনও আবিষ্কৃত হইতেছে। কিন্তু এই উপাদান হইতে প্রকৃত ইতিহাস সংগঠন বড় সহজ সাধ্য নহে। কেবল ইট, কাঠ থাকিলেই যেমন গৃহ প্রস্তুত হয় না, সঙ্গে সঙ্গে স্থপতি-বিজ্ঞান প্রয়োজন, এমন কি গৃহের উৎকর্ষ অপকর্ষ প্রধাণতঃ এই স্থপতি-বিজ্ঞান উপরেই নির্ভর করে সেইরূপ ইতিহাসের উপাদান হইতে প্রকৃত ইতিহাস সংগঠন করিতে হইলেও একটি বিশেষ বিজ্ঞান প্রয়োজন। কিরূপে সেই বিশেষ বিজ্ঞানটি অধিগত হইতে পারে পৃষ্ঠনীয় মৈত্রেয় মহাশয় অতি সুন্দর প্রণালীতে তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বর্তমান কালে চতুর্দিকেই ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। মফঃস্বলের অনেক উৎসাহী যুবক অদম্য অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে ইতিহাস গঠনোপযোগী অনেক উপাদানও সংগ্রহ করিতেছেন। কিন্তু উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে অধিকাংশ স্থলেই এই সমুদয় উপাদানের প্রকৃত ব্যবহার হইতে পারিতেছে না। এমতাবস্থায় মৈত্রেয় মহাশয় তাঁহার সারগর্ভ অভিভাষণটিতে এই প্রকার ইতিহাস-গঠন প্রণালী সুচারুরূপে বিবৃত করিয়া বঙ্গদেশের একটি মহত্বপূর্ণ সাধন করিয়াছেন। ইউরোপধণ্ডে ক্লিন্ডারস (Klinders) ও প্যাট্রি (Patrie) প্রভৃতি যাহা করিয়াছেন,

দেশে শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ই সর্ব প্রথমে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের পুরাতন অমূল্যবস্তু যুবক মাত্রকেই আমরা মৈত্র মহাশয়ের অভিভাষণটি বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিতে অমুরোধ করি।

সভাপতির অভিভাষণ সমাপ্ত হইবার পর প্রবন্ধপাঠ আরম্ভ হয়। এবারে ইতিহাস শাখায় পাঠের জ্ঞাত বহু-সংখ্যক প্রবন্ধ প্রেরিত হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয়ও বিষয় নির্বাচন সমিতি একযোগে তন্মধ্যে ১৭ কি ১৮টি পাঠোপযোগী বলিয়া মনোনীত করেন। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল।

প্রথমে রায় সাহেব শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় “বৌদ্ধ জাতক” নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঈশানবাবু সুবৃহৎ বৌদ্ধ জাতক মালার বঙ্গানুবাদে ব্যাপৃত আছেন। প্রায় শতাধিক জাতক উপাখ্যান ইতিমধ্যেই অনূদিত হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধ এই অমূল্যগ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ। ‘জাতক’ পাঠের আবশ্যকতা কি, ইহা পাঠ করিলে নূতন কি কি বিষয়ে আমাদের জ্ঞানলাভ হইতে পারে ইত্যাদি বিষয় তিনি সংক্ষেপে আলোচনা করেন। এতদ্ব্যতীত জাতকের কাল নির্ণয় সম্বন্ধেও তিনি কিছু আলোচনা করেন। এই অংশ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতের পুনরাবৃত্তি মাত্র, নূতন কোন যুক্তি প্রণালী অবলম্বনে কোন নূতন সিদ্ধান্তের অবতারণা একেবারেই নাই। জাতক পাঠের আবশ্যকতা সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার মধ্যেও নূতন কিছুই নাই। দশরথ জাতক, বভেজ্জ জাতক প্রভৃতি দ্বারা রামায়ণের রচনাকাল, ভারতবর্ষের প্রাচীন বাণিজ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যে অনেক জাতব্য তথ্য জানিতে পারা যায় তাহা সর্বজনবিদিত। কিন্তু এই ভূমিকা অংশ বিশেষ মূল্যবান না হইলেও প্রস্তাবিত জাতকের অমূল্যবাদ যে বঙ্গ সাহিত্যের একটি বিশেষ অভাব যোচন করিবে তাহা আমাদের সন্দেহ নাই।

অতঃপর শ্রীযুত বাবু সুরেন্দ্রনাথ কুমার বক্তৃত্যর গ্রীক রাজগণ নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সুরেন্দ্র বাবু যে বিষয়টি নির্বাচন করিয়াছেন তাহা বঙ্গ সাহিত্যে এক প্রকার নূতন। বীরবর আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর তদীয় বিজিত রাজ্য সমূহ তাঁহার বিখ্যাত সেনাপতি গণের করগত হয়। এশিয়ার অন্তর্গত যে সমুদয় স্থান আলেকজান্ডার জয় করিয়াছিলেন তাহা সেলুকস নামক সেনাপতির রাজ্যভুক্ত হয়। হিন্দুকুশ পর্বতমালার উত্তর স্থিত, অকশাস (Oxus) ও জ্যাকজারটেস (Jaxartes) নামক তটিনীদ্বয় বিধৌত বক্তৃত্য নামক প্রদেশ তাহার অন্তর্গত। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে এই ভূভাগ সেলুকসের বংশধরগণের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করে। তৎপরে বহুকাল পর্য্যন্ত গ্রীক রাজগণ এই প্রদেশে পরাক্রম সহকারে রাজত্ব করেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আলেকজান্ডারের অনুকরণে ভারতবর্ষে অভিযান করেন, এবং পাজাব আফগানিস্থান প্রভৃতি প্রদেশ বহুকাল তাঁহাদের শাসনাধীনে থাকে। এমন কি সুদূর গুজরাট প্রভৃতি স্থানে তাঁহাদের রাজ্য কিছুকাল পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রায় তিনশত বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের প্রান্ত প্রদেশে এই গ্রীক রাজ্যের অবস্থান ইতিহাসের একটি বিশেষ অরণীয় ঘটনা বলিতে হইবে। এই দুই প্রাচীন সভ্যতার সংস্পর্শে, পরস্পরের ভাববিনিময় ও সভ্যতার আদান প্রদান কিরূপ সম্পাদিত হইয়াছিল বর্তমানে তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই। তবে এই উভয় সভ্যতার মধ্যে যে পরস্পর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলিতেছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার নানা বিভাগে যে গ্রীক প্রভাব স্পষ্টরূপে বিদ্যমান, তাহা এই সংস্পর্শেরই ফল। আলেকজান্ডারের স্বল্পকালস্থায়ী অভিযান সমধিক বিখ্যাত হইলেও তাহাতে এই প্রকার ভাববিনিময়ের কোন সুযোগ বর্তমান ছিল না। বক্তৃ-

জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

রায় গ্রীক রাজগণ তিনশত বৎসর ভারতবর্ষের প্রান্ত দেশে বাস করার নিমিত্তই এই প্রকার ভাব-গিনিয়র সম্ভবপর হইয়াছিল। এই ভাবে দেখিতে গেলে বক্তৃ-  
রায় গ্রীক রাজগণের ইতিহাস আমাদের একটি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়। শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ কুমার এই বিষয়টি নির্দোষ করিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু হুংখের বিষয় তাঁহার ভ্রায় লোকের নিকট হইতে আমরা যাহা আশা করি প্রবন্ধটি তদনুরূপ হয় নাই। পার্সি গার্ডনার ও রেপসনের (Percy Gardner's Catalogue of Greek and Scythic coins in the British Museum, এবং Rapson's Indian coins এই দুই) সুপরি-  
চিত গ্রন্থে যাহা আছে তদতিরিক্ত তাঁহার প্রবন্ধে বিশেষ কিছু আছে বলিয়া আমাদের মনে হইল না। কানিংহাম (Cunningham) কর্তৃক নিউমিসমেটিক ক্রনিকল্‌এ (Numismatic Chronicle) প্রকাশিত বহুসংখ্যক প্রবন্ধাবলী, উইলসনের এরিয়ানা এন্টিকোয়া (Wilson's Ariana Antiqua) এবং টমাস, রেপসন, মেসন প্রভৃতির (Thomas, Rapson, Masson, Raoul Rochette) প্রবন্ধাবলী পাঠ করিলে যে সমুদয় সমস্তার উদয় হয়, তাহার বিবৃতি ও বিচার করিলে অনেক নূতন তথ্য অবগত হওয়া যায়।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিজ্ঞা-  
ভূষণ মহাশয় “কালিদাসের জন্মস্থান” সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। কিছুদিন পূর্বে “গৃহস্থ” প্রকাশিত “কালিদাসের জন্মস্থান” শীর্ষক একটি উৎকট প্রবন্ধ বাঁহারা পাঠ করিয়াছিলেন তাঁহাদের পক্ষে এই প্রবন্ধের নাম শ্রবণে মনে আতঙ্কের সঞ্চার হওয়া অস্বা-  
ভাবিক নহে। যেরূপ উদ্ভট প্রমাণ সহকারে স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে যে, নবদ্বীপই কালিদাসের জন্মভূমি, তাহা পুরাতত্ত্ব আলোচনাকারীগণের প্রতি স্লেষ গ্রন্থত অথবা বিকৃত মন্তির ফল স্বরূপ তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। মাননীয় কাশিমবাজারের মহারাজ ও অধ্যাপ

পণ্ডিত ডাক্তার ষ্ট্রস (Dr. Stross) এই উত্তরের নামযুক্ত হও-  
রায় পণ্ডিত মন্থনাথ ভট্টাচার্যের অপরূপ সিদ্ধান্ত উল্লিখিত হই শ্রেণীর কোনটির অন্তর্গত তাহা নিঃসন্দেহে বলা কঠিন। এইরূপ অবস্থায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিজ্ঞা-  
ভূষণের ভ্রায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত এ বিষয়ে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করায় বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। বিজ্ঞাভূষণ মহাশয়ের মতে বাঙ্গালা দেশ যে কালিদাসের জন্মভূমি ছিল এরূপ অনুমান করিবার কোনই কারণ নাই, বরং উজ্জয়িনী বা তরিকটবর্তী স্থান তাঁহার জন্মস্থান ছিল এইরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে। রঘুর দিগ্বিজয়ের বর্ণনাক্রমে বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে সত্য, কিন্তু তাহাতে কিছুই প্রমাণিত হয় না, কারণ গ্রন্থের এ অংশ অপরিহার্য্য, কবির ইচ্ছা গ্রন্থত নহে। পূর্বদিক বিজয় বর্ণনায় বঙ্গদেশের উল্লেখ না থাকিলে বর্ণনা অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে, সুতরাং কবিকে বাধ্য হইয়া বঙ্গদেশের অবতারণা করিতে হইয়াছে। বিশেষতঃ এই বঙ্গদেশের বিজয় বর্ণনা করিতে যাইয়া কবি লিখিয়াছেন, “বঙ্গান্ উৎখায় তরসা” ইহা হইতেও অনুমিত হয় যে, বঙ্গদেশ কবির জন্মস্থান নহে। কারণ “উৎখায়” এইরূপ নিদারুণ বাক্য স্বীয় জন্মভূমির প্রতি প্রয়োগ করা কিছু অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু মেঘদূত কবির কল্পনা গ্রন্থত কাব্য। ইচ্ছা হইলে তিনি অনায়াসেই বঙ্গদেশের একটা সুন্দর কর্ণা ইহাতে সন্নিবেশিত করিতে পারিতেন। যক্ষকে রামগিরির পরিবর্তে ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তস্থিত কোন পর্বতে নির্দোষিত করা যাইতে পারিত। সুতরাং যে মেঘদূত কাব্যের ঘটনা ও স্থান প্রভৃতি পৌরাণিক কোন বর্ণনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইয়া কেবল মাত্র কবির ইচ্ছায় নির্ণীত হইয়াছে, তাহার ঘটনা-স্থানের সমাবেশ দ্বারাই কবির জন্মস্থান নিরূপণ করিতে হইবে মেঘদূতে উজ্জয়িনীর যে প্রকার বর্ণনা আছে তাহাতে মনে হয় উহাই কালিদাসের জন্মস্থান। তৎপরে বিজ্ঞাভূষণ মহাশয় বলেন যে, কালিদাস শৈব বা



কালীভক্ত ছিলেন তাঁহার গ্রন্থ ও কালিদাস এই নামই তাঁহার প্রমাণ, এবং তিনি নানাবিধ প্রমাণ সাহায্যে প্রতিপন্ন করেন যে, উজ্জয়িনীই কালীর প্রথম পূজাস্থান।

মহাযজুর্বেদে বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়ের বক্তৃতার বিষয় “কালিদাসের জন্মস্থান” হইলেও “কালিদাসের জন্ম সময়” সম্বন্ধেই তিনি সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। সত্যের অনুরোধে আমরা বলিতে বাধ্য যে, এই আলোচনা বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়ের অগৌরব ও অপযশের বিষয় হইয়াছে। তিনি যে সমুদয় প্রমাণ বলে কালিদাসকে ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাহার কোনটিরই বিশেষ কোন মূল্য নাই। অথচ কালিদাসের জন্ম সময় যে পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম পাদের পরে হইতেই পারে না, মন্ডাসোর (Mandasor) শিলালিপির আবিষ্কারের পর তাহা স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে। বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় এই সুপরিচিত তথ্যটি বিস্মৃত হইয়া ভিক্ত ও সিংহল হইতে আহরিত প্রমাণাবলীর সাহায্যে তর্কজাল উপর তর্কজাল বিস্তার করিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইলেন যে, কালিদাস ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক। বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন যে, (১) কালিদাস পাণ্ড্য ও সিংহল দেশের মধ্যে সংগ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন; ষষ্ঠ শতাব্দীর অনতি পূর্বে ঐরূপ একটি সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল; (২) কালিদাস মেঘদূতে বে দিগ্‌নাগের উল্লেখ করিয়াছেন তিনি ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক; (৩) নবরত্নের অন্ততম রত্ন বরাহমিহির ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; সুতরাং এই তিন দিক হইতেই বিচার করিয়া দোষে কালিদাস ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক ইহাই প্রতিপন্ন হয়। এসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, পাণ্ড্য ও সিংহল দেশ বহু প্রাচীন কাল হইতেই সুপ্রসিদ্ধ; অন্ততঃ অশোকের সময় যে এতটি সুপরিচিত রাজ্য বর্তমান ছিল তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে, সুতরাং বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় এ উভয়ের মধ্যে ষষ্ঠ শতাব্দীতে যে সংগ্রামের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার অস্বল্প সন্দেহ। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম পাদের পরে হইতেই পারে না।

পূর্বেও সংঘটিত হইতে পারে। শেষোক্ত দুইটি যুক্তি সম্বন্ধে “প্রতিভাতে” প্রকাশিত ইতিহাসে বিক্রমাদিত্য নামক প্রবন্ধ জটিল। প্রাবণ-ভাজ সংখ্যা ১৩২০, ১৩৫ পৃষ্ঠা। আমাদের বিবেচনায় কালিদাসের জন্ম সময় সম্বন্ধে মাত্র দুইটি কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে—

(১) কালিদাসের জন্ম সময় পঞ্চম শতাব্দীর পর হইতে পারে না।

(২) কালিদাস খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া যে একটা প্রবাদ এতদেখে প্রচলিত আছে, তাহার বিরুদ্ধে এ পর্য্যন্ত কোন বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

অতঃপর শ্রীযুক্ত গুণালঙ্কার মহাশয়ের মহাশয় বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। কিন্তু উহা এত ক্ষীণবরে পঠিত হইল যে, উহার কোন কথা হৃদয়ঙ্গম করা একেবারে অসাধ্য হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু রমাপ্রসাদ চন্দ “প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম ও মৌর্যশিল্প” নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে লেখক মানব গৃহস্থত্র, শাস্ত্রায়ণ গৃহস্থত্র, পানিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে মন্দিরের উল্লেখ উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপন্ন করেন যে, মন্দির নির্মাণ প্রথা এদেশে বহু প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত ছিল। অতঃপর তিনি মৌর্যশিল্পের বিশেষ প্রদর্শন করেন। কিন্তু যাহারা এই শিল্পের সৃষ্টি ও উন্নতি করেন সেই মগধবাসীগণের প্রকৃতির কিছু পরিচয় না পাইলে তাঁহাদের শিল্পের পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় এই নিমিত্ত রমাপ্রসাদ বাবু প্রথমে মগধবাসীগণের প্রকৃতির বিশেষ প্রদর্শন করেন। তাঁহার মতে অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষের অশ্রাব্য অধিবাসীগণ হইতে মগধবাসীগণের একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্যভাব লক্ষিত হয়। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার নানা বিভাগে এই স্বাতন্ত্র্য ভাব পরিস্ফুট হইয়াছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি বলেন—যেমন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা।



তাহার মতে নন্দবংশীয় মগধরাজগণই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপূর্বে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য, এমন কি তাহার কল্পনা পর্য্যন্ত কেহ কখনও করেন নাই। রমাপ্রসাদ বাবুর এই উক্তিটি লইয়া সভায় অনেক বিচার বিতর্ক ও আলোচনা হয়। এবিষয় বিস্তারিত পরে লিখিত হইবে।

ধর্ম বিষয়েও মগধবাসীগণের প্রকৃতিগত স্বাভাব্য পরিচয় পাওয়া যায়। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি এই মগধ মণীষারই পরিচয় এবং চিরকালই ধর্ম বিষয়ে এই স্বাভাব্য হেতু মগধবাসীর প্রতি শাস্ত্রকারগণের প্রবল বিশেষভাব পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ নানা বিভাগে মগধবাসীগণের স্বাভাব্য ও বিশেষত্ব প্রদর্শন করিয়া লেখক অবশেষে মগধ হইতে উদ্ভূত মৌর্য শিল্পের পরিচয় প্রদান করেন। তাহার মতে এই শিল্পে গ্রীক প্রভাব অপেক্ষা আসিরীয় ও পারস্যের প্রভাব অধিকতর ভাবে বিদ্যমান।

যদিও রমাপ্রসাদ বাবুর প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য মৌর্য শিল্পের পরিচয় প্রদান অথাপি ইহার যে অংশে তিনি মগধবাসীগণের একটি স্বাভাব্য ও বিশেষত্বের ভাব প্রতিপন্ন করিয়াছেন আমাদের নিকট সেই অংশই অধিকতর মূল্যবান বোধ হয়। আর শিল্প সম্বন্ধে রমাপ্রসাদ বাবু যে দুইটি কথা ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচ্য। ফাণ্ডসন (Fergusson) প্রমুখ যে সমুদয় ইউরোপীয় পণ্ডিত ভারতবর্ষের শিল্পকলার বিষয় আলোচনা করিয়াছেন তাহারা সকলেই মৌর্যবংশের রাজ্যকালকে ভারত-শিল্পের জন্মসময় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র ইহার প্রতিবাদ করেন, এবং এই প্রতিবাদের ফলে ফাণ্ডসনকে তাহার মত কিয়ৎ পরিবর্তিত করিতে হইয়াছিল। রমাপ্রসাদ বাবুর প্রবন্ধ হইতে আমরা এইরূপ আভাস পাই যেন তিনিও রাজেন্দ্র লালের মতের পরিপোষক। তবে এবিষয়টি তাহার প্রবন্ধে তেমন সুস্পষ্টভাবে আলোচিত হয় নাই। ভারত শিল্প সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা এই যে, ইউরোপীয়

পণ্ডিতগণ শিল্পকে ধর্মাদ্বয়ীয় বিভাগ করিয়াছেন, যথা বৌদ্ধ শিল্প, জৈন শিল্প, ব্রাহ্মণ্য শিল্প ইত্যাদি। কিন্তু এই বিভাগটি আমাদের নিকট যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। শিল্প চিরকালই ভারতবর্ষীয় শিল্প। তাহাকে বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি পৃথক পৃথক কোঠায় (water-tight Compartment) বিভাগ করিয়া লইলে তাহার গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা মহাভ্রমে পতিত হইব। বর্তমান কালে দুই এক জন ইউরোপীয় পণ্ডিতও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। রমাপ্রসাদ বাবুর প্রবন্ধেও আমরা এইরূপ মতের আভাস পাই।

রমাপ্রসাদ বাবুর প্রবন্ধ পাঠ সমাপ্ত হইলে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাকবি ভাসের নবাধিষ্ঠিত গ্রন্থাবলী হইতে তাহার সময় নির্ধারণ সম্বন্ধে কি উপাদান প্রাপ্ত হওয়া যায় এতৎসম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন। মহাকবি ভাসের সময় নির্ধারণ সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত বিশেষ আলোচনা হয় নাই। ইণ্ডিয়ান এন্টিকোয়ারিতে (Indian Antiquary) স্টেন (Sten Konow) মুদ্রারাক্ষসের সমালোচনা-প্রসঙ্গে ভাসের কালনির্ণয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। তাহার মতে ভাস খৃঃ ৪র্থ শতাব্দীর লোক। ভাস গ্রন্থাবলীর আবিষ্কারক শ্রীযুক্ত গণপতি শাস্ত্রী উক্ত গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় তাহাকে খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর লোক বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জৈনসওয়াল খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীতে কাশ্মীর নারায়ণের সময়ে ভাস আবিষ্কৃত হইয়াছিলেন এইরূপ অনুমান করেন।\* এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে (Journal of the Royal Asiatic Society) এবিষয়ে যে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে ভাসকে খৃষ্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর লোক বলিয়া নির্ধারণ করা হইয়াছে।

শ্রীযুত প্রমথ চৌধুরী কাশীপ্রসাদ বৈষ্ণবের মত সমর্থন করেন। কাশীপ্রসাদের যুক্তি ব্যতিরেকে প্রমথ বাবু নুতন যে যুক্তি দুইটির অবতারণা করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপতঃ এই—(১) কোন কবির যশ চতুর্দিকে বিস্তৃত হইতে এবং কবি-মণ্ডলী মধ্যে তাঁহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতে অন্ততঃ তিন চারশত বৎসর দরকার; সুতরাং কালিদাস যে ভাবে ভাসের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে ভাসকে কালিদাসের তিন চার শত বৎসর পূর্বের বলিয়া অনুমান করা অসম্ভব নহে। কালিদাস পঞ্চম শতাব্দীর লোক ইহাই বর্তমান কালের পণ্ডিতগণের মত, সুতরাং খুব সম্ভব ভাস খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। (২) ভাস তাঁহার বালচরিত গ্রন্থে কৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণন ক্রমে কংসবধ প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। প্রমথ বাবু অনুমান করেন যে, ইহাতে প্রকারান্তরে কাশ্যগণ কর্তৃক সূর্য্যরাজের বধ বিবৃত ও সমর্থিত হইয়াছে। এবিষয়ে তাঁহার একটি প্রধান যুক্তি এই যে, উক্ত গ্রন্থে কৃষ্ণের নামের পরিবর্তে সর্ব্বত্রই নারায়ণ এই নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে প্রকারান্তরে কাশ্যরাজ নারায়ণ স্মৃতিত হইয়াছেন।

বর্তমান প্রবন্ধ এ বিষয়ের বিচার বিতর্ক করিবার স্থল নহে। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, উল্লিখিত দুইটি যুক্তির কোনটিই বিশেষ বলবতী নহে। যে যুক্তিবলে তিনি ভাসকে কালিদাসের তিন চারি শত বৎসরের পূর্ববর্তী প্রতিপন্ন করিতে চাহেন ঠিক সেই যুক্তি অনুসরণ করিলে বলিতে হয় যে, কালিদাস কবি বাণের তিন চারি শত বৎসর পূর্বে আবির্ভূত ছিলেন। কারণ বাণের সময়ে কালিদাসের যশ সুদূর দাক্ষিণাত্যে পর্য্যাপ্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। অথচ প্রমথ বাবু স্বীকার করিয়াছিলেন যে, কালিদাস পঞ্চম শতাব্দীর লোক। অতএব তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, সমগ্র ভারতবর্ষে কালিদাসের যশ ব্যাপ্তির পক্ষে অনধিক দুইশত বর্ষই যথেষ্ট এই হিসাবে ভাসকে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে নির্দেশ করা অশাস্ত্রীয় হয় না।

প্রমথ বাবুর দ্বিতীয় যুক্তিটি আমরা বৈকল্পিক বুঝিয়াছি উপরে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। যদি আমরা প্রকৃত বুঝিয়া থাকি তবে বলিতে হইবে এ যুক্তিটির কোন ভিত্তিই নাই। বালচরিত গ্রন্থের প্রথম ভাগে কৃষ্ণ কচিং নারায়ণ রূপে উল্লিখিত হইয়াছেন সত্য কিন্তু গ্রন্থের প্রায় সর্বত্রই তিনি দামোদর নামে অভিহিত হইয়াছেন। আর যে স্থলে তাঁহাকে নারায়ণ বলা হইয়াছে সে স্থলে উক্ত শব্দের সার্থকতা আছে—যেমন কৃষ্ণের জন্মের অব্যবহিত পরেই তদ্রূপমানসে আগত নারদ বলিতেছেন, “তদ্ভগবন্তং লোকাদিমনিধনমব্যয়ং লোকহিতার্থে কংস-বধার্থং যুক্কিকূলে প্রসুতং নারায়ণং দ্রষ্টুমিহাগতো’মি” এ স্থলে দেবর্ষি নারদ সচোদ্ধাত শিশুকে নারায়ণের অবতাররূপে কল্পনা করিয়া নারায়ণ এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থের সর্বত্রই যে যে স্থলে কৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছেন তত্তৎস্থলে গ্রন্থকার তাঁহাকে দামোদর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অত্রাজ, রাজা কংস কৃষ্ণকে দেখিয়া বলিতেছেন, “অয়ং স দামোদরঃ” (৬১ পৃঃ)। কংসবধের পর কৃষ্ণ বনুদেবের নিকট যাইয়া বলিতেছেন, “তাত দামোদরোহমভিবাদয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি (৬৪ পৃঃ), শ্রীযুক্ত প্রমথ বাবু শেষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, নিশ্চিত প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত ভাসকে কাশ্যবংশীয় নরায়ণের সমকালবর্তী বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। আমরা এ প্রস্তাব সমর্থন করিতে পারি না, কারণ ভাসের সময় নিরূপণ সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত সুনিশ্চিত যে দুইটি কথা আমরা জানি, পূর্বোক্ত অনুমান তাহার বিরোধী। সে দুইটি কথা এই—প্রথম তাঁহার ভরত বাক্য—“ইমাং সাগরপর্য্যন্তাং হিমবদ্ভিক্ষা-কুণ্ডলান্ মহীমেকাতপত্রাঙ্কান্ রাজসিংহঃ প্রশান্ত নঃ।” কাশী প্রসাদ ও স্বীকার করেন যে, এই শ্লোকে ভাস তদানীন্তন রাজাকে লক্ষ্য করিয়াছেন—

“The benedictory verse refers to the

reigning ( 'our' ) Sovereign. (J. A. S. B. 1913 P. 264 ).

সুতরাং এখন প্রশ্ন এই যে, কাবরাজ নারায়ণ উক্ত শ্লোকের লক্ষ্যভূত হইতে পারেন কি না। আমাদের বিবেচনায় ইহা সম্ভব নহে, কারণ কাবরাজগণের প্রভাব কদাচ সমুদায় আর্ষ্যাবর্তে বিস্তৃত হয় নাই। যতদূর প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে, কাবরাজগণের রাজ্য মগধের সীমা অতিক্রম করে নাই। সুতরাং “সাগরপর্যন্তা হিমবদিক্যকুণ্ডলা” এই বিশেষণ কাবরাজের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। তবে তর্ক উঠিতে পারে যে, সংস্কৃত কবিগণ, চিরকালই অতিশয়োক্তি পদ্ধতপাতী; বিশেষতঃ রাশার মহিমা বা রাজ্যের পরিমাণ সম্বন্ধে; কিন্তু যদি ইহাই হয় তবে কবির উচ্ছ্বাস বিদ্যা পর্তে বাধা পাইল কেন? তাহাও বিচার করিবার বিষয়। চিরাগত প্রথা মত সাগরাদ্বারপরী অধিপতিরূপে বর্ণনাই তাহা হইলে খুব স্বাভাবিক হইত। সুতরাং অধিক সম্ভব যে, কবি এখানে প্রকৃত ঘটনারই বর্ণনা করিয়াছেন। আর কবি ভাসের লিখন-পদ্ধতি পরবর্তী কালের কবিগণের জায় কৃত্রিমতা, অতিশয়োক্তি, অল্পপ্রাস-বাহুল্য প্রভৃতি দোষে দুষ্ট নহে। তাঁহার লেখা স্বচ্ছ, সরল, আড়ম্বর বিহীন। কবির এই প্রকৃতিও আমাদের সিদ্ধান্তের সমর্থন করে। \*

\* “Bhasa’s language is absolutely free from the *kaavya* artificiality which we find as far back as the time of the Rudradaman Inscription ( second cetury A. C. ). There is not the slightest efforts for alliteration ; the very thing seems to be almost unknown to the author. He never used long *samāsas*. Also his conceits are never far-fetched. Further, he discloses grammatical archaisms which would appear as erroneous or almost as erroneous to one familiar with the classical *kaavya* ( J. A. S. B. 1913 P. 261 ).

আর ভাস সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত সুনিশ্চিত অপরাধে একটি কথা আমরা জানি তাহাও ইহার সমর্থন করে। সেটি এই যে, ভাসের গ্রন্থোক্ত একটি শ্লোক চাণক্য প্রণীত অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। এখানে কে কাহার নিকট গণী তাহা নির্ণয় করা কঠিন বটে, কিন্তু সাধারণ ভাবে একথা বলা যাইতে পারে যে, অর্থশাস্ত্রের জায় পুস্তকে অপর গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করা খুব স্বাভাবিক, এবং এরূপ বহু উদ্ধৃত শ্লোক উক্ত গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। কিন্তু কোন নাটকে এরূপ ভাবে শ্লোক উদ্ধৃত করা কিছু অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়; বিশেষতঃ ভাসের জায় লক্ষপ্রতিষ্ঠ কবির পক্ষে ইহা আরও অস্বাভাবিক।

ভাসের সময় সম্বন্ধে যদি কোন অস্থায়ী (Provisional) সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় তবে গণপতি শাস্ত্রী যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়, অর্থাৎ ভাস চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক।

এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কালীপ্রসাদ যে যুক্তি উত্থাপিত করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপতঃ এই—

(১) গ্রন্থকার বৌদ্ধধর্মের সহিত সুপরিচিত। তাঁহার একটি নাটকের প্রাচীন পাত্র মন্ত্রী ক্রমশঃ শ্রমণের ছদ্মবেশ গ্রহণ করেন এইরূপ কল্পিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, গ্রন্থকার অশোকের পরবর্তী কালে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন।

আমাদের বিবেচনায় এরূপ অনুমান করিবার কোন হেতু নাই। অশোকের বহু পূর্ব হইতেই অন্ততঃ মগধে বৌদ্ধধর্ম বিশেষ প্রচলিত ছিল, এসম্বন্ধে বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করা যায়। বৌদ্ধগণের প্রথম ও দ্বিতীয় মহাসঙ্ঘাতি, এবং অশোক লিপিতে বৌদ্ধগ্রন্থের নামোল্লেখ

কালীপ্রসাদের এই মন্তব্য হইতে সহজেই অনুমিত হয় যে, ভাসের সময় “সংস্কৃত কাব্যের” সময় অপেক্ষা বহু-পূর্ববর্তী। এক শত কি দুই শত বৎসর ব্যবধানে কোন সাহিত্যের এরূপ আবুল পরিবর্তন সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না।

প্রভৃতি ইহার জাজ্জল্যমান দৃষ্টান্ত। ভগবান বুদ্ধদেবের জীবিত কালেই মগধের নানা স্থানে বিহার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং তাঁহার শিষ্য-সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। বুদ্ধদেবের সময় হইতে অশোকের সময় পর্য্যন্ত এই ধর্মের প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছিল ইহাই অনুমান করা স্বাভাবিক এবং ঐতিহাসিকগণেরও ইহাই মত।

(২) ভাসের গ্রন্থে সমাজের যে চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, তৎকালে বৌদ্ধ আচার ব্যবহার নিষ্ঠাবান হিন্দু গৃহস্থেরা পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র। ইহা হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের যুগের চিত্র বলিয়াই মনে হয়, দৃষ্টান্ত যথা—মগধের রাজমাতা তিস্তুনী-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইহা হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের চিত্র ইহাও যেরূপ সম্ভব যৎকালে হিন্দুধর্মের প্রতিপত্তি বৌদ্ধ ধর্ম কর্তৃক বিনষ্ট হয় নাই (অর্থাৎ অশোকের পূর্বে) অথচ বৌদ্ধধর্ম ধীরে ধীরে সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিতেছে তৎকালের চিত্র হওয়াও সেইরূপ সম্ভব।

(৩) কালীপ্রসাদের তৃতীয় যুক্তি এই যে, অশোকের রাজ্যসীমা বিদ্যাপর্যন্ত অতিক্রম করিয়াছিল, এবং অশোকের লিপিতে প্রায়শঃ সমগ্র ভারতবর্ষ এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ভাসের রাজার রাজ্য “হিমবৎ বিদ্যাকুণ্ডলা” স্মরণ্য তাহা অশোকের পরবর্তী; কিন্তু এই যুক্তিবলে ভাসকে অশোকের পরবর্তী না ধরিয়া অশোকের পূর্ববর্তী মনে করাই অধিকতর সঙ্গত। যখন খোর্য সাম্রাজ্য বিদ্যাপর্যন্ত অতিক্রম করে নাই, এ তখনকারই কথা। ইহাই স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে হয়।

আমাদের বিবেচনায় কালীপ্রসাদের কোন যুক্তিই বলবতী নহে, এবং অন্তরূপ প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত গণপতি শাস্ত্রীর সিদ্ধান্তকে সমীচীন গণ্য করা যাইতে পারে। বর্তমান প্রবন্ধে এবিষয়ে অধিক বাদানুবাদ নিম্নয়োজন।

প্রথম বাবুর বক্তৃতা শেষ হইলে শ্রীযুক্ত গণপতি রায় “ধবধীপে হিন্দু সাহিত্য” নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক “সামন্তরাজ লোকনাথ” নামক প্রবন্ধে ত্রিপুরায় প্রাপ্ত একখানি তাম্রশাসনের বিবৃত বিবরণ প্রদান করেন, এবং প্রসঙ্গক্রমে নানা ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনা করেন। এই তাম্রশাসনখানি বহুকাল পূর্বে পরলোকগত গঙ্গামোহন লঙ্কর এম্. এ, মহাশয় পাঠোদ্ধারের জন্ত এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে বহুকাল পর্য্যন্ত ইহার কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি ঘটনাক্রমে কিয়দ্দিনের নিমিত্ত ইহা বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির হস্তগত হইয়াছিল, এবং এই সুযোগে রাধাগোবিন্দ বাবু ইহার পাঠোদ্ধার সাধন করিয়াছেন।

রাধাগোবিন্দ বাবু তাঁহার প্রবন্ধে এই তাম্রশাসনখানির পাঠ বা অনুবাদ কিছুই দেন নাই। ইহা হইতে যে সমুদয় জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হওয়া যায় কেবল তাহাই সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

লোকনাথ নামক কোন সামন্তরাজ, অনন্তনারায়ণের মন্দির স্থাপন, ও কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণগণের ব্যবহারের জন্তে তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত শুল্ক বিষয়স্থিত এক অটবী-ভূখণ্ড ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন ইহাই আলোচ্য তাম্রশাসনখানির সার মর্ম্ম। লোকনাথের রাজ্য কোথায় ছিল তাহা জানা যায় না। তাঁহার সময় নির্ধারণকল্পে বর্তমান লিপির অক্ষরই একমাত্র সহায়। ডাক্তার ব্লক (Bloch) এই শাসনের লিপিকাল নবম দশম শতাব্দীতে নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন, রাধাগোবিন্দবাবুর মতে ইহা সপ্তম শতাব্দীতে লিখিত। যতদিন রাধাগোবিন্দবাবু এই শাসনের প্রতিকৃতি প্রকাশিত না করেন ততদিন এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা অসম্ভব। তবে রাধাগোবিন্দ বাবু অনুগ্রহপূর্বক আমাদেরকে এই শাসনের একখানি ক্ষুদ্র ফটোগ্রাফ প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহাতে লিপিকাল-

জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

বিষয়ে তাঁহার অনুমানই অধিকতর সম্ভব বলিয়া মনে হইল।

এই তাত্ত্বশাসনের সংলগ্ন মুদ্রায় উৎকীর্ণ একটি পংক্তিতে লিখিত আছে “কুমারামাত্যাধিকরণস্ত”। মূল শাসনখানি যে অক্ষরে লিখিত মুদ্রার এই অক্ষর-গুলি তাহা অপেক্ষা বহু প্রাচীন। রাধাগোবিন্দ বাবুর মতে ইহা উত্তর ভারতীয় গুপ্ত নরপতিগণের সমসাময়িক। লোকনাথকে গুপ্তরাজ্যগণের সমকালে প্রচলিত মুদ্রার ব্যবহার করিতে দেখিয়া লেখক অনুমান করেন যে, তাঁহার পূর্বপুরুষগণ গুপ্তরাজ্যগণের সামন্ত ছিলেন।

লোকনাথ সম্বন্ধে রাধাগোবিন্দ বাবু যে ঐতিহাসিক তথ্যের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপতঃ এই—সপ্তম শতাব্দীতে হর্ষের মৃত্যুর পর ভারতবর্ষে যে অরাজকতা উপস্থিত হয় তাহার সুযোগে সামন্তরাজ্য লোকনাথ স্বায় ক্রমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। পরমেশ্বর উপাধিধারী শ্রীলবধারণ নামক নৃপতি তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু দুইটি কারণে তিনি লোকনাথের বিরুদ্ধে যুদ্ধবাসনা ত্যাগ করিয়াছিলেন। এ দুইটি কারণ যথাক্রমে (১) লোকনাথের, প্রভাব ও অভ্যুদয় (২) তৎকালীন সার্কভৌম নরপতি প্রদত্ত শ্রীপটু প্রাপ্তি। এই সার্কভৌম নরপতি কে ঠিক জানা যায় না। তবে ইনি দ্বিতীয় গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়সাধনকারী আদিভ্যাসেন হইতে পশরেন রাধাগোবিন্দ বাবু এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন।

শাসন সম্পাদনের সময় সম্বন্ধে লিখিত আছে “চতুশ্চত্বারিংশৎ সংবৎসরে ফাস্তুন মাসে”। ইহা কাহার প্রচলিত সংবৎসর তাহার উল্লেখ নাই। লেখকের মতে ইহা হর্ষবর্দ্ধন প্রবর্তিত সংবৎসর।

এই তাত্ত্বশাসনে দানগ্রহণকারী শতাধিক ব্রাহ্মণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে রাধাগোবিন্দ বাবু নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—“ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, সপ্তম শতাব্দীতে আমাদের দেশে ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না। এই সকল ব্রাহ্মণ অল্প

কোনও প্রদেশ হইতে আনীত বা বিনির্গত বলিয়া উল্লেখ দেখা যায় না। ইহার সহিত আদিশূর কাহিনীর কিরূপ সামঞ্জস্য সাধিত হইতে পারে তাহা কুলশাস্ত্রজ্ঞ সুবীণের আলোচ্য।”

রাধাগোবিন্দ বাবুর ভ্রাতৃ লোকের এই মন্তব্যটিতে আমরা দুঃখিত হইয়াছি। কুলশাস্ত্রজ্ঞগণের প্রতি এই অনাবশ্যক ‘খোঁচা’ টুকু না দিলে তাঁহার প্রবন্ধের অগ্রহানি হইত না, বরং এই টুকু দেওয়াতে ইহার গুরুত্ব নষ্ট হইয়াছে। সপ্তম শতাব্দীতে এ দেশে ব্রাহ্মণ ছিল তাহা এই ত্রিপুরা শাসনের পাঠোদ্ধারের পূর্বে লোকে বিশেষ ভাবেই জানিতেন, তদ্বিষয়ে বহু প্রমাণ বিद्यমান এবং কুলশাস্ত্রজ্ঞগণও সম্ভবতঃ তাহা অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু আদিশূর-কাহিনীর সহিত ইহার অসামঞ্জস্য কোথায়, ইহা নির্ধারণ করা শক্ত। বরং এই তাত্ত্বশাসনেই এমন একটি কথা রাধাগোবিন্দ বাবু আবিষ্কার করিয়াছেন যাহাতে আদিশূর কাহিনী কিয়ৎ পরিমাণে সমর্থিত হয় বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। সে কালে ব্রাহ্মণ ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তৎকালে “বিজ-সন্তমেরা”ও শূদ্রাণীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। বর্তমানে বঙ্গদেশের সমাজে যে আচার ব্যবহার চলিতেছে, এবং আদিশূর কর্তৃক আনীত ব্রাহ্মণ যে আচার ব্যবহারের প্রবর্তনিত। বলিয়া প্রখ্যাত, তাহাদের সহিত উল্লিখিত আচার ব্যবহারের সামঞ্জস্য বিধান হয় কি? লোকনাথের তাত্ত্বশাসন হইতে বর্তমান বিষয়ে যদি কিছু প্রমাণিত হয় তবে তাহা এই যে, সমসাময়িক লোকনাথের (সপ্তম শতাব্দীর?) বঙ্গদেশস্থ ব্রাহ্মণগণ শূদ্রাণী গ্রহণ করিতেন। কিন্তু আমরা জানি যে, বঙ্গদেশে শীঘ্রই অসবর্ণ বিবাহ প্রথা রহিত হয় এবং আনুসঙ্গিক অত্যাচার অনুসন্ধানও সম্ভবতঃ পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনের মূলে যে বঙ্গদেশীয় একজন নরপতি ও তৎকর্তৃক আনীত বিগত আচার সম্পন্ন পঞ্চব্রাহ্মণ ছিলেন বা থাকিতে পারেন, ইহাতে অসাম-

জ্ঞান বা অস্বাভাবিক কিছুরই নাই। ভবিষ্যতে প্রতিবাদ-কর্ষার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জ্ঞান এ স্থলে বলিয়া রাখা কর্তব্য যে, আদিশুর ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা সে বিষয়ে আমরা কোন মতামত প্রকাশ করিতেছি না; আমাদের একমাত্র বক্তব্য এই যে, আলোচ্য তাম্র-শাসনখানির কোন উক্তির সহিত আদিশুর কাহিনীর কোন অসামঞ্জস্য দেখা যায় না।

রাধাগোবিন্দ বাবুর পর কুমার শ্রীযুক্ত বাবু শরৎ কুমার রায় উত্তর বঙ্গের প্রভুসম্পদ নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রথমেই লেখক ধীমান ও তৎপুত্র বিংশপাল নামক দুইজন সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর ও ভাস্কর কর্তৃক বরেন্দ্রভূমে প্রতিষ্ঠিত চিত্র ও ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে দুইটি অভিনব শাখার পরিচয় প্রদান করেন। লেখকের মতে বরেন্দ্রের এই শিল্পশাখার প্রভাব নেপাল, তিব্বত, চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপে বিস্তৃত হয়। অতঃপর উত্তরবঙ্গের মধ্যে যে সকল স্থান প্রভুসম্পদে পূর্ণ তন্মধ্যে কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়া লেখক প্রবন্ধ শেষ করেন। বাগননগর যোগিগুন্ডা, পাঁচবিবি, মঙ্গলবারি হাট, পাছাড়পুর, মহাস্থানগড়, বিজয়নগর প্রভৃতির বিবরণ প্রত্যেক বঙ্গবাসীর নিকটই মূল্যবান বিবেচিত হইবে।

অতঃপর যে সমুদয় প্রবন্ধ পঠিত হয় তন্মধ্যে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুরের “একডালা দুর্গ” ও শ্রীনলিনী-কান্ত ভট্টশালীর “বিক্রমপুর” নামক প্রবন্ধ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই উভয় প্রবন্ধই “প্রতিভাতে” প্রকাশিত হইবে সুতরাং ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্যক। বীরেন্দ্র বাবু ঢাকার নিকটবর্তী বর্তমান একডালা নামক গ্রামেই সুবিখ্যাত একডালা দুর্গ বর্তমান ছিল ইহা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। নলিনী বাবু বিক্রমপুরের মধ্যে প্রভুসম্পদ পরিপূর্ণ কয়েকটি স্থানের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বাবু রমাপ্রসাদ চন্দ্র তাহার প্রবন্ধের একস্থলে লিখিয়াছেন যে, মগধের নন্দরাজ্যগণই ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তৎপূর্বে সাম্রাজ্যের কল্পনাও ভারতবর্ষে কেহ কখনও করেন নাই। প্রবন্ধ পাঠ সমাপ্ত হইলে এই বিষয় লইয়া অনেক বাদানুবাদ ও আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকৃষ্ণ মুনোপাধ্যায় রমাপ্রসাদ বাবুর

উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, বহু প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পার্শ্ব পাওয়া যায়, এবং বেদ, ব্রাহ্মণ, পুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহার মত সমর্থন করেন। প্রতিপক্ষের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, বেদ, পুরাণ প্রভৃতির কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই, যতদিন পর্যন্ত কোন শিলালিপি দ্বারা ইহাদের উক্তি সমর্থিত না হয় ততদিন আমরা তাহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী তাঁর স্বত্বটি একটু ঘুরাইয়া দিলেন। তিনি বলেন যে বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর আধিপত্য স্থাপন করিলেই যেহেতু সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হয় তাহা প্রাচীনকালে থাকিলেও থাকিতে পারে কিন্তু বর্তমানে সাম্রাজ্য (Imperialism) বলিবে যাহা বুঝায় তাহার প্রবর্তক চাপক্য অথবা চন্দ্রগুপ্ত এই সাম্রাজ্যের (Imperialism) অর্থ অপরের উচ্ছেদসাধন পূর্বক স্বীয় প্রতিষ্ঠা স্থাপন, এ দ্বিনিষটি ভারতবর্ষে পৌটিল্য অর্থশাস্ত্রেই প্রথম দৃষ্ট হয়। পরিশেষে সভাপতি বলেন, এক্ষেত্রে উভয় পক্ষেরই জয় হইয়াছে। সাম্রাজ্য (Imperialism) বলিতে যাহা বুঝায় তাহা মগধবাসীগণ কর্তৃকই উদ্ভূত হইয়াছে তবে অপরবিধ সাম্রাজ্য প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে বিস্তৃত ছিল।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, ইতিহাস শাখার সভাপতি মহাশয় যে ভাবে স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন তাহা অতিশয় প্রশংসনীয়। অধিকাংশ স্থলেই সভাপতি, প্রবন্ধের ও তাহার পাঠকের নাম ঘোষণা করেন মাত্র, কিন্তু অক্ষয় বাবু অধিকাংশ স্থলেই প্রবন্ধ পাঠের পূর্বে বা পরে, আলোচিত বিষয়ের আবশ্যিকতা কি, এবং তাহার কোন অংশে বিচার বিতর্ক উপস্থিত হইতে পারে তাহা বিশদভাবে বিবৃত করিয়া বিষয়টি সাধারণের পক্ষে সুগম করিয়া দিয়াছেন। এবারে ইতিহাস শাখার আর একটি বিশেষ পঠিত প্রবন্ধের আলোচনা। যে যে স্থলে পঠিত প্রবন্ধের আলোচনা সুফলপ্রদ হইতে পারে সভাপতি মহাশয় সেই সেই স্থলে আলোচনা আহ্বান করিয়াছেন, এবং অনেক স্থলে এই আলোচনা বিশেষ যোগ্যতার সহিত নির্বাহিত হইয়াছে।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

## মহাকবি ভাস \*

মালবিকাগ্নি মিত্রের প্রস্তাবনায় মহাকবি কালিদাস ভাসকে অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন—“প্রথিতযশসঃ ভাস-সৌমিল্লক-বিপুত্রাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য” হইতেই ইহার স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে।†

হর্ষ চরিতে ভট্ট বাণও ভাসের গুণানুকীর্ণন করিয়া গিয়াছেন—

হৃত্রধার কৃতারস্তৈর্নাটকৈবর্হভূমিকৈঃ।

সপাতকৈর্ষশো লেভে ভাসো দেবকুলৈরিব।

ভাসের নাটকাবলী হৃত্রধার কর্তৃক আরক (নান্দী-হীন), ও সজ্জাবহন এবং তিনি দেবকুলের গ্রায় যণপতাকা ধারী কীর্ত্তিমান হইয়াছেন।

সুতরাং ভারতে ভাসের নাম অপরিচিত নহে, কিন্তু কবিশূন্য কালিদাস যাহার গুণযুক্ত হইয়াছিলেন সেই প্রথিতযশা প্রাচীন কবির নামের অস্তিত্ব এযাবৎ ছায়া-কঙ্কালকেই ভিত্তি করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয়, গত বৎসর ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে পণ্ডিতপ্রবর গণপতি শাস্ত্রী দশখানি হস্তলিখিত অপ্রকাশিত নাটিকার উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। এই রূপকগুলি মালয়ালম অক্ষরে তালপত্রে লিখিত; এবং শাস্ত্রী মহাশয় অনুমান করেন এই প্রতিলিপিগুলি ৩০০ বৎসরেরও প্রাচীন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে পদ্মনাভপুরের সন্নিকটে মনলিক্কর মঠে ১০৫ খানি লিখিত তালপত্র তাঁহার হস্তগত হয়। এক একটি পত্রে দশটি করিয়া পংক্তি, এবং গ্রন্থগুলি ৩০০ বৎসরের অধিক কাল পূর্বের হইলেও প্রথম দশ বারখানি পত্রের কয়েকটি শব্দ ব্যতীত সমগ্র প্রতিলিপির আর কোনও অংশই বিন্দুমাত্রও নষ্ট হয় নাই। এই ১০৫টি তালপত্রে দশখানি রূপকের প্রতিলিপির আবিষ্কার হইয়াছে, যথা,—

\* পণ্ডিতগণপতি শাস্ত্রী লিখিত ভাস গ্রন্থাবলীর উপোদ্ধাত অবলম্বনে।

† প্রথিতযশা কবি ভাস সৌমিল্লক প্রভৃতির প্রবন্ধ অতিক্রম করিয়া আমি লিখিতেছি ইত্যাদি।

১. স্বপ্নবাসবদন্তা। ২. প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ।
৩. পঞ্চরাত্র। ৪. চারুদত্ত। ৫. দূত ঘটোৎকচ।
৬. দূতবাক্য। ৭. অবিহারক। ৮. বালচরিত।
৯. মধ্যমব্যয়োগ। ১০. কর্ণভার। ১১. উরুভঙ্গ।

তন্মধ্যে দূতবাক্য নামক রূপকখানির কতিপয় পংক্তি মাত্র পাওয়া গিয়াছে। প্রতিলিপিকার রূপকখানি প্রথম পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় অসমাপ্ত অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া-ছেন। পরে আবিষ্কৃত অত্র প্রতিলিপি হইতে এই গ্রন্থের নামোদ্ধার হইয়াছে। পরিশিষ্ট ভাগে এই সকল গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সার প্রদত্ত হইল।

এই প্রতিলিপিগুলির উদ্ধারের অল্পকাল পরেই অভিষেক নাটক ও প্রতিমা নাটক নামীয় আরও দুইখানি নাটক শাস্ত্রী মহাশয়ের হস্তগত হইয়াছে। এই দুটি নাটকও সর্বাংশে পুনোন্মোদিত দশখানি রূপকের অনুরূপ।

এইরূপে পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী তেরখানি লুপ্ত রত্নের উদ্ধার সাধন করিয়া সাহিত্য, ইতিহাস ও প্রত্নচর্চার রাজ্যে এক নূতন সত্যের আলোক আনয়ন করিয়াছেন। এই সকল নাটক দেখা দূরে থাকুক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এযাবৎ ইহাদের নামও শ্রবণ করেন নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিহার মঠে “মুণ্ডিতমস্তক ব্রাহ্মণের” সঙ্গে ভারতের বহু অমূল্য রত্নের ধ্বংস হইয়াছে, সেই সকল রত্নের পুনরুদ্ধার স্বপ্ন-কল্পনা, এই দ্বাদশটি লুপ্ত রত্নেরও যে আর উদ্ধার হইবে এরূপ আশা কেহই করেন নাই, সুতরাং ইহাদের অপ্রত্যাশিত আবিষ্কার ভারত-জননীর গৌরব-মুকুটের কয়েকটি প্রগুণ্ট গণির পুনরুদ্ধার মাত্র।

কালিদাসের সময়ে ভাসের নাটকাবলীর বহুল প্রচলন ছিল একথা অস্বীকার করা চলে না। মালবিকাগ্নি মিত্রের প্রস্তাবনায় ভাসের নামোন্মোদনই ইহার অকাটা প্রমাণ। শূদ্রকের সময় ভাসের নাটকের প্রচার নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল, নতুবা মুচ্ছকটিকের আদর হইত না। মুচ্ছ-



কটিকে মৌলিক রচনা নাই, একথা বলা যায় না, তবে ইহার বেশী ভাগই “চারুদত্ত” নাটকের অন্তর্ভুক্ত, বা উপকরণের সমষ্টি মাত্র। অতএব দেখা যায়, কালিদাসের পর হইতে ভাসের নাট্যকাবলীর লুপ্ত আরম্ভ হয়। ইহার কারণ কি? আমরা দেখিব ভাসের কবিত্ব, ভাব-প্রকাশ রচনা-চাতুর্য্য, বাক্যশ্রী, রসপ্রবাহ প্রভৃতি ঋষি-প্রতিভার সহিত ভুলনীয়। সুতরাং হীনমূল্য বলিয়া ভাস-কাব্য লুপ্ত হয় নাই। আবার ভাস-প্রণীত গ্রন্থাদিতে তাঁহার নামের উল্লেখ নাই বলিয়াই এগুলি ক্রমশঃ বিস্মৃতির গর্ভে অদৃশ্য হইয়াছে একথাও স্বীকার করা যায় না। কারণ রঘুবংশ, শিশুপাল বধ প্রভৃতি কাব্যেও কবির নামোল্লেখ নাই। তবে আমরা দেখিতে পাই যে, গুণাঢ্যের “বহৎ-কথা” ও আচার্য্য ব্যাদির “সংগ্রহ” প্রভৃতি গ্রন্থেও ‘অসার’ নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইহার কারণ নির্ণয় করা দুষ্কর। ভাস-কাব্যাদির বেলায়ও এইমাত্র বলা যাইতে পারে। মুদ্রায়ন্ত্রের আবিষ্কার না হইলে এত দিনে বহু শ্রাব্য কবি নাম মাত্রে পরিচিত হইয়া থাকিতেন।

প্রশ্ন উঠিতে পারে এই গ্রন্থগুলি যে ভাস-প্রণীত তাহার প্রমাণ কি? গ্রন্থেত ভাসের নামোল্লেখ নাই? আমরা এখন এই প্রশ্নের উত্তর দিতেই প্রয়াস পাইব।

শাস্ত্রী মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, এই গ্রন্থগুলির কয়েকটি বিশেষত্ব আছে, এবং ইহাদের রচনা সাদৃশ্য, ভাষা-বিশ্বাস প্রভৃতি বিচার করিলে দেখা যায় যে, এগুলির রচয়িতা একই কবি। এমন কি কয়েকটি বাক্য ও শ্লোক বিন্দুমাত্র রূপান্তর গ্রহণ না করিয়া বিভিন্ন নাটকে স্থান লাভ করিয়াছে, যথা—

“এবার্য্যামিশ্রান্ বিজ্ঞাপয়ামি। অয়ে, কিন্নু ধলু ময়ি বিজ্ঞাপনবাগ্রে শব্দ ইব শ্রয়তে : অঙ্গ, পশ্যামি।” এই অংশটি প্রতিজ্ঞা যোগেশ্বরায়ণ, চারুদত্ত, অবিমারক, প্রতিমা নাটক এবং কর্ণভার ব্যতীত অন্যান্য সকল নাটকেই দেখিতে পাওয়া যায়। আবার,

“ইমাং সাগরপর্য্যন্তাং হিমবদ্বিক্যকুণ্ডলাম্।

মহীমেকাতপত্রাঙ্কাং রাজসিংহঃ প্রশান্ত নঃ।”

—হিমালয় ও বিজ্যাগিরি যাহার কুণ্ডল স্বরূপ, যে মহীমণ্ডল সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, আমাদের রাজা একচ্ছত্র অধিপতি রূপে তাহার সুশাসন করুন।—

এই ভরত বাক্য স্বপ্রবাসবদন্তা ও বালচরিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্রতিজ্ঞা যোগেশ্বরায়ণ, অবিমারক ও অভিষেক নাটকে

“ভবন্তুরঙ্গসো গাবঃ পরচক্রং প্রশম্যতু।

ইমামপি মহীং কুণ্ডমাং রাজসিংহঃ প্রশান্ত নঃ।”

—সমগ্র পৃথিবী হইতে রাজসিক ভাব বিচ্ছিন্ন হউক, শক্রমণ্ডলী প্রশমিত হউক। আমাদের রাজা এই নিখিল ভুবন সম্যক শাসন করুন।—এই শ্লোকটির উল্লেখ আছে, এবং এই শ্লোকের দ্বিতীয়াংশটুকু পঞ্চরাজে দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী ইহাও দেখাইয়াছেন যে, প্রতিজ্ঞা, পঞ্চরাজ, প্রতিমা ও স্বপ্ন নাটকের মঙ্গল শ্লোকে নাটকের প্রধান পাত্র-পাত্রীগণের নামোল্লেখ আছে—

“উদয়নবেন্দু সর্বগাবাসবদন্তা বলৌ বলন্ত তাম্।

পদ্মাবতীর্ণপূর্ণৌ বসন্তকম্রৌ ভূজৌ পাতাম্।”

—যাঁহার ভূজ যুগল উদয় কালীন নূতন চক্রের আয় রমণীয় গৌরবর্ণ, যাঁহার ভূজ সুরাপানে অধিকতর বলদৃপ্ত, লক্ষ্মীর আবির্ভাবে সুসমুদ্র ও বসন্তের আয় অনির্ব্বচনীয় শ্রীসম্পন্ন সেই বলদেব তোমার রক্ষা বিধান করুন।”

স্বপ্রবাসবদন্তা।

“পাতু বাসবদন্তায়ে মহাসেনোহতি বীৰ্য্যবান্।

বৎস রাজন্ত নান্না সশান্তির্যোগেশ্বরায়ণঃ।”

—যিনি স্বয়ং বাসবের কল্যাণ বিধাতা, যিনি বিপুল সেনা-বলে বলীয়ান, যিনি শক্রিমান ও যুগনিয়ামক এবং যিনি রাজ-বৎসল সেই ভগবান তোমাদিগকে রক্ষা করুন।



জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

নিম্নলিখিত শ্লোকটি চারুদত্ত ও বালচরিতের প্রথম অঙ্কে লিপিবদ্ধ হইয়াছে—

“লিম্পতীব তমোহঙ্গানি বর্ষতীবাজনং নভঃ

অসং পুরুষ সেবেব দৃষ্টি নিক্ষিপ্ততাং গত।”

—অঙ্ককার লিপ্ত অঙ্গ, অঙ্গনবর্ষী ( অঙ্ককার ? ) আকাশ ও অসং পুরুষের সেবার ত্রায় দৃষ্টি ( ? ) নিক্ষিপ্ততা প্রাপ্ত হইয়াছে।

“কিং বক্ষ্যতীতি হৃদয়ং পরিশক্তিতং মে।”

—কি জানি বলেন এই চিন্তায় আমার হৃদয় শক্তি হইতেছে।—

এই অংশটুকু স্বপ্ননাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে এবং অভিষেক নাটকের চতুর্থ অঙ্কে রহিয়াছে।

“ধর্মস্নেহান্তরে গুস্তা”—ধর্ম্মানুসারে অস্ত্রের স্নেহাধীন হইলে—এই কথাটিও প্রতিমা নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে এবং অভিষেক নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আরও অনেক শ্লোক বিভিন্ন নাটকে দৃষ্ট হইয়া থাকে :

ইহা হইতে দেখা যায় যে, এই নাটকগুলি একই কবির রচিত। এখন ভাসই যে ইহাদের রচয়িতা এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচার করা যাইবে।

আচার্য্যাভিনবগুপ্তপাদ প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থকারগণের পুস্তকে আমরা স্বপ্নবাসবদত্তার নামোল্লেখ পাই। স্বপ্নবাসবদত্তা মহাকবি ভাস প্রণীত এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই। রাজশেখর শুক্তিয়ুক্তাবলীতে লিখিয়া গিয়াছেন—

“ভাস নাটকচক্রে হপিচ্ছেটকঃ ক্ষিপ্তে পরীক্ষিতুম্।

স্বপ্নবাসবদত্তা দাহকোহভূন্ন পাবকঃ।”

—পরীক্ষার্থ ভাস-নাটকাবলী অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলেও স্বপ্নবাসবদত্তা কখনও ভস্মীভূত হইবে না।

আবার এই সকল আবিষ্কৃত নাটকের প্রথমে নান্দী নাই। সাধারণতঃ নাটক নান্দী পাঠের পরে আরম্ভ হইয়া থাকে—“নান্দ্যস্তে সূত্রধারঃ।” কিন্তু এ সকল নাটক “নান্দ্যস্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ”—এই বালিয়া আরম্ভ হইয়াছে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি তট বাণ ভাসের নাটক

বর্ণনায় বলিয়াছেন—“সূত্রধার কৃতারঃ”—এই বিশেষণ ধরিয়া লইলেও এইগুলি যে ভাসের নাটক তাহাও সন্দেহ মাত্র থাকে না।

আর ‘স্বপ্ননাটক’ স্বপ্নবাসবদত্তার সঙ্কচিত আকার বলিয়া নিঃসন্দেহে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। স্বপ্ন নাটকে বৎসরাকর্ষক বাসবদত্তার স্বপ্নদর্শনই বর্ণিত আছে। ইত্যাদি কারণে এই লক্ষ নাটকগুলি ভাসপ্রণীত বলিয়াই স্থির হইয়াছে।

শাস্ত্রী মহাশয় দেখিয়াছিলেন যে, স্বপ্নবাসবদত্তার কোন কোন অংশ কীট-দষ্ট হওয়ায় দুশ্রাষ্ট হইয়াছে, এবং চারুদত্ত ও কর্ণভার অসম্পূর্ণ বহিয়াছে, সুতরাং তিনি এই সকল নাটকের পূর্ব-কালের প্রতিলিপির উদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং ঈশ্বরানুগ্রহে কৃতকার্য্য হইলেন। মহীশূরের পণ্ডিত অনন্তাচার্য্যের নিকট তিন স্বপ্ন ও প্রতিজ্ঞা নাটকের পূর্ব প্রতিলিপি প্রাপ্ত হইলেন। পণ্ডিত অনন্তাচার্য্য এই প্রতিলিপিগুলি করল হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। স্বপ্ননাটকের শেষে “স্বপ্নবাসবদত্তা সমাপ্তা”—এই কয়টি কথা লিখিত আছে। সুতরাং স্বপ্ননাটক ও স্বপ্নবাসবদত্তা যে অভিন্ন তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। প্রতিজ্ঞা নাটকের অন্তেও প্রতিজ্ঞা যোগন্ধরায়ণ এই সম্পূর্ণ নামটি লিখিত রহিয়াছে।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, কালিদাস তাঁহার মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনায় ভাসের নামোল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং ভাস কালিদাসের পূর্বের লোক। এখন কথা হইতেছে তিনি কালিদাসের কতকাল পূর্বের লোক? কালিদাস তাঁহার মেঘদূতে অবতীর বৃদ্ধ গ্রামবাসিগণকে উদয়নের রক্তাক্ত বর্ণনে পটু বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন,—“প্রাপ্যাবতীরুদয়ন কথ্য কোবিদগ্রাম-বৃদ্ধান্।” কিন্তু ইহার অর্থ কি? কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, বৃদ্ধ গ্রামবাসিগণ বাল্যকালে উদয়নকে দেখিয়াছিল, এবং তাহারা উদয়নের কথা স্মরণরূপে

বর্ণনাক্রিতে পারিত। এইরূপ অর্থ করিলে ভাসকে কালিদাসের অল্প পূর্বের লোক বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ কিন্তু তাহা নহে।

ভামহাচার্য্য ধ্বনালোক প্রণেতা আনন্দবর্দ্ধনেব বহু পূর্বের লোক। আনন্দবর্দ্ধন খ্রীষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর লোক। ভামহ তদীয় কাব্যালঙ্কার স্বত্রবৃত্তির দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে অধিকরণে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

“শরচ্ছশাঞ্চ গৌরেণ বাতাবিচ্ছেন ভাবিনি !

কাশপুপ্পলবেনদেং সাশ্রুপাতং যুগং মম ॥”

—শরৎকালীন শশাঙ্কের ছায় গৌরবর্ণ বায়ুতাড়িত কাশপুষ্পের রেণু আমার চক্ষুকে অশ্রুময় করিয়াছে।

প্রতিজ্ঞা নাটক হইতে বহু অংশ ভামহের কাব্যালঙ্কারে স্থান লাভ করিয়াছে।

কথা এই যে, ভামহ কালিদাসের বহু পূর্বের লোক, কারণ, ভামহ, মেধাবী, রামশর্মা প্রভৃতি কবিও অশ্বকবংশ, রত্নাহরণ প্রভৃতি কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার গ্রন্থে কবি-সম্রাট কালিদাস বা তদীয় একটি কাব্য-রত্নেরও উল্লেখ পাওয়া যায় না। আবার ভামহ ‘যুক্তাসূক্ত বিচার’ পরিচ্ছেদে মেঘমালাকে প্রেম-সন্দেশ-দূতত্বে নিযুক্ত করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। কালিদাস বোধ হয় তাই আচার্য্য প্রবরের উপদেশ মনে করিয়া মেঘদূতের প্রথমে “ধুমজ্যোতিঃ সালল-মল্লতাং” ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। যক্ষ যে মেঘকে দৌত্যে বরণ করিল ইহার সমর্থনাই এই শ্লোকের উদ্দেশ্য।

সুতরাং আমরা দেখিলাম ভামহ কালিদাসের বহু পূর্বের লোক। আবার ভামহ বৎসরাজকে বহু প্রাচীন-কালের লোক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং “প্রাপ্য-বস্তীহুদয়নকথা কোবিদ গ্রাম বৃদ্ধান্” বাক্যদ্বারা এই বুঝিতে হইবে যে, গ্রামবৃদ্ধগণ তাহাদেরই গ্রামের উদয়নের প্রাচীন ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিতে উৎসাহী, কারণ সাধারণতঃ বৃদ্ধগণ গল্পপ্রিয়।

আমরা আরও দেখিতে পাই যে, কালিদাস ভাসকে “প্রথিতযশা” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তিনি ভাস-নাটকগুলিকে বহুপ্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন—

‘পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্গং ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবজ্জম্’

—পুরাতন হইলেই সমস্ত ভাল হয় না, আবার নূতন হইলেই সমস্ত নিন্দনীয় হয় না।—এই বাক্যাংশ হইতে ইহা বুঝা যায় যে, ভাস-কবির যশ ক্রমশঃ বাড়িয়া বাড়িয়া কালিদাসের সময় চরম শীর্ষে উপস্থিত হইয়াছিল। যদি ইহাই এই বাক্যাংশের অর্থ হয় তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, ভাস-কবি ও কালিদাস কবির মধ্যে কয়েক শতাব্দীর ব্যবধান। সুতরাং পরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, ভাস কালিদাসের বহু পূর্বের লোক এবং উদয়ন তাঁহারও পূর্ববর্তী। অতএব কালিদাসের অল্প পূর্বে ভাসকে স্থাপিত করা সমীচীন নহে।

ভামহ তদীয় কাব্যালঙ্কার গ্রন্থে কথা-বিচার উপলক্ষে “বৃহৎকথা”র উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু দণ্ডী তাঁহার “কাব্যাদর্শে” এই উপলক্ষে “বৃহৎকথা”র উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ভামহের সময়ে “বৃহৎকথা”র আবির্ভাব হয় নাই। ভামহের পরে গুণাঢ্য ইতিহাস, স্বপ্নবাসবদন্তা, কাব্যগ্রন্থ, লোক-কাহিনী (Folk-lore) প্রভৃতি হইতে এই সকল কৌতুকময়ী কথা সংগ্রহ করিয়া “বৃহৎকথা” নামে পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

গুণাঢ্য শালিবাহন বংশীয় (অন্ধ্র বংশীয়) হাল নৃপতির সমসাময়িক। হাল খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক; সুতরাং ভামহ খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর লোক বলিয়া ধরা যাইতে পারে, সুতরাং ভাস ভামহের পূর্ববর্তী বলিয়া তাঁহাকে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় কি তৃতীয় শতাব্দীর লোক বলিয়া ধরয়া লওয়া যায়।

আর এক দিক দিয়া বিচার করিলে ভাসকে চন্দ্রশুণ্ড মৌর্যের পূর্ববর্তী (?) বলিয়া দেখা যায়। বিষ্ণুশুণ্ড (চাণক্য বা কোটিল্য) খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর লোক, তিনি চন্দ্রশুণ্ড মৌর্যের সমসাময়িক। চাণক্য তদীয় কোটিল্য অর্ধশতাব্দী গ্রন্থে অগ্ণান্য শ্লোকের সঙ্গে একটি শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন, এটি প্রতিজ্ঞা যোগন্ধরায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়—

“নবং শরাবং সলিলস্ত পূর্ণং সুসংস্কৃতং দর্ভকৃতোত্তরীয়ম্-  
তৎ তন্তু মা ভূয়রকং চগচ্ছেদ যো ভর্ষুপিণ্ডস্ত কৃতে ন  
যুধ্যৎ ।”

—যে ব্যক্তি অন্নদাতার জন্ত যুদ্ধ না করে তাহার জলপূর্ণ শরাও সুসংস্কৃত দর্ভময় উত্তরীয় আর ঘটে না, এবং সে নিরয়গামী হইয়া থাকে।

এখন ভর্ক হইতে পারে কোন গ্রন্থকার কাহার নিকট শ্রী ? প্রথমতঃ, নিজের কথায় অন্যের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করা হয় না, কোটিল্য সৈন্যগণকে উৎসাহ দিতেছেন, সুতরাং অন্তের কথা বলিয়া সৈন্যের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করাই স্বাভাবিক। উদ্ধৃত শ্লোকটি তৃতীয় সংখ্যক। প্রথম অংশটি (এস্থলে উদ্ধৃত হয় নাই) ক্ষতি স্থানীয় দ্বিতীয় শ্লোকটি (উদ্ধৃত হয় নাই) স্থিতি স্থানীয়, সুতরাং তৃতীয়টি যে আর্ধশতাব্দীকারের ইহা বিশ্বাস্ত নহে। আবার ক্ষতি হইতে উদ্ধৃত অংশটির পরে কোটিল্য “অপীহ শ্লোকৌ ভবতঃ” বলিয়া দুটি শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন। নিজের হইলে এই কথা বলার তাৎপর্য কি ? এখন কথা হইতে পারে উদ্ধৃত শ্লোকটি ভাসের নাও হইতে পারে। একথা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু যেক্রম স্থলে এই শ্লোকটি প্রতিজ্ঞা নাটকে উল্লিখিত আছে সে স্থলে ছন্দ প্রভৃতির বিচার করিয়া দেখিলে শ্লোকটি অন্যের নিকট হইতে গৃহীত বলিয়া মনে করা যায় না। যশস্বী কবিগণ অন্যের শ্লোক সাধারণতঃ উদ্ধৃত করেন না, বিশেষতঃ নাটকাদি গ্রন্থে, এবং উদ্ধৃত করিলেও কোন না কোন প্রকারে বুঝাইয়া দেন

শ্লোকটি পরকীয়, কিন্তু এস্থলে বিন্দু মাত্রও সেই রূপ ইঙ্গিত নাই।

প্রতিজ্ঞা নাটকের পঞ্চমাস্ত্রে মেধাতিথির উল্লেখ আছে, কিন্তু এই মেধাতিথি মমুর টীকাকার মেধাতিথি নহেন। তিনি মহর্ষি মেধাতিথি, কারণ ইহার নাম অম্বাজ ঋষিগণের নামের সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—  
মমু, মহেশ্বর, বৃহস্পতি, প্রচেতা। সুতরাং ভাস মমুর টীকাকার মেধাতিথির পরবর্তী লোক নহেন।

এই সামান্য প্রবন্ধে ভাসের কবিত্বের সৌন্দর্য্য বর্ণনার প্রয়াস করা ধুটতা, বিশেষতঃ প্রবন্ধ লেখক এই কার্যের সম্পূর্ণ অজ্ঞপযুক্ত, ভাসের কবিত্ব শক্তির আলোচনা লেখকের সাধ্যাতীত। সুতরাং শাস্ত্রী মহাশয়ের পদাঙ্ক অমুসরণ করিয়া আমি কিঞ্চিৎ প্রয়াস পাইব, পাঠকগণ ধুটতা মার্জনা করিবেন।

পদ্মাবতীর সহচরীগণ বাসবদণ্ডকে বনপথ হইতে দূরে সরিয়া যাইতে বলিতেছে। উদয়ন এ পথে আসিতে-  
ছেন। বাসবদত্তা মর্শপিড়িতা হইয়াছেন। যোগন্ধরায়ণ বলিতেছেন—

“পূর্লং ত্রয়াপ্যভিমতং গতমেব মাসী—

চ্ছাধ্যং গামম্মসি পুনবিজয়েন ভর্তুঃ ।

কালক্রমেণ জগতঃ পরিবর্তমান।

চক্রারপংক্রিরিব গচ্ছতি ভাগ্যপংক্তি ॥

—এরূপ ভাবে এখানে আসা পূর্বে আপনিও অমুমোদন করিয়াছেন, মহারাজের বিজয় লাভের পর আপনি আবার পূর্ল গৌরব লাভ করিবেন। চক্রনৈমির ঞায় জগতের কাল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যপংক্তিও পরিবর্তিত হইয়া থাকে।

প্রতিজ্ঞা নাটকের এক স্থলে শ্রমের ফল অবশুভাবী প্রমাণ করিবার জন্ত কবি বলিতেছেন—

“কাষ্ঠাদির্জ্যয়েত মধ্যমানাদ্ ।

ভূমিস্তোয়ং ষষ্ঠমানা দদাতি ॥

সোৎসাহানাং নান্ত্যসাধ্যং নরাণাং ।

মার্গারক্কাঃ সৰ্ব্বযত্নাঃ ফলস্তি ॥

—বর্ষণ করিলে কাষ্ঠ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়, খনিতে হইলে মুস্তিকা হইতে জল উঠিয়া থাকে, উৎসাহী মানবের অসাধ্য কিছুই নাই। যত্নের সহিত আরক্কা চেষ্টার ফললাভ হইবেই হইবে।

মহাসেন বরের গুণ বর্ণনা করিতেছেন—

“কুলং তাবচ্ছাধ্যং প্রথমমভিকাজ্জেক্ হি মনসা

ততঃ শাস্ত্রকোশং, মূহুরপি গুণো হ্রেব বলবান্ ।

ততো রূপে কাস্তিঃ, ন খলু গুণতঃ স্ত্রীজন-তয়াং

ততো বীৰ্য্যোদগ্ৰং নহি ন পরিপাল্যা যুবতয়ঃ ॥

—আমি প্রথমতঃ বরের কুলই প্লাব্য বলিয়া মনে মনে আকাজ্জক করিয়া থাকি। তারপর স্নেহ, কারণ, স্নেহ মৃদুগুণ-সম্পন্ন হইলেও প্রভাবশালী। অতঃপর বরের রূপ-লাবণ্য আমার প্রার্থনীয়, মনে করিবেন না রাগীর ভায়ে আমি কাস্তির পক্ষপাতী—কাস্তিও একটি গুণ। সর্বশেষে বরের পক্ষে আমার কামনার বস্তু উগ্রবীৰ্য্য, নতুবা রমণীকে রক্ষা করা যায় না।

কত্ভার মাতার মানসিক অবস্থা বর্ণনটি কেমন স্বাভাবিক ও সুন্দর—

“অদন্তেত্যাগতা লজ্জা দন্তেতি ব্যধিতং মনঃ ।

ধর্ম্মস্নেহান্তরে স্তম্ভা দুঃখিতাঃ খলু মাতরঃ ॥”

—কত্ভা এখনও পাত্রস্থা হয় নাই ইহা ভাবিলে লজ্জা হয়। কত্ভা পাত্রস্থা হইয়াছে ইহা ভাবিলেও মনে দুঃখ হইয়া থাকে। আবার ধর্ম্মানুরোধে কত্ভা অস্ত্রের স্নেহাধীন হইলেও ইহা জননীর ক্লেশের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

যত্ন করিয়া কৃতকার্য্য না হইলে দোষ নাই—ভাগ্য সর্বত্রই বলবান্—

“যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোহত্র দোষঃ

কো বা ন সিধ্যতি মমোতি কস্মোতি কার্য্যম্ ।

যত্নৈঃ শুভৈঃ পুরুষতা ভবতীহ নৃণাং

দৈবং বিধানমভুগচ্ছতি কার্য্যসিদ্ধিঃ ॥”

—যত্ন করিয়া কার্য্যসিদ্ধি না হইলে কি দোষ? এই কার্য্য আমার অবশ্য করিতে হইবে এই ভাবিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কার্য্য সিদ্ধি না হইয়া থাকে? বিশেষরূপে চেষ্টা করিলে পুরুষকারের অমুরূপ ফল-লাভ হইবেই হইবে। কার্য্যসিদ্ধি দৈবের বিধান অমুরূপ করিয়া থাকে।

কালিদাস শকুন্তলার ৪র্থ অঙ্কের একটি সুন্দর শ্লোক ভাসের অনুরূপে লিখিয়াছেন—

“পাছুং ন প্রথমং ব্যবস্জতি পয়ো যুগ্মাশ্বপীতেষু যা

না দন্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবং ।

আন্তো বঃ কুসুম-প্রসূতি-সময়ে যন্তা ভবত্যাংসবঃ

সেয়ং যাতি শকুন্তল! পতিগৃহং সর্কৈরহুজ্জায়তাম্ ॥”

—তোমরা জলপান না করিলে যে প্রথম জল পান করিত না, ভূষণপ্রিয়া হইলেও তোমাদের প্রতি স্নেহ বশত যে পল্লব চয়ন করিত না, তোমাদের কুল হওয়ার সময় হইলে সকলের আগে যার আনন্দ হইত, সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছে তোমরা অহুমতি কর।

অভিষেক নাটকের এই শ্লোকটিও পাঠ করুন—

“যন্তাং ন প্রিয়মণ্ডনাপি মহিষী দেবশ্চ মন্দোদরী

স্নেহালুপ্সতি পল্লবান্ নচ পুনর্বীজস্তি যন্তাং ভয়াৎ ।

বীজস্তো মলয়ানিলা অপি কঠৈরস্পৃষ্টবালক্রমা

সেয়ং শক্ররিপোরশোকবনিকা ভয়েতি বিজ্ঞাপ্যতাম্ ॥”

—ভূষণপ্রিয়া হইলেও রাবণমহিষী মন্দোদরী যে অশোকবনের প্রতি স্নেহ বশত পল্লব চয়ন করিতেন না, সত্তত প্রবাহিত মলয়ানিলও ইন্দ্রজিতের ভয়ে যে বনে প্রবাহিত হইত না; যে বনের তরুণ বৃক্ষগুলি কখনও কর-স্পৃষ্ট হয় নাই, শত্রু-শত্রু ইন্দ্রজিতের সেই সাধের অশোকবন আজ ভগ্ন এই কথা জানাইয়া দাও।

এই দুটি শ্লোকের যে ভাব-সাদৃশ্য আছে এমন নহে। ‘প্রিয়মণ্ডনাপি’, ‘স্নেহাৎ’, ‘পল্লবান্’, ‘সেয়ং’, ‘প্রসূতি’ মধুরপদগুলিও কালিদাস ভাস হইতে ধার লইয়াছেন।

আরও দেখুন—

“হৃদয়েনেহ তত্রাদৈর্ঘ্যিধাতুভেব গচ্ছতি ।

যথা নভসি তোয়ে চ চন্দ্রলেখা দ্বিধা কৃত্য ॥”

—চন্দ্রলেখা আকাশে ও সলিলে যেরূপ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া থাকে সেইরূপ বসুদেব-পত্নী দৈবকীর প্রাণটি স্তবিকাগৃহে শ্রীকৃষ্ণাভিমুখে আকৃষ্ট হইতেছে ও দেহখানি কারাগৃহের দিকে নীত হইতেছে ।

কালিদাসের এই শ্লোকটি পড়ুন—

“গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদ সংস্থিতং চেতঃ ।

চীনাং শুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্ত ॥”

বায়ুর বীপরীত দিকে নীয়মান রেশমী পতাকার স্তায় রাজার শরীরটি সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু মনটি অস্থির হইয়া পশ্চাৎ দিকেই ধাবিত হইতেছে ।

কালিদাসের—

“বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহস্তু যুগাঃ ॥”

—পণ্ডসকল আশ্রমে অনিষ্টের আশঙ্কা নাই এই বিশ্বাসে কোলাহল শুনিয়াও পলাইতেছে না ।—

কহাকবি ভাসের নিম্নোক্ত পংক্তিটির সামান্য রূপান্তরিত আকার—

“বিস্তরং হরিণাশ্চরন্ত্যচকিতা দেশাগত প্রত্যায়াঃ ।”

—হরিণগুলি আশ্রমে অনিষ্টের আশঙ্কা নাই এইরূপ জ্ঞাতবিশ্বাস বশত অচকিত ভাবে চরিয়া বেড়াইতেছে ।

সমান্তর ও সদৃশ শ্লোকাবলী সাবধানে পাঠ করিলে ঈদৃশ বহু শ্লোক কালিদাসের গ্রন্থ হইতে খুঁজিয়া লইতে পারা যাইবে । ভবভূতির গৃহাবলীতেও ভাসের প্রভাব সুস্পষ্ট লক্ষিত হয় । উত্তর রামচরিতের দ্বিতীয় অঙ্কে আত্রেয়ীর কথাগুলি স্বপ্ন বাসবদত্তার প্রথমাক্ষে ব্রজচারীর কথাগুলির ছায়া মাত্র ।

মৃচ্ছকটিকের বহু শ্লোকের ভাষা ও ভাব চারুদত্ত নাটক হইতে অবিকল গৃহীত হইয়াছে—

“যাসাং বলির্ভবতি মদগৃহদেহলীনাং

হংসৈশ্চ সারসগণৈশ্চ বিতক্তপুংগাঃ ।

তাস্বেব পূর্কবলিক্রত্বযাকুরাশু

বীজাঞ্জলিঃ পততি কীটমুখাবলীচঃ ।”

চারুদত্ত—প্রথমাক্ষ

—পূর্বে আমার গৃহের বাড়ান্দায় হংস-সারস প্রভৃতি পক্ষী পুষ্পরাশি দূরীভূত করিয়া যে সকল সজ্জিত বলি খাইয়া ফেলিত সেই সকল বলি-শেষ হঠাৎ উৎপন্ন যবাকুরে এখন কীটমুখভ্রষ্ট বীজাঞ্জলি পতিত হইতেছে ।—

মৃচ্ছকটিকের নিম্নোক্ত শ্লোকটির সহিত তুলনা করুন—

যাসাং বলিঃ সপদি মদগৃহদেহলীনাং

হংসৈশ্চ সারসগণৈশ্চ বিলুপ্তপূর্কঃ ।

তাস্বেব সংপ্রতি বিরক্ততৃণাকুরাশু

বীজাঞ্জলিঃ পততি কীটমুখাবলীচঃ ॥

—পূর্বে আমার গৃহের বাড়ান্দায় হংস সারস প্রভৃতি পক্ষিকুল যে সকল বলি ক্ষণকালের মধ্যেই নিঃশেষ করিয়া ফেলিত সেই সকল বলিশেষহইতে উৎপন্ন তৃণাকুরে কীটমুখভ্রষ্ট বীজাঞ্জলি এখন পতিত হইতেছে ।

আরও দেখুন—

“মার্জারঃ প্লবনে বৃকোহপসরণে শোনো গৃহালোকনে

নিজ্রা স্তৃপ্তমমুগ্ধবীৰ্য্যভুলনে সংসর্পণে পন্নগঃ ।

মায়া বর্ণশরীরভেদকরণে বাগ্ দেশ ভাষান্তরে

দীপো রাত্রিশু সংকটে চ তিমিরং বায়ুস্থলে নোর্জলে ॥”

( চারুদত্ত নাটক )

( তত্ত্ব ) উন্নতনে মার্জার, পলায়নে বৃক, গৃহস্থিত দ্রব্যাদি অবলোকনে শোন, স্তৃপ্ত মমুগ্ধের ক্ষমতা বিচারণে নিজ্রা, দ্রুতগমনে সর্প, শরীরের বর্ণাদি পরিবর্তনে মায়া, বিভিন্নদেশের ভাষায় বাগ্মী, রাত্রিকালে প্রদীপ, সংকটে তিমির, স্থলে বায়ু ও জলে নৌকা ।

এবং

“মার্জারঃ ক্রমণে যুগঃ প্রসরণে শোনো গৃহালুকনে

স্তৃপ্তাস্তৃপ্ত মমুগ্ধবীৰ্য্যভুলনে ষা, সর্পণে পন্নগঃ ।

মায়া রূপ শরীরবশরচনে বাগ্ দেশ ভাষান্তরে

দীপো রাত্রিশু সংকটেষু ভুজুষো, বাজী স্থলে, নোর্জলে ॥”

( ৩ঙ্কর ) অতিক্রমে মাজ্জার, পলায়নে যুগ, গৃহাবলোকে গেলেন, সুপ্তাসুপ্ত মনুষ্য নির্জারণে কুকুর, ক্রত গমনে সর্প, বিভিন্নরূপ ও বর্ণ সজ্জায় মায়া, বিভিন্নদেশের ভাষায় বাগ্মী, রাত্রিকালে প্রদীপ, সন্ধ্যাকালে বৃক, স্থলে অশ্ব ও জলে নৌকা। ( মুচ্ছকটিক )।

চারুদত্ত নাটকের চতুর্থ অঙ্কে—

“বিপদগ্রস্ত সর্ষাপী, সংলম্বোৎফুল্ল লোচনা।

মৃগীব শরবিদ্ধাপী কম্পসে, চাহুকম্পসে ॥”

—বিপদে তোমার সর্ষাশরীর শিথিল, প্রেমাংবেগে লোচনযুগল উৎফুল্ল, সুতরাং শরবিদ্ধ মৃগীরদ্বায় কম্পাশ্রিত কলেবর, আবার চক্ষু হৃতিতে অশ্রুকম্পা-কটাক্ষ।

এবং মুচ্ছকটিকের চতুর্থ অঙ্কে—

“বিবাদত্সস্ত সর্ষাপী সংলম্ব লাস্ত লোচনা।

নীরমানা ভূজিয়াত্স, কম্পসে নাস্তুকম্পসে ॥”

—ওগো বারবিলাসিনি, তোমাকে লইয়া যাইতেছে বলিয়া বিপদে তোমার সর্ষাশরীর শিথিল কিন্তু প্রেমাংবেগে লোচনযুগল চঞ্চল, তুমি কম্পিত হইতেছ আবার কম্পিত হইতেছও না।

এরূপ বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, মুচ্ছকটিক ভাসকৃত চারুদত্ত নাটকের এক নূতন সংস্করণ মাত্র। বস্তুতঃ শূদ্রক ভাসের চারুদত্ত অবলম্বন করিয়াই মুচ্ছকটিক লিখিয়াছিলেন। শূদ্রক যে ভাসের পরবর্তী তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই; কারণ শূদ্রককৃত মুচ্ছকটিকে নাট্যকারের নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু ‘চারুদত্তে’ এরূপ কোনও প্রস্তাবনা নাই। বাস্তবিক পরবর্তী যুগেই প্রস্তাবনায় নাট্যকারের নাম ও নাট্যের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং মুচ্ছকটিকে মৌলিক গ্রন্থ বলিয়া ধরিয়া লইলে বিষয় ভুল করা হইবে। তবে কবি শূদ্রক যে বহু রসাত্মক শ্লোকাদি মুচ্ছকটিকে সন্নিবিষ্ট করিয়া গ্রন্থানিকে নূতন ভাবে সাজাইয়াছেন ইহা সর্বথা স্বীকার্য। কবি শূদ্রক কালিদাসের

পূর্ববর্তী কি না বলা যায় না, তবে তিনি যে, বামনের পূর্ববর্তী ইহাতে সন্দেহ নাই, কারণ তাঁহার কাব্যালঙ্কার হ্রস্ববৃত্তিতে শূদ্রকের উল্লেখ আছে—“শূদ্রকাদি রচিতেষু প্রবন্ধেন্ন ভূয়ান প্রপঞ্চো দৃশ্যতে।”

মহাকবি ভাসের কবিত্বের যৎকিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইল। ভাস-নাটক যেমন প্রাচীন তেমনই গুণবহুল। ভাসের ভাব-প্রকাশ-কৌশল অতুলনীয়, ভাষা প্রাজ্ঞল, মধুর, মনোমুগ্ধকর, ধীর-গভীর ও উদাহী। ফলতঃ এইরূপ ভাষা অন্যান্য সহস্র বৎসরের প্রাচীন পুস্তকে ভিন্ন দৃষ্ট হয় না।

বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন বিষয়ের হৃদয় বর্ণনায় ভাস সিদ্ধহস্ত, কিন্তু তাই বলিয়া কবি ভাস রস-বর্ণনায় অপটু নহেন, এবং বাগ্‌বাহুল্য ভাস-নাটকে আদৌ স্থান লাভ করিতে পারে নাই।

মনের ঠিক ভাবটি প্রকাশ করার জন্য যেখানে যে কথাটির প্রয়োগ দরকার ভাস ঠিক তাহাই করিয়াছেন, তাঁহার নাটকে একটিও বাহুল্য-কথা নাই, এবং অর্থ-প্রতিপত্তির জন্য যে কথাটির দরকার ঠিক সেই কথাটিরই প্রয়োগ রহিয়াছে। নিঃশ্বাস বায়ুর দ্বায় স্বাভাবিক ভাবে নাটকগুলি ভাসের মুখ হইতে বহির্গত হইয়াছে—কোনও স্থলে একটু অস্বাভাবিক বা কৃত্রিম সজ্জা দেখিতে পাওয়া যায় না। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, ছন্দ-লালিত্য ও পদ-বিজ্ঞাসে ভাস-নাটক অধি-সুজ্ঞির দ্বায় চিত্তোন্মাদী।

নবাবিষ্কৃত ভাস নাটকের সাহায্যে এক ঐতিহাসিক সত্য অবিসংবাদিত রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। অজাতশত্রুর পরবর্তী মগধ রাজের নাম লইয়া এত দিন বিতণ্ডা চলিতেছিল এবং অনেকে উদয়কেই অজাতশত্রুর পরবর্তী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা ভাসপ্রণীত স্বপ্ন নাটকে দেখিতে পাই মহারাজ দর্শকের ভগিনী পদ্মাবতী বৎসরাজ উদয়নের পরিণীতা মহিষী, এবং দর্শকের পরে উদয় মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং উদয়ের সময়েই রাজগৃহ হইতে পাটলিপুত্রে মগধের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়।

আবার স্বপ্ননাটকের ভরত বাক্য হইতে তৎকালীন সাম্রাজ্য-সীমার উপলক্ষ হয়। চন্দ্রগুপ্ত-মৌর্য্য উত্তর ভারতে একাধিপত্য স্থাপন করেন। তাঁহার সাম্রাজ্য পূর্ব পশ্চিমে সাগরতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল ও উত্তর দক্ষিণে-হিমালয় হইতে বিষ্ণাগিরির পাদমূল্য পর্য্যন্ত প্রসার লাভ করিয়াছিল। সুতরাং এই হিসাবে দেখা যায় ভাস চন্দ্র-গুপ্ত ও অশোকের মধ্যবর্তী কারণ, অশোকের রাজ্য সীমা-বিষ্ণাগিরি লঙ্ঘন করিয়াছিল।

ভাস-প্রণীত দূত ঘটোৎকচ উরুভঙ্গ প্রভৃতি নাটক মহাভারতের ঘটনাবলী লইয়া রচিত। অনেকে মনে করেন মহাভারত খ্রীষ্ট পূর্ব পঞ্চ শতাব্দী ও খ্রীষ্টীয় পঞ্চ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত হইয়াছে। যদি ভাসকে চন্দ্রগুপ্তের পূর্ববর্তী বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে ভাস প্রায় খ্রীষ্ট পূর্ব পঞ্চ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক হইয়া দাঁড়ান। তাহা হইলে যাহারা খ্রীষ্ট পূর্ব পঞ্চ শতাব্দী মহাভারতের রচনা কাল বলিয়া নির্দেশ করিতে চাহেন তাঁহাদের মতবাদ অনেকটা অসার হইয়া পড়ে।

আশা করি বর্তমান সময়ে কোনও বোধ্যতর ব্যক্তি ভাস-দত্ত উপাদানের বলে ইতিহাসের এই সকল জটিল সমস্যার বিচার-ভার গ্রহণ করিবেন।

### ভাসের গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত সার।

১। **স্বপ্নবাসবদত্তা**—বৎসরাজ উদয়ন উজ্জয়িনী-পতি মহাসেনের কন্যা বাসবদত্তার পাণিগ্রহণ করেন। পরে প্রণট-রাজ্য উদয়নের পক্ষে সিদ্ধাদেশ হয় যে, মগধ-রাজ-হুহিতা পদ্মাবতীর সহিত রাজার পরিণয় হইলে তিনি পুনরায় রাজ্য-লক্ষী লাভ করিবেন। সুতরাং প্রভুভক্ত মন্ত্রী যোগন্ধরায়ণ প্রচার করিয়া দেন যে, গ্রাম-দাহে রাণী বাসবদত্তা পুড়িয়া মরিয়াছেন এবং মন্ত্রী যোগন্ধরায়ণও রাণীকে উদ্ধার করিতে যাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এদিকে যোগন্ধরায়ণ মহিষীকে স্বীয় ভগিনী বলিয়া পরিচয় দিয়া ও স্বয়ং ব্রহ্মচারী সাজিয়া মহিষী বাসব-

দত্তাকে মগধ-রাজ-ভগিনী পদ্মাবতীর নিকট আসি বরুণ রাখিয়া যান। পরিশেষে পদ্মাবতীর সহিত রাজার পরিণয় হয় এবং লক্ষ-গৌরব উদয়নের সহিত রাণী বাসবদত্তারও মিলন ঘটে। এই নাটকে কবি পদ্মাবতী-চরিত্রকে অতি উচ্চ আদর্শে অঙ্কিত করিয়াছেন।

২। **প্রতিজ্ঞা যোগন্ধরায়ণ**—বৎসরাজ এক দিন গজ-মৃগয়া করিতে নাগবনে গিয়াছিলেন। উজ্জয়িনী-পতি প্রত্যোত তাঁহার হস্তে স্বীয় তনয়াকে দান করিতে ইচ্ছুক হইয়া কৌশলে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাজধানীতে লইয়া আসেন এবং অস্তঃপুরে রুদ্ধ করিয়া রাখেন। একদিন দৈবক্রমে উদয়নের সহিত রাজকুমারীর দেখা হয়, এবং ফলে উভয়ের প্রণয় সঞ্চার হয়। এদিকে বৎসরাজ-মন্ত্রী যোগন্ধরায়ণ বাসবদত্তার সহিত রাজাকে স্বকীয় রাজধানীতে ফিরাইয়া আনিতে কৃতসংকল্প হইয়া স্বকীয় বহুলোক উজ্জয়িনীতে প্রেরণ করেন। তাহার। ছদ্মবেশে অস্তঃপুরে ও নগরে বাস করিতে থাকে এবং মন্ত্রী স্বয়ং উন্নত বেশে উজ্জয়িনীতে ভ্রমণ করিতে থাকেন। পরে সুযোগ বুঝিয়া একদিন রাজা উদয়ন রাজকুমারী বাসবদত্তার সহিত হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া উজ্জয়িনী হইতে বাহির হইয়া পড়েন। এদিকে যোগন্ধরায়ণ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া লোকজন সহ বন্দী হন। কিন্তু উজ্জয়িনী-রাজ মহাসেন মন্ত্রীর নীতি-প্রয়োগ-নৈপুণ্যে পরিতুষ্ট এবং স্বকীয় হুহিতার অনুরূপ বরলাভে প্রীত হইয়া যোগন্ধরায়ণকে সাদর সম্মানে আপ্যায়িত করেন এবং কোশাটী নগরে সম্মানে পাঠাইয়া দেন।

৩। **বাল চরিত**—ইহাতে কৃষ্ণের বালাম্বলী গণিত হইয়াছে। কংসগৃহে বনুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। কংসভয়ে ভীত বনুদেব যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া নন্দগোপ হস্তে কৃষ্ণকে প্রদান করেন ও যশোদার কন্যাকে লইয়া আসিয়া ইহাকেই স্বীয় সন্তান বলিয়া কংসের বিবাস উৎপাদন করেন।

এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থে কৃষ্ণের গোপালয়ে বাস, পুতনা বধ,

শকট দানব নিধন, যমলার্জুন কথা, কালীয় দমন, কংস-বধ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

৪। **পঞ্চরাত্র**—যজ্ঞাবসানে হর্যোধান আচাৰ্য্য জ্যোৎস্না দক্ষিণা দানের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে আচাৰ্য্য বলিলেন, “তুমি পাণ্ডবদিগকে অৰ্দ্ধরাজ্য ফিরাইয়া দাও, ইহাই আমার দক্ষিণা।” হর্যোধান বলিলেন, “যদি পঞ্চরাত্রের মধ্যে অজ্ঞাতবাসকারী যুধিষ্ঠিরাদির কোন সংবাদ আইসে তবেই অৰ্দ্ধরাজ্যকে অৰ্দ্ধরাজ্য দিব।” ৩২পরে হর্যোধানের গোগৃহ-যাত্রা, ছদ্মবেশী অৰ্জুন কর্তৃক কুরু সৈন্তের পরাজয়, বিরাট-গৃহে যুধিষ্ঠিরাদির আত্মপ্রকাশ এবং বিরাট রাজকন্যা উত্তরাকে পঞ্চ পাণ্ডবের পুত্রবধূরূপে গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা। যুধিষ্ঠির হর্যোধানের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “অভিমম্বার সহিত উত্তরার পরিণয় কার্য্য বিরাট গৃহে হইবে অথবা হস্তিনায় হইবে।” শকুনি বলিয়া উঠিল, “সেই খানে, সেই খানে।” জ্যোৎস্না বলিলেন, “হর্যোধান, পঞ্চরাত্র এখনও শেষ হয় নাই, যুধিষ্ঠিরাদির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে অতএব স্বীয় প্রতিজ্ঞা স্বরণ পূৰ্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে অৰ্দ্ধরাজ্য প্রদান কর।” হর্যোধান অৰ্দ্ধরাজ্য দিতে স্বীকার করিলেন এবং সকলে প্রসন্ন হইলেন।

[এখানে মহাভারতে বর্ণিত ঘটনাবলীর সহিত এক আশ্চর্য্য বিরোধ দৃষ্ট হয়।]

৫। **অবিমানক**—সৌবির রাজকুমার অবিমানক ঋষিশাপে চণ্ডালরূপ প্রাপ্ত হইয়া পিতার সহিত

কুন্তিভোজনগরে প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতেছিলেন। তথায় তিনি স্বীয় মাতুল রাজা কুন্তিভোজের কন্যাকে মত্তহস্তীর গ্রাস হইতে রক্ষা করেন। পরে উভয়ের মধ্যে পরস্পর প্রেমের সঞ্চারণ হয় ও বিচ্ছেদ ঘটে। পরিশেষে আবার সংগোপনে উভয়ের মিলন হয়। শাপাবসানে নারদ সকলের পরিচয় প্রদান করেন।

৬। **অন্যাস ব্যাসোপা—**(১অঙ্ক) ভীমসেন এক ব্রাহ্মণ পরিবারকে ঘটোৎকচের হস্ত হইতে উদ্ধার করেন।

৭। **দূতবাক্য**—পাণ্ডবের দূত হইয়া গ্রীক্শ্ব হর্যোধানের সভায় গমন করেন। ইহাই এই নাটকের বর্ণনীয় বিষয়।

৮। **দূতঘটোৎকচ**—অভিমম্বার মৃত্যুতে দুঃখিত গ্রীক্শ্ব ঘটোৎকচকে দূতস্বরূপ যুধিষ্ঠিরাদির নিকট প্রেরণ করেন।

৯। **কর্ণভার**—কর্ণ ইন্দ্রকে কবচ ও কুণ্ডল দান করেন।

১০। **উত্তরভঙ্গ**—গদাযুদ্ধে ভীমসেন কর্তৃক হর্যোধানের উত্তরভঙ্গ হয়।

১১। **চারদন্ত**—শূড়কের মূচ্ছকটিক চারদন্তের রূপান্তর মাত্র।

শ্রীশুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।



## আলোচনা

### ময়নামতির গান

শ্রীযুক্ত আবদুল করিম ও শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দাস মহাশয় প্রতিভা চৈত্র সংখ্যায় ভবানী দাসের ময়নামতির গান লইয়া আলোচনা করিয়াছেন দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। এই মূল্যবান প্রাচীন গ্রন্থ সম্বন্ধে যত আলোচনা হয় ততই মঙ্গল, আমি এখানে একটিমাত্র বক্তব্য বলিয়া তাঁহাদের আলোচনার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব—অগ্রাঙ্ক কথা ময়নামতির গানের ভূমিকায় দ্রষ্টব্য। ভূমিকা সম্বন্ধেই প্রকাশিত হইবে। বক্তব্যটি এই যে, দুইখানা পুথির পাঠ মিলাইয়া ময়নামতির গানের পাঠোদ্ধার হইয়াছিল। পাঠোদ্ধার কার্য সম্পূর্ণ বৈকুণ্ঠ বাবু করিয়াছেন আমার তাহাতে কিছুমাত্র হাত ছিল না। সম্পাদন কার্য সম্পূর্ণ আমি করিয়াছি, তাহাতে যাহা দোষ ক্রটি হইয়াছে তাহাতে বৈকুণ্ঠ বাবুর কিছুমাত্র হাত নাই। সম্পাদন সময়ে বৈকুণ্ঠ বাবুর সাহায্য না পাওয়ায় বৈকুণ্ঠ বাবুর উদ্ধৃত পাঠ লইয়া সময় সময় কিছু গোলমালে পড়িতে হইয়াছে। বৈকুণ্ঠ বাবুর বাস-গ্রাম কুমিল্লা ময়নামতি পাহাড়ের প্রায় সংলগ্ন। আমি কিছুদিন কুমিল্লার প্রবাসীমাত্র ছিলাম কাজেই সম্পাদনে বৈকুণ্ঠ বাবুর সাহায্য পাইলে সম্পাদন সম্পূর্ণ হইত। এখন মোহিনী বাবু ও আবদুল করিম মহাশয়দ্বয়ের আশেপাশে অংশগুলির পুনরালোচনা করা যাউক।

(১) “শম্ভুছড়ামাটি”কে আমি শম্ভুবাসান গৃহতল অর্থে নিয়াছি আলোচক হয় তাহাকে শম্ভুচাইল নামক গ্রামের নাম বলিয়া বুঝিতে চাহেন। যাহারা ভৌগোলিক নামগুলির প্রাচীন কাল হইতে ক্রম পরিবর্তনের কিছুমাত্র খবর রাখেন তাহারা “শম্ভু” “শম্ভু” মিল দেখিয়া কখনই এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেন না।

শম্ভুচাইল ময়নামতির পাহাড় হইতে কতদূর? শম্ভু-চাইল নামে একটা গ্রাম কুমিল্লা জেলার সীমার মধ্যে খুঁজিয়া পাইয়াই অমনি মানিকচাঁদের বাড়ী পাইয়াছেন বলিয়া উল্লসিত হইয়া উঠা সমীচীন হয় নাই। ময়নামতির মূড়া হইতে জ্রীলোকের এক দৌড়ের পথ যদি শম্ভু-ছড়া নামে কোন গ্রাম মূড়ার আধ মাইলের মধ্যে বর্তমান থাকে তবেই মোহিনী বাবু তাহাকে মানিকচাঁদের বাড়ী বলিয়া নির্দিষ্ট করিতে পারিতেন। যেখানে শম্ভুছড়া শব্দটি আছে সেই কয়টি লাইন উদ্ধৃত করিতেছি।

তোর বাপের ঘর ছিল সঙ্কছড়া মাটি  
তাহাতে বিছাইল পুনি গঙ্গাজল পাটি।

“পুনি” শব্দটির মানে আশা করি সমালোচকদ্বয় জানেন। তাহা জানিয়াও এরূপ অসাবধানতার পরিচয় দেওয়া বিশ্বাসের বিষয়। ময়নামতি স্বামী মানিকচন্দ্রকে ব্রহ্মজ্ঞান দিবেন তাই তাহাকে মহা সমাদর করিয়া বসাইতেছেন। গৃহতল শম্ভুবাসান তাহাই যথেষ্ট শীতল ও মন্থন ছিল—তাহার উপরেও রাজার মন ভুলাইবার জন্য ময়নামতি গঙ্গাজল নামক বিধাত শীতল পাটি বিছাইয়াছিলেন। এই হইতেছে এই লাইল দুইটির সোজা অর্থ। এই বিষয়ে আর অধিক লিখা বাহ্যিক বিবেচনা করি। একটু চিন্তা করিলেই আলোচক মহাশয় দ্বয় আমার অর্থ সঙ্গত বলিয়া বুঝিতে পারিবেন। ময়নামতি ও মানিকচাঁদের যে ভিন্ন বাড়ী ছিল তাহা ঠিকই, কিন্তু সে দাম্পত্য জীবনের শেষ অবস্থায়। শেষ অবস্থায় ময়নামতি তাহার জপতপ সাধনা লইয়া পৃথক ভাবে বাস করিতেন। তাহার প্রমাণ ভূমিকায় দ্রষ্টব্য। কনিকা বা কলিকানগরকে কলিকা পুর বলিয়া স্থির করাও বোধ হয় ঠিক হয় নাই। কলিকাপুরে কি ময়নামতির বাড়ীর চিহ্ন আছে না ময়নামতির স্মৃতি সংশ্লিষ্ট অগ্র কিছু আছে? আমাদের মতে বর্তমানে ময়নামতির টিলা বলিয়া পরিচিত স্থানটিই প্রাচীন কালের কলিকানগর ছিল।

(২) বাসর শব্দের দুই অর্থ—কেলিগৃহ ও দিবস।  
যে কোন অভিধানে এই অর্থ আছে—

অবশ্য মরিবা তুমি আমার বাসরে  
সপ্তদিনের বাসি মরা করিব তোমাতে।

এইখানে বাসর শব্দের অর্থ “আমাদের দিনে” “আমরা  
বাঁচিয়া থাকিতে”—ইহা ছাড়া অল্প অর্থ অসম্ভব।

সাতা নি আসিব যম বাড়ির ভিতর  
তবে লোহাএ বান্ধিব পুনি আমার বাসর।

এখানে বাসর অর্থ কেলিগৃহ—লক্ষ্মীন্দরের লোহার  
বাসর স্বরণ করুন। এরূপ সামান্য সামান্য শব্দের প্রকৃত  
মানে ত পড়িবা মাত্রই বুঝা যায়—তাহা নিয়া করিম  
সাহেবের মত আজীবন প্রাচীন সাহিত্যের আলোচক  
কেন যে গোলমালে পড়িয়াছেন তাহাই বিশ্বয়ের বিষয়।

(৩) তরাঙ্কু মানে প্রকৃতই নিজি—আমার “ছুড়ি”  
মানে ভুল হইয়াছে—কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি।

(৪) “জৈতা” শব্দটি সংস্কৃত “জতু” শব্দ হইতে  
আসিয়াছে। জতু মানে লাক্ষা—এই জতু দিয়াই পাণ্ডব-  
দের দাহের নিমিত্ত ঘর নির্মিত হইয়াছিল। জতু শব্দ  
ভাষায় “জৈতা” হইয়া সহজদাহ্য পদার্থ মাত্রই প্রযুক্ত  
হইয়াছিল। জৈতা শব্দটির পাকাটি অর্থে প্রয়োগ হইতে  
পারে। পাকাটির আটান ও পাকাটির ছাউনি আলবান্ধা  
ঘর বাঁহারা দেখিতে চাহেন তাঁহারা একবার ঢাকা  
জেলায় পানের বরোজগুলি দেখিয়া যাইবেন।

(৫) চারিবর্ষ লাগিল খণার কারবার  
ভাঙ্গ খাই সিদ্ধাএ লাগিল ঢুলিবার।

এখানে বর্ষ অর্থে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র কি না  
আমি তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আলোচক  
ঘরের এই জিজ্ঞাসা “আজগুবি” ও “হাস্তকর” বলিয়া  
মনে হইয়াছে। প্রশ্ন পাইলে বাঁহারা তাহার  
উত্তর দিবার অধিকারী তাহারা স্থির মস্তকে তাহাই  
দিতে চেষ্টা করেন। আলোচক মহাশয়ঘর বৈশ্য (?)  
গোপীচান্দের বাড়ীতে চারি বর্ষ কাজ করিতে

আসিবে কেন তাহা ভাবিয়া না পাইয়া এক লিপিকর  
প্রমাদের ধূয়া ধরিয়াছেন। একটু চিন্তা করিলেই  
বুঝা যাইত যে, “চারিবর্ষ” ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ইত্যাদি ভিন্ন আর  
কিছুই হইতে পারে না, কারণ যে হাড়িকার জন্ত  
বস্ত্রমতী খাট পাতিয়া দেয় এবং যমের পুত্র মেঘনালা  
ছত্র ধরে তাহার অধীনে চারিবর্ষ খাটিবে তাহা কিছু  
মাত্র বিচিত্র নহে। একাদশ শতাব্দীর ঘোর তান্ত্রিকতা  
ও মহাযান বৌদ্ধধর্মের মহাবিপ্লবের দিনে তাহা খুবই  
সম্ভব ছিল। তাহার জন্ত লিপিকর প্রমাদ কল্পনা করি-  
বার কিছুমাত্র আবশ্যিকতা নাই; আর তিন স্থানে প্রাপ্ত  
তিনখানা পুস্তকে যে শব্দ পরিষ্কার রূপে বর্ণ বলিয়া  
লেখা আছে তাহাকে লিপিকর প্রমাদ বলা দুঃসাহসিকতা।

(৬) যশী শব্দের মানে আমি যশস্বী করিয়াছিলাম  
এবং তাহাই সঙ্গত ও পাঠ্যমাত্র বোধ্য মানে। আলোচক-  
ঘর এখানেও লিপিকর প্রমাদ কল্পনা করিয়া যশী  
মানে জ্যোতিষ্য করিতে চান। প্রাচীন পুস্তকের  
আলোচনায় কল্পনাকে আর একটু খাট করা ভাল—  
বজ্রজনের অমরোষ। আলোচক ঘরের মন্তব্য “পাঞ্জি  
দেখিয়া হাতে খড়ি লইয়া গণনা করা গণকের কর্ম,  
যশস্বীর তাহাতে কোন হাত নাই।” অদ্বুত মন্তব্য  
আমিও আলোচকঘরের ভাষায় বাঁহাতে পারি “হাস্তকর ও  
আজগুবি।” গণক শুধু কি যশস্বী হইতে  
পারে না? যশস্বী গণককে শুধু তাহার বিশেষণটি দ্বারা  
উল্লেখ করিলেই কি অপরাধ হয়?

(৭) আমাদের প্রাপ্ত পুথিতে এক যায়গাতে  
শিলাতে কু দিবার পূর্বে ধর ধর উচ্চারণ করিয়া, অল্প  
যায়গায় যশ যশ উচ্চারণ করিয়া এবং অল্প আর এক যায়-  
গায় ধর্ম ধর্ম উচ্চারণ করিয়া শিলাতে কু দেওয়া হইয়াছে।  
আলোচক ঘরের প্রাপ্ত পুস্তকে ধোও ধোও করিয়া  
কু দেওয়া হইয়াছে। এ অবস্থায় তাহাদের ধোও ধোওই  
শুদ্ধ আর অন্য সমস্তগুলিই লিপিকর প্রমাদ এমন  
বায়না যদি তাঁহারা ধরেন তবে আমি মাচার।

( ৮ ) “বিরি” শব্দটি (আমার পুস্তকে “বিরি” আছে আলোচক ঘরের পুস্তকে “গিরি” আছে—গিরি বিরিরই পূর্ববঙ্গীয় সংস্করণ বলিয়া বোধ হয়) ঘরণী মানে করিয়াছি, তাহা না কি হান্তজনক। স্থানটির অর্থ এই—মানিকচন্দ্র বলিয়াছিল, ময়নামতি তুমি আমার স্ত্রী—আমার অধীনে থাকিবে—আমি কি তোমার ঘরের ঘরণী যে আমার নিকট হইতে ধর্মোপদেশ শুনিতে পাইবে।

( ৯ ) “চারি বধুর দুঃখ খাইয়া” কথাটি যে একটি মিষ্ট মধুর রকমের হাস্য উপহাস তাহা বোধ হয় অল্প চিকিৎসা বিনাও বুঝা যায়। সন্ন্যাসের নিয়ম এই যে, জ্ঞানকে মাতৃসম্বোধন করিয়া গৃহত্যাগ করিতে হয়, কিন্তু তাহার পূর্বে ময়নামতি সটান একাদশ দ্বাদশ বৎসরের বালিকাগণের মাই চক্ চক্ করিয়া পান করিয়া পরিভূক্ত হইয়া গোপীচাঁদকে সন্ন্যাস যাত্রায় গভীর ভাবে উপদেশ দিতেছেন এরূপ কল্পনা কি করিয়া আলোচক ঘরের মনে স্থান পাইল? তাহার আবার সুধীগণকে একথা গভীর ভাবে বিচার করিতে আহ্বান করিয়াছেন! সুধীগণ হাসিয়া থুন হইয়া গেলে লেখক হয় যে খুনের দায়ে পড়িবেন!

(১০) কেন্দা কি কেন্দা আসল পুথিতে আছে তাহার

মীমাংসা করিতে এখন পারিলাম না, কারণ পুথিগুলি হাতের কাছে নাই। কিন্তু আলোচকঘরের উদ্ভিদ তব্ব বিচারে একটু ভুল হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ কেয়া বা কেতকী গাছের ফল কাঁঠালের মত নহে। লেটোন নামক এক প্রকার কচু জাতীয় কাঁটাসম্বল গাছের ফলই কাঁঠালের মত—লেটোন গ্রামাবালিকাগণ মাটির ভাত মাটির ব্যঞ্জন রাখিয়া খেলা করিতে মাছ স্বরূপ ব্যবহার করে। লেটোনের ফলকে কেয়া কাঁঠাল বলে, এবং তাহা ঠিকই অখাদ্য।

(১১) “আপন সূক্য” বলিয়া যে কথাটি যুক্তিত হইয়াছে তাহা মূলে “আগল সূক্য” বলিয়া ছিল—ছাপা খানার ভূত উদ্ধার রূপান্তর ঘটাইয়াছে। “আগল সূক্য” মানে আমি করিয়াছি—“অলক্ষ্মী—যে আপনার সূখ আগে দেখে।” ইহা আমি সম্পূর্ণ সঙ্গত অর্থ বলিয়া মনে করি।

সর্বশেষে—“তরাজু” এবং “সর্বজএ” কথা দুটির ঠিক মানে এবং “সর্বজএ” কথাটির ঠিক বানান ধরিয়া দিবার জন্য আলোচকঘরকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

ত্রীনলিনী কান্ত ভট্টশালী।

# প্রতিভা

চতুর্থ বর্ষ

আম্রাত ১৩২১

৩য় সংখ্যা

## বংশোৎকর্ষ বিজ্ঞান ও বর্তমান হিন্দুসমাজ \*

একটি জাতির উন্নতি সংসাধন করিতে হইলে প্রধানতঃ দুইটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে হইবে। প্রথমতঃ, বংশোৎকর্ষ বিজ্ঞানের (Eugenics) সাহায্যে এরূপ সামাজিক বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে হইবে যাহাতে জাতির মধ্যে উত্তরোত্তর সুযোগ্য ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, এবং অযোগ্য ব্যক্তির সংখ্যা হ্রাস পায়। দ্বিতীয়তঃ, জাতীয় শিক্ষাদীক্ষা এবং জীবনযাত্রা প্রণালী প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক অবস্থা (Environment) এরূপ হওয়া আবশ্যিক যাহাতে সুযোগ্য ব্যক্তিগণ তাহাদের দক্ষতার উপযুক্ত কার্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হন। বর্তমান প্রবন্ধে প্রথমোক্ত উপায়টি সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাইতেছে।

বংশোৎকর্ষ বিজ্ঞানের মূলভিত্তি বংশক্রমের নিয়মের (Law of Heredity) উপর সংস্থাপিত হইয়াছে। বংশক্রমের প্রভাব সম্বন্ধে এখনও বাদানুবাদ আছে বটে কিন্তু মূলতঃ নিম্নলিখিত কথাটি অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়। সুস্থ, বুদ্ধিমান ও চরিত্রবান

লোকের বংশেই সচরাচর সুস্থ, বুদ্ধিমান ও চরিত্রবান লোক জন্মিয়া থাকে, এবং কয়েকটি পীড়াবিশেষ দ্বারা আক্রান্ত, নিকোষ ও চরিত্রহীন লোকের বংশে প্রায়ই তদনুরূপ লোক জন্মিয়া থাকে। এখন সমাজ যদি আপনাদের হিত আশা করিতে তাহা হইলে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে শ্রেষ্ঠোক্ত অযোগ্য লোকগণ যথাসম্ভব অল্পসংখ্যক সন্তান উৎপাদন করিতে পারে এবং পূর্কোক্ত যোগ্য ব্যক্তিগণ যথা সম্ভব অধিকসংখ্যক সন্তান জন্মাইতে পারে। কাজেই দেখা যাইতেছে, বিবাহের পাত্র-পাত্রী নির্বাচনই (Selection through marriage) বংশোৎকর্ষের পক্ষে সর্বাঙ্গীক প্রয়োজনীয় বিষয়।

সম্প্রতি আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের কয়েকটি ষ্টেটে (state) বংশোৎকর্ষ বিজ্ঞানের অনুমোদিত কয়েকটি আইন প্রণীত হইয়াছে। বিবাহের পূর্বে পাত্র ও পাত্রীকে গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে এই মর্মে একখানি প্রশংসাপত্র লইতে হয় যে, তাহাদের কোনও কঠিন রোগ নাই, বুদ্ধির ও চরিত্রের কোনও বিশেষ দোষ নাই, এবং তাহারা সন্তান পালনে সক্ষম। ইহা দ্বারা সমাজের মহোপকার সাধিত হইবে সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। আমেরিকায় উদ্ভাদি রোগ, মত্তপান এবং মানাক্রম অপরাধীর সম্বন্ধে যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বিখ্যাত সেন্সস বিবরণ (Census) সংগৃহীত হয় আমাদের দেশে সেরূপ হয় না। এই সেন্সস বিবরণ হইতে আমেরিকানেরা

আবাদ ১০২১

জানিতে পারিয়াছে যে, তাহাদের দেশে উন্মাদ এবং একেবারে বুদ্ধিহীন (imbecile) লোক এবং যে সকল লোকের চরিত্রে এমন বিষম ত্রুটি আছে যে, চুরি ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধ তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে এইরূপ লোকের (habitual criminals) সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে; এত আইন কাগুন, এত স্বাস্থ্যবিষয়ক ব্যবস্থা, এত শিক্ষা বিস্তার কিছুতেই ইহার প্রতীকার হইতেছে না। এখন তাহারা সমাজের এই বিষম রোগের এক বিষ-বড়ীর ব্যবস্থা করিতেছেন। তাহারা চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে এই প্রকৃতির অযোগ্য লোকেরা বিবাহদ্বারা সন্তান উৎপাদন করিতে না পারে। কেন না ইহা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, চরিত্রের এবং বুদ্ধির সকল মৌলিক দোষ (innate defects) বংশানুক্রমে পিতা মাতা হইতে সন্তানে সংক্রামিত হয়।

এই বিবাহ সম্বন্ধীয় আইনের বিরুদ্ধে কিন্তু সে দেশে মহা আন্দোলন চলিতেছে। তাহার প্রধান কারণ এই যে, সেখানে কোনও প্রাচীন লোক পাত্র ও পাত্রী নির্বাচিত করিয়া তাহাদিগকে উদ্বাহ বন্ধনে সম্বন্ধ করেন না। অপরিণতবুদ্ধি যুবক ও সুবতীর্ণ আপনাদের স্বৈচ্ছাক্রমে বিবাহ করিয়া থাকে—কাজেই তাহারা গবর্ণ-মেন্টের এই সদিচ্ছাপ্রণোদিত আইনটিকে একটা জুলুম বলিয়া বিবেচনা করিতেছে।

আমাদের দেশে প্রাচীন অভিভাবকগণ নানাদিক বিবেচনা করিয়াই পাত্র-পাত্রী ঠিক করিয়া দেন কাজেই ওরূপ একটা আইনের বিরুদ্ধে এদেশে তেমন আন্দোলন হইবার কথা নহে। তবে অনেকে সামাজিক কোনও বিষয়ে সরকারী আইন যাহােই অন্যায় বিবেচনা করেন, সে কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।

ইতিহাসে দেখা যায় হিন্দু রাজগণ বিবাহাদি অনেক সামাজিক ব্যাপারেও আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। বঙ্গাল সেন প্রভৃতি প্রাচীনকালের রাজাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, সেদিন পর্যন্ত পেশোয়াগণ সমাজ-সংস্কার

কার্যে রাজশক্তির প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। \* কিন্তু ইংরাজ গবর্ণমেন্ট হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে কোনও আইন করিতে স্বভাবতঃই ভয় পান, কেন না লোকে মনে করিতে পারেন যে, তাহারা হিন্দুর ধর্মে হস্তক্ষেপ করিতেছেন।

মুসলমান আমলে, হিন্দুরাজ্যের অবর্তমানে ব্রাহ্মণগণ হিন্দুসমাজের প্রতিনিধি রূপে অনেক সামাজিক আইন চালাইয়া ছিলেন। সেই সকল ক্রমান্বয়ে ধীরেই হিন্দুসমাজ আত্মরক্ষার লক্ষ্যে হইয়াছে। না হইলে সমস্ত বাঙ্গা দেশ মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করিত।

কিন্তু ইহাতে দেশে আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন, ইংরাজী শিক্ষা প্রভৃতি কতকগুলি এমন নূতন ঘটনার আবির্ভাব হইয়াছে যে, তজ্জন্ত সম্প্রতি হিন্দুসমাজের আইনগুলি বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত করার প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু পরিবর্তন করিবে কে? বর্তমানকালে ব্রাহ্মণগণের আর সেরূপ আধিপত্য নাই। কাজেই ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, সুবর্ণ বণিক, নমঃশূদ্র প্রভৃতি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রবীণ ও বিদ্বান লোকগণ সমবেত হইয়া যদি একটা মহতী সভা আহ্বান করেন তাহা হইলে সেই সভা কালোপযোগী অথচ ধর্মশাস্ত্র-সম্মত বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন পূর্বক হিন্দুজাতির উন্নতি সত্ত্বর সংসাধিত করিতে পারেন। তবে আমাদের বর্তমান আলস্য-বিহ্বলিত সমাজদেহে অতটা শক্তি আছে কি না তাহা বিবেচনা করিতে হইবে।

যাহা হউক সমবেত ও বিধিবদ্ধ ভাবে না হইলেও সমাজ-সংস্কারদ্বারা সমাজরক্ষার চেষ্টা যে যাবে যাবে দেখা যায় না এমত নহে। যাহারা এই সকল চেষ্টা করিতেছেন তাহাদের কার্যপ্রণালী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় (১) পুরাতন শাস্ত্রে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহারা তাহারই অনুসরণ করিতে চান, দেশ কাল পাত্র ভেদে যে ব্যবস্থার পার্থক্য হওয়া উচিত তাহা তাহারা বিস্মৃত হন। (২) কেহ কেহ ইউরোপীয় গণের অঙ্ক অনুকরণ করিতে থাকেন—ভারত-

বর্ষ ইউরোপ নহে ইহা তাঁহারা ভ্রাবেন না। (৩) কেহ কেহ হয়ত কেবল মাত্র দয়াধারা প্রণোদিত হইয়া অথবা ন্যায়ের (justice) প্রেরণায় সমাজ-সংস্কার কার্যে ব্রতী হন। কিন্তু সমাজ এমনই একটি জটিল সমস্যা যে কেবল মাত্র ভাবুকতায় তাহার বিশেষ কোনও উপকার করা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিকের মত সহিষ্ণু ও সাবধান ভাবে সমাজের উপস্থান নানা অবস্থার ও ব্যবস্থার দ্বারা প্রতিবাদ পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে, এবং আবশ্যিক হইলে পরীক্ষা স্বরূপে সমাজের (experimentally) উপর নূতন নূতন ব্যবস্থার ফলাফল কিরূপ হয় তাহা দেখিয়া স্থির করিয়া লইতে হইবে। বাস্তবিক পাশ্চাত্য দেশসমূহে, বিশেষতঃ আমেরিকা ও জার্মানিতে পদার্থবিজ্ঞান প্রাণীবিজ্ঞান প্রভৃতির দ্বারা সামাজিক বিষয় সকল অধ্যয়ন করিবার জন্যও সমাজ-বিজ্ঞান (Sociology) নামে একটি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হইতেছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান শিক্ষার বন্দোবস্ত কত দিনে হইবে বলা কঠিন। যাহা হউক আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের বিষয় বংশোৎকর্ষ বিজ্ঞান এই সমাজ বিজ্ঞানের একটি প্রধান শাখা।

কয়েক বৎসর হইতে আমি বিশেষভাবে হিন্দুসমাজের সম্পর্কে বংশোৎকর্ষ বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। একটি প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, প্রাচীন হিন্দুসমাজের মূল ব্যবস্থাগুলি বিজ্ঞানসম্মত, কিন্তু পরে বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ অনেক প্রথা সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় বর্তমান কালে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ প্রভৃতি জাতিগুলি এত উপজাতিতে (subcastes) বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে উপযুক্ত পাত্র ও পাত্রীর অসম্ভাব হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দু বিবাহে কিরূপ ভাবে পাত্রী ও পাত্র নির্বাচন করিলে তাহা বিজ্ঞানসম্মত হইবে তাহা অল্পে আলোচনা করিয়াছি। এখানে কেবল এই সম্পর্কে একটি কথা বলিতে চাই। বংশোৎকর্ষ বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ খুব আশা প্রদ হইলেও আপাততঃ

কিছুকাল গবেষণাধারা ইহার আবিষ্কৃত সত্যগুলি দৃঢ়তর ভিত্তির উপর স্থাপিত করা প্রয়োজন। কিন্তু সে কার্যের জন্য আমরা কি সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উপর নির্ভর করিয়া হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিব? আমরা আমাদের সমাজের বিষয় অধ্যয়ন করিয়া কি নূতন নূতন সত্য আবিষ্কার করিতে পারিব না? বিশেষতঃ এই কার্যের জন্য হিন্দুসমাজের যে সুবিধা রহিয়াছে পাশ্চাত্য সমাজের তাহা নাই। প্রথমতঃ, আমাদের কুল-গ্রন্থ প্রভৃতি বংশবিবরণ থাকায় আত্মীয়-স্বজনগণের ঘনিষ্ঠ পরিচয় রাখার জন্য অনেক খবর পাওয়ার সুবিধা রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, বিবাহসম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার যে রূপ শক্তি আমাদের আছে তাহাদের তাহা নাই, কেন না সেখানে অভিভাবকগণ আপনাদের বিবেচনা অল্পসারে পাত্রপাত্রীকে বিবাহবন্ধ করিতে পারেন না। এখন একটি বিষয় মীমাংসা করিবার বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। কয়েক পুরুষ বুদ্ধিমান ও চরিত্রবান পাত্রের সহিত বুদ্ধিমতী ও চরিত্রবতী পাত্রীর মিলন সাধন করিলে সে বংশে লোকোত্তর প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ—দার্শনিক নিজ (Nietzsche) যাহাদিগকে প্রতিভাশালী (great geniuses বা Supermen) নামে অভিহিত করিয়াছেন সেইরূপ ব্যক্তিগণ জন্মবে কি না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন যদি প্রাচীন নবদ্বীপে আগমবাগীশ মহাশয়ের পুত্রের সহিত চৈতন্যদেবের কন্যার বিবাহ হইত, এবং এই বিবাহে যে কন্যা উৎপন্ন হইত তাহার সহিত নিত্যানন্দের পুত্রের বিবাহ হইত, তাহা হইলে সেই বিবাহের সন্তানগণ প্রতিভাশালী (Supermen) হইত কি না। ইহা মীমাংসা করিবার প্রধান উপায় বর্তমান কালে একটি সামাজিক পরীক্ষা (social experiment) করিয়া দেখা ঐরূপ বিবাহের ফল কিরূপ হয়। ঐরূপ পরীক্ষা সম্পাদন করিবার শক্তি পাশ্চাত্য সমাজ অপেক্ষা হিন্দু সমাজের অধিক আছে। কি উপায়ে সমাজে প্রতিভাবান লোক (আমি “genius” এর কথা বলিতেছি,

আবাত ১০২১

বুদ্ধিমান বা “talented” লোকের কথা বলিতেছি না।  
উৎপন্ন করা যায় তাহা যদি আমরা পাশ্চাত্য পণ্ডিত-  
বর্গকে শিখাইতে পারি, সেটা কি আমাদের কম গৌর-  
বের বিষয় হইবে? হুংখের বিষয় বংশোৎকর্ষবিজ্ঞানের  
উপকারিতা সম্বন্ধে এ দেশে যথার্থ ধারণা না থাকায়  
কোনও ব্যক্তি সামাজিক বিষয় লইয়া পরীক্ষণ ও  
পরীক্ষা করিতে হইলে কাহারও নিকট আশায়রূপ  
সাহায্য না পাইয়া ভ্রমোন্মত্ত হইয়া পড়েন।

আর একটা কথার সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া  
প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সন্ন্যাস বা চিরকৌমার্যের  
সহিত বিবাহের সুবিধা ও অনুবিধাগুলি বৈজ্ঞানিক  
ভাবে তুলনা করিয়া দেখা যাক। এক জন চিরকুমার  
যে রূপ সমাজের উপকারার্থে আপনার সমুদ্র শক্তি নিয়োগ  
করিতে পারেন এক জন বিবাহিত লোকে সে রূপ পারেন  
না; কেন না তাহাকে স্ত্রী পুত্রের প্রতিপালন জন্য অনেকটা  
শক্তি ব্যয়িত করিতে হয়। সে দিন এনসাইক্লপিডিয়াতে  
(Encyclopaedia Britannicaতে) খৃষ্টান মিশনারিগণের  
বিবরণ পড়িতেছিলাম। তাহাতে দেখিলাম শিক্ষাপ্রচার,  
দরিদ্রসেবা প্রভৃতি মিশনের কাজ প্রায় অর্ধেক রোমান  
ক্যাথলিক পাদরিগণ করিতেছেন, তাঁহারা অবিবাহিত।  
অর্ধেক কাজ করিতেছেন প্রোটেষ্ট্যান্ট পাদরিগণ,  
তাঁহাদের মধ্যে বিবাহের প্রথা থাকিলেও অর্ধেকের  
অধিক অবিবাহিত। ইহাতেই বুঝা যায় বিবাহিত  
লোকের পক্ষে স্বার্থত্যাগ করিয়া লৌকিকসেবায় আত্ম-  
নিয়োগ করা কত কঠিন। যাহার নিজের সন্তান নাই,  
তিনি ইচ্ছা করিলে সমাজের সমুদায় বালক বালিকাকে  
তাঁহার সন্তানস্থানীয় করিতে পারেন।

কিন্তু চিরকৌমার্যের বিরুদ্ধে বংশোৎকর্ষ বিজ্ঞানের  
এক মহা আপত্তি আছে। চিরকুমার যদি সুখোদ্য ব্যক্তি  
হন তাহা হইলে তাঁহার বংশ না থাকায় উত্তরকালে  
সমাজ কতকগুলি যোগ্য ব্যক্তি লাভে বঞ্চিত হইবে।  
কাছেই এই এক উভয় সমস্যা পড়া গেল —

না বাইলে রাজা মারে, বাইলে ভুলদ।

গাবণ আয়েশে যথা শারীচ কুরদ।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এই সমস্যার উত্তরে বলিতে-  
ছেন যে, সমাজ যখন যোগ্য ও স্বার্থত্যাগী ব্যক্তিগণের  
সন্তানদ্বারা লাভবান হইবে তখন সেই সন্তানগণের  
লালনপালনের ভার সমাজেরই নিজের উপর নেওয়া  
উচিত। কিন্তু সমাজের এতটা কর্তব্য বোধ কবে হইবে  
বলা যায় না, কাজেই ততদিন পর্যন্ত ইহার কোনও  
মীমাংসা হইবে না। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় হিন্দু  
সমাজের প্রক্ষেপেই এই সমস্যার সর্বোৎকৃষ্ট মীমাংসা  
রহিয়াছে। হিন্দুগণ ভাই, ভাইপো প্রভৃতি মিলিয়া  
একত্র একত্র পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করে। তাহাদের  
মধ্যে কেহ অধিক উপার্জন করে, কেহ অল্প উপার্জন করে,  
কিন্তু সকলেই সমান সুখে সচ্ছন্দে সংসার নির্বাহ করে।  
এখন এইরূপ একটা পরিবারের এক জন লোকে যদি স্বার্থ  
ত্যাগ করিয়া কোনও লোক-সেবায় কাজে আত্মনিয়োগ  
করে কিংবা অধিক উপার্জনের আশায় কোনও বিপদ-  
সম্মুল কার্যে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার জীপুত্রের  
জন্ম চিন্তিত হইবার আবশ্যক নাই। পরিবারের অত্যন্ত  
উপার্জনকম আত্মীয়গণ তাহাদের ভরণপোষণ নির্বাহ  
করিবেন। আজকাল ওকালতি প্রভৃতি পুরাতন  
নিরাপদ রাস্তায় চলিয়া অনেকের কিছু রোজগার  
করিতে পারিতেছেন না, বিদেশে উপনিবেশ স্থাপন,  
রসায়নিক কারবার ও নানারকম কলকারখানা  
প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নূতন ও বিপজ্জনক রাস্তায় চলিতে  
বাধ্য হইতেছেন। অনেক স্থলে এই সকল সাহসী ও  
উদ্যোগী যুবক বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইতে চাহিতেছেন  
না, কেন না পূর্বকার হিন্দু একত্র পরিবার দ্রুত  
বেগে অদৃশ্য হইতেছে। যে সকল চিন্তাশীল ব্যক্তি  
কেবলমাত্র বর্তমান সমাজের অবস্থা ভাবেন না, পরন্তু  
ভবিষ্যতে সমাজের অবস্থা কিরূপ হইবে তদ্বিষয়েও  
চিন্তা করেন, তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার  
জন্যই এই বিষয়টির অবতারণা করিলাম।

সুবিধা স্বীয় একান্তবর্তী পরিবারে অনেক অসুবিধাও আছে। প্রধান অসুবিধা এই যে, যদি পরিবারভুক্ত কোমল লোক কুচরিত্র হয় তবে তাহা দ্বারা সমস্ত পরিবারের অমঙ্গল সাধিত হইয়া এইরূপ স্থলে বাড়ীর কর্তার উচিত সেই ব্যক্তিকে পারবার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া। অবশ্য বলা বাহুল্য একান্তবর্তী পরিবাবেব সুখ প্রধানতঃ নির্ভর করিতেছে কৰ্তা ও গৃহিণীর উপর, কৰ্তাগৃহিণী ভাল লোক না হইলে এগার পরিবাব এক দিনও টিকিবে না।

যাহা হউক, একার পরিবার সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করবাব স্থান ইহা নহে। আমি কেবলমাত্র ইহাই দেখাত্তে চাহ যে, চিরকৌমার্য ও বিবাহেব সনাতন বিরোধ, সুপরিচালিত হিন্দু একার পরিবাব প্রথা দ্বারাই সৌম্যসিত হইতে পারে। এই একটা দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যায় যে, বৈজ্ঞানিক প্রণালী মতে হিন্দুসমাজেব বিষয় অধ্যয়নদ্বারা আমরা এমন অনেক সত্য আবিষ্কার করিতে পারিব যাহা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ আমাদের নিকট শিক্ষা কবিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

ঐসত্যশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

## প্রভাত

উষার কিরণদীপ্ত বঙ মেঘ-পথে  
সুবলা নামি আসে হেমকুন্ত মাথে  
আলোক-প্রবাহ বহি'; আবেগচল  
ডুহলে তটিনীবাঁবি ছল্ ছল্ ছল্  
অজ্বেব পরশ লভি',—স্নুদ্ধ বক্ষ টুটে  
মর্ষের হরষ যত পুষ্প হয়ে ফোটে  
কনককমল সম সর্ষদেহে তার,  
তাবি পানে মৌল যুদ্ধ নয়ন আঁরাব  
বিস্ময়ে রহিছ চাহি'।

এস অগ্নি বালা!

আমার অন্তরুখানি করি দাও আলা  
নারিব নয়নপাতে স্বর্ণ তুলি দিয়া  
আঁধার এ মর্ষগেই দাও উজলিয়া।  
তোমার লাবণ্য-গলা নিখিল গগন  
বহা'ক্ হৃদয়ে মোর আলোক-প্রাবন।

ঐপারমলকুমার ঘোষ।

## বৈশ্যজাতির পুরাতত্ত্ব

বৈশ্য জাতিতে আৰ্য্যজাতির নিয়ন্তর কপেই আমরা আমাদের শাস্ত্রে ও সাহিত্যে বর্ণিত দেখিতে পাই। কিন্তু তাহাদের প্রকৃত পুরাতত্ত্বের সন্ধান করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, একসময়ে তাহারা ই সন্ধ্যাপেক্ষা অধিক গৌরবের আধিকারী ছিলেন।

বৈশ্যজাতির পূৰ্ব্বোক্ত পুরাতত্ত্বের মূলতত্ত্ব তাহাদের জাতীয় নাম হইতেই উদ্ধার করা যাইতে পারে। বৈশ্য যেমন তাহাদের জাতীয় নাম তেমনই 'বিশ' ও 'অৰ্য্য'ও তাহাদের জাতীয় নাম। 'বিশ' সম্বন্ধে এইরূপ অভিধান আছে—'দ্বৌ বিশৌ বৈশ্য মনুর্জো'। ইহাব অর্থ—'বিশ' শব্দ 'বৈশ্য' ও 'মনুজ্য' এই উভয়ার্থেই বাচক। 'অৰ্য্য' শব্দ সম্বন্ধে অভিধানে উক্ত হইয়াছে, "অৰ্য্যঃ স্বামী বৈশ্যয়োঃ",—ইহাব অর্থ, 'অৰ্য্য' স্বামী ও বৈশ্য এই উভয়কেই বুঝায়।

'বৈশ্য' শব্দ 'বিশ' ধাতু হইতে জাত। 'বিশ' ধাতুর অর্থ প্রবেশকরা। এই 'বিশ' ধাতু হইতে একদিকে যেমন গাত্রাবরণবাচক 'বেশ' শব্দ গঠিত হয় তেমনই গৃহবাচক 'বেশ্য' শব্দও গঠিত হয়।

'বেশ' শব্দের দ্বারা যেমন একদিকে বৈশ্য শব্দের মূল্যার্থের ব্যাখ্যা হইতে পারে তেমনই বেশ্য শব্দের দ্বারাও অপবদিকে ইহাব মূল্যার্থের ব্যাখ্যা হইতে পারে।

গাত্রাবরণের মধ্যে প্রবেশ করে বা গৃহমধ্যে প্রবেশ করে 'বিশ' ধাতুর ইহাই ব্যুৎপত্তি হয়। এই ব্যুৎপত্তি-টীকে পুরাতত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া লইলে আমরা



আবাদ ১০২১

ইহার প্রকৃত গূঢ়ার্থ কণ্ঠস্থ করিতে সমর্থ হইব। মানবজাতির উন্নতির ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি যে, মানবজাতির বর্তমান উন্নতি একদিনে বা একবারে হয় নাই। এই উন্নতি বহুকালে ও ক্রমে ক্রমে হইয়াছে। মানবজাতির গাত্রাবরণ ও বাসগৃহ আবিষ্কার করিতে বহু সময়ই লাগিয়াছিল। এমন জাতি পৃথিবীতে বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা সম্পূর্ণ উল্লভ অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছে, আবার এমন সভ্যজাতির কথাও জানা যায় যাহারা বাসগৃহ নির্মাণ করিতে না জানিয়া গর্তে বাস করিত। 'বেশ' ও 'বাসের' আবিষ্কার প্রথম ইহাদের দ্বারা হইয়াছে বলিয়াই ইহাদের 'বৈশ্য' নাম হইয়াছে। ইহাই আমাদের নিকট ইহার প্রকৃত তাৎপর্য বলিয়া বোধ হয়।

বাসগৃহের সহিত 'বিশ' বা বৈশ্যের সম্বন্ধ পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদগণের ভুলনামূলক ভাবাবিজ্ঞানের প্রমাণ দ্বারাও সমর্থিত হয়। \*

গূঢ়ার্থক 'বিশ্' শব্দের অনুরূপ শব্দ যে আমরা পাশ্চাত্য প্রাচীন আৰ্য্য ভাষা সকলে বিদ্যমান দেখিতে পাইয়াছি তাহাতেও 'বেশ' বা বাসগৃহের সহিত 'বিশ্' বা বৈশ্য জাতির অতি প্রাচীনকালে 'বে' যোগ ছিল এবং এই যোগমূলেই যে ইহাদের এই নাম হয়, তাহা পরিষ্কার রূপেই বুঝিতে পারা যায়।

এক সময়ে আৰ্য্যগণ 'বিশ্' নামেই পরিচিত হইতেন। পাশ্চাত্য প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত ওয়েবার (Weber) বলেন, "তখনও (ঋগ্বেদের সময়ে) কোন জাতিভেদ বর্তমান ছিল না। লোক সকল তৎকালপর্য্যন্তও একই সমষ্টীভূত ছিল এবং একই বিশ্ নাম ধারণ করিত।"†

\* "Vaisya comes from a Sanskrit root, which is found in many Aryan tongues—Sanskrit vesa, a house; oikos, Greek; Vicus, Latin, veils, Gothic; wick, German." Cyclopaedia of India by Balfour.

† There are no castes as yet; the people is still

এই অংশ আর, সি দত্ত মহাশয়ের ঋগ্বেদানুবাদে দৃষ্ট হয় (১৫ পৃঃ)।

ঐতিহাসিক ডাক্তার হার্টারের মতেও সমগ্র আৰ্য্য উপনিবেশিকগণই এক সাধারণ বিশ্ নামে পরিচিত ছিলেন।‡

'বিশ্' শব্দ এই প্রকারেই আৰ্য্য সাধারণ নাম হইতে মনুষ্য সাধারণের নামে যে পরিণত হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ অতিথানে অনুসন্ধান করিলে আমরা 'বিশ্' শব্দকে মনুষ্য জাতেরই বাচক দেখিতে পাই যথা, 'বৌবিশৌ বৈশ্য মনুষ্যো ॥' বিশ্ শব্দ বৈশ্য ও মনুষ্য উভয়ই বুঝাইয়া থাকে। আমরা রাজার যে 'বিশাম্পতি' একটি নাম প্রাপ্ত হই তাহাতে 'বিশ্' শব্দ স্পষ্টই লোকজাত্যই বুঝায়। বেদে এই অর্থেই 'বিশ্ পতি' (ঋগ্বেদ ৬।১।৮) শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। পশুপালন, কৃষি ও বাণিজ্যই বৈশ্য জাতির বিশেষ ধর্মরূপে শাস্ত্রে নির্দিষ্ট দেখা যায়, যথা—

"পশুনাং রক্ষণং নানিষিক্কাধ্যয়নম্বেব চ।

বণিকপথং কুদীদকং বৈশস্ত কৃষিমেব চ ॥" ১০

মনুসংহিতা, ১ম অধ্যায়।

বৈশ্যদিগের পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, কৃষিকর্ম এবং বৃদ্ধির জন্য ধন প্রয়োগ করনা করিলেন।"

আর্য্যজাতির প্রথম ইতিহাসের আলোচনা হইতে পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন one united whole and bears but one name, that of Visas." Indian Literature p 38. Translation রমেশ বাবুর ঋগ্বেদানুবাদে উদ্ধৃত (১৮ পৃঃ)

‡ Dr. Hunter says the Vaisya caste, literally the Vis or body of the Aryan settlers were in ancient times the tillers of the soil. Imp. Gaz. Cyclopaedia of India by Balfour.

"ডাক্তার হার্টার বলেন বৈশ্যজাতি মূলতঃ বিশ্ বা সমগ্র আৰ্য্য উপনিবেশিকগণ পুরাকালে ভূমিকর্ষণকারী ছিলেন।

আর্য্যগণ আদি অবস্থায় পশুপালনদ্বারাই জীবন যাপন করিতেন।\*

ইহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণই আছে যে, আদি আর্য্যগণ ভ্রমণশীল পশুরক্ষক (জাতি) ছিলেন।

বৈশ্বদিত্যের পশুপালন ও কৃষিকর্মের নির্দেশদ্বারা তাঁহাদের মধ্যে যে আদিম আর্য্যজীবনের নিদর্শন পাওয়া যায় তাহাই আমরা বুঝিতে পারিতেছি। ইহা দ্বারা তাঁহাদের সর্বপ্রাচীনত্বের প্রমাণও পাওয়া যায়।

বৈশ্বজাতির অপর একনাম ‘অর্য্য’। এই ‘অর্য্য’ শব্দ ‘অ’ বা ‘অর’ ধাতু হইতে নিপ্পন্ন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই ‘অর’ ধাতু মূলে কর্ণধারক ছিল বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুতরাং ‘অর্য্য’ শব্দ যে আদিতে ‘কৃষক’ বুঝাইত তাহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে। মহর্ষি মথুরা বৈশ্বজাতির যে কৃষিকর্মের নির্দেশ করিয়াছেন অর্য্য শব্দের কৃষিকার্য্যের সহিত তাহারিও বিলক্ষণ সঙ্গতিই হয়। কৃষিকার্য্য বর্তমানে বিশেষ সম্মানের-বিষয় না হইলেও ইহা এক সময়ে যে বিশেষরূপেই মর্য্যাদাজনক ছিল তাহা ‘অর্য্য’ শব্দের অপর শ্রেষ্ঠ অর্থদ্বারাও প্রমাণিত হয়। ধনিক বৈশ্বদিত্যের যে আমরা শ্রেষ্ঠী ও তদপত্রষ্ট ‘শ্রেষ্ঠ’ উপাধি দেখিতে পাই তাহা শ্রেষ্ঠ শব্দ হইতেই উৎপন্ন, ও ইহারই অর্থপ্রকাশক। আমরা রোমানদিগের বিশেষ সমৃদ্ধির সময়ও যে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে কৈসারকর্ষণ ছাড়িয়া আসিয়া দেশের অধিনেতৃত্ব করিতে দেখিতে পাই তাহাতেও কৃষিকার্য্য যে সমাজে হয়ে ছিল না তাহারই প্রমাণ প্রাপ্ত হই।

যে ‘অর্য্য’ নামের দ্বারা আমাদের আদিপুরুষেরা আপনাদের পরিচয় প্রদান করিতে প্রাণা বোধ করিতেন, এবং যে আর্য্যদিগের কৃষিকর্ম বলিয়া আমাদের নিজের পরিচয় প্রদান করিতে আমরা পরম গৌরব মনে করিয়া থাকি সেই অর্য্য নামটী বৈশ্বদিত্যের ‘অর্য্য’ নাম হইতেই যে স্বার্থে গঠিত হইতে পারে তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণে স্বাভাবিক সাধারণ অধিকার আছে তিনিই বুঝিতে পারিবেন।

এই প্রকারে আমরা দেখিতে পাইলাম যে, বৈশ্বজাতি বর্তমান সমাজে অপর অপর আর্য্য জাতিদিগের

\* “There is good reason for believing that the primitive Aryans were named herdsmen” The Origin of the Aryans by Isaac Taylor, p 43.

স্বায় উচ্চপদস্থ না হইলেও এক সময়ে ইহারা ই আর্য্য সমাজের প্রকৃত মেরুদণ্ড ছিলেন। তাহাতেই ইহাদের জাতীয়, নামে আর্য্যদিগের পুরাতত্ত্বের যেরূপ নিদর্শন এখনও বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অপর কোনও আর্য্য জাতির নামেই সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্তী।

## তুচ্ছ

### পিক ও কাক

পিক বলে—“থাকি আমি বসন্তের দেশে”  
কাক কয়, “মহাশয়! আমি বার মেসে।”

### শূত্র ও এক

শূত্র কহে, “এক তোর কোন গুণ নাই,  
ডাহিনে থাকিয়া তোরে আমি যে বাড়াই!”  
এক বলে, “ধন্য তুমি—জীতে রহো বাপা!  
আমা বিনা বঁধু তুঁহ, শুধু শূত্র—কাঁপা।”

### অমুরাগ

দিবসে সরোজ হাসে সরসীর বুকে,  
নিশি দিবা পদ্মবিভা ষোড়শীর মুখে—  
মৃগাল আসন তাই নাহি মনে লাগে,  
রক্ত গণ্ডে ফোটে পদ্ম সত্তা: অমুরাগে।

### স্মৃতি

আমি যে দেখেছি তারে রাখালের সাজে  
নিত্য সে বিনোদ রূপ জাগে চিত্ত মাঝে!  
মধুরার রাজা—সে গো গোকুলের শ্রাম  
তমালের তাজা পাতে লিখা তার নাম।  
ব্রজ ছেড়ে গেছে বটে চড়ে’ দিব্য রথে,  
আজো সে চাকার দাগ আজো আছে পথে।

শ্রীকুলচন্দ্র দে।

## স্বপ্ন বাসবদত্তা

মহাকবি ভাস্কর স্বপ্নবাসবদত্তার বঙ্গানুবাদ

### পাত্র-পাত্রীগণ

পুরুষগণ।

উদয়ন, বৎসরাজ

যোগেশ্বরায়ণ, রাজমন্ত্রী

বসন্তক ( বিদূষক ), রাজার নন্দসচিব

ব্রহ্মচারী, লাভাৎক গ্রামাগত জনৈক অশ্বেবাসী

কাঞ্চুকীয়, রাজ-ভৃত্য

সংভবক

ভট

} পদ্মাবতীর দাস-দয়

স্ত্রীগণ।

বাসবদত্তা, উদয়নের প্রথমা মহিষী ও উজ্জয়িনী-রাজ  
প্রমোত্তের কন্যা

আবস্তিকাবেশিনী (অবস্তী-দেশীয়া রমণীর বেশধারিণী),  
ছদ্মবেশিনী বাসবদত্তা

পদ্মাবতী, যগধরাজ দর্শকের ভগিনী

তাপসী। মধুকরিকা ও পদ্মিনিকা, পদ্মাবতীর সখী ও  
পরিচারিকা

ধাত্রীদয়, পদ্মাবতীর উপমাতা ও বাসবদত্তার উপমাতা  
বিজয়া, বৎসরাজ-গৃহে প্রতিহারী

### স্থাপনা

স্বপ্নধারের প্রবেশ।

স্বপ্নধার। যাঁর বাহুহুটি দেখতে প্রতিপদের নূতন  
চক্ষের মত সুন্দর গৌরবর্ণ, সুরাপান করে যাঁর বাহুতে  
অধিকতর বলের সঞ্চার হয়, লক্ষ্মী দেবীর আবির্ভাবে যাঁর  
বাহুহুটি সমৃদ্ধি সম্পন্ন, এবং যাঁর বাহু বসন্তের কমণীয়তার  
চির নবীন সেই বলদেব তোমার রক্ষা বিধান করুন।

আচ্ছা, উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে এরূপই বলা  
যাক। একি! আমি এদিকে বলব মনে কছি, ওদিকে  
কি একটা শব্দের মত শুন্চি না? রসো, দেখছি।

( নেপথ্যে ) মশায়রা সরে যান, সরে যান।

হ। হাঁ, বুঝতে পেরেছি। যে সব পরিচারক  
মহারাজকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে তারা রাজকুমারীর সঙ্গে  
তপোবনে যাচ্ছে, আর তপোবনের পথ থেকে লোক  
জন সব সরে যেতে বলছে।

### প্রথম অঙ্ক

ছলন ভটের প্রবেশ।

ভটগণ। মশায়রা, সরুন সরুন।

পরিব্রাজকবেশী যোগেশ্বরায়ণ ও আবস্তিকাবেশিনী বাসবদত্তার  
প্রবেশ।

যৌ। ( কান পাতিয়া ) কি! এখান থেকেও লোক  
জন তাড়িয়ে দিচ্ছে। যারা বনের ফল খেয়েই সন্তুষ্ট-  
চিন্ত, এবং আশ্রমে থেকেই সুখী, যারা গাছের বাকল  
পরেই পরিতুষ্ট, যারা ধীরমতি ও সকলে যাদের পূজা করে  
কে তাদিগকে জ্ঞাসিত কচ্ছে। সৌভাগ্যে গর্ষিত হয়ে,  
বিনয় বিসর্জন দিয়ে কোন পামর, কার আজ্ঞায় এই  
শাস্ত তপোবনটিকেও লোকালয় করে তুলছে? এ  
উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ কি?

বা। আর্ঘ্য। কারা তাড়িয়ে দিচ্ছে?

যৌ। যারা এমন করে লোক হাঁকিয়ে দিচ্ছে তারা  
মরাধম।

বা। আৰ্য্য, আমি একথা বলছি না। আমি বলছি আমাকেও তাড়িয়ে দিবে না কি ?

যৌ। ভদ্রে, যে সকল দুর্দৈব ভবিষ্যতে ঘটবে বলে আমরা ভয় করি, সে গুলিও এমন ভাবেই তাড়িত হয়ে থাকে।

বা। আৰ্য্য, পথ হেঁটে আমি কাতর হই নাই ; কিন্তু এই অপমানটা আমার বড় লাগছে।

যৌ। ভদ্রে, এরকম যে একটা কিছু হবে তা ত আপনি পূর্বেই মনে ভেবে রেখেছেন, এখন আর এ বিষয়ে চিন্তা করা বৃথা।

এখানে আসাটা ত পূর্বেই আপনি স্বীকার করেছেন। মহারাঞ্জ বিজয়-লক্ষী ফিরে গেলে আবার আপনিও গৌরব ফিরে পাবেন। কালের সঙ্গে সঙ্গে, জগতের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, চক্র-নোমর খায় মাছুষের ভাগ্যেরও পরিবর্তন হয়ে থাকে—তা ত আপনি জানেন।

ভট্টদয়। সরুন, সরুন, মশায়রা, সরে যান।

কাঞ্চকীরের প্রবেশ।

কাঞ্চ। সম্ভবক, লোক সব তাড়িয়ে দিও না।

দেখ, যারা আশ্রমে থাকে তাদের কটু বলা উচিত নয়। এতে রাজার কলঙ্ক হয়। এ সব মনসী মুনি লোক-গঞ্জনা এড়াবার জন্যই বনে এসে বাস কচ্ছেন।

ভট্টদয়। আৰ্য্যের নিষেধ শিরোধার্য্য।

[ প্রস্থান।

যৌ। এ লোকটার আগমন শুভযুচক বলে বোধ হচ্ছে। আৰ্য্যে, আসুন আমরা এর কাছে যাই।

বা। আচ্ছা, চলুন।

যৌ। ( অগ্রসর হইয়া ) ওগো মশায়, বলি এরা সব লোক তাড়িয়ে দিচ্ছে কেন ?

কা। তপস্বী—

যৌ। ( আশ্চর্যত ) তপস্বী সম্বোধনটা সম্মানযুচক বলে কিন্তু অনভ্যস্ত বলে আমার ভাল লাগছে না।

কা। তপস্বী, শুনুন। এই যে দেখছেন, ইনি

আমাদের মহারাঞ্জ দর্শকের ভগিনী, নাম পদ্মাবতী। মহারাঞ্জের মার সঙ্গে আশ্রমে দেখা কতে এসেছিলেন। এখন তাঁরই আদেশ মত রাজগৃহে ফিরে যাবেন। কিন্তু আজ তিনি এই আশ্রমে থাকবেন মনে কচ্ছেন। আপনারা তীর্থসলিল, সমিধ, কুশুম ও দর্ভাদি ইচ্ছা-মুসারে বন থেকে সংগ্রহ করে আনুন। ধর্ম্য রাজ-কুমারীর প্রাণ সদৃশ, তপস্বিদের ধর্ম্মাচরণের যাতে বিন্দু-মাত্রও ব্যাঘাত না হয় তাই তাঁর একান্ত ইচ্ছা। শুধু তাই নয়, এটা এদের কুলব্রত।

যৌ। ( স্বগত ) বটে, ইনিই মগধরাজকুমারী পদ্মাবতী ! ইনিই আমাদের মহারাঞ্জের মহিষী হবেন বলে পুষ্পকভদ্রাদি সিদ্ধাদেশ করেছিলেন ! হাঁ, তাই হবে, কারণ লোকের উপর হিংসার ভাণ বা মেহের ভাবটা সঙ্কল্পামুসারেই হয়ে থাকে। ইনি আমাদের রাণী হবেন শুনে তাঁকে আমার একান্তই আপনার বলে মনে হচ্ছে।

বা। ( স্বগত ) রাজমহিষী হবেন শুনে তাঁকে আমারও ভগিনীর মত ভালবাসতে ইচ্ছে হচ্ছে।

পরিজন ও পরিচারিকা সহ পদ্মাবতীর প্রবেশ।

চোটা। রাজকুমারী, এদিকে আনুন, এই আশ্রম।

গট পরিবর্তন—তাপসী উপবিষ্টা।

তা। রাজকুমারীর শুভাগমনে আমাদের আশ্রম ধন্য হ'ল।

বা। ( স্বগত ) ইনিই রাজকুমারী। যেমন কুল, তেমনই রূপ।

পদ্মা। আৰ্য্যে, অধিনীর প্রণাম গ্রহণ করুন।

তা। বৎসে, চিরজীবী হও। তপোবন অতিথি জনের আপন বাড়ীর মত মনে ক'রো।

পদ্মা। আৰ্য্যে, ঠিক বলেছেন। আপনার মেহ-সৌজন্তে একান্ত অল্পগৃহীত হ'লেম।

বা। ( স্বগত ) এঁর কেবল যে রূপই মধুর তা নয়, কথাগুলিও বড় মধুর।

তা। (বাসবদত্তার প্রতি) ভদ্রে, ইনি রাজার ভগিনী, এখনও বিয়ে হয় নি।

চৌ। উজ্জয়িনীর রাজার ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধের প্রস্তাব করে মহারাজ প্রদ্যোত দূত পাঠিয়েছেন।

বা। (স্বগত) বাঃ! তা হ'লে ইনি ত এখন আমার আত্মীয় হলেন।

তা। আহা, কেমন সুন্দর রূপ! আবার দুই রাজার বংশও খুব ভাল।

পদ্মা। (কাঞ্চুকীর প্রতি) আর্ষা, এখানে কেউ কিছু চান এমন কি কোন তপস্বী আছেন? একটু খুঁজে দেখুন না?

কা। আচ্ছা, রাজকুমারীর যেমন ইচ্ছা। হে, আশ্রমবাসী তপস্বীগণ আপনারা শুনুন—আপনাদের ধর্মকার্য্য দেখে ধর্মের প্রতি যগধরাজকুমারীর একান্ততা আরো বেড়ে উঠেছে, তিনি ধর্ম লাভের জন্ম আপনাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে ইচ্ছুক হয়েছেন। আপনাদের কার কি চাই একটু অহুগ্রহ করে বললে রাজকুমারী একান্ত বাধিত হ'বেন। ধর্ম রাজকুমারীর প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। যদি কারও কিছু বাসনা থাকে বলুন, তা পূর্ণ করে তিনি ধন্য হবেন। যদি কারও কলসের প্রয়োজন থাকে, যিনি যেমন কাপড় পরেন তেমন কাপড়ের যদি কারও প্রয়োজন থাকে, যার দীক্ষা হয়েছে এমন কারও যদি গুরু দক্ষিণার অভাব থেকে থাকে দয়া করে বলুন। অহুগ্রহ করে একবার বলুন, আজ কার কি জিনিষের দরকার।

যৌ। বাঃ! বেশ একটা উপায় হয়েছে দেখছি। ওগো, আমি একজন প্রার্থী আছি।

পদ্মা। আমার তপোবনে আসাটা আজ ভাগ্যে সার্থক হ'ল!

তা। এ আশ্রমে ত কারও কোন অভাব নেই, এ ব্যক্তি নিশ্চয় কোন আগন্তুক।

কা। মশায়, আমার কি চাই বলুন।

যৌ। এই যে দেখছেন ইনি আমার ভগিনী। এর স্বামী বিদেশে। আমার প্রার্থনা রাজকুমারী কিছুকাল একে তাঁর কাছে রাখেন। অর্থে আমার প্রয়োজন নাই, ভোগ বিলাসে আমার আকাঙ্ক্ষা নাই, আমি কাপড় চাই না, খৌন-ধারণের জন্ম আমি গুরুদ্বা ধরেছি। কিন্তু দেখলুম এই রাজকুমারী বড় ধীর-প্রকৃতি, ধর্মপ্রচারে তাঁর একান্ত যত্ন, তাই আমার বিশ্বাস ইনিই আমার ভগিনীর চরিত্র রক্ষা কতে পারবেন।

বা। (স্বগত) হায়! আর্ষা যোগকুরায়ণ আমাকে এখানেই রেখে যেতে চাচ্ছেন। তবে আমার ভরসা আছে তিনি বিশেষ না ভেবে কোন কাজই করবেন না।

কা। এই ভার গ্রহণ করা বড় দিগম্ব. কেমন করে এই ভ্রাস স্বীকার করব! অর্থ দানকরাটা সুখকর, প্রাণধারণকরা সুখকর, তপস্বী করাটাও সুখকর, এবং আর আর সব কাজ করাই সুখকর কিন্তু ভ্রাস রক্ষা করা বড় কষ্টকর।

পদ্মা। আর্ষা, প্রথমে কার কি চাই এইরূপ ঘোষণা করে দিয়ে এখন ত আর বিচার করা চলে না। ইনি যা বলছেন তাই করুন।

কা। রাজকুমারী, এ আপনার যোগ্যরূপ কথাই বটে।

চৌ। সত্য এত ভালবাসেন রাজকুমারী? আপনি চিরজীবী হ'য়ে বেঁচে থাকুন।

তা। ভদ্রে, চিরজীবী হও।

কা। আচ্ছা আপনি যা বলছেন তাই হবে। মশায়, রাজকুমারী আপনার ভগিনীর রক্ষার ভার নিলেন।

যৌ। রাজকুমারীর বড় অহুগ্রহ, আমি একান্ত কৃতার্থ হলাম। বৎসে, রাজকুমারীর নিকট যাও।

বা। (স্বগত) হায়রে অদৃষ্ট! না গিয়ে আর উপায় কি?

পদ্মা। আনুন, আনুন, এখন তো আপনি আত্মীয় হলেন।

তা। আহা, কেমন সুন্দর রূপ! এও রাজকুমারী হবে।

চৌ। হাঁ, আপনি যা বলছেন ঠিক; এ নিশ্চয়ই সুখে লালিত হয়েছে।

যৌ। উঃ! অর্ধেক ভারের লাঘব হল। মন্ত্রীদেব সঙ্গে যে রকম পরামর্শ হয়েছিল ঠিক তাই হ'ল। আমাদের মহারাজ যখন আবার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হবেন, আর যখন মগধের রাজকুমারীর সঙ্গে মহারাজের বিয়ে হবে, তখন মহিষা পদ্মাবতীই আমার সাক্ষী হবেন। তিনিই বলবেন যোগন্ধরায়ণ বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী!

যে সকল সিদ্ধাদেশিক মহারাজের ভবিষ্যৎ বিপত্তি জ্ঞান চক্ষে দেখেছিলেন তাঁরাই বলেছেন পদ্মাবতী বৎসরাজের মহিষী হবেন। তাঁদের সিদ্ধ বাক্যের উপর বিশ্বাস করেই আমি এ কাজ করুম। দৈব সিদ্ধবাক্য কখনও অতিক্রম কতে পারে না, এটা একটা পরীক্ষিত সত্য।

জনৈক ব্রহ্মচারীর প্রবেশ।

ব্র। ( উর্দ্ধদিকে দেখিয়া ) তাইতো, দুপুর হয়েছে, বড় ক্লান্ত হয়েছি। এখানেই একটু বিশ্রাম করি। ( পরিক্রমণ করিয়া ) এ যেন তপোবন হবে ব'লেই বোধ হচ্ছে।

হাঁ, এ নিশ্চয়ই তপোবন। এখানে কেউ কাকে হিংসা করবে না এই বিশ্বাসে হরিণগুলি স্বচ্ছন্দে বেড়ায় বেড়াচ্ছে, একটুও চকিত হচ্ছে না। বৃক্ষগুলি ফল-ফুলে ভরে আছে, কেউ নষ্ট করছে না। চারদিকেই যথেষ্ট অচাষা যায়গা পড়ে আছে। কপিল ও গোপন সকল দলে দলে চরে বেড়াচ্ছে। আর তপোবনের বহুস্থান থেকে ধূম উঠে আকাশ ছেয়ে ফেলছে।

আজ্ঞা, দেখা যাক, ঢুকেই পড়ি। ( প্রবেশ করিয়া ) একি! ( কাণ্ডাকায়িক দেখিয়া ) এরূপ লোক ত আগ্রমে থাকে না। ( অগ্র দিকে দেখিয়া ) আবার তাপসীও এখানে রয়েছেন। তাহ'লে আর যেতে দোষ নেই।

সর্বনাশ! একি! আবার জীলোকও যে রয়েছেন দেখছি। কাণ্ড। মশায়, অসঙ্কোচে ঢুকে পড়ুন। এ আগ্রম, এখানে সকলেরই সমান অধিকার।

বা। সর্বনাশ!

পদ্মা। ও—উন পরপুরুষ দেখেন না। দেখতে হবে তাঁর এ ব্রত যাতে রক্ষা হয়।

কাণ্ড। আমরা আগে এসেছি, আপনাকে আমাদের আতিথ্য গ্রহণ কতে হবে।

ব্রহ্ম। ( মুগ্ধ ধূইয়া ) বাপরে! এতক্ষণে ক্লান্তি দূর হল।

যৌ। মশায়, আপনি কোথা থেকে এলেন। কোথা বাবেন, আপনার থাকারি বা হয় কোথায়?

ব্রহ্ম। বলছি শুনুন, আমি রাজগৃহ থেকে এলুম, বৎসরাজ্যে লাবাণক নামে একটা গ্রাম আছে, আমি সেখানে শাস্ত্রাধ্যয়ন করি।

বা। কি! লাবাণকের নাম বলছে না! এই নাম শুনে আমার কষ্ট যে নূতন হয়ে উঠছে।

যৌ। তবে কি আপনার অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়েছে?

ব্রহ্ম। না, এখনো হয় নি।

যৌ। তবে লাবাণক ছেড়ে এখন এখানে এলেন যে?

ব্রহ্ম। সেখানে একটা দারুণ দুর্ঘটনা ঘটেছে।

যৌ। কি রকম দুর্ঘটনা!

ব্রহ্ম। সেখানে রাজা উদয়ন বাস করেন।

যৌ। হাঁ, রাজা উদয়নের নাম শুনেছি বটে। কি হয়েছে তাঁর?

ব্রহ্ম। অবস্তীর রাজকুমারী বাসবদত্তা তাঁরই প্রিয়তমা মহিষী।

যৌ। হাঁ, তাঁরপর।

ব্রহ্ম। মহিষীকে লাবাণকে রেখে রাজা হরিণ শিকারে গিয়েছিলেন, একদিন ইঠাৎ আশুন পেগে সমস্ত গ্রাম পুড়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে মহিষীও পুড়ে মরলেন।

বা। (স্বগত) মিছে কথা, হতভাগিনী এখনও বেঁচে আছে।

যৌ। তারপর।

ব্রহ্ম। রাণীকে বাঁচাতে গিয়ে মন্ত্রী যোগন্ধরায়ণও আগুনে কাঁপিয়ে পড়লেন।

যৌ। মন্ত্রীও কাঁপিয়ে পড়লেন! তারপর!

ব্রহ্ম। তারপর রাজা ফিরে এসে, সব কথা শুনে, উভয়ের বিয়োগ-দুঃখে একান্ত কাতর হয়ে নিজেও আগুনে পুড়ে মরতে গেলেন! কিন্তু মন্ত্রী বিশেষ চেষ্টা করে তাঁকে নিবারণ করেন।

বা। (স্বগত) আমি জানি আমার প্রতি আর্ধ্য-পুত্রের স্নেহ অসীম।

যৌ। তারপর।

ব্রহ্ম। তারপর রাণীর শরীরের যে সকল অলঙ্কার পুড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সেগুলি আলিঙ্গন করে রাজা মূর্ছিত হলেন!

সকলে। মূর্ছিত হলেন! কি সর্বনাশ!

বা। (স্বগত) আর্ধ্য যোগন্ধরায়ণের অভীষ্ট সিদ্ধ হ'ক।

চেটী। রাজকুমারী, ঈনি কাঁদছেন।

পদ্মা। এঁর মনটি বড়ই কোমল।

যৌ। হাঁ, আমার ভগিনীর হৃদয়ের স্নেহ-কোমলতা স্বভাবতই বড় বেশী। তারপর।

ব্রহ্ম। তারপর ধীরে ধীরে রাজার আবার জ্ঞান হ'ল।

পদ্মা। ভাগ্যে আবার জ্ঞান হল। মূর্ছিত হ'লেন এ কথা শুনে আমার হৃদয়ও যেন শূন্য হয়ে গিয়েছিল।

যৌ। তারপর।

ব্রহ্ম। তারপর রাজা ধূলায় পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন, সর্বাস্থ ধূলায় ধূসর হয়ে গেল। কিছুকাল পরে হঠাৎ উঠে, “হা বাসবদত্তা! হা অবতী-রাজকুমারী! হা প্রিয় শিষ্যে!” এরূপ কত কি বলে করুণ ভাবে বিলাপ কতে লাগলেন। আর বেশী বলব কি এখন আমার মনে হয়—

চক্রবাকীর বিরহে চক্রবাকও মহারাজের মত এত কাতর হয় না, আর পৃথিবীতে অত্ৰ এমন কোনও প্রাণী নাই যে প্রিয়ার বিরহে মহারাজ উদয়নের মত এত অস্থির হ'য়ে পড়ে। যে পত্নীকে স্বামী এত ভালবাসেন সে-ই জীকূলে ধন্ত, সে পুড়ে ম'রেও স্বামীর স্নেহে অমর হ'য়ে থাকে।

যৌ। আচ্ছা, রাজাকে আবার প্রকৃতিস্থ করবার জন্য মন্ত্রী কোনও চেষ্টা করেন নি?

ব্রহ্ম। হাঁ, রাজার রুমথান নামে এক মন্ত্রী আছেন, রাজাকে প্রকৃতিস্থ কতে তিনি বিশেষ যত্ন করেছেন।

কি আর বলব, মন্ত্রীও শোকাভিভূত হ'য়ে রাজার ত্রায় অন্ন মুখে তুলছেন না, সর্বদা চক্ষের জলে তাঁর বক্ষ ভেসে যাচ্ছে, কেঁদে কেঁদে তাঁর মুখমণ্ডল ক্ষীণ হয়ে গেছে, রাজার ত্রায় তিনিও অঙ্গ-সংস্কার, বেশ-বিজ্ঞাসাদি ছেড়ে দিয়েছেন। আর দিন নেই—রাত নেই—কেবল রাজার স্মৃতিশ্রাব্য কচ্ছেন। ঈশ্বর না করুন যদি রাজা ম'রে যান, তবে মন্ত্রীও নিশ্চয় ম'রে যাবেন।

বা। (স্বগত) আর্ধ্যপুত্র ভাগ্যে ভাল লোকের হাতে পড়েছেন। এটাও আমার একটা পরম সৌভাগ্য।

যৌ। (স্বগত) হায়! মন্ত্রী রুমথানের, পর কি গুরুতর

দায়িত্ব ! এখন আমার দায়িত্বের অনেকটা লাঘব হয়েছে । কিন্তু ক্রমধানের উপর যে ভার পড়েছে তা বড় বিষম ! রাজার ভার ভার উপর, রাজ্যের সকলের ভারও তারই উপর । (প্রকাশে) ব্রজচারী ঠাকুর, এখন ত রাজা প্রকৃতিস্থ হয়েছেন ?

ব্রজ । তা আমি জানি না । “হায় ! এখানেই তার সঙ্গে হেসেছি, তার সঙ্গে কথা বলেছি, তার সঙ্গে বসেছি, এখানেই আবার তার সঙ্গে রাগ করেছি”—এসব কথা বলে রাজা মর্মভেদী বিলাপ করছিলেন, মন্ত্রা অতি কষ্টে এই অবস্থায়ই তাঁকে নিয়ে লাবাণক থেকে বেড়িয়ে গেলেন । রাজা চ’লে গেলে পর নন্দ্র-চন্দ্র না থাকলে আকাশের যেমন দশা হয় সে গ্রামেরও সেইরূপ দশা হ’ল । তখন সেখানে আর কে থাকে ! আমিও বেড়িয়ে পড়লুম । তারপর কি হ’ল বলতে পারি না ।

তাপসী । আগন্তুকও এমনি ভাবে যে রাজার গুণ গান করে সে রাজা বাস্তবিকই গুণবান ।

চেটা । দিদিমণি, রাজা কি আবার বিয়ে করবেন ?

পদ্মা । ঠিক আমার মনের কথাটিই বলেছ ।

ব্রজ । তবে এখন আসি ।

উভয়ে । আসুন, ভগবান আপনার অতীষ্ট সিদ্ধ করুন ।

ব্রজ । আশীর্বাদ করুন ভগবান যেন তাই করেন ।

যো । রাজকুমারীর আদেশ হ’লে আমিও যেতে পারি ।

কাঞ্চ । রাজকুমারী, আপনার আদেশ হ’লে ইনিও যেতে পারেন ।

পদ্মা । আর্ধ্য, বলে দিন তাঁর ভগিনীর জন্ত আর যেন তিনি উৎকণ্ঠিত না হন ।

যো । আমার ভগিনী সাধুজনের হস্তে ন্যস্ত হয়েছে, আর উৎকণ্ঠিত হব কেন ? এখন তবে আসি ।

কাঞ্চ । আচ্ছা আসুন, আবার যেন দেখা পাই ।

যো । হাঁ, নিশ্চয়ই পাবেন ।

কাঞ্চ । ভিতরে যাওয়ার সময় হয়েছে ।

পদ্মা । আর্ধ্য, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন ।

তাপসী । বৎসে, অমুরূপ বর লাভ কর ।

বা । আর্ধ্য, আমিও আসি ।

তাপসী । স্বামীর সঙ্গে তোমার শীঘ্রই মিলন হ’ক ।

বা । আপনার আশীর্বাদে একান্ত অনুগৃহীত হলেম ।

কাঞ্চ । রাজকুমারী, এদিকে আসুন—

পাখীগুলি আপন আপন বাসায় ফিরে যাচ্ছে, মুনীরা দিনের শেষে অবগাহন কচ্ছেন, অগ্নি-শিখা উজ্জ্বল হ’য়ে উঠেছে, সমস্ত আশ্রম যজ্ঞধূমে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, সূর্য্য দূরে সরে পড়েছেন । তাঁর কিরণজাল দ্বাস প্রাপ্ত হয়েছে । তিনি এখন রথ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি অন্তশিখরে প্রবেশ কচ্ছেন ।

## প্রবেশক

চৌর প্রবেশ ।

চৌর । কুঞ্জরিকা, রাজকুমারী পদ্মাবতী কোথায় ? কি বলছ, মাধবীলতাকুঞ্জের পাশে কন্দুক নিয়ে খেলছেন ? আচ্ছা, তবে তাঁর কাছেই যাই । এই যে রাজকুমারী ! মাথায় চুলের চূড়া, মুখে বিন্দু বিন্দু বাম—কন্দুক নিয়ে খেলতে খেলতে এদিক পানেই আসছেন—বাঃ, রাজকুমারীকে এখন বড়ই চমৎকার দেখাচ্ছে ! আচ্ছা, সামনেই যাওয়া বাচ্ ।

[ প্রস্থান ।



## দ্বিতীয় অঙ্ক

কন্সক নিয়ে খেলতে খেলতে বাসবদত্তা ও  
পরিচারিকা সহ পদ্মাবতীর প্রবেশ।

বা। সখি, লও এই তোমার কন্সক।

পদ্মাবতা। না, এখন আর খেলে কাজ নেই।

বা। সখি, কন্সক নিয়ে এতক্ষণ খেলেছ যে তোমার  
হাত দুখানি বড় লাল হ'য়ে গেছে। বোধ হচ্ছে এ আর  
কাকুর হাত।

চেচী। দিদিমণি, প্রাণ ভ'রে খেলে নিন্, খেলে নিন্।  
কুমারী বয়সই খেলার কাল, এই সুন্দর ও সুখের কাল  
আর বেশী দিন থাকছে না।

পদ্মা। ( বাসবদত্তার প্রতি ) আর্থো, আমাকে কি  
ঠাট্টা করবেন ভাবছেন ?

বা। না সখি, আজ তোমাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে—  
চারদিকেই যেন তোমার বরের মুখ দেখছি।

পদ্মা। আচ্ছা, যান্ আপ্নি এখান থেকে।  
আর ঠাট্টা ক'রে কাজ নেই।

বা। সখি, তুমি মহাসেন মহিষীর পুত্র-বধূ হবে বোধ  
হচ্ছে।

পদ্মা। মহাসেন কে ?

বা। উজ্জয়িনীতে প্রত্যোত নামে এক রাজা আছেন,  
তার এত সৈন্ত-বল যে তাঁর নাম হয়েছে মহাসেন।

চেচী। সেই রাজার সঙ্গে সম্বন্ধ হ'ক এটা ভর্ত্তি-  
দারিকার আদবে হচ্ছে নয়।

বা। তবে কার সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়া রাজকুমারীর  
ইচ্ছে ?

চেচী। উদয়ন নামে বৎসদেশে এক রাজা আছেন।  
দিদিমণি সেই রাজাকেই বিয়ে করবেন।

বা। ( স্বগত ) কি ! আর্থাপুত্রকেই বরণ কত্তে  
চাচ্ছে ! ( প্রকাশে ) কেন ?

চেচী। রাজকুমারীর তাঁর উপরই মন গিয়েছে।

বা। ( স্বগত ) আমিও তাঁরই স্নেহে উন্মাদিনী  
হয়েছি।

চেচী। দিদিমণি, যদি সেই রাজা দেখতে কুৎসিত  
হয় ?

বা। না, না, কুৎসিত হবে কেন ? সেই রাজা  
দেখতে বেশ ভাল।

পদ্মা। আর্থো, আপনি কি করে জানলেন ?

বা। ( স্বগত ) আর্থাপুত্রের প্রতি অমুরাগের দরুণ  
একটা বড় অন্ডায় করে ফেলেছি। কি বলব ? হাঁ, হয়েছে।  
( প্রকাশে ) সখি, উজ্জয়িনীর লোকেরা সকলেই এরূপ ব'লে  
থাকে।

পদ্মা। তা হবে। উজ্জয়িনীর সকলেই তাঁকে জানে  
কি না ! সকলের চক্ষে সুরূপ হওয়া সৌভাগ্যের কথা।

ধাত্রীর প্রবেশ।

ধা। রাজকুমারী, সুখী হ'ন। আপনার বিয়ের  
সম্বন্ধ হয়ে গেছে।

বা। কার সঙ্গে হ'ল ?

ধা। বৎসরাজ উদয়নের সঙ্গে।

বা। সে রাজা তা হ'লে কুশলে আছেন ?

ধা। হাঁ, তিনি নানাপদে রাজগৃহে এসেছেন এবং  
রাজকুমারীকে তিনিই বিয়ে করবেন বলেছেন।

বা। কি সর্বনাশ ! তিনি নিজেই বলেছেন !

ধা। এখানে এমন সর্বনাশের কথাটা কি হ'ল ?

বা। না তেমন সর্বনাশের কথা কিছু নয়, তবে  
মহিষী বাসবদত্তার শোকে তিনি পদ্মাবতাকে ত্যাগিল্য  
কত্তে পারেন ত ?

ধা। একি কখনও হ'তে পারে ! যারা মহাপুরুষ শাস্ত্র

পুণ্যহস্তে চেষ্টার প্রবেশ ।

আলোচনা করে শীঘ্রই তাঁদের মন প্রকৃতিস্থ হ'য়ে থাকে ।

বা। রাজা নিজেই কি রাজকুমারীকে বরণ করেছেন !

ধা। না, রাজা স্বয়ং রাজকুমারীকে বরণ করেন নি । তিনি কোন কাজে এখানে এসেছিলেন, আমাদের মহারাজ তাঁর বংশ, বিজ্ঞা, বয়স আর রূপ দেখে ভুলে গিয়ে রাজকুমারীকে তাঁর হাতেই দিতে চাইলেন ।

বা। ( স্বগত ) তাই বল । তা হ'লে এবিষয়ে আর্ধ্যপুত্রের কোন দোষ নেই ।

আর এক জন চেষ্টার প্রবেশ ।

চেটী। আর্ধ্যো, শীগ্গির আসুন ; আজই ভাল নক্ষত্র । রাণী মা বল্লেন আজই কৌতুক মঙ্গল কন্তে হবে ।

বা। যতই তাড়াতাড়ি হচ্ছে, ততই আমার হৃদয়ে অন্ধকার ঘনিষে আসছে ।

ধা। রাজকুমারী, তবে চল আমরাও যাই ।

[ সকলের প্রস্থান ।

### তৃতীয় অঙ্ক

চিন্তা করিতে করিতে বাসবদত্তার প্রবেশ ।

বা। চারদিকেই বিয়ের আমোদ—বিয়ের গোলমাল । অন্তঃপুরের আঙ্গিনায় পদ্মাবতীকে ফেলে আমি একলা এই প্রমদ বনে চলে এসেছি । দেখি এখানে মনের কষ্টের খানিকটা লাঘব হয় কি না । হায় ! এমন পোড়া অদৃষ্ট কার হয় ! আর্ধ্যপুত্রও পরের হ'ল । এখানে একটু বাস । চক্রবাকীই ধৃষ্ট, চক্রবাকের বিরহে সে বাঁচে না । কিন্তু তা ব'লে আমি আত্মহত্যা করব না । আর্ধ্যপুত্রকে দেখবার আশায়ই বেঁচে থাকব ।

চেটী। আবস্তিকা গেলেন কোথায় ? এই যে, চিন্তায় একেবারে শূন্যহৃদয় হ'য়ে প্রিয়ঙ্গু গাছের তলে শিলার উপরে ব'সে আছেন । দেখে বোধ হচ্ছে যেন পূর্ণিমার চাঁদটি মেঘে ঢেকে গেছে । আচ্ছা, একবার কাছেই যাই । আর্ধ্যো আবস্তিকে, আপনাকে আমি কতক্ষণ থেকে খুঁজছি ।

বা। কেন ?

চেটী। রাণী মা বল্লেন আপনার জন্ম উচ্চ বংশে, আপনার হৃদয়ও স্নেহে ভরা, তার উপর আবার আপনি নানা কাজে পটু—তাই আপনাকেই কৌতুক মঙ্গলের মালা গাঁথে দিতে হবে ।

বা। কার জন্ত ।

চেটী। রাজকুমারীর জন্য ।

বা। ( স্বগত ) হায় ! এও আমার কন্তে হ'ল ? হা ঈশ্বর ! তুমি এতই নিষ্ঠুর !

চেটী। আর্ধ্যো, এখন আর অল্প ভাবনা ভাববার অবকাশ নেই । বরং এই মণিভূমিতে চান কচ্ছেন ।

শীগ্গির গাঁথুন ।

ধা। ( স্বগত ) অল্প কিছু আর ভাবতে পাচ্ছি কৈ ? ( প্রকাণ্ডে ) ওগো, বর কেমন দেখলে ?

চেটী। হাঁ, রাজকুমারীকে ভালবাসি ব'লে, আর আমাদের মনে ভারি কৌতুহল হয়েছিল ব'লে বর খুব ভাল করেই দেখেছি ।

বা। বলি, কেমন দেখলে ?

চেটী। কি আর বলব, এমনটি আর আগে কখনও দেখি নি ।

বা। তবে দেখতে ভালই ?

চেটী। মনে হয়. যেন ধলু-শর ছাড়া মদন ঠাকুর

নিজে।

বা। আচ্ছা থাক, আর শুনে কাজ নেই।

চেটী। কাজ নেই কেন ?

বা। পরপুরুষের রূপের কথা শুনে নেই।

চেটী। তা হ'লে লীগ'গির মালাটা গাঁথুন।

বা। নিয়ে এস। (স্বগত) হায় আমি কি

হতভাগিনী ! এই মালা গাঁথাও আমার কপালে ছিল।

ওগো, এই ওষুধের নামটা কি ?

চেটী। এটার নাম অবিশ্বাকরণ।

বা। (স্বগত) হাঁ, তা হ'লে এ অনেক বার গাঁথতে

হবে। এতে আমারও ভাল, পদ্মাবতীরও ভাল।

(প্রকাশে) এই ওষুধটার কি নাম ?

চেটী। এটার নাম সপত্নী-মর্দন।

বা। এ গাঁথতে নেই।

চেটী। কেন ?

বা। রাজার আগের রাণী ত ম'রে গেছে, এটা

গাঁথবার আর দরকার কি ?

অপর একজন চেটীর প্রবেশ।

চেটী। আর্যো, লীগ'গির করুন। বর এতক্ষণ

সধবাদের সঙ্গে অন্তঃপুরের আঙ্গিনায় ঢুকছেন।

বা। এই যে হয়েছে, নাও না !

চেটী। আমাকে আবার কাপড় আনতে হবে।

আমি চলুম।

[ উভয়ের প্রস্থান।

বা। এই যে চাকরাণীরা সব চ'লে গেল। হায়, কি

সর্বনাশ ! আর্যাপুত্রও পরের হ'ল ! (দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া)

যাই, গিয়ে বিছানায় পড়ে থাকি—দেখি যদি একটু

ঘুম আসে. তাহ'লেও হুঃখের খানিকটা লাভ হ'তে

পারে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগুরুবল্লভ ভট্টাচার্য্য।

## মহানির্ব্বাণ তন্ত্র \*

ভারতবর্ষীয় আইন বাবসারাদিগের নিকট আত্মপরিচিত এক বিচক্ষণ ও উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজ-কর্মচারী আর্থার এভলন এই ছদ্ম নাম গ্রহণ করিয়া মহানির্ব্বাণতন্ত্রের এক অদ্ভুত ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন। ইতিপূর্বে এই তন্ত্রের আরও সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ববর্তী কোন সংস্করণই বর্তমান সংস্করণের সহিত তুলনার যোগ্য নহে। ইহা এক লক্ষপ্রতিষ্ঠ ইউরোপীয় প্রকাশক কোম্পানী দ্বারা ইউরোপেই মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে, সুতরাং ইহার ছাপা, কাগজ প্রভৃতি যে উৎকৃষ্ট তাহা বলাই বাহুল্য। মূল্যও তদনুরূপ অধিক। সচরাচর আইন-পুস্তকের যেরূপ উচ্চ মূল্য ধার্য করা হইয়া থাকে এই গ্রন্থেরও সেইরূপ করা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় ইহাতে মূল তন্ত্রখানা প্রকাশিত হয় নাই। যদি দেবনাগরী অক্ষরে মূল গ্রন্থ এই সঙ্গে প্রকাশিত হইত তবে বর্তমান সংস্করণ সর্বাঙ্গসুন্দর হইত সন্দেহ নাই।

এই অনুবাদ উৎকৃষ্ট এবং যথাসম্ভব মূলগ্রন্থতঃ কেবল এইমাত্র বলিলে ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করা হয় না। এই গ্রন্থের একটু বিশেষত্ব আছে। অথ আমরা তাহাই বিবৃত করিতে চেষ্টা করি।

হিন্দুর শাস্ত্র-গ্রন্থ ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গের দ্বারা এই যে প্রথম অনূদিত ও প্রকাশিত হইল তাহা নহে। তন্ত্রশাস্ত্র না হউক, অত্রাণ হিন্দুশাস্ত্র ইতিপূর্বে অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতই প্রকাশিত করিয়াছেন।

সার উইলিয়াম জোন্স (Sir William Jones) কর্তৃক সংস্কৃত ভাষার 'আবিষ্কারের' পর হইতেই বেদ উপনিষদ প্রভৃতি হিন্দুর শাস্ত্র-গ্রন্থ ইউরোপীয় পণ্ডিত বর্গের বিশেষ

ভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্র তাৎদূশ সৌভাগ্যবশত ঘটিয়া উঠে নাই। তন্ত্রশাস্ত্র মিত্র ও সুই হের এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই ধারণাই যে এই ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গের উপর আধিপত্য করিয়া আসিতেছিল। আর্থার এভলন সাহেবই তন্ত্রশাস্ত্রকে সেই রূপে বাদ হইতে মুক্ত করিতে সর্ব প্রথম প্রয়াসী হইয়াছেন। সেই জন্য তিনি হিন্দু মাত্রেয়ই কৃতজ্ঞতাভাজন সন্দেহ নাই।

কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগকর্তৃক প্রচারিত হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থের সহিত এই গ্রন্থের আরও পার্থক্য আছে। আর্থার এভলন সাহেব কোন পূর্ব সন্ধিত সংস্কার লইয়া এই গ্রন্থ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। তিনি প্রকৃত সত্যানুসন্ধিস্বরূপে আর এই পান্ডেরী ধ্যান্য করিতে যত্ন করিয়াছেন। ইউরোপীয় সুধীবর্গের মনে কেবল গ্রন্থেই এই গুণের অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। ইউরোপ এবং ভারতের পার্থক্যের এই ইউরোপীয় এই ভারত একই গ্রন্থে অবস্থিত হইলেও প্রকৃত প্রাকৃতিক অবস্থার সহিত অপরের প্রাকৃতিক অবস্থার পার্থক্যই সামান্য সেইরূপ ইউরোপীয়ান ও ভীরু বর্ষীয় একই মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত হইলেও একের মানসিক প্রকৃতির সহিত অপরের মানসিক প্রকৃতির পার্থক্যও সেইরূপ অল্প। তাহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, জীবনধারণ, শিক্ষা, চিন্তা ও সংস্কার হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সুতরাং ইউরোপীয়েরা আমাদের শাস্ত্র, ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য যখনই আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন তখনই অলক্ষিত ভাবে তাহারা তাহাদিগের নিজেদের সংস্কার ও ধারণা আমাদের শাস্ত্র গ্রন্থাদির উপর অপ্রোক্ষ করিয়া বসেন এবং যে মাপকাঠি দ্বারা তাহারা নিজেদের অনুষ্ঠান ধর্ম ও সমাজের বিচার করিয়া থাকেন সেই মাপকাঠি দ্বারা আমাদের শাস্ত্র গ্রন্থাদির বিচার করিয়া ইউরোপীয় সুধীবর্গকে নিন্দা করিবার অস্ত্র প্রস্তুত করেন।

\* Luzac & Co. 46, Great Russell Street, London, W. C. মূল্য ৮/- আট টাকা।

আষাঢ় ১৩২১

তেছি তাহা নহে। আমাদের শাস্ত্র, ধর্ম, বা সভ্যতা জানিবার ও বুঝিবার জন্য তাঁহাদিগের যে আগ্রহ তাহা সর্ব্বথা প্রশংসনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উদ্দেশ্য সাধু হইলেও চেষ্টার ফল সর্ব্বদা নির্দোষ হয় না। যাহুব নিজের আজন্ম সংস্কার বা ধারণা সহজে পরিত্যাগ করিতে পারে না। সুতরাং নিজের সংস্কার বা ধারণার সহিত সামঞ্জস্য রহিত কোন বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে স্বীয় পূর্ব্ব-সঞ্চিত সংস্কারের বশীভূত হইয়া তাহা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করাও স্বাভাবিক। অতি কঠোর শিক্ষা ব্যতীত এই দোষের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায় না।

তা ছাড়া, ইহার মধ্যে আরও একটু স্থগ্ন কথা আছে। মনস্তত্ত্ববিদ ব্যক্তির জ্ঞানেন যে, সামঞ্জস্য-জ্ঞানই প্রথম হয়, পার্থক্য-জ্ঞান পরে হইয়া থাকে। একই শ্রেণীর পরস্পর বিভিন্ন দুই পদার্থ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে আমরা প্রথমে তাহাদের সামঞ্জস্যই দৃঢ়তর করিয়া থাকি। বিচারশক্তির উন্মেষ না হইলে তাহাদের পার্থক্য অনুভব করিতে পারি না। শিশু সকল রমণীকেই মাতৃ সম্বোধন করিয়া থাকে। পরে বয়োবৃদ্ধি হইলে, বালক বুঝিতে পারে যে, নিজের মাতার সহিত অপর রমণীর পার্থক্য কোথায়। সুতরাং কোন সম্পূর্ণ অপরিচিত বা অপরিজ্ঞাত সভ্যতা বা শাস্ত্রের আলোচনা করিতে হইলে আমাদের বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিতে হইবে যে, নিজের শাস্ত্র বা সভ্যতার সহিত উহার পার্থক্য কোথায়। সেই পার্থক্য সম্যকরূপে উপলব্ধি করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের সেই অপরিচিত শাস্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে পরিপূর্ণ ধারণা হইয়াছে এরূপ মনে করা অসম্ভব। তন্মত, নিজের সভ্যতার সহিত যাহা কিছু বিভিন্ন তাহাই নিন্দনীয় এই ধারণা লইয়া যদি কোন বিষয় আলোচনা করা যায় তবেও সেই বিষয়ের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। কোন অপরিচিত বা বৈদেশিক শাস্ত্র বা সভ্যতা আলোচনা করিতে হইলে

যাহারা সেই সেই শাস্ত্র বা সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছেন সমালোচককে তাঁহাদের আসনেই নিজকে বসাইতে হয়। তাঁহাদের চক্ষু দিয়াই তাঁহাদের শাস্ত্র দেখিবার আবশ্যকতা হয়। তবেই সেই সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা বা জ্ঞান জন্মিতে পারে, নচেৎ না। তারপর কোন শাস্ত্রের নিন্দা বা প্রশংসা করিতে হয়, কর। কিন্তু আগে বুঝিতে চেষ্টা কর, তারপর মতামত প্রকাশ করিও।

অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত ইউরোপীয় চক্ষুদ্বারাই ভারতীয় শাস্ত্র আলোচনা করেন, এবং নিজের পূর্ব্ব-সঞ্চিত সংস্কার ভারতীয় শাস্ত্রের প্রতি আরোপ করিয়া থাকেন। তাহারা ভালমন্দ বিচার করিতেই বিশেষ আগ্রহীল। আলোচ্য শাস্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য তাঁহাদের সেরূপ আগ্রহ দেখা যায় না, এবং ভারতীয় শাস্ত্র যে পরিমাণে ইউরোপীয় শাস্ত্রের বা মতামতের অনুরূপ সেই পরিমাণেই তাহা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করেন; এবং যে পরিমাণে পৃথক সেই পরিমাণে নিকৃষ্ট বলিয়া গণনা করেন।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা নিজের সংস্কার কিরূপে আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থে আরোপ করিয়া থাকেন তাহা বুঝাইবার জন্য সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী সমালোচক এবং দার্শনিক টেইন ম্যাক্সমুলারের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন।\*

\* Here close by us, is poor Mr. Maxmuller who, in order to acclimatise the study of Sanskrit was compelled to discover in the Vedas the worship of a moral God, that is to say, the religion of Paley and Addison. (Taine's History of English Literature. Vol. II, p. 479.)

তাৎপর্য—সংস্কৃতের আলোচনা ইউরোপে প্রবর্তিত করিবার উদ্দেশ্যে ম্যাক্সমুলার সাহেব বেদে এক বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ঈশ্বরের আবিষ্কার করিতে, অর্থাৎ, পেলি, বা এডিসনের ধর্ম্মের সহিত সামঞ্জস্য দেখাইতে বাধ্য হইয়াছেন।

এই দৃষ্টান্ত দ্বারা টেইন ম্যাক্সমুলার অপক্ষাও একটা জাতির সন্ধীর্ণতার প্রতিই অধিক দীক্ষিত করিয়াছেন। তাঁহার মনোগত ভাব এই যে, ইথেরজ পাঠক এরূপ সন্ধীর্ণ যে, তাঁহারা যদি বেদে তাঁহাদের দার্শনিক বা লেখকদিগের অনুমোদিত বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন ঈশ্বরের (moral God) আভাস না পান তবে তাঁহারা কিছুতেই সংস্কৃতালোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন না। ম্যাক্সমুলার এই জ্ঞানই বাধ্য হইয়া বেদে বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন ঈশ্বরের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন।

যাহা হউক, বেদে বাস্তবিক বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ঈশ্বরের (moral God) উল্লেখ আছে কি না, এবং উল্লেখ না থাকিলে ম্যাক্সমুলার সাহেব প্রকৃত পক্ষে বেদে তাহা আরোপিত করিয়াছেন কি না, সে কথার আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। সে সম্বন্ধে আমি এখানে কোন মতামত প্রকাশ করিব না। আমি কেবল এই কথাই বুঝাইতে চাই যে, ইউরোপীয়েরা এই রূপ নিজেদের সংস্কার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমাদের উপর আরোপ করিয়া থাকেন, এবং সেই কারণেই তাঁহাদের অতুল অধ্যবসায়, বিপুল পরিশ্রম অনেক সময় নিরর্থক হইয়া যায়।

আর্থার এভলন সাহেব এইরূপ নিজের সংস্কার তন্ত্রের প্রতি আরোপ করেন নাই। তিনি ভারতীয় চক্ষু দ্বারা ভারতীয় শাস্ত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। গ্রন্থের মুখবন্ধে (preface) তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে তন্ত্রগুলি অপেক্ষাকৃত সরল সংস্কৃতে রচিত। তথাপি সে গুলির অনুবাদ করিতে হইলে তন্ত্রের পারিভাষিক শব্দ ও সাধন-প্রণালীর সম্বন্ধে মোটামুটি কাজ চালাইবার উপযোগী জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে যাহারা জাতি, শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলে তন্ত্রের সহিত সুপরিচিত এবং যাহারা পূর্বপুরুষদিগের নিকট প্রাপ্ত শাস্ত্রের প্রতি এখনও প্রজ্ঞাবান তাহাদিগেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। গ্রন্থের সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, যে পর্য্যন্ত নিজেদের চক্ষু

অভ্যস্ত হইয়া না যায় সে পর্য্যন্ত তাঁহারা ভারতীয় চক্ষুদ্বারা ভারতীয় শাস্ত্র দেখিতে যত্নবান হইবেন। অতীতকালে এবং এমন কি বর্তমান কালেও হিন্দুশাস্ত্রের যে হান্তজনক ব্যাখ্যা হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে এই প্রণালীই অবলম্বন করা আবশ্যক।†

আর্থার এভলনের গ্রন্থ পাঠ করিবার পূর্বে আমি ঐ গ্রন্থের এক বিজ্ঞাপন দেখিয়াছিলাম। তাহাতে লিখিত ছিল যে, গ্রন্থকার অনুবাদের পুরোভাগে স্বরচিত এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও বিস্তৃত ভূমিকা সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন। উহা দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম যে ভূমিকায় বোধ হয় গ্রন্থকার সর্বপ্রথম মহানির্বাণ তন্ত্রের রচনা কাল নির্দেশ করিতে যত্ন করিয়াছেন। ভিতরের এবং বাহিরের প্রমাণের (internal and external evidence) অনুবলে ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদগণের প্রাণপ্রিয় স্ত্র, ‘হয়তঃ,’ ‘বোধ হয়’ প্রভৃতির সাহায্যে সম্ভবতঃ তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন মহানির্বাণতন্ত্র নিতান্ত আধুনিক, অর্থাৎ, হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, না হয়, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত। তারপর বোধ হয় তিনি বেদের কর্মকাণ্ডের সহিত মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের

†The Tantras generally are written in comparatively simple Sanskrit. For their rendering, however, a working knowledge of their terminology and ritual is required, which can only be fully found in those to whom it is familiar through race upbringing and environment, and in whom there is still some regard for the ancient inheritance. As for others, they must learn to see through the Indian eye of knowledge until their own has been trained to its lines of vision. In this way we shall be in the future spared some of the ridiculous presentments of Indian beliefs common in the past and even now too current. Preface p. xvi

সম্পূর্ণ এবং মহান নৌক ধর্ম হইতে তত্ত্বশাস্ত্রের উৎপত্তি বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া পাণ্ডিত্যের ফোয়ারা ছুটাইয়াছেন; সর্বশেষে বোধ হয় তিনি তত্ত্বশাস্ত্র যে নিত্য কুসংস্কারপ্রণয় ও বিভৎস তৎসম্বন্ধে এক লম্বা-চৌকি রক্তাক্ত কাড়িয়া 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করিয়াছেন। আমার এরূপ অনুমান করা যে নিত্য অনঙ্গত

হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে পারি না। কারণ সাধারণ (average) ইউরোপীয় সমালোচক এবং তাত্ত্বিক (philosophers) প্রকৃতবিশদেতা এইরূপই করিয়া থাকেন। বাহা ইউক তাত্ত্বিক (philosophers) বন্ধন আঁধার অভুলনের বই হস্তগত হইল দেখিলাম যে, আমার অনুমান সম্পূর্ণ ভুল। গ্রন্থকার পরপদক্ষুদ্র পথে একেবারেই বিচরণ করেন নাই। তিনি সময়ও নির্দেশ করেন নাই; যথার্থনের সহিত সম্বন্ধেরও বিচার করেন নাই। বেদের কক্ষকাণ্ড সম্বন্ধে একটু উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাও নিত্য অনঙ্গত অবস্থার ভাবে। তিনি গালা-গালিও দেন নাই। তৎপরিবর্তে সাবধানে শাস্ত্র বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভূমিকাতে তিনি তত্ত্বের পারিভাষিক শব্দ ও সাধন-প্রণালী ও ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সে ব্যাখ্যাও তিনি স্বকপোলকল্পিত মত প্রচার করিতে যত্ন করেন নাই। যেখানে তাত্ত্বিক-দিগের মধ্যেই মতভেদ আছে সেখানে তিনি অতি সূক্ষ্মে স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

রাজা রামমোহন রায়ের গুরু শ্রীমদ্ হরিহরানন্দ ভারতী মহানির্বাণতত্ত্বের যে এক অমূল্য টীকা লিখিয়াছেন গ্রন্থকার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা কার্যে প্রধানতঃ তাহাই অবলম্বন করিয়াছেন। 'বুদ্ধ' জগমোহন তর্কালঙ্কারের অতিরিক্ত টীকাও তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাচীনকালে হিন্দুর শাস্ত্র-গ্রন্থ লিখিত হইত না। অধ্যাপকও শিষ্যবর্গ উহা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন। শাস্ত্র লিখিত হইবার প্রথা প্রচলিত হইবার পরও শাস্ত্রের ব্যাখ্যারও অধিকাংশ

কণ্ঠগতই থাকিয়া যাইত। শিষ্যগণ গুরুপরম্পরায় তাহা প্রাপ্ত হইতেন। এতলন সাহেব লিখিয়াছেন যে, শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করিতে হইলে এই পরম্পরাগত শিক্ষার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে এবং নিজের চেষ্টায়ই তাহা লাভ করিতে হইবে। \* কোন লিখিত গ্রন্থ তাহার অভাব পূরণ করিতে পারে না।

শ্রীমদ্ আর্থার এভলন সাহেব শ্রীমদ্ হরিহরানন্দ স্বামী ও জগমোহন তর্কালঙ্কারের দ্বারা নিত্য আধুনিক পাণ্ডিত্যগণের মতামতও প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু যাহারা বেদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন—এবং আত্মকাল বেদের আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয় কে?—তাহারা সাযনাচার্যের ব্যাখ্যার ভ্রম দেখাইতে না পারিলে নিজেদের পাণ্ডিত্য (scholarship) নিরর্থক হইল বাংলা মনে করেন। ইহাতে শাস্ত্রের যে কদর্ভ প্রচারিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

পারশেষে বক্তব্য এই যে, মহানির্বাণ তত্ত্ব ভাল কি মন্দ তাহা আমি বিচার করিতে চাই না। উহা বর্তমান সময়ের উপযোগী কি না তাহাও আমি বলিব না। আমার বক্তব্য এই যে, যে প্রণালীতে তিনি ইহার আলোচনা করিয়াছেন তাহাই শ্রেষ্ঠ প্রণালী। শাস্ত্রের প্রকৃত মর্মোদ্ঘাটনের জন্ত উৎকৃষ্টতর প্রণালী আর নাই। ভাক্ত বৈজ্ঞানিকতার দোহাই দিয়া যাহারা শাস্ত্রের কদর্ভ করিতেছেন, স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যায় সৃষ্টি করিতেছেন তাহারা উপকারের পরিবর্তে অপকারই করিতেছেন।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ।

\* 'There are however some matters in the shastras or its accompanying oral tradition which he must, if disposed thereto, find out for himself. Preface p. xv.'

## জীবন-মৃত্যু

জীবনের মাঝে মৃত্যুর বাসা  
মৃত্যু জীবনে রাখে,  
মৃত্যুর মাঝে জীবনের আশা  
জীবন-মৃত্যুর মাঝে ।  
সীমার মাঝারে মরণের খেলা,  
অশায়ে নাহি ত ঠাই ;  
দৌহার মিলনে কোথায় সে যে  
ভাবিয়া না তারে পাঠ ।  
একেরে ছাড়ি' অপরের দেখা  
কভু ত হ'তে না পারে,  
হৃদয় হইতে প্রীতির কাড়ি'  
কোথায় রাখিবে তারে ?  
মৃত্যু বলিয়া সামান্য টানিলে  
ফুরায়ে যায় কি কাজ ?  
(তাই) মৃত্যুর মাঝে জীবনের আশা  
জীবন মৃত্যুর মাঝে !

শ্রীসত্যব্রত শর্মা ।

## দুই বন্ধু

( সেধ সাদী )

দুই বন্ধু দৈবযোগে নদী মাঝে পড়ে'  
নিরুপায় হ'য়ে ভেসে গেল কিছু দূরে ।  
নিকটে নাবিক যবে উদ্ধারতে এল,  
“হেথা যাও”—এক বন্ধু তরী ঠেলে দিল—  
“ওই মোর বন্ধু ডুবে, আগে লও তুলে,”  
বলিতে বলিতে নিজে ডুবে গেল জলে ।

শ্রীঅবনী মোহন চক্রবর্তী ।

## আয়ুর্বেদে—অস্ত্রচিকিৎসা

চাঁদসী প্রচলনমতে

## ত্রণ বিজ্ঞান

( পূর্ন প্রকাশিতের পর )

প্রাচীন হোগলপাতিদ্বারা ত্রণ-প্রাচীর উপরে ও নিম্ন দিকে কর্তৃত্ব হইলে, তক্ষনা অথবা কনিষ্ঠা অঙ্গুলি ত্রণ-গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে। অঙ্গুলি না গেলে সলাকা প্রবেশ করাষ্টয়া দেখিতে হইবে, কোন দিকে গহ্বরের পরিমাণ বেশী আছে, (এই সময়েও ত্রণ-প্রাচীরের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে) এবং যে দিকে গহ্বরের বেশী আছে সেই দিকে এমত ভাবে কাটিয়া দিতে হইবে যেন অস্ত্র-মুখ ঢালু হয়, তবেই ত্রণের মধ্যস্থ পুঞ্জ-রক্ত স্বাভাবিক নিয়মে বাহির হইয়া বাইতে পারিবে। ত্রণের উপরিভাগের যে যায়গা পাতলা হইয়া যায় বা টোব ধরিয়া উঠে, সেই স্থলই গহ্বরের ঢালু দিক, ইহাই সাধারণ নিয়ম, এবং সেই স্থলেই প্রবল অস্ত্র প্রবেশ করাইতে হয়; কিন্তু বাতজ ত্রণে সচরাচরই এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। বায়ুর শক্তিতে হয়তো ত্রণ-গহ্বরের উপর দিক টোব ধরিয়া উঠিয়াছে, অথবা একাধিক স্থল এই প্রকারে টোব ধরিয়াছে এবং তাহার মধ্যে পুরু মাংস-পেশীর প্রাচীর বিদ্যমান আছে; কিন্তু যে স্থলে অস্ত্র হইলে ঢালু হইতে পারে, যে স্থল ভয়ানক পুরু, অস্ত্র করিলে অতিরিক্ত রক্ত-স্রাব হইবে, অথবা শিরা বা মৰ্ম্মাদি আহত হইবার একাণ্ডই সম্ভব এই প্রকার স্থলে যে যে স্থলে টোব ধরিয়াছে সেই সেই স্থলে অস্ত্র করিয়া সলাকা দিয়া দেখিতে হইবে কোন দিকে ত্রণের গহ্বর বিদ্যমান আছে; এবং যদি এই অস্ত্রে ঢালু না হইয়া থাকে, তবে সলাকার মাথায় হোগলপাতি বা এরসেম লেন-চেট দ্বারা বা বোমা যন্ত্র দ্বারা নিম্ন প্রাচীর-গাত্রে সরু ছিদ্র



করিয়া দিয়া পলিতা বা রবারের নল দ্বারা পুঁজ বাহির করিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে। ইহা ভিষকের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। ক্ষোটকের একাধিক স্থলে অস্ত্র করা আবশ্যক হইলে প্রত্যেক অস্ত্রই মাংস-পেশীর লম্বালম্বি ভাবেই করিতে হইবে। আরাআরি ভাবে কখনও কোন স্থলে অস্ত্র করা কর্তব্য নহে, করিলে মাংস-পেশী কাটিয়া যাঁইতে পারে, অথবা শিরা বা স্নায়ু কাটিয়া অতিরিক্ত রক্তস্রাব বা ক্ষতে তীব্র যন্ত্রণা হইতে পারে। অধিকন্তু ক্ষত সকলে পুরিয়া উঠে না, একটা উন্নত মাংস-পিণ্ড জন্মিয়া থাকে।

অস্ত্র-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে অতি লঘু হস্তে চাপ দিয়া পুঁজ বাহির করিয়া দিবে। পুঁজ বাহির করিতে জোরে চাপ দেওয়া কর্তব্য নহে। রোগী দুর্বল, বা অধিক দিনের ত্রণ বা বিজ্রবি, উরুগুস্ত আদি অধিক পুঁজ-বিশিষ্ট ত্রণের পুঁজ প্রথম দিনে সম্পূর্ণ নিঃসৃত করা কর্তব্য নহে, করিলে রোগীর শরীরের রক্তের গতি সেই দিকে হইয়া রক্তাশয়ের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া হঠাৎ মৃত্যু হইতে পারে। সেইরূপ পুরাতন বড় ত্রণের পুঁজ এক কালীন সকল বাহির করিয়া দিলে রোগী ক্ষয়কাশে পরে আক্রান্ত হইবার একাধি সম্ভব, এবং এই অবস্থায় এই প্রকারে জর হইলে রোগী প্রায়ই রক্ষা পায় না। যথারীতি পুঁজ বাহির করিয়া একখণ্ড পাতলা ত্বাকরা আবশ্যক মতে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে করিয়া ক্ষতের মুখে সলা-দ্বারা ছিপির মতন করিয়া রাখিবে। ত্বাকরা বাহাতে ত্রণ-গহ্বর মধ্যে বেশী না যায় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। গহ্বরের মধ্যে অতিরিক্ত ত্বাকরা দিলে পুঁজের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া যায় ও অনেক স্থলে নুতন করিয়া প্রদাহ আরম্ভ হয়। বিশেষতঃ অস্ত্রের পর দিবসই, প্রকৃতির শক্তিতে ত্রণ গহ্বরের চারি দিকের সুস্থ মাংসদ্বারা ত্রণ-গহ্বর অনেক পূর্ণ হইয়া যায়। ত্বাকরা মধ্যে দিলে, এই মাংস আর বৃদ্ধি হইতে পারে না, বরং ক্ষয় হইয়া যায়।

**রক্তস্রাব**—অস্ত্রের মুখে পাতলা ত্বাকরাই ব্যবহার কর্তব্য, কেননা পাতলা ত্বাকরায় রক্তাদি যে প্রকার বন্ধ হয় মোটা বা মারাদি সংযুক্ত ত্বাকরায় তত সহজে বন্ধ হয় না। আর যদি হঠাৎ অসাবধানতা বশতঃ কোন ধমনী বা শিরা ছিন্ন হইয়া যায় তবে প্রথম ত্বাকরা দ্বারা জোরে চাপ দিয়াই বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু না হইলে জারিত লৌহ, হিরাক্ষ, ফটকারী চূর্ণ ইত্যাদি সঙ্কোচক ঔষধ ত্বাকরায় মাখিয়া বণ্ডেজ করিয়া দিবে; এবং উক্ত ঔষধের জলদ্বারা সর্বদা ভিজাইয়া রাখিবে। ছাগল্লাদির পাতা, বিষল্যা করণীর পাতা, দুর্বার মাইজ ইত্যাদি যে সব গ্রাম্য রক্তরোধক ঔষধ প্রচলিত আছে তাহাতেও এই সব স্থলে ভাল কাজ হইয়া থাকে। চীৎকার দিলেও বেশ ফল হয়।

ত্বাকরার চাপ দিয়া জগপটা পুরু করিয়া বাঁধিয়া রক্ত বন্ধ করিতে পারিলেই ভাল হয়। রক্তরোধক সকল ঔষধই উত্তেজক, রোগীর বায়ু চড়া করিয়া দেয় কিন্তু একটুকু মোটা জাতীয় শিরা অথবা ধমনী যদি ছিন্ন হইয়া যায় তবে এই সব ঔষধে প্রায়ই রক্ত বন্ধ হয় না। সেই স্থলে শিরা ছিন্ন হইলে ক্ষতের নিম্ন দিকে এবং ধমনী ছিন্ন হইলে ক্ষতের উপরের দিকে জোরে একটা বন্ধন দিয়া দিতে হইবে। যুদ্ধ ধারে পিচকারীর মত ছিটিয়া রক্ত বাহির হইলে শিরা, এবং দোমাইয়া দোমাইয়া বোকনা বোকনা রক্ত বাহির হইলে ধমনী ছিন্ন হইয়াছে বলিয়া জানিবে। এই প্রকার বন্ধন দিলে ও যদি কোন কাজ না করে তবে ধমনী বা শিরার মুখ পাইলে তাহা বাঁধিয়া দিবে, আর যদি সম্বুচিত হইয়া মাংস-পেশীর মধ্যে বসিয়া যায় তবে যে স্থল দিয়া রক্তস্রাব হইতে থাকে তথায় গ্রেণ দুই কাওয়াইনের তুলা লাগাইয়া দিলে নিশ্চয়ই সকল প্রকার রক্তস্রাব বন্ধ হইবে। যদি সে স্থলেও না হয় তবে উত্তম লৌহ সলাকা দ্বারা ই দন্ধ করিয়া দিবে।

**বণ্ডেজ**—অস্ত্রের পর জল গটাই বাঁধিয়া রাখিতে

হইবে। এনটিসেপটিকের বন্ধন প্রণালী সর্বত্র কার্যকরী হইতে পারে না। সুস্থ ও সবল ও নির্দোষ শরীর না হইলে, বা রোগী রক্তচুষ্টি গরমি, মধুমেহ, কুষ্ঠ আদি বিধে দূষিত হইলে, এই প্রণালীতে কোনই কাজ হইতে পারে না। বিশেষতঃ এই ব্যয়সাধ্য চিকিৎসা ভারতের প্রকৃতির ও দরিদ্র পল্লীর সম্পূর্ণই অল্পযোগী। নেই কারণেই আয়ুর্কেদে পূর্ব বর্ণিত চিকিৎসা প্রণালী সমর্থন করিয়া গিয়াছে, এবং তাহাই আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। তবে এনটিসেপটিক চিকিৎসা প্রণালীও আয়ুর্কেদের প্রথম সময়ে প্রচলিত ছিল বলিয়া দেখা যায়। স্বাস্থ্য হউক অস্ত্রের পর রক্তপূঞ্জ বন্ধ হইয়া গেলে ক্ষতোপরি পুরু গদি দিয়া বেণ্ডেজ করিয়া রাখিতে হইবে! এবং ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত তাহা জলদ্বারা ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। পর দিবস বেণ্ডেজ খুলিয়া কাচা মলমের পটী দিতে হইবে। যদি অস্ত্রকালীন প্রাণীরাতি আহত হইয়া থাকে বা দোষের প্রকোপ বশতঃ প্রদাহ না কমিয়া চারি দিকের লাল ভাব বিজ্ঞমান থাকে এবং ত্রণ-গহ্বর সঙ্কচিত হইয়া না যায়, তবে আবশ্যক বোধে দুই তিন দিনও জলপটী রাখা যাইতে পারে, বা তোকমা, তিল, বেতাগাদি ত্রণ-সঙ্কোচক পুলটীশ আদি ব্যবহার করা যাইতে পারে। তবে সচরাচর প্রায় সর্বদাই এই স্থলে কাচা মলমের পটীতেই বিশেষ ফল দর্শে। পুলটীশ আদি দিতে হইলে ক্ষত মুখের ন্যাকরা বাহির করা কর্তব্য নহে, কিন্তু কাচা মলমের পটী দিলে অস্ত্র-মুখের আকরা ফেলিয়া দিতে হইবে এবং মলমের পটী মাত্র কাটামুখ ও প্রদাহিত স্থানের উপর বসাইয়া দিতে হইবে, মধ্যে পুরিয়া দেওয়া কর্তব্য নহে। এনটিসেপটিক ভাবের চিকিৎসায় সকল স্থলেরই মলম বা ঔষধের পটীর উপর পান, বা কলাপাতা ব্যবহার করিতে হইবে। এই প্রকারে প্রদাহ কমিয়া ত্রণ গঠে সঙ্কচিত হইতে থাকিলে, কাচা মুখের আকরা ফেলিয়া দিয়া কষার জল দ্বারা ( নিম, বট ) ধোঁত করিয়া প্রত্যহ দুই বেলা ঔষধ

দিতে হইবে। ধোয়ার সময় ফিট্কারি, ভূত ইত্যাদি দ্বারা ক্ষতের মধ্যে ভোরে জল দেওয়া কর্তব্য নহে। আকরার করিয়া জল দিবে এবং অতি সন্তর্পণে ভিজা আকরা দিয়া ক্ষতের মধ্যে রক্ত পুঁজ পুছিয়া ফেলিবে। উৎপন্ন মাংস-অস্তুর যাহাতে ভাঙ্গিয়া না যায় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ত্রণে সামান্য পুঁজ আদি থাকিলে এক বেলা বেণ্ডেজ পরিবর্তন করিলেও চলিতে পারে। অপর পক্ষে পুঁজের মাত্রা বেশী হইলে দুই তিন বারও বেণ্ডেজ পরিবর্তন আবশ্যক হইয়া পড়ে। অস্ত্রের পর দুই তিন দিন কাচামলমের পটী, পরে ক্ষতে পচা থাকিলে কাইটমলম বা ঘায়ের তেল, এবং সুস্থ হইয়া উঠিলে গোল ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে। এ বিষয় বিস্তারিত ক্ষত রোগ বর্ণনাকালে লিখিত হইবে। এই প্রকার চিকিৎসায় ত্রণ পুরিয়া না উঠিলে নালী ঘায়ের চিকিৎসা অনুসারে চিকিৎসা করিতে হইবে।

**ত্রণলোপীক কর্তব্য**—দিবা নিদ্রা, গম্যা স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ, দীর্ঘ সময় উপবেশন বা শয়ন, মাদক দ্রব্য সেবন বা অমিষ্ট চিন্তা, রাত্রি জাগরণ যান বাহনে গমন নিষিদ্ধ।

**পথ্য**—রোগী দুর্বল হইলে উত্তেজক ঔষধ, দুগ্ধ, মাংস, মৎস্য, ডাইল, ভাত ইত্যাদি বলকারক খাদ্য পথ্য। রোগ পুরাতন হইলে পুষ্টিকর ও বলকারক খাদ্য ও তৈলাক্ত খাদ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। গমের ছাত্ত পিষ্টক, গরম জল বিশেষ উপকারক। উত্তেজনা দ্রব্য জ্বর বিজ্ঞমান থাকিলেও দ্রোণ আহার স্বাভাবিক অবস্থার মতই করিতে হইবে।

শ্রীকেশব চন্দ্র দাস।

## প্রেমের কবর

বাদশাহের “হেনার বাগান” আজ পরিপূর্ণ—ফুলের গন্ধে, আর বুলবুলের গানে। হাসনা গাছের হাজারো আঁখি এক সঙ্গে ফুটে উঠেছে চাঁদের আলোর গোশন মধ্যে। বাগানের আলো-ছায়ার মধ্যম্নে মোড়া স্থানের উপর মুহূ পা ফেলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন—তরুণ শাহজাদা; গায়ে তাহার সোনার বুটা দেওয়া ফিরোজা রঙের কুর্তা। পায়ে সোনার জরি মোড়া চটী; কণ্ঠে হীরার ধারের মিশরী ছুরি, মুখে বেদনা-মাখা কেমন চিত্তাঙ্কিত ভাব। খানিক পরে বাগানের এক কোণে কুঞ্জ-অন্তরালে একটা ক্ষুদ্র মন্দির বেদিকার উপর শাহজাদা উপবেশন করিলেন।

চাঁদ রজত জ্যোৎস্নায় দিগন্ত প্রাণিত করিয়া বনের মাথার উপর আসিল। শাহজাদা লক্ষ্যহীন দৃষ্টি তাহাই দেখিল। কান্ড বুলবুল কুঞ্জবনে ঘুমাইয়া পড়িল। স্বপ্ন-ভোর পাখীর ছ’একটা মধুস্বর রাত্রির পাখুর মুখে চুপন-ধ্বনির মতো বজ্রস্রোতটিতেছিল। শাহজাদা উঠিলেন না, সেইখানে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কত-কণ পরে কি চিন্তায় তাহার মুখ প্রোঙ্কল হইয়া উঠিল—একদিনের ছবি তাহার মনে পড়িয়া গেল। সে এমনি নির্জন রাত্রি,—অনন্তরালে চাঁদ এমনি হেলিয়া পড়িয়াছিল।

\* \* \* \*

শাহজাদা বাগানে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, দেখিলেন—ইরানী বাদী বালিকা আনার কলি তাহার উৎফুল্ল কুসুম-গুচ্ছ ভুল্য হৃদয়-অর্ধা উদ্যান-কোণে মন্দির বেদিকায় জুটাইয়া দিয়া ঘুমাইতেছে! চুপন-গুচ্ছ পাথরে মিলাইয়া বালিকা যেন একান্ত আগ্রহে এই পাষণ বেদিকাকেই আপনায় প্রাণের সঙ্গী করিয়া লইয়াছে! মন্দির বেদিকার চতুর্দিক সৌরভসিক্ত অজস্র পুষ্পবৃক্ষে সুসজ্জিত রহিয়াছে।

বালিকার বসন্তকোমল একটা বাহু ঝুলিয়া পড়িয়াছিল—শাহজাদার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তিনি বিস্ময়ান্বিত ভাবে দেখিলেন কোমল হাতে একখানি কাগজের খণ্ড। কাগজ-খণ্ডে একটি কবিতা।

“শুফতাম আজ এশকে বুঁতা জায়

দিলচে হাসেব কারদাই।

শুফত মারা হাসেলে জুজ লাল

হায়ে খার নিস্ত ॥”

শাহজাদা এই কবিতায় বালিকার আকুল হৃদয়ের মর্ম-বেদনা ভরে ভরে—অক্ষরে অক্ষরে পাঠ করিলেন। কে এই বালিকার প্রাণ-পুষ্প-অর্থীর দেবতা!

শাহজাদা কোতুলকাক্রান্ত হইয়া সেই কবিতার নিয়ে এই কয়েকটা কথা লিখিলেন,—

“পেশ আহলে দিদা ফারকে

দারগুল ও দারখার নিস্ত ॥”

শাহজাদা প্রত্যহ উদ্ভান-প্রান্তে এই নির্জন মন্দির পাথরে উপবেশন করিতেন। অপরাহ্ন রবির স্তব্ধ আভা বৃক্ষকুঞ্জের মধ্য দিয়া আসিয়া শাহজাদার তরুণ মুখে কমলীয় রূপের জ্যোতি-মাখাইয়া দিত। বালিকা এখানে আসিয়া প্রত্যহ বাদশাপুত্রের হাতে বৈকালিক শরবৎ ও মিষ্ট আন্নার রস প্রদান করিয়া যাইত। বৃক্ষ কাচের-পাত্রে ঈষৎ-রক্ত আনারের রস, বৈকালিক রশ্মির রক্তিম লালিমা ও শাহজাদার রক্তিম মুখের হাস্য-দীপ্ত কমলীয় জ্যোতি মিলিয়া এক অপরূপ সুবাস বিস্তার করিত—প্রেম-দেবতার তাহা অজ্ঞাত ছিল না।

এই বালিকা প্রত্যহ নিশীথ নীরবতার মধ্যে এই মন্দির বেদিকার পাদমূলে একান্তে বসিয়া সমগ্র হৃদয়ের প্রেম-পরিপ্লুত নয়ন-বারি দ্বারা কোন হৃদ ভ প্রেমদেবতার ভূষিতা করিত কেহ জানিত না।

একদিন নিশীথ-নির্জনতার মধ্যে রূপোন্মত্ত রাজভৃত্য দিলদার বালিকার প্রাণ ভিক্ষা করিল, বালিকা দীপ্ত ফুলিদের মতো বলিয়া উঠিল, “কুহুর,

আমি বিবাহিতা—আমার স্বামী স্বর্গের দেবতা। বাদ-শাহকে বলিলে এখনই তোর প্রাণদণ্ড হইবে।”

দিলদার ঘৃণায় ও ক্ষোভে জর্জরিত হইয়া এই ক্ষুদ্র বালিকার দর্প চূর্ণ করিবার সংকল্প মনের মধ্যে গোপন রাখিয়া তাহারই পদস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, জীবনে আর সে কখনো এমন হীন সঙ্কল্পের বশবর্তী হইবে না। সঙ্কলন মনে সে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বালিকার দয়ার পাত্র হইয়াছিল।

আজ আনার স্বপ্নে দেখিল, তাহার নিম্নলিখ প্রেম-দেবতা প্রার্থিত বর লইয়া শিয়রে আসিয়া দণ্ডায়মান।

আনার কলি প্রেম-পুলকে জাগরিত হইয়া যাহাকে দেখিল, তাহা তাহার স্বপ্ন-কল্পনারও অতীত; দেখিয়া বিষয়মুগ্ধ ও আধঃস্বপ্নজড়িতকণ্ঠে প্রশ্ন করিল,—কে তুমি? স্বর্গের দেবতা!

শাহজাদা বিষয়-জড়িত ও কৌতুকপূর্ণকণ্ঠে উত্তর করিলেন, “আমি স্বর্গের দেবতা নই, আনার। আমি শাহজাদা।” আনার অধিকতর বিষয়জড়িতকণ্ঠে বলিল, “তুমি স্বপ্ন—সেই সত্য হোক। আমার স্বর্গের দেবতা যেন কখনো এমন ভাবে ধরা দিতে না আসে।”

শাহজাদা বিষয়াবৃত্তিতে ভাবে প্রশ্ন করিলেন, “কে তোমার স্বর্গের দেবতা আনার। তাহার জন্ম তোমার এ প্রেম-রাত্রি-জাগরণ?” আনার আকুলকণ্ঠে উত্তর করিল, “স্বর্গের দেবতা।—কেমনে বলি শাহজাদা, যদি তিনি আজ আমার শিয়রে আসিয়া না দাঁড়াইতেন,—তিনি যদি সেই মন্দিরে গোপন হইত, তিনি যেখানে বিরাজিত সেখানেই থাকিতেন,—তবে তাঁহার সম্মুখে মন খুলিয়া—হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া দেখাইতে পারিতাম,—কে সেই স্বর্গের দেবতা! বলিতে হয়, বাদীর ঋণে শাহজাদা ক্ষমা করিলে বলিতে হয়,—আমার স্বর্গের দেবতা, বেহস্তের মালিক আজ আমার সম্মুখে!” শাহজাদা প্রেমপূর্ণকণ্ঠে উত্তর করিলেন, “আনার,

এ তোমার স্বপ্ন নয় তো?” আনার অপ্রপূর্ণ আনন্দনেত্রে চাহিয়া মুহূর্তে বলিল, “শাহজাদা যদি এ সত্য স্বপ্নও হইত, তবু আমি সুখী। ইহার বেশী বাদী আশা করিতে পারেনা। জাগ্রতে—স্বপ্নে—আমার একই দেবতা। হে বেহস্তের মালিক! স্বপ্ন এবং সত্য উভয়ই আমার নিকট সমান। জাগ্রতে আমার দেবতা দূরের হইলেও স্বপ্নে তিনি আমার একান্ত আপনার।”

শাহজাদা সম্মুখে আনারের হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া প্রেমপ্লুতকণ্ঠে বলিলেন, “তোমার মতো নির্মল প্রেমের রাজ্য দীন-হুনিয়ার অধীশ্বরেরও প্রার্থনীয়। তুমি সত্যই আমার!”

শাহজাদা আনারের গণ্ডে একটি রক্তিম চুখন মুদ্রিত করিয়া দিলেন।

পরদিন ইরাণী বাদী আনারকলি শাহজাদার একমাত্র প্রিয়তমা পত্নী নাদির; বেগম নামে পরিচিত হইলেন।

দিলদার আনিয়া শাহজাদাকে একখানি পত্র দিল।

“যদি এতকালের ভালবাসা ভুলিয়া গিয়া না থাক তবে দ্বিপ্রহর রাত্রিতে ‘হেরামের’ বাহিরের উজানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও,—ওমর।”

দ্বিপ্রহর রাত্রি উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। গাছের ছায়া বাগানের বৃকে আসিয়া পাড়িয়াছে। কতক্ষণ পর শাহজাদা দেখিলেন, অপাদমস্তক “বোরকার” আবৃত কে একজন অহঃপুরের প্রান্তবর্তী দরজা অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে বাগানের শেষ সীমায় উপস্থিত হইল। তখন কে একটি যুবক কুণ্ডলনের প্রান্ত হইতে বহির্গত হইয়া সেই “বোরকা” ঢাকা মূর্তির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। তখন “বোরকার” মুখাবরণ অপসারিত হইল, যেন মেঘের মধ্য হইতে পূর্ণচন্দ্র ফুটিয়া বাহির হইল।

কতক্ষণ কথাবার্তার পর “বোরকা” আবৃত করিয়া মহিলাটি দ্রুত অগ্নপুুরের দিকে অগ্রসর হইল। অপর

আষাঢ় ১৩২১

মহুখ্য বৃত্তিটা মুহূর্ত মধ্যে অন্ধকারে কোথায় মিলাইয়া গেল।

শাহজাদার শিরায় শিরায় উত্তপ্ত শোণিত খেলা করিতেছিল; তিনি ভাড়াভাড়া উত্তান কানন হইতে বাহির হইয়া মহিলার সম্মুখবর্তী হইলেন।

“কে তুমি এই নিশীথ অভিসারে পাপিয়সী?”

এই কণ্ঠস্বরে মহিলা কাঁপিয়া উঠিল, সঙ্কুচিত হইয়া পথের এক পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল।

“বল কে তুমি—বল, এখনই তোমার উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করিব”—শাহজাদা পজ্জিয়া এই কথাগুলি বলিলেন।

মহিলা ‘বোরকা’ ঝেৎ উন্মোচন করিয়া বিবাদ মিশ্রিত করণ কণ্ঠে বলিল, “শাহজাদা, আমি নাদিরা।” শাহজাদা, বজ্রকঠোরকণ্ঠে বলিলেন, “নাদিরা! সত্যি তুমি পাপিয়সী নাদিরা! নিশীথ নির্জনে কোন প্রেমাস্পদের অভিলাষ পূর্ণ করিতে গিয়াছিলে?”

নাদিরা করণকাতরকণ্ঠে বলিল, “শাহজাদা, এ আপনার সম্পূর্ণ ভ্রম—আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।” “এই চক্ষু যেখানে সাক্ষী সেখানে প্রতারণার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।” শাহজাদা কঠোরকণ্ঠে এই কথাগুলি বলিলেন।

আনারের ওষ্ঠ কম্পিত হইতেছিল, কি যেন বলিতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু তাহা কেমন অক্ষুট চীৎকারের মতো নির্গত হইল। শাহজাদা বজ্রকঠোর কণ্ঠে বলিলেন, “সয়তানী, চুপ কর; স্বীয় অবস্থার কথা একবার ভেবে দেখ। প্রায়শ্চিত্ত এখনই হোক।” শাহজাদা কটি-হইতে ছুরি উন্মোচন করিলেন। উত্তপ্ত মূষ্টির মধ্যে থাকিয়া ছুরিখানা বন্ধক করিয়া উঠিল, শাহজাদা দুই পদ অগ্রসর হইলেন, তারপর দুই পদ পশ্চাতে ফিরিয়া বলিলেন, “না, কলঙ্কিনীর শোণিতে এ হস্ত মলিন করিব না। এই খাণ্ধেই তোরা জীবন্ত সমাধি হোক—তা হলেই প্রকৃত দণ্ড হইবে।”

সেই খানেই নাদিরাবেগম শোকে হুঃখে স্বামীর

অবিস্বাসে ও ঘৃণায় মুর্ছিত হইয়া ভূপতিত হইল।

শাহজাদার ভৃত্যেরা সেই খানেই নাদিরা বেগমের কবর খনন করিয়া তাঁর সমাধি দিল।

\* \* \* \* \*

তারপর এক মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। অমল জ্যোৎস্না-শ্রোতে আকো সমস্ত উজ্জ্বল পরিপ্লাবিত। শাহজাদার হৃদয় আজ শূন্য,—কেবল মাত্র শূন্য নহে—বিচূর্ণ। তিনি “হেনা” কুঞ্জের পার্শ্বস্থ বেদিকায় উপবেশন করিয়া ছিলেন। “হেনার” সুরভি স্বাস—তা’ও আজ তিক্ত, বুলবুলের প্রেম কাকলী অর্থশূন্য এবং চাঁদের জ্যোৎস্না শীর্ণ মলিনতার বিগুহ ছবি।

এমন সময় শাহজাদা দেখিতে পাইলেন, কবরের কাছে কে একজন অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, নূতন কবরের উপর রাশিকৃত পুষ্প সম্ভার সজ্জিত করিয়া একটা যুবক একান্ত মনে কি প্রার্থনা করিতেছে।

শাহজাদা নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু যুবক কিছুমাত্র বিচলিত হইল না; একান্ত মনে প্রার্থনায় রত রহিল। শাহজাদা ক্ষণেক কাল স্তব্ধের মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন।

যুবক উঠিয়া উর্দ্ধনয়নে প্রণিপাত করিয়া বলিল, “খোদা! ভগ্নীকে তোমার শাস্তিময় ক্রোড়ে স্থান দিও। এই নিষ্ঠুর ভ্রাতার প্রায়শ্চিত্ত কিসে হয়, বলিয়া দেও, প্রভু!” শাহজাদা অগ্রবর্তী হইয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন,

“কে তুমি?—কাহার জন্ত প্রার্থনা করিতেছ?”

যুবক মস্তক তুলিয়া অবিচলিত কণ্ঠে বলিল,

“দেবীর পূজা করিতেছি, তিনি এখন স্বর্গলোকে। শাহজাদা, এ হতভাগ্যই এই দেবী প্রতিমাকে হত্যা করিয়াছে।”

শাহজাদা সংশয়পূর্বকণ্ঠে বলিলেন, “তুমি!—তাহাকে হত্যা করিয়াছ কেন?”

“আমি ছাড়া তাহার অন্য আশ্রয় কিছুই ছিল না।

পিতৃ মাতৃহীন দুই ভাই ভগিনী এই স্বর্ণভূমি হিন্দুস্থানে আসিয়াছিলাম—আমি বাদশাহের সৈনিক বিভাগে কর্ম গ্রহণ করি। অন্তঃপুরে আশ্রয় পাইল হুগধিনী আনার। আমি ভগ্নী-বাতক পাপিষ্ঠ ওমর।”

ওমরের অবিরল অশ্রুধারা কবরের মৃত্তিকা সিক্ত করিতেছিল।

“ওমর, আমিই তোমার প্রেমময়ী ভগ্নীর মৃত্যুর কারণ। হায় খোদা! কি কঠোর শাস্তি দিলে আমাকে!” শাহজাদার কণ্ঠ শোকাবেগে নিরুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি অবনত হইয়া কবরের মৃত্তিকা চুখন করিতে লাগিলেন। কোকিলের কণ্ঠ—হেনার গন্ধ কোন অভূতপূর্ব বেদনা-ভারে আশ্রুত হইয়া শূন্য আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া দিতেছিল। কতক্ষণ পরে তিনি ওমরের হাত ধরিয়া বলিলেন, “তাই ওমর, তুমি এখানে আমার পদ গ্রহণ করিয়া অবস্থান কর।”

ওমর কাতরকণ্ঠে বলিল, “শাহজাদা, আর আমার ধন গৌরবের বিলুপ্তি অভিলাষ নাই। এখন কোথাও নির্জনে ঈশ্বরধ্যানে জীবন অতিবাহিত করিব। শুধু এই প্রার্থনা বৎসরান্তে এই দিনে আসিয়া যেন এই প্রেমের কবর দর্শন করিতে পারি এই অশ্রুমাতি করুন।”

\* \* \* \*

কত বিজন সন্ধ্যা, কত নীরব রাজি শাহজাদাকে শোকতপ্ত অশ্রুপাতে এই কবরের মৃত্তিকা সিক্ত করিতে দেখিয়াছে, ইয়ত্তা নাই।

পরে শাহজাদা এই স্থানে একটি প্রকাণ্ড “মকবারা” নির্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে একখানি তুবার-ধবল মর্মর প্রস্তরে প্রাণের এই কয়েকটি কথা স্মরণে লিখিয়া রাখিলেন,

“আগরু মন্ বাজ বাইনাম্ রিউ ইয়ার-ই-খেশ রা।

তা কেহামৎ ওক্ৰ গোয়ায়ু কির দিগার-খেশ রা।”

—হায়! যদি ক্ষণেকের তরে

আর একবার ফিরে

পাইতাম দেখা কত (সেই) হারান সখার!

খোদা! রাখিতাম হৃদে কবি

এই কৃতজ্ঞতা ভরি

শেষ বিচারের দিন যবে আসিত আমার।

লাহোরের “গুল বাগের” সন্নিকটে আনার কুঞ্জের এক পার্শ্বে একটি বিশাল সমাধি-গুম্বজ দূর হইতে দৃষ্ট হয়। ইহারই অভ্যন্তর প্রকোষ্ঠে একখানি স্মৃৎস্ত তুবার-ধবল মর্মর প্রস্তরে যন্ত্রে খোদিত এই কয়েকটি কথা; অঙ্কিত রহিয়াছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

## আলোচনা

### ভাটিয়াল গান সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

প্রতিভার ১৩২১ সনের বৈশাখের সংখ্যায় কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। তন্মধ্যে শ্রীযুত যোগেন্দ্র কিশোর রক্ষিত মহাশয়ের সংগৃহীত কতিপয় ভাটিয়াল গান দেখিয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছি। যোগেন্দ্র বাবু যে এমন ‘ভাবের’ গান গুলি সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা অত্যন্ত স্তুতের বিষয় সন্দেহ নাই। আশা করি তিনি ক্রমশঃ এই শ্রেণীর গান সংগ্রহ করিয়া অনেক লুপ্ত রত্নের উদ্ধার সাধনে রুতকার্য্য হইবেন।

আমি সদ্যত বিজ্ঞা সম্বন্ধে নিতান্তই অনভিজ্ঞ, অতঃপর কথায়, গান জানি না একথা বলাই মোটের উপর যুক্তি যুক্ত। আর, প্রবন্ধ লিখা সম্বন্ধেও আমার বিজ্ঞা বুদ্ধির তরুণই অভাব। তবে যে আমি প্রবন্ধ বিশেষ সম্বন্ধে স্বীয় মতামত প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইয়াছি তাহাতে আমার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, কেবল যাত্রা নিজের জ্ঞান বিবাস মতে কোন সত্য বিষয়ের প্রকৃত সংবাদ যাহাতে সাধারণের নিকট ঠিক ভাবে প্রকাশিত হয়, তাহার কৃষ্ণকিৎ চেষ্টা মাত্র।

আমি যোগেন্দ্র বাবুর সংগৃহীত সকলগুলি গান সম্বন্ধেই যে কিছু মতামত প্রকাশ করিব তাহা নয়; মাত্র একটি গান সম্বন্ধে গুলি কয়েক কথা লিখিতে চেষ্টা করিব।

“ওরে দয়াল তোমায় ডাইকা সানাল ইত্যাদি”

এই সঙ্গীতটির “সানাল” শব্দের অর্থ কোন ভাষায় দেখি না। তাহা আমি জ্ঞাত নাহি। তবে যতদূর বুঝিতে পারি বাঙ্গাল্য অভিধানে বোধ হয় “সানাল” শব্দের অর্থ দেখি হয় না, অথবা অভিধানে “সানাল” শব্দটাই স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। আমি আরবি বা ফার্সি ভাষা কখনও আলোচনা করি নাই, সুতরাং উক্ত কোন ভাষায় যদি “সানাল” শব্দ দেখি অর্থ বোধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাও আমার নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এ বিষয় যোগেন্দ্র বাবু হয়তো জানিয়াই লিখিয়া থাকিবেন। “সানাল” শব্দের অর্থ যদিও কোন ভাষায় দেখি হয়, তবু আমি বর্তমান সঙ্গীতটিতে “সানাল” অর্থ দেখি করা সঙ্গত মনে করি না, যে হেতু, এই অর্থে উক্ত সঙ্গীতটির ভাব সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার হইবে না। আমি এই সঙ্গীতটি কয়েক বার কোন কোন ভক্ত ফকীর এবং তাঁহাদের শিষ্যগণের মুখে গীত হইতে শুনিয়াছি। এই গানটি সম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও নিকট একটু তথ্য সংগ্রহ করিতেও প্রয়াস পাইয়াছি।

- গোয়ালন্দ হইতে নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত যে পথে প্রত্যহ ষ্টিমার যাতায়াত করে তৎপার্শ্বের একটা ষ্টেশনের নাম মইনট। ষ্টেশনটী রাজখাড়া ষ্টেশনের কিছু “উজানে” অবস্থিত; গোয়ালন্দ হইতেও বেশী দূরবর্তী নয়। মইনট মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত। এই মইনট ষ্টেশনের নিকট দিয়া ষ্টিমার গমন কালে ষ্টিমার হইতে “নরুলাপুর” নামক একটা ক্ষুদ্র গ্রাম দৃষ্টি-পথে পতিত হয়। এক বৎসর অগ্রহায়ণ কি পৌষ মাসে আমি ষ্টিমার যোগে গোয়ালন্দ হইতে নারায়ণগঞ্জ অভিমুখে আসিতেছিলাম। তখন ষ্টেশনের অনতিদূরে উক্ত নরুলাপুর গ্রামে একটা জনতা আমার নয়ন গোচর হইল। আমি আরও দেখিলাম যে, ঐ স্থানটিকে সুন্দর সুন্দর পতাকা ও রুদ্রলা বৃক্ষ প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছে; সুতরাং স্বভাবতঃ আমার মনে বিষয়টা ভালরূপে অবগত হইবার ঔৎসুক্য

জন্মিল। আমি ষ্টিমারের কোনও কোনও আরোহীর নিকট এ বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তাহাতে আমি জানিতে পারিলাম, উপরোক্ত নরুলাপুর গ্রামে “সানাল” ফকীর নামে জনৈক মুসলমান সাধক বাস করিতেন। তিনি আপন শিষ্যদিগকে লইয়া ঐ সময় একটা মেলা মিলাইতেন। অর্থাৎ তিনি স্বীয় মতাবলম্বী ধর্ম্মাচর্য্যগী লোকসহ ধর্ম্মালাপ ও ধর্ম্ম সঙ্গীত ইত্যাদি উপায়ে কয়েক দিন আমোদ প্রমোদে কাটাইতেন। উক্ত “সানাল” ফকীর এখন জীবিত নাই। কিন্তু তাঁহার পুত্র এখনও স্বর্গ-গত ফকীর সাহেবের স্মরণ ও সন্মানার্থ প্রতি বৎসর সেই মেলা মিলাইয়া থাকেন; এবং এখনও এই মেলায় শত শত ভক্ত একত্র হইয়া স্বর্গীয় ফকীরের প্রতি সন্মান প্রদর্শন করেন, এবং আধ্যাত্মিক ভাবের ‘ফকীরী’ সঙ্গীত গান করিয়া শ্রোতা দিগকে বিমোহিত করেন। আমি যখন ষ্টিমারে আরোহী বিশেষের নিকট “সানাল” ফকীরের মেলার বিষয় শ্রবণ করিলাম, তখন, আমার পূর্ব পরিচিত কয়েকটা ভক্তের কথা মনে হইল, এবং তাঁহাদের নিকট সময় সময় “সানাল” ফকীরের নাম শুনিয়াছি, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। তাঁহার সঙ্গিনায়ের লোকের মুখেই এইরূপ ফকীরী সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া অনেক সময় এক অনির্লচনীয় সুখানুভব করিয়াছি; তাহাও তখন আমার স্মৃতি পথাক্রম হইল।

এখন দেখা যায় যে, উল্লিখিত “ওরে দয়াল ইত্যাদি” সঙ্গীতটিতে যে “সানাল” শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে এবং যোগেন্দ্র বাবু যাহার অর্থ দেখি করিয়াছেন, সেই “সানাল” শব্দ প্রকৃত পক্ষে দেখি অর্থ জ্ঞাপক নয়। এই “সানাল” শব্দে পূর্বোক্ত “সানাল” ফকীরকেই বুঝায়। সানাল ফকীরই বলিতেছেন, “ওরে দয়াল, আমি সানাল” ত্রুয়াকে ডাকিয়া কুল পাই না। এই অর্থ গ্রহণ করিলে বোধ হয় সমস্ত সঙ্গীতটির অর্থও পরিষ্কার হয়।

তার পর, যোগেন্দ্র বাবু এই গানটির সহিত অপর একটা গান একত্র করিয়া লইয়াছেন।



“আগে যদি জান্তাম” হইতে শেষ পর্যন্ত গানটি অথবা একটা গানের অংশ মাত্র। ‘কাণ্ডারী হইও রে’ পর্যন্তই পূর্ব সঙ্গীতটির শেষ।

আমার বতদূর মনে হয়, তাহাতে শেখোক্ত সঙ্গীতটি এই—

“মাকী বাইয়া যাও।

আগে যদি জান্তাম রে ভাই মাকী \* এতই চোর  
তবে কি দিতাম রে যাগা তেমামার উপর।

মাকী বাইয়া যাও।

স্বরধানা—তোর ভাঙ্গারে চুরা

দুয়ার কেন বান্দ,

আরে আপনি মরিয়া বাইবা, কার লাইগা কান্দ।

মাকী বাইয়া যাও।”

আমার বোধ হয় এই সঙ্গীতটির আরো দুই একটি “অন্তরা” আছে। কিন্তু সকলগুলি ‘অন্তরা’ আমার ঠিক মনে হয় না। সংগ্রহকারী যোগেন্দ্র বাবু চেষ্টা করিলে হয়তো সম্পূর্ণ সঙ্গীতটি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন।

এখানে ইহাও বলা অনাবশ্যক হইবে না যে, উপরোক্ত গান দুইটির সুর বোধ হয় এক নয়। আমি দুইটি গান একই লোকের মুখে বিভিন্ন সুরে গীত হইতে শুনিয়াছি। অবশ্য উভয় সুরই ভাটিয়াল সুরেরই অন্তর্গত। যোগেন্দ্র বাবু চেষ্টা করিলে বোধ হয় সুর দুইটি সম্বন্ধেও ঠিক সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। তিনি শেখোক্ত গানটির অর্থাৎ ‘মাকী, বাইয়া যাও’ এই গানটির প্রথম পংক্তিতে লিখিয়াছেন, “মাকীর এতই চোট”; কিন্তু আমি সেই স্থলে ‘মাকী ‘ত চোর’ শুনিয়াছি, আমার ইহাও মনে হয় যে, এখানে “মাকী এতই চোর” হওয়ার সম্ভাবনাটাই অধিক। পক্ষে ‘চোট’ এবং ‘উপর’

\* “মাকী” স্থলে “সাধু” শব্দের প্রয়োগেও এই গানটি বিক্রমপুর অঞ্চলে গীত হইয়া থাকে।

এই দুইটি শব্দের মিল হয় না। ‘এতই চোর’ এবং “তেমামার উপর” হইলেই পৃথকশে অনেকটা মিল লক্ষিত হয়। তিনি প্রথম সঙ্গীতটির যে অর্থ করিয়াছেন, তাহার সহিত শেখোক্ত সঙ্গীতটির অর্থের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্যই উহার প্রথম পংক্তিতে “মাকির এতই চোট” লিখিয়া থাকিবেন। যোগেন্দ্র বাবু “তেমামার উপর” কথাটির অর্থ “তিন তামা দালানের সমান উঁচু চেউয়ের উপর” এরূপ করিয়াছেন। আমার মনে হয় “তেমামার উপর” অংশের অর্থ এরূপ না করিয়া “অতি যত্নের সহিত ও সংগোপনে” করিলেই ভাল হইত। এইরূপ অর্থ করিলে গানটি সম্পূর্ণরূপে অল্প আকার দারণ করিলে। শেখোক্ত সঙ্গীতটির প্রথম দুই পংক্তি যদি এইরূপ হয়—

“আগে যদি জান্তাম রে ভাই, মাকী এতই চোর, +  
তবে কি দিতাম রে যাগা তেমামার উপর?”

তবে ইহার অর্থ নিম্নোক্তরূপ হওয়াই সম্ভব।

সঙ্গীতটির রচয়িতা একজন সাধক। তিনি তাঁহার আরাধ্য দেবতা বা ভগবানকেই মাকী বা চালক বলিতেছেন। তিনি দেখিয়াছেন যে, ভগবানের প্রতি মন দেওয়ার পর হইতে তাঁহার সাংসারিক বিষয়ের প্রতি আসক্তির হ্রাস হইতেছে; কিন্তু আকাক্ষার নিরুত্তি হয় নাই; সুতরাং এই সময়টা তাঁহার পক্ষে একটা বিষম সমস্তার বিষয় হইয়াছে। তাই তিনি বলিতেছেন মাকী অর্থাৎ ভগবান যেন তাঁহার মন চুরি করিয়াছেন এবং তিনি আর তাঁহার মনকে সংসারের দিকে সহজে আনিতে পারেন না।

+ “সাধু এতই চোর” এই পাঠ ধরিলে অর্থ প্রতিপত্তির কোনই গোল হয় না। আগে যদি জানিতাম যারা সাধু বলিয়া পরিচিত তারা ধর্মধর্মী তবে তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতাম না, এবং তাহাদের উপদেশ মত কার্য করিতাম না।



আব্দ ১৩২১

কাঞ্জেই তিনি ভগবানকে নিজস্ব জানিয়া মুখে তাঁহার প্রতি বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিতেছেন। এই ভাবটী ভক্তের আদার বলা যাইতে পারে। ভক্তের তখনকার ভাব বড়ই মধুর। এই ভাবটীকে বাৎসল্য ভাব বলিলেও হয়। অথবা ইহা তাঁহার হৃদয়ের অন্তর-তম প্রদেশ হইতে প্রবাহিত অনাবিল আবেগের প্রকাশ মাত্র। এই কথাটী হইতে হয়তো আরও সুন্দর ভাব উদ্ধার করা যাইতে পারে। সে বিষয়ের অধিক আলোচনা করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।

যোগেন্দ্র বাবু তাঁহার প্রবন্ধের টীকাতে লিখিয়াছেন “এই লুপ্ত প্রায় গানগুলি সংগ্রহ করিয়া যেন ইত্যাদি।” এই শ্রেণীর গানগুলি সবই যে লুপ্তপ্রায় একথা বলা যায় না, কারণ আমি পূর্বে সানাল ফকীরের যে সম্প্রদায়ের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি সেই সম্প্রদায়ের লোক এখনও এইরূপ অনেক নূতন সঙ্গীত রচনা করিয়া থাকেন। অবশ্যই ইতঃপূর্বে রচিত এই শ্রেণীর কতক গান লুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যোগেন্দ্র বাবু সহরে থাকেন বলিয়া ভাটিয়াল গান সংগ্রহ কার্যে আশাহুরূপ অগ্রসর হইতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিছেন। বাস্তবিকই সহরে এত নাটক, যাঁত্র ও খেমটা সঙ্গীতের মধ্যে সেই সকল সঙ্গীতের আলোচনা কমই দেখা যায়। মফঃস্বলেই এই শ্রেণীর গানের চর্চা হইয়া থাকে। যদিও ইহা মফঃস্বলের নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে অধিক পরিমাণে প্রচলিত, তবু ইহার লালিত্য ও প্রাণমাতান মধুর ভাব অল্প সঙ্গীত অপেক্ষা অনেক সময় উচ্চতর স্থান অধিকার করিয়া থাকে। বিগত কয়েক বৎসর কার্যোপলক্ষে কলিকাতা মহানগরীতে অবস্থান কালে একবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবের দিন অতি প্রত্যাষে অর্থাৎ উৎসবোপলক্ষে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রাতঃরূপাসনা আরম্ভ হইবার কিছু পূর্বে, একটা মহিলা যে ছুই একটা ভাটিয়াল গান গাইয়াছিলেন তাহা শুনিয়া

মনে যে অনির্বচনীয় মধুর ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সাধ্যাতীত। ঐ গান যিনি শুনিয়াছেন, অন্ততঃ সেই সময়ের লজ্জা তিনি নিশ্চয়ই অগ্র সংবরণ করিতে পারেন নাই। যে সকল সঙ্গীতের এরূপ প্রাণমনমুগ্ধকারিণী শক্তি, সেই সকল অমূল্য রত্ন সংগ্রহ কার্যে যোগেন্দ্র বাবু ত্রুতী হইয়াছেন, অতএব তিনি প্রকৃতই উৎসাহ পাইবার যোগ্য। আশা করি, যোগেন্দ্র বাবু উপরোক্ত সম্প্রদায়-সংস্থষ্ট লোকের নিকট হইতে ভাটিয়ালগান সংগ্রহ করিয়া প্রতিভার পাঠক-পাঠিকাদিগকে উপহার দিবেন। তিনি চেষ্টা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, সানাল ফকীরের গায় আরও অনেক তত্ত্ব সাধক অনেক স্থানে এইরূপ সম্প্রদায় গঠন করিয়াছেন, এবং এই সকল সম্প্রদায়ভুক্ত তত্ত্ব জনের নিকটও সঙ্গীত সংগ্রহ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীহবেন্দ্রকুমার কর।

## “শ্রীহট্টের রঘুনাথ ও বঙ্গের রঘুনাথ”

### প্রতিবাদ

[আত্মা শ্রীহট্ট হইতে শ্রীযুক্ত লোকনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ১৩২০ বঙ্গাব্দে ১১শ সংখ্যা প্রতিভায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি, এ, বি, টি লিখিত উপরোক্ত প্রবন্ধের যে সুদীর্ঘ প্রতিবাদ পাঠাইয়াছেন তাহা সম্যক প্রকাশিত করার স্থান প্রতিভায় নাই, সুতরাং যে সমস্ত আপত্তি তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাই সংশোধিত ভাষায় সংক্ষেপে মুদ্রিত হইল। অসংযত ভাষা ও অবান্তর কথা পরিত্যক্ত হইয়াছে।]

প্রতিভা সম্পাদক।

(১) উপেন্দ্র বাবু “বঙ্গের চতুষ্পাঠি সমূহে” রঘুনাথ সম্বন্ধে যে “অনেক ইতি কথা প্রচারিত” আছে তাহা পরিত্যাগ করা উচিত নহে, এইরূপ বলিয়াছেন, অথচ

সেই সব ইতি কথা আলোচনা-যোগ্য মনে করেন না। আমরা এরূপ অনেকের মত অবগত আছি যাহাদের কথার মূল্য অল্প নহে।

(২) উপেন্দ্রবাবু কল্পিত সুবিদ নারায়ণ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। সুবিদ নারায়ণ কি কল্পিত? যদি সুবিদ নারায়ণ কল্পিত হয় তবে তাঁহার কাল বিচারের প্রসঙ্গ কেন?

(৩) উপেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, “কাত্যায়ন রঘুপতি .....তাহাকে কুলগৌরবধ্বংসকারী জানে...নবদ্বীপে গমন করেন” ইত্যাদি।

এ কথা শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে লিখিত বা সমর্থিত হয় নাই। ১৩৯ পৃঃ ২২২৭ অঃ দ্রষ্টব্য।

(৪) নবাবিধ্বত তাম্রশাসনমতে ৬৪১ খৃষ্টাব্দে পঞ্চদশ শতাব্দীর অধীন ছিল, সুতরাং ত্রিপুরা রাজ-কর্তৃক পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণকে উহা দান করার প্রসঙ্গ ঠিক নহে—এই কথা উপেন্দ্র বাবু বলিতে চাহেন; অথচ তিনি তদীয় কাছাড়ের ইতিবৃত্তের ১ম অধ্যায়ে ১৯পৃষ্ঠায় কি লিখিয়াছেন? তিনি উক্ত পুস্তকের ২৫ পৃষ্ঠায়ই বা কি লিখিয়াছেন?

(৫) (ক) “কাত্যায়ন, কাশ্যপ, মৌদগল্য, স্বর্ণ-কৌশিক, গৌতম এবং বৎস্য, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, কৃষ্ণা-ত্রৈয় ও পরাশর ব্রাহ্মণগণ ৬৪১ খৃঃ একত্র আসিবার এক বৎসর আতবাহিত না হইতেই শ্রীহট্টে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু এই দশ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণমধ্যে কয়েক শাখা আধুনিক, প্রমাণ পাওয়া যায়।”

(খ) “এই দশ গোত্রের অন্তর্গত বাৎস্য গোত্রের প্রতিষ্ঠাতা নিধিপতি।.....সুবিদ নারায়ণ ১৫শ শতাব্দীর হইলে তাঁহার ১০ম পুরুষ উদ্ধতন নিধিপতি যে ৬৪১খৃঃ শ্রীহট্টে প্রতিষ্ঠিত হন তাহা স্বাকার করিতে হইবে।”

(গ) “বৎস্য গোত্রে শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া শ্রীহট্টে প্রসিদ্ধি।.....শ্রীচৈতন্যের প্রপিতামহ মধুকর মিশ্র ১৪৫১ খৃঃ উড়িষ্যা হইতে আসিয়া শ্রীহট্টে

বসবাস করেন। ইহা যদি সত্য হয় তবে ঢাকা দক্ষিণ দত্তরালীর বাৎস্ত গোত্র এবং তাঁহাদের জাতি বলিয়া পরিচিত বুরুঙ্গার বাৎস্তগণ ৬৪১ খৃঃ ত্রিপুরার যজ্ঞো-পলক্ষে শ্রীহট্টে আগমন করেন কিরূপে?”

আলোচনা—(ক) দশ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ৬৪১ খৃঃ একত্র শ্রীহট্টে আগমন করিয়াছিলেন ইহা লেখক “উপরোক্ত আখ্যান” কোথায় পাইয়াছিলেন? শ্রীহট্টের জাতীয় ইতিহাস ২য় ভাগ, ৩য় অংশ ১৮৬ পৃষ্ঠা, এবং শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ অধ্যায় ৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দশ গোত্রীয়ের মধ্যে কোন কোন শাখা আধুনিক? (খ) জাতীয় ইতিহাস ও শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে বাৎস্ত গোত্রের প্রতিষ্ঠাতা নিধিপতি বলিয়া লিখিত হয় নাই। আনন্দ বাৎস্ত গোত্রের প্রতিষ্ঠাতা।

নিধিপতি আনন্দের পঞ্চদশ পুরুষ পরে, তাঁহার দশম পুরুষে সুবিদ নারায়ণের জন্ম। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের ৬ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। এই হিসাবে কাজেই ৬৪১ খৃঃ বাৎস্য গোত্র শ্রীহট্টে প্রতিষ্ঠিত হয় যেহেতু “সুবিদ নারায়ণকে পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া ধরা যায়।”

কাছাড়ের ইতিহাসের ২৩ পৃষ্ঠায় লেখক স্বয়ংও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন।

(গ) বৎস্ত গোত্রীয় শ্রীনন্দ শ্রীহট্টের পঞ্চদশে আসিয়া উপনিবিষ্ট হয়। আনন্দের সম্পর্ক শ্রীচৈতন্যের পিতা-মহের সহিত ছিল বলিয়া কে উপেন্দ্র বাবুকে সংবাদ দিয়াছে? শ্রীনন্দের বংশধর রায়গড় প্রভৃতি বাসী। দত্তরালী ও বুরুঙ্গাবাসীগণ যে শ্রীনন্দের সন্তান নহেন ইহা তাঁহারা নিজেই বলেন। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে মধুকর মিশ্রকে সাম্প্রদায়িক বৎস্ত গোত্রের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় নাই—শ্রীনন্দকেই বলা হইয়াছে। মধুকর মিশ্র পরে শ্রীহট্টে আসিয়াছেন ইহা শ্রীহট্টে স্বীকৃত বটে। মধুকর মিশ্র উড়িষ্যা হইতে আসিয়াছেন বলিয়া জাতীয় ইতিহাসে লিখিত হইলেও শ্রীহট্টে স্বীকৃত হয় নাই। ১৪৫১ খৃষ্টাব্দে মধুকর মিশ্রের শ্রীহট্টে আসা

আব্দ ১০২১

অসম্ভব, কারণ চৈতন্যদেব ১৭৮৫ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জগন্নাথ মিশ্রের বৃদ্ধ বয়সের ছেলে, তখন তাঁহার বয়স ৫০ বৎসর ধরিলেও ১৪৫১ খৃঃ জগন্নাথের বয়স ১৬ বৎসর হয়। মধুকর মিশ্র পুত্র পৌত্রাদি লইয়া শ্রীহটে আসেন নাই; একা আসিয়া বিবাহ করিয়া শ্রীহটে থাকিয়া যান, ইহাই প্রচলিত ও প্রমাণসিদ্ধ কথা।

জাতীয় ইতিহাসের ১২৬ পৃষ্ঠায় ১৪৫১ খৃষ্টাব্দে মধুকর মিশ্র শ্রীহটে আসেন এই কথা বলা হয় নাই। তিনি তৎপূর্বে উড়িষ্যা ত্যাগ করেন বলা হইয়াছে।

বুরুজায় পঞ্চ প্রবরান্বিত বৎস্যগোত্রীয়গণ ও দত্তরা-লীর পঞ্চ প্রবরযুক্ত বৎস্য গোত্রীয়গণ একই বৃক্ষের দুটি শাখা। সাম্প্রদায়িকদের সহ আদান প্রদানে বুরুজায় বৎস্যগণ সাম্প্রদায়িক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

(৬) “শ্রীচৈতন্যের বংশ সামবেদী ভরদ্বাজ গোত্রীয় রূপে বন্ধে স্থপরিচিত।” বন্ধের কোন জেলায় এই বংশ বর্তমান?

মুরারিগুপ্তের শ্রীচৈতন্যচরিত ও প্রেমবিলাস দ্রষ্টব্য।

(৭) “সুবিদ নারায়ণ ও ওসমান নামধেয় এক জন সেনাপতি সমসাময়িক”—ইহারা সমসাময়িক নহেন, কারণ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে ইহা নাই। খোয়াজ ওসমান নামক এক ব্যক্তিকে রাজার সমসাময়িক বলা হইয়াছে।

(৮) “সুবিদ নারায়ণের সময়ে তাম্রকূটের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে।”

এই হিসাবে উপেন্দ্রবাবু রাজাকে আকবরের পূর্ব-বর্তী হওয়া অসম্ভব বলিয়াছেন। সিদ্ধান্তসারাবলী নামক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থোক্ত “কলঙ্গ” শব্দের অর্থ তামাক এবং কলঙ্গসংবেষ্টন অর্থে চুরুট বলিয়া অঙ্গুমিত হয়.....; সুতরাং আকবরের পূর্বেই তামাকের ব্যবহার ছিল। যাহারা জাতির উৎপত্তির হেতু তাহুল ভ্রম, তামাক নহে। শ্রীঃ ইঃ ২য় ভাগ, ২য় খণ্ড, ৭ম অঃ, ১০৮পৃঃ টীকা।

(৯) “সুবিদ নারায়ণের বংশীয় শ্রীযুক্ত আবদুল করিম চৌধুরী প্রণীত বংশপত্রিকা প্রামাণ্য”—কিন্তু শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে প্রদত্ত বংশপত্রিকাও সুবিদ নারায়ণের বংশীয় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চৌধুরী মহাশয় প্রদত্ত। সেই বংশ-বলীতে তিন পুরুষের নাম অজ্ঞাত বলিয়া লিখিত, সুতরাং ইতিবৃত্ত লেখক “অজ্ঞাত তিন পুরুষ আবিষ্কার” করেন নাই। এই বংশাবলী অল্পসারে বর্তমান কাল পর্যন্ত তৎপক্ষে ১৩ পুরুষ হয়। ১২৬১ বাংলায় লিখিত একপাণ্ডা প্রাচীন বংশাবলীর সহিত ইহার ঐক্য আছে।

শ্রীহট্টের খাজে ওসমান প্রবন্ধে উপেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন ওসমান কর্তৃক যাহারা জাতিচ্যুত হয় তাহাদের বংশে ৮১২ পুরুষ চলিতেছে, আর এই প্রবন্ধে বলিতেছেন, “বর্তমান হইতে ১১ পুরুষ পূর্বে রাজা সুবিদ নারায়ণ প্রাদুভূত হন”—প্রতিভা জ্যৈষ্ঠ ১৩২০, ১৭ পৃঃ; প্রতিভা চৈত্র ১৩২০, ৩৫১ পৃষ্ঠা। ইহার কারণ কি? আমরা জানি-যাছি যে, রাজার সময় হইতে তৎপক্ষে ১৩ পুরুষ চলিতেছে। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক বংশেও ১১১২১১৩ এইরূপ পুরুষ সংখ্যাই চলিতেছে—যথা, শ্রীচৈতন্যের মাতুল বংশ, শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক সার্বণ গোত্র, পার্শ্বদ ভক্ত বিদ্যানিধির বংশ, শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক সাতকানিয়া বাসুদেব দত্তের বংশ, শান্তিপুত্রের বংশ, অদ্বৈতাচার্যের বংশ। অদ্বৈত বংশে ১১১২১১৩ পুরুষ পর্যন্ত চলিতেছে। ঢাকার উখলীতে অদ্বৈত বংশের এক শাখার বাস। যদি অদ্বৈত বংশের ১১১২১১৩ পুরুষ বর্তমানে চলিতেছে ইহাই হয় তবে সুবিদ নারায়ণকে শ্রীচৈতন্যের সম-সাময়িক কেন বলা হইবে না? লেখকের মতেও সুবিদ নারায়ণের বংশে ১১ পুরুষ চলিতেছে।

(১০) উপেন্দ্র বাবু বলেন ৪১২ গোরাঙ্গের পূর্বে (১৩১২ বাং) রঘুনাথের কথা শ্রীহটে কেহ জানিত না। উত্তরে বলা যায় যে, শ্রীহটে কেন ১৩১২ বঙ্গাব্দে ঢাকাতেই এই আলোচনা ছিল। তখনকার বান্ধব পত্রিকা দেখিলেই এ কথার সত্যতা জানিবেন।

প্রবন্ধকার তদীয় কাছাড়ের ইতিবৃত্তে যে অংশ বৈদিক পুরাণস্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা কি অপ্রামাণ্য?

(১১) “কাত্যায়ন পূর্বে ছিল কি না বলা হইল না।”

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ের টীকাধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। বঙ্গ কাত্যায়ন গোত্র নাই; রঘুনাথ কাত্যায়ন গোত্রোৎপন্ন।

(১২) সম্প্রতি প্রাপ্ত ভাস্কর বর্ষার তাম্র শাসনের পাঠোদ্ধার কালে লেখক “তহুল্লিখিত ভূমি শ্রীহটে নহে” ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন, এবং কয়েক পৃষ্ঠা পরেই আবার বীপরীত কথা বলিতেছেন। ভাস্কর বর্ষার সময়ে পঞ্চথণ্ডে ব্রাহ্মণ বসতি ছিল, তবে বেহুল্ল লোদীর সময়ে পঞ্চথণ্ডে জঙ্গলাকীর্ণ ছিল বলিয়া সাব্যস্ত হইল কি রূপে? সপ্তম শতাব্দীতে পঞ্চথণ্ডে ব্রাহ্মণ বসতি ছিল। বেহুল্ল লোদীর সময়ে “পঞ্চথণ্ডে রঘুনাথের জন্ম অসম্ভব” হইবে কেন? ইটা গরগনায় সম্বর্ধণ গোত্রীয় এক ব্রাহ্মণ বংশ আছে। এই বংশে ৩৪ পুরুষ পূর্বে চুড়ামণি উপাধিবিশিষ্ট কৃষ্ণদাস নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, সুতরাং বেহুল্ল লোদীর সময় পঞ্চথণ্ডে প্রাচীনতর ব্রাহ্মণ বংশে ‘তর্কসিদ্ধান্ত’ উপাধি ছিল না। শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণসমাজ সম্বন্ধে সুবিজ্ঞ কোন ব্যক্তির মুখে একথা শোভা পায় না।

(১৩) উপেন্দ্র বাবু বলিতে চান যে, খাসোকের পুষ্করিণী ও খাসা গ্রামের অতি প্রাচীন দীঘি এক। কিন্তু এই পুষ্করিণী ৭ম শতাব্দীর নহে। পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা কালিদাস পালের প্রপৌত্র (২০ পুরুষ পূর্বে) বারাগসী পাল এই পুষ্করিণী খনন করেন, সুতরাং ইহাকে “রাজা পালের দীঘি” বলে। “গজিনিকা” সহ মরাগানের মিলও বেশ মানাইয়াছে।

(১৪) উপেন্দ্র বাবু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের “শ্রীহট্টের কানা ছেলে” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ হইতে কতকটা উদ্ধৃত করিয়াছেন। “কানা ছেলে”

কি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ যে, উপেন্দ্র বাবু ইহার সমালোচনা আবশ্যক মনে করিলেন? +

## একডালা ছুর্গ \*

( বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের কলিকাতা অধিবেশনে  
ইতিহাস শাখাতে পঠিত )

সম্রাট মহম্মদ টোগলকের রাজত্বকালে সুলতান ফকর উদ্দীন মোবারক শাহ বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করেন। দিল্লীর রাজশক্তি তখন নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিল, সুতরাং ফকরউদ্দীনের দিল্লীর সম্রাট কর্তৃক লাজিত হইবার আশঙ্কা ছিল না। সুলতান ফকরউদ্দীন দিল্লীর বশতা স্বীকার না করিয়া স্বনামে খোতবা ও সিকা প্রচলিত করিয়া বঙ্গদেশ শাসন করিতে বঙ্গের স্বাধীনতা আরম্ভ করেন। ইনিই বঙ্গের প্রথম স্বাধীন পাঠান নৃপতি। মহম্মদ টোগলক স্বীয় সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়াতে বঙ্গদেশের শাসন কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। এই সময় হইতেই বঙ্গদেশ দিল্লী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হয়।

+ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র গুহ বি, এ, বি, টি “বঙ্গের রঘুনাথ” প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশ ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পাঠ করিয়াছেন। এই প্রতিবাদের অনেক বিষয়ের আলোচনা সম্ভবতঃ সেই প্রবন্ধে স্থান পাইয়াছে। ইহা শীঘ্রই প্রতিভাতে প্রকাশিত হইবে। এই বিষয়ের আর দ্বিতীয় প্রতিবাদ পত্রস্থ করিতে আমরা অসমর্থ।

প্রতিভা সম্পাদক।

\* এই প্রবন্ধটি বিবৃতভাবে লিখিত হইয়াছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে উহা যে ভাবে সংক্ষিপ্ত করিয়া পঠিত হইয়াছিল, তাহাই এখানে মুদ্রিত হইল।

সুলতান ইলিয়াস শাহ যখন বঙ্গের সিংহাসনে উপবিষ্ট, তখন সম্রাট মহম্মদ টোগলকের মৃত্যু হওয়াতে তদীয় পিতৃব্যপুত্র ফিরোজ টোগলক দিল্লীর সম্রাট হইলেন। নানা কারণে তিনি পূর্বে হইতেই ফিরোজ শাহের উপর বিরক্ত ছিলেন। তদুপরি বঙ্গের নবীন স্বাধীনতা লাভে উত্তেজিত হইয়া তিনি ৭৫৪ হিঃ অর্থাৎ বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। ইলিয়াস শাহ রাজধানী ফিরোজ শাহের পাণ্ডুয়া পরিত্যাগ করিয়া এক-প্রথম বার বঙ্গ ডালার দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয়লাভ করিয়া আক্রমণ। আশ্রয় গ্রহণ করেন। সম্রাট ২২ দিন পর্যন্ত অবরোধ করিয়াও দুর্গ হস্তগত করিতে পারিলেন না। অবশেষে ইলিয়াস সসৈন্তে দুর্গের বাহিরে আগমন করিলে একডালার উন্মুক্ত রণাঙ্গনে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে এক-লক্ষ বাঙ্গালী দৈত্য দেশরক্ষার্থ প্রাণ বিসর্জন করে। অতঃপর বর্ষাকাল সমাগত হওয়াতে সম্রাট ব্যর্থমনোরথ হইয়া ইলিয়াস শাহের সহিত সন্ধি করিয়া দিল্লীতে প্রত্য-গমন করেন। রিয়াজ-উস-সালাতিন এবং ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারণী বিরচিত “তারিখ-ই-ফিরোজশাহী” গ্রন্থে এই যুদ্ধের বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ইলিয়াস শাহ কর্তৃক নিহত ফজরউদ্দীনের জামাতা জাফর খাঁকে বঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সম্রাট ফিরোজ শাহ ৭৬০ হিঃ অর্থাৎ ফিরোজ শাহের দ্বিতীয় বার বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। দ্বিতীয় বার বঙ্গ তখন ইলিয়াস শাহের মৃত্যু হওয়াতে তদীয় পুত্র সেকন্দর শাহ বঙ্গের সুলতান ছিলেন। পিতৃপন্থ্যসূরণ পূর্বক সেকন্দর রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এবারও সফলকাম হইতে না পারিয়া সম্রাট ফিরোজ অবশেষে সেকন্দর শাহের সহিত স্থায়ী ভাবে সন্ধি করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

বঙ্গের ইতিহাসে সুলতান হোসেন শাহের রাজত্ব কালে একডালার পুনরুদ্ধার দৃষ্ট হয়। এই হোসেন শাহের রাজত্ব কালেই ত্রিখীচৈতন্য দেবের আবির্ভাব হয়; পুণ্যপ্রাপ্ত রূপ, সনাতন, সাকর মল্লিক, দবিরখান প্রভৃতি ইহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেন। হোসেন শাহ বিশ্বাস দাতক পাইক ও হাবলী দিগকে পদচ্যুত করিয়া, এই অসন্তুষ্ট দুর্দান্ত সেনানীগণের বিষেষ হইতে নিজকে সুরক্ষিত এবং নিরাপদ করিবার জন্য একডালার দুর্ভেদ্য দুর্গে অবস্থিত করিতেন। বঙ্গদেশের নৃপতিগণের মধ্যে এক হোসেন শাহ বাতীত অন্য কোন নরপতিই গোড় ও পাণ্ডুয়া নগর পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন স্থানে বাস-ভবন নির্দিষ্ট করেন নাই। হোসেন শাহের রাজত্বকালে একডালাই বঙ্গদেশের রাজধানী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। \*

যে একডালা দুর্গ মুসলমান শাসনকালে গোড়, পাণ্ডুয়া হইতেও সুরক্ষিত এবং দুর্ভেদ্য বলিয়া বিবেচিত হইত, দিল্লীর সম্রাট পুনঃ পুনঃ আক্রমণে এবং সুদীর্ঘ অববোধেও যে দুর্গ অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই, যে একডালার উন্মুক্ত রণাঙ্গনে একলক্ষ বাঙ্গালী একডালা দুর্গ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ অকাতরে কোথায় অবস্থিত প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে, বিবুধজন-ছিল? সোঁবিত হোসেন শাহের রাজধানী

যে একডালায় অবস্থিত ছিল, যে একডালা হইতে হোসেন শাহের সৈন্যসমূহ কামরূপ আক্রমণ করিয়া উহার রাজধানী পর্যন্ত অধিকার করিয়া-ছিল, † দুঃখের বিষয়, অত্যাধি নিঃসন্দেহরূপে ইতিহাস-বিখ্যাত সেই একডালার স্থান নির্দিষ্ট হয় নাই।

বহু মনীষী এবিষয়ে স্ব স্ব অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়া

\* Stewart's 'History of Bengal', এবং রিয়াজ-উস-সালাতিন'।

† Taylor's "Topography and Statistics of Dacca" p. 69.

গিয়াছেন। ষ্ট্রাট, টমাস, ব্লকম্যান, ওয়েষ্টমেকট, ঐযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্তী, ঐযুক্ত একডালার স্থান রামপ্রাণ গুপ্ত, ও ঐযুক্ত অক্ষয়-নির্দেশ সম্বন্ধে কুমার মৈত্রেয় মহাশয় উত্তর বঙ্গে বিভিন্ন মতবাদ। একডালার স্থান নির্দেশে প্রয়াসী ;

পক্ষান্তরে, মেজর রেণেল, টেলার, হাণ্টার, বেভারিজ, থান বাহাদুর সৈয়দ আওলাদ হোসেন, ঐযুক্ত বতীন্দ্রমোহন রায় প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ঢাকা জেলায় একডালা অবস্থিত ছিল, এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কেহই এ পর্য্যন্ত নিঃসন্দেহ-রূপে স্থায় মত প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন নাই। যে পণ্ডিতগণ উত্তর বঙ্গে একডালার স্থান নির্দেশে প্রয়াসী, তাঁহাদের মধ্যে পরম শ্রদ্ধাস্পদ ঐযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের নাম সর্ব প্রথম উল্লেখ যোগ্য। আমরা যে মত উপস্থিত করিব তাহা তদীয় মতের বিরোধী। এতদ্ব্যতীত আমাদের সংগৃহীত প্রমাণাবলী নিয়ে বিবৃত হইল।

প্রথমতঃ, ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহের চেষ্টায় কিয়দিন পূর্বে আমরা ঢাকা জেলার উত্তরাংশস্থিত একডালা অঞ্চলে গমন করিয়া-ঢাকা একডালাতে ছিলাম। অসুস্থত্বের ফলে শিলালিপি আবি-ঐতিহাসিক হিসাবে মূল্যবান ঙ্কার। একখানা শিলালিপি ও কতিপয় বাদশাহি সনন্দ আবিষ্কৃত হয়।

লক্ষ্মা ও বানার নদীর প্রায় সঙ্গমস্থলে একডালা অবস্থিত ; মেজর রেণেলের মানচিত্রে উহা “একডালা চৌকী” বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছে। এই একডালার অতি সন্নিকটে একটী বনাকীর্ণ স্থানে একটী নাতিবৃহৎ মসজিদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। উহার দ্বারদেশে একখানা শিলালিপি সংলগ্ন আছে। নিয়ে উহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল—

‘ঈশ্বরের প্রেরিত (মহম্মদ)—তাঁহার উপর ঈশ্বরের কৃপা বর্ধিত হউক—বলিয়াছেন, যিনি ঈশ্বরের নিমন্ত

মসজিদ নির্মাণ করেন, ঈশ্বর তাঁহার জন্য স্বর্গে সেই প্রকার গৃহ নির্মাণ করেন। এই বৃহৎ মসজিদ একডালাতে হোসেন বংশীয় সৈয়দ আসরফের পুত্র পরম মাননীয় আলাউদ্দীনয়াওয়াদিন আবুল মুজঃফর শাহ সুলতান হোসেন কর্তৃক নির্মিত হইল। ঈশ্বর তাঁহার রাজ্য ও রাজত্ব চিরস্থায়ী করুন। দ্বাবিশত্যাধিক নব শত অব্দে (নির্মিত)—১২২ হিঃ।’

এই শিলালিপি যে মসজিদের দ্বারদেশে সংলগ্ন আছে, তাহা একডালাতে সুলতান হোসেন শাহ কর্তৃক নির্মিত হয়, তাহা শিলালিপিতে স্পষ্ট ঢাকা একডালাতে রূপে লিখিত আছে। হোসেন “একডালা” নামযুক্ত শাহের রাজধানী একডালাতে হোসেন শাহের শিলা-ছিল, তাহা পূর্বেই উক্ত লিপি অবলম্বনে ঢাকা হইয়াছে। উক্ত শিলালিপি একডালাতে ঐতি-সহ মসজিদটী যখন অতাপি হাসিক একডালার ঢাকা একডালাতে বর্তমান স্থান নির্দেশ। আছে, তখন হোসেন শাহের রাজধানী একডালা ও ঢাকা একডালা অভিন্ন বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

দ্বিতীয়াতঃ, “রিয়াজ-উস-সালাতনে” লিখিত আছে—“এই সময় (অর্থাৎ ফিরোজ শাহ কর্তৃক একডালা দুর্গ অবরোধকালে) সেখ বিয়াবানী (অথবা রাজা বিয়াবানী) উপাধিধারী একজন ফকির কালগ্রাসে পতিত হন। এই ফকির সুলতান বিয়াবানীর ‘রিয়াজ’ সামসউদ্দীন ইলিয়াসের প্রভাভাজন অনুযায়ী বর্ণনা। ও পুঞ্জীয় ছিলেন। তিনি ফকিরের বেশে দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া বিয়াবানীর দেহ সমাধিস্থ করিলেন। তারপর একাকী ফিরোজ শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ধরা পড়িবার পূর্বেই স্বীয় দুর্গে প্রবেশ করিলেন।”

এই বিয়াবানী কে ছিলেন, তাহা স্থির করিতে যাইয়া অনেকেই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ভবানী ও বিয়াবানী

শব্দবয়ের উচ্চারণগত সাদৃশ্য দেখিয়া ডাক্তার জেমস টেলার বলিয়াছেন, সম্ভবতঃ বিয়া-বিয়াগানী শব্দকে বানী বুনিয়া বংশীয়া শেষ রাণী রাণী টেলার ও বেভারি ভবানীর বংশধর।\* বেভারিজ লেয় মত। এই উক্তির সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, মুসলমান সাধুর নাম রাজা হইতে পারে না, তিনি পূর্বে হিন্দু ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। বিয়াবানী এবং ভবানী হয়ত একই শব্দ।† বলা বাহুল্য, এই মতদ্বয় সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, এবং অমুমানের উপর স্থাপিত; সুতরাং উহাদের বিশেষ কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই।

প্রদ্ব্যাপদ ঐযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রের মহাশয় লিখিয়াছেন, “বিয়াবানী একটি পারসিক শব্দ; তাহার অর্থ—আরণ্যক। যে সাধুপুরুষ মালদহ প্রদেশে “রাজা বিয়াবানী” নামে কথিত হইতেন, তিনি লোকালয় ছাড়িয়া নিয়ত অরণ্য মধ্যেই বাস করিতেন। তজ্জন্ত লোকে তাঁহাকে অরণ্যের রাজা (রাজা বিয়াবানী)

বলিত। অত্যাপি তাঁহার

বিয়াবানী শব্দকে শ্রীযুক্ত সঙ্কল্প কত অলৌকিক জন-অক্ষয়কুমার মৈত্রের মত। প্রতি প্রচলিত আছে। মাল-

দহের ইতিহাসলেখক গোলাম

হোসেন এবং ইলাহি বক্স উভয়েই তাঁহার কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি কোন্ স্থানে বাস করিতেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করার জন্য ইলাহি বক্স স্বরচিত হস্তলিখিত পারস্ত ভাষা নিবন্ধ “খুরশেদ জাহানামা” নামক ইতিহাসে অলিখিত স্থান রাখিয়া গিয়াছেন। \* \* \* লোকালয় ত্যাগ করিয়া-ছিলেন বলিয়া “রাজা বিয়াবানী”র সমাধিক্ষেত্রে কোনও সমাধিসম্বন্ধের নির্দিষ্ট হয় নাই। তাহাতেই সে স্থান

লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।” \* শ্রীযুক্ত মৈত্রের মহাশয়ের উল্লিখিত সাধু বিয়াবানীর অপর নাম খেরকা পোষ।† গোলাম হোসেন, ইলাহি বক্স প্রভৃতির গ্রন্থে বোধ হয় ইনি সেই নামেই পরিচিত তদীয় মত সঙ্কল্প হইয়াছেন। খেরকা পোষ আলোচনা। স্বনাম খ্যাত সাধু শুর কুতুব

আল আলমের সমসাময়িক ছিলেন। শুর কুতুব ১৪৪৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। অর্থাৎ, ইতিহাস বর্ণিত বিয়াবানী ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে ফিরোজ শাহ কর্তৃক বঙ্গ আক্রমণ কালে দেহত্যাগ করেন। সুতরাং খেরকা পোষ ও বিয়াবানীর জীবিতকাল মধ্যে প্রায় এক শতাব্দী প্রভেদ হইয়া পড়িতে এই উভয় ব্যক্তি এক বলিয়া মনে হয় না।

ঢাকা নগরী এবং একডালার প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত টঙ্গী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে উত্তরখান নামক একটি গ্রাম আছে। এই স্থানে সাধু বিয়াবানীর সমাধি অত্যাপি বর্তমান। প্রবাদ এই, কবির

ঢাকা একডালার শাহ নামে ধান্দেশের একজন সন্নিকটবাসী বিয়াবানী। বাদশাহ দিল্লীর সম্রাটের সূহিত যুদ্ধে পরাভূত হওয়াতে,

তাঁহার বৈরাগ্যের উদয় হয়। সংসার ত্যাগ করিয়া ফকির হইয়া তিনি ভাওয়ালের নিবিড় অরণ্যে উত্তরখান নামক স্থানে বাস করিতে থাকেন। নির্জন অরণ্যে বাস করিতেন বলিয়া তিনি ‘শাহ কবির বিয়াবানী’ (‘বিয়াবানী’ অর্থ আরণ্যক) নামে এতৎপ্রদেশে খ্যাত হইলেন। সাধারণতঃ লোকে তাঁহাকে ‘রাজা বিয়াবানী’ বলিত, কারণ, ধান্দেশের নৃপতি হইয়াও তিনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসী ফকির হইয়াছিলেন। শাহ কবির বিয়াবানীর তিন পুত্র জন্মে; তাঁহাদের নাম

\* “Taylor’s Topography and Statistics of Dacca”

† J. A. S. B. Vol. LXIV. P. 227,

\* “প্রবাসী,”—১৩১৫, অগ্রহায়ণ।

† শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়। ঢাকা রিভিউ ও সপ্তিলন—১৩১৯ পৌষ।

পাহাড়ী শাহ, শাহ দাউদ এবং শাহ আমির। তাঁহারাও পিতার স্থায় ধার্মিক এবং বিয়াবানীর বংশবিস্তৃতি। শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। পাহাড়ী শাহ এবং শাহ আমির নিঃ-সন্তান ছিলেন; দ্বিতীয় ভ্রাতা শাহ দাউদের শাহ পদল, শাহ সুলতান, এবং শাহ কুতবউদ্দীন নামক তিন পুত্র জন্মে। শাহ পদল হইতে ক্রমশঃ এই বংশ বৃদ্ধি হইতে থাকে; এবং অষ্টাবিধি শাহ কবির বিয়াবানীর বংশধরগণ উত্তরখান গ্রামে বাস করিতেছেন। এই বংশের বংশাবলী ইহাদের নিকট রক্ষিত আছে।

উত্তরখান গ্রামে শাহ কবির বিয়াবানী এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পাহাড়ী শাহের সমাধিস্থান অষ্টাবিধি বর্তমান আছে। একটী বৃহৎ বেদীর বিয়াবানী ও তাঁহার উপর পাশাপাশিভাবে এই বংশধরগণের সমাধি-দুইটী সমাধি বেদিকা অবস্থিত। ক্ষেত্রনিচয়। ইহা হইতে কয়েক গজ দূরে বিয়াবানীর স্ত্রীর এবং তাঁহার পৌত্র শাহ পদলের সমাধিবেদিকাঘরের ভগ্নাবশেষ পাশাপাশিভাবে বর্তমান। তাহার নিকটেই শাহ কবির বিয়াবানীর কনিষ্ঠ পুত্র শাহ আমিরের সমাধি। এই সমাধি ক্ষেত্রসমূহের অদূরে একটী ক্ষুদ্র ইষ্টকনির্মিত কুঠীর ভগ্নাবশেষ বর্তমান। উহার ছাদ পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু জীর্ণ প্রাচীরগুলি অষ্টাবিধি দণ্ডায়মান আছে। ইহা শাহ কবির বিয়াবানীর মসজিদ ছিল। উত্তরখান গ্রামের যে স্থানে এই সমাধিক্ষেত্র নিচয় ও মসজিদের ভগ্নাবশেষ বর্তমান, তাহাকে লোকে শাহ কবির বিয়াবানীর দরগা বলে। এই স্থানটী বহু প্রাচীন বৃক্ষাদিতে ঢাকা; উহার পার্শ্বে একটী দৌরিকা আছে।

উত্তরখানবাসী শাহ কবির বিয়াবানীর ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং অন্তত শক্তিসমূহের খ্যাতি চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইল। বলাধিপতি ইলিয়াস শাহ তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। সাধুর ভরণ পোষণের জন্য

তিনি অনেক ভূমি তাঁহাকে নিষ্কর দান করেন। শতখণ্ডে ছিন্ন জীর্ণ দানপত্র-ইলিয়াস শাহপ্রদত্ত খানি অষ্টাবিধি বিয়াবানীর বংশধরগণ রক্ষা করিতেছেন। উহা এত জীর্ণ যে উহার পাঠোদ্ধার করা অসম্ভব। সনন্দের যে স্থানটীতে রাজকীয় শিলমোহর ছিল, তাহা এখনও কিঞ্চিৎ স্পষ্ট আছে। অসংলগ্ন হইলেও উহা ইহাতে সুলতান সামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহের নাম উদ্ধার করা যায়।

শাহ সুলজা যখন বঙ্গদেশের শাসনকর্তা ছিলেন, তখন বিয়াবানীর বংশধরগণ যে সম্পত্তি বহুকালাবধি নিষ্কর ভোগ করিতেন, তাহা স্বেচ্ছায় গাজীগণের জমিদারি ভাণ্ডার্য পরগনার অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে গাজীগণ তাহা আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শাহ সুলজার সহকারি জয়মুদ্দিন মহম্মদ আলতাফ সরমদি সুলতান ইলিয়াস শাহ প্রদত্ত সনন্দ পরীক্ষা করিয়া এক অনুমতি পত্র দ্বারা তাহাদিগকে ঐ জমি পূর্ববৎ ভোগ করিবার অধিকার প্রদান করেন। শাহ সুলজার ইলিয়াস শাহের সনন্দের রাজত্ব কালের ঐ সনন্দ বিয়াউল্লেক্ষযুক্ত শাহ সুলজার বানীর বংশধর শাহ মুজাফর-রাজত্বকালে বিয়াবানীর হোসেন বর্জুক অষ্টাবিধি রক্ষিত বংশধরগণকে প্রদত্ত সনন্দ। হইতেছে। ইলিয়াস শাহ প্রদত্ত সনন্দখান। বিনষ্ট হইলেও এই সনন্দদ্বারা তাহার অভাব কতকটা মোচন হইবে, কারণ ইহাতে পূর্ব সনন্দের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। শাহ কবির বিয়াবানীর বংশধরগণ অষ্টাবিধি তাঁহাদের সম্পত্তি নিষ্কর ভোগ করিতেছেন। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট উহাদের সনন্দসমূহ দর্শন করিয়া তাহাদিগকে পূর্ববৎ নিষ্কর সম্পত্তি ভোগ করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন।

সনন্দখানার শীলমোহরে লিখিত আছে—“শাহসুলজা মহম্মদি, তদীয় পুত্র (?) জয়মুদ্দিন মহম্মদ আলতাফ সর-



বাবি ১৯১

সদি।” বাঙ্গালাতে এই সনন্দের মর্ম নিয়ে প্রদত্ত হইল—  
‘হজুরের এই আদেশ হইল—

যখন খান্দেশি বিয়াবানীর বংশধর কৈশরের যৌক-  
দমা সংক্রান্ত প্রকৃত ব্যাপার হজুরের গোচরার্থ নিবেদিত  
হইল যে কৈশর ব্যতীত (অপর কেহ) বিরোধীয় ভূমির  
মালিক নহে, তখন হজুরের আদেশানুযায়ী এই স্থির  
হইয়াছে যে, পূর্বোক্ত ব্যক্তির এবং তাহার ভ্রাতৃগণের  
ও আত্মীয়গণের সাহায্যার্থ ভাওয়াল পরগণার অন্তর্গত  
(বিরোধীয়) জমিদারি খুর্দ (ছোট) উত্তরখানের  
অন্তর্ভুক্ত করা হইল। গাজির নিদেশে তদীয় কর্মচারী  
(বিচারপতি) মাননীয় মহম্মদ  
শাহ সুজার রাজত্বকালে হায়াতের নিকট এই নালিশ  
প্রদত্ত সনন্দের বঙ্গানুবাদ। রুজু করে যে খাপর খান্দেশি  
আমাদের (সরকারী) জমি  
বলপূর্বক দখল করিতেছে। অতঃপর, আমীন পাঠাইয়া  
মোকদ্দমার তদন্ত করিয়া জানা গেল যে, পূর্বোক্ত ব্যক্তি  
(কৈশর খান্দেশি) সুলতান ইলিয়াস শাহের আমল  
হইতে (পুরুষানুক্রমে) ঐ জমি ভোগ করিতেছে।  
তদন্তের পরে (বিচার হইলে) পূর্বোক্ত ব্যক্তির (খান্দেশি)  
অধিকারে বিচারকের হুকুমনামা আছে। উত্তর-  
খান নামক স্থান ভাওয়াল পরগণার অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে  
উহার সীমা লইয়া সর্বদাই জামদারের সহিত দাঙ্গা  
হান্ধামা ও বহু খুন জন্ম হয়। সুতরাং আমরা ইচ্ছা  
করি যে, (বিরোধীয়) ভূমি পূর্বোক্ত ব্যক্তির (খান্দেশির)  
পুত্রের নামে (সরকার হইতে) লিখিয়া দেওয়া হউক।  
উহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, মোজা খুর্দ (ছোট) উত্তরখান  
বিরোধীয় ভূমির অন্তর্ভুক্ত। ঐ জমি তহশীলদারগণ  
তাহাদের নিজের অধিকারে রাখিয়াছে।”

সনন্দের শেষ দুই পংক্তি নিতান্ত জীর্ণ হওয়াতে উহার  
অধিকাংশই পাঠযোগ্য নহে, সুতরাং উহার মর্মার্থ দেওয়া  
গেল না। ঐ স্থানে “১০৬৬ ফসলি” এই তারিখটি দৃষ্ট

হয়। মুসলমানগণের মধ্যে ফসলি অর্দ্ধ অত্য়পি প্রচলিত  
আছে। ১০৬৬ ফসলি সনে ১৬৫২ খৃষ্টাব্দ ছিল।

এই সনন্দে উত্তরখানবাসী খান্দেশি বিয়াবানীর নাম  
এবং তাঁহাকে ইলিয়াস শাহ সনন্দ দ্বারা ভূমি দান  
করিয়াছিলেন, এবং সেই ভূমি বিয়াবানীর বংশধরগণ  
শাহ সুজার সময়ে ভোগ করিতেন, প্রভৃতি বিষয়ের  
স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সুতরাং, ইলিয়াস শাহের সময়ে  
ঢাকা একডালার সন্নিকটে বিয়া-  
উত্তরখানের বিয়াবানী ও বানী নামক একজন সাধু বাস  
ঐতিহাসিক বিয়াবানী করিতেন; ইলিয়াস শাহ তাঁহাকে  
অভিন্ন; সুতরাং, ঢাকা ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন বলিয়া তাঁহার  
একডালাও ঐতিহাসিক ভরণপোষণার্থ ভূমি দান করিয়া  
একডালা অভিন্ন। ছিলেন; এবং এই বিয়াবানীর  
সমাধিমন্দির অত্য়পি ঢাকা

একডালার সন্নিকটস্থ উত্তরখান নামক স্থানে অবস্থিত,  
ইত্যাদি বিষয় স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইতেছে। সুতরাং  
উত্তরখান বাসী বিয়াবানী ও মুসলমান ঐতিহাসিকগণ  
বর্ণিত বিয়াবানী যে অভিন্ন ব্যক্তি ইহাই বিশেষ সম্ভবপর  
বলিয়া বোধ হয়। মিষ্টার বেভারিঞ্জ লিখিয়াছেন,  
“বিয়াবানার বাসস্থান যে একডালা দুর্গের সন্নিকটে ছিল  
তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই, কারণ হাজি ইলিয়াস  
একডালা দুর্গ হইতে বাহির হইয়া এই সাধুর অন্ত্যেষ্টি  
ক্রিয়ায় যোগদান করিয়াছিলেন। সুতরাং বিয়াবানীর  
সমাধিক্ষেত্র কোথায় অবস্থিত, তাহা নির্ণয় করিতে  
পারিলেই একডালার অবস্থিতি সম্বন্ধে তর্কবিতর্কের  
সুমাধাস্য হইতে পারে।” বিয়াবানীর সমাধিক্ষেত্র যে  
উত্তরখান নামক স্থানে অবস্থিত, উপরে আমরা তাহা  
প্রদর্শন কারতে সচেষ্ট হইয়াছি। সুতরাং, উত্তরখানের  
সন্নিকটস্থ ঢাকা একডালাতেই যে ইতিহাস-বিখ্যাত  
একডালা দুর্গ অবস্থিত ছিল, তাহাই প্রতীয়মান হইতেছে।

হুতীস্রতঃ, এক ঢাকা জেলা ভিন্ন অত্র যে যে  
স্থানে একডালা দুর্গের স্থান নির্দেশের চেষ্টা করা হইয়াছে,

তাহার কুত্রাপি একডালা নামের, এবং এমন কি উহার সাদৃশ্যযুক্ত অন্য কোন নামের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নাই। সাম্‌স্-ই-সিরাজ আফিক তদীয় “তারিখ-ই-ফিরোজশাহী” গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

‘ফিরোজ শাহ পাণ্ডুরা পৌছিলেন; তথায় ফিরোজ শাহের নামে খোতবা প্রচারিত হইল। সুলতান ফিরোজ শাহ একডালাকে আজাদপুর এবং সহর পাণ্ডুরাকে ফিরোজাবাদ আখ্যা প্রদান করিলেন। \* \* \* (তদবধি) আজাদপুর ওরফে একডালা, ফিরোজাবাদ ওরফে পাণ্ডুরা।’

এই বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সম্রাট ফিরোজ শাহ একডালাকে আজাদপুর আখ্যা প্রদান করেন। এই আজাদপুর নামক কোন স্থানের অস্তিত্ব অত্য়পি আছে কি না, তদ্বশ্যে কেহ বিশেষ কোন অনুসন্ধান করেন ঢাকা একডালার সন্নিকটে নাই। ঢাকা একডালা সাম্‌স্-ই-সিরাজবর্ণিত ‘আজাদ- অঞ্চলে অনুসন্ধান পুর’ আবিষ্কার। জানিতে পারিলাম যে,

একডালার অনতিদূরে ‘আজাদপুর’ নামক একটা স্থান অত্য়পি বর্তমান আছে। মেজর রেগেলের সপ্তদশ সংখ্যক মানচিত্রে ঐ স্থান একডালা হইতে কিঞ্চিৎ দক্ষিণ পূর্বদিকে ‘সাজাদপুর’ নামে চিত্রিত আছে। বলা বাহুল্য, আজাদপুর অর্থাৎ হাজাত-পুরকেই মেজর রেগেল শুদ্ধ করিয়া ‘সাজাদপুর’ লিখিয়াছেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বর্ণিত একডালা ও আজাদপুর এই উভয় নামই ঢাকা জেলাতে অত্য়পি প্রায় অবিকৃত অবস্থায় বর্তমান, অথচ একডালার অত্য়ন্ত যে সমস্ত অভিনব স্থান নির্দেশিত হইয়াছে, তাহার কোন স্থানেই একটা নামেরও চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই, এই মতই সমর্থিত হইতেছে।

চতুর্থতঃ, ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারনী একডালার বর্ণনায় তদীয় গ্রন্থ “তারিখ-ই-ফিরোজ-শাহী”তে লিখিয়াছেন—

“উহার (একডালার) একদিকে জল (নদী), এবং অপরদিকে জঙ্গল।” বারনী ও মুসলমান ঐতিহাসিক- ‘রিয়াজ’-প্রণেতা আরও বলিয়া-গণের একডালা বর্ণনা। ছেন যে, একডালা অঞ্চল বর্ষাকালে জলপ্লাবিত হইয়া যায়।

সুতরাং বর্ষাকাল আগতপ্রায় দেখিয়া ফিরোজ শাহ ইলিয়াসের সহিত সন্ধি করিয়া দিল্লী অভিযুগে যাত্রা করিলেন। সাম্‌স্-ই-সিরাজ-আফিক তদীয় গ্রন্থে এই স্থানের চতুর্দিক জলবেষ্টিত থাকায় ইহাকে ধীপাকার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণের বর্ণনার সহিত ঢাকা একডালার প্রাকৃতিক সংস্থানের সর্বাংশে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বানার ও লক্ষ্মা নদীদ্বয়ের প্রায় সঙ্গমস্থলে অবস্থিত হওয়াতে একডালা ঠিক একটা দুর্গোপযোগী স্থান। উহার অব্যবহিত পশ্চিম হইতেই ভাওয়ালের নিবিড় অরণ্য আরম্ভ হইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। বর্ষাকালে ঢাকা জেলার অধিকাংশ স্থান জলপ্লাবিত হইয়া যায়, তাহা সর্বজন বিদিত। ঢাকা একডালার পার্শ্বস্থিত ভূখণ্ড পূর্ব,

ঢাকা একডালার প্রাকৃতিক পশ্চিম ও দক্ষিণে লক্ষ্মা সংস্থানের সহিত মুসলমান ও বানার নদীদ্বয় দ্বারা ঐতিহাসিকগণের বর্ণনার সাদৃশ্য বেষ্টিত, এবং উহার উত্তরেটোক নদী প্রবা-

হিত। উক্ত ভূখণ্ড প্রকৃত পক্ষেই একটা দ্বীপ,—মেজর রেগেলের মানচিত্রে দর্শনেই তাহা উপলব্ধি হইবে। সুতরাং, ঢাকা একডালার প্রাকৃতিক সংস্থান মুসলমান ঐতিহাসিকগণের বর্ণনার সহিত অবিকল মিলিয়া যায়। এই সমস্ত যুক্তির বলে আমরা এই মত স্থাপনে প্রয়াসী যে, ঐতিহাসিক একডালা দুর্গ ঢাকা জেলাস্থ একডালাতেই অবস্থিত ছিল।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর।

## হাঁড়ি চাঁচা

হাঁড়িচাঁচা কিন্তু কোন দিনই গায়ক প্রণীভুক্ত নহে। অথচ “গায়ক পাখী” নামক প্রবন্ধ লেখকের হাতে পড়িয়া তাহার এই উন্নতি হইতেছে। হাঁড়ি চাঁচা গায়ক পাখীর প্রণীভুক্ত হইতে পারে কি না অতঃপর পাঠকগণ বিচার করিবেন, কিন্তু হাঁড়িচাঁচা গায়ক পাখী নহে খেয়ালের জোরে এই কথাও বলা চলে না।

দূর পাড়ার গায়ের অনঙ্গর মূর্খও হঠাৎ দুই একটা সুন্দর কবিতা রচনা করে। আমাদের হাঁড়িচাঁচা সেই প্রণীর। তবে ইহাদের শব্দ বড় রুক্ষ, এবং ইহারা অত্যন্ত একাকী থাকিতে ভালবাসে বলিয়াই ইহাদের পক্ষে অনেকটা মোক্তারী করিতে হইল। নতুবা হাঁড়িচাঁচা ‘গায়ক পাখীর’ পেছনে হইলেও দলের প্রান্তেই একটু স্থান পাওয়ার যোগ্যতা রাখে।

হাঁড়িচাঁচার আরও কতিপয় কলঙ্ক আছে। ইহাকে আমাদের দেশে ‘কাঁচ-কাঁচা’ বলে। ঐ রকম বিকট আওয়াজ করে বলিয়াই ইহার এই প্রতিমধুর নাম হইয়াছে। ঘরের আশে পাশে চীৎকার করিলে বাড়ীর শোকেরা ঢিল ছুঁড়িয়া ইহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। ইহাদের শব্দ না কি কলহের হুচনা করে। কোন কোন স্থানে ইহাকে ‘টাকুয়া লেজী’ নামেও অভিহিত করা হয়।

হাঁড়ি চাঁচার মাথার রঙ ফিকে কালো। চক্ষু দুইটা উজ্জল এবং প্রথর দৃষ্টিসম্পন্ন। ঠোঁট বেঁটে, অত্যন্ত শক্ত এবং ধারাল। ঠোঁটের বর্ণ ধোঁয়াটে। প্রায় সর্বদায় বর্ণই পাটল। স্থানে স্থানে ফিকে কালোর মিশ্রণে একটু গাঢ়। ডানার বর্ণ ফিকে কালো—তাহার উপরের দিকে কয়েকটা জঁবৎ হলুদে রঙের পালথ আছে। ডানার মাঝামাঝিও কয়েকটা ঐরূপ বর্ণের ও সাদা কয়েকটা পালথ আছে। ইহাদের পুচ্ছ অতি দীর্ঘ—প্রায় ১৪।১৫ ইঞ্চি লম্বা হয়। পুচ্ছদেশে ১২টা পালথ। মধ্যের পালথ দুইটাই সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ। অন্ত্যন্ত পালথ-

গুলি এই দুই পালথের মাঝামাঝি হইতে ক্রমে ছোট। দীর্ঘ পালকদ্বয়ের অগ্রভাগ এক পক্ষমাংশ কালো। তাহার উপরের অংশ ফিকে হলুদে ও পাটলের মিশ্রণে উৎপন্ন এক রং বিশিষ্ট। পুচ্ছের ছোট পালথ গুলির অর্ধেকের বেশীই কালো, বাকী গুলি ফিকে পাটল। পা দুইটার রঙ মেটে। প্রত্যেক পা’র চারিটি নখ শক্ত এবং তীক্ষ্ণ।

হাঁড়িচাঁচা একাকী বা পতি-পত্নীতে মিলিয়া বিচরণ করে। দলে মিশিয়া থাকা ইহাদের বড় একটা অভ্যাস নাই। তবে কখন কখন ২।৪টা অতিরিক্ত বন্ধুবান্ধবের সম্মিলন হয় বটে, তাহাও অতি অল্প সময়ের জন্য। ইহাদের দাম্পত্য প্রণয় গভীর, কিন্তু সময় সময় পতি-পত্নীতে যুদ্ধও হইয়া থাকে। এমন কি এই দাম্পত্য-কলহে হাঁড়িচাঁচা রাগের চোটে কখন কখন প্রণয়ীর জীবন সংহার করিয়া ফেলে। অবশ্য এরূপ শোচনীয় দুর্ঘটনা খুব অল্পই ঘটয়া থাকে।

হাঁড়ি চাঁচা হিংস্র প্রকৃতির পক্ষী। ইহারা খুঁজিয়া খুঁজিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখীর বাসা বাহির করে এবং এই সকল বাসার ডিম বা ছানাগুলি ধাইয়া ফেলে। তাল গাছের ডাঁটার ফাঁকে ‘চামড়ড়া’, ‘নাকাটা’ প্রভৃতির বাসা থাকে। হাঁড়ি চাঁচা দুই চারি দিন পর পর আসিয়া এক একবার তাল গাছে ঝাঞ্জের অল্পসন্ধান করে। হঠাৎ মাটিতে পড়িয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেড় ধরিয়া লইয়া যায়। কীট, পতঙ্গ, ছোট পাখী প্রভৃতি দ্বারা ইহারা অধিকাংশ সময় জঠর-জ্বালা নিবারণ করে। কলা এবং অন্যান্য ফলেও ইহাদের অরুচি নাই।

গভীর জঙ্গলে উচ্চরন্ধের চূড়ায় ইহারা বাসা নির্মাণ করে। ফাল্গুনের শেষ ভাগে ডিম পারে এবং প্রায় দেড়-মাস পরে ছানাগুলিকে উড়িতে শিখায়। ইহারা প্রায়শঃই দুইটা ডিম প্রসব করে। কদাচিৎ ৩টা ডিম প্রসব করিতেও দেখা যায়। ডিমের রঙ্গ নীলাভ সাদা তাহাতে ফিকে ম্যাজাণ্টো রঙের ছিটা।

ইহারা সময় সময় নির্জনে বসিয়া রাগিনী আলাপ

করিয়া থাকে। ইহাদের সেই সঙ্গীত তেমন প্রীতিকর না হইলেও সঙ্গীত শ্রেনীতে স্থান পাওয়ার দাবী করিতে পারে।

হাঁড়িটাচা এক গাছ হইতে অগ্নি গাছে উড়িয়া যাইবার সময় ক্যাচ্ ক্যাচ্ ক্যাচ্ করিয়া ডাকিতে থাকে এবং সঙ্গিনী তদনুসারে তাহার অনুসরণ করে।

অগ্ন্যস্ত্র পাখীর জ্ঞান ইহাদের বংশও ভ্রাস পাইতেছে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

## চন্দ্রকান্ত প্রসঙ্গ

সেরপুরের স্থখ-দুঃখ

( ৩ )

পিতৃ-বিয়োগের পর ৮নব কুমার চৌধুরী মহাশয়ের বড় আদরের “চুড়ামণি” বিক্রমপুর ও নবদ্বীপের পাঠ সমাপন করিয়া “তর্কালঙ্কার” উপাধি ভূষণে ভূষিত হইয়া সেরপুর ফিরিয়া আসিলেন। পিতৃ-বিয়োগ তর্কালঙ্কার মহাশয়কে একান্ত ব্যথিত করিয়াছিল সত্য, কিন্তু কর্তব্য ও অধ্যবসায়-ব্রষ্ট করিতে পারে নাই। মহাআদিগের চরিত্রের এটা একটা বিশিষ্ট লক্ষণ। তর্কালঙ্কার মহাশয় পঠদশায় একান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং সে তপস্বী অভ্যস্ত কঠোরতর হইলেও তাহাকে তিনি জীবনের প্রধান ব্রত বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। আমরা এ বিষয় তাঁহার ‘সংক্ষিপ্ত জীবনী’ প্রস্তাবে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। তর্কালঙ্কার মহাশয় দেশে আসিয়া মাতৃদেবীর আদেশ ক্রমে বিবাহ করিলেন। তাঁহার ১ম বিবাহ ময়মনসিংহ জেলারই আন্তজীয়া গ্রামের ৮তোলানাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের কন্যার সহিত হয়। কিন্তু বিধাতার নির্মল্ল অন্তরঙ্গ, তর্কালঙ্কার মহাশয় অতি অল্পকালের মধ্যেই পত্নীবিয়োগ যন্ত্রণা অক্লান্ত করিলেন। তাঁহার

প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হইল, জননী ব্রহ্মময়ী বধু-বিয়োগে কাতরা হইলেন, পুত্রের ক্রেশ সন্তাবনায় আরও অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি অবিলম্বে পুত্রের মতামতের অপেক্ষা না করিয়া আর একটি পাত্রী স্থির করিলেন। পাত্রীটী উক্ত জেলারই রামপুর গ্রামের স্বর্গীয় কালী ভৈরব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যা। যথাসময়ে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইয়া গেল, জননী ব্রহ্মময়ী নববধূলাভে ভাঙ্গা সংসার আবার জোড়া দিলেন, তাঁহার বিষম মুখ আবার প্রসন্ন হইয়া উঠিল; কিন্তু তর্কালঙ্কার মহাশয়কে তিনি সুখী করিতে পারিয়াছিলেন কি না জানিনা, তবে তর্কালঙ্কার মহাশয় এমনই মাতৃভক্ত ছিলেন যে, মাতৃদেবী অন্ততঃ একদিনের জ্ঞাও পুত্রের বিষম মুখ দেখিতে পান নাই। এই স্ত্রীর গর্ভে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের একটি পুত্র ও চারিটা কন্যা সন্তান জন্মে। ইনিই তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত দুর্গা সন্দর। কন্যা চারিটির মধ্যে একটির নাম অজ্ঞাত, তিনি শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। অগ্নি তিনটির নাম অন্নদা দেবী, রাজকুমারী দেবী, ও গিরিবালা দেবী। ৩গিরিবালা দেবী তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মৃত্যুকালেও তাঁহার নিকটেই ছিলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ গিরিবালা দেবী অকালে বিধবা হন, তর্কালঙ্কার মহাশয় কন্যার বৈধব্য যন্ত্রণায় নিজেও বড় আঘাত পাইয়াছিলেন। তিনি কন্যাকে প্রায় সন্ধ্যে রাখিতেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মৃত্যুর কতক দিন পরে গিরিবালা দেবীও গঙ্গা লাভ করেন। গিরিবালা দেবীকে আমরা জ্যেষ্ঠা সহোদরার মত ভক্তি করিতাম, তিনিও আমাদের সোহোদর ভূমি মনে করিতেন। তাঁহার স্বভাব অতি পবিত্র ও মধুর ছিল। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের এই কন্যাকে তাঁহার মনোরঞ্জিত ছায়া লক্ষিত হইত।

জননী ব্রহ্মময়ী দেবী এবং সেরপুরের তদানীন্তন বিদ্যোৎসাহী, বিদ্যানু ও বদান্ত জমিদার স্বর্গীয় নবকুমার চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র স্বর্গীয় গোবিন্দ কুমার চৌধুরী

মহাশয়, প্রাচীনগীয়া শ্রীযুক্ত তারামণি চৌধুরাণী মহাশয় ও তৎপুত্র স্বয়ং বিদ্যানু ও বিজ্ঞানসুধাঙ্গী ও দানশীল জমিদার স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের আগ্রহ ও সাহায্যে তর্কালঙ্কার মহাশয় স্বর্গে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রতিভা পূর্বেই চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, দেশে চতুষ্পাঠী স্থাপনের পর নানাস্থানে রাজা ও জমিদার বাড়ীতে বিচার সভায় পাণ্ডিত্য ও বিচার নৈপুণ্যে সেই প্রতিভার প্রভা আরও বিস্তৃতি লাভ করিল। তর্কালঙ্কার মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে অধ্যাপনা ও স্বয়ং অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের এমনই স্বীভাষা যে, কিছুকাল পরে তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রীও যত্নামুখে পতিত হইলেন। শিশু সন্তানগুলি লইয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় মহাবিপদে পড়িলেন। এদিকে জননী ব্রহ্মময়ী দেবী শোক করিবেন না ছোট ছোট শিশুগুলিকে রক্ষা করিবেন? তিনি মহাক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলেন।

মাতার ক্লেশ দর্শনে তর্কালঙ্কার মহাশয় ব্যথিত হইলেন। আবার জননীর অমুরোধে দার পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইলেন। তৃতীয় বিবাহ ‘মনা’ গ্রামে সম্পন্ন হয়। দৈবের এমনই নিরীক্ষা সেই স্ত্রীও বেশী দিন বাঁচিলেন না। পুত্র ভাবিতে লাগিলেন, ‘জননীর ক্লেশ দূর হইল না,’ মাতা ভাবিতে লাগিলেন, ‘পুত্র স্মৃতি হইয়া সংসার ধর্ম করিতে পারিল না।’

এদিকে শিশুগুলির প্রতিপালন করাও একা জননীর পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। এই বার মাতৃদেবীকে কিঞ্চিৎ ‘জৈদ’ প্রকাশ করিতে হইল, এমন অতি সহর আর একটি পাণ্ডী স্থির করা হইল। উক্ত জেলায় কানীহারী গ্রামের বর্ডমান স্মার্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রুক্ষকুমার স্মৃতিভীষণ মহাশয়ের ভগিনীকে ব্রহ্মময়ী দেবী বধুরূপে গ্রহণ করিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ভাঙ্গা সংসার জোড়া লাগিতে না লাগিতেই ইনিও কালগ্রাসে পতিত হইলেন। এত কষ্টও লোকে সহ করিতে পারে? ক্রমে

চারিটা স্ত্রীর বিয়োগ—তথাপি তর্কালঙ্কার মহাশয় এক দিনের ক্ষতও অধ্যাপনা ত্যাগ করেন নাই। সংসারের তীব্র ষাট প্রতিঘাতে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে হইতেও একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল না। তিনি চিরকাল ধীর-স্বভাব, কোন বিপদে তাঁহাকে অস্থির হইতে দেখা যায় নাই। এই নিদারুণ শোক তর্কালঙ্কার মহাশয় বুক পাতিয়া লইলেন, কিন্তু জননী ব্রহ্মময়ী আর সহ করিতে পারিলেন না। তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি এত চেষ্টা করিলেন তবু পুত্রকে স্মৃতি করিতে পারিলেন না। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার অল্প পুত্রটিও কালগ্রাসে পতিত হইলেন। বড় উপার্জনশীল রামচন্দ্রও তাঁহাকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া চলিয়া গিয়াছেন, এতদিন পরে তাঁহার বিধবা পত্নীও স্বামীর পথ অনুসরণ করিয়া শাশুড়ীকে একেবারে অসহায়া করিয়া গেলেন। মাতৃদেবীর চোখের জল আর থামিতেছে না। পত্নী-শোক, ভ্রাতৃ-শোক তর্কালঙ্কার মহাশয়কে কিছু বিচলিত করিবার উপক্রম করিল। ভ্রাতৃজায়া তাঁহার গৃহের লক্ষী স্বরূপিনী ছিলেন, তিনি মাতৃদেবীর ও শিশু সন্তানগুলির সেবা শুশ্রূষা করিতেন, ছাত্র ও পরিবার বর্গের পাক-সাকের সাহায্য করিতেন, তিনিও গেলেন! তর্কালঙ্কার মহাশয়ের একটি অতি সুন্দরী কন্যা শিশুকালেই ইহা-দেবরই সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেল, মাতৃদেবীরও শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তিনি এখন প্রায়ই পীড়িতা থাকেন; কষ্টের সীমা নাই, তবু কি মানুষ স্থির থাকিতে পারে? চক্ষু হৃদয়ের সান্ধনা করিবার শক্তি তাঁহাকে ভগবানই দিয়া-ছিলেন, তিনি সেই শক্তির সাহায্যে সকল আলা, সকল দুঃখশোক সহ্য করিয়া লইলেন, চিত্ত-চাঞ্চল্য দূর করিতে সমর্থ হইলেন; ভগবতী বীণাপাণি তাঁহার অমৃতনাদিনী বীণার মধুর স্বন্ধারে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রাণ সর্বদা পূর্ণ করিয়া রাখিতেন, তিনি সকল আবার অমোঘ ঔষধ বীণা-বন্দনা জীবনের সার করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি নীরবে ও সরবে বাঁধীর ‘বন্দনা-গীতির’ অনুশীলন

করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি কাব্য রচনায় মনো-নিবেশ করেন। তাঁহার পরমবন্ধু হরচন্দ্র চৌধুরী ও গোবিন্দকুমার চৌধুরী মহাশয়দ্বয় তাঁহাকে পরম উৎসাহিত করেন। তাঁহারা অনেক সময় নিজেদের মূল্যবান সময় বিয়োগবিধুর পরম বন্ধুর মনোরঞ্জনের জন্ত ব্যয়িত করিতেন। অকৃত্রিম বন্ধুগণের সাহায্যে বিত্তার্থীগণের অধ্যাপনা ও কাব্য সৌন্দর্য্যের উপাসনায় তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। চিন্তাশীল ব্যক্তি অনেকেই বলিয়া থাকেন “শোকেরদ্বারা কবিতা চিত্তক্ষেত্রে কবিতার বীজ অতি সমৃদ্ধ অঙ্কুরিত হয়। কথাটা অনেকটা সত্য। আমরা ‘উদ্ভাস্ত প্রেমের’ ভায় গন্ত-সাহিত্য এবং ‘এয়ার’ ভায় পদ্ম সাহিত্য এক একটা পুণ্যপ্রতিমার শোকশেলে আহত হৃদয়েরই দানরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ‘সতীপরিণয়’ নামক মহাকাব্যখানি সেই শোকাঙ্গপুতলেখনীর সাহায্যেই প্রকাশ পাইয়াছে। ‘সতীপরিণয়’ নামক মহাকাব্যে আমরা পত্নী-শোকাহত হৃদয়ের করুণ বিলাপের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। এই সময়ে তাঁহার আরও কয়েকখানি সংস্কৃত কাব্য রচিত হইয়াছিল। চন্দ্রবংশ, কৌমুদী সুধাকর প্রভৃতি উৎকৃষ্ট মহাকাব্য ও দৃশ্যকাব্য দুইখানি যে কোন মহাকবির অতুৎকৃষ্ট মহাকাব্য ও দৃশ্যকাব্যের সহিত তুলিত হইতে পারে। তা ছাড়া ‘আনন্দতরঙ্গিনী’ প্রভৃতি কতকগুলি শোকসান্ধনাপ্রদ শান্তিরসপূর্ণ স্তোত্রও বিরচিত হয়; এবং সেই সময়েই ‘তত্ত্বাবলী’ নামক একখানি উৎকৃষ্ট পদার্থ তত্ত্বগ্রন্থ রচনা করেন। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অধিকাংশ পুস্তকই তাঁহার সেরপুর অবস্থিতি সময়ে রচিত। যাহা হউক তর্কালঙ্কার মহাশয় চতুর্ধ্ব বার দার-পরিগ্রহ করিয়াও সংসারে শান্তি পাইলেন না। তাঁহার সংসারিক ক্লেশ তেমনই রহিয়া গেল। জননী ব্রহ্মময়ী আবার জেদ ধরিলেন পুত্রকে আবার বিবাহ করাইয়া সংসারদুর্গে নিয়োজিত করিবেন, সুখশান্তির অধিকারী

করিয়া। তুলিবেন—সংসারে তাঁহার এই একটিমাত্র পুত্র আর সকলেই ত তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছেন; সেই একমাত্র পুত্রের বেদনাবিশগ্নমুখ, মা কি কখনও দেখিয়া সহ্য করিতে পারেন? জননী পুত্রকে বুঝাইয়া বলিলেন, “বাবা, আবার বিবাহ কর, সংসারী হও, আমার বড় কষ্ট হইতেছে, আমি আর এই নিয়া পারি না, ছেলেমেয়েগুলি ‘মা মা’ বলিয়া কাঁদে, শুনিয়া আমার বুক ফাটিয়া যায়।”

তর্কালঙ্কার মহাশয় দেখিলেন বেদনা-ক্লিষ্টা জননীর শীর্ণ কপোলদ্বয় চক্ষের দলে ভাসিয়া যাইতেছে,—মাতৃ-ভক্ত সন্তান আর কি স্থির থাকিতে পারেন? তর্কালঙ্কার মহাশয় মাতৃদেবীর ক্লেশ নিবারণের জন্ত আবার বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। আবার বিবাহের আয়োজন হইল, পুত্রবৎসলা জননী আবার হাসিকান্নার মধ্যে নবধু গৃহে আনিলেন। এই বিবাহই তর্কালঙ্কার মহাশয়ের শেষ বিবাহ। এই পঞ্চম দ্বার গর্ভে আমাদের পরম মেহাস্পদ কাব্যাহুরাগী ও কবি শ্রীমান্ তারাসুন্দর ও একটা কত্যা জন্মগ্রহণ করেন। এই বিবাহ করাইয়া মেহময়ী জননী ব্রহ্মময়ী দেবী আর বেশী দিন সংসার বাস করিতে পারিলেন না, তাঁহার দেহ শয্যালয় হইল, রোগে তিনি মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন, মাতৃভক্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় ভগিনীদের সঙ্গে প্রাণপণে জননীর সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু মা বুঝি আর বাঁচিলেন না, একদিন প্রিয় পুত্র-পৌত্র প্রভৃতিকে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিয়া রত্নগর্ভা ব্রহ্মময়ী দেবী অনন্ত ধামে চলিয়া গেলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় মাতৃহীন হইলেন। যথাকালে সমারোহের সহিত জননীর শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। তর্কালঙ্কার মহাশয় জনক জননীর মৃত্যুর পর এক এক বৎসর মহাশুক্র নিপাতজনিত কঠোর নিয়ম সকল প্রতিপালন করিয়াছিলেন। মহাশুক্র নিপাতে এক বৎসর পরাম করা নিবেদন, তাহা শুধু পরের দেওয়া অন্ন খাওয়া নিবেদন মাত্র নহে, পরে পাক করিয়া

আষাঢ় ১৩২১

দিলেও তাহা ভোজন করা যায় না তিনি এইরূপই ব্যবস্থা দিতেন, এবং নিজেও সেই নিয়ম প্রতিপালন করিয়া ছিলেন।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সাংসারিক সুখ কোনও দিনই বেশী কিছু হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। এই সামান্য কয়েকটা বৎসরে তাঁহার কতগুলি শোক হইল, কতগুলি বেদনা তাঁহার মর্ম্মস্থানে কঠোর রেখা আঁকিয়া গেল, তিনি স্তাব-সুখীর বলিয়া নম্বর সংসারের প্রকৃত রহস্যবেত্তা বলিয়া নিজে তত ভাঙ্গিয়া পড়েন নাই। হুঃখ তাঁহাকে শত সহস্র মূর্ত্তিতে আক্রমণ করিয়া দেখিয়াছে কিন্তু শৈলাহত বজ্রের খায় সামান্য ক্ষত করিয়াই প্রতিহত হইয়াছে; আমরা তাঁহাকে অনেক সময় অপ্রবিসর্জন করিতে দেখিয়াছি কিন্তু সুখেও আনন্দে! হুঃখ তাঁহাকে অনেক প্রকারেই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে কিন্তু তাঁহার বিশিষ্টতাটুকু কাড়িয়া লইতে পারে নাই। তাঁহার অধ্যাপনা তেমনই চলিতেছে, তেমনই বঙ্গগণের প্রতি প্রীতি প্রফুল্ল ভাব ও ব্যবহার, গৃহদেবতার অর্চনা, ক্রিয়াকলাপ, দান ধ্যান ও অতিথি সংকার, কিছুই বিপর্যস্ত হয় নাই। ধর্ম্মে অচল বিশ্বাস, সত্যে অটুট দৃঢ়তা, শাস্ত্রে অক্লাণ্ড পরিশ্রম, ও গ্রন্থপ্রণয়নে অসাধারণ আগ্রহ এবং অধ্যবসায়, তাঁহাকে এক যুহুর্ন্তের জ্ঞান পরিত্যাগ করে নাই। তর্কালঙ্কার মহাশয় কনিষ্ঠ রামচন্দ্রের কর্ম্মকুশলতায় পূর্বেই পৈতৃক সম্পত্তির কতক আয় বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, নিজেও অনেকটা আয় বাড়িয়া তুলিলেন, এদিকে ধরচও একান্ত বাড়িয়া উঠিল, ছাত্র ৪০, ৫০টা দুইবেলা আহার করেন, পরিবারও ছোট নহে, তৎপর বিদেশীয় পণ্ডিত বা শিক্ষিত কোন লোক সেরপুরে আসিলে প্রায় তর্কালঙ্কার মহাশয়েরই আতিথ্য গ্রহণ করিতেন।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সেরপুরে অবস্থিতিকালে সেরপুরের সারস্বতকুঞ্জের অগ্ৰহা বড়ই মনোহর ও স্পৃহনীয়

ছিল। ভক্তিভাজন পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় হরমুন্দর তর্করত্ন মহাশয় ও তদীয় সন্নিহিত জ্ঞাতি পূজ্যপাদ পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত দুর্গামুন্দর কৃতিরত্ন মহাশয় প্রভৃতি, তুল্য উন্মত্ত ও অধ্যবসায় সহকারে অধ্যাপনা করিতেন। আরও একটা চতুষ্পাশীতে রীতিমত শাস্ত্রাভ্যুদয় চলিত। তর্করত্ন মহাশয় অতি তেজস্বী ক্ষণজন্মা পুঙ্খব ছিলেন, তাঁহার পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিমত্তা বড়ই প্রখর ছিল। তিনি নিজে অগাধ সম্পত্তির অধিকারী, স্থানীয় অধিকাংশ জমিদারের গুরুদেব, পরন্তু মর্যাদায় সেরপুরের অগ্রণী ছিলেন। কবিরত্ন মহাশয়ের ও পাণ্ডিত্য প্রভৃতি অসাধারণ ও সম্মান অপ্রতিহত। তর্করত্ন মহাশয় বহু সদমুষ্ঠান করিয়াছেন, এবং চরমে কাশী লাভ করিয়াছেন, তাঁহার কয়েকখানি সংস্কৃতগ্রন্থ এখনও বর্তমান আছে।

তর্কালঙ্কার মহাশয় তর্করত্ন মহাশয় ও কৃতিরত্ন মহাশয়কে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন, শাস্ত্র বিষয়ে স্থান বিশেষে মতামতের বিভিন্নতা থাকিলেও তাঁহারা তিন জনেই তিনের প্রতি বিশেষ আস্থাভাবন ছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় 'স্বতি চন্দ্রালোক' সংকলন সময়ে নিজের স্বাভাবিক সিদ্ধান্তটী হাঁহাদের বিশেষ করিয়া দেখাইতেন, এবং নিজের অভিনব সিদ্ধান্তে কিছু ভ্রম-প্রমাদ রহিল কি না তাহা জ্ঞানবার জ্ঞান এরূপ আলোচনা অত্যন্ত কৃতবিদ্য পণ্ডিতের সঙ্গেও নিঃসঙ্কোচে করিতেন, কিছুমাত্র অভিমান প্রকাশ করিতেন না। সত্য নির্ণয়ের জ্ঞান পঞ্চম বর্ষের শিশুর মত সরলতা ও ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেন। কলিকাতায় অবস্থান কালেও এ সকল সিদ্ধান্ত ও তদনুকূল যুক্তি প্রমাণ সকল, পূর্নস্থলী নিবাসী মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ ৬ জ্ঞান পঞ্চানন মহাশয় ও যয়মনসিংহ টাঙ্গাইল নিবাসী নবদ্বীপের প্রধান স্বাভ ৬ হরিশচন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনা করিতেন। বাহা বলিতেছিলাম— সেরপুর সে সময় সরস্বতীর মানসসরোরর হইয়াছিল। এ দিকে বেরূপ সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা হইতে লাগিল,



সেইরূপ অল্পদিকে বালালাভাবরও রীতিমত অক্ষুণ্ণ লেন চলিল। সেরপুরের লক্ষ্মীর প্রিয়পুত্রগণ বিমাতার সঙ্গে চিরদিন সন্ধ্যা রক্ষা করিয়া চলিয়া আসিতেছেন সে সময়ে হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ও গোবিন্দকুমার চৌধুরী মহাশয় প্রভৃতি নিজেরা সংস্কৃত ইংরাজী ও পার্শ্ব ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইহাদের লাই-ব্রেরী এইসকল ভাষার সাহিত্য ও দর্শনে পরিপূর্ণ থাকিত, তাঁহারা রীতিমত অধ্যয়ন করিতেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ও নিজের লাইব্রেরীটি বিশেষভাবে সাজাইতে লাগিলেন। যখন অর্থের তেমন স্বচ্ছলতা ছিল না, তখনও তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া নানাদেশ হইতে দুর্লভ গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি হাতের লেখা শাস্ত্র গ্রন্থও বহুতর সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কোন কোন সাহেবের মতে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের লাইব্রেরীটি ভারতবর্ষের সংস্কৃত লাইব্রেরী সমূহের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ছিল। এই বিপুল পুস্তকালয়টি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের দিবারাজির অবলম্বন হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার সংগৃহীত পুস্তকগুলি দেখিলে মনে হয় না যে এগুলি অন্ততঃ ২১৩ বার ওলটপালট না হইয়াছে। তর্কালঙ্কার মহাশয় অনেক দুস্ত্রাপ্য গ্রন্থ নিজ হাতে লিখিয়াছেন। এরূপ কঠোর অধ্যবসায় সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব।

তর্কালঙ্কার মহাশয় সেরপুরে অবস্থিতি সময়েও দেশ বিদেশে বহু নিমন্ত্রণ পাইয়াছেন। তাঁহার পাঁচটি বিবাহ, শেবপেক্ষের স্ত্রীও কালী লাভ করিয়াছেন; কিন্তু আর বিবাহ করেন নাই। তাঁহার এই বহু বিবাহ নিয়া সমবয়স্ক পণ্ডিত কেহ কেহ তাঁহাকে বিজ্ঞপ করিতেন। এক বার একটা বড় সভাতে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সঙ্গে বিক্রমপুরের পণ্ডিতদিগের শাস্ত্রালোচনা বা বিচার হইয়াছিল;—“৪৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত লোক গৃহস্থপ্রমী, এই সময় মধ্যে কণকালের জন্তও গৃহী, ভার্য্যাবিশুদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিবে না, ইহাই শাস্ত্রের আদেশ।”

এই মতটি সমর্থন করিবার জন্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় বিশেষ চেষ্টা পান, পরিশেষে এই মতটি সমর্থিতও হয়, কিন্তু প্রতিপক্ষ একজন সুরসিক পণ্ডিত সভাস্থলে দাঁড়াইয়া হাসিমুখে তর্কালঙ্কার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন “তর্কালঙ্কার দাদা, আপনার বিবাহ না করণী? পাঁচটি কি?” বলা বাহুল্য ইহা শুধু রহস্ত নহে, বর্তমান বিচারে তর্কালঙ্কার মহাশয়কে অপদস্থ করা ও তাঁহার হৃদয়ে বেদনা দেওয়াই বক্তার উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু স্পষ্টভাষী তর্কালঙ্কার মহাশয় তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, “হাঁ ভায়া পাঁচটিই বটে, কিন্তু গানি না মতুদেবী অস্তাপি জীবিতা থাকিলে আরও করণী হইত।”

বক্তা নির্ঝাক হইলেন সভাস্থলে সকলেই বুঝিলেন তর্কালঙ্কার মহাশয় কেবল জননীর আদেশেই বহু বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়কে এযাবৎ কেহ মিথ্যা বলিতে শুনে নাই। তাঁহার মত মহাপ্রাণ ব্যক্তির জননীর নাম করিয়া মিথ্যা কথা বলা একেবারেই অসম্ভব। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের শত্রুগণও কিন্তু তাঁহার আদর্শ চরিত্র ও প্রতিভার প্রতি বিশেষ আস্থা বান্ ছিলেন। এমনই সুখ দুঃখের মধ্য দিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রতিভা জগতে নিজের আসনটি নির্ধারণ করিবার জন্ত অগ্রসর হইতেছিল। “সেরপুরের সুখদুঃখ” প্রসঙ্গে আমাদের অনেক কথা বলিবার রহিল আগামী সংখ্যায় তাহা বলিবার জন্ত চেষ্টা করিব। আমরা হয়ত অনেক বৃত্তান্ত অবগত নহি, যাহা অবগত আছি বলিয়া মনে করিতেছি হয়ত তাহাতেও অনেক ভ্রমপ্রমাদ রহিয়াছে সন্দেহ পাঠকগণ এসম্বন্ধে আমাদের ভ্রম প্রমাদ সংশোধন করিয়া দিলে বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিব।

( ক্রমশঃ )

শ্রীকালীকৃত সিদ্ধান্তশাস্ত্রী।



## পূর্ববঙ্গের মেয়েলী শ্লোক

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

- ১১৪। মাসী মার আদরে  
সর্ব অঙ্গ বিদরে।
- ১১৫। ক্যাণ্ কুকুড়ার ঘর—  
ক্যাণে হয় মাথা ব্যথা,  
ক্যাণে হয় অর।  
ক্যাণ্ = কণ।
- ১১৬। বাইর বাড়ী ঘর নাই বাড়ীর মধ্যে  
কাছারি ;  
বোর্ পরণে ত্যানাথান্ ধাইর  
পরণে সাড়ি।
- ১১৭। শীত শীত শীত।  
কাঁধা ওয়ালার গুণ্ গুণি, জামাওয়ালার  
গীত।
- ১১৮। লতার উপর দিয়া লতা গেছে—  
টাইনা আনুতে ছিড়া গেছে।  
অতিদূর সম্পর্কীয় আত্মীয়তার উল্লেখ হইলে এই  
শ্লোক দেওয়া হয়।
- ১১৯। আমার পেটের ছাও  
আমারে ধইরা খাইতে চাও ?
- ১২০। সুখের উপর সুখ—  
তার উপরে পাটি কাটা টুক্।
- ১২১। দেশে নাই বা'—  
পোলায় খোঁজে তা'।
- ১২২। গরম অঞ্চল টাটকা দুধ  
যে খায় সে অতুত।
- ১২৩। চুল কাটলে হয় ডালে পালে,  
নাক্ কাটলে হয় না কোন কালে।

- ১২৪। চুয়ী মাগীর বড় গলা—  
আরো খায় সে দুধ কলা।  
চুয়ী = চোরের জীলঙ্গ।
- ১২৫। কইলে লড়া লড়া,  
না কইলে পেট ভরা।
- ১২৬। মূর্থ পুত্র ভ্রম স্বরূপ।
- ১২৭। জিহ্বারে না দিও লাই,  
জিহ্বা বলে আরো খাই।  
লাই = প্রশয়।
- ১২৮। খায় লর চিম্টি,  
নাম পড়ে চুসকীর।
- ১২৯। সর্প হইয়া দংশ ভূমি,  
ওকা হইয়া ঝাড়।
- ১৩০। যে নারী সতীনের ঘরে পড়ে  
তারে বিধি আলাদা সাজে গড়ে।
- ১৩১। সকল সতীনে লাড়ে চাড়ে,  
বইন্ সতীনে পুইড়া মারে।
- ১৩২। চোরেরে কয় চুরি করতে,  
গিরন্তরে কয় সজাগ থাকতে।  
গিরন্ত = গৃহস্থ।
- ১৩৩। জোঁরা ভিটায় তোলে ঘর,  
যে আসে তারই হয় অর।
- ১৩৪। ভাতে বলে মোরে খা—  
সেচুর পাইরা ঘরে বা।  
সেচুর পাইরা = সৈচ্ড়িয়ে।
- ১৩৫। মরতে চলছে বুড়ী—  
তবুও না ছাড়ে শাঁখার গুড়ি।  
পূর্বে বোধ হয় আধুনিক রোজ্ পাউডারের পরিবর্তে  
বিলাসিনীদিগের প্রসাধন কার্যে শাঁখার গুড়ি ব্যবহৃত  
হইত।
- ১৩৬। কি না পায়—  
মুগ ডাইল খায়।

১৩৭। নায় আটে না—

হইয়া যায়।

হইয়া=ওইয়া।

১৩৮। বেহায়ার বালাই দূর—

কাটা কাণে বিদ্ধা ফুল।

১৩৯। ধ্যারে কুটার আগুন দিয়া—

পেংনি বইল আল গোছ হইয়া।

কোন গুরুতর কার্য্য করিয়া কার্য্য কারক যদি  
পরম নিশ্চিত্ত ভাবে সরিয়া বসিয়া থাকে তবে এই শ্লোক  
দেওয়া হয়।

১৪০। মা'র নাম চেরকী বাদী—

পুতের নাম সুলতান বাঁ।

১৪১। ঝারি ঝরবে, উমান্ ঝর,

বাদী চোর, জী মুখর।

১৪২। খটর মটর জোতা পায়,—

জাখ্‌লো দিদি কেলো যায় ?—

ভাব্রঞ্জীর ভাতারে যায়।

১৪৩। কৈচা—কুটলে মিছা,

রাঁধ্‌লে দেয় টৌ,—

সগল খাইল বো।

সগল=সকল।

১৪৪। আরে ও গোলামের নাতি,

আনুচিলা ক্যান্‌ দুর্গামুর্তি ?

করুই ত এই কীর্তি।

এক হস্তভাগ্য বহু অসুসন্ধানে এক অপূর্ণ সুন্দরী  
কণ্ঠারত্ন বিবাহ করিয়াছিল। কিন্তু শেষটা দেখা গেল  
যে বোটি একটি আন্ত মাকাল ফল—অলস ও মুখরার এক  
শেষ। বৌর ব্যাদবি সহ করিতে না পারিয়া শান্তরী  
একদিন ছেলের কাছে সব কথা বলিলেন। মাতৃতত্ত্ব  
ছেলেও সেই জীকে ভৎসনা করিতে আরম্ভ করিল জীও  
অননি রোষতরে তাহাকে বলিয়া উঠিল—

“আরে ও গোলামের নাতি”

ইত্যাদি।

১৪৫। আইজ বুঝ্‌লি না, বুঝ্‌বি কাইল্,

মাগ্‌ ধাপরাবি আর পার্‌বি গাইল্।

১৪৬। শান্তরি বড় দুতের দুত,

কাঠি মাইপা থোয় দুধ।

বো তেমন দুতের দুত,

জল্‌ মিশাইয়া খায় দুধ।

১৪৭। পিরদুপেরই কোল আঁধার।

পিরদুপ=প্রদীপ।

১৪৮। আম তলাই আম মূল।

১৪৯। সোনা থুইয়া আঁচলে গিরু।

১৫০। বো মরে, জোকোর পড়ে,

ঘরে ঘরে বিয়া করে।

জোকোর=উলুধনি।

১৫১। থাকেন যদি মোহন বাঁশী,—

কত রাধা হবেন দাসী।

১৫২। মা মরলে বাপ তাত্র,

ভাই হয় বনের বাত্র।

১৫৩। মাইয়ারে বাধ্‌নায় কে ?

মাইয়ার মায় আর বাপে।

১৫৪। ছাই ফেলাইতে ভাঙ্গা কুলা।

১৫৫। সর্ব্ব কর্মে রাধা,—

ভাতারে ডাকে দাদা।

১৫৬। অলি লো বাঁশ পাতা,—

বিয়ার রাইতে কইচিলি কথা।

১৫৭। শান্তরি নাই, ননদ নাই,

কারবা রাধি ডর,

আগে খাই পাস্তা ভাত—

শেষে লেপি ঘর।

১৫৮। মায় রাঁধে যেমন তেমন,

বইসে রাঁধে পানি,

এ যে অভাগী রাঁধে—

যেমন চিনি পরমন্থানি।

পরমন = পরমার।

১৫২। অদন্ত হাসি বড় ভালবাসি।

এক রাজার ছই রাণী ছিলেন। মামুলি প্রথমত বড় রাণীকে ছোট রাণীর প্ররোচনায় বনে দেওয়া হইল। একদা রাজা বনে ভ্রমণ করিতেছেন এমন সময়ে পরম সুন্দর একটা শিশু দেখিয়া স্নেহাভিভূত হইলেন। শিশুটা রাজার আদর পাইয়া ধিলধিল করিয়া হাসিয়া উঠিল; রাজা অমনি বলিয়া উঠিলেন, “অদন্ত হাসি বড় ভালবাসি।”

এ কথা শুনিয়া শিশুর জননী কুটীরের বাহিরে রাজাকে দেখিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। রাজা তাঁহাকে বড় রাণী বলিয়া চিনিতে পারিয়া পরম যত্নে গৃহে নেওয়ার প্রস্তাব করিলেন।

ওদিকে ছোটরাণী সংবাদ পাইলেন যে, বড় রাণীকে সত্বরই রাজধানীতে আনা হইবে এবং রাজা বড় রাণীকে দেখিয়াই বলিয়াছেন যে, “অদন্ত হাসি বড় ভালবাসি।” তিনি তৎক্ষণাৎ রাজার প্রিয় হওয়ার জন্য শাঁড়ানী দিয়া নিজের সৰ্ব দাত ফেলিয়া দিলেন। দিয়া রাজ সন্মুখে গিয়া হাসিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা তাঁর এই ডাইনীবৎ চেহারা দেখিয়া দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন : এবং বড় রাণীকে নিয়া সংসার গৃহস্থি করিলেন।

১৬০। যোর যার মুলুক তার।

১৬১। বাপের নাম নাই, দাদার নাম নাই,  
ট্যামগোপালের নাতি।

১৬২। আল্লাদের চাঁদ—

বুইড়া কয় বুড়ীলো আমারে

কোলে কইরা রাঁধ্।

১৬৩। এত খাওয়ান খাওয়াইছ

লড়িতে না পারি ;

রথখান দেও দেখি

নিত্ কর্ণকার।

রথ = পা।

নিত কর্ণ = নিত্যকর্ণ, এখানে চুরি করিয়া খাওয়া।

এক বোর চুরি করিয়া খাওয়ার অভিযাস ছিল। শান্তরী

টের পাইয়া ভাবিলেন—এত বড় দোষ! যে করিয়াই

হউক বোর এ দোষ শোধরাইতেই হইবে। তাই

তিনি একদিন বৌকে চব্য, চোম্ব, লেহ, পেয় নানা-

বিধ উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্বারা পরিতোষ পূর্বক খাওয়াইলেন।

বৌ আর নড়িতে চড়িতে পারে না। এদিকে তাহার

চুরি করিয়া খাইবার সময় উপস্থিত; কিন্তু উঠিয়া

খাওয়ার শক্তির অভাব। অগত্যা শান্তরীকে ডাকিয়াই

বৌ বলিল—“এত খাওয়ান খাওয়াইছ” ইত্যাদি।

( ক্রমশঃ )

শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত।

## ময়মনসিংহের প্রাচীন কীর্তি

প্রতিবাদ

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় প্রতিভা বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ দুই সংখ্যায় প্রকাশিত উপর লিখিত নামধের প্রবন্ধটির কয়েকটি দোষ ও ত্রুটি দেখাইয়াছেন। ইংরেজী নোট অবলম্বনে লেখা প্রবন্ধে স্থান ও ব্যক্তির নামে অনেক গুলি ভুল হইয়াছে, যথা—

অশুদ্ধ  
আগার সিন্দূর  
ইসক থা

বোকার নগর  
কাটার দীঘি  
সংসার দীঘি  
কাতিয়াধি  
আছমতিয়া  
হাবাতনগর

শুদ্ধ

এগার সিন্দূর  
ঈশা থা  
বোকাই নগর  
কুটামন দীঘি  
সেনবাড়ীর দীঘি  
কাটিয়াদি  
আচমিতা  
হয়বত নগর

পূর্ণবাবু আরও লিখিয়াছেন যে, প্রবন্ধের লিখিত গিরীশচন্দ্র রায় প্রকৃত পক্ষে গিরীশচন্দ্র চৌধুরী হইবে, এবং শ্রীরাধিকার মূর্তি রৌপ্যময়ী নহে, দ্বাক্ষময়ী।

প্রতিভা সম্পাদক।

# প্রতিভা

৪র্থ বর্ষ

শ্রাবণ, ১৩২১

৪র্থ সংখ্যা

## মাতৃস্তোত্র

উছল নীল সিদ্ধ-সলিল  
চুষে চরণ তব—  
সংখ্যা-বিহীন উষ্মি-আননে  
বন্দনা-কলরব ;  
অঙ্গীশ চিরগণিত তব,  
গুল কে এন ধরি,  
নির্মল নীল অম্বর হাসে  
মা, তোমার শিরোপরি।  
দীপ্তোজ্জ্বল সূর্য্যে তোমার  
অঙ্গের হেম ছায়া,  
চন্দ্রের সূখা অর্ণবে তব  
বিশ্ব-মোহিনী মায়ী ;  
গ্রহতারকার পূর্ণ সভায়  
সম্বর্জনা তব,  
অমৃত-ধোর-গর্জনে তব  
কম্বর জয় রব।  
জাহ্নবী তব চিত্তের চির  
-কাণ্ডে মেঘ-ধার—  
স্বর্ণাঙ্কলা লক্ষ্মী অচলা  
বক্ষেতে মা, তোমার !  
পুষ্পিত তব কুল-কানন  
মঞ্জুল সুসমায়—  
ছন্দে-হাসে গন্ধে-বরণে  
নন্দন ভেসে যায়।

বিশ্ব-স্বভাব-সাম্রাজ্যের  
মধুময়ী রাণী তুমি,  
সৌন্দর্য্যের কল্প-প্রতিমা,  
--অগ্নি গো আমার ভূমি—  
অধ্যাত্মের আত্মা শক্তি,  
কল্প-জ্ঞানের মাতা,  
ধর্ম্ম-ধেয়ান-মন্দাকিনীর  
পুণ্য-পীয়ুষ-মাতা !  
শাস্ত্রত বেদ ছন্দ তোমার  
বিশ্বের আদি গান—  
ভক্তির মহা-আহ্বান-বাণী,  
শক্তির মধু তান ;  
দর্শন-গীতি- সংহিতা তব  
ঋদ্ধির ভাণ্ডার—  
মর্ত্য-বাসীর গৌরব-জ্ঞান  
-সম্পদ-পারাবার !  
বাহ্যের তুমি প্রার্থিত ধন,  
ভক্তের তুমি প্রাণ,  
অমৃত তুমি, পুণ্যদা তুমি,  
অক্ষয় তব দান ;  
মাতৃ-পীয়ুষ-স্তন্য-পিন্নাসী  
ভগবান বার বার  
বক্ষে তোমার সন্তান রূপে  
জন্মেন অবতার !  
শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

## বঙ্গের রঘুনাথ শিরোমণি

### দ্বিতীয় প্রস্তাব

(ঢাকা সাহিত্যপরিষদে পঠিত, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১)

### পূর্ব প্রস্তাবের সার সঙ্কলন।

বঙ্গ-বিজেতা সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে দক্ষিণ শ্রীহট্টের ইটা অঞ্চলে সুবিদনারায়ণ নামে ত্রিপুরার জনৈক সামন্ত নৃপতি রাজত্ব করিতেন। শ্রীহট্টের সাম্রাজ্যিক সমাজের বংশাদি পঞ্চগোত্রের অন্ততম বাৎস্তগোত্রে রাজা সুবিদনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। রাজকন্যা রত্নাবতী খঞ্জা ছিলেন। রাজা পঞ্চ-খণ্ড ঘুঙ্গাদিয়া নিবাসী (১) রুদ্রপতির পুত্র এবং রমা-

পতির ভ্রাতা রঘুপতি নামক জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-যুবকে গৃহে জামাতারূপে পঞ্চখণ্ড হইতে ইটা রাজ্যে স্থাপিত করেন। শ্রীহট্টের সাম্রাজ্যিক সমাজের কাশপ, বর্ণকৌশিক প্রভৃতি অপর পাঁচ গোত্রের অন্ততম কাত্যায়ন গোত্রে রাজ-জামাতা রঘুপতি জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে সাম্রাজ্যিক সমাজের এই দুই শাখার মধ্যে সত্তাবের যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু পূর্বে এরূপ ছিল না। এই সামাজিক অসত্তাবের মূলে শ্রীহট্টের রঘুনাথের আবিষ্কার (২)। ১০:১২ বৎসর হইল শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় সর্বপ্রথম সামাজিক পক্ষে প্রচার করেন যে, রাজ-জামাতা রঘুপতির রঘুনাথ নামে এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন এবং ইনিই কালক্রমে অধিতীয় নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি রূপে নবদ্বীপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ভ্রাতার বিবাহে দুঃখী পরিবারের অর্থান্ধা বচিয়া গেল সুতরাং রঘুনাথের শ্রীহট্ট পরিত্যাগের কারণ নির্দেশ করা আবশ্যিক হইয়া পড়ে। প্রচার করা হইল বংশাদি পঞ্চগোত্র, রাজা আদি ধর্ম-ফার (১) দান প্রতিগ্রহ করায় কাত্যায়নাদি পঞ্চগোত্রীয়গণ কর্তৃক আদান প্রদানের বহির্ভূত ছিলেন। রাজা বংশাদি পঞ্চগোত্রের অন্ততম বৎস্তগোত্রীয়, সুতরাং কাত্যায়ন রঘুপতি রাজকন্যা বিবাহ করায় “কুলপৌরব ধ্বংসকারী” বিবেচিত হওয়ার তাঁহার একাদশ বর্ষীয় ভ্রাতা রঘুনাথ অভিমানে জননী সহ শ্রীহট্ট পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে উপনীত হন। শ্রীহট্ট হইতে ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টায় “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে”

(১) রুদ্রপতির বংশ পত্রিকা প্রতিভা পত্রিকায় (ফাল্গুন, ১৩২০) মুদ্রিত হইয়াছে। ঘুঙ্গাদিয়া গ্রামে কুকী রাজ-গণের ‘বুণ’ বাজাইলে প্রজাবর্গ বিপদ কালে সতর্ক হইবার সুযোগ পাইত। ঘুঙ্গাদিয়ার নিকটে কুকী রাজার বাড়ী ও দীঘি। পঞ্চখণ্ডের পূর্বনাম “টেকইর” টেকরী কুকীগণের স্থতি জাগ্রত রাখিয়াছে। পার্শ্বভূমিতে অবস্থিত ভদ্র পল্লীসমূহ ১৩:১৪ পুরুষ মধ্যে নিকটবর্তী সমতল ভূভাগ হইতে আগত ব্যক্তিগণ কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমান পঞ্চখণ্ডের স্থাপিত্য পাল ও দত্ত-বংশীয় গণের বংশপত্রিকা এসম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। অবকাশ হইলে যথা সময়ে উহা প্রকাশিত হইবে। বর্তমান অধিবাসিগণের পূর্বনিবাসভূমি বড়ুয়া কোনা, দাসউড়া, বখালা, ছোটলিখা প্রভৃতি স্থানে অদ্যাপি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। পঞ্চখণ্ড সুপাতলা গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমান দত্ত বর্তমান হইতে ১১ পুরুষ পূর্বে পঞ্চখণ্ডে আগমন করেন। তাঁহার তিন পুরুষ মাত্র পূর্বে, পালবংশীয় কালিদাস সদলবলে পঞ্চখণ্ডে উপনিবিষ্ট হন। সুবিদিত “বার পালের দীঘি” তৎকালেও অত্যন্ত প্রাচীন দীঘি রূপে পরিণত ছিল এইরূপ বিবরণ পালবংশীয়গণের নিকট হইতেও অবগত হওয়া যায়।

এই দীঘি ঢীলা ও সমতল ভূমির সন্ধিস্থলে অবস্থিত। এই দীঘি অতি প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে সত্য, কিন্তু এই উপনিবেশ প্রাচীন যুগেই

টেকরী কুকীগণের অত্যাচারে ধ্বংস হইয়া যায়। বর্তমান ভদ্র উপনিবেশ সের শাহেরও পরবর্তী কালে স্থাপিত; চৈতন্য দেবের সময়ে এস্থলে ঘোর অরণ্য ছিল এবং মধ্যে মধ্যে কুকীগণের বসবাস ছিল, সুতরাং তৎকালে তর্কসিদ্ধান্ত উপাধিকারী পণ্ডিতগণের পঞ্চখণ্ডে অবস্থানের কথা একান্ত অযৌক্তিক।

(২) “শ্রীশ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা” ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, ৪১৯ পৌরাণিক এবং নব প্রতিভা ১৩১০ বাঙ্গলা জ্যৈষ্ঠ।

এই কাহিনী স্থান প্রাপ্ত হয় এবং “শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত” লেখক উপর্যুক্ত উপাদান সমূহ অবলম্বনে এবং সময়োপযোগী সামান্য পরিবর্তন ক্রমে রঘুনাথ বিবরণ নিজগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। আমরা বিবিধ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া কল্পিত প্রতিগ্রাহী অপবাদেব অসারতা এবং কাভ্যায়ন রঘুনাথের সহিত বঙ্গীয় রঘুনাথের একীকরণ-চেষ্টার অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছি। সনন্দ ও বংশপত্রিকালক প্রমাণাবলী আমাদেরকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। রাজা সুবিদনারায়ণ পাঠান দলপতি ওসমান কর্তৃক পরাভূত হন। ইহার পর ৩৪ বৎসর অভিবাহিত হইতে না হইতেই ১৬২১ খৃষ্টাব্দে মোগল সৈন্য কর্তৃক ওসমানও নিহত হয়।

নাসিরুদ্দিন নামক দক্ষিণ শ্রীহট্টের জনৈক প্রতাপশালী ব্যক্তি ওসমানের হত্যাকাণ্ডসাধনে সুজায়াত খাঁকে সাহায্য করেন এবং এই সাহায্যের পুরস্কার স্বরূপ সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বের নবম বৎসরে, অর্থাৎ ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে, কানিহাটী পরগণার চৌধুরী উপাধি এবং একখণ্ড ভূমি জায়গীর স্বরূপ লাভ করেন। এই জায়গীর প্রাপ্তির সনন্দ কানিহাটীর জমিদার-বংশে অজ্ঞাপি সত্ত্বে রক্ষিত আছে। নাসিরুদ্দিন যে সুজায়াত খাঁকে ওসমান খাঁর বিরুদ্ধে প্রেরিত অভিযানে সাহায্য করিয়াছেন ইহার প্রমাণ এই সনন্দে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই সনন্দ হইতে দেখা যায় যে, সুবিদনারায়ণের জামাতা রঘুপতির কনিষ্ঠ সহোদর রঘুনাথের জীবিত কাল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ। আলোচিত বংশ পত্রিকার মধ্যে আবহুলকরিম চৌধুরী প্রণীত সুবিদনারায়ণের বংশপত্রিকা, সার্কর্ভৌম প্রণীত বঙ্গপত্রিকা, জাতীয় ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত রঘুপতি বংশ পত্রিকা এবং পঞ্চখণ্ডে অবস্থিত রঘুপতির জ্ঞাতিগণের বংশপত্রিকা—রাজ-পরিবার সংশ্লিষ্ট এই চারিটি বংশ পত্রিকার মধ্যে একমাত্র জাতীয় ইতিহাস প্রদত্ত বংশ পত্রিকার রঘুনাথ নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, এবং ইহাদের

কোনও একটাতেও রঘুনাথ-ভ্রাতা রাজ-জামাতা রঘুপতি ও তাহার বর্তমান বংশধরগণের মধ্যে ৮ পুরুষ, এবং রাজা ও তাহার বর্তমান বংশধরগণের মধ্যে ৯ পুরুষের অধিক বংশধান দৃষ্ট হয় না। পুরুষ হিসাবে সময় নির্ধারণের সর্বোচ্চ হারে, অর্থাৎ তিন পুরুষে ১০০ বৎসর হিসাবেও শ্রীহট্টের রঘুনাথ ১৩১৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্তী হন না। সুতরাং সনন্দ ও বংশাবলী এই উভয়বিধ প্রমাণ হইতে নির্ধারিত হইতেছে যে, রঘুপতি ও অপর ভ্রাতা রঘুনাথের প্রাদুর্ভাব কাল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ। রাজা সুবিদনারায়ণের সময় দীর্ঘ করিয়া না দেখাইলে উভয় রঘুনাথের জীবিত কালের সামঞ্জস্য হয় না, সম্ভবতঃ এই জন্মই রাজার দুই পুত্রের নামের পর তৎসংশ্লিষ্টগণের অজ্ঞাতসারে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত গ্রন্থে ৩ পুরুষ অজ্ঞাত লিখিত হইয়া থাকিবে। বাহাউক রাজ-জামাতা রঘুপতির পর ঐরূপ “৩ পুরুষ অজ্ঞাত” দেখান হয় নাই।

বিভিন্ন কাভ্যায়ন বংশপত্রিকায় উক্ত প্রকারে ‘৩ পুরুষ অজ্ঞাত’ রূপে লিপিবদ্ধ না দেখিলে শুধু একটা মাত্র বংশ পত্রিকায় কৃত্রিম উপায়ে সময় দীর্ঘ করিয়া রঘুনাথের সময় নির্ধারণ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হইবে না, এবং এই সকল বংশ পত্রিকা উপেক্ষা করিয়া অজ্ঞাত কয়েকটি পরিবারের বংশ পত্রিকা হইতে সময় নির্দেশের চেষ্টাও বিশেষ কার্যকারী হইবে না। শ্রীহট্টের কাভ্যায়ন রঘুনাথ ও বঙ্গীয় রঘুনাথ অভিন্ন ইহা সপ্রমাণ করিতে এবং উভয় রঘুনাথের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে শ্রীহট্টের কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি অক্লান্তি ভাবে লেখনী পরিচালনা করিতেছেন। ১০, ১২ বৎসর পূর্বে (তখনও শ্রীহট্টে রঘুনাথের সম্যক সৃষ্টি হয় নাই) তাহার প্রকাশ করেন শ্রীহট্ট পরিভ্রমণ কালে রঘুনাথ মাত্র একাদশবর্ষীয় ছিলেন, তৎপূর্বেই তিনি পঞ্চখণ্ডের সুবিখ্যাত শিবরাম তর্কসিদ্ধান্তের নিকটে ব্যাকরণ ও অভিধান অধ্যয়ন করেন। ইত্যাকার মত লইয়া রঘুনাথকে শ্রীহট্টের কাভ্যায়ন গোত্রে রাখা অসম্ভব দেখিয়া তাহার ইচ্ছাক্রমে মত পরিবর্তন করিতে

বাধ্য হন। আমরা তৎসমুদায়ের উল্লেখ করিয়াছি এবং নিম্নলিখ রজকুলের অমূলক অপবাদ প্রচার করাতে সমাজে যে অশান্তির সূত্রপাত হয়, তাহাও যথাক্রমে দেখাইয়াছি।

### বঙ্গীয় রঘুনাথ শিরোমণি \*

বঙ্গীয় রঘুনাথ শিরোমণি নিজ অমূল্য গ্রন্থরাশি ব্যতীত নিজ জীবনীর কোনও উপাদান রাখিয়া যান নাই। তাঁহার সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে অমুসন্ধান করিয়া তথ্য উদ্ঘাটন করিতে হইবে। সুতরাং প্রথম আলোচ্য বিষয় পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের চতুষ্পাঠী সমূহে রঘুনাথ জীবনীর বিবিধ আধ্যাত্মিক। দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় বৈষ্ণব সাহিত্যে রঘুনাথ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আধ্যাত্মিক; সর্বশেষ আলোচ্য বিষয় আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যে রঘুনাথ সংশ্লিষ্ট মতবাদ।

সংগৃহীত উপাদান ও তৎসাহায্যে রঘুনাথ জীবনীর আলোচনার প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে রঘুনাথ শিরোমণির সমসাময়িক ঐতিহাসিক অবস্থার একটু আলোচনা প্রাসঙ্গিক হইবে না। এই সকল ঘটনাবলি হইতে আমরা বুঝিতে পারিব (১) রঘুনাথ ও চৈতন্য দেব উভয়ে বাসুদেব সার্বভৌমের ছাত্র হইতে পারেন কি না ;

\* গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম লইয়া বাকালী জাতি গৌরবান্বিত। এই ধর্ম-মতের ক্রমবিকাশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গভাষা বাকালী জাতির অপর গৌরবের বিষয়, সুখের বিষয়। ইহারও যথা যোগ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ হইতেছে কিন্তু ধর্ম ও ভাষা ব্যতীত বাকালীর গৌরব অজুতব করিবার আর একটা বিষয় আছে ; কিন্তু তাহার ধারাবাহিক বিবরণ সংগ্রহ করিবার কোনও উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায় না। বাকালীর দর্শনের ইতিহাস (History of Philosophy) এমন কি বঙ্গীয় দর্শনিক গণের সম্রাট রঘুনাথের জীবনী যথা যোগ্য ভাবে লিখিত হয় নাই। স্বল্প চিত্রায় বঙ্গীয় দার্শনিকগণ হিগেল, কোমতে, মিল, হেইন (Hegel, Kant, Mill, Bain) হইতে নান হইবেন না।

(২) ওসমান ও ওসমান কর্তৃক পরাজিত রাজা সুবিদ-নারায়ণ ও তাঁহার কুটুম্ব রঘুনাথ কোন সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

হুসেন সাহের রাজত্বের অব্যবহিত পূর্বে প্রায় ১০ ঐতিহাসিক বৎসর কাল বঙ্গের সিংহাসনে হাবসী দাসরাজগণ অধিষ্ঠিত ছিলেন। বঙ্গের এই দুর্দিনের সময় সুলতান সাজাদা ৮ মাস কাল রাজত্ব করেন। ইনি হাবসী খোজা ছিলেন। পাঠান নৃপতি ফতেসাহকে নিহত করিয়া ইনি সিংহাসন লাভে সমর্থ হন। মালিক আওল নামক তাঁহার হাবসী সেনাপতি কর্তৃক তিনিও নিহত হন। মালিক আওল সাধারণতঃ ফিরোজ সাহ নামে পরিচিত। অতঃপর তৎপুত্র মামুদ সাহ রাজত্ব করেন। পিতা-পুত্র উভয়ে ৪ বৎসরের অনধিক কাল মাত্র রাজত্ব করিয়া-ছিলেন। মামুদ সাহ ঘোর অত্যাচারী ছিলেন। সিদ্দিক-বদর খোয়ান নামক জনৈক হাবসী ক্রীতদাস তাঁহাকে নিহত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন এবং মজফর সাহ নামে পরিচিত হন। মজফর তিন বৎসর ৫ মাস কাল রাজত্ব করেন। তিনিও ঘোর অত্যাচারী ছিলেন। ক্রমে পাঠান ওমরাহগণের পক্ষেও তাঁহার অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠে। সুতরাং তাঁহার মন্ত্রী সৈয়দ হোসেন বিজ্রোহ ঘোষণা করেন।

রাজা নিহত হইলে পর সৈয়দগণ সৈয়দ হোসেনকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করে। সৈয়দগণের মনোরঞ্জনার্থ তিনি তাহাদিগকে গোড় নগর লুণ্ঠন করিতে অজুমতি প্রদান করেন। কিন্তু কয়েকদিন লুণ্ঠন চলিলে পর তিনি আবার সৈয়দগণকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ দেন। সৈয়দগণ এই আদেশ অমান্য করে এবং ফলে স্বাদশ সহস্র সৈয়দ নিহত হয়।

এই হোসেন সাহের মৃত্যু হইতে দ্বিগুণ হইয়াছে যে, তিনি ১৪২৪ খৃঃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বিশেষ যশঃ ও পরাক্রমের সহিত দীর্ঘকাল রাজত্ব

করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসন সময়ে হাবসীগণ বঙ্গ-হইতে বিদূরিত হয় এবং দেশে শান্তিসম্পদের প্রতিষ্ঠা হইতে থাকে। এই প্রজাবংশল নৃপতির অধীনে বঙ্গ-সাহিত্য যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। ইনি জৌনপুরের শেষ স্বাধীন নৃপতিকে আশ্রয় প্রদান করেন। ইহার সময়েই পৰ্তুগীজ বাণিজ্যপোত গঙ্গাবক্ষে সৰ্ব্বপ্রথম দৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকাল বিচারে দেখা যায় উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র ( ১৫০৪—১৫৩২ খৃঃ ) তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। চৈতন্য দেব ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০৯ খৃঃ ২৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস ধৰ্ম্ম অবলম্বন করেন এবং ঐ সনেই পুরীধামে বাসুদেব সার্কভোমের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। চৈতন্য দেবের জন্মের \*অল্প পূর্বে নবদ্বীপে হাবসীগণ কর্তৃক বিবিধ অত্যাচার অমুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার ফলে গঙ্গানান নিবন্ধ হয় এবং হিন্দুধর্ম্মের অমুষ্ঠান জাতি-ধ্বংসের কারণ হইয়া পড়ে। এই কারণে রঘুনাথের গুরু বাসুদেব সার্কভোমের নবদ্বীপ পরিত্যাগের কথা একাধিক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

হোসেন সাহের মৃত্যুর পর তৎপুত্র নসরৎসা ও তৎপৌত্র মামুদসা যথাক্রমে সিংহাসনে আরোহণ করেন। মামুদ সেরসাহ কর্তৃক ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে পরাজিত হইয়াছিলেন। সের সাহের মৃত্যুর পর ( ১৫৪৮ খৃঃ ) ৪ জন পাঠান নৃপতি বঙ্গে রাজত্ব করেন।

১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের সেনাপতি খানজাহান কর্তৃক বঙ্গের শেষ পাঠান নৃপতি মোগল রাজত্ব দায়িত্ব কররাণী পরাজিত হন। ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ ভাঁওয়ালে

\* ১। “বিশারদ সূত সার্কভোম ভট্টাচার্য্য।

সবংশে উৎকলে গেলা ছাড়ি গৌড় রাজ্য ॥

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে উদ্ধৃত—চৈতন্য মঙ্গল।

২। “উৎকলে সার্কভোমশচ বারাগস্তাং বিশারদঃ।”

বিশ্বকোষে উদ্ধৃত—রাষ্ট্রীয় কুলপঞ্জিক।

ও ব্রহ্মপুত্র-তীরে বিদ্রোহী পাঠান দলপতি ওসমানকে বিভাড়িত করিয়া ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন।

১৬০৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে সুবাদার আলাউদ্দিন, চিত্তি নবাব ইসলাম খাঁ, বিদ্রোহী পাঠান, পৰ্তুগীজ ও মগ দস্যুদিগকে দমন করিবার মানসে রাজমহল হইতে ঢাকা নগরীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ১৬১২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ ইসলাম খাঁর প্রেরিত সৈন্যগণ কর্তৃক ওসমান নিহত হয়। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ শ্রীহট্টের নাসিরুদ্দিন ইসলামখাঁ হইতে জায়গীর ও সন্দ লাভ করেন।

### রঘুনাথ জীবনের উপাদান।

চতুপাণ্ডী সমূহের পরম্পরাগত চতুপাণ্ডী প্রচলিত আখ্যানগুলি দুই শ্রেণীতে আখ্যায়িকা। বিভাগ করা যাইতে পারে।

(ক) পূর্ববঙ্গে প্রচলিত রঘুনাথ সংলিষ্ট

ইতি কথা—ইহাদের অধিকাংশ রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ সি, আই,ই কর্তৃক ৬ গোলকচন্দ্র সার্কভোম, ৬ চন্দ্রকুমার তর্কালঙ্কার, ভুবনমোহন বিজয়ার প্রভৃতি লক্ষপ্রতিষ্ঠিত্রায় শাস্ত্র ব্যবসায়ার নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়া “সুপ্রভাত” নামক গ্রন্থে “রঘুনাথ শিরোমণি” নামক প্রবন্ধে গ্রথিত হইয়াছে। নিয়ে উল্লিখিত প্রবন্ধের সারমর্ম প্রদত্ত হইল।

(১) বাসুদেবের পিতা মহেশ্বর বিশারদ এবং পিতামহ একপত্নী রামভদ্র সিদ্ধাঃ বাগীশ। বাসুদেব শঙ্কর প্রবর্তিত দর্শন শাস্ত্রের একটি টোল স্থাপন করেন।

শেষ জীবনে তিনি প্রতাপ রুদ্রের কালীপ্রসন্ন ঘোষ সহায়তায় পুরীধামে একটি বেদান্তের সংগৃহীত বিবরণের টোল স্থাপন করেন। বারাগনীতে না যম্ম যাইয়া দণ্ডিগণ পর্যন্ত তাঁহার নিকট বেদ অধ্যয়ন করিত। বাসুদেবের সময়ে ঠায়ের আধিপত্য ছিল মিথিলায়।



মৈথিলী পণ্ডিতগণ ছত্রদিগকে কোন গ্রন্থই নিঃসন্দেহে লইয়া যাইতে দিতেন না। তখন নবদ্বীপে জায়ের উপাধিদানের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

(২) পাঁচ বৎসর বয়সে (১১ বৎসর বয়সে নহে) রঘুনাথ তদীয় দুঃখিনী জননী সহ নবদ্বীপ বিজ্ঞানগরে বাসুদেব সার্কভৌম-গৃহে আশ্রয় লাভ করেন।

(৩) রঘুনাথের পূর্বপুরুষগণ পরাতারনিবাসী ছিলেন।

(৪) শিশু রঘুনাথের প্রত্যাশন্ন মতিভ ও বিচার শক্তির পরিচয়—

(ক) ‘সব গাছে প্রচুর আম হইবে’ ভূনিয়া রঘুনাথের প্রশ্ন—‘তাল গাছেও আম হইবে নাকি?’

(খ) বর্ণ পরিচয় কালে আগে ‘ক’ পরে ‘খ’ কেন, দুইটি “ব”, তিনটি ‘স’ কেন ইত্যাকার প্রশ্ন।

(গ) বালুকা হাতে রাধিয়া হাতের উপর আঙুল লওয়া প্রভৃতি কার্য।

(৫) রঘুনাথ ১২ বৎসর বয়সে মিথিলায় পঞ্চদশ মিশ্রের টোলে প্রতিষ্ঠ হন। রঘুনাথ গঙ্গেশ উপাধ্যায় কৃত সটীক চিন্তামণি কণ্ঠস্থ করেন এবং গুরুদত্ত “শিরো-মণি উপাধি লাভ করিয়া নবদ্বীপে ফিরিয়া আসেন এবং চিন্তামণি দীপ্তি নামক নুতন আকারে জায়ের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

(৬) পরবর্তী বঙ্গীয় নৈয়ায়িকগণের গ্রন্থে বাসুদেব সার্কভৌম প্রভৃতি অল্প কাহারও কোন নাম নাই; কিন্তু রঘুনাথের নাম পত্রে পত্রে।

(৭) মিথিলায় অবস্থান কালে তিনি নিজকে নবদ্বীপ নিবাসী বলিয়া আত্ম পরিচয় দিয়াছিলেন।

(৮) ক। রঘুনাথ যখন আশীতিপন্ন বৃদ্ধ তখন নবদ্বীপের জগদীশ তর্কালঙ্কার এক টীকা রচনা করেন।

(খ) চরম বার্ককো তাঁহার একটু একটু শিরঃ-কম্প হইত।

(গ) তিনি চিরকুমার ছিলেন।

(ঘ) অর্ধোপার্জনে তিনি উদাসীন ছিলেন।

(ঙ) তাঁহার একচক্ষু কাণা ছিল।

(চ) তাঁহার যথেষ্ট আত্মাভিমান ছিল। অপ-মানের প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি গুরু পঞ্চদশ মিশ্রকে হত্যা করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছিলেন।

(ছ) দারিদ্র্য ও শিরঃকম্পের দরুণ তাঁহাকে উপহাস করায় তিনি কবিষ পূর্ণ শ্লোকে প্রত্যুত্তর দানে নিজ তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

(খ) পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত অপরাপর ইতিকথার মর্ম্ম নবদ্বীপ মহিমা এবং মদীয়া কাহিনী নামক দুই খানা গ্রন্থ হইতে নিম্নে সংগৃহীত হইল।

(অ) নবদ্বীপ মহিমা প্রদত্ত বিবরণের সারাংশ—

(১) বাসুদেব মিথিলায় গমন পূর্বক চিন্তামণি ও কুসুমালঙ্কার শ্লোকাংশ কণ্ঠস্থ করেন। অতঃপর তিনি কালীধামে বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি জীবনের শেষ-ভাগ ত্রীক্ষেত্রে অতিবাহিত করেন। এই স্থানেই তিনি চৈতন্যদেবের সহিত বিচারে পরাজিত হন।

(২) রঘুনাথ তৃতীয় কি চতুর্থ বৎসরে পিতৃহীন হন। তদীয় দুঃখিনী জননী বাসুদেব সার্কভৌমের পোন কোন ছাত্রের গৃহে কার্য্য করিয়া নিজের ও পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতেন।

(৩) একদা তিনি ‘নবদ্বীপ নিবাসিনঃ’ বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন।

(৪) রঘুনাথ চৈতন্যদেবের সহাধ্যায়ী ছিলেন। অনেক স্থলে চৈতন্যদেব তাঁহার মত পরিক্ষুট করিয়া দিতেন। একদা এক উড়ুড়র বৃক্ষতলে বসিয়া রঘুনাথ ২৪ খণ্ডীয় যে প্রশ্নের সমাধান করিতে পারেন নাই চৈতন্য-দেব বহুহুত মধ্যে সেই প্রশ্ন সমাধান করিয়া দিয়াছিলেন।

(৫) বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিলে রঘুনাথ বলিতেন,—“পুত্র কত্থার জন্যই বিবাহের প্রয়োজন। ‘ব্যুৎপত্তিবাদ’ আমার পুত্র এবং ‘লীলাবতী’ আমার কত্থা। অতএব বিনা বিবাহেই আমার আশা ফলবতী হইয়াছে।”

(৬) রঘুনাথ খৃষ্টীয় বোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলেবর পরিত্যাগ করেন।

(আ) নদীয়া কাহিনী প্রদত্ত বিবরণের সারাংশ—

(১) খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে পক্ষধর মিশ্র মিথিলার সর্কশ্রষ্ট পণ্ডিত। বামুদেব পক্ষধরের ছাত্র; মতান্তরে সহাধ্যায়ী। তিনি কাশীধামে বেদান্তও অধ্যয়ন করেন। বামুদেবের শেষ বয়সে নবদ্বীপে মুসলমানগণ ঘোর অত্যাচার করিতে থাকে। বামুদেব তাহাতে উত্থিত হইয়া সপরিবারে উৎকল যাত্রা করেন এবং তথায় অবস্থিত কালে সার্কভৌম নিরুক্ত নামক এক গ্রন্থ রচনা করেন।

(২) রঘুনাথের পুত্র (!) রামভদ্র সার্কভৌম। ইনি “পদার্থ খণ্ডনের” টীকার আশ্রয় পরিচয় দিয়াছেন।

মুরারীগুপ্ত বৃন্দাবনদাস ও কবিরাজ গোস্বামীর পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যে রঘুনাথ।

(১) অদ্বৈত প্রকাশ—সম্প্রতি ত্রিযুক্ত অচ্যুতচরণ

তত্ত্বনিধি মহাশয়ের যত্নে অদ্বৈত প্রকাশ নামক একখানা বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থরচয়িতা ঈশান নামক অদ্বৈত আচার্য্যের জনৈক সেবক। ঈশান নগর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি। অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থে চৈতন্যদেব বামুদেব সার্কভৌমের টোলে দুই বৎসর কালায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। রঘুনাথের (!) মনস্তপ্তির জন্য পাঠাবস্থায় চৈতন্যদেব স্ব-রচিত ত্রায়ের টীকা প্রণয়ন করেন, এই রূপও বর্ণিত হইয়াছে। অদ্বৈতপ্রকাশ হইতে যৎ-কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল—

(১) “গদাধর কহে গুনবেদ পঞ্চানন

চৈতন্যদেবের আশ্রয়ে কহি গৌরের পাঠ বিবরণ  
১০০ বর্ষ ব্যপী প্রথমে শ্রী গঙ্গাদাস পণ্ডিতের স্থানে  
বিজ্ঞানিকা। দুই বর্ষে ব্যাকরণ কৈলা সমাপনে

দুই বর্ষে পড়িলা সাহিত্য অলঙ্কার  
তবে গলা শ্রীমান বিষ্ণুমিশ্রের গোচর

তাহা দুই বর্ষে স্থতি জ্যোতিষ পড়িলা

সুদর্শন পণ্ডিতের স্থানে তবে গেলা

তার স্থানে বড় দর্শন পড়িলা দুই বর্ষে

তবে গেলা বামুদেব সার্কভৌম পাশে

তার স্থানে তর্ক শাস্ত্র পড়িলা দুই বৎসরে

এবে ভূঁয়া পাশে আইলা বেদ পড়িবারে।”

(২) “এই নিম্নাঞ্জন সর্কশাস্ত্রে অতি বিচক্ষণ।

বিজ্ঞাসাগর বিজ্ঞাসাগর উপাধি মুক্তি করিলু স্থাপন।

উপাধি লাভ তাহা শুনি সতে কৈল জয় জয় ধ্বনি।

ছাত্র কহে বিজ্ঞাসাগর দেহ পান চিনি।” -

(৩) “পুণ্ডে গৌরা ববে শাস্ত্র কৈলা অধ্যয়ন

তর্ক শাস্ত্রের টীকা এক কৈলা বিরচণ

চৈতন্যদেব প্রণীত সেই টীকা লঞা তিহ গঙ্গা পাশে যায়

ত্রায়ের টীকা হেন কালে এক দ্বিজ তাহারে পুছয়

গঙ্গায় বিসর্জন তবে বন্ধে কোন গ্রন্থ কহ মহাশয়

ত্রায় শাস্ত্রের টীকা এই শ্রীগৌরাসঙ্গে কয়

দ্বিজ সেই টীকা দেখি করে হাহাকার

কহে মোর পরিশ্রম হইল ছারখার

ইহা দেখি মোর টীকার হইব অনাদর

শ্রীগৌরাসঙ্গ কহে ভয় নাহি দ্বিজবর

নিজকৃত টীকা গঙ্গা মাঝে ডারি দিল।”

(২) শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত—এই সুবিখ্যাত গ্রন্থ

হইতে নিম্নে যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল—

(ক) “ব্যাকরণের পাঠ সমাপ্ত হইলে, নিমাইয়ের ত্রায় পড়িবার ইচ্ছা হইল। তখন তিনি বামুদেব সার্কভৌমের টোলে প্রবেশ করিলেন।”

(খ) আবার বলরাম দাস অমিয় নিমাই চরিতে রঘুনাথ সম্বন্ধে বলিতেছেন—

“রঘু ভীকৃষ্ণদে নদে চমকিত

কেবল নিমাই নিকটে স্থানিত।

রঘুনাথ পড়ে মনোযোগ দিয়া

নিমাই বেড়ায় অতি চঞ্চলিয়া।

কখন যে পড়ে কেহ নাহি জানে

তবু রঘুনাথ নায়ে তার সনে।”

আবণ ১০৫১

অতঃপর রঘুনাথ যে প্রশ্ন সমাধান করিতে দিব্যারাতি চিন্তা করিয়াও পারেন নাই নিমাইর মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার সমাধান করিবার বর্ণনা।

(গ) “নিমাই শ্রায় পড়িতে আরম্ভ করিয়াই একখানা স্নায়ের টিপ্পনী লিখিতে আরম্ভ করিলেন। রঘুনাথও সেই সময় তাঁহার দৌধীতি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। রঘুনাথ কোনরূপে শুনিলেন, বিখস্তরও একখানি স্নায়ের গ্রন্থ লিখিতেছেন। একথা শুনিয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল।” অতঃপর গঙ্গাবক্ষে নিজ-কৃত শ্রায় গ্রন্থের বিসর্জন ও বজুর মনোমালিন্য দূর করিবার বর্ণনা

(৩) ভক্তিচৈতন্য চম্পিকা হইতে নিয়ে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল—

“বাসুদেবের শ্রায় ছাত্র-সৌভাগ্য সকল অধ্যাপকের অদৃষ্টে ঘটে না। গোড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ ও ভক্তিধর্ম-প্রবর্তক চৈতন্য, বঙ্গে নব্য শ্রায়ের প্রবর্তক রঘুনাথ, স্মৃতি-ব্যবহার প্রবর্তক রঘুনন্দন, তত্ত্বশাস্ত্রপ্রবর্তক কৃষ্ণানন্দ, হরিদাস সার্কভৌম প্রভৃতি, সকলেই তাঁহার ছাত্র।”

**আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যে রঘুনাথ।**

“খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে হরিদাস ও রঘুনাথ নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ও চৈতন্যদেব এই উভয়ের সম-সাময়িক। রামভদ্র সার্কভৌম রঘুনাথ শিরোমণির পুত্র ও ছাত্র। তিনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবদ্বীপে প্রসিদ্ধ হইল।”

নব্যভারত পৌষ ১০০৫, ৪৮২পৃঃ—ত্রৈলোক্যানাথ ভট্টাচার্য্য।

“শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ব্যাকরণাদির অধ্যয়ন সমাপন করিয়া কিছুদিন বাসুদেব সার্কভৌমের টোলে শ্রায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তখন শ্রীহট্টবাসী “কৃষ্ণাশ্রয়ী” রঘুনাথ সহ তাঁহার যে রঙ্গ হইত, তাহারই একটা চিত্র এখানে উল্লেখ করিব।”

রঘুনাথ নির্জনে বৃক্ষতলে বসিয়া দীর্ঘকালব্যাপী চিন্তায় যে প্রশ্ন সমাধান করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন চৈতন্যদেব মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা সমাধান করেন।

“রঘুনাথের মনে বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার গ্রন্থখানা অশ্বিতীয় হইবে, ইহাধারা তিনি খ্যাত হইবেন। কিন্তু নিমাইকৃত প্রস্তুত “বিচার পদ্ধতি ও অচিন্তিত সিদ্ধান্ত দর্শন করিয়া তাঁহার সে ভরসা চলিয়া গেল। চির-পোষিত আশা মিলাইয়া গেল, তাঁহার বৈষ্ণব বিদুরিত হইল এবং চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া কল্লণহৃদয় নিমাই বড় ব্যথিত হইলেন এবং বলিলেন, ‘ভাই! তুমি কাদিতেছ কেন? ইত্যাদি।’ অতঃপর পাদটীকায় নিম্নোদ্ধৃত দুই লাইন প্রদত্ত হইয়াছে—

“সেই ক্ষণে দয়ানিধির দয়া উপজিল।

নিঃকৃত টীকা গঙ্গাবক্ষে ডারি দিল॥”

অবৈত প্রকাশ।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ( ১৪৪—৫ পৃঃ )

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রণেতা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিতেছেন—২০ বৎসর বয়সে ( ১৫০৫ খৃঃ ) চৈতন্যদেব নবদ্বীপে টোল স্থাপন করেন, তখন নৈমায়িক রঘুনাথ, শ্রী রঘুনন্দন খ্যাতনামা পণ্ডিত, এবং বাসুদেব তখন বৃদ্ধ ও নবদ্বীপ বাসী। \*

এই পর্যায়ে আমরা রঘুনাথ জীবনীর উপাদান এবং তৎসম্পর্কীয় ইতিবৃত্ত, বৈষ্ণবগ্রন্থ ও আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য প্রভৃতিতে রঘুনাথ বিষয়ক মতবাদ প্রভৃতির উল্লেখ করিলাম। অতঃপর ইহাদের আলোচনা করিয়া সত্য নির্ধারণে যত্নবান হইব।

( আগামী সংখ্যায় সমাপ্য )

শ্রী উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ।

\* Nimai set up a tol himself at the age of twenty \* \* \* \* About this time, there came to Navadvipa, a renowned scholar named Keshava Kashmiri \* \* \* \* There were veteran scholars at Navadvipa about this time ; old Vasudeva Sarbobhauma, the first authority in Logic in India ; Raghumandan Bhattacharyya whose jurisprudence up till now governs Hindu society in Bengal ; and Raghunath Siromani were all living. These were the intellectual giants of this period, but they were scholarly recluses who for many years had scarcely mixed with men.

History of Bengali Language and Literature. Ch. V. PP. 420-1. University Edn. 1911

## স্বপ্নবাসবদত্তা

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

## প্রবেশক

বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। ভাগ্যে আবার মহারাজের বিবাহ-মঙ্গল দেখলুম ! কে জানত এইরূপ সুখ-সলিলের পাকে পড়ে আবার আমরা ভেসে উঠব। এখানে দালানে শুই, অন্তঃপুরের দীর্ঘিতে চান করি, আর কোমল-মধুর মোদক খাই,—মনে হচ্ছে যেন উত্তরকুরুবাসেই রয়েছি—শুধু একমাত্র অঙ্গ-রার অভাব। একটা কিন্তু ভারি দুঃখ,—যা খাই তা ভাল হয় না, ভাল ভাল বিছানার চাদর দেওয়া পালকেও ঘুম হয় না, আর চারদিকে কেবল বাত-বতের মতই আমার চোখে লাগছে। যদি শরীর ভাল না থাকে, আর সুখ যদি চিরস্থায়ী না হয়, তবে সে সুখ সুখই নয়।

চৌর প্রবেশ

চৌ। আর্ঘ্য বসন্তক কোথায় গেলেন ! এই যে বসন্তক। বসন্তক ঠাকুর আপনাকে কতক্ষণ যে খুঁজছি।

বিদূ। কেন ? তুমি আমার খুঁজছ কেন ?

চৌ। রাণী-মা জিজ্ঞাসা কচ্ছেন আমাদের চান হয়েছে কি না।

বিদূ। রাণী-মা জিজ্ঞাসা কচ্ছেন, বেশ; তুমি কেন জিজ্ঞাসা কচ্ছ ?

চৌ। আর কেন ? ফুল-চন্দন আনব কি না তাই জানতে।

বিদূ। হাঁ, মহারাজের চান হয়েছে খাবার ছাড়া আর সব নিয়ে এস।

চৌ। খাবার আনতে বারণ কচ্ছেন যে ?

বিদূ। আমি একটি হতভাগ্য কি না, তাই কোকিলের যেমন চোখ বদলায় আমারও তেমনি উদরেব পরিবর্তন হয়েছে।

চৌ। বেশ, আপনার এরকম হলোই ভাল।

বিদূ। আচ্ছা, তুমি এখন যাও ; আমিও রাজার কাছে যাব।

[উভয়ের প্রস্থান।]

## চতুর্থ অঙ্ক।

পরিচারিকার সহিত গম্ভাবতী ও আবন্তিকা বেনিনী  
বাসবদত্তার প্রবেশ

চৌ। রাজকুমারী প্রমদ বনে এলেন কেন ?

গম্ভাবতী। মুজুরিকা, দেখত শেফালিকার ফুল ফুলেছে কি না !

চৌ। হাঁ রাজকুমারী, মাঝে মাঝে প্রবাল তার পাশে পাশে মুক্তার ঝালরের মত ফুলের গোছাগুলি বেশ দেখাচ্ছে।

গম্ভা। তবে আর দেবী কেন ? ফুল তুলে আন।

চৌ। আচ্ছা, আপনি এই শিলাতলে একটু বসুন, আমি ফুল তুলে আনিছি।

গম্ভা। (বাসবদত্তার প্রতি) আর্ঘ্যে, তবে এখানেই কি বসব ?

বা। হাঁ, বস। যা'ক। (উভয়ের উপবেশন)

চৌ। (ফুল তুলিয়া) রাজকুমারী, দেখুন, দেখুন, মনঃশিলা চাকতির মত শেফালিকা ফুলে আমার অঞ্জলি ভরে গেছে।

গম্ভা। বাঃ ! ফুলগুলি কেমন সুন্দর ! আর্ঘ্যে, এক বার চেয়ে দেখুন।

চৌ। রাজকুমারী, আরো তুলব ?

গম্ভা। না, আর তুলে, কাজ নেই।

বা। বারণ কচ্ছেন কেন ?

গম্ভা। আর্ঘ্যপুত্র এখানে এসে এই ফুলগুলির সৌন্দর্য দেখে সুখী হবেন।

বা। সাধ, মহারাজকে আপনি কেমন ভাল বাসেন ?

পদ্মা। সে কথা ঠিক বলতে পারি না, তবে তাঁর বিরূপে বড় কাতর হয়ে পড়ি।

বী। (স্বগত) আমি বড় হৃৎথের কথা ভুলছি।  
আবার রাজকুমারীও উত্তর দিচ্ছেন ঠিক এমনি।

চেটা। রাজকুমারীকে আমি বলতে শুনেছি যে মহারাজকে তিনি বড় ভালবাসেন।

পদ্মা। আমার শুধু একটা সন্দেহ হয়।

বা। কি! কি!

পদ্মা। আর্ধ্যপুত্রকে আমি যেমন ভালবাসি আর্ধ্য বাসবদত্তাও তেমনি ভালবাসতেন!

বা। না, এর চাইতেও বেশী!

পদ্মা। আপনি জানলেন কি করে?

বা। তাইত, আর্ধ্যপুত্রের প্রতি প্রাণের এতটা টান বলে, তত্ত্বতার বাইরে গিয়ে পড়েছি! (প্রকাশ্যে) যদি তাই না হবে তবে বাসবদত্তা কি কখনও স্বপ্নে ছেড়ে রাজার সঙ্গে চলে আসতেন।

পদ্মা। হাঁ, একথা ঠিক বটে।

চেটা। রাজকুমারী, মহারাজকে ভাল করে বলুন আপনিও বীণা শিখবেন।

পদ্মা। তা তাঁকে ত আগেই বলেছি।

বা। তিনি কি বলেন।

পদ্মা। কিছুই বলেন না, শুধু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে চুপ করে রইলেন।

বা। কিছু কারণ তাঁরই ছিল?

পদ্মা। আমার মনে হ'ল আর্ধ্য বাসবদত্তার গুণের কথা বললে পাছে আমার মনে ব্যথা হয় তাই যেন অতি কষ্টে চোখের জল বারণ করেন।

বা। (স্বগত) যদি সত্য হয় তবে আমি বাস্তবিকই ধস্ত।

রাজা ও বদু্যকের প্রবেশ

বি। বাঃ! বাঁধুলি ফুলে সমস্ত যায়গা ছেয়ে যায় নি অথচ বিরলভাবে এখানে সেখানে পড়ে আছে। এতে

প্রমদ বনটা বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছে। মহারাজ, এদিকে আসুন।

রাজা। হাঁ, বয়স্ক, এই বাচ্ছি।

বসন্তক, মনে হচ্ছে যখন উজ্জয়িনীতে গিয়েছিলুম; অবশী-রাজকুমারীর সঙ্গে তখন প্রথম দেখা। কামদেব আমার অবস্থা দেখে তখন আমার উপর তাঁর পাঁচটি শরই নিক্ষেপ ক'রেছিলেন; সেই শরাবাত এখন কিন্তু আমাকে বিষশরের ঝায় মর্মে মর্মে পীড়া দিচ্ছে। সকলেই জানে মদনের মাত্র পাঁচটিই বাপি, তবে এখন আবার আর একটা তিনি কোথায় পেলেন, বসন্তক?

বি। রাণী পদ্মাবতী গেলেন কোথায়? হয় লতা-মণ্ডপে গিয়েছেন, নয় বাঘের ছালের মত দেখতে যে পুরুতল্লিক শিলা শালকুন্ডমে ঢেকে আছে তারই উপরে বসে আছেন; অথবা হতে পারে সপ্তচ্ছদ-বনে যেখানে সপ্তচ্ছদের খুব কড়া গন্ধ সেখানে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন, আর যদি সেখানেও না গিয়ে থাকেন তবে যে দারুবনে মৃগ-পক্ষি ঐভূতির সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা করেছে সেখানে নিশ্চয়ই গিয়েছেন। মহারাজ ঐ দেখুন শরৎকালের আকাশ—কোথাও একটু মেঘের চিহ্ন নেই তারই নীচে বলদেবের বাহর ঝায় রমণীয় সারসের সারিগুলি চুপ ক'রে উড়ে যাচ্ছে।

রাজা। হাঁ, সখা ঠিকই বলেছে—সারিগুলি দেখতে চমৎকারই বটে। কখন সরগ, কখন বজ্র, কখন উঁচু-নীচু, আবার ঘুরাফেরার সময় সপ্তর্ষি বংশের মত কুটিল—খোলস-ছাড়া সাপের বুকের মত সুনির্মল আকাশের যেন সীমা নির্দেশ করে দিচ্ছে।

চেটা। রাজকুমারী, দেখুন! দেখুন! কোকনদের মাগার মত পাণ্ডুবর্ণ কেমন সুন্দর সারসের সারিগুলি চুপ ক'রে আকাশে উড়ে যাচ্ছে। ওমা! মহারাজ যে!

পদ্মা। কি বল্লি আর্ধ্যপুত্র। (বাসবদত্তার প্রতি) শিখি, আপনি সঙ্গে রয়েছেন এখন আর্ধ্যপুত্রের কাছে বাব না, আসুন আমরা মাধবীকুঞ্জে ঢুক পড়ি।

বা। আচ্ছা আনুন।

(মাধবী কুঞ্জে প্রবেশ)

বিদু। রাণী পদ্মাবতী নিশ্চয়ই এখানে এসেছিগেন,  
এখন চলে গিয়েছেন।

রাজা। তুমি জানকি কি করে?

বিদু। দেখেছেন না শেফালিকা-গুচ্ছ থেকে ফুল  
তুলে নিয়েছে।

রা। বসন্তক, দেখ ফুলগুলি কেমন সুন্দর!

বা। (স্বগত) বসন্তক কণা শুনে মনে হচ্ছে যেন  
আমি উজ্জয়িনীতেই আছি।

রাজা। বসন্তক, এস এই শিলাতলে বসেই পদ্মা-  
বতীর আগমন প্রতীক্ষা করা যা'ক।

বি। আচ্ছা, আনুন বসাই যা'ক! (বসিয়া ও  
আবার উঠিয়া) বাপরে! শরৎকালের গোদ্রে মাথার  
চাঁদি ফেটে গেল; আনুন মহারাজ, মাধবীকুঞ্জে ঢুকে পড়ি।

রাজা। আচ্ছা, তুমি আগে আগে পথ দেখিয়ে যাও।

বিদু। এই যাচ্ছি।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

পদ্মাবতী। বসন্তক সব মাটি কল্লেরে এখন কি করব!

চৌ। রাজকুমারী, ভাববেন না; এই দেখুন না  
এই যে লতাটার মধুকরগুলি বসে আছে সেটা একটু  
নেড়েই আমি রাজার এখানে আসা বাতে না হয় ঠিক  
তাই করে দিচ্ছি।

পদ্মা। বাঃ! বেশ কথা; তাই কর, তাই কর।

(চৌ লতাটি নাড়িতে লাগিল)

বিদু। আরে বলো; মহারাজ, মহারাজ, এভাবে  
না, ফিরে যান, ফিরে যান।

রাজা। কি হয়েছে?

বিদু। আঃ! দাঁসীর বেটা মধুকরেরা কামড়িয়ে দিলে  
গো, কামড়িয়ে দিলে।

রাজা। সাবধান! সাবধান! দেখ বসন্তক মধুকর-  
গুলিকে যেন রাগিও না। ঐ দেখ—মধুমন্ত মধুকর

সোলাগ-ভরে মধুকরীর আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে আছে, তোমার  
পায়ের শব্দে প্রিয়তমার আলিঙ্গন ভেঙে হয়ে আমারই মত  
হৃদশাগ্রস্ত হবে।

তাই আর বেয়ে কাজ নেই, এস এখানেই বস।

বিদু। মহারাজের যেমন ইচ্ছা।

(উভয়ের উপবেশন)

পদ্মা। ভাগ্যে আর্ধ্যপুত্র এখানে বসে পড়লেন, তা  
নৈলে যে কি বিপদই হ'ত!

বাস। (স্বগত) ভাগ্যে আর্ধ্যপুত্র কুশলে আছেন,  
তা নৈলে আমার না জানি কি দশা হ'ত।

চৌ। রাজকুমারী, আমরা কিন্তু আটক পড়লেন;  
এদিকে চেয়ে দেখুন একবার—আর্ধ্য বাসবদত্তার চক্ষু  
যেন ছল ছল করছে।

বাস। মধুকরগুলি হঠাৎ কাশ কুসুম ছেড়ে উড়তে  
লাগলো, তাইতো পরাগ ছুটে এসে আমার চোখে  
পড়েছে—তাই চোখ দিয়ে জল পড়তে।

পদ্মা। হাঁ, তাই বটে।

বিদু। সখা, এখন ত প্রমদ বনে কেউ নেই, একটা  
কথা জিজ্ঞেসা করব?

রাজা। স্বচ্ছন্দে।

বিদু। আচ্ছা মহারাজ, আপনি কি মহিষী বাসব-  
দত্তাকে বেশী ভালবাসতেন, না রাণী পদ্মাবতীকেই বেশী  
ভালবাসেন।

রাজা। সখা, তুমি আমাকে এই সন্ধিতে ফেলতে  
চাচ্ছ কেন?

পদ্মা। সখি, আর্ধ্যপুত্র বড় সন্ধিতেই পড়েছেন।

বাস। (স্বগত) হায়! আমি কি হতভাগিনী!

বিদু। মহারাজ স্বচ্ছন্দে বলুন, একজন ত মরেই  
গেছেন, আর একজন ত কাছে নেই, ভয় কি?

রাজা। নাহে তোমার বলব না, তোমার বড়  
আলগা যুথ!

পদ্মা। আর্ধ্যপুত্র ত অনেকটাই বলে ফেলেন।  
বলার আর বাকী রইল কি!

জীবন-৩২১

বিদু। মহারাজ, এই আমি সকলের শপথ করে বলছি, কারও কাছে কিছু বলব না—এই আমি জিত কাটলুম।

( সেইরূপ করণ )

রাজা। না সখা, বলতে ভরসা হচ্ছে না।

পদ্মা। বসন্তক ত ভারি বোকা, এতেও রাজার মনোভাব বুঝতে পারে না!

বিদু। কি মহারাজ, বলবেন না—আচ্ছা না বলে দেখি কেমন করে এই শিলা ছেঁড়ে আপনি এক পা চলতে পারেন—এই আমি পথ আগলিয়ে দাঁড়ালুম।

রাজা। কি তুমি জোর করবে নাকি?

বিদু। হাঁ, নিশ্চয় জোর করব।

রাজা। বটে, তবে ত বলতেই হ'ল।

বিদু। মহারাজ, রাগ করবেন না—যদি সত্য কথা না বলেন তবে সখার শাপ লাগে।

রাজা। উপায় কি? বলছি তবে, শোন—

রূপে, লীলে মাধুর্য্যে পদ্মাবতী আমার বড় প্রিয়, কিন্তু বাসবদত্তার প্রতি আমার মন এত অহরহুত যে, সে মন কিছুতেই বাসবদত্তাকে ভুলতে পাচ্ছে না।

বাস। ( স্বগত ) বাহোক, এটাই আমার সত্বাপের যথেষ্ট পুরস্কার। এখন এই অজ্ঞাতবাসটাও আমার কাছে স্মৃতির ব'লে বোধ হচ্ছে।

চেচী। রাজকুমারী, মহারাজ ত বড় নিশ্চয়!

পদ্মা। না, তুমি বুঝতে পারিস নি—আমার প্রতি মহারাজের মমতা যথেষ্ট—যিনি এখনও আর্ধ্যা বাসবদত্তাকে ভুলতে পারেন নি, তাঁকে কি কখনও নিশ্চয় বলা যায়?

বাস। রাজকুমারী, আপনার বংশ যেমন উচ্চ, মনটিও তেমন উদার।

রাজা। বসন্তক, আমার কথা ত আমি বলুম, এখন তুমি বল ত রাণী বাসবদত্তা তোমাকে বেশী স্নেহ কতেন, না রাণী পদ্মাবতী বেশী স্নেহ করেন।

পদ্মা। আর্ধ্যপুত্রও বসন্তক হলেন দেখছি।

বিদু। ছল ক'রে ফল কি? আমার কাছে দুই জনই সমান।

রাজা। বৃথ, আমার কাছ থেকে জোর ক'রে সব কথা শুনে নিজের বেলায় সব চাপা দিচ্ছ!

বিদু। কি! আমার উপরও মহারাজ জোর খাটাবেন না কি?

রাজা। হাঁ, জোর খাটাব বই কি। নিশ্চয় খাটাব।

বিদু। তাহ'লে কিছুই ভুলতে পারবেন না।

রাজা। হে মহাত্মা, রাগ করো না। আচ্ছা জোর করব না, নিজের ইচ্ছাতেই বল।

বিদু। আচ্ছা, তাহ'লে বলতে পারি। রাণী বাসবদত্তা আমাকে বড় স্নেহ কতেন। রাণী পদ্মাবতী তরুণী, রূপবতী—একটুও রাগ করেন না, একেবারেই অহঙ্কার নেই, সদাই মিষ্ট কথা বলেন, কারো মনে কখনও ব্যথা দেন না। আর একটা গুণ তাঁর বড়ই বেশী—খুব ভাল ভাল খাবার নিয়ে আমাকে খোঁজ করেন।

বাস। ( স্বগত ) বসন্তকও আমাকে ভুলে যায় নাই দেখছি।

রাজা। বসন্তক, সব কথা আমি দেবী বাসবদত্তাকে ব'লে দিব কিন্তু।

বিদু। হায়! কাকে বলবেন মহারাজ, রাণী বাসবদত্তা যে অনেক দিন মরে গেছেন।

রাজা। ( সবিস্ময়ে ) হায়! তাইত বটে, বাসবদত্তা ত নাই!

পরিহাস কতে গিয়ে আমি যে সব ভুলে গিয়েছি! আমার মন যে তাই কথায় কথায় সত্যের দেশও ছেড়ে গিয়েছে! তাই বুঝি পূর্বের অভ্যাসের দরুণই এই কথা হঠাৎ আমার মুখ থেকে বেড়িয়ে গেল!

পদ্মা। মহারাজের কথাগুলি বড়ই উদার। নৃশংস না হলে এমন কথায় কেউ রাগ করে না।

বাস। ( স্বগত ) আর্ধ্যপুত্র আমাকে যে ভুলতে

পারেন নি তা ঠিক বুঝতে পারলুম। পূর্বে রাজার অসাক্ষাতে এইরূপ প্রিয় কথা শুনেও মনে ততটা বিশ্বাস হয় নি।

বিদু। মহারাজ, অধীর হবেন না। বিধির বিধান লঙ্ঘন করে কার সাধ্য।

রাজা। সখা, তুমি আমার মনের অবস্থা বুঝতে পাচ্ছ না, তাই এমন কথা বলছ—

হুংখ আমি ভুলে গিয়েছিলুম, কিন্তু বাসবদত্তার ভালবাসা আজও ভুলতে পারি নি, তাই সেই ভালবাসা মনে করে আমার আমার হুংখ নুতন হয়ে ভেগে উঠছে। আমি জানি চোখের জলের সঙ্গে সঙ্গে মনের তার অনেকটা কেটে যায় তাই এখন চোখের জল ফেলে কাঁদছি।

বিদু। সখা, কেঁদে কেঁদে আপনার চক্ষু ধোর হয়ে গিয়েছে, যাই মুখ ধোয়ার জল নিয়ে আসিগে।

পদ্মা। আর্যো, আর্যাপুত্রের চোখ এখন অশ্রুধারায় ঢেকে গিয়েছে, চলুন এই ফাঁকে আমরা কুঞ্জ থেকে বেড়িয়ে পড়ি।

বাস। আচ্ছা, চলুন রাজকুমারী—না হয়, আপনি থাকুন : স্বামীকে এরূপ উৎকণ্ঠিত ও শোকাক্ত রেখে আপনার যাওয়া উচিত নয়। আমি একাই যাচ্ছি।

চেচী। আর্য্য ঠিক কথাই বলেছেন—রাজকুমারী, আপনি মহারাজের কাছেই যান।

পদ্মা। তবে কি আমি যাব ?

বাস। হাঁ সখি, যাওয়াটাই ঠিক।

( পদ্মাবতীর রাজার সম্মুখে গমন )

বিদু। ( পদ্মপাতার জল লইয়া ), এই যে রাণী পদ্মাবতী !

পদ্মা। বসন্তক এতে কি ?

বিদু। এটাতে—এটা—এ—

পদ্মা। বল বসন্তক, এতে কি ?

বিদু। মহারানী, বাতাসে উড়ে মহারাজের চোখে

কাশপুষ্পের পরাগ এসে পড়েছে। এই নিন, মুখ ধোয়ার জল।

পদ্মা। যিনি পরের মনে ব্যথা দিতে চান না তাঁর পরিজনেরাও দেখছি তেমনি ( অগ্রসর হইয়া ) আর্য্যপুত্রের জয় হ'ক। এই মুখ ধোয়ার জল এনেছি।

রাজা। একে ! পদ্মাবতী ! ( জনান্তিকে ) বসন্তক ব্যাপার কি ?

বিদু। ( রাজার কানে কানে ) যেমন দেখছেন।

রাজা। বসন্তক, বেশ বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছে। ( মুখ ধুইয়া ) পদ্মাবতী, বসো।

পদ্মা। মহারাজের যেমন ইচ্ছা।

( উপবেশন )

রাজা। পদ্মাবতী, বাতাসে উড়ে এসে শরৎকালের চঞ্জের মত কাশ-পুষ্পের রেণুগুলি আমার চোখে পড়েছে। তাই চোখ দিয়ে জল পড়েছে।

( আত্মগত ) রাজকুমারীর এই সবে মাত্র বিয়ে হয়েছে—যদি সত্য কথা বলি তা হ'লে মনে ব্যথা পাবে। যদিও এর স্বভাবটী বড় ধীর তবু সহজে কাতর হয়ে পড়ে—স্ত্রীলোক ত বটে !

বিদু। মহারাজ, আজ বিকেল বেলায় আপনাকে সঙ্গে করে মগধরাজ বজ্রবাহুবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবেন। শিষ্টাচারের পরিবর্তে প্রতিসংকার কত্তে হয়—আপনি তবে এখন উঠুন।

রাজা। ঠিক কথা; এটাই হচ্ছে প্রথম কর্তব্য—সদৃশ্যের ও শিষ্টাচারের পরিচয় দেয় এমন লোকের অভাব নেই, কিন্তু শিষ্টাচারের মর্যাদা বেশ ক'রে বুঝতে পারে এমন লোক বড় বিরল।

[ সকলের অস্থান।

প্রবেশক

পদ্মিনীকার প্রবেশ

পদ্মি। মধুকরিকা, শীগ্গির এস।



মধুকরিকার প্রবেশ

মধু। এই যে আমি এসেছি? কি কত্তে হবে বল।  
পদ্মি। তুমি কি শোন নি যে, রাজকুমারী মাথা-  
বেদনার কাতর হয়েছেন।

মধু। তা হলে ত বড় কষ্টের কথা।

পদ্মি। শীগ্গির গিয়ে আর্থ্যা আবস্তিকাকে ডেকে  
নিরে এস। শুধু রাজকুমারীর মাথা ধরেছে এইমাত্র  
বলবে, তা হলে তিনি নিজেই আসবেন এখন।

মধু। তিনি এসে কি করবেন?

পদ্মি। কেন, মিষ্টি কথা বলে মাথা বেদনার উপশম  
করবেন!

মধু। হাঁ, তা বটে; রাজকুমারীর বিছানা হয়েছে  
কোথায়?

পদ্মি। বিছানা হয়েছে সমুদ্র গৃহে\*। যাও এখন।  
মহারাজকে খবর দেওয়ার জন্য আমি বসন্তককে খুঁজছি।

মধু। আচ্ছা, তাই যাচ্ছি।

পদ্মি। বসন্তকের দেখা পাই কোথায়?

বিদূষকের প্রবেশ

বিদু। একে বৎসরাজ মহিষী বাসবদত্তার বিরহে  
একান্ত কাতর, তার উপর আবার রাজকুমারী পদ্মাবতীর  
সঙ্গে বিয়ে হওয়ার তাঁর অনেক কথাই মনে আসছে—  
এতে রাজার যে মানসিক সজ্ঞাপটা বেশী হবে তাতে  
আর সন্দেহ কি। এই যে পদ্মিনিকা! পদ্মিনিকা তুমি  
এখানে কেন?

পদ্মি। বসন্তক ঠাকুর, আপনি শোনেন নি রাজ-  
কুমারী পদ্মাবতী মাথা ধরায় বড় কাতর হয়েছেন!

বিদু। মাইরি পদ্মিনিকা, আমি কিছু শুনি নি।

পদ্মি। তাই আপনাদের রাজার কাছে একটু  
খবর দিন। আমিও একটা প্রলেপ নিয়ে যাচ্ছি।

বিদু। রাণী পদ্মাবতীর বিছানা হয়েছে কোথায়?

পদ্মি। ওনাছি, সমুদ্র-গৃহে।

বিদু। আচ্ছা, তুমি যাও, আমিও এই যাচ্ছি—  
মহারাজকে খবর দিব।

[ উভয়ের প্রস্থান। ]

পঞ্চম অঙ্ক

রাজার প্রবেশ

রাজা। কাল-চক্রে আবার দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ  
কত্তে হ'ল! কিন্তু তুমার-পাতে নষ্টলী সেই বাসবদত্তা—  
অবন্তীরাজকুমারী—অবন্তীরাজের অনুরূপা কথা—যাঁর  
অঙ্গ-বসি অগ্নিদাহে লাবাণক গ্রামে ভস্মীভূত হয়েছে  
তার কথা ত ভুলতে পাচ্ছি না—অনেক চেষ্টা করেও ত  
এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পাচ্ছি না!

বিদু। মহারাজ, শীগ্গির আসুন, শীগ্গির আসুন।

রাজা। কেন?

বিদু। রাণী পদ্মাবতী মাথা-ব্যথায় বড় কাতর  
হয়েছেন।

রাজা। কে বললে?

বিদু। পদ্মিনিকা এই মাত্র বলে গেল।

রাজা। হায়! যিনি রূপশ্রীতে উজ্জল ও গুণে প্লাবিত—  
তাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হয়ে আমার শোক অনেকটা কমে  
আসছিল, কিন্তু যদিও আমার বাসবদত্তার শোক একেবারে  
প্রশমিত হয় নি, তবু পদ্মাবতীকে বর কত্তে হবে। বসন্তক,  
পদ্মাবতী আছেন কোথায়?

বিদু। ওনাছি সমুদ্র গৃহে তাঁর বিছানা হয়েছে।

রাজা। তা'হলে পথ দেখিয়ে চল।

বিদু। এদিকে আসুন, মহারাজ।

( ক্রমশঃ )

শ্রীশঙ্করবল্লভ ভট্টাচার্য্য।

## বর্ষাবিরহ

মেঘমালাময় আজিকে গগন  
 জল বরে শুধু অনিবার,  
 মনে পড়ে মুখ বঁধুয়ার।  
 জনহীন ধরা, আমি বাতায়নে  
 বসে আছি ঠায় আজি নিরঞ্জন  
 তার কর ধরি এ মধুর ধনে  
 বহু কথা ছিল বলিবার।  
 মনে পড়ে তাই মুখ তার।

বন-উরা ফুল পড়ে ঝরি ঝরি  
 কে তোলে তাদের প্রিয়া বই ?  
 মালা গাঁথা আজ হলো কই ?  
 নীপ হলো সারা শিহরি' শিহরি,  
 কেতকী ঝরিল গুমরি' গুমরি'  
 কুটঙ্গ-কামিনী কহে ঝরি ঝরি  
 "কতদিন আর জিয়ে রই ?"  
 কে মালা গাঁথিবে প্রিয়া বই ?

নব যৌবনে হুকুল দোলায়ে  
 ভটিনী ছুটিছে ধর ধার,  
 বধা আছে ঐ বঁধু তার।  
 ললিত লতিকা শিহরি কেশরে  
 বন্ধে জড়ায় তাহার দোসরে  
 মিলনে রয়েছে বরিষা-বাসরে  
 সাথে সাথে সবে বঁধুয়ার,  
 আমি কাছে নাই শুধু তার।

৪

আমের আড়ালে, কপোত-কপোতী  
 বসে আছে দৌহে মুখোমুখী,  
 স্নেহে সুখী আর দুখে দুখী।  
 ডাহকে রাগায় ডাহকী কপটী  
 সারস সারসী করে ঝটাপটী  
 কদমের শাখে ময়ূর ময়ূরী  
 খেলিতেছে আজ লুকোলুকি.  
 মোরা বসে নাই মুখোমুখী।

৫

মহানমারোহে মেঘ আসে যায়  
 ঘুরে দেশ দেশ দ্বার দ্বার  
 গলে দোলে মালা বলাকার।  
 গরজন করে রহিয়া রহিয়া,  
 কোনও কথা সে ত আনে না বহিয়া  
 প্রিয়া তবে আর মুখেতে চাহিয়া  
 কেঁদেছিল শুধু অনিবার।  
 ছিলনাক কিছু বলিবার।

৬

চপলা চমকি, হৃদয় চমকে  
 করে যেন মোরে পরিহাস,  
 প্রাণ করে আরো হা হতাস।  
 বারতা বহিয়া মেঘ যায় তেসে  
 জল-ধারা ঐ ছুটে দেশে দেশে  
 মিলনের প্রেম যদি তাহে মিশে  
 নাহি পায় আজি পরকাশ।  
 তবে আর মিছে প্রেমপাণ।

৭

কাজ পরে আছে শত শত, তবু  
 কাজ করা আজ হলো দূর।  
 নিরাশার,—বিনা তরসার।

চরণে না ছুঁলে চলে না যব  
সব ভুল, কানে না দিলে মজ  
হাতে হাতে কিছু মজুরী না পেলে  
একা একা খাটা নাহি যায়।  
আজিকার দিন বরষায়।

শ্রীকালিদাস রায়।

## দানবীর দুর্গাচরণ

ঢাকা জেলার অন্তর্গত পরগণা বিক্রমপুরের কোলীত প্রধান বাণিজ্য সন্ন্যাসীর “সাতভাঙ্গ নগর” গ্রামে খ্যাতনামা ৬ রাঙ্গা কিশোর গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে, ১২৩৩ সালের ১০ই মাঘ মঙ্গলবার ৬ দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন। দুর্গাচরণের পিতার নাম ৬ গৌরমোহন চট্টোপাধ্যায় এবং মাতার নাম ৬ সন্তোষী দেবী। বাল্যে দুর্গাচরণ মাতুলালয়ে থাকিয়াই প্রতিপালিত হন, কিন্তু সে সময় তাহার মাতুলদের অবস্থা স্বচ্ছল না থাকায় বিত্তা-শিক্ষার প্রতি অধিক মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই।

উপযুক্ত বিত্তাশিক্ষা না হইলেও “কুলীনের ছেলের” স্তম্ভকার্য্যে কোনই ব্যাধাত হয় না। তাই চতুর্দশ বৎসর বয়স্ক কালে দুর্গাচরণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত হাড়িয়া গ্রামের ৬ শিবশঙ্কর বিশ্বাস মহাশয়ের কন্যা ৬ রাজলক্ষ্মী দেবীকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর স্বশ্রমালয়ে থাকিয়াই বিত্তাচর্চা আরম্ভ করেন এবং তাঁহার স্বশ্রমেরই বস্ত্রে বাদলা ও পার্শ্ব পড়িতে আরম্ভ করেন। দুর্গা-চরণের গ্রন্থগুলিতে পার্শ্ব শব্দ পাওয়া যায় এবং তিনি পার্শ্ব ভাষার সুগণ্ডিত ছিলেন। কিছু দিন স্বশ্রমালয়ে অধ্যয়ন করিয়া, পরে তিনি কলিকাতার অন্তর্গত রুজ-কর গ্রামে বাইরা সংস্কৃত ব্যাকরণ ও কুলশাস্ত্র শিক্ষা করেন।

চট্টগ্রাম যাত্রা করেন এবং তথায় গবর্ণমেন্টের খাস নিমক মহালে চাকরী গ্রহণ করিয়া সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিতে থাকেন। কিন্তু ঐ স্থানের জল বায়ু সহ্য না হওয়ায় ও নিমক মহালের কার্য্য স্থগিত হওয়ায় তিনি নীলকর সাহেবদিগের অধীনে কার্য্য লইয়া যশোহরে আগমন করেন। চট্টগ্রাম পরিত্যাগের অন্ত আরও একটি কারণ ছিল। চট্টগ্রামেই তাঁহার পত্নী বিয়োগ হয় এবং সেইজন্যই সে স্থানে বাস করা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়া ছিল। যাহা হউক, দুর্গাচরণ পুনরায় উক্ত হাড়িয়া গ্রামের ৬ গৌরীশঙ্কর বিশ্বাস মহাশয়ের কন্যা শ্রীযুক্তা বসন্ত কুমারীর পাণিগ্রহণ করেন।

কিয়দিক্‌বস তিনি নীলকর দিগের অধীনে কার্য্য করিতে থাকেন। কিন্তু সেই সময় নীলবিদ্রোহ ঘটতে দুর্গাচরণ নীলকর দিগের কার্য্য পরিত্যাগ করেন এবং যশোহরে অন্তর্গত কালীপুরে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। এখানে ইহা বলা যাইতে পারে যে, বিক্রমপুর কালীপুরে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, এবং ইহার একমাত্র কারণ এই যে, কালীপুর কুলীন প্রধান গ্রাম এবং উভয় স্থানেই অনেক “স্বঘর” থাকিতে, অনেক সময় “আদান প্রদানাদি” হয়।

নীলকর দিগের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দুর্গাচরণ কলিকাতা জ্ঞান বাজারের খ্যাতনামা রাণী রাসমণির ঠেটে অনেক কাল প্রশংসার সহিত নায়েবী ও অন্যান্য দায়িত্বকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। তৎপরে কর্ম্মত্যাগ করিয়া কালীপুরেই বাস করিতে থাকেন, এবং ১৩১৬ সনের ৫ই অগ্রহায়ণ তারিখে ৬ কালীধামে সজ্ঞানে দেহ ত্যাগ করেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁহার পক্ষাঘাত রোগ হয় কিন্তু এই প্রকার অচল অর্দ্ধাঙ্গ লইয়াও তিনি কোন দিন তাঁহার প্রাত্যহিক নিয়মিত কর্ম্ম, গীতাপাঠ প্রভৃতি স্থগিত করেন নাই।

দুর্গাচরণ স্বশ্রমপরায়ণ হিন্দু ছিলেন। তুলাপুত্র

দেব করিয়া দুর্গাচরণ মাতুলের সহিত কলিকাতা, নবাবি, চতুরাধি, বাগ ও শিক প্রভৃতি উপলক্ষে

দুর্গাচরণ চারিমাस কাল 'মহাভারত' দেন এবং সেই সময় প্রচুর অর্থব্যয়ে দেশবিদেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ঘটক ও কুলীন প্রভৃতি নিমন্ত্রণ করিয়া সকলকে সম্বলিত করেন। এই সকল কার্য কালীন তিনি যে সকল দান করিতেন তাহার একটু বিশেষত্ব ছিল। সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ-ভোজ-নার্থ উপস্থিত। বালকেরা বসিবার ও খাইবার পাতা লইয়া টানাটানি করিতেছে। এমন সময়ে সহস্রাধিক আসন, ও তরুপযোগী থালা ও গ্লাস আসিয়া উপস্থিত। আহারাংশে সেই সকল ব্রাহ্মণ প্রত্যেকেই ত্রৈক এক খানি করিয়া আপন ও থালাও এক একটা করিয়া গ্লাস পাইলেন। আহারের প্রারম্ভ পর্য্যন্তও কেহ এ ধারণা করিতে পারেন নাই এবং তাঁহার ২১০টা নিত্যন্ত আত্মীয় বন্ধু ব্যতীত অল্প কাহাকেও তিনি এ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই।

দুর্গাচরণের একটি কীর্তি "হিরণ্যগর্ভ যজ্ঞ।" বঙ্গদেশে এ পর্য্যন্ত খুব বড় লোকেই এই বিরাট যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছেন। দুর্গাচরণ মহাসমারোহের সহিত মংস পুরাণোক্ত যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। কথিত আছে যে, এই যজ্ঞে সর্বপ্রকার পাপ নষ্ট হয় এবং যিনি বোড়শ মহাদানের অন্তর্গত এই মহাদান করেন তিনি সকল পাতক হইতে মুক্ত হইয়া অশ্বৈর্গলোকে গমন করেন। এই যজ্ঞে দুর্গাচরণের প্রায় পঁচাত্তর সহস্র মুদ্রা ব্যয় হয় এবং এই উপলক্ষে কালী, কাঞ্চি, মিথিলা ও জাবিড় হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আমন্ত্রণ হইয়াছিল ও তিনি তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত সম্মানের সহিত বিদায় করিয়াছিলেন। বিক্রমপুর, নবদ্বীপ ও ভট্টপল্লী হইতেও অনেক মহাপণ্ডিত আমন্ত্রিত হইয়া কালীপুর পবিত্র করিয়াছিলেন। একমাস কাল ব্যাপিয়া কালীপুরে এই মহাযজ্ঞের "জের" চলিয়াছিল।

এই মহাযজ্ঞের অন্তেই দেশে দুর্ভিক্ষ হয়। দুর্গাচরণ এই সময়ে দুস্থ ও দরিদ্রকে অকাতরে বহু অর্থ বিতরণ করেন। তাঁহার গৃহে প্রত্যহ শত শত ভিক্ষুক আহাৰ্য্য পাইত। উপস্থিত সকলের আহাৰ্য্যাদি শেষ

হইলে তবে দুর্গাচরণ ও তাঁহার সহধর্মিণী আহাৰ্য্য করিতেন। গৃহে কেহ অভুক্ত থাকিতে তাঁহারা জলম্পর্শ করাও সম্মত বোধ করিতেন না।

দুর্গাচরণের প্রধান কীর্তি যশোহর জেলার অন্তর্গত লক্ষ্মীপাশায় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন। লক্ষ্মীপাশা তাঁহার স্বগ্রাম হইতে প্রায় দেড়মাইল। ইচ্ছা করিলেই তিনি স্বগ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারিতেন কিন্তু তাহা না করিয়া যাহাতে সর্ব সাধারণ সম্বলিত হন ও সকলেরই উপকার হয়, সেইজন্ম তিনি লক্ষ্মীপাশায়ই বিদ্যালয় স্থাপন করা সম্মত বিবেচনা করিয়া তথায় বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এখনও দুর্গাচরণ প্রতিষ্ঠিত "ডি. সি. ইনষ্টিটিউশন্" (D. C. Institution) হইতে বৎসর বৎসর বহু ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহার কীর্তি কাহিনীর পরিচয় দিতেছে।

দুর্গাচরণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত মাতুলালয় ও খণ্ডরা-লয়স্থ গ্রামস্বয়ের দুস্থের সাহায্যার্থ অকাতরে অর্থ বিতরণ করিতেন।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, দুর্গাচরণ সংস্কৃত ও পার্শ্বভাষায় কৃতবিদ্য ছিলেন। দুর্গাচরণ মাতৃভাষায় অদ্বন্দ্বিত ছিলেন। শকাব্দ ১৭৮৬ বা ১২৭১ সনের ১৫ই শ্রাবণ তিনি 'বিক্রম নাটক' নামক এক "হাস্তরসময়" গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ঢাকা যোগলটুলি স্কুলে যন্ত্রে মুদ্রিত করেন। সে আজ প্রায় চল্লিশ বৎসরের কথা। এতদ্ব্যতীত দুর্গাচরণ "ছিদাম শাপ মোচন" বা "বিচ্ছেদ মিলন পালা" নামে অল্প এক পুস্তক এবং "মানভঞ্জন" নামে অল্প এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শেবোক্ত দুইখানি পুস্তক মুদ্রিত হয় নাই। তবে, সে সময়ে সেগুলি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। দুর্গাচরণের সখের "চপের দলে" ও পেশাদারী চপের দলেও এগুলি সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইত। দুর্গাচরণ তাঁহার নিজের সখের দলে "ঢোল" বাজাইতেন এবং গ্রাম বৃদ্ধগণের নিকট আমরার জানিতে পারি যে, দুর্গাচরণ এ বিষয়ে একজন "জ্ঞানী" ছিলেন।

প্রবণ ১০২১

চল্লিশ বৎসর বা তদূর্ধ্ব সময়ে দুর্গাচরণ যে বইগুলি লিখিয়াছিলেন আমরা তাহা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিলে, ভরসা করি পাঠকবর্গের অপ্রীতিকর হইবে না। এক কালে, আমরা শুনিয়াছি, পিতৃমপুরে দুর্গাচরণের গানের যথেষ্ট আদর ছিল।

প্রথমই যুক্তিত “হাস্তরসময়” কাব্য “বিক্রম নাটকের” আলোচনা করিব। “বিজ্ঞাপনে” গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, “ভোজরাজ-পুত্রী তিলোত্তমার সহিত উজ্জয়িনীর অধীশ্বর বিক্রমাদিত্যের আকস্মিক বিবাহ-বৃত্তান্ত এক কৌতুকবহু ব্যাপার। এই ক্ষুদ্র নাটকে সেই ব্যাপারটী বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই যে, যেমন কবি শক্তি সম্পন্ন লোকে ইহা প্রণয়ন করিলে আদরের হইত, তুর্ভাগ্যক্রমে জগদীশ্বর আমাদের তাদৃশ শক্তিসম্পন্ন করেন নাই। সুতরাং আমার নাটক রচনার প্রয়াস পশু-জনের গিরি-লতনের ছায় উপহাসকর সন্দেহ নাই। তবে সারগ্রাহী গুণজ্ঞ মহোদয়গণ, স্বসামান্য কাব্যেরও সার গ্রহণ করিয়া যে আমোদ প্রকাশ করিয়া থাকেন, আমি সেইটী মনে করিয়াই এই পুস্তক প্রণয়নে হৃঃসাহসিকতা প্রকাশ করিয়াছি। এই আমার প্রথম উত্তম।”

দুর্গাচরণের ইহা প্রথম উত্তম হইলেও ইহা সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। নাটকের আখ্যান বস্তুটী তৎকালোচিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্য বিশ্রামমণ্ডপে পিঞ্জরবদ্ধ শারিকার নিকট অবগত হন যে, রাণী ভানুমতী তাঁহার সহোদরা “তিলোত্তমার রাস্তিরে বে হন” এবং “বরকে দেবার জন্তই রাণী মালা গাঁথবেন।” শারিকা ইহাও নিবেদন করিল যে, “রাস্তির নিষ্ঠতি হলে, রাণীকে নেবার জন্ত ভোজরাজার এক দাসী একটা গাছে উঠে আসবে, বাহির আঙ্গিনায় পাছটি রেখে গোপনে রাণীর নিকটে যাবে, আপনকার নিজে হলে সেই মায়ারক্ষে চেপে রাণী বোনের বে দেহে যাবেন, রাস্তিরেই আবার ফিরে আসবেন।”

মহারাজ বিক্রমাদিত্য এই সংবাদ অবগত হইয়া অস্ত্র-পুরে গমন করিয়া নিদ্রার ভান করিলেন এবং রাণী যখন “কেবল গহনা কথানা পরে আর কাপড় খানা” ছাড়িতে গেলেন, তখন রাজা গোপনে সেই মায়ারক্ষে উঠিয়া “একটী পাশে झুকিয়ে” থাকিলেন। মায়ারক্ষ চক্ষের পলকে ভানুমতীর পিত্রালয়ে পৌছিলে, রাণী রাজাস্ত্র-পুরে পৌছিলেন এবং মহারাজ বিক্রমাদিত্য চিন্তা করিতে লাগিলেন।

উতিমধ্যে শকটারোহণে তথায় “বরের পিতা” আগমন করিলেন এবং সুপুরুষ দেখিয়া বিক্রমাদিত্যের নিকট বলিলেন “বাবু, এখনি ভোজরাজার যে মেয়ের বে হন, আমার ছেলেই তার বর, বাপু হে, আমার ছেলেটি কুঁহ, তুমি একটী কার্য্য কর, বরের পোষাক পরে, ফিট ফাট হয়ে, টোপের মাথার দে বর সেজে, রাজবাড়ী গিয়ে রাজার মেয়েকে বে কর।” অবশ্য বিক্রমাদিত্য “যাদুলী ভাবনা যন্ত সিদ্ধি ভবতি তাদুলী” মনে করিয়া সহজেই সন্মত হইলেন।

বিবাহ সভায় পুরোহিত যখন বরের “বাপ পিত্ত-মহের” নাম জিজ্ঞাসা করিলেন তখন বর বলিলেন “মহাশয়, আমার নাম খোকা, আমার পিতার নাম খোকার বাপ পিতামহের নাম খোকার বাপের বাপ।” পুরোহিত যখন কোপ প্রকাশ করিলেন তখন বর বলিলেন যে “নাম কটা আমার ভাল স্মরণ হচ্ছে না” এবং “বরের পিতারদিকে দৃষ্টিপূর্ব্বক মাথা ঝুঁক উচু করে” বলিলেন “ইনি বলবেন।” ভোজরাজ অবশ্য এ সুযোগ ছাড়িলেন না। “বেয়াই মহাশয়, বাপের নাম বলতে যে কামাই বাবু ভয় করেন। জন্মের কিছু ব্যতিক্রম আছে না কি? না হয় বেরানিকে সুধান থাক্” এই উক্তি শুনিয়া বর বলিলেন “আমার পিতার নাম কে অজ্ঞাত, বলুন দেখি?”

তৎপরে বাসর গৃহের দৃশ্য। অনেকে হয়ত এ দৃশ্য পছন্দ করিবেন না। সুতরাং আমরা অল্প অল্পের বিষয়

আলোচনা করিব। তবে প্রত্যাশ্বিকগণ ৪০৫০ বৎসর পূর্বে বিক্রমপুরের বাসর ঘরে কি প্রকার পরিহাসাদি হইত, তাহা জানিবার ইচ্ছা করিলে আমাদের সমালোচ্য এই নাটকখানি পাড়িতে পারেন।

প্রত্যবে অদুরী পরিবর্তন করিয়া বিক্রমাদিত্য গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রত্যাগমনের পূর্বে যখন তিলোত্তমা তাঁহাকে “নাথ” সম্বোধনে অভিহিত করিলেন তখন বর বলিলেন “সরগে, তুমি আমাকে এমন সম্বোধন করে অপরাধী করে না। আমি নিতান্ত হতভাগ্য! তোমার নাথ সম্বোধনের যোগ্য নই।” তিলোত্তমা উত্তর করিলেন “যে যাকে শাস্ত্রসম্মত বিয়ে করে, সেই তার নাথ, সেই তার হস্তী, কর্ত্তা, বিধাতা। স্বীলোকের স্বামীই সকল, তা আমার নাথ সম্বোধনে বাধা কি? তবে কি না—

সুরসিক মধুকর, চতুর বিলাসী।

মজ্জায় পাগলনী-মন, নিরন্তর বিলাসি ॥

তার প্রেমে মন, যত মধুকর ধায়।

হুলজ কুমুম চয়ে, তেমন কোথায়?

মধুবতী গুণবতী কমলিনী যত

মাধবী, মালতী, ঘূষা, কভু নহে তত।

কেমনে বাঁধিবে বল মধুকর-মন

রূপগুণ না থাকিলে কে করে যতন!

কিন্তু নাথ, তবু কি সে রসিক ভ্রমরে।

মাধবী প্রভৃতি ফুলে অনাদর করে?”

রাজ্ঞাও কিছু কম ছিলেন না। তিনিও পড়ে উত্তর দিয়া বলিলেন—

“সত্যে বন্দী আমি, তাই ত্যজি হেন ধন।

যাইতেছি, কিন্তু, হেথা রবে প্রাণ মন।”

তিলোত্তমা যখন শুনিলেন যে, রাজা অর্থলোভে এরূপ করিয়াছেন তখন তিলোত্তমা রাজার প্রতি “কাল ঝাড়িয়া বলিলেন “অবলা জাতি স্বভাবতঃই অল্পবুদ্ধি। এরা ভাল মন্দ বড় একটা বিবেচনা না করে হঠাৎ মধুর কথা

মোহিত হয়ে পড়ে। আবার অনেক অবতার আছে, যে তাদিগে প্রথম হাতে হাতে আকাশ দিয়ে শেষে ত্রিকূল নষ্ট করে কুল বালাকে অকুল সাগরে ভাসিয়ে পলায়ন করে।” যাহাইউক, অদুরীয়ক বিনিময় করণাপ্তর বিক্রম-দিত্য প্রস্থান করিলেন এবং “কেলিগৃহে কুঞ্জেরও প্রবেশ হইল।”

কুজকে দেখিয়াই তিলোত্তমা “পোড়ামুখ বাদর! তুই কেরে?” বলাতেই কুজ “(সভয়ে) ঠাকরুণ, আমি আপনাকে বে করেছে, আমাকে চিন্তে পারেন” বলিয়া উত্তর দিল এবং নিজ কবিত্ব শক্তির পরিচয়ে সুন্দরীকে প্রলোভিত করার প্রয়াস পাইতে লাগিল। বৃথা প্রয়াস। ফলে তিলোত্তমা “(সরোষে কুঞ্জের বৃকের উপর পদাঘাত করিয়া)” “হাঘড়ের নাক কান কাটিবার” ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কুঞ্জের চীৎকারে বরের পিতা ও কনের মাতা উপস্থিত হইলেন এবং শেথোক্ত। সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কহা কেন “হাঘড়ের নাক কেটে ফেলি না।” ইহার কারণ জিজ্ঞাসা ও কহা অপ্রাভাবে তাহা হয় নাই এইরূপ উত্তর দিলেন। গোলমাল শুনিয়া রাজা ভোজ উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন এবং যখন বরের পিতা “ছেলে ভাল করা অসম্ভব” বলিলেন, তখন ভোজরাজ বলিলেন, মহাশয়, এগুন অনেক ঘটক মহাত্মা পাত্র-পাত্রী ভাল করে থাকেন। টাকা পেলে ফুলের মুখটার ঘরেও জেলেনীর মেয়ে চালিয়ে দেন। আবার দিবি কুলীনের মেয়েকেও যৎসামান্য লোকের হাতে সমর্পণ করেন।” যাহাইউক, অবশেষে স্থিরীকৃত হইল যে, “এদেশের অভিযোগের বিচার কর্ত্তা হইবেন আপনাদের জামাতা বিক্রমাদিত্য” এবং তাহার নিকটই সকলে হৃদয় বিচারের জজ উপস্থিত হইলেন।

বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় রাজা যখন তাঁহার দক্ষিণ বাহ ও দক্ষিণ চক্ষুর নৃত্যের কথা বলিলেন তখন বিদূষক বলিলেন—

“নিম্ন তিতো, কল্লা তিতো, তিতো মাখাল ফল।

তাহতে অধিক তিতো, হুঁসতৌনের ঘর।”

সে দিন বৃষ্টিস্থ অবগত হইয়া রাধা পরদিনস বিচার ফল প্রকাশ করিলেন এইরূপ প্রকাশ করিলেন। এদিকে অশ্বপুরে দুই ভগ্নীতে কথোপকথন কালে রাধা উপস্থিত হইয়া ভাস্কর্য্যতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, “আমি যদি তিলোত্তমাকে বিয়ে করি, তুমি ত বেজার হবে না?” তিলোত্তমা উত্তর করিলেন “বেজার হবে কেন?”

চকোরিণী, কুমদিনী, সুধাংশুর প্রেমধীনী,

আবার যামিনী, তায় লইয়া বিহরে হে,

দিধা নাট মনে করে, সমতাব সবার।

সতিনী সতিনী তারা, কলহ কি করে হে?”

বিক্রমাদিত্যও ছাড়িবার পাত্র নহেন। তবে তিনি যাহা উত্তর করিলেন তাহা একটু অশ্লীল বলিয়া অনেকের ভাল লাগিবে না। সুতরাং আমরা দৃষ্টান্তের যাইয়া দেখিতে পাই যে, বিদূষক কুজ্জকে বালিতেছেন যে—

“ভেকের বাসনা খেতে পদ্মিনীর মধু।

ছাতারের ইচ্ছা হয় কুমদার বঁধু॥

কুকুরের সাধ হয় দেবতুলা পূজা।

সুখে চিত হয়ে শুভে সাধ করে কুঁজ।”

যাহাউক, সকল গোলমাল মিটিয়া গেল।

বৈভালিক রাগিণী আলিয়া ও তাল কাওয়ালীতে নিয়োক্ত গীতে: সকলকে তুষ্ট করিলেন—

“আজ আনন্দে আর নাই পারাপার।

কি ঘটনা বিধাতার! যেমন সুরূপ ভূপতি, তেমন তিলোত্তমা সতী, রতিপতি সনে রতি, মিলন কি চমৎকার।

কেশবের বামে যথা কমলা বিরাজে,

ভূপতির বামে তথা, তিলোত্তমা সাজে,

মিলালে বিধাতা কি রোহিণী-বিজ্ঞরাজে!

যোগা জনে মিলে যোগ্য, সুধাংশুর গণ ভোগ্য।

অশ্বরের ভাগ্যে কোথা, মিলে অশ্বত্থের তার।”

দুর্গাচরণের নাটকের আখ্যান, রচনা ইত্যাদি

আজিকার সমালোচকগণের মনঃপুত না হইতে পারে।

কিন্তু ৪০ বৎসর পূর্বে বিক্রমপুরে যখন এ নাটক অভিনীত হইয়াছিল, তখন স্বাধার সাধারণ সকলেই সান্তিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন।

আমাদের ইচ্ছা ছিল যে, দুর্গাচরণের পাণ্ডুলিপি হইতেও কয়েকটা স্থান উদ্ধৃত করি, কিন্তু প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে। আমরা বিশ্বস্তহুজে শুনিয়াছি যে “হিরণ্যগর্ভ” বা স্কুলের জ্ঞান যশোহরে দুর্গাচরণের যেকোন খ্যাতি, ঢপের গান রচনায় বিক্রমপুরে তাঁহার খ্যাতি তদপেক্ষা কোন অংশে নূন নহে। আমরা সেই তরসায়ই আজ ঢাকার সাহিত্য পরিষদের মুখপত্রে দানবীর দুর্গাচরণের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনার প্রয়াস পাইয়াছি। কবি সত্যই বলিয়াছেন—

Full many a gem of purest ray serene  
The dark unfathom'd caves of ocean bear;  
Full many a flower is born to blush unseen,  
And wastes its sweetness on the desert air”.

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ স্বাক্ষর।

## প্রতীক্ষা

আমি শুধু বসে আছি তব প্রতীক্ষায়,  
কখন আসিয়া তুমি ভূষিত হিয়ার  
মধুর পোহাগ রাশি দিবে গো ঢালিয়া,  
বেদনা-ব্যথিত প্রাণ যাবে গো গলিয়া।  
নিভৃত মধ্যাহ্ন কালে একাকিনী হায়!  
সুদীর্ঘ সময় মম কাটিতে না চায়।  
হৃদয় মাঝারে ভাসে অতীতের গীতি,  
সমীরে বহিয়া আনে তব প্রিয় স্মৃতি।  
তব প্রতীক্ষায় আর কতদিন আমি  
ধাকিব বসিয়া আর হে জীবন-স্বামী।  
তিল তিল করি হায় গণি দণ্ড পল।  
কেমনে কাটাব দীর্ঘ জীবন বিফল!

শ্রীচারুশুভা।

## রাখালের গান

( ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত )

ভুবন-মনোমোহিনী শশুশ্রীমালা বঙ্গপল্লীর বনবিহঙ্গ—  
তানে যেমন দশদিকে সুধার ধারা বর্ষিত হয়, গামা-  
কণ্ঠজাত সুমধুর পঞ্চম হলুধ্বনিতে যেমন মঙ্গলবার্তা  
আশীর্বাদের মত দিগন্তের কোলে ছড়াইয়া পড়ে, সেইরূপ  
বঙ্গ পল্লাজননীর নিজস্ব অপার্বিষ সম্পদ, পল্লারাখালের  
কমকঠের ‘মেঠো’ সুরের মিঠা গানে দশদিক এক  
স্বপ্নরাজ্যে ডুবিয়া থাকিত। বঙ্গপল্লীর সেই অতীত  
সুখের দিন আর নাই। একদিন বঙ্গপল্লীর প্রাকৃতিক  
শোভা মুনিকন-বাহিত ছিল; বঙ্গের প্রতি পর্ণকটীর  
এক একখানি তপশ্চারী মূনির আশ্রমের মত পবিত্র এবং  
শান্তিময় ছিল। সেই বঙ্গের অনবদ্য স্বাস্থ্যসম্পদশালী  
বাক্সালীর বিপুল দেহ-গৌরব, অশীতিপর বৃদ্ধের যুবকো-  
চিত কণ্ঠ-পটুতা, প্রতিবেশীর সহৃদয়তাপরিপূর্ণ অকপট  
ব্যবহার ও সহানুভূতি, সর্বত্র অভাবশূন্যতা এখন গল্পের  
বিষয়ীভূত হইয়াছে। বঙ্গের দিগন্ত প্রসারি মাঠ অপর্যাপ্ত  
শস্যক্ষেত্রে বিভূষিত থাকিয়া দেশ দেশান্তরে আপন গৌরব-  
কাহিনী যুগনাভির সৌরভের মত বিতরণ করিত।  
পালে পালে ধেমুসুন্দ মাঠে মাঠে অফুরন্ত গ্রামল ঘাসে  
উদর পূর্ণ করিয়া বৃক্ষছায়ায় শুইয়া রোমন্থন করিত।  
গ্রামলী ধবলী লালী—কেহ বা মাথা গুঁজিয়া ঘাস খাইত,  
কেহ বা উর্দ্ধমুখে হাঙ্গা রবে নৃত্যশীল বৎসকে সম্মেহে  
আহ্বান করিত। “উন্নত ককুদ মেঘ-গভীর আরাবী”  
বৃষভের-সজল-জলদ-সম্মিত বা ভূবার-ধবল-কমনীয় কাণ্ড  
নয়নের কতই না ভূগুণি সাধন করিত! স্বেচ্ছাবিহারী  
সুপুষ্ঠ দেহ গোধান সকল বঙ্গের অমূল্য সম্পদ ছিল।  
ঘটোয়ী গাভী সকল সুমধুর পয়োদানে দেশের জনগণের  
স্বাস্থ্য সংরক্ষণে প্রচুর সাহায্য করিত। রাখালেরা ক্ষুধা  
পাইলেই কলার পাতার ঠোকা—যখন তখন গাভী

দোহন করতঃ সেই “অজালের” দুধ পেট ভরিয়া পান  
করিত। গাভী সম্মেহে রাখাল বালকের অঙ্গ লেহন  
করিত। ইহা দেখিয়াই ত কবির ভাব-সিন্ধু উখলিয়া  
উঠিয়াছিল—

“দুগ্ধ অবি পড়ে বাটে,  
অমিয় লহরী ছুটে,  
স্মেহে গাভী গ্রাম অঙ্গ চাটে।”

এ কল্পনা অত্যন্ত মৌলিক! বড় সুন্দর!

মাঠের নগ্ন-সৌন্দর্য্যের পারিপার্শ্বিকরূপে রাখাল  
বালকের মুক্ত কণ্ঠের উদাস আকুল সঙ্গীত-লহরী যেন  
বনদেবীর বনবীণার ঝঙ্কারের মত সুদূর পল্লোতে প্রবেশ  
করিত। এই জীবন্ত অশরীরী সৌন্দর্য্য ভাষার আয়ত্ত  
নহে, কেবল মাত্র উপভোগ্য। চিত্রকরের তুলিকা  
কিংবা কবির কল্পনা সেখানে সম্পূর্ণ পরাভূত হয়।  
রাখালের গান বঙ্গের নিরঙ্কর কবির অপূর্ণ সৃষ্টি।  
ইহাতে বর্ণনার কারিগরী নাই, ভাবের উচ্ছ্বাস নাই,  
কুটিলতার ছায়া নাই, সরল, স্বচ্ছ, প্রাণের সহজ  
আবেগময়। শিক্ষিত কবির কবিত্ব অপেক্ষা এই নিরঙ্কর  
কবির শক্তি হীন নহে। কিন্তু হায়! মেঠো গলায়  
রাখাল বালকেরা যে সঙ্গীত-সুধা বিতরণ করিত, এখন  
বঙ্গে তাহার সম্পূর্ণ অভাব। এখন আর সেই মাঠ ভরা  
পড়া ক্ষেত (পতিত জমি) নাই; এখন আর গো-গ্রাসের  
জন্ত জমিদারেরা জমি পরিত রাখেন না। খড় বিচালীই  
এখন গরুর জীবন ধারণের উপকরণ হইয়াছে। তাহাও  
অগ্নি মূল্যে বিক্রীত হয়। পূর্বে গ্রামল দুর্দাদলে উদর  
পূর্ণ করিয়া গাভীদল খড় বিচালীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন  
করিত; খাড়গুলিকে আদবেই খড় খাইতে দেওয়া হইত  
না। খাড় বা গাভীকে ভোর বেলায় “ডাব-ঘাস” (শিশির  
সিক্ত ঘাস) খাওয়ান হইত। এখন সে দিন নাই। দশ  
বৎসর পূর্বেও কৃষকেরা জমি হইতে ধানের ছড়া কাটিয়া  
লইত, তাহার সঙ্গে বতদূর সম্ভব খড় ধরে আসিত,  
তাহাতেই কৃষকের বৎসর চলিয়া যাইত। পৌষ মাসের



শেষ ভাগে ঐ সকল জমিতে খাণ্ডন ধরাইয়া দেওয়া হইত, আর মাঠকে মাঠ ছাঁহ ভরা থাকিত। তাহাতে একদিকে জমিতে উত্তম সার হইত ও অপর দিকে শস্তের ক্ষতি-কারক কাঁট ধাড়ী বাচ্ছা সহ পুড়িয়া মরিত। এখন জীবন-সংগ্রামের কঠোর নিষেধে মাঠে ঘাস জন্মিবার অবকাশ হয় না। ফসলের পর ফসল করিয়া কৃষকেরা ক্ষেত্রের উর্বরা শক্তি ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছে। গবাদিও কাঁচা ঘাসের অভাবে দুর্বল হইয়া পড়িতেছে।

এখনকার রাখালের কার্য্য পুকুর পাড়ে গরু বাধিয়া বিচালী পরিবেশন করা, আর গোয়ালে গামলা দেওয়া। গরুর প্রাতি রাখালের কর্তব্য এখানেই শেষ। এখন আর কীর-সর-নবনীত-পরিপুষ্ট-দেহ সদাপ্রকৃত স্বাধীন রাখালও নাই, তেমন মিঠা “মেঠো” গানও নাই। আমাদের স্বাতি-পটে কখন কখন অভ্যন্তর সেই মধুর বীণার স্বরবৎ রাখাল বালকের কোমল কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি বাজিয়া উঠে, আর একটা বুকফাটা হাহাকার যেন আশুনের হৃদয় লইয়া নাকে মুখে ছুটিয়া বাহির হয়।

পল্লী রাখালের গানগুলি কি মধুর! না শুনিলে কেবল পাঠ করিয়া তাহার মাধুরী উপলব্ধি করা যায় না। বঙ্গ পল্লীর নিরক্ষর কবির রচিত এই সকল সরল সঙ্গীত বড়ই আনন্দদায়ক। সময়ান্তরে আমরা বঙ্গের নিরক্ষর কবির গান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আকাঙ্ক্ষা রাখিয়া অল্প পাঠকগণকে কয়েকটি রাখালের গান উপহার দিয়া বিদায় গ্রহণ করিব।

( ১ )

আরে শোন রাখাল খাই ও রে,  
তোর মায়ে কইছে রে,  
গাঙ্গের জলে হাত মুখ ধুইয়া  
গাছের তলাত্ বৈতে রে।  
ঝিলা লাগলে টোপলা \* খুইয়া  
মুড়ি চিড়া খাইতে রে। †

\* টোপলা—পুটলী।

† “চাউল ভাঙ্গা খাইতে রে” এই পট্টাঙ্গুর।

মায়ের বুকের দুধ খাই’ কইয়া,  
হাতের আঙলায় পানি লইয়া,  
আড়াই চুমুক খাইও রে।  
ছেঁওয়ার মধ্যে লেংটি পাইত্যা  
পূব শিওরে শুইও রে।  
সন্ধ্যার আগে গরু লইয়া—  
বাড়ীত্ ফিইরা যাইও রে।

আগে যখন সে বাড়ী হইতে মাঠে আইসে তখন মা একবার উপদেশ দিয়াছেন। মায়ের মন—ছেলের মঙ্গল চিন্তায় অধীর। পরে যে রাখাল গোচারণে আসিয়াছে, তাহার নিকটেও পুনরায় শুধরাইয়া দিয়াছেন। সে মাঠে আসিয়া তাহাই গাইতেছে।

এই গানটীতে মায়ের সরল সম্বন্ধ উপদেশ ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কেমন আদেশ! দিন দুপ্রহরে হাত মুখ ধুইয়া গাছের তলায় বিশ্রাম করিলে ক্লান্তি ঘুটিয়া যায়। যেখানে সেখানে জল পান করিতে নাই সেকালে মাতা ছেলে-দিগকে এই উপদেশ প্রদান করিতেন। নিতান্তই পথে ঘাটে জলপান করিতে হইলে হাতের অঙ্গুলি পূর্ণ করিয়া জল কইয়া “মায়েব বুকের দুধ খাই” বলিয়া আড়াই অঙ্গুলি জল পান করিতে উপদেশ করিতেন। মায়ের বুকের দুধে সন্তানের অহিত হয় না—তাই এই কথা বলা হইয়াছে। ছেলের পানীয় জল মাতৃ-স্তনের মত পবিত্র অপকার-বিহীন ও হিতকর হউক। পূর্ব বা দক্ষিণ শিয়রে শয়নই হিন্দু-রীতি। মা সেই কথা পুনরায় ছেলেকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন।

( ২ )

মনটা কেমন করে আমার  
বাড়ীত্ ফিইরা যাইত চায়।  
বন্দের (১) পাই (২) চাইয়া রইছে  
আমার কান্দালিনা মায় গো—  
আমার ছুঁনি (৩) মায়।

কেনে যায় মা রান্না ঘরে  
 কেনে (৪) যায় মা দীঘির পাড়ে  
 উকী মাইরা (৫) চাইয়া দেখে  
 দেখা যায় কি নাই ও (৬) যায়—  
 আমাদের দেখা যায় কি না যায় গো।  
 বাইগুণ পোড়া ভাত খাইয়া যায়  
 ঘরের মাইকে শুইতে যায়;  
 কেনে আইসা পীড়ার উপর  
 উকি মাইরা মাইরা চায়।  
 এরই লাইগা পানি খাইতে  
 আইজ (৮) আমার “বিষম” যায়॥

রাখাল আজ জল পানের সময় বিষম গিয়াছিল।  
 জল পান করিতে বা পান খাইতে কখন কখন জল বা  
 পান উর্দ্ধগামী হয়, উহাকে বিষম যাওয়া কহে। প্রবাদ  
 কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ব্যাকুল ভাবে চিন্তা করিলে  
 বিষম যায়। তাই রাখাল বালক আজ বিষম গিয়াছিল।

( ৩ )

গাই বাছুরের পেট ভইরাছে  
 বেলাও ত আর নাই,  
 মায়ে আলাইছে বাতি  
 চল গৃহে যাই।  
 গোয়াইল ঘরে ধোঁয়া দিয়া  
 তপ্তা ভাত গিয়া খাই।  
 মায়ের বুকে মাথা রাইখা—  
 শুইয়া নিদ্রা যাই রে।

( ৪ )

দিবা গেল সন্ধ্যা হইল রবি গেল দূর;  
 কানাইয়া ডাক দিয়া বোলে  
 হারাইলাম বাছুর।

বে-ওর বন (১) আন্ধার রাইত (২)  
 উরাত উচা (৩) ঘাস—  
 কৈ পাইবাম বাছুর আমার  
 লাগবো বার মাস।  
 খাড়াও (৪) তোমরা রাখাল ভাইরে—  
 বাছুর দেইখা লই,  
 উচা আইল উইঠা ডাকি  
 হাঁরৈ হাঁরৈ (৫)।  
 ( ৫ )

কইও হুখু বন্ধের লাগ্ পাইলে গো—নিরলে।  
 আমাদের নি আছে বন্ধের মনে গো।

আমার বন্ধু রঙ্গি চন্দ্র,  
 কদম তলা বান্ধে টঙ্গি,  
 আমাদের নি আজও মনে করে গো।  
 আমার বন্ধু চিকণ কালা,  
 গলায় শোভা বনমালা  
 হাতে শোভে ঐ না লো মুরলী গো।  
 বাঁশী বাজায় কদম্বেরি তলে গো।  
 আমি মৈলে এই করিও  
 দাবানলে না দহিও  
 না ভাসাইও যমুনার জলে গো।  
 আমি মৈলে আর করিও  
 না কান্দিও না পুড়িও  
 বাইকা রাইখো তমালের ডালে গো।  
 কইও হুখু বন্ধের লাগ্ পাইলে।

( ১ ) বে-ওর = অসাম।

( ২ ) আন্ধার রাইত = অন্ধকার রাত্রি।

( ৩ ) উরাত উচা = উরু পর্যন্ত উচ্চ।

( ৪ ) খাড়াও = অপেক্ষা কর।

( ৫ ) হাঁরৈ = ছোট গোবৎসকে গাভীর অঙ্গুরণে  
 ভাজা গলায় আব্বান করা। এই আব্বানে বাছুর সাড়া  
 দেয় এবং ছুটিয়া আইসে।

বিরহিণী রাধার এই করুণ সঙ্গীত ধারা রাধাল বাপ-  
কেরা যখন কোমল কণ্ঠে দশদিকে ছড়াইয়া দেয়, তখন  
শ্রোতা মাত্রেই নয়ন বাস্পভারাক্রান্ত হয়। এই গানটি  
বিভিন্ন স্থানের রাধালের মুখে বিভিন্ন রূপ শুনিয়াছি।

( ৬ )

আমার সরল প্রেমে গরল কে কৈরাছে রে  
নাগর বিনোদিয়া।  
( নাগর বিনোদিয়া আমার রে বন্ধু বিনোদিয়া )  
মনে রাইখ মনমোহিনী—  
মনেতে রাখিয়া রে  
নাগর বিনোদিয়া।  
ত্রিচরণে লিখিও নামটি ঐ চরণে দাসী  
বলিয়া রে নাগর বিনোদিয়া।  
কঠিন তোর মাও বাপ কঠিন তোর হিয়া  
পাইলাম না রে প্রাণ বন্ধুয়া  
চিত্ত বান্ধা দিয়া রে. নাগর বিনোদিয়া।

( ৭ )

ঘাটে নাও লাগাইয়া রে তুমি,  
পান খাটিয়া যাও।  
পান খাইয়া যাও রে বন্ধু  
কথা শুইনা যাও।  
কোন দেশের মানুষ গো তুমি  
কোন বা দেশে যাও  
একখান কথা কও বা না কও  
পান খাইয়া যাও।  
বিনয় কৈরা ডাকছি তোমারে গো  
একবার ফিরা চাও  
ঘাটে নাও লাগাইয়া তুমি  
পান খাইয়া যাও।

কোনও হীনচরিত্রা লজ্জাহীন রমণীর উক্তি স্বরূপ  
এই গানটি রচিত। সরলপ্রাণ রাধাল বালক সময়

অসময় বোঝে না; তাৎপর্যপূর্ণতার ধার ধারে না, আপন  
মনে সাধা গলায় গান গাইয়া যায়।

দেখরে ও ভাই সুবল সখা  
তুই নিরে ভাই চিন্লে।

ঐ রমণী কে যায় গো জলে।

আগে পাছে অষ্ট সখী

ইসারায় কথা বলে।

চিকণ মাজার নীলাম্বরী বাতাসে হেলে ঢলে

ঐ রমণী কে যায় গো জলে।

মদনমোহন ধোঁপা বাইকাছে নানা ফুলে

তাতে গুঞ্জরে অলি দলে দলে

ঐ রমণী কে যায় গো জলে।

এই গানটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া মনে হয়।

কারণ বুদ্ধদিগের নিকট এই সঙ্গীতটি সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত।

বঙ্গ শত্রুর রাধাল বালকের সঙ্গীতগুলি বংগ্রহ করিয়া  
রাখা কর্তব্য কি না, ঐ গুলি বঙ্গভাষার অতীত দিনের  
কোনও সাহায্যকারী ছিল কি না এবং এই সকল সঙ্গীতের  
ভিতর দিয়া প্রাণে কোনও ভাবাবেশ হয় কি না সাহিত্য-  
সেবিগণের উপর সেই বিচার ভার অর্পণ করিয়া আমি  
বিদায় গ্রহণ করিতেছি। সাহিত্যিকমণ্ডলী এই সঙ্গীত  
গুলি সংগ্রহ যোগা মনে করিয়া আদেশ প্রচার করিলে  
পুনরায় আরও কতিপয় সঙ্গীত প্রকাশ করিতে যত্নকর  
হইব।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

## প্রকাশ

যা' কিছু মোর মরমে ছিল

ফুটেছে বাইরে,

গোপন আর নাহি রে কিছু নাহি রে।—

চিত্ত আমার কমল পায়া

সুপ্ত ছিল চেতন হারা,  
ফুটেছে সে ফুলের মত  
নীরবে চাহি রে,  
গোপন আর নাহি রে কিছু নাহি রে !

বুকের বাস টুটিয়া গেছে  
উতলা বাতাসে.  
আঁচলখানি ছড়িয়ে গেছে আকাশে ;  
সজ্জা আমার সকল ফেলি'  
লক্ষ বাঁধন হেলায় ঠেলি'  
সরমহারা দাঁড়াই আসি  
সবার সকাশে ;  
আঁচল খানি ছড়িয়ে গেছে আকাশে ।

ধরণী মোরে টানিয়া নিল  
বাহর কুলায়ে,  
সকল দেহে পরশ দিল বুলায়ে ;—  
অঙ্গ আমার লতার মত  
চুষনেতে বিবশ নত,—  
বাহর ডোরে দেয়গো মোরে  
সকল ভুলায়ে ;  
অঙ্গে আমার পরশ দিল বুলায়ে ।

হাজার বরণ লুকায়ে ছিল  
গোপন অন্তরে,  
আজি সে হেরি আকাশ ভার সত্তরে।  
বক্ষণিবার নৃত্যতালে  
বিশ্ব নিখিল লীলায় দোলে,  
আমারি ঘাপে উজল আজ  
আমার পথ রে।  
বরণরাশি আকাশ ভার সত্তরে।

নিচোল-পাশ বাঁধনখানি  
নীরবে টুটিয়া

হৃদয় মোর বাহিরে ওঠে ফুটিয়া ;  
গন্ধে গানে অরুণ রাগে !  
মর্মে একি পুলক রাগে !  
নিখিল দিগ্ধি পলক রাগে  
চুমছে লুটিয়া ;  
হৃদয় মোর নীরবে ওঠে ফুটিয়া ।

যা' কিছু মোর মরমে ছিল  
ফুটেছে বাহিরে,  
গোপন আর নাহি রে কিছু নাহি রে !—  
স্তব্ধ ভাষা প্রকাশ মাগি  
রুদ্ধ দলে ছিল চাগি,  
উলসে আজি হাওয়ার সুরে  
হরষে গাই রে !  
গোপন আর নাহি রে কিছু নাহি রে !  
প্রীতিরমলকুমার ঘোষ ।

## ভারতশিল্পের নব জাগরণ

এল্ আর্ট ডেকরেটিফ্ ( L' Art Decoratif ) নামক  
চিত্র-শিল্প সম্পর্কিত ফরাসী মাসিক পত্রে মাদাম হোল্বেক  
( Madame Hollebecque ) ভারতশিল্পের নব জাগরণ  
সম্বন্ধে এক উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন : বিগত তরা  
মে তারিখের স্টেটসমেন ( Statesman ) পত্রে ইংরেজীতে  
তাহার এক সারমর্ম প্রকাশিত হইয়াছে । আমরা  
নিম্নে তাহার ভাব সংকলন করলাম ।

ইতি পূর্বে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাহার  
শিষ্যবৃন্দের কয়েকখান ছবি ভারতের প্রাচ্য শিল্প-সামিতি  
( Indian Society of Oriental Art ) পারিগরে  
প্রেরণ করিয়াছিল । তথাকার প্রাচ্য শিল্প-সামিতির  
( Societe des orientales ) তত্ত্বাবধানে এই সমস্ত চিত্র

পারিনগরে প্রদর্শিত হইয়াছিল। সেই সকল চিত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে মাদাম হলবেক লিখিয়াছেন—

“আমাদের বিশ্বাস ছিল যে, আমরা ভারতবর্ষকে বুঝিতে পারিয়াছি। রাশি রাশি তীর্থযাত্রী দল বাণিয়া রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছে, অথবা স্বর্গকামনায় গঙ্গা-তীরে বা দেবমন্দির পূজোপহার লইয়া সমবেত হইয়াছে,—এই জাতীয় চিত্রই আমরা ভালমন্দ উভয় শ্রেণীর লেখকগণের ভারতবর্ষবিষয়ক গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাই। তাঁহারা যে ভারতের ছবি দিয়া থাকেন, সেই ভারত কখনও জাঁকাল, কখনও দরিদ্র, হীন,—এই উদ্ভাস্ত শাস্ত—কিন্তু ইহার সমস্ত অবস্থাই ইউরোপীয় দর্শক দিগের বক্রমোৎপাদক। কিন্তু আজ এই চিত্র প্রদর্শনী উপলক্ষে ভারত আমাদের নয়নের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। এই ভারত পর্যটকদিগের কল্পনা রাগ-রঞ্জিত নহে, ইহা ভারতীয় চিত্রকরদিগের তুলিকোস্তি। প্রাচ্য বাজারে যে নর্তকী কি বাজীকর, সন্ন্যাসী প্রভৃতির নিকট ছবি পাওয়া যায় তাহাই জুলি এবং সেভিল (Jules এবং Bois Andre Cheyillon) ও অন্যান্য লেখকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু সে সবার সহিত আলোচ্য চিত্রের কোন সম্পর্ক নাই। প্রচণ্ড অনায়াস আলোক, অসংযত উত্তম এবং সুখলভ্য ইন্দ্রিয়-বিলাস যে চিত্রের লক্ষণ, পর্যটকেরা সেইরূপ চিত্রই ভাড়াভাড়া সংগ্রহ করিয়া থাকেন। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দের বা অবনীন্দ্রনাথের ভ্রাতা গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনোহর অথচ গভীর চিত্রে সে লক্ষণের অভাব দৃষ্ট হয়।

“জীবন বাণী গভীর সাধনার ফলে এই সমস্ত শিল্পী সম্প্রদায়—বিভক্ত এবং পৌরাণিক ধাৰ্ম্মিক্যের জড়িত ভারতীয় সভ্যতার এক পূর্ণাঙ্গ সামঞ্জস্য পূর্ণ প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যে জাতি এত কাল উদ্ভাবনী-শক্তি রাহত বলিয়া বিবোচিত হইয়াছে, সেই জাতির এই জাগরণকে ‘নব অভ্যুত্থান’ (Renaissance)

বলিয়া অভিহিত করিলে অগ্রায় হইবে না। কিছুকাল পড়িয়া থাকার পর, পুনরায় উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় প্রদান করাকে যদি পুনর্জন্ম বলা অসম্ভব না হয়, তবে ভারত-শিল্পের এই নব জাগরণকেও ‘নব-অভ্যুত্থান’ (Renaissance) বলা অসম্ভব হইবে না। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর শিল্পসাহিত্যের পুনরীকাশকে যে অর্থে ‘নব অভ্যুত্থান’ বলা হয়, সে অর্থে ঐ শব্দ বর্তমান ভারতীয় শিল্পের প্রতি প্রয়োগ করা অসম্ভব। কারণ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। কোনও এক বিশেষ আদর্শের অনুসরণে সমস্ত ক্ষমতা নিঃশেষিত করতঃ সেই আদর্শকে পরিত্যাগ পূর্বক বর্তমান ভারতবর্ষ, স্বীয় অক্ষুরক্ত উত্তমের প্রভাবে, একটা নূতন ও অপরিজ্ঞাত তত্ত্ব বা মতবাদ গুণসম্মত প্রকাশিত করে নাই। কলিকাতার চিত্রকরদল সংস্কারক নহেন। তাঁহারা নূতন কিছু উদ্ভাবন করেন নাই বা পুরাতন কিছু বিনাশ করিতে অগ্রসর হয়েন নাই। তাঁহারা ভারতবর্ষকে চিত্রার কোন নূতন পথে প্রদর্শিত করিতেও প্রয়াসী নহেন। প্রাচীনের প্রতি অহুরক্ত হইলেও তাঁহারা অতীতের সহিত বর্তমানের কোন বিচ্ছেদ ঘটাইতে আনিচ্ছুক। ভারত-শিল্প আবিচ্ছেদে প্রবাহিত হয় নাই সত্য, কিন্তু যে শৃঙ্খল অল্পকালের জন্ত বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল কলিকাতার চিত্রকরদল পুনরায় তাহা সংযোজিত করিয়াছেন।

“নানা রাজনৈতিক পরিবর্তন ও পরাজয়ের মধ্যে ভারতবর্ষ স্বীয় চিন্তার, স্বীয় ধর্ম্মের পূর্নাপর এক্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। আজ আমরা ভারতবর্ষের যে প্রকৃতি দেখিতে পাই,—যে স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করি—তাহা এই যুগ-যুগব্যাপী একোই ফল। দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ বোধ ও ব্রহ্মগ্যর্থ্য অতীতকালে ভারতের বিভিন্ন জাতিকে যে একতাহত্রে আবদ্ধ করিয়াছিল, কিছুই সে বন্ধনকে শিথিল করিতে পারে নাই। যে ভাবপ্রবান দার্শনিক তত্ত্বের প্রভাবে হিন্দুধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছিল, বহুশতাব্দীর পরে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁহার শিষ্যবৃন্দ সেই

তত্ত্বের পুনরুৎপাদন করিয়াছেন। সে তত্ত্বের সারমর্ম সংক্ষেপে একরূপ বলা যাইতে পারে যে, মায়ার কৃষ্ণকে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রপঞ্চ জীবের মোহ উৎপাদন করিতেছে; ইহার অন্তরালে এক সনাতন অবিনশ্বর সত্যরূপ ‘একমেবাদ্বিতীয়ং’ বিরাজ করিতেছেন; এবং বহুজন্মের অবসানে জীবাত্মা সেই পরমাত্মাতেই বিলীন হইয়া যায়। অতএব বৃত্তিতে হইবে যে, পরিদৃশ্যমান পদার্থের যথাযথ প্রতিকৃতি অঙ্কনই শিল্পের চরম উদ্দেশ্য হইতে পারে না; কিন্তু পরিদৃশ্যমান পদার্থরাজি যে অবিজ্ঞেয় তত্ত্বের আবরণ ও আংশিক অভিব্যক্তি মাত্র, তাহার অনুসন্ধানই শিল্পের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই কারণেই দৈনন্দিন জীবনের দৃশ্যাবলী স্বভাবানুকরী ছবি, বাজারের জনতা, বারণসীর রাস্তার দৃশ্য এবং আত্মাত্ম যে সমস্ত ছবির সহিত ইউরোপীয় চিত্রকরদিগের প্রসাদে আমরা সুপরিচিত হইয়াছি, তাহার কিছুই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার শিল্পরন্ধের রচনায় স্থান পায় নাই। নন্দলাল বসুর ‘মদ্যপায়ী’ এবং গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বৃষ্টিতে কেরানী বাবুদের আপিস বাড়ী’ নামক চিত্রদ্বয় বাদ দিতে হইবে। এই শ্রেণীতে ছবি দুইটি জাপানী প্রণালীতে অঙ্কিত; উহাদিগকে মৌলিক রচনা না বলিয়া জাপানী প্রণালী কৃত্তি পূর্ণ অনুকরণ বলাই সঙ্গত। ভারতের আধ্যাত্মিক ভাবপ্রধান দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যাকল্প যতটুকু স্বভাবানুকরণের প্রয়োজন, অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিল্পরন্ধ ততটুকুই স্বভাবের অনুকরণ করিয়া থাকেন। যে-সে ঘটনা এই তত্ত্বের উপযোগী নয়। বিষয় নির্বাচন করিয়া লইতে হয়, পরে তুলিকা সংযোগে উহার ব্যাখ্যা করিতে হয়। বাস্তবিক তাঁহারা তাঁহাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টির প্রভাবে পুনঃসৃষ্টি করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে, দৈনন্দিন জীবনে যথেষ্ট মহত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না; এবং উহা একরূপ গভীর ভাব সম্পন্ন নহে যে তুলিকা সহযোগে উহার স্থায়িত্ব প্রদান

করা আবশ্যক। দেবতাদিগের চরিত্র, গভীর রহস্য-পূর্ণ ধ্যান বা সমাধি, অনাদি শক্তির পরিকল্পনা প্রভৃতি তাঁহাদের মতে, শিল্প প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত আলম্বন। উজ্জলবর্ণ ও শারীরিক সৌন্দর্য্য পরিহার না করিলে এই সকল ভাবের অভিব্যক্তি প্রদান করা যায় না। উজ্জল বর্ণের পরিহার এবং যুগ্ম সামঞ্জস্যের সমাবেশই এক্ষেত্রে প্রয়োজন এবং তদ্বারাই চিত্র ধ্যানের উপযোগী হয়। এবং চিত্রের নিম্নত কোণে এই সমস্ত উচ্চ ভাবের প্রবেশপথ উন্মুক্ত হয়।

“এবিষয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পের ক্রমবিকাশের কাহিনী শিক্ষাপ্রদ। ভারতীয় শিল্পের অজিহ্ব বিলুপ্ত হইয়াছে, এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া পূর্ব্বে ইংরাজ শিক্ষকেরা ভারতীয় ছাত্রদিগকে নিরুপ ইংরেজী চিত্র পুস্তক ও শিল্পদর্শন নকল করিতে শিক্ষা দিতেন। ১৯০৬ সনে কি তরলকটবর্তী কালে, ‘ভারতীয় স্থাপত্য ও চিত্র বিজ্ঞান’ (Indian sculpture and Painting) স্মৃতিজ্ঞ গ্রন্থকার হাভেল সাহেব এই সমস্ত অপকৃষ্ট আদর্শ দূর করিয়া তৎপরিবর্তে প্রাচীন ক্ষুদ্রাকার চিত্র (miniature) সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন; অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শিল্প চর্চার স্বাধীনতা অধঃস্থান করিতে উৎসাহিত করেন। ইংরেজ চিত্রকরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ায় তিনি প্রথমতঃ উজ্জলবর্ণের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তৎপর তিনি ইংরেজ প্রভাবের হস্ত হইতে যতই পরিমুক্ত হইতে লাগিলেন ততই উজ্জল বর্ণ পরিহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ‘দ্রমণের অবসান’ নামক চিত্রে মেঘের অন্তরালে অন্তঃগমনোন্মুখ সূর্য্যের আরক্ত কিরণমালা ঐন্দ্র আর কোনই উজ্জল বর্ণ নাই। উহাতে বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া চলিয়াছে। ঐ চিত্রের বর্ণ ক্যাকাসে সাদা হইতে ক্রমশঃ বেগুনী আভাযুক্ত সাদায় পরিণত করা হইয়াছে। বর্ণ সন্নিবেশ প্রণালীর এই সামঞ্জস্য কলিকাতার চিত্রকরদিগের বিশেষত্ব। ভারতীয় উজ্জল আলোকে

উদ্ভাসিত। লোকে সাধারণতঃ ইহাই লক্ষ্য করিয়া থাকে। কলিকাতার চিত্রকর দলের কেতই তাহা অঙ্কিত করিতে উৎসুক নহেন। ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র পরিপত্ত দশায় যে পরিপক্বতা না উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহা অনুশীলন করিলে ভারতবর্ষের যে চিত্রে যানামধ্যে উদ্ভিত হয়, অক্ষুট, ক্ষীণ আলোকে চিত্রিত করিয়া ইহার ভারতবর্ষের সেই ধীর গম্ভীর প্রতিকৃতিই অঙ্কিত করিতে ভালবাসেন। এক কথায় বলিতে গেলে তাঁহাদের বাহ্য জগতের প্রতিকৃতি আধ্যাত্মিক জীব সম্বন্ধে বই আর কিছুই নহে।

“কেবল শিল্পীগণের চোখেই এই ক্ষীণ বর্ণের প্রয়োগের একমাত্র কারণ নহে। ইহার অন্য কারণও আছে। অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ বহুদিন চিত্রশালায় ক্ষীণবর্ণে চিত্রিত ছবি অনুশীলন করিয়াছিলেন; এবং ইউরোপের ‘রাফেলপূর্ব’ চিত্রকর দলের (Pre Raphaelites) প্রভাবে অনুপ্রাণিত শিক্ষকদিগের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহারা সেই প্রভাব হইতে এখন পরিমুক্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। কুমারী কার্পেলি (Karpelos) চম্পক কুমুমহন্তে পুষ্পাধারের নিকট উপবিষ্ট প্রাচ্য চিত্রকরের একছবি, ফরাসী দেশীয় প্রাচ্য চিত্রকর সমিতিগৃহে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় চিত্রকরদিগের সাক্ষরজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার চিত্রকরদল, তৈল চিত্রের পরিবর্তে,— কুমারী কার্পেলি (Karpelos) কর্তৃক অঙ্কিত সেই চিত্রের শিল্পীয় জায়, চম্পক-পুষ্প-হন্তে পুষ্পাধারের নিকট উপবেশন করতঃ, যে দিন জলীয় বর্ণে ছবি আঁকিতে আরম্ভ করিলেন সেই দিনই তাঁহারা ইউরোপীয় প্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইলেন।

“অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বদেশের সনাতন আদর্শের প্রতি অক্লান্ত। যে ‘ইন্দো পারশ্ব’ ও ‘মোগল’ শিল্প তিন শতাব্দী ব্যাপিয়া উৎকৃষ্ট চিত্রাবলীর সৃষ্টি কারয়াছিল তিনি তাহার, এবং অজ্ঞতা ও অজ্ঞাত গুহার প্রাচীন

চিত্রশালার পক্ষপাতী। তাঁহার এবং তাঁহার শিষ্যবৃন্দের চিত্রে উক্ত শিল্পের কোন না কোনটীর প্রভাব পরিলক্ষ্য হয়। তাঁহার ছাত্রবৃন্দের মধ্যে মুসলমানও আছেন। ইহাদের একজন নুরজাহানের জীবনের ঘটনাবলী মনোহর ভাবে অঙ্কিত করিয়া থাকেন। ঈশ্বরী প্রসাদ সাদির কাবোর ঘটনাবলী পারশ্ব রীতামুসারে চিত্রিত করিয়াছেন।

“শিব-চিত্র অঙ্কনে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা বতদূর ক্ষুণ্ণিত লাভ করিয়াছে, তাঁহার ছাত্রবৃন্দের প্রতিভা তজ্জপ করে মাই। অবনীন্দ্রনাথের হরগৌরীর ছবি মনোহর সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি নন্দলাল বসু, অত্রার গুহাগারে চিত্রিত শিবপার্বতীর যে ছবির অবিকল অনুকরণ করিয়াছেন, তাহা অবনীন্দ্রনাথের ছবি অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। সেই চিত্রে, লতার মত ললিতা পার্বতী স্বীয় পতিগণ গণ্ডে গণ্ডে স্থাপন করিয়া বিরাজ করিতেছেন। যে চিত্রের হরগৌরী ধীর-গম্ভীর, তাঁহাদের অনাবৃত দেহ সৌন্দর্য্য অসমায় পরম্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী;—স্ত্রীপুরুষের যুগপৎ শারীরিক ও আধ্যাত্মিক মিলনের অপূর্ণ রহস্যের এতদপেক্ষা অধিকতর হৃদয়স্পর্শী উদ্বোধন চিত্রশিল্পে আর দেখা যায় নাই। বৌদ্ধধর্মের কাহিনী অঙ্কনে এই শিল্পিদল তেমন নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন নাই। গাজুলীর ‘বুদ্ধের ধর্মপ্রচার’ নামক চিত্রে আধুনিক ভাবের অতিশয় প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। সচরাচর যাহা প্রাচীন রোমবাসীগণের আকৃতি বলিয়া পরিচিত, তাঁহার বুদ্ধদেবেও সেইরূপ আকৃতি পরিলক্ষ্য হয়। আর, গগনেজনাথ ঠাকুর যে ‘নির্কামের’ পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাও বালকোচিত। সে ছবিতে এক নীল সাগর অঙ্কিত করা হইয়াছে; এবং তন্মধ্য হইতে একটা মস্তক ধীরে ধীরে উখিত হইতেছে। কিন্তু তিনি বৌদ্ধ শতাব্দীর ভক্তিধর্ম প্রচারক ত্রিচৈতন্যের যে সমুদয় ছবি আঁকিয়াছেন তাহা উৎকৃষ্টতর। তাহাতে মহেশ্বরের এক ধীর-গম্ভীর রেখাপাত হইয়াছে। অঙ্কন

কৌশলের কথঞ্চিৎ ক্রটি থাকিলেও তাঁহার ‘অস্তিত্ব কালীন শোক’ নামক ছবি গভীর ভাবে চিত্ত আন্দোলিত করে।

“অবনীন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা পতিভাষালী চিত্র নন্দলাল বসু হিন্দুদিগের মহাকাব্য রামায়ণ মহাভারতের অনেক ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার যে সব ছবিতে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ অঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে ইংরেজ প্রভাব দৃষ্ট হয়। কারণ, তাহাতে চমৎকারিত্ব কিংবা উন্মাদনা নাই। কিন্তু তাঁহার ‘জতগৃহদাহ’ নামক ছবিতে সৃষ্টিকর্মতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়; এবং বুদ্ধিষ্টির ‘মহাপ্রস্থান’ নামক ছবি মহত্বপূর্ণ বলে। কিন্তু তাঁহার ‘রাম-চরিত’ নামক ছবিতে প্রকৃত প্রকারের কল কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে তিনি ইউরোপীয় প্রভাব সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছেন; অজস্র গুহার ছবিতে ভারতের সনাতন অঙ্কন-রীতির যে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, তিনি পূর্ণভাবে তাহাই অনুসরণ করিয়াছেন। এই সনাতন অঙ্কন-রীতি এখনও ভারতবর্ষ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। এই আদর্শে চিত্রিত ছবি বাক্সারে পাওয়া যায়; এবং ভারতীয় রমণীরা এখনও স্ব স্ব গৃহের দ্বারদেশে দেবদেবীর যে ছবি অঙ্কিত করিয়া থাকেন তাহাও এই রীতিতে চিত্রিত। রাম-মাতা কৌশল্যার চিত্রে তিনি হিন্দু রমণীর পরিপূর্ণতার এক ছবি আঁকিয়াছেন। ‘সারগভীরে রামের বিলাস’ নামক ছবি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, কাব্যে যাহা চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, চিত্রে তাহার সর্বোৎকৃষ্ট অভিব্যক্তি প্রদান করা হইয়াছে।

“অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিজ্ঞপাণ্ডিত ছবিও অঙ্কিত করিয়াছেন। লোকশিল্পার উদ্দেশ্যেই তাহা রচিত হইয়াছিল।

‘আমরা কলিকাতার চিত্রকর্মেদের ছবির প্রকৃতি বর্ণনা করিলাম;—উহা মনোহর, বিশেষত্বপূর্ণ এবং

ধ্যানস্তিমিত। এক সাধারণ উদ্দীপনার প্রভাবে সমবেত চেষ্টাধারা কতদূর উৎকর্ষ লাভ করা যায় তাঁহারা তাহা দেখাইয়াছেন। ভারতীয় প্রকৃতির অনুরূপ আদর্শ ও কলাকৌশলে নবজীবন প্রদানের অনুবোধে এই সমস্ত প্রতিভাশালী ও কতিমতাহীন চিত্রকরদল নিজেদের ব্যক্তিগত ক্রটি বিসর্জন দিয়াছেন। তাঁহারা বর্ণের ঐচ্ছল্য এবং আকৃতির বৈচিত্র্যে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া থাকিলেও খাঁটি ভারতীয় শিল্পাদর্শের অনুসরণের অভিলାষ বাক্ত করিয়াছেন।

“এই মুষ্টিমেয় চিত্রকরদল যদি উৎকৃষ্ট চিত্রে সৃষ্টি করিতে চাহেন তবে তাঁহাদিগকে বিদেশীয় প্রভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্জন করিতে হইবে। এবং তাঁহাদিগকে পৌরাণিক কাহিনী পরিত্যাগ করিয়া তুলিকা সহযোগে ভারতীয় চিন্তার স্বরূপ বাখ্যা করিতে হইবে। প্রাচীন ভাস্কর্য্যের রচনায় যে তেজ, শক্তি ও মনোমুগ্ধতা দৃষ্ট হয় কলিকাতার চিত্রকরগণের চিত্রে তাহা দেখা যায় না। প্রশান্ত লাবণ্য সৃষ্টির প্রতি ইহাদের অনুরাগই তাহার কারণ। ইহারা ভারতের খাঁটি লক্ষণগুলি আমাদের নিকট উপস্থিত করেন নাই। বিশাল স্বপ্নের লীলাভূমি এই ভারতবর্ষ সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে অসংখ্য দেবতারূপে পরিকল্পনা করিয়াছিল। সৃষ্টির জন্ত তাঁহাদের অসংখ্য হস্ত, ভোগের জন্ত তাঁহাদের সহস্র মস্তক পরিকল্পিত হইয়াছিল। সেই প্রাচীন কালে আমরা পরস্পরবিরোধী অনেক ভাব দেখিতে পাই; জীবন ও মৃত্যু, অনুভূতি ও চিন্তা, ভোগ বিলাস ও সন্ন্যাস। কিন্তু তখনও ভয়ানক উত্তেজনায় মধ্যে আমরা স্থিতিশীলতার প্রতি আগ্রহ দেখিতে পাই; এবং উদ্দাম প্রবৃত্তির উন্নততার মধ্য হইতে স্থির চিন্তাবৃত্তির উৎপত্তি লক্ষ্য করি। এই বৈচিত্র্যময় ও উচ্ছলিত চিন্তাশক্তির উপযুক্ত অভিব্যক্তি আমরা এই চিত্রকরগণের নিকট পাইব বলিয়া আশা করি। কিন্তু এরূপও হইতে পারে যে, ভারতবর্ষ একদিন ধ্যানের রাজ্য



অতিক্রম করিয়া বিশ্বজগতের কর্মরাজ্যে প্রবেশ লাভ করিবে; তখন উহা নববোধন লাভ করিয়া একরূপ এক শিল্পের সৃষ্টি করিবে যাহার দৃষ্টান্ত আমরা এপর্যন্ত দেখিতে পাই নাই।

“ভারতশিল্পের এই নবজাগরণকে সাদরে বরণ করিয়া লওয়াই আমাদের বর্তমান কর্তব্য। যে সভ্যতার মধ্যে এই শিল্প জন্মলাভ করিয়াছে মানসিক নেত্রে সেই সভ্যতার মধ্যে ইহাকে সংস্থাপিত করিয়া ইহার আলোচনা করা আবশ্যিক। আমাদের পক্ষে ইহার অনুকরণ করার প্রয়োজন নাই। এক রমণীর পোষাক নির্মাতার খেলার গতিকে পারস্ত রীতির অনুসরণ করিতে যাইয়া, আমরা তিন বৎসরকাল যে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রদর্শন দিয়াছিলাম, এই উপায়েই সেই উচ্ছৃঙ্খলতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিব। পারস্ত রীতি আমাদের হস্তে আসিয়া, সমস্ত বিশেষত্ব হারাইয়া, এক অর্থহীন জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। হিন্দু শিল্প আমাদের নিকট মানসিক ক্রীড়নক হওয়া উচিত নহে। অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দকে আমরা যে বৃত্তিতে চেষ্টা করিতেছি, এবং তাঁহাদের সাহায্যে যে আমরা ভারতের অমূল্য সভ্যতার প্রকৃত স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি, তাঁহারা আমাদের সে চেষ্টা ও আগ্রহের সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র।”

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ।

## পূর্ববঙ্গের মেয়েলী শ্লোক

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

১৬৪। পান, পান, পিঠা

তিনই নীতে মিঠা।

১৬৫। আং উজায়, ব্যাঙ উজায়,

খইলা, পুঁঠি বলে আমি উজাই।

খইলা=খলিগা মাছ।

১৬৬। যেমুন মা, তেমন ঝি,  
তেমুন তার নাতিন টি।

১৬৭। যত আছে নাড়াবইনা,  
সগলেই হইল কীর্তাইনা।

১৬৮। বাইরা মইলে গে'য়াই খালি।  
মইলে=মরিলে।

খালি=শূণ্য।

১৬৯। নাপিত হইল কবিরাজ  
চুল ফালাইব কে?

১৭০। ওয়া জানি, এইয়া জানি,  
জগতে নাইগো বাকি।

সতীনরে দিল সোনার গয়না  
আমারে দিল ফাঁকি।

১৭১। খইলু মাছ দিয়া রাঁধিলাম ঝোল,  
সতীন গোসা করচে মাথা ধইরা তোল।  
গোসা=ক্রোধ।

১৭২। বইতে জানলে পড়ে না,  
খাইতে জানলে মরে না।

১৭৩। যদি থাকে নাসিবে  
আপনে আপনে আসিবে।

১৭৪। আপনা খেইকা পর ভাল,  
পর খেইকা জল ভাল।

খেইকা=হইতে।

১৭৫। পরের উপর খায়,  
আঠার মাসে বছর যায়।

১৭৬। কুমাইরা রাঁধে কুমারী খায়,  
আঠা মাসে বছর যায়।

১৭৭। আমার পাঠা আমি  
ল্যাঙ্গে কাটুম।

১৭৮। যত কিছু উপার্জন  
বিহুপদে সমর্পণ।

১৭৯। পাইয়া পাঁচনী  
নাম খোয় সুবচনী।

১৮০। সায়েরে শষণ,  
শিশিরে কি ভয়।

১৮১। এইরা ফুরাইলে খাইবা কি ?  
যরে আছে আবিয়াত কি।  
আবিয়াত = অবিবাহিতা।

এই শ্লোকটি পূর্বদেশে কতাপণের প্রচলন প্রমাণ  
করিতেছে। সময়ের পরিবর্তনে এখন বিপরীত স্রোত  
প্রবহমান।

১৮২। অর্ধেক আচার, অর্ধেক বিচার।

১৮৩। ধান বানুতে শিবের গীত।

১৮৪। যত দোষ নন্দ ঘোষ।

১৮৫। আকাঠা নায়ের সাজ বেশী।

১৮৬। রামায়ণের মধ্যে ভূতের কেচুকেচী।

১৮৭। যখন পড়্বে চক্কের মৈ  
এই বড়াই বা থাকব কৈ ?

১৮৮। বিষের লগে উদ্দিশ নাই  
কুলাপানা চকর।

১৮৯। ঘর দেবতা দয়া করে  
দগ্ধর দগ্ধর কলা পড়ে।

১৯০। এক বুড়ীর নানান দোষ,  
নাকের আগায় বিষ ফোট।

১৯১। এক আভাগীর তিন কাম  
ধান ঘাটে আর চোয় আম।

চোয় = চোবে।

১৯২। যার পরে তার ধায়,  
তারই ভিটার ঘুঘু চড়ায়।

১৯৩। ধোপ ক্রাপড়ের তেনাও ভাল।

১৯৪। স্বভাবে করিব কর্ম কি দোষ আমার।

১৯৫। ইল্লৎ যার ধুলে,  
স্বভাব যার মইলে।

১৯৬। মুখে ভাল লাগে যা  
ভাতার পুত্রে নো দিও তা।

১৯৭। হাভাইতার দাঁতে বিষ,  
কাচা কলাটা ভাতে দিস।

১৯৮। ভাতার পুত বানিজ্জে দিয়া,  
আপনে বইলাম গোলা লইয়া।

১৯৯। জানেন না কু, খু,  
করতে আসেন সরকারী।

২০০। আইড়ের মুড়া—ঘির্ড মুড়া  
দেও নিয়া জামাইর পাতে,  
কুইতের মুড়া—কাঠমুড়া  
দেও আইনা আমার পাতে।

ঘির্ড = ঘৃত।

২০১। সাঁক গেলে দীয়া,  
বয়স গেলে বিয়া।

দীয়া = দীপ।

২০২। আইবেন জামাই নিবেন কি,  
জামাইর গোসায় যাইব কি ?

২০৩। এক পাও ছুই পাও বাওয়ন বাড়ী কদর।  
বাওয়ন = বামন ; ব্রাহ্মণ।  
কদর = কতদর।

২০৪। এক শ্বাশুরীর পুত্রসন্তান ছিল না। কেবল  
একমাত্র কন্যা। তাহার একটি ছেলে হয় ইহা সকলেরই  
ইচ্ছা। কিন্তু বহু ঔষধ পত্র, তাবিচ কবচেও কোনরূপ  
সুফল ফলিল না। “নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।”

এক দিন তাহার জামাতা শ্বশুর বাড়ী এসেছেন।  
শ্বশুর মহাশয় জামাতার ক্রম বাজার হইতে খুব বড়  
একটি কই মাছ আনিয়া ক্রীকে উহা উত্তমরূপে পাক  
করিয়া জামাইকে দিতে বলিলেন। কিন্তু এদিকে  
শ্বাশুরী বড়ই লোভী, সে জামাতার পাতে কই মাছটি  
দিল বটে কিন্তু লোভে তাহার রসনেস্ত্রির সরস হইয়া

উঠিল, এবং অসহ্য হওয়ায় ঘরের বারান্দায় গিয়া

জামাইকে ওনাইয়া ওনাইয়া বলিতে লাগিল—

“পাড়ার লোকেও কয়,

আমার মনেও লয়

জামাইর পাতের কই মাছ খাইলে

খাঁতুরার পোলা হয়।”

২০৪ উল্টা পিলে মাড়ির দাঁত।

২০৫। গরজ ভারি, খরচ কম।

২০৬। হাউস আছে রুচ নাই,  
দাঁড়ি আছে মোছ নাই।

২০৭। ধূপ নাই দেবী সাজাল খাও,  
মুই আভাগী আছি দেইখা এইয়াও পাও।

সাজাল=ধোয়া ( ধূপহীন )

২০৮। যার কাজ তারে সাজে,  
অস্ত্রে পরে ঠেঙ্গা বাজে।

২০৯। একপুত্র যার—  
বাপের ঠাকুর তার।

২১০। কায়েতের বুদ্ধি,  
ঘণ্টার বাজি।

২১১। রূপবতী গুণবতী কুলীনের কি,  
তাতে আবার পুত্রবতী তুলনা দিবা কি।

২১২। ঝড়ে বানে বক মরে,  
ফকীরের কেরামৎ বাড়ে।

২১৩। হয় কথা নয় করে,  
গুতা গুতি সার করে।

২১৪। ক্যাংরা চৌথের ঘুম,  
ল্যাছড়া কাঁথার উম।

উম=গরম।

২১৫। উপরি মাইরা কাঁপরি,  
ভাতার মাইরা দেশান্তরী।

২১৬। দরবারে না পাইয়া ঠাই,  
ঘরে গিয়া মাউগ্ কিলাই।

২১৭। মামু,

ভাত এমন চিহ্ন—

ধোদার থিকা উন্নয় আর বিশ্ব।

২১৮। কোথায় রাণী ভবানী,  
কোথায় সেইজে মৃতনী!

২১৯। যার মরণ যথায়  
নাও কইরা যায় তথায়।

২২০। এইও দিন যায়—  
খ্যার দিয়া যে চুল বাঁধে  
সেও ভাতার পায়।

২২১। মায় ছুইলে পোলা মরে,  
এমুন পোলা ন উদরে ধরে।

২২২। কানে হাত না দিয়াই কয়  
কান নিল। চলে।

২২৩। আটে পাথে নাইও,  
নিাত্য নিত্য খাইও।

২২৪। পুত্রের কালী, গঙ্গাজলের বালি।

২২৫। আজ রান্চে কে?  
অ্যাড়নে।

তবেযে ভাল হইছে  
কেবল বড়বো লাড়নে।

রান্চে—রাধিয়াছে।

অ্যাড়নে=। শাখলপ্রকৃতির অকস্মা স্রীলোক।

২২৬। নিমাততা, গিমা তিতা,  
আর তিতা ক্ষর;  
তার থকা অধিক তিতা  
ছুই সতীনের ঘর।

নিম=নিমফল।

গিমা=শাক বিশেষ।

ক্ষর=ক্ষয়ের।

২২৭। লাগেই এত লাড়া?  
ডাইল হইলে ত ভাঙ্গত পাতিল—  
ভাইয়া যাইত পাড়া।

- ২২৮। গোদেদে না কইও গোদ,  
পিরীতে কইও “পানিফোট।”
- ২২৯। আমি জানি না চুল বাঁধতে,  
আমারে কয় আরেক বাড়ী রাঁধতে।
- ২৩০। ফাদা মুখে আদা খায়,  
হাতে হাতে স্বর্ণ পায়।
- ২৩১। নাচতে না জানলে উঠান বাকা।
- ২৩২। অপে গেলাম মাসীবাড়ী,  
এত হুঁগা ভাত, এত বড় একটা চাড়ি।  
অপে = খুব নাম শুনিয়া। চাড়ি = গামলা।
- ২৩৩। পেটের খেঁকা পোলা পড়ে,  
উবুত হইয়া ডাবা ধরে।  
ডাবা = হাঁকা।
- ২৩৪। দাদায় কইছে বাড়ী বান,  
বানুতে আছি ওদা ধান।
- ২৩৫। ভাত পানু না বাদী,  
মাছ ভাজার লিগা কাঁদি।
- ২৩৬। কপালে আছি বাদী,  
স্বখের লিগা কাঁদি।  
লিগা = জন্ম।
- ২৩৭। স্বস্তুর বাড়ী মথুরাপুরী,  
তিন দিন পরে ঠাঙ্গার বাড়ী।
- ২৩৮। স্বস্তুর বাড়ী বাসা,  
একজনরে মারলে তিন জনে করে গোসা।
- ২৩৯। পাগে খাইয়া রাগে রাখে।  
পাগে = হৈসেল খানায়।
- ২৪০। যার বিয়া তার মনে নাই,  
পাড়া পরসার ঘুম নাই।
- ২৪১। ভাল কথা মনে পড়ছে  
আচাইতে আচাইতে,  
ঠাকুরঝিরে পানির কুটুমে নিল  
নাচাইতে নাচাইতে।

কোন গ্রামে কোন বধু ও তাহার ননদ একসঙ্গে  
নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিল। দৈবক্রমে ননদটিকে  
হঠাৎ কুমীরে নিয়া গেল। ভ্রাতৃবধুটি এমন সন্তদয়া যে  
এ ভয়ানক খবরটা বাড়ীতে কহিতেও তিনি ছুলিয়া  
গেলেন। অবশেষে যখন খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া  
আচমন করিতেছেন তখন তাহার উক্ত ঘটনা মনে  
পড়িল এবং অতি হালুকা ভাবে বলিলেন —

“ভাল কথা মনে পড়ছে” ইত্যাদি।

- ২৪২। এী ভাঙ্গে মুঁছ, তারে কয় ছুচা,  
মাইয়া ভাঙ্গে মাইট, তারে কয় বাইট।
- ২৪৩। নাপিত দেখলে  
কুনি নৌখ্ বাড়ে।  
নৌখ = নখ্
- ২৪৪। বাড়ীর ধারে কামার,  
দাও গড়াইতে দেও অমার।
- ২৪৫। আমার ঠাকুর খায়েন কি ?  
যি ভাত। “  
না পাইলে ? সুধা ভাত।
- ২৪৬। ছটি লটি ইংরাজি পড়েন,  
খইলতানিরে কয়েন “পাহেট।”
- ২৪৭। চোর গেলে বুদ্ধ বাড়ে।
- ২৪৮। ভাত পায় না বাবাজি,  
খাট্টা খাইতে চায়।
- ২৪৯। হয় না হয় বিয়া,  
সাদি বাজাও গিয়া।
- ২৫০। লাখটাকা, লাখটাকা,  
হুইকুড়ি দশ টাকা।
- ২৫১। অভাগীর লগ্গনে  
চাদ ওঠে দক্ষিণে।
- ২৫২। রাহ চণ্ডালের গুণ্ডি—  
এক লাফা বাগুণে তিন চাড়ালনীর কুণ্ডি।  
কোন এক চণ্ডালপাড়ার ধার দিয়া গ্রহবিগ্রহ বাইতে

ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ৩ টি চণ্ডালিনী তাহাদের নিজ নিজ কোঠি লিখাইয়া লইতে চাহিল। ঠাকুর পারিশ্রমিক চাহিলে তাহারা একটিমাত্র লাক্ষা বেণু ছাড়া আর কিছুই দিতে পারিবে না জানাইল। ঠাকুরও যথালভ ভাবিয়া উহা সেই তিনটি কোঠি লিখিয়া দিলেন।

২৫৩। মাঁইয়ার নাম ফেলি,  
পরে নিলেও গেল, যমে নিলেও গেল।

২৫৪। অছুক্সা বড়ই, ভুজ্ঞা বেল,  
ডাকে বলে পরাণ গেল।

২৫৫। দাতায় দান করে,  
ভাড়ারী পেট ফাটে।

২৫৬। খাওইয়া আছে, চাওইয়া নাই,  
নেওইয়া আছে, দেওইয়া নাই।

চাওইয়া—দৃষ্টিকরিবার লোক;  
সহায়ভুক্তিকারক।

২৫৭। আদি কাইলা ভাদী,  
ভাতারে ডাকে “দিদি।”

২৫৮। খাইলাম ত বার চারি,  
না খাইলাম ত দিন চারি।

২৫৯। এক বিয়া ই দেবের বরে,  
আরেক বিয়া কি পাছে ধরে?

২৬০। ক্ষুধা থাকলে সুখও রোচে,  
ভেকরুলে কামর দিলে বুড়াও নাচে।

সুখ—সুখুভাত।

ভেকরুল—ভিমরুল।

২৬১। ভাসুর ঠাকুর, ভাসুর ঠাকুর, শোনচ নি,  
অভাগীর কথা বোঝছ নি?  
বাইদা মাগী বাড়ীত্ আইল,  
চৌক্ ঠার দিয়া পাছ দুয়ারে নিল,  
কপাল চিরা মাউরকা ভরল।  
নিম্বর দিয়া বুঁদ মারল,  
ঘরকোণা ব্যাঙ, মোরে করল।

কোন এক ভ্রাতৃবধু তাহার ভাসুরকে জানাইল যে একদিন এক বেদেনী তাহাদের বাড়ী আসিবা মাত্র তাহার সতিনী তাহাকে চৌক্ ঠারিয়া পা দুয়ারে ডাকিল, এবং বেদেনীর নিকট হইতে কি এক শিকর লইয়া হতভাগিনীর কপাল চিরিয়া উহা ভরিয়া দিল এবং তদুপরি সিন্মুরের টিপ্ পরাইয়া উহা অদৃশ্য করিয়া ফেলিল এবং তদবধি সে সতীনের চক্রান্তে কুণো ব্যাঙ হইয়া ধরে আছে, আর তার সতিনী পরম সুখে স্বামী নিয়া সংসার করিতেছে।

২৬২। সাত বার খাইয়া রইচে শুইয়া,

তার চাউল দেও আগে ধুইয়া।

২৬৩। মূর্খের স্ত্রী, পণ্ডিতের মা,  
“গম্যতাং” টা বাধা করে—

ধীরে ধীরে যা।

একগ্রামে এক পণ্ডিতের একটি টোল ছিল। বহু ছাত্র সেখানে লেখাপড়া করিত। একদিন এক কৃষক-পত্নী তাহার একমাত্র ছেলেটিকে লেখাপড়া শিখাইবার উদ্দেশ্যে পণ্ডিত মহাশয়ের হাতেপায়ে ধরিয়া ঐ ছেলেটিকে রাখিয়া গেল। পণ্ডিত মহাশয় বহু চেষ্টা করিয়াও যখন লেখাপড়ার দিকে উহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিলেন না তখন নিরাশ হইয়া তিনি উহাকে বাড়ীর গোরু রাখার ভার দিলেন। এ দিকে ছেলেও মাঝে মাঝে বাড়ী যাইয়া ছুঁচরটা ভিড়ি মিড়ি আঙড়ায় আর মা ভাবে যে তার ছেলে তারি পণ্ডিত হয়েছে। একদিন ছেলেকে বাড়ী নেওয়ার জন্য তার মা স্বয়ংই টোলে এসে উপস্থিত। মা আসিবা-মাত্র ছেলে ত গিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট বাড়ী যাওয়ার বিদায় চাহিল, কিন্তু তখন পণ্ডিত মহাশয় অধ্যাপনা কার্যে বিশেষ ব্যাপ্ত, বার বার বিদায় চাওয়াতে তিনি মুখ ব্যাদান করিয়া বলিলেন—“গম্যতাং”। এখন রাখাল ছেলে ত কিছুই বুঝিতে পারে না, সে বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল; “কি

কইলেন কি কইলেন ?” তখন পণ্ডিত মহাশয় ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন “তোমার মাথা, যা।” বালক তখন “গম্যতাৎ” শব্দের অর্থ—মাথা ঠাহরাইয়া তার মার সঙ্গে বাড়ী চলিল। বাইতে বাইতে ছুপুয়ের রৌদ্রে তার মাথা ঘরিয়া গেল—কিছুতেই দ্রুত হাটিতে পারিতেছে না। কিন্তু তাহার মা খুব তাড়াতাড়ি হাটিতেছে। তখন সে তার মাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—

মুখের জ্বা, ( কারণ তাহার পিতা ত মুখই ছিল )

পণ্ডিতের মা, ( সে নিজে ত এখন পণ্ডিত হইয়াছে )

গম্যতাংটা ( মাথাটা ) ব্যাধা করে, ধীরে ধীরে যা।

২৬৪। আদা চুম্বীর মনে কামড়।

২৬৫। অধিক সন্তান যার পাপের সাজা তার।

২৬৬। গীত গায় কে লো রাই ?

আমার দেওরের ভাই।

গায় কেমন ?

আপনা রস, পয়ের বেরস,

ভেড়ার থিকা কিঞ্চৎ সরস।

দেওরের ভাই=দেবরের ভাই,

অর্থাৎ স্বামী।

২৬৭। বুড়ীর আগছ্যারেও ভয়,

পাছছ্যারেও ভয়,

সকল কথা গুইয়া বুড়ী

কামের হিসাব লয়।

২৬৮। এত কইরা আনলাম আমি ভাঙইয়ার বি,

মুখের চোটে মইলাম সদারামগুটি।

২৬৯। দাসী লো দাসী আন ত বোড়া,

বিবাদ করতে বাই উত্তর পাড়া।

২৭০। বিয়া বাড়ীর কাম,

বুড়লে বাড়লে নাম।

২৭১। কামারের ভাইল, আইল আর কাইল।

২৭২। ভালরে বইলা করলাম বো,

বো বলে আমারে পইথানে বো।

বো=বাছ।

২৭৩। যদি ধোয় পাতিলের কোল, তবে ধায়

বেহুনের কোল।

বেহুন=ব্যাঞ্জন।

ত্রিযোগেন্দ্র কিশোর রচিত।

## অসময়ে

( ১ )

প্রকৃতি লো, আজি অসময়ে একি

ধরিলে সাজ ?

এ মহা শিশিরে বাদলের ধারা

অবনী-মাক !

ভুবার-নীতল অধীর সমীর

রুদ্ধ ছয়ায়ে আঘাতে গভীর

নাহি কি লাজ ?

রবি-শশী-তারা নীরদের কোলে

ঘুমাইয়া সুখে পড়িল কি ছলে

পাশরি কাজ ?

প্রকৃতি লো আজি অসময়ে একি

ধরিলে সাজ ?

এ মহা শিশিরে বাদলের ধারা

অবনী-মাক !

( ২ )

কেতকী-কদম্ব কোথায় গো আজি

সুখমা মাথা ?

শেফালি-পেঁদায় খোলাপে জ্বাঝার

বাগান ফাকা ?

মাঠে-মাঠে কোথা শ্রাম ভূণ-দল

কোথা কৃষাণের কর্ণের রোল

লাদল হাঁকা ?

আজিকে সেথায় কাঁচা-পাক ধান

নাচিছে পুলকে মায়ের মহান

আশিস্ রাকা।

কেতকী-কদম্ব কোথায় আজিকে  
সুখমা মাথা ?  
সেফালি-গেঁদার গোলাপে আমার  
বাগান ঢাকা !

( ৩ )

কোথায় গগনে আজিকে বলাকা  
হাজার দলে ?  
সারস-সমাজ কেলি যে করে না  
দাঁধির জলে !  
আজিকে আকাশে সুরভিল টিয়া  
উড়িছে হরবে কল কলাইয়া  
সুতান-ছলে !

শুক তড়াগে নীচে পড়ে নার  
বিফল বাসনা মাছরাঙাটির  
চরণ টলে !

কোথায় গগনে আজিকে বলাকা  
হাজার দলে ?  
সারস-সমাজ কেলি যে করে না  
দাঁধির জলে !

( ৪ )

তন্ত্রী আমার এখনো বাঁধি নি  
বাদল-তানে !  
এখনো জাগেনি আকুল তিয়াস  
বিরহী-প্রাণে !  
তবেলো প্রকৃতি, অসময়ে হেন  
অশ্রু তোমার উধালিছে কেন  
অপার মানে ?

করা ও যৌবনে আজি কোলাকুলি  
কেন্ ভাব তব নিব মোরা তুলি  
কেহ কি জানে ?

তন্ত্রী আমার এখনো বাঁধি নি  
বাদল-তানে !

এখনো জাগে নি আকুল তিয়াস  
বিরহী-প্রাণে !

( ৫ )

কুন্তলদাম ফেলগো সরায়ে—  
মুছগো আঁধি !

অকালে এ সাজ শোভে না তোমায়  
কেমনে আঁকি !

সহজ, সরল, সুন্দর সাজে  
এস আরবার ধরণীর মাঝে  
শিশির মাখি !

কুয়াসা-আঁচলে ঢাক গো বদন  
অমিয়-মধুর বধুর মতন  
হৃদয়ে রাখি !

কুন্তলদাম ফেলগো সরায়ে  
মুছগো আঁধি !

অকালে এ সাজ শোভে না তোমায়  
কেমনে আঁকি !

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত ।

## পুস্তক পরিচয়

সাগর সঙ্গীত,

স্বকবি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস, বার-এট-ল প্রণীত, রয়েল অষ্টাংশিত, চমৎকার ছাপা, চমৎকার কালী, প্রতি পৃষ্ঠায় সাগরের সুন্দর হাকটোন ব্লক, তা ছাড়া বহুসংখ্যক অতি সুন্দর হাকটোন ব্লক আরও আছে। এরূপ সুদৃশ্য পুস্তক বঙ্গভাষায় বিরল। বিস্তৃত সমালোচনা সত্ত্বে প্রকাশিত হইবে। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্যের উল্লেখ নাই।

পঙ্কজী.

স্বকবি শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন কুশারী প্রণীত, ডবলক্রাউন, ষোড়শাংশিত, ঢাকা হইতে প্রকাশিত। নূতন ধরণের কবিতা পুস্তক। সমালোচনা সত্ত্বে পত্রস্থ হইবে।

পাখি-পাখি কথা.

বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত রাধালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত—ভাল বাধাই—ভাল কাগজ ও ছাপা—প্রকাশক, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

# ময়নামতির গান ভূমিকা।

১৩১৭ সনের শ্রাবণ মাসে কোন কক্ষে নিযুক্ত হইয়া আমি কুমিল্লা অবস্থান করিতেছিলাম। সেই সময়ে বঙ্গ-বর শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ বাবুও সঙ্গে পরিচয় হয়। ১৩১২ সনের দ্বিতীয় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়ের ময়নামতির গান নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তিনি তাহাতে লিখিয়াছিলেন “তিনিয়াছি ত্রিপুরা জেলায় ও পূর্ববঙ্গে রাজ্য গোপী-চাঁদের পাখা প্রচলিত ছিল।” বৈকুণ্ঠবাবুর সঙ্গে কথা

প্রসঙ্গে জানিতে পারি যে, ময়না-পুঁথি আবিষ্কারের মতির গান তাঁহারা জেলেবেলায় ইতিহাস পল্লী বৃদ্ধদের মুখ হইতে শুনিয়াছেন। এবং ময়নামতির পুঁথি এখনও দৃশ্যাপ্য নহে। তাঁহার নিকট অল্পসন্ধানে আরও অব-গত হইলাম যে, কুমিল্লা হইতে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত যে অল্পচ পর্বতশ্রেণী আছে তাহার এক অংশ ময়না-মতির পাহাড় নামে কথিত হয়। এই অল্পচ পর্বত-শ্রেণীর টিলায় টিলায় বহু প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ এখনও বর্তমান আছে। ময়নামতির পাহাড় নামে পরিচিত টিলায় ময়নামতির বাড়ী ছিল এবং তাহার অনুরেই গোপীচন্দ্রের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। এখনও স্থানীয় লোকেরা তাহা অসঙ্কোচে নির্দেশ করিয়া থাকে। ময়নামতির পাহাড়ের একটি টিলার নাম ঈদ্রনাগড়া এবং অল্প একটি টিলার নাম পদ্মনামড়া। ইহা শুনিয়া এবং ময়নামতির পাহাড়ের পশ্চিম দিকস্থ পরগণার নাম পাটিকারা পরগণাও ময়নামতির টিলার উত্তর দিকে দেবপুর নামে এক গ্রাম আছে ইহা অবগত হইয়া আমার কৌতুহল অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইল। চারি পাঁচ মাস আমি কুমিল্লায় ছিলাম। কুমিল্লা হইতে আসি-বার কালে ময়নামতির পুঁথির লক্ষ অল্পসন্ধানে করিতে

বৈকুণ্ঠবাবুকে অগ্ররোধ করিয়া আসিলাম। আমি কুমিল্লা পরিত্যাগ করিবার কিছু পরেই বৈকুণ্ঠবাবু কবি ভবানীদাস বিদ্যাসিত ময়নামতির পুঁথির আবিষ্কার করেন। পুরাতত্ত্বানুসন্ধানে উৎসাহী কুমিল্লা রাজবাড়ীর সহকারী ম্যানেজার শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ও একখণ্ড ভবানীদাসের পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠবাবুকে তিনি এই পুঁথি অল্পগ্রহ করিয়া দেখিতে দেন। বৈকুণ্ঠবাবু তাঁহার নিজের আবিষ্কৃত পুঁথি ও এই পুঁথি, এই দুইটি পুঁথির পাঠ মিলাইয়া ময়নামতির পুঁথির পাঠ উদ্ধার করেন, এবং তাহা অবলম্বনে ত্রিপুরা সাহিত্য সভার এক অধিবেশনে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৩১৮ সনের মাঘ মাসে আমি প্রত্নানুসন্ধানে আবার কুমিল্লায় যাই। এবং বৈকুণ্ঠবাবুকে সঙ্গে করিয়া নানা স্থানে ঘুরি। আসিবার সময়ে বৈকুণ্ঠবাবুর নিকট ভবানী-দাসের পুস্তক ঢাকা সাহিত্যপরিষৎ হইতে প্রকাশিত করিবার প্রস্তাব করিলাম। বৈকুণ্ঠবাবু তাহাতে সানন্দে সম্মতি দিলেন, এবং তাঁহার উদ্ধৃত পাঠ সম্ব-লিত খাতাখানি ও ত্রিপুরা সাহিত্য সভার পঠিত প্রবন্ধটি আমার হাতে সমর্পণ করিলেন। প্রবন্ধটি ১৩১৯ সনের ফাল্গুন মাসের প্রতিভায় বাহির হইয়াছে।

দুইটি পুঁথি মিলাইয়া পুঁথির একটি বিশুদ্ধ পাঠো-দ্ধার কার্য্য বৈকুণ্ঠবাবু করিয়াছেন; এতদ্ব্যতীত তাহাকে বিস্তারিত পরিচয় করিতে হইয়াছে। কিন্তু তবু দুই এক স্থানে ঠিক পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে কি না ব্যাখ্যা ও পাঠো-দে বিষয়ে নিশ্চিত হইতে পারি-ছার কাহিনী নাই। ব্যাখ্যা কার্য্য সম্পূর্ণ আমার করিতে হইয়াছে। কেবল দুই এক স্থানে দুই একটি শব্দের অর্থ বৈকুণ্ঠবাবু তাঁহার খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা



হইতে কিছু কিছু সাহায্য পাইয়াছি। নানা কারণে ব্যাখ্যা ও এই ভূমিকা আমার মনের মত হইল না। তাহাতে অসম্পূর্ণতা রহিয়া গেল। ভবিষ্যৎ সংস্করণে যথাসাধ্য এই সকল ত্রুটি পরিহার করিতে চেষ্টা করিব।

১৮৭৩ খৃঃ ১ম খণ্ড নং ৩ এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রথম গ্রীয়ারসন সাহেব দেবনাগর অক্ষরে রঙ্গপুরে প্রচলিত ময়নামতির গাথাটি মুদ্রিত করেন।

গাথাটি তিনি এক যুগী জাতীয় ময়নামতির গাথার বৃদ্ধের মুখে আৱণ্টি শুনিয়া পূর্ব পূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করেন। যে বাবুর উপর তাহার নকল করিবায়

ভার ছিল তিনি গাথাটির প্রায় অর্দ্ধাংশের উপর কলম চালাইয়া তাহার গ্রামাতা সংশোধন করিয়া দেন। সেই অর্দ্ধেক ছাপা হইয়া গেলে পর গ্রীয়ারসন সাহেব তাহা জানিতে পারেন এবং পরে যথাস্থ্য ভাবে গাথাটি মুদ্রিত হয়। ষষ্ঠ বর্ষের সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় দ্বর্গত মল্লিক নামক এক কবি বিরচিত গোবিন্দচন্দ্রের গীত নামক এই গাথার এক পরিচয় প্রকাশিত করেন, এবং পরে সেই গাথা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। ১০১৫ সনের দ্বিতীয় সংখ্যা সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বিবেকচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় রঙ্গপুরের নিলফামারী সবডিভিসন হইতে দুইটি বৃদ্ধ যুগীর মুখে শুনিয়া এই গাথার এক পরিচয় প্রকাশিত করেন। বিবেকচন্দ্র বাবুর সংগৃহীত গাথা এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। গ্রীয়ারসনের গাথা ও বিবেকচন্দ্র বাবুর সংগৃহীত গাথা একই কবির রচিত। উভয়ের মধ্যে বিশেষ বিভিন্নতা নাই।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ময়ূরভঞ্জে প্রমোদ-সঙ্কানের সময় অর্দ্ধ উড়িয়া অর্দ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত এই গাথার এক সংস্করণ আবিষ্কার করিয়া লইয়া আসেন। তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাহার নব প্রকাশিত “প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য পরিচয়” নামক বৃহৎ গ্রন্থে তাহা হইতে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমাদের ভবানীদাসের পুঁথি আবিষ্কারের পূর্বে এই চারিটি গাথার পরিচয় জানিতে পারা গিয়াছে। সম্ভ্রান্তি আমি দিনাজপুর জেলার খালুরঘাট সবডিভিসনের অন্তর্গত কোম গ্রাম হইতে আবদুল হুসু মহম্মদ নামক এক মুসলমান কবি বিরচিত ময়নামতির গানের এক পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছি। এই পুঁথিও যথাস্থ্য সত্তর ঢাকা সাহিত্য পরিষৎকর্তৃক প্রকাশিত হইবে।

চৈতন্তভাগবতে দেখা যায় যে,

“মহীপাল যোগীপাল গোপীপাল গীত।

গোপীচাঁদের গাথার ইহা শুনিয়া যত লোক আনন্দিত।

জনপ্রিয়তা মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণ।

দস্ত করি বিবহরি পুঞ্জে কোন জন।”

এই গোপীপালের গীত যে আমাদের আলোচ্য গোপীচাঁদের গাথা সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যোগীপাল এবং মহীপালের গীত আঙ্গিও আবিষ্কৃত হয় নাই, কিন্তু রীতিমত চেষ্টা চলিলে, আবিষ্কৃত হওয়া খুবই সম্ভব। বিবহরির ভাসান গান এখনও পূর্ববঙ্গে প্রচলিত আছে। আর বিবহরির গানের পালার যে কত রচয়িতা আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে তাহার সংখ্যা নাই। মঙ্গলচণ্ডীর গীত এখনও উত্তরবঙ্গে বিশেষ প্রচলিত; এখনও অনেক ভক্ত গৃহস্থের বাড়ীতে শারদীয়া পূজার কয়দিন মঙ্গলচণ্ডীর পাল পাওয়া হইয়া থাকে। চৈতন্ত ভাগবতের বর্ণনায় বুঝা যায় যে, এই গাথাগুলি বাঙ্গালা দেশে বড়ই জনপ্রিয় ছিল। বাঙ্গালা দেশে যে গোপীচাঁদের গাথা বিশেষভাবে জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহার নানা প্রমাণ পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গের কবিগণের রচিত গাথাতে পাওয়া গিয়াছেই ভবিষ্যতে আরও যে কত কবির রচিত গোপীচাঁদের গাথা আবিষ্কৃত হইবে তাহা কে

বলিতে পারে। এই গ্রাম্য গাথাগুলির আর এক বিশেষত্ব এই যে, হিন্দু মুসলমান সমভাবে ইহাতে যোগ দিত এবং ইহা উপভোগ করিত। যে পুঁথিখানি হইতে বর্তমান পুস্তকের পাঠ উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশিত হইল তাহার দুইখানিই মুসলমানের অধিকারে ছিল, এবং লিপিকরও মুসলমান। দিনাজপুর হইতে ময়নামতির গানের যে পুঁথিখানি সম্প্রতি আবিষ্কৃত করিয়াছি তাহা আবদুল সুকুর নামক মুসলমান কবির রচিত। কবি এক স্থানে লিখিয়াছেন,

সুকুর মহম্মদে ভণে শুনিয়া হিন্দুর পুরাণে  
মুসলমানের ইহবাণি নয়।

আমাদের ছেলেবেলায় দেখিয়াছি আমাদের বাড়ীর নিকট মনসার ভাসান গানের কতগুলি দল ছিল। তাহাদের সমস্তই মুসলমানের গঠিত এবং গায়কও সবই মুসলমান। শ্রীযুক্ত আবদুল করিমও চট্টগ্রাম হইতে বহু মুসলমান কবির রচনা আবিষ্কার করিয়াছেন। বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা কি এই বিষয়ে ঘাঁহারা এখনও স্থির মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিতেছেন না তাঁহাদিগকে এই বিষয়গুলি একবার বিবেচনা করিয়া দেখিতে আহ্বোধ করি।

গোপীচাঁদের গাথা শুধু যে বাঙ্গালা দেশেই অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল এমন নহে, এই গাথা সমস্ত ভারতবর্ষের হৃদয়ে বিশেষ সম্মানের আসন অধিকার করিয়া লইয়াছিল। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশে এই গাথা প্রাচীন কাল হইতে গীত হইয়া আসিতেছে। “মারাস্ত্রী, হিন্দি ও উর্দু ভাষায় রাজা গোপীচাঁদ সম্বন্ধে শত শত কাব্য, নাটক, গল্প, ছড়া ও গীত প্রভৃতি বিরচিত হইয়া গিয়াছে। বোম্বাই ও পুনার বাঙ্গালী রাজা গোপী চাঁদের ছবি বিকীর্ণ হইয়া থাকে। কাশী, ফরুকাবাদ, আহমদনগর, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে গোপীচাঁদ রাজার নাটক অভিনয় হইয়া থাকে। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে গোপীচাঁদের গল্প কহিয়া

অথবা তাঁহার জীবনের ঘটনা বিশেষের গান গাইয়া শত সহস্র লোক ভিক্ষা করিয়া থাকে।”\* অনতিবৃহৎ জনপদের অধিপতি গোপীচাঁদের গাথার এরূপ জনপ্রিয়তা ও ভারতব্যাপিত্বের কারণ কি?

কারণ অনেকগুলি। গোপীচাঁদ অত্যন্ত রূপবান ছিলেন—গোপীচাঁদের গাথার অনেক স্থানেই তাহার পরিচয় আছে। গোপীচাঁদ পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান—দিশীর্ণ রাজ্যের উত্তরাধিকারী—পরাক্রান্ত রাজ-গণের ক্রোধগণের স্বামী। এইরূপ একটি ভাগ্যবান যুবকের নবীন যৌবনের অষ্টাদশ বৎসর বয়সে সমস্ত রাজ্য-ধন-সুখসম্পদ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া যাওয়ার মত করুণ ঘটনা জগতে বড় বেশী ঘটে নাই—ভারতবর্ষে গোপীচাঁদের পূর্বে ও পরে মাত্র এক এক বার ঘটিয়াছিল। এশ বৎসর বয়সে নবজাত পুত্র জাড়িয়া সিদ্ধার্থ সন্ন্যাসে বাহির হইলেন—

“আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ ভক্তিপ্রণত চরণে তার।”

গোপীচাঁদের ৫০০ বৎসর পরে নবদ্বীপ আধার করিয়া নবপরিণীতা পত্নী পারিত্যাগ করিয়া—মায়ের বুকে শেল হানিয়া আর এক নিষ্ঠুর এরূপে পথে বাহির হইয়া পড়িয়া-ছিলেন—সমস্ত ভারতময় একটা অশীম করুণ রসের উচ্ছ্বাস বাহিয়া গিয়াছিল—বাঙ্গালা দেশ এখনও সেই রসধারায় সরস হইয়া রহিয়াছে। কাজেই গোপীচাঁদের করুণ কাহিনীয়ে, ভারতবর্ষের হৃদয়কে কাড়িয়া লইবে ইহাতে অসাধারণ কিছুই নাই। ষাটশ বৎসরের সন্ন্যাসে গোপীচাঁদ ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে গিয়াছেন, সেই স্থানেই লোকের মন গলাইয়া আসিয়াছেন এবং বিগলিত হৃদয় জনসমূহ গোপীচাঁদের করুণ কাহিনীকে পুরুষপনম্পরায় উত্তরাধিকারের মত রাখিয়া গিয়াছে।

হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে যখন উত্তর ভারতের একতা হত্ন ছিল হইয়া খেল, তখন ভারতের মহাত্মাদ্বিনের

\* পরলোকগত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী কৃত “বদে ভাষ্করণরাজবংশ।”

স্বতন্ত্রপাতি হইয়াছিল। সেই মহাবিপ্লব মাৎস্ত্র জায়ের দিনে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা, মিশন-বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া অরাজক রাজ্যে রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে রুতকার্য হইয়াছিল; আত্মশক্তির এই আশ্চর্য্য উদ্বোধনে বাঙ্গালার সভ্যতা যে বিশেষত্ব লাভ করিয়াছিল উত্তর ভারতে তাহার প্রভাব বহুশতাব্দী ব্যাপিয়া বর্তমান ছিল। ধর্ম্মপাল ও দেবপাল উত্তরভারতবাসী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলে পর বাঙ্গালা দেশ সমস্ত ভারতবর্ষের আদর্শ স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। বাঙ্গালার ভাস্কর অপূর্ণ প্রতিভা-বলে ভারতে নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করে, এবং বাঙ্গালার দীপঙ্কর দীপ হস্তে যাইয়া তিব্বতের অন্ধকার ঘুচাইয়া দেয়। এমনি সময়ে বাঙ্গালার নাথ সম্প্রদায় যখন বাঙ্গালী রাজ্য গোপীচন্দ্রের অদ্ভুত সন্ন্যাসের কাহিনী গোরক্ষনাথ মীননাথ ইত্যাদির অলৌকিক কীর্ত্তি-কাহিনীর সহিত মিশাইয়া দেশে দেশে গাহিয়া ফিরিতে লাগিল, তখন তাহা যে সমস্ত ভারতময় সাধুর অভিযান পাইয়াছিল তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

যে নাথধর্ম্মাশ্রিত বর্তমান কালে যুগী বলিয়া পরিচিত জনসম্প্রদায়ে চেষ্টায় গোপীচাঁদের কাহিনী এককালে সমস্ত ভারতময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল

-তাহাদের ইতিহাস কুহেলিকাচ্ছন্ন।

নাথ ধর্ম্ম ও নাথধর্ম্ম লইয়া এখনও কোন ঐতিহাসিক ভাল করিয়া আলোচনা নাথগণ

করিয়াছেন বলিয়া জানি না। মহামহো-

পাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রাচ্য-বিজ্ঞা-মহার্ষি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের “বর্তমান বৌদ্ধধর্ম্ম” নামক ইংরেজী পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন; তাহাতে তিনি প্রসঙ্গক্রমে নাথধর্ম্মের

বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে নাথধর্ম্মের উৎপত্তি বৌদ্ধধর্ম্মের বাহিরে, কিন্তু কালক্রমে তাহা বৌদ্ধধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। এই মতবাদের ভিত্তি কি জানি না,

তবে নাথমার্গ, বজ্রযানমার্গ, মন্ত্রযানমার্গ, জসহ সাধনা ইত্যাদি ধর্ম্মপন্থা একই গোষ্ঠীভুক্ত—একটি হইতে আর একটিকে গভী টানিয়া সম্পূর্ণরূপে বিশেষিত করা সম্ভবপর নহে। গঙ্গার ধারা যেমন সমুদ্রের কাছে আসিয়া সহস্র ধীরাম্র বিভক্ত হইয়া সমুদ্রে মিশিয়া গিয়াছে—মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মও তেমনি পতনের প্রাক্কালে বহু ধারায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহার কোনটি কোথায় যাইয়া লয় পাইয়াছে কোনটি এখনও ঘন বনাশুরালে আত্মগোপন করিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে তাহার নির্ণয় করা সহজ নহে। নাথ-মার্গ কি সেই রূপই একটি ধারা, অথবা পূর্ক হইতেই ইহার স্বাধীন অস্তিত্ব ছিল তাহার, বিস্তৃত বিচার এখানে আবশ্যক নহে। আমার বোধ হয়, অথর্ববেদে যে মন্ত্র-তত্ত্ববহুল শৈব ধর্ম্মের প্রাধাত্য দেখা যায় নাথ-ধর্ম্ম তাহা হইতেই প্রস্তুত। মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের শাখা-গুলি হইতে নাথ-ধর্ম্মের যে জীবনী শক্তি অনেক বেশী ছিল তাহার প্রমাণ এই যে, বর্তমানে বৌদ্ধধর্ম্মের শাখা-প্রশাখাগুলি লুপ্ত প্রায়, দুই একটি নাম তাড়াইয়া কোন রকমে আত্মরক্ষা করিতেছে; কিন্তু নাথধর্ম্ম এখনও বর্তমান, নাথসম্প্রদায় অব্যাহত ভাবে এখনও ভারতের সর্বস্থানে বিরাজ করিতেছে, এবং বাঙ্গালা দেশে রাজ-কোপে তাহার সযাজে পৃথক হইয়া পড়িয়া থাকিলেও সংখ্যায় এবং ক্ষমতায় তাহার এখনও নগণ্য নহে। চৈতন্যের প্রেম-বজ্রায় বৌদ্ধধর্ম্মের শাখা প্রশাখা-গুলি ভাসিয়া ডুবিয়া গিয়াছে, কিন্তু নাথউপাসীধারী জনসমূহ এখনও সগোরবে তাহীদের স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলিতেছে। নাথ-ধর্ম্মের জীবনী শক্তির ইহার চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

বঙ্গালচরিতে যুগীগণের পুরোহিত দিগকে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। অত্যাশি যুগীগণ শিবপোত্র বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। যুগীদের নাথগণ শিব-অংশে সজ্জত বলিয়া বিখ্যাত। বর্তমান কালের যুগী-

সমাজে মীননাথ \* এবং গোরক্ষনাথ সুপরিচিত এবং হাড়িপা ও কাঁপা নামক যুগীশ্বরধর ও কম বিখ্যাত নহেন। ইহারা প্রকৃতই ঐতিহাসিক পুরুষ ছিলেন কি না তাহার সমসাময়িক প্রমাণ কিছুই নাই। কিন্তু শঙ্করাচার্যের ঐতিহাসিকত্বে যেমন কেহ সন্দেহ করে না, যুগী-গুরুগণের অস্তিত্বও তেমনি নিঃসন্দেহ। পুরুষপরম্পরায় ইহাদের অলৌকিক কার্য কলাগের কাহিনী বঙ্গদেশে চলিয়া আসিতেছে। ভারতের ২ম, ১০ম, ১১শ শতাব্দীর ধর্মালোচনে ইহাদের হস্তচিহ্ন সুস্পষ্ট বিদ্যমান। অজুসন্ধানে “মীন চৈতন” নামক একখানা প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তক আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহাতে মীননাথের পতন ও শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্তৃক তাহার পুনরুজ্জীবন কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। ময়নামতির গান-গুলিতে কেবল গোরক্ষনাথ ও হাড়িপার প্রসঙ্গ দেখা যায়।

গুরু গোরক্ষনাথের ভারতবাসী প্রভাব গোরক্ষনাথ ছিল। উত্তরপশ্চিম ভারতে “গোরকু”

শব্দ সংযুক্ত বহুস্থানের নাম হইতে এবং গোরক্ষনাথের “জলন্ধর” উপাধি দেখিয়া মনে হয় যে, পঞ্জাবের জলন্ধর নগর তাহার জন্মভূমি ছিল। ময়নামতি গুরু গোরক্ষনাথের শিষ্য ছিলেন, হাড়ি জাতীয় হাড়িপার নিকট ময়নামতির পুত্রের দীক্ষা গ্রহণ হইতে বুঝা যায় যে, নাথ সম্প্রদায়ে জাতি ভেদ স্বীকৃত হইত না, এবং শুধু ঐচ্ছিক নিম্ন শ্রেণীর লোকেরও গুরুর পদবী ও অধিকার লাভ করা অসম্ভব ছিল না।

নান্দর্শন এবং পরবর্তী কালের বৌদ্ধধর্ম যে অনেকটা মিশ্রিত গিয়াছিল, বর্তমান আলোচ্য পুস্তকে এবং পূর্ব প্রকাশিত এই শ্রেণীর অন্যান্য পুস্তকে ধর্ম, নিরঞ্জন সর্বত্র ধর্ম এবং নিরঞ্জনের উল্লেখ দেখিয়া তাহা ঠিক বলিয়া মনে হয়। এই শ্রেণীর গ্রন্থ সমূহে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেবতাগণের উল্লেখ প্রায় দৃষ্ট হয় না—কিন্তু ধর্ম ও নিরঞ্জনের উল্লেখ সর্বস্থানেই পাওয়া যায়। বর্তমান গ্রন্থের ১ পৃষ্ঠায়—

ভোক্তার আকার নষ্ট কৈল যেই জন,  
নষ্ট কউরুক তার প্রভু নিরঞ্জন ॥

২৭ পৃষ্ঠায়

ধর্ম ধর্ম করিয়া রাজা সিদ্ধান্তে দিল ফুক,  
পুরী থাকি চারি বধু গুণিতে লাগে ফুক।

—ইত্যাদি স্থান তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে “নিরঞ্জনের রূপা” শীর্ষক অধ্যায় স্মরণীয়। সেখানে ধর্ম নিরঞ্জন ক্রুদ্ধ হইয়া “যবনরূপী” হইয়া হিন্দুদের দেবালয়াদি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। নাথধর্মের প্রধান দেবতা শিব, কিন্তু পূর্বকালে ধর্ম বা নিরঞ্জনও এই ধর্মে কম সম্মাননীয় ছিলেন না। ধর্ম-পূজা যে বুদ্ধ-পূজারই নামান্তর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী এম. এ. মহাশয় তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় তৎসম্পাদিত কবি হুক্ত মল্লিক কৃত গোবিন্দ চন্দ্রের গীতের ১২ পৃষ্ঠায় অত্যাধিক পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত ধর্ম ঠাকুরগুলির এক স্মরণীয় তালিকা দিয়াছেন।

ময়নামতির গানের ঐতিহাসিকতা অতি সাবধানে বিচার্য। আমাদের সন্দেহ মনে রাখা উচিত যে, এই গাথাগুলি সমস্ত দেশময় গীত হইত। রচনা স্বত প্রাচীনই হউক না কেন, এগুলি মুখে মুখে এমন পরি-

বর্তিত হইয়াছে যে, প্রাচীনত্বের চিহ্ন বড় ময়নামতির বেশী নাই। এই রকম গাথা হইতে গাথার ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিতে

ঐতিহাসিকতা হইলে অত্যন্ত সাবধানতা ও সঙ্গ-জাগ্রত বিচার বুদ্ধির প্রয়োজন। কয়েক জন লেখক এই গাথাগুলি লইয়া প্রবন্ধাদি লিখিতে বাইরা উভয়েরই শোচনীয় অভাবের পরিচয় দিয়াছেন। তাহার এই সমস্ত গাথার প্রত্যেক বাক্য বেদ বাক্যবৎ জানিয়া এমন গভীর ভাবে বিপুলায়তন টীকাটিপ্সনি আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন যে, ঐতিহাসিক আলোচনা উপহাসের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বুদ্ধের বাসিক

পত্রের সম্পাদকগণ এই সকল হস্তাক্ষরক বচন। অল্পদিন বদনে পত্রস্থ করিতেছেন—সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক আলোচনার মহা অনিষ্ট সাধিত করিতেছেন।

প্রথম মহীপাল দেবের বাণগড় লিপি হইতে জানা যায় যে, তাঁহার পিতা বিগ্রহপাল দেবের রাজ্য অনধিকারী কর্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছিল, গোপী চাঁদের জ্ঞান তিনি পূর্বপ্রদেশে আসিয়া ঐতিহাসিক আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহীপাল স্বীয় বাহুবলে সেই বিলুপ্ত পিতৃরাজ্যের পুনরুদ্ধার করেন।

সম্রাট কুমিল্লা জেলায় ব্রাহ্মণবেড়িয়ার নিকটস্থ বাবাউড়া গ্রামে একটি বিষ্ণু মূর্তির নীচে, ঢাকা সাহিত্য পরিষদের পুরাতত্ত্ব সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি. এ. বি. টি মহাশয় মহীপাল দেবের রাজত্বের ৩য় বৎসরের একটা লিপি আবিষ্কৃত করিয়াছেন। তাহা দেখিয়া মনে হয় যে, বাণগড় লিপিতে উল্লিখিত পূর্বদেশ কুমিল্লা অঞ্চল এবং মলয় উপত্যকা মলয় উপদ্বীপ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এখানে একটি ঐতিহাসিক সমস্যার আলোচনাও

অনুবাদ—[বিগ্রহপাল দেবের] সেনা গজেন্দ্র-গণ পূর্বদেশের প্রচুর ভূগে উদর পূর্ণ করিয়া, স্বচ্ছ জল পান করিয়া, তাহার পর মনোযোগতাকার চন্দন বনে বৈষ্ণবতন্ত্র মণ্ডল করিয়া, মেঘের মত ঘনীভূত জল ফুৎকার দ্বারা তরুণের জড়তা বিধান করিয়া, শীতল গিরির নিত্য দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। (১১শ শ্লোক) তাহা হইতে অবনীপাল মহীপাল দেব জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন যিনি বাহুবলে যুদ্ধে সমস্ত শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া এবং অনধিকারী কর্তৃক বিলুপ্ত পিতৃরাজ্যের পুনরুদ্ধার করিয়া সমস্ত রাজ্য বৃন্দের মন্তকে তাঁহার চরণ-পদ্ম নিহিত করিয়াছিলেন। (১২শ শ্লোক)

গোড় লেখমালায় ১৫ পৃষ্ঠায় “প্রালেয়াজি” অর্থ বৈষ্ণব মহাশয় হিমালয় পর্বত করিয়াছেন—আমি তাহা করিবার কোন হেতু বা আবশ্যিকতা দেখিয়াছি না।

(১১শ শ্লোক)

সমাধান করিতে চেষ্টা করিব। বাণগড় লিপি ও বাবাউড়া লিপি হইতে প্রমাণিত হয় যে, বাঙ্গালার পূর্বাঞ্চল বিগ্রহপাল-মহীপালের সময় পাল রাজাদের অধীনে ছিল, এবং মহীপালদেবের অন্ততঃ তৃতীয় রাজ্যক পর্য্যন্ত যে মহীপালদেবের অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল, বাবাউড়া লিপি তাহার প্রমাণ। অথচ ১০২৪ খৃষ্টাব্দে যখন রাজেন্দ্র চোল বাঙ্গালা দেশের দক্ষিণাংশের উপর দিয়া তাহার বিজয়-বাহিনী চলাইয়া লইয়া যান তখন বাঙ্গালা দেশে আসিয়া তাহার সঙ্গে দেখা হইল রাজা গোবিন্দ চন্দ্রের। মহীপালের সঙ্গে তাহার দেখা হইল উত্তর রাঢ়ে। ইহার অর্থ কি?

বিক্রমপুর-রাজ শ্রীচন্দ্রদেবের দুইখানা তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম, এ, মহাশয়ের প্রচারিত শাসন হইতে জানা যায় যে, পূর্ণচন্দ্র নামক একজন মহামুদ্রব ব্যক্তির সুবর্ণচন্দ্র নামক পুত্র ছিল। সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র বঙ্গভাগত চন্দ্র-দ্বীপের রাজ-পদ লাভ করে। রাজ-বোগে জাত তাঁহার পুত্র শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুর হইতে তাম্রশাসন প্রচারিত করিয়াছিলেন। কোথা হইতে আসিয়া এই বংশ সহসা পূর্ববঙ্গে রাজ্যপদ প্রতিষ্ঠিত করিল? শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনে যে রাজ-মুদ্রা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা পালবংশের রাজ-মুদ্রা। ইহা হইতে দৃঢ় প্রতীতি হয় যে, চন্দ্র-রাজ-গণ পাল রাজগণের অধীন রাজা ছিলেন। বিগ্রহপাল যখন অনধিকারীর হস্তে রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া পূর্বাঞ্চলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন হয় তিনি চন্দ্ররাজগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, অথবা চন্দ্র উপাধিধারী ক্ষমতাশালী বংশ পালরাজ-গণের ৫৫৫৫৫৫ দিনের সঙ্গী হইয়া গোড় হইতে তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে আসিয়াছিলেন। মহীপাল পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া বরেন্দ্রে চলিয়া গেলে পালবংশের ক্ষমতা পূর্ববঙ্গে অনেকটা হ্রাস পায় এবং সেই অবসরে সাতারে হরিশ্চন্দ্র, বিক্রমপুরে শ্রীচন্দ্র এবং কুমিল্লায়

মাণিকচন্দ্র ছোট ছোট রাজ্য স্থাপিত করিয়া প্রায় স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। এই চন্দ্র উপাধিধারী রাজ-গণ পালবংশের সহিত জাতিভেদ বা বৈবাহিক সম্বন্ধ হুত্রে আবদ্ধ ছিল বলিয়া মনে হইতেছে।

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল কর্তৃক আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত ছলভ মল্লিকের গৌবিন্দচন্দ্রের গীতে দেখিতে পাওয়া যায়—

সুবর্ণচন্দ্র মহারাজ ষাড়িচন্দ্র পিতা।  
তার পুত্র মাণিকচন্দ্র শুন তার কথা ॥

( ৬৩ পৃষ্ঠা-৬৩ শ্লোক )

এই দুই ছত্রে অকৃত্রিম ঐতিহাসিক সত্য নিবদ্ধ আছে বলিয়া মনে করি। শ্রীচন্দ্রের তাত্ত্বশাসন হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তাঁহার পিতামহের নাম সুবর্ণচন্দ্র ছিল। একখানা সুপ্রাচীন তাত্ত্বশাসনে এবং আধুনিক গাথার এই মিল দেখিয়া মনে হয় যে, ছলভ মল্লিকের কথোক্ত সত্য রহিয়াছে। মহারাজ ষাড়িচন্দ্র নামে খুব সম্ভব ত্রৈলোক্য চন্দ্রকে বুঝাইতেছে। ষাড়ি মানে বড়—শ্রেষ্ঠ। এই উপাধি ত্রৈলোক্যচন্দ্রই পাইবার উপযুক্ত, কারণ তিনিই প্রথম চন্দ্রদ্বীপ ও বঙ্গের রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। ষাড়ি উপাধিধারা যদি ত্রৈলোক্যচন্দ্রকেই বুঝান হইয়া থাকে তবে সাভার বিক্রমপুর ও মেহারকুল বা পাটিকারার রাজবংশ ত্রয়ের মধ্যস্থিত সম্পর্ক ছিল বলিয়া বোধ হইতেছে।

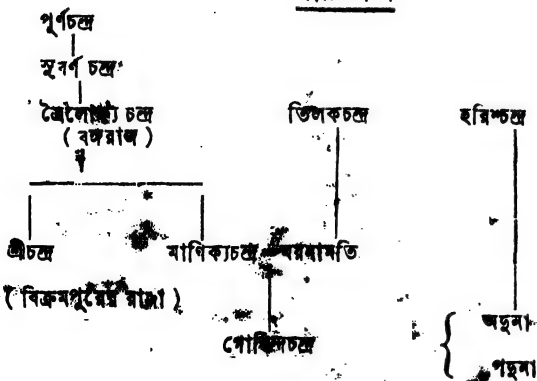
বিক্রম পুর

মেহারকুল

সাভার

বা

পাটিকারা



সাভার-রাজ হরিশ্চন্দ্রের কোন পুত্র থাকিবার পরিচয় পাওয়া যায় না, এবং বিক্রমপুরাধিপ শ্রীচন্দ্রও বোধ হয় অপুত্রক পরলোক গমন করেন। কাজেই হরিশ্চন্দ্রের কত্তাগণের স্বামী এবং বঙ্গরাজ্য-পৌত্র গৌবিন্দচন্দ্র এই তিন রাজ্যেরই উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তাই রাজেশ্বর চোল ১০২৪ খৃষ্টাব্দে একমাত্র গৌবিন্দচন্দ্রকেই পুরীক্ষালের অধিপতি দেখিয়াছিলেন।

চন্দ্র উপাধিধারী রাজগণ পুরীক্ষালের রাজা হইয়াও তাঁহাদের গোড় অঞ্চলে স্থিত পৈত্রিক সম্পত্তি হাড়িয়া দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হইতেছে না। ত্রৈলোক্য-চন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুরে রাজা হইলে অল্প পুত্র মাণিক্যচন্দ্র রঙ্গপুরে অবস্থিত পৈত্রিক সম্পত্তি পাইয়াছিল বলিয়া বোধ হইতেছে। সকলেই জানেন রঙ্গপুর জেলায় ময়নামতির কোট ইত্যাদি বিদ্যমান। নিরোদ্ধত শ্লোকগুলি এইস্থানে প্রনিধুন যোগ্য। ময়নামতি নিজের জ্ঞান প্রাপ্তির বিবরণ পুত্রকে বলিতেছেন—

শিশুকালে বিভা দিল বাপে আর মায়।

ঘন ঘন বাপের বাড়ী যাইতুম অবসরায় ॥

তাহার পর গোন্ধনাথ সেই “বাপের বাড়ীতে” ময়নামতির দেখা পাইয়া তাহাকে জ্ঞান দিতে মনস্থ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছেন—

তা দেখিয়া গোষ্ঠনাতে মনে মনে ঘুমে

এমন সুন্দরী যাইব যমের তোবনে ॥

অত্রেণা হইল সিদ্ধি বিতির উপর।

এক নাম রাধি যাইয়ু মেহারকুল সহর ॥

ভবানীদাস, ২২ পৃষ্ঠা

সুবর্ণচন্দ্র মহারাজ ষাড়িচন্দ্র পিতা।

তার পুত্র মাণিকচন্দ্র শুন তার কথা ॥

মোরে বিভা কৈল রাজা অঙ্গ বরসে।

গেলেন তোমার পিতা মোর বাপের বাসে ॥

ঘ্যানে দেখিলাম স্বামীর অকাল মরণ।

কেহ না জানারে তারে জিজ্ঞাসে কখন ॥

পল্লিত্য দিম্বু আমি ধ্যানেন্তে বসিয়া।

পলাইল তোর পিতা রাজসী বলিয়া।

সেই হৈতে তোর পিতা না আইল মোর পাশে।

মোর বাপে কখা রাজা গেল নিজ দেশে।

তোম পিতা মোর ভয়ে করয়ে তরাস।

মোর ভয় করি রাজা বঞ্চে গৃহ বাস।

তখন আমার গর্ভ হইল ছয় মাস।

সেই গর্ভে গোবিন্দচন্দ্র তোমার প্রকাশ।

দ্ব্যুত মল্লিক—৬৩, ৬৪ পৃঃ।

ময়নামতি বঞ্চে বাছা হইবে অমর।

রাজা বলে তবে কেন বাপ মৈল মোর।

ময়নামতি বলে বাছা ঐ তাপে মরি।

না শুনিল জ্ঞান কথা গেল জন্ম পুরি।

তোমার পিতা মাণিকচন্দ্র পরম সুন্দর।

আমার বোঝনে টুটে কলেবর।

উদ্বা পুত্র নাহে একলে নাগিনী।

জন্মে বসি পিয়ে মধু কান বিনাশিনী।

যে কালে জনক গৃহে আছিলাম আমি।

মোরে জ্ঞান দিয়াছেন গোকনাথ মুনি।

দ্ব্যুত মল্লিক—৬১ পৃষ্ঠা।

মাণিকচন্দ্র রাজা বঞ্চে বড় সতি।

তাটি হৈতে আইল বাঙ্গাল লক্ষা লক্ষা ডাড়ি।

আছিল দেড় বুড়ি ষাটনা লৈল ১৫ গুণা।

গ্রীয়ারসন (Greerson).

J. A. S. B. 1873. Part I, No. 3.

P. 149, ll. 6, 12, 13.

মাণিকচন্দ্র রাজা ছিল ধর্মী বড় রাজা।

ময়নাকে বিভা করিল তার বড় বুড়ি তারখা।

ময়নাকে বিভা করিল রাজার না পুরিল মনের আশ।

তার পরে দেবপুরের পাঁচকড়া বিভা করে পুরি নিল

ময়নাক হাতিলাহা।

দেবপুরের পাঁচকড়া ডাহিনী মএনা কোন্দল নাগিল।

শ্রীযুক্ত বিবেকের ভট্টাচার্যের সংগ্রহ—সাহিত্য—

পরিবৎ পত্রিকা ১৩.৫, ২য় সংখ্যা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র

সেনের বাঙ্গালা সাহিত্য পুস্তকচয় উদ্ধৃত।

বৃদ্ধ রাজা যমে নিছে গোড়ের গোসাই।

কি বুঝিছ গোপীচন্দ্র তোর নাই ঠাই।

ভবানীদাস—৮ পৃঃ, পাদটীকা।

গঙ্গা বোলে ময়নামতি কাদ কি কারণ।

যোর হস্তে নিবেদিতাম গঙ্গার চরণ।

মেহারকুলের রাজা ছিল মাণিক চাঁদ গোসাই।

পৃথিবীতে জন্মএ পুরীতে স্থল নাই।

ভবানীদাস—১৫ পৃষ্ঠা।

সন্ন্যাসী হইয়া বাইতে হইলে কি কি ছাড়িয়া যাইতে  
হইবে গোপীচাঁদ তাহার তালিকা মাতা ময়নামতিকে  
দিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে আছে—

এহি সব এড়ি যাবে আপনে জানিয়া।

নএয়ান গড় এড়ি যাবে উনশত বাগিয়া।

বাপের মিরাস এড়ি যাইয়ু গোড়ের সহর।

দাদার মিরাস এড়ি যাবেক কমলাক নগর।

ভবানীদাস—৬পৃষ্ঠা।

উপরি উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে যে কেহ নিম্ন শিথিত  
সিদ্ধান্ত গুলিতে উপনীত হইতে পারিবেন।

গোড় অঞ্চলে মাণিক্যচন্দ্রের ভূসম্পত্তি ছিল। মাণিক্য-  
চন্দ্র গোড় হইতে আসিয়া কমলাকের রাজা তিলকচন্দ্রের  
অল্পবয়স্ক একমাত্র কন্যা ময়নামতিকে বিবাহ করেন,  
এবং গোড় পরিত্যাগ করিয়া বর জামাইর মত থাকেন।  
ময়নামতি বাপের বাড়ীতে গোরক্ষনাথের নিকট  
“জ্ঞান” লাভ করিয়া মন্ত্রতন্ত্রে অসাধারণ পারদর্শিতা  
লাভ করিয়াছিলেন। মাণিক্যচন্দ্র বীরজীর শক্তির  
পরিচয় পাইয়া তাহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। অধিকতর

কুমিল্লায় ময়নামতির ভ্রাতার এক মাইল উত্তরে  
দেবপুর নামক এক গ্রাম এখনও আছে।



সিদ্ধদেহা জীর সাহচর্য্য তাহার অসিদ্ধ দেহে সহ্য হইত না। মনের হৃৎথে তিনি দেবপুরের পাঁচ কত্তা বিবাহ করিয়াছিলেন। \* পর জামাইর অদৃষ্ট সর্বকালেই সমান। মাণিকচন্দ্রকে স্বস্তর বাড়ী বড় কেহ খাতির করিত না। ময়নামতির সহিতও দেবপুরের পাঁচকত্তার বনিবনাও হইত না। কাজেই ছয় মাসের গর্ভবতী ময়নামতিকে রাখিয়া স্বস্তরকে বলিয়া পর জামাইর আসন পাট উঠাইয়া মাণিকচন্দ্র নিজ দেশে চলিয়া গেলেন। তিনি কোথায় মরিয়াছিলেন তাহা ঠিক জানা যায় না, কারণ রঙ্গপুরের গাথা ও বর্তমান ভবানী-দাসের পুথিতে এই বিষয়ে মিল নাই। তবে ময়নামতিকে ছাড়িবার অত্যন্ত কাল পরেই মাণিকচন্দ্র পরলোক গমন করেন।

মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর গোবিন্দচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বুকাননের (Buchanan) পুস্তকে এবং গ্রীয়ারসনের গ্রন্থে জানা যায় যে, ধর্মপাল নামক একব্যক্তির সঙ্গে ময়নামতির যুদ্ধ বাধিয়াছিল। সাতারের হরিশ্চন্দ্র না কি ময়নামতিকে এই যুদ্ধে সাহায্য করিতে যাইয়া নিহত হন। রঙ্গপুরে ময়নামতির কোটের অনতিদূরে ধর্মপালের গড় এবং হরিশ্চন্দ্রের পাট থাকার কথাটিতে সত্য মিথিত আছে বলিয়া বোধ হইতেছে। এই ধর্মপাল কে ?

রাজেন্দ্র চৌলের তিরুমলয় লিপিতে দেখিতে পাই যে, তিনি দত্তভুক্তি অর্থাৎ বিহারে এক ধর্মপালকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন। মহীপালদেবের সারনাথ লিপিতে (গৌড়লেখমালা, ১০৪ পৃঃ) দেখিতে পাই যে, মহীপাল ১০২৬ খৃষ্টাব্দে হিরপাল ও বসন্তপাল নামক দুইজন

\* ময়নামতির গাথাগুলি অবলম্বনে যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হইব ঐতিহাসিক হিসাবে যে তাহার মূল্য বড় বেশী নহে পূর্বেই তাহার একবার আভাস দিয়াছি। তবে “নাই-মামার চেয়ে” ইত্যাদি ঘটন বরণ করিয়া এই সকলের ঐতিহাসিকতা সন্দেহ উচিত নহে।

পালোপাধিক ব্যক্তিকে নানা জীর্ণ সংস্কার কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহারা মহীপালের আশ্রয় বলিয়াই বোধ হইতেছে। পালোপাধিক দত্তভুক্তির ধর্মপালও মহীপালদেবের কোন আশ্রয়ই হইবেন। মহীপালের প্রতিনিধি স্বরূপ বোধ হয় তিনি দত্তভুক্তি শাসন করিতেছিলেন। বোধ হয় এই ধর্মপালেরই বাড়ী ময়নামতির কোটের পাশে ছিল, এবং মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর তিনি মাণিকচন্দ্রের সম্পত্তিটুকু গ্রাস করিবার চেষ্টা করায় তাহার সহিত নাবালক গোপীচাঁদের যুদ্ধ রন্ধা করিতে কৃতনিশ্চয় ময়নামতির ও তাহার পক্ষাবলম্বী বৈবাহিক হরিশ্চন্দ্রের যুদ্ধ বাধিয়াছিল। অবশ্য এতদ্বি কেবল যুক্তি সঙ্গত অনুমান মাত্র, ঐতিহাসিক প্রমাণ কিছুই নাই। গ্রীয়ারসন মাণিকচন্দ্রকে ধর্মপালের ভ্রাতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উভয়ে মামাতা পিতৃভ্রাতাই হওয়া অসম্ভব নহে।

মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর শিশু গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্র “দাদার মিরাস” মেহারকুল রাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত হন। মাতা ময়নামতি তাহার অভিভাবিকা স্বরূপ রাজকার্য্য চালাইতে থাকেন। অল্প বয়সেই ময়নামতি সাতাররাজ হরিশ্চন্দ্রের কন্যায় অদুনা ও পছনার সহিত গোপীচাঁদের বিবাহ দেন। গোপীচাঁদ আরও দুই বিবাহ করিয়াছিলেন, যথা—

এক বিবাহ করাইলা অদুনা পছনা।

সে সব সুন্দরী জানে আমার বেদনা।

আর বিবাহ করাইলা খাণ্ডীএ জিনিয়া।

আর বিবাহ করাইলা উরুয়া রাজার মাইয়া।

দশ দিন লড়াই কৈল উড়িয়া রাজার সনে।

চৌক-বুড়ি মণিবা কাটিলাম এক দিমে।

চৌক দৌরন মণিবা কাটি সাত শত লক্ষর।

হতীঘোড়া কাটিলাম তুষ্টীহাজার।

যুদ্ধে হারিয়া নিপে গেল পলাইয়া।

তার বেটা বিবাহ কৈলুম মহিব জিনিয়া।



উড়িয়ায় যুদ্ধব্যবসায়ী দিগকে খণ্ডাইত বলিত। “খণ্ডাও” প্রিন্সিয়া যে মেয়ে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া গোপীচাঁদ গরু কারতেছেন তাহা বোধ হয় উড়িয়া দেশেরই কাহারও মেয়ে। কিন্তু গোপীচাঁদের চতুর্থ স্ত্রীর পিতা এই উরুয়া রাজাটিকে? আমার ভাব সন্দেহ হইতেছে যে, ইনি রাজেন্দ্র চোল ভিন্ন আর কেহই নহেন। উড়িয়া অঞ্চল হইতে আগত বলিয়া ইহাকে উরুয়া বা উড়িয়া রাজা বলা হইয়াছে। উড়িয়া রাজার সঙ্গে যে গোবিন্দচন্দ্রের যুদ্ধ হইয়াছিল দেখা বাইতেছে যে, কবি ভবানীদাসের সময় পর্য্যন্ত তাহার স্মৃতি লুপ্ত হয় নাই। গোবিন্দচন্দ্রের গর্বোক্তিঃ যদি সত্য থাকে (এবং থাকা অসম্ভব কিছুই নহে) তবে ইহা যুদ্ধের চিরন্তন আত্মসম্মতি রহস্য—উভয় পক্ষের বিজয় গৌরব দাবীর—একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। রাজেন্দ্র চোল তিরুমলয় লিপিতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, জয় করিয়াছিলেন তিনি,—ঝড়ুষ্টি সমাচ্ছয় বাঙ্গাল দেশে যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়াতুর গোবিন্দচন্দ্র হস্তাপ্ত হইতে নামিয়া ক্রত পলায়ন করিয়াছিলেন। এদিকে ভবানী দাসের গাথায় গোপীচন্দ্রের গর্বোক্তি সত্য বলিয়া ধরিলে দেখা যায় যে, ১০০০ বৎসর পরে পূর্বাঞ্চলে সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের অভিনয় পুনরাভিনীত হইয়াছিল। উড়িয়া রাজা রাজেন্দ্র চোল যুদ্ধেতে হারিয়া পলাইয়া যান। গোবিন্দচন্দ্র মহিম \* নামক স্থান অধিকার করেন, এবং অবশেষে রাজেন্দ্র চোল কণা দান করিয়া পরিত্রাণ পান।

গোপীচাঁদ বর্তমান কুমিল্লার পাঁচ মাইল দূরস্থিত ময়নামতি বা লালমাইর পাহাড়ে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। এই লালমাইর পাহাড় প্রায় ১০ মাইল দীর্ঘ। তাহার প্রত্যেক মুড়ার শীর্ষে প্রাচীন প্রাসাদাবলির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। মুড়াগুলির অবস্থান

\* মহিম কোথায়? কল্প প্রদেশে না কি মহিম নামক একটি জনপদ আছে।

এমন সুন্দর এবং সেগুলি স্বভাবতই এমন সুরক্ষিত যে, গোপীচাঁদের পছন্দ দেখিয়া প্রশংসা না করিয়া থাক। যায় না। ইতিহাসপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রকেই একবার এই মুড়াগুলি দেখিয়া আসিতে অনুরোধ করিতেছি। ভবানীদাসের গাথার অন্ত্য যে সকল স্থানের নাম পাওয়া যায়, রঙ্গপুরের দুলভ মল্লিকের, স্কুর মহম্মদের এবং ময়ূরভঞ্জের গাথার সহিত তাহাদের মিল নাই। আমরা সেগুলির স্থান নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিলাম না। কেবল যেখানে বেঙ্গাগৃহে গোপীচাঁদ আবদ্ধ ছিলেন সে স্থানটি ভবানীদাসের পুঁথি ছাড়া অল্প সমস্ত গুলি গাথায়ই প্রায় একই নামে উক্ত হইয়াছে—তাহা শ্রীকলিঙ্গের বন্দর। শ্রীকলিঙ্গের বন্দর শব্দদ্বারা কোন স্থানকে বুঝাইতেছে। তখনুক নয় ত?

মেঘারকুল পাটিকারায়ই যে গোপীচন্দ্রের রাজ্য ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কোন কোন পুস্তকে মুকুল এবং কোন কোন পুস্তকে পাটিকা নগর বলিয়া এই স্থানবয়ের উল্লেখ হইয়াছে। স্কুর মহম্মদ মুকুল লিখিয়াছেন। দুলভ মল্লিক পাটিকা লিখিয়াছেন। রঙ্গপুরের গাথাগুলিতে শুধু বঙ্গ বলিয়া সারিয়া দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গ বলিতে যে প্রাচীনকালে পূর্বাঞ্চলকেই বুঝাইত এবং বাঙ্গাল বলিতে যে এখনও পূর্বাঞ্চল বাসীদিগকেই বুঝায় ইহা সকলেই জানেন। ময়নামতি পাহাড়ের আশে পাশে বহু প্রাচীন ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। তথায় ভূপ্রাণিত করেটি বৃহৎ প্রস্তরস্তম্ভের কথা আমি অবগত হইয়াছি। ইহাদের গায়ে হয়ত খোদিত লিপি থাকিতে পারে। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানকারীদের দৃষ্টি এই অঞ্চলে পতিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ পর্য্যন্ত এই স্কুলে বলিতে গেলে কোন অনুসন্ধানই হয় নাই।

গোবিন্দচন্দ্রের উত্তরাধিকারী কে হইয়াছিল জানা যায় না। ভবানীদাস, বঙ্গিয়া লিখিয়াছেন, “গোপীচাঁদের বংশ নাই ভুবন জড়িয়া।” গোবিন্দচন্দ্রের হস্ত হইতেই

বোধ হয় বর্ষরাজগণ পূর্বাঞ্চল কাড়িয়া লইয়াছিলেন।

বর্তমান গাথার রচয়িতা ভবানীদাসের পরিচয় বিশেষ কিছুই অবগত হওয়া যায় না। ভবানীদাসের কবি ভণিতায় নিজের নাম ভিন্ন আর পরিচয় কোথাও কিছুই উল্লেখ করেন নাই।

তবে ভাষার নমুনা দেখিয়া বোধ হয় যে, তিনি কুমিল্লা অঞ্চলের লোকই হইবেন এবং ৩০০ খ্রিঃ ৩৫০ বৎসর পূর্বে প্রাকৃত হইয়াছিলেন। তবে তাঁহার কবিত্ব-ভাণ্ডার যে ময়নামতির গাথা রচনা করিয়া রিক্ত হইয়া যায় নাই, তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ঊনবিংশ ভাগ ৪র্থ সংখ্যায় শিলচর নন্দাল স্কুল লাইব্রেরীতে রক্ষিত কতিপয় প্রাচীন পুঁথির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে ভবানীদাস রচিত রামের স্বর্গারোহণ এবং লক্ষ্মণের দিগ্বিজয় নামক দুইখানা পুঁথির পরিচয় পাওয়া যায়। ভণিতায় এক স্থলে ভবানীদাস বজীবর-স্মৃত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বজীবর স্মৃত বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে বুঝাইতেছে যে, বজীবর একজন বিখ্যাত লোক ছিল। এই বজীবর কে? ত্রিযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৫০৪ পৃষ্ঠায় (৩য় সংস্করণে) এক বজীবরের পরিচয় পাই। বজীবরের গঙ্গাদাস নামে পুত্র ছিল। দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন “ইহায়া উভয়েই সাহিত্যত্রে আত্মবিশ্বস্ত ছিলেন। পদ্মাপ্রাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সমস্ত গ্রন্থেই ইহাদের প্রতিভা খেলিয়াছে। পুরুষদের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিগুলির অধিকাংশেই এই উভোগী কবিদ্বয়ের লেখার নমুনা আছে। \* \* \* কবি গঙ্গাদাস সেন প্রায় প্রত্যেক পত্রের পিতা ও পিতামহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন—

“পিতামহ কুলপতি পিতা বজীবর।

যার বশ বোবে লোকে পৃথিবী ভিতর।”

বজীবর একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন। এরূপ অল্প-

মানের আরও অনেক কারণ আছে। বজীবরের গঙ্গাদাস নামক পুত্র থাকায় এবং ভবানীদাসেও গঙ্গাদাস নাম-সাদৃশ্য থাকায় মনে হইতেছে ভবানী দাস এই প্রতিভা-শালী কবিরই পুত্র ছিলেন। এই বৈজ্ঞ কবি-পরিবার আরও কবির জন্ম দিয়াছিল বলিয়া মনে করি। দীনেশ বাবু রাজেন্দ্র দাস নামক কবির আদি পর্বের পরিচয় দিয়াছেন, (তৃতীয় সং ৫১২ পৃষ্ঠা) এবং আমায়ের নিকট শ্রামদাস সেন নামক কবি রচিত ময়নামতির গানের সমশ্রেণীর “মীনচেতন” নামক পুস্তক আছে। বজীবরের বাসস্থান “দিনার ঘোপ” ছিল বলিয়া উল্লিখিত দেখা যায়। দিনার ঘোপ কোথায়?

বজীবর জগদানন্দ নামক এক সমৃদ্ধ ব্যক্তির জগদানন্দ আশ্রয়ে থাকিয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ও জয়চন্দ্র ভবানীদাস রাজা জয়চন্দ্র নামক এক ব্যক্তির আশ্রয়ে থাকিয়া কবিতা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার কোন কোন পুঁথিতে দেখা যায়। এই মহামুভব দ্বয়ের পরিচয় প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইঁহারা বোধ হয় পিতা-পুত্র ছিলেন। জয়চন্দ্রের আদেশে ভবানীদাস কর্তৃক অনূদিত চণ্ডীর একখানা তাল পাতার পুঁথি ঢাকা পরিষদে আছে।

ভবানীদাসের পুঁথি হইতে বাল্য বিবাহ, বিধবা বিবাহ, সত্যদাহ, স্ত্রী-স্বাধীনতা, তৎকালীন পরিধেয় তৎকালীন বস্ত্রালঙ্কার, সৈন্ত সামন্ত, বহুবিবাহ, জুড়নি আচার প্রথা, ব্যাতারে কতাদান, দ্রব্যমূল্য, ভূমির ব্যবহার প্রভৃতি ইত্যাদি বিষয় অবগত হওয়া যায়। এই স্বাভাবিক পুঁথি হইতে সেই সকল স্থল উদ্ধৃত করিয়া পাঠকের পাঠ-সুখ নষ্ট কারব না।

ভবানীদাসের কবিত্ব স্থানে স্থানে অতি সুন্দর। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রাণীগণের বিলাপের স্থলটির কবিত্ব উল্লেখ হইতে পারে। স্থানে স্থানে সুকুর মহাক্ষদের পুস্তকের সঙ্গে তাব ও ভাষার ভবানী দাসের আশ্চর্য মিল আছে। সুকুর মহাক্ষদের

পুস্তক প্রকাশিত করিবার সময় সেই সমস্ত স্থল দেখান হইবে।

ভবানীদাসের ভাষায় অনেক স্থানে অনেক শব্দের সংস্কৃত ও বর্তমান বাঙ্গলার মধ্য-ভাষার প্রাচীন ও বর্ত্তী আকৃতির ব্যবহার দেখিতে পাই। যথা—

“তা তুমিরা চারি বধু বৃক্ষে যারে খাও” (১৬ পৃষ্ঠা) তা ছাড়া তুমি, আন্ধি ইত্যাদিও আছেই। অনেক ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে যাহার বিশেষত্ব আন্দর। এখন আর অবগত নহি, যথা, রাগ লগিযুক্ত, সিন্দুরা পয়ার, পরিতাল ছন্দ ইত্যাদি।

প্রাচীন পুস্তকের সম্পাদন বিষয়ে একটি কথা চিন্তনীয়। পাঠোদ্ধার করিয়া কি অবিকল তাহাই মুদ্রিত করা উচিত? না শুধু ভাষার ও বর্ণ বিন্যাসের বিশেষত্বগুলি বজায় রাখিয়া অনাবশ্যক ও অসুচিত ভুলগুলি সংশোধন করিয়া মুদ্রিত করা উচিত? আমার ত মনে হয় যে, লিপিকারদের স্পষ্ট ভুল গুলি মুদ্রিত করিয়া যথা আমরা প্রাচীন সাহিত্যকে ভ্রাতাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছি। বর্ণবিভক্ত্যসের ও ভাষার বিশেষত্বগুলি বজায় রাখিয়া সুসংস্কৃত করিয়া পুস্তক বাহির করিলেই বোধ হয়, ভাল হয়। এই পুস্তক সম্পাদনে আমরা অনেকটা এই উপায় অবলম্বন করিয়াছি।

পুস্তকের প্রফ আমি নিজে দেখিতে না পারায় এবং অন্যায় কারণে অনেকগুলি ভ্রম প্রমাদ হইয়াছে নিজে তাহার তালিকা দেওয়া গেল।

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১ ... ২ ... ১৭ ...			খুলিয়া	... খুলিয়া
২ ... ১ ... ২২ ...			সরঙ্গগাত্র	... সরঙ্গএ
৩ ... ১ ... ৬ ...			আপন সূক্য	... আগল সূক্য
৩ ... ২ ... ১২ ...			বন্ধিলা	... বন্ধিব
৭ ... ১ ... ১২ ...			ভিত	... ভিতর
৭ ... ১ ... ৮ ...			রনদেখা	... রনদেখা
১১ ... ১ ... ২১ ...			সরঙ্গগাত্র	... সরঙ্গএ

১১ ... ১ ... ২২ ...	ধাত্তাত্র	... ধাত্তাএ
১১ ... ২ ... ২৩ ...	ভক্তি	... ভুক্তি
১৩ ... ২ ... ৩ ...	তরে	... তবে
১৪ ... ১ ... ৫ ...	গুপটাদ	... গুপিটাদ
১৪ ... ১ ... ৮ ...	বছাইল	... বিছাইল
১৪ ... ২ ... ২৩ ...	ওমি	... তুমি
১৫ ... ১ ... ৬ ...	পন্ত	... পন্ত
১৬ ... ১ ... ২৫ ...	সরঙ্গগাত্র	... সরঙ্গএ
১৬ ... ২ ... ২৬ ...	আমরর	... আমর
১৬ ... ২ ... ২০ ...	কানিয়া	... কালিয়া
১৭ ... ১ ... ৩২ ...	ছুড়ি	... নিক্তি
১৯ ... ১ ... ৪ ...	ওরমান	... তুরমান
১৯ ... ২ ... ২৩ ...	সরঙ্গগাত্র	... সরঙ্গএ
২১ ... ১ ... ২৬ ...	যমের	... জলের
২১ ... ২ ... ২৫ ...	সাক্তা	... সা ক ও
২৪ ... ১ ... ১৮ ...	সত্ত	... মত্ত
২৮ ... ২ ... ৯ ...	জল	... জন

কুজ গ্রন্থের ভূমিকা অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া উঠিল। এই পুস্তক সম্পাদন বিষয়ে শ্রীযুক্ত দানেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট অনেক উপদেশ পাইয়াছি এজন্য তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। শ্রীযুক্ত বোহিনী মোহন দাস ও শ্রীযুক্ত আবচল করিম সাহেব ময়নামতির গান লইয়া প্রতিভায় আলোচনা করিয়া সম্পাদনের দুই একটি দোষ ক্রটি দেখাইয়া দিয়াছেন। এজন্য তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ত্রিপুরা রাজ ষ্টেটের ব্যানেন্দ্রার শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের পুঁধি এবং হরিন্দ্রনাথ পাঠশালায় শিক্ষক শ্রীযুক্ত সোভন গাজির পুঁধি এই দুই পুঁধি দিয়াই বর্ত্তমান পুস্তকের পাঠোদ্ধার হইয়াছে। তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

ঢাকা সাহিত্য পরিষদ

১লা শ্রাবণ, ১৩২১

তিনিমিত্রাঙ্ক ভট্টশালী

ঢাকা সাহিত্য পরিষদে পঠিত।

# প্রতিভা

৪র্থ বর্ষ

ভাদ্র, ১৩২১

৮ম সংখ্যা

## পুরীর সিকুতরঙ্গ

কখন রবি বসল পাটে,  
নাই কেউ আর শূন্য পাটে,  
ব'সে আছি একা.  
দেখছি চেয়ে অবাক হ'য়ে  
গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছ বয়ে.  
আঁকছি জলে রেখা।  
তোমার গভীর বিদার করে'  
তরঙ্গ সব যেমন জোরে  
উঠে, আবার লুটে,  
তেননি প্রাণে কত কথা.  
কত কালের হরষ-ব্যথা  
ফুটে আর টুটে।  
তুমি যেমন উঠছ পড়ে'  
ভেঙ্গে ভেঙ্গে উঠছ গড়ে,'  
কে পারে তা আর ?  
কত রাজা, রাজ্য এল.  
তোমার গর্ভে গড়িয়ে গেল,  
কোথায় চিহ্ন তার।  
কই বায়রণ, সুইনবরণ,  
নবীন, বিজেন কোথায় এখন.  
লিখল তোমার কথা।  
নেমকহারাম, তোমার আগি  
গাঁথছি মালা নিশি আগি,  
আমিও 'সাকিন তথা'।

বাঁকগে তব, জ্যোৎস্নায় ভরে'  
অকুল উঠছে আকুল করে,'  
—বাঁধি ভাষার ডোরে,  
জলের মাঝে ওই যে আগুন,  
আজকে তারে করি রে 'গুণ'  
আঁধির অনোর লোরে।  
পিছে ফেলে' মুখর শহর  
দাঁড়িয়ে গেছে ঝাউয়ের বহর,  
দেখছে জলে নাট,  
দেখছে শ্রীমন্দিরের চূড়া  
এই গড়ে, এই হয় শুঁড়া  
তোমার যত ঠাট্টা  
বাতাস এসে মারছে ঠেলা,  
তীরে নীরে করছে খেলা,  
কাঁপছে বালির বাঁধ,  
কিরণ-কিরীট জলে মাখে.  
চেউগুলি সব রঙ্গে মাতে,  
হাসছে ভাসছে চাঁদ।  
শোন রে, হা-হা-র কঁকে কঁকে  
ওপার এপারেরে ডাকে,  
মিলন-সেতু পাথর।  
জলের আগুন সুখামাধা,  
আয় পতঙ্গ পুড়িয়ে পাখা,  
ওড়া নয়, আজ সঁতার।  
শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

## বাঙ্গলা

### “সাধুভাষা” ও “উচ্ছৃঙ্খল ভাষা”

কোন কোন বাঙ্গলা লেখকের ভাষা সংস্কৃতবহুল, আর কোন কোন লেখকের ভাষায় কথিত শব্দেরই প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া প্রথমোক্ত ভাষাকে কেহ কেহ “সাধুভাষা” ও দ্বিতীয় প্রকারের ভাষাকে “কথিত বা উচ্ছৃঙ্খল ভাষা” নাম দিয়া থাকেন। তাঁহারা ইহাও বলিয়া থাকেন যে, উভয়বিধ ভাষার মধ্যে “সাধু ভাষাই” সকলের লেখা উচিত। কিন্তু, বর্তমান সময়ে, যে সমুদয় লেখক বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই “উচ্ছৃঙ্খল” জাতীয়। ইহাদের লেখাই সমাজের হৃদয়গ্রাহিনী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভাষা দু’এক জন লোকের সম্পত্তি নহে, উহা সুবিশাল সমাজের সম্পত্তি বটে। সুতরাং যে ভাষাকে বাঙ্গলার মনুষ্য-সমাজ বুঝিয়া থাকে ও বলিয়া থাকে, যে ভাষা বাঙ্গালী হৃদয়ের প্রত্যেক ভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ তাহাকেই আমরা বঙ্গভাষা বলিব।

এক দিকে যেমন এক জাতীয় “উচ্ছৃঙ্খল” লেখা নূতন সাহিত্য-যুগের আনয়ন করিয়া সহৃদয়-হৃদয়গ্রাহিনী হইয়াছে অপর দিকে, শতশত গণ্য “উচ্ছৃঙ্খল” লেখকের লেখনী হইতে শত শত লেখা নিঃসৃত হইতেছে, এবং কিয়ৎকাল যাত্রা দিবা-প্রদীপের স্তায় বর্তমান থাকিয়া, বিশ্বতির অতল গর্ভে বিলীন হইতেছে। এরূপ লেখা পড়িয়া কেহ সুখও পায় না, আর এইরূপ লেখা জন সমাজ পড়েও না। তাহা আপনা আপনিই বিনষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ লেখা অভ্যস্তগণ্য, উহা সাহিত্য-সমাজের কোনও বিশেষ অপকার করিতে পারে না। সুতরাং তাহার প্রতি সমালোচকের বাক্য-ব্যয়েরও প্রয়োজন

নাই, ইহা সমালোচনারও অযোগ্য। তবে, এইমাত্র দেখা উচিত যে, ইহা বিজ্ঞানস্বরূপে গৃহীত না হয়।

দর্শন-শাস্ত্র বল, ধর্মশাস্ত্র বল, সাহিত্য-শাস্ত্র বল, প্রত্যেক শাস্ত্রই সমাজের এক একটি অগুণ অভিযত সমষ্টি ( Expression of Public opinion ) বটে। যে শাস্ত্র জন-সমাজের মনোমত নহে, সে শাস্ত্র শাস্ত্রই নহে, সে শাস্ত্র সমাজকে শাসনই করিতে পারে না। পক্ষান্তরে, উপর্য্যুক্ত “উচ্ছৃঙ্খল” জাতীয় সাহিত্যও যদি বিশাল জন-সমাজের মনস্তত্ত্ব বিধান করিতে পারে, তবে তাহাই আমাদের সাহিত্য শাস্ত্র। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া চলিলেও উহা আমাদের সাহিত্য শাস্ত্র। যদি উহাঃ অনির্বচনীয় মাধুর্য্য সর্বসাধারণের বিশাল ও গভীর হৃদয়কে চমৎকৃত করিতে পারিয়া থাকে তবে উহার গর্ভকে ধর্ম করা সমালোচকের দৃঃসাধ্য। বস্তুতঃ আজকাল সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রতি উদাসীন লেখকগণের রচনা সমাজের বৈরূপ হৃদয়গ্রাহিনী হইয়াছে খাঁটি “সাধুভাষা” তরুণ হইতে পারে নাই। এই শ্রেণীর লেখকও বিরল। সমাজের বিশাল হৃদয়টাই যে কলুষিত হইয়াছে, এবং সমালোচকের হৃদয়ই অনাবিল রহিয়াছে তাহাও বলা যায় না। আর যদি তাহাই ঘটয়া থাকে তবে এ রোগ অচিকিৎস বটে।

প্রত্যেক প্রচলিত ভাষার এক একটি অনন্তসাধারণ দৃঢ় জীবনী শক্তি আছে। উহারা প্রত্যেকেই চন্দ্র, সূর্য্য, মনুষ্য, পশু, পক্ষীর জায় প্রাকৃতিক পদার্থ, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অবয়বী এবং স্বতঃ পবিত্র। কুলেখক-প্রদত্ত শতশত আবর্জনাও উহাদের স্বাতন্ত্র্য ও পবিত্রতা নষ্ট করিতে পারে না। সুতরাং তাহা লইয়া হৈ চৈ করিয়া এবং নিরঙ্কুশ কবিদের প্রতি “উচ্ছৃঙ্খল ভাষা” লিখিও না, “সাধুভাষা” লিখিও এইপ্রকার করমাইশ্ (আদেশ) দেওয়া খুঁটতার পরিচায়ক না হইলেও হুখা বটে।

কোনও লেখকের লেখা তাঁহারই মূর্তিমান্ মহাপ্রাণ। যে লেখকের বৈরাগ্য প্রতিভা তিনি তদ্রূপই লিখিবেন। তাঁহার লেখা তাঁহার প্রকৃতি লজ্জন করিয়া সমালোচক বা গ্রাহকের আদেশ অনুসরণ করিতে পারে না, করিলে সেই লেখা লেখাই নহে, তাহা নিজীব, প্রাণহীন। সমুদয় লেখকই কোনও বিষয়ে লিখবার কালে তাঁহাদের প্রতিভাকে যথাসাধ্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যে লেখক “সাধুভারাময়” তিনি সাধুভাষায় লিখিবেন; আর যিনি “উচ্ছৃঙ্খল” তিনি “উচ্ছৃঙ্খল” ভাষাই লিখিবেন। কুসুম কাননে নানা পুষ্পেরই বন্ধ থাকে, নানা পুষ্পই স্বতন্ত্রভাবে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। এক জাতীয় বৃক্ষে কখনই অল্প জাতীয় পুষ্প জন্মিতে পারে না।

সাহিত্যসেবীগণ ভাবে যেমন মুগ্ধ হইলেন, ভাষায় তদ্রূপ হইলেন না। কিন্তু ভাবের অনুরূপ ভাষা পাইলে, “সোনার সোহাগা” বলিয়া মনে করেন। যে লেখকের ভাষা যত স্বচ্ছ ও স্বভাবসিদ্ধ, যে লেখাতে লেখকের মনের ভাব অনায়াসে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই লেখাকেই আদর করিতে সাহিত্য সমাজ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।

বিভাগ্য পাঠ্য পুস্তকে কোন শ্রেণীর ভাষা থাকা উচিত সে বিষয়ে এস্থলে একটা কথা বলা আবশ্যক। “সাধু ভাষা”ই হউক আর “উচ্ছৃঙ্খল ভাষা”ই হউক, প্রতিভাশালী প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ লেখকের রচিত সাহিত্যই পাঠ্যরূপে নির্বাচিত হওয়া উচিত। তবেই সাহিত্যের আবঙ্গনা-রাশি বহু পরিমাণে কমিয়া আসিবে।

এক দিকে, একদল সমালোচক যেমন বঙ্গভাষাকে সংস্কৃতপ্রায় করিতে চাহেন, অপর দিকে আজকাল আর একদল সমালোচক বঙ্গভাষাতে বহুপরিমাণে আরব্য ও পারশ্ব শব্দ ঢুকাইতে চাহেন। ফরমাইসে তৈয়ারী (made to order) বিভাগ্য পাঠ্য পুস্তকে ইহা পারা যায় বটে, কিন্তু, আরব্য ও পারশ্ব ভাষায় অনভিজ্ঞ প্রকৃত সাহিত্যিকের লেখায় তাহা ঢুকান অসম্ভব। আর যদি বঙ্গভাষার ভাণ্ডে এমন শুভ দিনই কখনও উদ্ভূত হয় যে,

আরব্য ও পারশ্ব ভাষাভিজ্ঞ প্রতিভাশালী লেখক আরব্য ও পারশ্ব-শব্দবহুল বঙ্গভাষা লিখিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য চমৎকৃত করিতে পারেন তবে তখন সেইরূপ ভাষাই জন সমাজে সমাদৃত হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীদেবেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

## মদিরার মাধুরী

( থাকেন হইতে )

এস নদী-তীরে এস, সুন্দরী, এস গো ইরানী বালা।  
প্রতি পিয়লায় দাও ডুবাইয়া যত সংসার-জালা।  
গোলাপের যত জীবন মোদের দশটি দিনের খেলা  
হাসির সোনার শৃঙ্খল দিয়া বাঁধো তায় এই বেলা।  
যত নীচমনা শত্রুর কথা করোনাক প্রত্যয়, --  
সুরার প্রমোদ-বরণার তলে গাও রে তাহার জয়।  
যুবর কুপায় ভুলাও তাহারে—ভুলিয়াছে যেবা মোরে  
সৌধুর কণ্ঠে শুধু বাসনার বিরামের গান করে  
নিষ্ঠুর আঘাতে ছিঁড়েছে যাহার প্রণয়ের আশালতা  
কে বাঁচাবে তা'র সুরা বিনা হয়!

কে বুঢ়াবে তার ব্যাথা!

যৌবনে সুরা সুমধুরওম সকল সুখের সার  
আছে যত দিন যৌবন ধন, রেখ মর্যাদা তার  
যৌবন, রূপ,—এই দুটা তটে সুরার তটিনী তুলে,  
তরুণ অধর, মদিরা সুধায় স্বর্গীয় করে' তুলে।  
মান, অপমান, লোভ, ক্রোধ, ঘেব, প্রতিহিংসার কথা  
সুরার সাগরে দাও গো ডুবিয়ে সব অন্তর-ব্যাথা।  
ভরি লও সুরা শোণিত-শিরায় ওগো নীরক্ত ম্লান,  
শুক হৃদয়-বেলায় আশুক প্রেমাস্রবের বান।

স্বর্ণ বরণে উঠুক উজ্জলি তাত্র বরণ তার  
সুয়ার অনলে জলিয়া উঠুক গ্লানির অন্ধকার ।  
এ দিন ছুনিয়া সুখায় পরলে সদা সুখে হুখে ভরা  
কাঁটা কুসুমের মাঝে এ যে মধুসব তাপ-জালা-হরা ।  
শ্রীকালিদাস রায় ।

## স্বপ্নবাসবদত্তা

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

রাজা ও বিদূষক উভয়ে মাধবীকুঞ্জের দিকে পরিক্রমণ  
করিতে লাগিলেন ।

বিদু। এই যে সমুদ্র গৃহ—মহারাজ ভিতরে যান ।

রাজা। তুমি আগে যাও ।

বিদু। আচ্ছা, আমিই যাব আগে । সর্বনাশ !

সর্বনাশ ! মহারাজ আসবেন না ! দাঁড়ান !—দাঁড়ান !

রাজা। কেন ? কেন ? কি হয়েছে ?

বিদু। আর কেন ? প্রদীপের আলোকে পরিষ্কার  
দেখছি গৃহতলে একটা সাপ !

রা ।। ( প্রবেশ করিয়া ও দেখিয়া )

হায় ! মূর্খের চক্ষে এটা সাপই বটে ! মূর্খ, দরজায়  
যে একটা মালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেটাই নীচে  
পড়ে গিয়েছে ; সেই মালাটারই খানিকটা সোজা ও  
খানিকটা কুটিল ভাবে পড়ে আছে বলে সাপের মত  
দেখাচ্ছে ; আর মন্দ মন্দ বায়ুতে একটু একটু নড়ছে  
বলে বোধ হচ্ছে যেন একটা সাপ ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে ।

বিদু। ( দেখিয়া ) হাঁ মহারাজ ঠিকই বলেছেন—  
এখন দেখছি এটা সাপ নয়—কিন্তু মহারাজ ত বড় নিরাশ  
হলেন ! রাণী পদ্মাবতী এখানে এসে চলে গিয়েছেন !

রাজা। বসন্তক, এটাও তোমার ভুল ; পদ্মাবতী  
মোটাই এখনও এখানে আসেন নি ।

বিদু। আপনি কি করে বুঝলেন ?

রাজা। এই যে দেখছেন না,—

বিছানাটি একটুও লুলে পড়ে নি, বিছানার চাদরখানা  
সটান ও সমান বিছান রয়েছে, একটুও ঘোচ হয় নি ।  
মাথার ওষুধ লেগে ধপ্পে পরিষ্কার বালিশটি একটুও  
মলিন হয় নি । আর সাধারণতঃ চক্ষুর প্রীতি-সাধনের  
জন্য রোগীর শয্যাগৃহের একটা কিছু শোভা সংসাধন করা  
হয়, এখানে তাও কিছু করা হয় নি : আরও একটা কথা  
আছে—রোগী একবার শুলে শীর্ষগির শয্যা ছেড়ে  
ওঠে না ।

বিদু। তা' হ'লে মহারাজই এই শয্যায় খানিক  
ক্ষণ বসে রাণীর জন্য অপেক্ষা করুন ।

রাজা। আচ্ছা, তাই করছি । ( বসিয়া ) বয়স্ক,  
বড় যুগ পাচ্ছে । একটা গল্প বল না ?

বিদু। আচ্ছা আমি গল্প বলছি, আর আপনি হ, হ  
করুন ।

রাজা। বেশ ।

বিদু। উজ্জয়িনী ব'লে একটা নগর আছে । সেখানে  
কি করে কার্যের ফল লাভ করা যায় লোকের এ জ্ঞানটা  
বড় সূক্ষ্ম ।

রাজা। সুখা, উজ্জয়িনীর গল্প বলছ কেন ?

বিদু। যদি এই গল্পটা মহারাজের ভাল না লাগে  
তবে আর একটা বলছি ।

রাজা। বয়স্ক, এই গল্প যে আমার ভাল লাগছে না  
তা নয় । উজ্জয়িনীর কথায় আমার অবস্খী-রাজকুমারীর  
কথা মনে হচ্ছে—উজ্জয়িনী ছেড়ে আসবার সময় আত্মীয়-  
কুটুম্বগণের কথা মনে করে তার চোখ জলে ভরে গিয়ে-  
ছিল, আর প্রবৃত্ত অশ্রুবিন্দুগুলি বক্ষ সিক্ত করে ব'রে  
পড়ছিল—তারপর অনেক সাত্বনার ফলে সে আমার দিকে  
এক দৃষ্টে চেয়ে চেয়ে এত উন্মনস্ক হয়ে বীণা বাজাতে  
লাগল যে, বীণার কাঠি তারে লাগছে কি না তাতে লক্ষ্য  
নেই, শূন্যই কাঠি চালাচ্ছে । সে ছবি এখনও আমার  
চোখে লেগে রয়েছে ।

বিদু। আচ্ছা, তবে আর একটা গল্প বলছি। ব্রহ্মদত্ত নামে একটা নগর আছে—সেখানে কাম্পিল্য নামে একজন রাজা রাজত্ব করেন।

রাজা। কি বললে?

বিদু। ব্রহ্মদত্ত নামে একটা নগর আছে—সেখানে কাম্পিল্য নামে একজন রাজা রাজত্ব করেন।

রাজা। আরে মুর্থ, রাজার নাম ব্রহ্মদত্ত, আর নগরের নাম কাম্পিল্য।

বিদু। কি বলেন মহারাজ! রাজার নাম ব্রহ্মদত্ত! আর নগরের নাম—কাম্পিল্য!

রাজা। হাঁ।

বিদু। আচ্ছা, আপনি একটু চুপ করে থাকুন। ততক্ষণ আমি এই দুটা নাম আঙড়িয়ে নি—হাঁ, হয়েছে রাজার নাম ব্রহ্মদত্ত, আর নগরের নাম কাম্পিল্য—আচ্ছা, এখন শুনুন—কি মহারাজ! ঘুমিয়ে পল্লেন? বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, যাই আমিও গায়ের চাদরখানা নিয়ে আসি। [প্রস্থান।]

আবাস্তিকাবেশিনী বাসবদত্তা ও চৌরীর প্রবেশ

চৌরী। আর্ঘ্য্য, আসুন। রাজকুমারী মাথাব্যথায় বড়ই কাতর হয়েছেন।

বাস। পদ্মাবতীর বিছানা হয়েছে কোথায়?

চৌরী। শুনেছি সমুদ্রগৃহে।

বাস। আচ্ছা, তুমি আগে আগে যাও, আমি তোমার পেছনে পেছনে যাচ্ছি। (উভয়ের পরিক্রমণ)

চৌরী। এই যে সমুদ্রগৃহ। আপনি ভিতরে যান। আমি একটা প্রলেপ নিয়ে আসছি। [নিষ্ক্রান্ত।]

বাস। হায়! আমার উপর বিধিও বাম হলেন! আর্ঘ্য্যপুত্র একে বিরহকাতর—কোথায় পদ্মাবতীকে আশ্রয় করে একটু সুস্থ হবেন তা না পদ্মাবতীই অসুস্থ হয়ে পড়লো! আচ্ছা যাই ভিতরে। চাকরাণীগুলি ভারি দুর্বিনীত দেখছি ত। ঘরে ত পদ্মাবতীকে দেখবার জন্ম প্রদীপটি ছাড়া আর কেউ নেই! এই যে পদ্মাবতী শুয়ে

আছে—আমি এখানেই বাসি—না আলাদা আসনে বসলে ভালবাসাটা কম দেখাবে। আচ্ছা বিছানার এক পাশেই বসছি। একি! এর কাছে বসাতে হঠাৎ আজ আমার সমস্ত প্রাণ যেন আনন্দের বজায় ডুবে গেল! বোধ হয় একটু সুস্থ হয়েছে—সমান ভাবে নিঃশ্বাস পড়ছে। রাজকুমারী শয্যার এক পাশে শুয়ে আছেন তাই শূন্য আর একটা পাশ যেন ডেকে বলছে, আমাকে এসে আলিঙ্গন কর। যাই আমি সেই পাশটার শুই গিয়ে।

(শয়ন)

রাজা। (স্বপ্নে) হা বাসবদত্তা!

বাস। (সহসা উঠিয়া) হায়! হায়! আর্ঘ্য্যপুত্র যে! এ তো পদ্মাবতী নয়। আমাকে কি দেখলে না কি? তা হ'লে ত মন্ত্রী যোগন্ধরায়ণের প্রতিজ্ঞা নিফল হল!

রাজা। হা, অবন্তী-রাজকুমারী!

বাস। বাঁচলেম, আর্ঘ্য্যপুত্র স্বপ্ন দেখেছেন! এখানে ত কেউ নেই খানিক ক্ষণ আর্ঘ্য্যপুত্রকে দেখে নয়ন-মন চরিতার্থ করি!

রাজা। হা প্রিয়তমে, হা প্রিয়ে, হা প্রিয় শিষ্যে, আমার কথার উত্তর দাও।

বাস। কথা ত বলছি!

রাজা। তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ?

বাস। না, রাগ করি নি, দুঃখিত হয়েছে।

রাজা। যদি রাগ কর নি, তবে তোমার গায়ে অলঙ্কার নেই কেন?

বাস। এর পর আর কি বলব?

রাজা। কি বলছ, “এই বিরহিনীকে কি তোমার মনে পড়ে?”

বাস। (সরোবে) দূর হ'ক; এখানেও বিরহিনী!

রাজা। আচ্ছা, এই দেখ বিরহিনীকে মনে আছে কি না। (আলিঙ্গনার্থ হস্ত প্রসারণ)

বাস। এখানে অনেকক্ষণ রয়েছি, যদি কেউ দেখে ফেলে তা হ'লে ভারি বিপদ ঘটবে। এখন যাই।



আর্য্যপুত্রের হাত ছুঁখানি বিছানার উপর তুলে রেখে বাই। (এই রূপ করিয়া প্রস্থান)

রাজা। (সহসা শয্যা হইতে উঠিয়া) বাসবদত্তা, কোথা গেলেন তুমি? আর একটু দাঁড়াও? হায়! হায়! বাসবদত্তা গেল কোথা? তাড়াতাড়ি বেরুতে গিয়ে চৌকাঠে লেগে পড়ে গেলুম। বুঝতে পার্লুম না বাসবদত্তা সত্যি—কি যশ!

বিদূষকের প্রবেশ

বিদু। মহারাজ জেগেছেন দেখছি।

রাজা। সখা, তোমায় একটা সুখের সংবাদ দিচ্ছি, বাসবদত্তা বেঁচে আছে!

বিদু। হায়! মহিষী বাসবদত্তা—কোথায় তিনি? তিনি যে অনেক দিন ম'রে গেছেন, মহারাজ!

রাজা। না সখা, বাসবদত্তা মরে নি!

আমাকে বিছানার উপর জাগিয়ে এইমাত্র চ'লে গেল। বাসবদত্তা আঙুনে পুড়ে মরেছে এই কথা ব'লে কুমথান আমাকে ছলনা করেছিল।

বিদু। অসম্ভব নয়। কিন্তু আমার মনে ঐ উজ্জয়িনীর কথা শুনে মহিষীর কথা ভাবছিলেন তাই তাঁকে স্বপ্নে দেখেছেন।

রাজা। যদি বাসবদত্তা স্বপ্ন হ'য়ে থাকে তবে আমি আবার কাগলুম কেন? আর যদি মতিভ্রম হ'য়ে বাসবদত্তাকে দেখে থাকি, তবে এখনও সেই মতিভ্রম অটুট রইল না কেন?

বিদু। মহারাজ, যদি এরূপ করেন তবে লোকে আপনাকে উপহাস করবে। তবে আমি জানি এই রাজপরিবারে অবস্খী সুন্দরী ব'লে একটা যক্ষিনী আছে। আমার বোধ হয় মহারাজ সেটাকেই দেখেছেন।

রাজা। না—না সখা, আমি নিশ্চয় বাসবদত্তাকে দেখেছি—

জেগে দেখলুম বাসবদত্তার চোখে অঙ্গন নেই, আর তার সুদীর্ঘ কেশরাশি মুখের উপর লম্বিত হয়ে পড়ে রয়েছে—এই ক'রেই অবস্খী-রাজকুমারী পতিব্রততার ধর্ম

পালন কচ্ছেন। এই দেখ বয়স্ক প্রিয়া ত্রাসিত হ'য়ে স্বপ্নে আমার বাহ স্পর্শ করেছিল সেই স্পর্শজনিত রোমহর্ষ এখনও দূর হচ্ছে না।

বিদু। এ সব অকারণ চিন্তা ক'রে আর লাভ নেই। মহারাজ, আসুন, এ বেলা আমরা অন্তঃপুরের অঙ্গনে বাই।

কাজুকীর প্রবেশ

কা। আর্য্যপুত্রের জয় হ'ক; আমাদের মহারাজ দর্শক আপনাকে বলতে বলেন যে, অমাত্য কুমথান সৈন্য সজ্জা ক'রে আপনার শত্রু আকৃণির বিনাশার্থ এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আমাদেরও হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতি আপনার সাহায্যার্থ সজ্জিত হ'য়েছে। অতএব মহারাজ সত্বর প্রস্তুত হ'ন। এখন দেখা যাচ্ছে সমস্তই বৎসরাজের অনুকূল—

শত্রুদের মধ্যে মনাস্তর হয়েছে। রাজ-ভক্ত কৌশাঙ্গী-নিবাসী প্রজাগণ আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী, পুরবাসীগণ সকলে আনন্দিত, বিশেষতঃ অগ্রগামী সৈন্যগণ গঙ্গা উত্তীর্ণ হয়েছে, আর আপনার অভিযান কালে যে সকল সৈন্য পশ্চাৎভাগ রক্ষা করবে তাদেরও নির্বাচন হয়েছে; আবার আমাদের মহারাজও শত্রু-নিপাতের উপযোগী অস্ত্রাশ্রয় সমস্ত আয়োজন ঠিক ক'রে রেখেছেন।

রাজা। তা হ'লে আর চিন্তা নেই—এত দিনে বিধি মুখ তুলে চাইলেন।

মহাসাগরের তায় যে যুদ্ধ ক্ষেত্র মাত্র নাগেন্দ্র ও ভূরঙ্গ সাহায্যে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, যে যুদ্ধ ক্ষেত্রের বিকীর্ণ বাণরাশি বিপুল তরঙ্গ-ভঙ্গের তায় সেইরূপ বিরাট যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হ'য়ে দারুণ কর্শে সুদক্ষ আকৃণিকে এবার বিনাশ করবই করব। [সকলের প্রস্থান।

বিকৃত্ত।

কাজুকীর প্রবেশ

কা। রক্ততোরণের দ্বার রক্ষা হচ্ছে কে হে?

প্রতীহারীর প্রবেশ

প্রতী। আর্ধ্য, আমি বিজয়া ; আদেশ করুন।

ক। বিজয়া, বৎসরাজ্য পুনরায় মহারাজ উদয়নের হস্তগত হ'য়েছে, আবার তাঁর সৌভাগ্যের দিন ফিরে এসেছে। তাঁকে বল মহারাজ মহাসেনের রাজধানী হ'তে রৈভ্যসগোত্র কাঞ্চকীয় এসেছেন, আর মহিষী অঙ্গারবতীর প্রেরিত রাণী বাসবদত্তার ধাত্রীও তাঁর সঙ্গে এসেছেন। এরা দু'জনেই দ্বারদেশে অপেক্ষা কচ্ছে।

প্রতী। আর্ধ্য, এই খবর দেওয়ার ঠিক সময় এটা নয়।

কাঞ্চ। কেন বিজয়া ?

প্রতী। আজ না কি কে শয্যা-মহাপ্রাসাদ থেকে বীণা বাজিয়েছিল মহারাজ জ্ঞানে বলেছেন এই বীণার স্বর অবিকল ঘোষবতীর মত।

কাঞ্চ। তারপর।

প্রতী। তারপর সেখানে গিয়ে রাজা জিজ্ঞাসা করেন, “এই বীণা কোথা থেকে এল ?” সেই লোকটা বললে, “আমরা নন্দদাতীরে একটা ঝোপে পেয়েছি। মহারাজের ইচ্ছা হ'লে নিতে পারেন।” তারপর বীণাটি কোলে তুলে মহারাজ মুচ্ছিত হলেন। ধানিক পরেই মুচ্ছা ভাঙ্গল বটে কিন্তু অবিরল ধারে অশ্রু বিসর্জন ক'রে রাজার চোখ দুটি ফুলে উঠল। তারপর তিনি অত্যন্ত করুণ স্বরে বীণার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বললেন, “ঘোষবতি, তোমাকে ত পেলাম, তাকে ত দেখছি না ?” আর্ধ্য এই ত অবস্থা শুনলেন, এখন কেমন ক'রে আবার এই খবর নিয়ে যাই।

কাঞ্চ। যাও, তুমি এই খবরও দেও গিয়ে—এই খবরেও ঘোষবতীর কথা আছে।

প্রতী। আজ্ঞা, তবে যাই। এই যে মহারাজ শয্যা-মহাপ্রাসাদ থেকে নেমে আসছেন। এখানেই খবরটা দি।

কাঞ্চ। হাঁ, তাই দাও।

[ উভয়ের প্রস্থান।

যষ্ঠ অঙ্ক।

রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ

রাজা। ঘোষবতি, তোমার মধুর স্বরে কর্ণ পরিতৃপ্ত হয় ; তুমি থাকতে দেবী বাসবদত্তার বন্ধে, না হ'লে তার জোড়ে—সেই সুখের স্থান ছেড়ে তুমি ভীতিসঙ্কল অরণ্যে গেলে কেন ? আবার পাখীরা তোমার গাময় ধূলি ছড়িয়ে দিয়েছে। ঘোষবতি, তোমার প্রাণে বিদুমাত্রও স্নেহ নেই—হতভাগিনী বাসবদত্তাকে কি একটুও তোমার মনে পড়ে না ?

গুরু-নিতম্বিনী বাসবদত্তা উপবিষ্ট হ'লে তার কোলে থেকে তোমার দুই দিকে চাপ পড়ত, তার পরোধর যুগলের মধ্যে স্বেদাসক্ত হ'য়ে তুমি সুখে থাকতে, আমার বিরহে কাতর হয়ে রাণী করুণ সুখে তোমাকে বাজাত, আবার অল্প সময় তোমাতে মধুর রাগিনী আলাপ কন্ত—তাকি তোমার একটুও মনে পড়ে না ?

বিদূ। মহারাজ, এক্ষণ কাতর হ'য়ে আর লাভ কি ?

রাজা। সখা তুমিও এ কথা বলছ ?

এই বীণা দেখে অতীতের কত কথা আমার মনে জেগে উঠছে। কিন্তু ঘোষবতীকে যিনি এত ভালবাসতেন সেই দেবীকে ত দেখছি না ? বসন্তক, কোনও শিল্পীর কাছে নিয়ে গিয়ে ঘোষবতীতে শীঘ্র নূতন তার লাগিয়ে নিয়ে এস।

বিদূ। যে আজ্ঞা।

( বীণা লইয়া প্রস্থান )

প্রতীহারীর প্রবেশ

প্রতী। মহারাজের জয় হ'ক। মহারাজ মহাসেনের রাজধানী থেকে রৈভ্যসগোত্র কাঞ্চকীয় এবং তার সঙ্গে রাণী অঙ্গারবতীর প্রেরিত মহিষী বাসবদত্তার ধাত্রী দ্বারদেশে অপেক্ষা কছেন।

রাজা। পদ্মাবতীকে সংবাদ দাও।

প্রতী। যে আজ্ঞা।

[ প্রস্থান।

রাজা। এই ঘটনা এত শীঘ্রই কি মহাসেন জানতে পারলেন ?

পরিচায়িকাগণের সহিত পদ্মাবতীর প্রবেশ

প্রভা। রাজকুমারী, এদিকে আসুন।

পদ্মা। আর্ধ্যপুত্রের জয় হ'ক।

রাজা। পদ্মাবতি, শুনচি না কি মহারাজ মহাসেনের রাজধানী থেকে রৈভ্যসগোত্র কাঙ্ক্ষীয় ও রাণী অঙ্গারবতীর কাছ থেকে ধাত্রী বসুন্ধরা দ্বাংদেধে উপস্থিত হয়েছেন।

পদ্মা। আর্ধ্যপুত্র, বন্ধুগণের কুশল সংবাদ জানতে পাব এতে আমার বড় আনন্দ হচ্ছে।

রাজা। হাঁ পদ্মাবতী, তোমার যোগ্য কথাই বলেছ। বাসবদত্তার যারা আত্মীয়, তারা তোমারও আত্মীয়। একথা ঠিক। পদ্মাবতি, ব'স—ব'সছ না যে?

পদ্মা। আর্ধ্যপুত্র, আপনি কি আমার সঙ্গে একত্র ব'সে এদের সঙ্গে দেখা করবেন?

রাজা। এতে দোষ কি?

পদ্মা। আর্ধ্যপুত্র পুনরায় বিয়ে করেছেন, এতে এদের মনে দুঃখ হতে পারে।

রাজা। যারা তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারে তাদের সঙ্গে যদি তুমি দেখা না কর তা হ'লে দোষের কথা হবে। তাই তোমাকে বসতে বলছি।

পদ্মা। আচ্ছা তবে বসি। ( উপবেশন )

আর্ধ্যপুত্র, মা ও বাবা না জানি কি ব'লে পাঠিয়েছেন তবে আমার মন বড় উৎকণ্ঠিত হচ্ছে।

রাজা। ঠিক বলেছ—

আমারও মনে এই সন্দেহ হচ্ছে—না জানি তাঁরা কি ব'লে পাঠিয়েছেন। হায়! আমি তাদের ঘেহের কথা চূরি ক'রে নিয়ে এসেছি—কিন্তু রক্ষা করতে পারি নি। ভাগ্য-দোষে গুণবান পুত্র কোন অপরাধ কল্পে সে যেমন পিতার কোপে পতিত হবে ব'লে ভীত হয় আমিও তাই হচ্ছি।

কাঙ্ক্ষীয়, ধাত্রী ও প্রভাহারীর প্রবেশ

কাঙ্। আমাদের রাজার আত্মীয়ের রাজ্যে এসেছি ব'লে মনে এক দিকে যেমন আনন্দ হচ্ছে তেমনি আবার

রাজকুমারীর মৃত্যুর কথা মনে ক'রে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হচ্ছে। হে দৈব, তুমি যদি বৎসরাজ্য শত্রু হস্তগত না কত তা হ'লে দেবী বাসবদত্তার অকুশল ঘটত না!

প্রভা। এই আমাদের মহারাজ, আর্ধ্য সামনে আসুন।

কাঙ্। ( অগসর হইয়া ) আর্ধ্যপুত্রের জয় হ'ক।

ধাত্রী। মহারাজের জয় হ'ক।

রাজা। ( অত্যন্ত সন্মানের সহিত ) আর্ধ্য, পৃথিবীতে রাজগণের উদয়াস্তের একমাত্র কর্তা আমার আকাঙ্ক্ষিত বান্ধব রাজা মহাসেন কুশলে আছেন ত?

কাঙ্। হাঁ, মহাসেনের কুশল; মহারাজ সর্বাঙ্গীন কুশলে আছেন কি না তিনি তাই জানতে পাঠিয়েছেন।

রাজা। ( আসন হইতে উঠিয়া ) মহাসেন কি আদেশ করেছেন?

কা। মহাসেনের প্রতি এই সন্মান প্রদর্শন বৈদেহী-ভ্রমরের যোগ্যই বটে; মহারাজ, আসনে ব'সেই মহাসেনের বক্তব্য শ্রবণ করুন, তাতে দোষ নেই।

রাজা। মহাসেনের আদেশ শিরোধার্য।

( উপবেশন )

কাঙ্। সৌভাগ্যের বিষয় যে, ভাগ্যক্রমে শত্রু-হস্তগত রাজ্যের পুনরায় উদ্ধার হয়েছে। মহারাজ,

যারা অশস্ত্র, যারা কাতর, তাদেরই উৎসাহ নেই, যারা উৎসাহী প্রায় তাদের ভাগ্যেই রাজ্য-লক্ষী লাভ হ'য়ে থাকে।

রাজা। এ সমস্তই মহাসেনের প্রভাবের ফল—

আমি প্রথমে পরাজিত হয়েছিলেম, তারপর তাঁর পুত্রগণের সঙ্গে লালিত হয়েছি, বল-প্রয়োগে রাজ-কুমারীকে অপহরণ ক'রে এনেছিলেম কিন্তু রক্ষা করতে পারি নি। তারপর তার মৃত্যুর কথা শুনেও আমাকে একান্ত আপনায় ব'লে মনে ক'রে তাঁরা যে আমার সংবাদ লওয়া উচিত মনে করেছেন তাতে মহাসেনের উদারতা ও প্রভাবেরই পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

কাঞ্চ। আমি মহাসেনের বক্তব্য নিবেদন করছি।  
রানীর কথা ধাত্রী বলবেন।

রাজা। মা গো! মা!

যোল জন মহিষীর মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠা, যিনি পুণ্যশীলা,  
যিনি নগরের দেবীকল্পিনী, যিনি আমার প্রবাস হুখে  
কাতর, আমার সেই মায়ের কুশল তো?

ধাত্রী। হাঁ মহারাজ, রানীমার সর্বাঙ্গীন কুশল।  
তিনিও মহারাজের সর্বাঙ্গীন কুশল জ্ঞানতে চেয়েছেন।

রাজা। আমার আবার সর্বাঙ্গীন কুশল! মা গো!  
আমার কুশল ত এই!

ধাত্রী। মহারাজ, এত কাতর হবেন না।

কাঞ্চ। আর্ধ্যপুত্র, ঐধ্য অবস্থান করুন; যারপর  
মহারাজের এত ভালবাসা সেই মহাসেন-রাজকুমারী  
ম'রে ও মরেন নি, এবিষয়ে শোক ক'রে ফল কি?

মরণ-কালে কে কাকে রক্ষা কতে পারে? দড়ি  
ছিঁড়ে গেলে ঘটের অবলম্বন আর থাকে কৈ!  
সংসার ও অরণ্য একই রকম—অরণ্যে গাছ জন্মে  
সময় হলে ম'রে যায়; সংসারেও লোক জন্মে সময়  
কুরালে ম'রে যায়।

রাজা। আর্ধ্য, এমন কথা বলবেন না—

মহাসেন-রাজকুমারী আমার প্রিয়তমা মহিষী, শিষ্যা।  
মরণেও তাকে ভুলতে পারব না।

ধাত্রী। মহারাজ, রানী বলেছেন, “বাসব-  
দত্তা ম'রে গেছে—বিধির বিধান; কিন্তু আমার কাছে  
ও মহারাজের কাছে আমাদের গোপালক যেমন প্রিয়  
আমাদের জ্যেষ্ঠ জামাতা তুমিও তেমন। একটাই  
তোমাকে উজ্জয়িনীতে আনিয়েছিলুম, এবং অগ্নি  
সাক্ষী না ক'রে বীণার ছলে বাসবদত্তাকে তোমার  
হাতে সমর্পণ ক'রেছিলুম। কিন্তু তোমারই  
চপলতার দোষে বিবাহ মজল হ'তে পারে নি। যা হ'ক  
আমরা তোমার ও বাসবদত্তার ছবি আঁকিয়ে সেই  
ছবির বিয়ে দিয়েছি। এখন বাসবদত্তার সেই ছবিখানা

তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি, এই ছবি দেখে তুমি  
শান্তি লাভ করো।”

রাজা। আহা, আমার, পর, রানীমার কত স্নেহ।  
আর তাঁর কপাগুলিও তাঁর বংশেরই অঙ্গরূপ।

এই স্নেহমাখা কথা শুনে আমার প্রাণে যত আনন্দ  
হ'ল শত রাজ্য ফিরে পেলেও তেমন আনন্দ হ'ত না।  
আমি গুরুতর অপরাধ করেছি, তবু আমাকে ভোলেন  
নি, আবার আমার উপর কত স্নেহ!

পদ্মা। আর্ধ্যপুত্র, গুরুব্যক্তির ছবি দেখে তাঁকে  
আমার প্রণাম কতে ইচ্ছে হচ্ছে।

ধাত্রী। রাজকুমারি, দেখুন দেখুন কেমন সুন্দর  
আকৃতি।

( চিত্র প্রদর্শন )

পদ্মা। ( দেখিয়া স্বগত ) কি আশ্চর্য্য! এই ছবি  
যে অবিকল আর্ধ্য আকৃতির মত। ( প্রকাশ্যে )  
আর্ধ্যপুত্র, এই ছবি দেখতে ঠিক আর্ধ্য আকৃতির  
মত।

রাজা। ‘মত’ কি বলছ পদ্মাবতী—আমার বোধ  
হচ্ছে যেন এই ছবিটি ঠিক তাঁরই—

হায়! এত স্নিগ্ধ রূপের এই দারুণ বিপদ ঘটল কি  
ক'রে? মুখের এমন মাধুর্য্য আশুনই বা কোন প্রাণে  
পুড়িয়ে দিল?

পদ্মা। আর্ধ্যপুত্রের ছবি দেখলেই বুঝতে  
পারব এই ছবিটি আর্ধ্য বাসবদত্তার ঠিক ছবি কি না।

ধাত্রী। রাজকুমারি, এই ছবিখানা একবার  
দেখুন ত।

পদ্মা। বাঃ, এ ত ঠিক আর্ধ্যপুত্রেরই মত!  
তা'হ'লে ঐ ছবিখানাও আর্ধ্য বাসবদত্তার না হ'য়ে  
আর যায় না।

রাজা। দেবি, ছবি দেখা অবধি তোমাকে আনন্দিতও  
দেখছি এবং উদ্বিগ্নও দেখছি—এর কারণ কি?

পদ্মা। আর্ধ্যপুত্র, এই ছবিটি ঠিক যার চেহারার  
মত এমন একজন এখানেই আছেন।

ভাঙ্গ ১৩২১

রাজা। কি! তোমার কথা শুনে আমি যে অস্থির হ'য়ে উঠছি! বাসবদত্তা নয় ত?

পদ্মাবতি। কি! ভগিনী বাসবদত্তা!

রাজা। তা হ'লে তাকে এখনি এখানে নিয়ে এস।

পদ্মা। আৰ্য্যপুত্র, একজন ব্রাহ্মণ তাঁর ভগ্নীকে আমার কাছে আমার কন্যার মত থাকবে ব'লে রেখে গেছেন। তার স্বামী বিদেশে আছে। স্ত্রত্যাগ সে পর পুরুষ দর্শন করে না। কিন্তু সে আমার সঙ্গেই এসেছে। তাকে দেখলেই সব বুঝতে পারবেন।

রাজা। যদি নিশ্চিতই সে ব্রাহ্মণের ভগিনী হ'য়ে থাকে তবে সে আর কেউ—বাসবদত্তা নয়—পৃথিবীতে একরকমের লোক নেই একথা বলা যায় না।

প্রতীহারীর প্রবেশ

প্রতী। মহারাজের জয় হ'ক। উজ্জয়িনী থেকে একজন ব্রাহ্মণ এসেছেন, বলছেন, “রাণীর কাছে আমার ভগিনীকে গচ্ছিত রেখে গিয়েছি। এখন তাকে ফিরে নিতে এসেছি।” সেই ব্রাহ্মণ দ্বারদেশে অপেক্ষা কচ্ছেন।

রাজা। পদ্মাবতি, তিনি কি সেই ব্রাহ্মণ!

পদ্মা। হাঁ, সেই ব্রাহ্মণই হবেন।

রাজা। উপযুক্ত শিষ্টাচার দেখিয়ে ব্রাহ্মণকে এখানে নিয়ে এস।

প্রতী। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

রাজা। পদ্মাবতি, তুমিও তাঁর ভগিনীকে নিয়ে এস।

পদ্মা। আৰ্য্যপুত্রের যেমন আদেশ।

[প্রস্থান]।

বৌদ্ধরায়ণ ও প্রতীহারীর প্রবেশ

যৌ। (স্বগত) রাজার মঙ্গল হবে এই ভেবেই মহিষীকে ছদ্মবেশে সাজিয়েছিলাম। এখন কার্য্যসিদ্ধি হয়েছে কিন্তু মহারাজ কি বলবেন এই ভেবে আমার মনে বড় শঙ্কা হচ্ছে।

প্রতী। এই যে মহারাজ সম্মুখে; আৰ্য্য এগিয়ে যান।

যৌ। মহারাজের জয় হ'ক।

রাজা। এই স্বর যেন পরিচিত বোধ হচ্ছে! ওগো ঠাকুর, আপনি কি আপনার ভগিনীকে পদ্মাবতীর কাছে রেখে গিয়েছিলেন?

যৌ। হাঁ মহারাজ।

রাজা। (প্রতীহারীর প্রতি)

এই ব্রাহ্মণের ভগিনীকে শীগ্গির নিয়ে এস।

প্রতী। মহারাজের যেমন আদেশ।

[প্রস্থান।

পদ্মাবতী, আবন্তিকা ও প্রতীহারীর প্রবেশ

পদ্মা। আৰ্য্য! আশ্রন আশ্রন; আপনাকে একটা সুখবর দিব।

আবন্তিকা। কি খবর, সখি!

পদ্মা। আপনার ভাই আপনাকে নিতে এসেছেন।

আবন্তিকা। আমার গৌভাগ্য যে, দাদা এখনও ভোলেন নি।

পদ্মা। আৰ্য্য পুত্রের জয় হ'ক; ব্রাহ্মণ যাকে আমার কাছে রেখে গিয়েছিলেন তাকে এনেছি।

রাজা। পদ্মাবতি, সাক্ষী রেখে গচ্ছিত বস্তু ফিরিয়ে দিতে হয়—এই রৈভ্যাস ঠাকুর ও ধাত্রী বস্তুদ্বারা তোমার সাক্ষী হবেন।

পদ্মা। মা, এই দেখুন যাকে আমার কাছে এই ব্রাহ্মণ রেখে গিয়েছিলেন।

ধাত্রী। (আবন্তিকাকে বিশেষ রূপে দেখিয়া)

একি! এ যে রাজকুমারী বাসবদত্তা!

রাজা। কি! মহাসেন-রাজকুমারী! দেবী বস্তুদ্বারা, পদ্মাবতীকে সঙ্গে করে তাকে এখানে নিয়ে আসুন।

যৌগ। না, না, তাকে এখানে আনা যায় কি ক'রে। সে যে আমার ভগিনী।

রাজা। আপনি কি বলছেন। এ যে মহাসেন-রাজকুমারী।

যৌগ। মহারাজ,

ভরত-কুলে আপনার জন্ম, আপনি পরম বিনীত, মহাজ্ঞানী ও শুদ্ধশীল সূত্রগ্রাং অবিবেচনার বশবর্তী হ'য়ে যদি রাজ-ধর্ম বিসর্জন দেন তা হ'লে এই নিখিল কুল কলঙ্কিত হবে।

রাজা। আচ্ছা, ছবির সঙ্গে এর রূপের কতটা দাদৃশ্য আছে তাই আমি দেখব। প্রতীহারী, পর্দাটা একটু সরু-চিঁত কর তো।

যোগ। প্রভুর জয় হ'ক।

বাস। আর্ধ্যপুত্রের জয় হ'ক।

রাজা। একি! ইনি যে যোগেশ্বরায়ণ, আর ইনিও যে মহাসেন-রাজকুমারী! (উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া)

আমার স্বপ্ন কি সত্য হ'ল? আমি কি আবার প্রিয়-তমা বাসবদত্তাকে সত্যি দেখছি—পূর্বেও একবার স্বপ্নে দেখেছিলাম তখন কিন্তু বঞ্চিত হয়েছি।

যোগ। মহারাজ, দেবাকে স্থানান্তরিত ক'রে আমি গুরুতর অপরাধ করেছি, এ অধীনকে ক্ষমা করুন।

(পদতলে পতন)

রাজা। (মন্ত্রীকে ডুলিয়া) আপনি যোগেশ্বরায়ণ!

হায়! আপনি উন্মাদ সেক্ষে, যুদ্ধ ক'রে, শাস্ত্রের নাতি অবলম্বন ক'রে আমাকে উদ্ধার করেছেন—আমি ভুবে গিয়েছিলাম শুধু আপনার ঐকান্তিক যত্নে ভেদে উঠেছি।

যোগ। প্রভুর ভাগ্যের অধীন হওয়াই ত আমাদের কর্তব্য।

পদ্মা। হায়! কি সৌভাগ্য! ইনিই আর্ধ্য বাসবদত্তা। আর্ধ্যে, সখীর জায় ব্যবহার ক'রে আমি আপনার প্রতি অশিষ্টাচরণ করেছি, যেক্ষেপ শিষ্টাচার দেখান উচিত তা দেখাই নি; এখন পায়ে প'ড়ে প্রণাম কচ্ছি—অপরাধ মার্জনা করবেন।

বাস। (পদ্মাবতীকে ডুলিয়া) ওঠ ভগিনী, তুমি চিরসধবা হও। যে লোক প্রার্থী হ'য়ে আসে সে-ই দোষী হয়, যে প্রার্থনা পূর্ণ করে তার কিছুই অপরাধ নেই।

রাজা। বয়স যোগেশ্বরায়ণ, দেবীকে এরূপ ভাবে স্থানান্তরিত ক'রে কি উপকার করেছেন?

যোগ। মাত্র কৌশাধী বন্ধা করেছি।

রাজা। পদ্মাবতীর কাছে তাকে গচ্ছিত রেখে গেলেন কেন?

যোগ। পুশকভদ্রাদি সিদ্ধ পুরুষগণ বলেছিলেন রাজকুমারী পদ্মাবতী কৌশাধী-রাজের মহিষী হবেন।

রাজা। ক্রমধানও তা হ'লে একথা জানতেন!

যোগ। মহারাজ, একথা কারও অজানা ছিল না।

রাজা। কি আশ্চর্য্য, ক্রমধান ত বড় শঠ দেখছি।

যোগ। মহারাজ, দেবী বাসবদত্তা কুশলে আছেন এই সংবাদ দিয়ে রৈভ্যাস ঠাকুর এবং ধাত্রী বনুন্ধরাকে আজই উজ্জয়িনীতে পাঠিয়ে দিন।

রাজা। দেবী পদ্মাবতীকে সঙ্গে ক'রে আমরা সকলেই সেখানে যাব।

ভরত বাক্য

যে পৃথিবী সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, বিদ্যাগিরি যার কুণ্ডল স্বরূপ, আমাদের রাজা একচ্ছত্র অধিপতি রূপে সেই সমগ্র পৃথিবীর শাসন দণ্ড পরিচালন করুন।

[ সকলের প্রস্থান।

ইতি স্বপ্ননাটকমবসিতম্।

শুভং ভূষাৎ।

শ্রী গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

## বঙ্গের রঘুনাথ শিরোমণি \*

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

টাকা সাহিত্য পরিষদে পঠিত

পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের চতুষ্পাঠী সমূহে এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে বঙ্গীয় রঘুনাথ শিরোমণি সম্পর্কে যে সকল জনশ্রুতি এবং মতবাদ প্রচারিত আছে তৎসমূহের মর্ম এই প্রবন্ধের উপাদান ভাগে ইতঃপূর্ব প্রকাশিত হইয়াছে। রঘুনাথ শিরোমণি নিজ জীবনের কোনও উপাদান রাখিয়া যান নাই। সমসাময়িক কোন মহাত্মাও রঘুনাথের জীবনী লিপিবদ্ধ করেন নাই আর বর্তমান বঙ্গেও এপর্যন্ত রঘুনাথ এবং অপরাপর দার্শনিক-গণের জীবনী লিপিবদ্ধ হয় নাই। সুতরাং রঘুনাথ সম্পর্কে বহু ভ্রান্ত ধারণা বঙ্গসাহিত্যে প্রচলিত হওয়া আশ্চর্যের বিষয় বলিয়া গণ্য হইবে না। † পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন বঙ্গীয় রঘুনাথ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জনপ্রবাদ হইতে সত্য উদ্ধার করিতে যদিও আমরাদিগের সিদ্ধান্তের সহিত প্রচলিত বহু মতবাদের বিরোধ ঘটিতে পারে তথাপি আমরা যতদূর সত্য নির্ধারণ করিতে পারিয়াছি তাহা বিবৃত করা সঙ্গত মনে করিয়া নিম্নে তাহার আলোচনা করিলাম।

\* শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের দুইস্থলের মুদ্রাকর আমাদের সংশোধন—

(১) ১৪৭ পৃঃ প্রথম স্তম্ভ ১১শ লাইনে ১৬২১ স্থলে ১৬১২ হইবে।

(২) ১৫১ পৃষ্ঠা (১) ৯ম লাইনে ‘প্রণয়ন’ স্থলে “গঙ্গা-পর্বে বিসজ্জন” হইবে।

† শ্রীহট্ট হইতে উত্থাপিত নূতন মতবাদগুলি “শ্রীহট্টের রঘুনাথ ও বঙ্গের রঘুনাথ” শীর্ষক প্রবন্ধে আগোচিত হইয়াছে। প্রতিভা, ১০২১।

গ্রীক কবি হোমরের বাসস্থান লইয়া ৭টি জনপদের রঘুনাথ শিরোমণি নাগরিকগণ দাবী উত্থাপন শ্রীহট্ট, পদ্মাতীর অথবা করিয়াছিলেন! এক্ষেত্রে নবদ্বীপ নিবাসী? আমরাদিগকে তিনটীমাত্র স্থানের দাবী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে।

শ্রীহট্ট দাবী আধুনিক। ১১২ বৎসর হইল শ্রীহট্ট অচ্যুতনাথ তত্ত্বনিধি মহাশয় সর্বপ্রথম, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত দক্ষিণ শ্রীহট্টের ( বাৎস্ত গোত্রীয় ) সুবিদনারায়ণ নামক জনৈক রাজার জামাতা ( কাত্যায়ন গোত্রীয় ) রঘুপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে রঘুনাথ শিরোমণি বলিয়া প্রচার করেন।

শ্রীহট্ট-রঘুনাথ আলোচনায় ইতঃপূর্বে আমরা সপ্রমাণ করিয়াছি যে, শ্রীহট্টের কাত্যায়ন গোত্রে নবাবিষ্কৃত রঘুনাথ একটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক ব্যক্তিমাত্র এবং খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাদুর্ভূত সুবিদনারায়ণের আত্মীয় রূপে এই কল্পিত রঘুনাথের অবতারণায় শ্রীহট্টের বহু ঐতিহাসিক সত্য বিকৃত হইয়াছে।

পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের চতুষ্পাঠী সমূহে প্রচলিত জনশ্রুতি সমূহ একবাক্যে নির্দেশ করিতেছে যে, পঞ্চম-বর্ষের পূর্বেই রঘুনাথ জননী সহ বাসুদেব সার্কভোমের গৃহে আশ্রয় লাভ করেন এবং পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রমকালে সার্কভোমের নিকটেই সর্বপ্রথম তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়।

শ্রীহট্টের তথাকথিত রঘুনাথের বিদ্যারম্ভ শ্রীহট্টের পঞ্চমও নিবাসী শিবরাম তর্কসিদ্ধান্তের নিকটে হইয়াছিল এবং ব্যাকরণ ও অভিধান সমাপ্ত করিয়া একাদশ বৎসর বয়সে তিনি শ্রীহট্ট পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপ আগমন করিয়াছিলেন। এ কাহিনী হইতেও প্রমাণিত হইতেছে যে, কাত্যায়ন গোত্রে নবাবিষ্কৃত রঘুনাথ, বঙ্গীয় রঘুনাথ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তি। সুতরাং বঙ্গীয় রঘুনাথের নিবাস নির্ধারণ করিতে গিয়া শ্রীহট্টের নাম উল্লেখই নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচিত হইবে।

স্বর্গীয় বান্ধব সম্পাদক রঘুনাথকে পদ্মাতীর বাসী  
বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন; কিন্তু  
পদ্মাতীর পদ্মানদী রাজসাহী, মুর্শিদাবাদ,  
নদীয়া, ঢাকা প্রভৃতি জিলার সীমা  
ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। পদ্মাতীর বলিতে  
ঢাকা জিলার অন্তর্গত স্থানবিশেষ বুঝাইবে একরূপ উক্ত  
সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

পশ্চিম বঙ্গের চতুষ্পাঠী সমূহে প্রচলিত জনশ্রুতি  
অনুসারে রঘুনাথের পিতা নবদ্বীপবাসী দরিদ্র ব্রাহ্মণ  
ছিলেন এবং রঘুনাথ নিজেকে “নবদ্বীপ  
নবদ্বীপ, নিবাসিনঃ” বলিয়া পরিচয় প্রদান  
পদ্মাতীর করিয়াছিলেন। একরূপ একটা বচনও  
বঙ্গের চতুষ্পাঠী সমূহে সর্বত্রই প্রচলিত  
আছে। এমতাবস্থায় রঘুনাথের পূর্বপুরুষগণ নবদ্বীপে  
উপনিবিষ্ট হইবার পূর্বে পদ্মাতীরে কোনও  
অনিদিষ্ট স্থানে বাস করিতেন, তর্কহলে এইরূপ স্বীকৃত  
হইলেও কোনও প্রবল নূতন প্রমাণ উপস্থিত না হওয়া  
পাওয়া, “নবদ্বীপ নিবাসিনঃ” রঘুনাথের নিবাসভূমি  
নবদ্বীপ ভিন্ন অত্র নিকারণ পরিবার উপায় নাই।

এখন রঘুনাথ কোন সময়ে বিজ্ঞানালোচনা করেন সেই  
বিষয়ের আলোচনা করা যাউক।

চৈতন্যদেব ও সার্কভৌমের পরিচয় প্রসঙ্গ চৈতন্যদেবের  
মধ্যলীলার অন্তর্ভুক্ত। মধ্যলীলা  
রঘুনাথ-গুরু সার্ক-  
ভৌম ১৪৮ খৃঃ  
সঙ্গে অথবা ১৫০৪  
খৃঃ অব্দের পরে  
নবদ্বীপ পরিভ্রমণ  
পূর্বক উড়িষ্যা  
উপনিবিষ্ট হন।

\* চৈতন্যদেবের শেষজীবনের নিত্যসহচর দামোদর  
রচিত করচা বর্তমানে লুপ্ত। কবিরাজ গোস্বামী  
তদীয় গুরু রঘুনাথ দাসের নিকট হইতে উক্ত করচা  
প্রাপ্ত করিয়া তদনুসরণ পূর্বক মধ্যলীলা বর্ণন করেন।

মধ্য লীলা হইতে উদ্ধৃত এই অংশ পাঠ করুন।

“গোপীনাথ আচার্য্যকে কহে সার্কভৌম।  
গোসাঞির জানিতে চাহি কাঁহা পূর্বাশ্রম।  
গোপীনাথ আচার্য্য কহে ‘নবদ্বীপ বর’;  
জগন্নাথ নাম পদবী মিশ্রপুরন্দর।  
শিশুভর নাম ইহঁার তাঁর ইঁহো পুত্র;  
নীলাধর চক্রবর্তী হইলেন দৌহিত্র।  
সার্কভৌম কহে ‘নীলাধর চক্রবর্তী’;  
বিশারদের সমাধায়া, এই তাঁর খ্যাতি।  
মিশ্রপুরন্দর তাঁর মাঝ হেন জানি  
পিতার সম্বন্ধে দৌহাকে পূজ্য আমি মানি ॥  
নদীয়া সম্বন্ধে সার্কভৌম তুষ্ট হৈলা।  
প্রীত হৈয়া গোসাঞিরে কহিতে লাগিলা ॥  
সহজেই পূজ্য তুমি আরে ত সন্ন্যাস।  
অতএব জানহ তুমি আমি নিজদাস ॥  
শুনি মহাপ্রভু কৈল শ্রীবিষ্ণু অরণ।  
ভট্টাচার্য্য কহে কিছু বিনয় বচন ॥  
তুমি জগৎগুরু সর্বলোকহিতকর্তা  
বেদান্ত শুনাও সন্ন্যাসীর উপকর্তা ॥  
আমি বালক-সন্ন্যাসী ভালমন্দ নাহি জানি  
তোমার আশ্রয় লৈল গুরু করি মানি ॥” \*

এই পরিচয়ে সার্কভৌম সন্তুষ্ট না হইয়া, সন্ন্যাসী কোন  
সম্প্রদায় ভুক্ত এবং তাঁহার কি নাম, এই দুইটা বিষয়  
অবগত হইবার জন্য অতঃপর তিনি মুকুন্দ দত্তকে প্রশ্ন  
করেন—

“প্রকৃতি বিনীত সন্ন্যাসী আকৃতে সুন্দর;  
আমার বহু প্রীতি হয় ইহঁার উপর।  
কোন সম্প্রদায় সন্ন্যাস করেছেন গ্রহণ?  
কিবা নাম ইঁহার? শুনিতে হয় মন।”

মধ্যলীলা, ২ষ্ঠ পরিচ্ছেদ। ৫৪ অঙ্ক।

\* শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র কুমার রায় কর্তৃক ঢাকা ফরিদাবাদ  
হইতে প্রকাশিত সংস্করণ। মধ্যলীলা, ২ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ৪০—  
৪৬ অঃ।



ভাব ১০২১

উপযুক্ত বর্ণনা হইতে দৃষ্ট হইবে যে, বাসুদেব সার্কভৌমের নিকট দণ্ডাগণ বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। তিনি বেদান্ত শাস্ত্রবিৎ “সন্ন্যাসী উপকণ্ঠা” বৈদান্তিক অধ্যাপকরূপে পুরীধামে দীর্ঘকাল যাবৎ সুপ্রতিষ্ঠিত এবং পুরীধামে :৫০২ খৃষ্টাব্দে চৈতন্য দেবের সহিত পরিচয় হইবার বহু পূর্বে হইতেই তাঁহার এই প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কিন্তু নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক বাসুদেব ১৫০৪ খৃষ্টাব্দের পরে ( অর্থাৎ প্রতাপরুদ্র রাজ্য লাভ করিবার এবং চৈতন্য দেবের ১২ বৎসর বয়ঃক্রম হইবার পরে ) উড়িষ্যার প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই ১৫০২ খৃষ্টাব্দের বহু পূর্বে হইতেই বাসুদেবের নৈয়ায়িক খ্যাতির পরিবর্তে দেশ-বিখ্যাত বৈদান্তিক খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সার্কভৌম, তবু চিন্তামণি গ্রন্থের টীকাকার। তাঁহার টীকার নাম সার্কভৌম নিকৃষ্টি। তথাপি কবিরাজ গোস্বামী আভাসেও তাঁহাকে নৈয়ায়িক-রূপে বর্ণনা করেন নাই। তিনি যে দীর্ঘকাল যাবৎ পুরীধামে বেদান্তের আলোচনার খ্যাতি লাভ করিয়া আসিতেছিলেন, গোস্বামী মহাশয়ের বর্ণনা হইতে এই ধারণা কি দৃঢ় হইতেছে না ?

ষষ্ঠীয়তঃ, গোস্বামী মহাশয় বলিতেছেন—“গোস্বামীর জানিতে চাহি কাঁহা পূর্বাশ্রম।” নবদ্বীপ পারিত্যাগ পূর্বক উড়িষ্যার দীর্ঘকাল যাবৎ প্রতিষ্ঠিত না হইলে অর্থাৎ চৈতন্য দেবের ১২ বৎসর বয়ঃক্রমের বহুপূর্বে হইতেই প্রতিষ্ঠিত না হইলে সার্কভৌমের পক্ষে চৈতন্য দেবের মত নবদ্বীপের একটি খ্যাতনামা ব্যক্তিকে চিনিতে না পারা অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হইবে। আর তর্কস্থলে যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, চৈতন্য দেব নবদ্বীপে বাসুদেব সার্কভৌমের চতুষ্পাণীতেই অধ্যয়ন করিতেন, তাহা হইলে বাসুদেবের পক্ষে বংশ পরিচয় লাভের পরেও পুনঃ, “কিবা নাম ইহার ? শুনিতে হয় মন” ইত্যাদি আলোচনা, আরও অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হইবে। কয়েক দিবসের নিমিত্তও চৈতন্য-

দেব বাসুদেবের নিকট অধ্যয়ন করিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই ভক্ত কবি এস্থলে এগন্ধকে উল্লেখ করিতে বিরত হইতেন না।

তৃতীয়তঃ, “রাষ্ট্রীয় কুলপঞ্জিকা” এবং জয়ানন্দ প্রণীত ‘চৈতন্য মঙ্গল’ এই দুইটি গ্রন্থ, দুইটি পৃথক সমাধের ব্যক্তিগণ কর্তৃক লিখিত। কিন্তু উভয় গ্রন্থেই চৈতন্যদেবের জন্মকালে নবদ্বীপে “যবন ভয়ে” অর্থাৎ মুসলমানগণের অত্যাচারে বাসুদেব সার্কভৌম ভীত হইয়া নবদ্বীপ পরিত্যাগ পূর্বক পুরীধামে উপনিবিষ্ট হইবার কথা বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্থতঃ, চৈতন্য দেবের জন্মকালে অত্যাচারী হাবসা ক্রৌতদাস রাজাদিগকে বঙ্গের সিংহাসন লাভ করিতে দেখা যায়। স্মরণ্য সমসাময়িক বঙ্গ ইতিহাস “যবন ভয়ে” কাহিনীর প্রতিকূল নহে।

পঞ্চমতঃ, মুরারীগুপ্ত, বৃন্দাবন দাস প্রভৃতির বর্ণনা অনুসারে চৈতন্যদেব গঙ্গাদাসের নিকট ব্যাকরণ পাঠ করেন। তাঁহারা বাসুদেব সার্কভৌমের নিকট চৈতন্যদেবের বিদ্যাভ্যাস করিবার কথা পরোক্ষ ভাবেও বর্ণনা করেন নাই। উপযুক্ত পঞ্চবিধ কারণে ১৪৮৫ খৃঃ অব্দে বাসুদেব সার্কভৌম নবদ্বীপ পরিত্যাগ পূর্বক উড়িষ্যা গমন করেন এইরূপ নির্দ্বাণই যুক্তি সঙ্গত বলিয়া গণ্য হইবে। পঞ্চমতঃ চৈতন্য দেবের ১২ বৎসর বয়ঃক্রমের পরে ( অর্থাৎ ১৫০৪ খৃষ্টাব্দের পরে ) প্রতাপরুদ্র কর্তৃক নবদ্বীপ হইতে বাসুদেব সার্কভৌমের পুরীধামে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জনশ্রুতি বঙ্গ সাহিত্যে সুপরিচিত হইলেও নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হইবে না। \*

“বাসুদেব সার্কভৌম, উড়িষ্যার অধিপতি প্রতাপ রুদ্র গঙ্গপতির বিশেষ অনুরোধে, নবদ্বীপ ছাড়িয়া, উড়িষ্যার রাজধানী “পুরী” নগরে চলিয়া গেলেন; এবং রাজার দ্বারপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়া সেখানে আবার বেদান্তের টোল বসাইলেন।”—৬/কালী প্রসন্ন ঘোষ প্রণীত, সুপ্রভাত ৩৭ পৃঃ।

## সময় নির্ধারণ

কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যদেবের সময় নির্ধারণ করিয়াছেন।

“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।

অষ্টচল্লিশ বৎসর একট বিহরি ॥

চৈতন্যদেব চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।

চৌদ্দশত পঞ্চাশে হৈলা অন্তর্ধান ॥

চল্লিশ বৎসর প্রভু কৈলা গৃহবাস।

নিরন্তর কৈল প্রেম ভক্তির প্রকাশ ॥

চল্লিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস।

চল্লিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস ॥

তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।

কভু দক্ষিণ কভু গৌর কভু বৃন্দাবন ॥

অষ্টদশ বৎসর রহিল নীলাচলে।

কৃষ্ণপ্রেমনামামুতে ভাসাইল সকলে ॥”

—কবিরাজ গোস্বামী রুত চৈতন্যচরিতামৃত আদি লীলা. ৭ হইতে ৯ অঃ—ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

রঘুনাথের পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য

নবদ্বীপের একজন স্নাত পণ্ডিত

রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য ছিলেন। পিতার নিকট অধ্যয়ন

নাহলে তিনি শ্রীনাথ আচার্য্য

চূড়ামণির চতুষ্পাঠিতে অধ্যয়ন করেন এইরূপ অবগত

হওয়া যায়। রঘুনাথের “জ্যোতিষ তত্ত্ব” নামক

গ্রন্থের রবি সংক্রান্তি গণনায়, উক্ত গ্রন্থ ১৪৮৯

শকাব্দে প্রণীত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়—

“নবাষ্ট শক্রহীনেন শকাব্দাঙ্কেন পূরিতঃ” অর্থাৎ

১৪৮৯ শকাব্দায় পূরণ করিবে। সুতরাং জ্যোতিষ তত্ত্বের

প্রণয়ন কাল ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দ এবং চৈতন্যদেবের জন্মের

৮২ বৎসর পরে। উক্ত গ্রন্থ রঘুনাথের ৫০। ৫৫ বৎসর

বয়স্ক কালে রচিত বলিয়া ধরা গেলেও দেখা যায় যে,

রঘুনাথ চৈতন্য দেবের অন্ততঃ ২৭ বৎসর বয়স্ক কালে

জন্ম গ্রহণ করেন। অপর. “হরিভক্তিবিলাস” নামক গ্রন্থ চৈতন্যদেবের তিরোভাবের বহু পরে রচিত হয়, এবং রঘুনাথ তাঁহার নিজ গ্রন্থে বহুবার উক্ত গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতেও প্রমাণীকৃত হয় যে, রঘুনাথ চৈতন্যদেবের বহু পরবর্তী পণ্ডিত ছিলেন।

ইতঃপূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, চৈতন্য দেবের

জন্মকালে বাসুদেব সার্কভৌম

রঘুনাথ শিরোমণি উড়িষ্যায় গমন করেন। সুতরাং

নবদ্বীপে বাসুদেব সার্কভৌমের

নিকট রঘুনাথের বিজ্ঞা-শিক্ষা থুব পরে হইলেও, সেই বৎসরই (১৪৮৫ খৃঃ) নবদ্বীপে বাসুদেবের চতুষ্পাঠিতে সমাপ্ত হয়। জনপ্রবাদ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ১৬ বৎসর বয়সে নবদ্বীপে বাসুদেবের চতুষ্পাঠি হইতে রঘুনাথ মথিলার পঞ্চধর মিশ্রের চতুষ্পাঠিতে প্রবেশ করেন। এই সূত্রে রঘুনাথ (১৪৮২-১৬) অর্থাৎ ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দের; কিন্তু কোন মতেই ইহার পরবর্তী হইবেন না; দুই চারি বৎসর পূর্ব-বর্তী হইতে পারেন এবং তাঁহার বয়স চৈতন্যদেবের অপেক্ষা অন্ততঃ ১৬ বৎসর অধিক বলিয়া বিবেচিত হইবে।

জগদীশ তর্কালঙ্কার চৈতন্যদেবের স্বস্তর সনাতন

মিশ্রের অধস্তন চতুর্থ পুরুষের

জগদীশ তর্কালঙ্কার ব্যক্তি; এবং পুরুষ গণনায় জগ-

দীশ হইতে বর্তমানে ১০।১১

পুরুষ চলিতেছে। \*

৩রায বাহাদুর মহাশয়ের প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে,

জগদীশ যখন তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ দীর্ঘজীবিতর টীকা প্রণয়ন করেন তখনও রঘুনাথ জীবিত ছিলেন। উপর্যুক্ত সময়ের আভাস হইতে দৃষ্ট হইবে যে, এই উক্তি নির্ভর-যোগ্য নহে।

\* তাঁহার কোনও ছাত্রের গ্রন্থ হইতে তিনি ১৬৫৭ খৃঃঅব্দে জীবিত ছিলেন এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই সম্পর্কে নবদ্বীপ মহিমা ত্রুটিব্য।

গদ্যধর জগদীশের সমসাময়িক। জগদীশের শেষ  
অবস্থায় গদ্যধরের অভ্যুদয় হয়।  
গদ্যধর পুরুষ গণনার এক্ষণে গদ্যধর  
হইতে ৭জন পাওয়া যায় \*  
গদ্যধর যে শিরোমণির ছাত্র নহেন এ কথা উপযুক্ত  
সময়ের অভ্যাস হইতেই প্রমাণিত হইবে। অথচ এইরূপ  
উক্তি বঙ্গ সাহিত্যে অপরিচিত নহে।

চৈতন্যদেবের আত্মলীলা সম্পর্কে তাঁহার বালা-  
সহচর মুরারি গুপ্তের রচিত  
চৈতন্যদেব ও “শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চরিতামৃত” ††  
রঘুনাথ প্রসঙ্গ। এবং বৃন্দাবনদাস রচিত  
চৈতন্যদেব কাহার “চৈতন্য ভাগবত” সর্লাপেক্ষা  
নিকট বিজ্ঞাত্যাস করেন? প্রমাণিক গ্রন্থ।

মুরারি গুপ্তের বর্ণিত ঘটনাবলী তাঁহার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট।  
চৈতন্যদেবের অধ্যয়নলীলা সম্বন্ধে মুরারি গুপ্ত  
বলিতেছেন—

“ততঃ পপাঠ স পুনঃ শ্রীমান্ শ্রীবিষ্ণুপণ্ডিতাৎ।  
সুদর্শনাৎ পণ্ডিতাচ্চ শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতাৎ ॥  
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ বিজ্ঞাৎ যে পণ্ডিত মহত্তমাঃ  
তেষাং মহোপকারায় তেভ্যো বিদ্যাং গৃহীতবান্ ॥  
নবম সর্গ ২৮ পৃষ্ঠা।

এক্ষণে বৃন্দাবন দাস কি বলেন দেখিতে হইবে।  
বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবের তিরোভাবের দুই বৎসর (৭)  
পরে † নিজ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এইরূপ প্রসিদ্ধি।  
এই গ্রন্থ হইতে নিম্নে যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল।

\* শ্রীকৃষ্ণ মৃণালকান্ত বোম প্রকাশিত। মুরারিগুপ্ত  
শাস্ত্রজ্ঞ ও চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন। বৃন্দাবন দাস,  
কবি কর্ণপুর, লোচন দাস এবং অপরাপর লীলা লেখক-  
গণ মুরারিগুপ্তের হস্তে অবলম্বন পূর্বক গৌর লীলার  
বহু ভঙ্গ অভিব্যক্ত করিয়াছেন।

† বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের শিষ্য ছিলেন। চৈতন্য  
দেব যখন গৃহী ছিলেন তখন বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের  
মাতার বয়স ৮ বৎসর ছিল এইরূপ অবগত হওয়া যায়।

†† বিখ্যাত ব্রহ্মবিদ।

গঙ্গাদাসের চতুষ্পাশ্চাতে  
চৈতন্যদেবের একমাত্র  
ব্যাকরণ অধ্যয়ন।

“যের সর্লশাস্ত্রের বুঝিয়া সমীহিত।  
গোষ্ঠীমাঝে প্রভু পঢ়িতে হৈল চিত ॥  
নবদ্বীপে আছে অধ্যাপক শিরোমণি।  
গঙ্গাদাসপণ্ডিত যেহেন সান্দীপনি ॥  
ব্যাকরণ শাস্ত্রের একান্ত তত্ত্ববিৎ।  
তাঁর ঠাঞি পঢ়িতে প্রভুর সমীহিত ॥  
বুঝিলেন পুত্রের ইঙ্গিত মিশ্রণর।  
পুত্র সঙ্গে গেলা গঙ্গাদাস বিপ্রশ্বর ॥  
মিশ্র বোলে “পুত্র আমি দিল তোমা স্থানে।  
পঢ়াইবা শুনাইবা সকল আপনে ॥”  
চৈতন্য ভাগবত—আদি খণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়।

\* \* \*

“যত পঢ়ে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের স্থানে।  
সভারেই ঠাকুর চালেন অমুক্ষেপে ॥  
শ্রীমুরারিগুপ্ত, শ্রীকমলাকান্ত নাম।  
কৃষ্ণানন্দ আদি যত গোষ্ঠীব প্রধান ॥  
প্রতিঘাটে পঢ়ুয়ার অন্ত নাহি পাই।  
ঠাকুর কলহ করে প্রতি ঠাঞি ঠাঞি ॥”

\* \* \*

চৈতন্য ভাগবত। ঐ।

চৈতন্যদেব অধ্যাপক  
হইয়াছেন।

“নবদ্বীপে হেন নাহি পণ্ডিতের নাম।  
যে আসিয়া যুঝিবেক প্রভুর ব্যাধান ॥  
সবে এক গঙ্গাদাস মহাভাগ্যবান।  
যার ঠাঞি করে প্রভু বিজ্ঞার আদান ॥”

—ঐ, ৭ম অধ্যায়

“সরস শিশু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের স্থানে ।  
কহিলেন সবষত ঠাকুর বাথানে ॥  
এবে যত বাথানেন নিমাক্ষি পণ্ডিত ।  
শব্দ সনে বাথানেন কৃষ্ণসমীহিত ॥  
গয়া হৈতে যাবত আসিয়াছেন ঘরে ।  
তদবধি কৃষ্ণ বই ব্যাখ্যা নাহি ফুরে ॥  
এবে ভাল বুঝিবারে না পারি চরিত ।  
কি করিব আমি সব বোলহ পণ্ডিত ॥”

গঙ্গাদাসের চতুর্পাঠিতে

একমাত্র ব্যাকরণ

অধ্যয়ন ।

“মনে ভাবে মুকুন্দ আজ জিনিব কেমনে ।  
ইহান অভ্যাস সবে মাত্র ব্যাকরণে ॥”

\* \* \*

“প্রভু কহে ‘সন্ধিকার্য’ জ্ঞান নাহি যার ।  
কলি যুগে ভট্টাচার্য্য পদবী তাহার ॥”

গঙ্গাদাসের চতুর্পাঠিতে অধ্যয়নকালে মুরারি গুপ্তকে  
উপলক্ষ করিয়া চৈতন্যদেব বলেন—

“প্রভু বোলে বৈষ্ণব তুমি ইহা কেনে পড় ।  
লতা পাতা নিঞা গিয়া রোগী কর দঢ় ॥  
ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষয়ের অবধি ।  
কফপিত্ত-অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইধি ॥”

—আদিখণ্ড, ৭ম অধ্যায়, চৈতন্য ভাগবত ।

দ্বিখণ্ডীয়

আক্ষেপ ।

“শিশু শাস্ত্র ব্যাকরণ পঢ়ায়ে ব্রাহ্মণ ।  
সে মোরে জিনিল হেন বিধির ঘটন ॥”

—আদিখণ্ড, ৯ম অধ্যায় ।

পরিশেষে গোড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের অন্ততম প্রামা-  
নিক গ্রন্থ ৬কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত “শ্রীশ্রীকৃষ্ণ  
চৈতন্যচরিতামৃত” হইতে চৈতন্যদেবের বিদ্যালক্ষ্য  
সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা হইল—

“গঙ্গাদাস পণ্ডিত স্থানে পাড়ে ব্যাকরণ ।

শ্রবণ মাতে কর্তে কৈল স্তত্রবৃত্তিগণ ॥

অল্পকালে হৈল পঞ্জীটীকাতে প্রবীণ ।

চিরকালের পঢ়ুয়া জিনে হৈয়া নগীন ॥

অধ্যয়ন লীলার প্রভু দাস বৃন্দাবন ।

চৈতন্য মঙ্গলে কৈল বিস্তারি বর্ণন ॥”

আদিশীলা—পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ৫ হইতে ৭ ;

বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা ইতঃপূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে ।

চৈতন্যদেবের ব্যাকরণ অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও

অধিকার সম্বন্ধে আর অধিক উদ্ধৃত করা নিম্নয়োজন ।

তিনি ব্যাকরণ ব্যতীত অপর কোনও শাস্ত্র গঙ্গাদাসের

নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, অথবা গঙ্গাদাস ভিন্ন

অপর কোনও অধ্যাপকের নিকট ব্যাকরণ ব্যতীত অপর

কোনও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এ সকল কথা

মুরারিগুপ্ত জ্ঞানেন না, বৃন্দাবন জ্ঞানেন না, এবং

কবিরাজ গোস্বামীও অবগত হন নাই । ইহারা সকলেই

বাসুদেব সার্কভৌমকে জানিতেন কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের

বিষয় যে ইহারা কেহই বাসুদেবকে অল্প সময়ের জন্যও

চৈতন্যের অধ্যাপকরূপে উল্লেখ করেন নাই । ইহাতেও

চৈতন্যদেবের পক্ষে বাসুদেবের দ্বাত্র হুওয়ার প্রতিকূল

প্রমাণ পাওয়া যায় ।

ইতঃপূর্বে আমরা দেখাইয়াছি যে, চৈতন্যদেব অধ্যা-

পক হইবার অব্যবহিত

চৈতন্যদেব আদৌ ত্রায়

শাস্ত্র অধ্যয়ন

করিয়াছিলেন কি ?

পূর্বেও গঙ্গাদাস পণ্ডিতের

নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়ন

করিতেন এবং ব্যাকরণের

চতুর্পাঠী স্থাপন পূর্বক

যখন তিনি অধ্যাপনা আরম্ভ করেন তখনও

তিনি একমাত্র গঙ্গাদাসকে বিশেষ ভক্তি প্রদ্বা

করিতেন । আর গয়াধাম হইতে প্রত্যাবর্তন

পূর্বক যখন তিনি ছাত্রদিগকে কৃষ্ণ কথা শিক্ষা দিতে

প্রবৃত্ত হন তখনও চৈতন্যদেবের ছাত্রবৃন্দ তাঁহার গুরু

গঙ্গাদাসের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। উপযুক্ত বর্ণনা হইতে, চৈতন্যদেবের আয়-শিক্ষার জ্ঞান বাসুদেবের কথা দূরে থাকুক অপর কাহারও চতুষ্পাশীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, এই বিবরণ বহু অন্বেষণ করিয়াও পাওয়া বাইতেছে না। পক্ষান্তরে তিনি যে আয়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই এ কথাই বৃন্দাবনদাস দৃঢ় ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। অমাত্মিক প্রতিভা বলে দিগ্বিজয়ীকে পরাভব করিবার পরে নদীয়াবাসীর মনে যে ভাবের উদয় হয় তাহার বর্ণনা কালে বৃন্দাবনদাস স্পষ্টভাবে বলিতেছেন—

“দিগ্বিজয়ী জিনিলেন শ্রীগৌর সুন্দরে।  
শুনিলেন ইহা সব নদীয়া নগরে॥  
কেহো বোলে ‘এ ব্রাহ্মণ যদি আয় পঢ়ে  
ভট্টাচার্য্য হয়ে তবে কখন না নড়ে।’

—আদিখণ্ড, নবম অধ্যায়।

চৈতন্যদেব আয়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই, আয়-শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্বক কত ব্যক্তি “ভট্টাচার্য্য” উপাধি লাভ করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে, সম্ভবতঃ ভক্ত বৃন্দাবনের হৃদয়ে ইহাতে একটু সাময়িক আক্ষেপের জাব উদ্ভিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু এই ভক্ত লেখক অবগত ছিলেন যে, ভক্তিবর্ধনপ্রবর্তকের মাহাত্ম্য, সাধারণ লোকের মত আয়, জ্যোতিষ, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র-পারদর্শিতার উপর নির্ভর করে না। শ্রীহট্ট-রঘুনাথ আবিষ্কারক শ্রীমুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি সম্পাদিত “অষ্টমত প্রকাশ” নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, চৈতন্যদেব দুই বৎসর, দুই বৎসর করিয়া সমগ্র স্মৃতি, জ্যোতিষ, বড়দর্শন, তর্কশাস্ত্র ও বেদ অধ্যয়ন করেন; এমন কি তিনি “বিজ্ঞানাগর” উপাধি পর্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন। কবি চৈতন্য দেবকে “বিজ্ঞানাগর” রূপে বর্ণনা করিয়াও নিরন্তর হন নাই। চৈতন্যদেব, বাসুদেব সার্বভৌমের নিকট আয়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, আয়ের এক অপূর্ব চীকা গ্রহণন করেন

এবং জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণের অশ্রুবিসর্জনে মর্ম্মবেদনায় পরিতপ্ত হইয়া তিনি স্বকৃত আয়ের চীকা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করেন, এই সকল অপূর্ব-কাহিনীও অষ্টমত প্রকাশে বর্ণিত হইয়াছে। স্বল্প কলেজের আয় দুই দুই বৎসরেই চৈতন্যদেব এক এক শাস্ত্র সম্যক আয়ত্ত করিয়াছিলেন, ইহা দেখাইয়া কবি তাঁহার অমাত্মিক প্রতিভা প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু এই সব অপূর্ব ঘটনাবলীর সমাবেশ দেখিয়াও গ্রন্থপ্রকাশক তত্ত্বনিধি মহাশয় নিবৃত্ত হন নাই। বলরামের আয় অসীম সাহসে তিনি এই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে নবদ্বীপের তार्কিক শিরো-মণি কুশাগ্রবুদ্ধি রঘুনাথ বলিয়া ঘোষণা করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু মুরারীচরণ, বৃন্দাবন দাস এবং কবিরাজ গোস্বামী আভাসেও চৈতন্যদেবকে নৈয়ায়িক রূপে বর্ণনা করেন নাই; পরোক্ষভাবেও চৈতন্যদেবের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিবার মানসে রঘুনাথকে জগতের চক্ষে গীন করিবার চেষ্টা করেন নাই। পরবর্তী লেখকগণের মধ্যে বাঁহারা রঘুনাথের চরিত্র ধর্ম্ম করিয়াছেন, তাঁহারা যদি জানিতেন যে চৈতন্যদেব কখনও আয়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই ও রঘুনাথের তিনি সহ-ধ্যায়ীও ছিলেন না, তাহা হইলে তাঁহারা আরও উদারতার পরিচয় দিতেন, ইহাই আমার বিশ্বাস। আর যদি ইহাই সত্য ঘটনা হইয়া থাকে যে, রঘুনাথ চৈতন্য দেবের আয়ের চীকা দেখিয়া অশ্রুবিসর্জন করিয়াছিলেন, ও বন্ধুর মর্ম্মবেদনায় পরিতপ্ত হইয়া চৈতন্যদেব স্বকৃত আয়ের অমূল্য গ্রন্থ গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন করেন, তবে রঘুনাথ যদি দীর্ঘাতি সহ ভাগীরথীর অভল জলে ডুবিয়া মরিতেন তাহা হইলেই ভাল হইত—চৈতন্যদেবের আয় অলৌকিক প্রতিভাশালী ব্যক্তির আয়ের গ্রন্থ আজ বঙ্গদেশে ভূগু হইত না! কে বলিতে পারে ইহাতে কি জ্ঞান-ভাণ্ডার নষ্ট হইয়া গিয়াছে?

বাসুদেব সার্সভোমের চতুর্পাঙ্গিতে রঘুনাথ, চৈতন্য-  
দেব এবং রঘুনন্দন সহ-  
বাসুদেব সার্সভোমের পাঠী ছিলেন, এই বহু  
চতুর্পাঙ্গিতে চৈতন্যদেব বিস্তৃত জনপ্রতি যে কতদূর  
রঘুনাথ ও রঘুনন্দন অপ্রকৃত তাঁহাদের সময়  
সহপাঠী কি না! নির্ধারণ হইতেই স্পষ্টরূপে  
প্রতীয়মান হইবে।

চৈতন্যদেবের জন্ম বৎসরেই বাসুদেব সার্সভোম  
উড়িষ্যা গমন করেন। চৈতন্যদেব একমাত্র গঙ্গাদাস  
পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। তিনি কখন  
শ্রায়শাস্ত্র পড়িলেন? বাসুদেবের নিকট তিনি শ্রায়  
পাঠ করেন কিরূপে? তাঁহার জন্ম বৎসরেই বাসুদেব  
নবদ্বীপ পরিত্যাগ করেন। বাসুদেব সার্সভোমের  
নিকট শ্রায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে কি সমসাময়িক মুরারি  
গুপ্ত এবং বৃন্দাবন দাস একথা জানিতেন না? কবিরাজ  
গোস্বামী কি এ কথা অবগত হইতেন না? তাঁহারা চৈতন্য-  
দেবের পাঠাবস্থার যে চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে  
স্মার্ত রঘুনন্দন অথবা বিখ্যাত নৈয়ায়িক রঘুনাথের নামো-  
ল্লেখ নাই। যদি চৈতন্যদেব ও রঘুনাথ সহপাঠী হইতেন  
তাহা হইলে নিশ্চয়ই মুরারিগুপ্ত, কৃষ্ণানন্দ, কমলাকান্ত  
প্রভৃতি চৈতন্যদেবের সহপাঠীগণের নামের সহিত  
রঘুনাথ ও রঘুনন্দনের নামোল্লেখ থাকিত কিন্তু রঘুনাথের  
এইরূপ উল্লেখ না থাকিতে তাঁহাকে রঘুনাথ এবং রঘু-  
নন্দনের সহপাঠীরূপে নির্দেশ করা যায় না।

কবিরাজ গোস্বামী সঙ্কীর্ণভাবে মইয়া লিখিতে বসিলে  
বাসুদেবকে চৈতন্যদেবের গুরু বলিয়াই বর্ণনা করিতেন  
এবং বাসুদেবকে ‘সন্ন্যাসী উপকর্ত্তা’ বৈদাস্তিক না বলিয়া  
চৈতন্যদেবের গুরু বলিয়াই বর্ণনা করিতেন। কিন্তু  
আশ্চর্যের বিষয় এই যে খ্যাতনামা পণ্ডিতপ্রবর  
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় কলিকাতা  
সাহিত্যসভার মুখপত্র “সাহিত্য সংহিতা” নামক  
মাসিক পত্রিকায় চৈতন্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও  
রঘুনন্দনকে বাসুদেবের শিষ্যরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।  
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ‘বঙ্গভাষা  
ও সাহিত্যের ইতিহাস’ গ্রন্থেও শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন  
কর্তৃক এবং বিধি উক্তি স্থান পাইয়াছে। অধিকন্তু দীনেশ  
বাবু ১৯০৫ খৃঃ অব্দেও যে বাসুদেব সার্সভোম নবদ্বীপে  
ছিলেন এইরূপ উক্তি করা অযৌক্তিক মনে করেন নাই।

১। রঘুনাথ কর্তৃক চিন্তামণি দীর্ঘাতি প্রণয়নের পূর্বে  
বঙ্গে শ্রায়শাস্ত্রের আলো-  
বঙ্গে শ্রায়শাস্ত্র চর্চা চলা বলিতে বিশেষ কিছুই  
প্রচলিত স্থাপনে পূর্ব ছিল না এইরূপ উক্তি বঙ্গ  
ও পরবর্তী নৈয়ায়িক মধ্যে সাহিত্যে সুপরিচিত। কিন্তু  
রঘুনাথের স্থান। তৎপূর্বেও কয়েকটি ক্ষণ-  
জন্ম নৈয়ায়িক বঙ্গদেশে  
প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ১২১ খৃঃ অব্দে হাবড়া জিলার  
অন্তর্গত ভুরমুট গ্রামে শ্রীধরাচার্য্য নামে একজন খ্যাত-  
নামা নৈয়ায়িক “শ্রায় কলঙ্গী” নামক শ্রায় শাস্ত্রের  
একটা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অতঃপর উদয়নাচার্য্য \*

†—সাহিত্য-সংহিতা বৈশাখ ১৩০২ “শ্রায়-  
দর্শনের ইতিহাস” নামক প্রবন্ধ—“বাসুদেবের  
চারিজন প্রধান শিষ্য ছিলেন। প্রথম চৈতন্যদেব।  
ইনি ১৪৮৫ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব ধর্মের  
প্রতিষ্ঠা ও প্রচার সাধন করেন। দ্বিতীয়, দায়ভাগের  
টীকাকার সুপ্রসিদ্ধ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তৃতীয়, সুপ্রসিদ্ধ  
তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। চতুর্থ শিষ্য সুবিখ্যাত  
রঘুনাথ শিরোমণি।”

\* ভট্টোলোক্য নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় নব্যভারত পত্রে  
প্রকাশ করেন যে উদয়ন মৈথিল নৈয়ায়িক। তিনি  
বারেন্দ্র শ্রেণীর ক্রতু ভাট্টার অংশে বর্ষ পুরুষের ব্যক্তি  
ছিলেন এইরূপ উক্তি সম্ভবপর নহে। এ সম্বন্ধে আরও  
আলোচনা আবশ্যক।

ভান ১০২১

“তায় বার্তিক পরিচিতি” ও “তায় কুমুদাঙ্গলী” গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি নিজ গ্রন্থে “গৌড় মীমাংসক” নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। গৌড়দেশে তৎপূর্বেও তায়-শাস্ত্রের আলোচনা হইত ইহাতে স্পষ্টই অনুমান হইতেছে। উদয়নের পরে মম্বুর টীকাকার কল্লুকভট্ট ও “ভাষাপরিচ্ছেদ” প্রণেতা বিশ্বনাথ তায়পঞ্চাননের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন মতবাদ অনুসারে বিশ্বনাথ রঘুনাথের বহু পরবর্তী। যাহা হউক সম্প্রতি “ভাষা পরিচ্ছেদ” প্রকাশক শ্রীযুক্ত রাধেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বিভিন্ন যুক্তি তর্কের অবতারণা পূর্বক প্রদর্শন করিয়াছেন যে বিশ্বনাথের পক্ষে শিরোমণির পরবর্তী হওয়া সম্ভবপর নহে।

উপর্যুক্ত নৈয়ায়িকগণের বিবরণ হইতে দৃষ্ট হয় যে রঘুনাথের পূর্বেও বাঙ্গালায় তায়শাস্ত্রের আলোচনা ছিল এবং বহু নৈয়ায়িক বঙ্গদেশে প্রাহুত হইয়াছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে গঙ্গেশ উপাধ্যায় “তত্ত্বচিন্তামণি” গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া “নব্যতায়ের” প্রতিষ্ঠা করেন। এই গ্রন্থের ফলে তায়শাস্ত্র আলোচনা নূতন আকার ধারণ করে। এই গ্রন্থই ভারতীয় নৈয়ায়িকগণের প্রধান আলোচ্য বিষয়। বহু নৈয়ায়িক এই গ্রন্থের টীকা লিখিয়াছেন। রঘুনাথ শিরোমণির সুপ্রসিদ্ধ চিন্তামণি দীধীতিও এই গ্রন্থেরই টীকা বিশেষ। যাহা হউক রঘুনাথের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে তিনি অসামান্য প্রতিভা বলে “চিন্তামণি” ও মণিলায় প্রচলিত টীকা টিপ্পনী ও তায়শাস্ত্রের গ্রন্থঞ্জির মর্ম সাধারণ শিক্ষার্থী বোধগম্য করিয়াছেন এবং তাহার প্রযত্নেই নবদ্বীপ তায়শাস্ত্র চর্চার কেন্দ্ররূপে

ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং চারিদিকে তায়চর্চার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

ব্যুৎপত্তিবাদ, তত্ত্বচিন্তামণি দীধীতি, পদার্থ খণ্ডন, লীলাবতী টীকা, তায় কুমুদাঙ্গলীর টীকা প্রভৃতি ৩৮ খানা গ্রন্থ রঘুনাথের কার্তিকি ঘোষণা করিতেছে। এবং পরবর্তীকালে বহু নৈয়ায়িক রঘুনাথ কৃত বহুগ্রন্থের টীকা প্রণয়ন পূর্বক অতুল যশ লাভ করিয়া গিয়াছেন। বর্তমানেও দীধীতি অথবা দীধীতির টীকা পাঠ না করিয়া কেহই নৈয়ায়িক রূপে বশস্বী হইতে সমর্থ হন না। ইহা সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। বঙ্গীয় দার্শনিকগণ সূক্ষ্ম চিন্তার খনিরূপ। রঘুনাথ হইয়াগেরই শিরোমণি।

রঘুনাথের স্বরচিত কয়েকটি শ্লোক, লোকপরম্পরায় অজ্ঞাপি দেশময় প্রচলিত। নিম্নে তন্মধ্যে কয়েকটি উদ্ধৃত হইল—

১। যোহঙ্কং করোত্যক্ষিমন্তং যশ্চ বালং প্রবোধয়েৎ।

তমেবাধ্যাপকং মন্যে তদন্তো নামধারিণঃ ॥

২। পঠান্তি কতিচিচ্ছাৎ খ ফ ছঠেতি বাচং শঠাঃ

খটঃ পট ইত্যতরে পটু রটন্তি নৈয়ায়িকাঃ।

বয়ং বকুল মঞ্জরা গলদপারমাধ্বীক—

ধ্রুণী পদরীতিহতি যুঁবতিভবিনোদামহে ॥

৩। তাহার বার্কক্য ও দারজ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া

জনৈক নীচাশয় ব্যক্তি নিম্নোক্ত শ্লোক রচনা করেন—

যশ সাংসারিকী চিন্তা, চিন্তা চিন্তামণেঃ কুতঃ।

তয়েব হি শিরঃ কম্পঃ ক শিরোমণি-ধারণম্ ॥

উত্তরে রঘুনাথ বলিয়াছিলেন—

কবিত্বং কিয়দৌলভ্যং চিন্তামণি মনোবিণঃ

নিপীত কালকুটস্থ হরশ্বেবাহি খেলনম্ ॥

রঘুনাথ আদর্শছাত্র, আদর্শ শিক্ষক। অধ্যাপনাই

তাঁহার জীবনের ব্রত—ব্যবসা নহে।

\* কল্লুকভট্ট এয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাহুত হন এইরূপ অবগত হওয়া যায়। তিনি মম্বুর টীকায় আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন—

“গৌড়ে নন্দনবাসি নাস্তি স্মকনৈ বন্দ্যাবরেজাং কুলে।

শ্রীমদ্বট্ট দিবাকরস্ত তনয়ঃ কল্লুক ভট্টোহভবৎ ॥

জনশ্রুতি “ব্যুৎপত্তিবাদ” ও লীলাবতী এই দুই গ্রন্থকে রঘুনাথের নিজপুত্র ও কঙ্কারূপে নির্দেশ করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ নৈয়ায়িক সমাজে “শিরোমণি” শব্দ যোগরূঢ় রূপে ব্যবহৃত। ইহা সত্ত্বেও কেহ কেহ রঘুনাথের ছাত্র এবং পদার্থ খণ্ডনের ঢীকাকার রামভদ্রকে রঘুনাথের পুত্ররূপে নির্দেশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে রামভদ্রের ঢীকা হইতে নিম্নোক্ত দুইটা শ্লোক উল্লেখযোগ্য।

১। ভাতস্ত তর্কসরসাক্ষকানেন্যু চূড়ামণেদিনমণে শচরণে  
প্রণম্য।

শ্রীরামভদ্রকৃতীকৃতিনাং হিতায় লীলাবশাৎ কিমপি  
কৌতুকমাতনোতি ॥”

২। “ভবানীভবনাশাভ্যাং পিতৃভ্যাং প্রণমাম্যহং।

যৎপ্রসাদাদিদং শাস্ত্রং করক্ষীরোপমী কৃতং ॥

মকরন্দে প্রকাশে বা ব্যাখ্যা পরিমলে হথবা

ততোধিকং পিতৃব্যাখ্যা মাধ্যাত্ম ময়মুত্তমং ॥”

বহুবিভূত কৌমার্যের জনশ্রুতি এবং যোগরূঢ় রূপে শিরোমণ শব্দের ব্যবহার সত্ত্বেও শিরোমণি বুঝাইতে চূড়ামণি শব্দের প্রয়োগ যুক্তিস্কৃত নহে।

ঐতিহাসিকের পক্ষে ইতিহাসের সত্য নির্ধারণের জন্য সঙ্গীর্ণতা পরিচয় করা কঠিন। সঙ্গীর্ণ ভাব এবং বাক্য বিতণ্ডা উভয়ই প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয়ের প্রতিফল। সঙ্গীর্ণ দেশ-প্রীতি-বশে ১০।১২ বৎসর হইল শ্রীহট্টে রঘুনাথ আবিষ্কৃত হন। প্রতিভার বিগত ফাল্গুন সংখ্যায় রঘুনাথকে লইয়া শ্রীহট্টের দাবী আলোচনায় আমরা প্রদর্শন করিয়াছিলাম যে, রাজা সুবিদনারায়ণের জামাতার ভ্রাতারূপে এক কলিত রঘুনাথের অবতারণা করাতে এবং বঙ্গীয় রঘুনাথের সহিত তাঁহার সময়ের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টায়, শ্রীহট্টে ইতিহাসের বহু তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ফলে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্তমান প্রবন্ধলেখকের প্রতি তীব্র ভাষা প্রয়োগ

করিয়াছেন। তত্ত্বনির্ণয়ার্থ বাদবিচারে কোনও আপত্তির কারণ হইতে পারে না। আশা করি এখনও তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কিছু বলিবার থাকিলে বিতণ্ডা পরিহার পূর্বক ধীরভাবে তত্ত্বনির্ণয়ার্থ অগ্রসর হইবেন।

এই গেল শ্রীহট্ট রঘুনাথের কথা! বঙ্গীয় রঘুনাথ সম্বন্ধে এস্থলে যৎসামান্য মাত্র আলোচিত হইয়াছে কিন্তু ইহাতেই প্রতীয়মান হইবে যে, রঘুনাথ সম্বন্ধে আলোচনার আরও অবসর রহিয়াছে।

বৈষ্ণব সাহিত্যে বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস প্রণয়ন করিবার অমূল্য উপাদান সঞ্চিত রহিয়াছে, কিন্তু পরবর্তী বহু অপ্রামাণিক কবির ও লেখকের ষড়্ভাষ এই অমূল্য সাহিত্যে বহু আবর্জনা প্রবেশ করিতেছে। এ সম্বন্ধে গোড়ার বৈষ্ণব সমাজের নেতৃবৃন্দ যথাবিহিত ব্যবস্থা করিলে সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাতেই কৃতজ্ঞ হইবেন সন্দেহ নাই।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এই প্রবন্ধ প্রণয়ন কালে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন, নবদ্বীপের স্বনামধ্যাত পণ্ডিতপ্রবর অজিত নাথ ঞ্জারত্ন প্রভৃতি দেশপ্রসিদ্ধ কতিপয় মহাত্মা অনেক বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নিরাকরণ করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন।

রঘুনাথ আলোচনার, রঘুনাথের ভাষাতেই প্রবন্ধ শেষে নিবেদন করিতেছি—

“মাত্তান্ প্রণম্য বিহিতাজ্জলি রেবভূয়ো ভূয়ো বিধায়  
বিনয়ঃ বিনিবেদয়ামি।

দ্ব্যং বচো মম পরং নিপুণং বিভাব্য ভাবাববোধ-

বিহিতো ন দুনাতি দোষঃ ॥ \*

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র গুহ।



## পরিশিষ্ট ।

ত্রি

১০২০, ১৫ই চৈত্র.....৪১১, বর্ণেল গজ

এলাহাবাদ ।

প্রবন্ধ লেখকের কতিপয় প্রশ্নের উত্তরে, মহামহো-  
পাধ্যায় পণ্ডিতরাজ্য বাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের মন্তব্য  
লিপি—

পরমক্ষেমাম্পদেবু !

আপনার প্রেরিত “বঙ্গের রঘুনাথ শিরোমণি ও  
শ্রীহট্টের রঘুনাথ শিরোমণি” শীর্ষক প্রবন্ধ আমি  
বঙ্গের রঘুনাথ” প্রবন্ধের প্রতিবাদে মুখবন্ধে সম্পাদকীয়  
মন্তব্য দ্রষ্টব্য । সংস্কৃত শ্লোক বিষয়ক আপত্তি সম্বন্ধে  
এই বক্তব্য যে, এই গুলি দক্ষিণ শ্রীহট্টস্থ বিভিন্ন হস্ত-  
লিখিত প্রাচীন পুঁথি হইতে সংগৃহীত । কাছাড়ের  
ইতিহাসের পরিশিষ্ট ভাগের ২৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।  
এ সম্বন্ধে বিতণ্ডা নিম্নয়োজন ।

প্রতিবাদকারক বলিয়াছেন যে, ১৩১২ বঙ্গাব্দে ( ? )  
[ বোধ হয় ১০১২ বঙ্গাব্দে হইবে, মুদ্রাকর প্রমাদ ]  
অর্থাৎ ৪১২ গৌরবঙ্গের পূর্বে ঢাকার বান্ধব পত্রিকায়ই  
শ্রীহট্ট রঘুনাথের আলোচনা হইয়াছিল । ১৩১৩ বঙ্গাব্দের  
ভাদ্র মাসে বান্ধবের শেষ সংখ্যা মুদ্রিত হয়, ১৩১৭  
বঙ্গাব্দের ১৩ই শ্রাবণ বান্ধব সম্পাদক পরলোক গমন  
করেন । আমরা ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত  
বান্ধবের প্রথম খণ্ড হইতে ১৩১৩ বঙ্গাব্দের বান্ধবের শেষ  
সংখ্যা পর্যন্ত সমস্ত পত্র অক্ষুণ্ণ করিয়াও রঘুনাথের  
কোনও আলোচনা পাইলাম না । বান্ধব সম্পাদক কৃত  
সুপ্রভাত নামক পুস্তকের রঘুনাথ শিরোমণি শীর্ষক  
প্রবন্ধের বিরুদ্ধে আবার কোনই আলোচনা বান্ধবে  
প্রকাশিত হয় নাই ।

—লেখক ।

পড়িয়াছি । আপনার যুক্তি তর্ক অতি সুন্দর হইয়াছে ।  
ছূর্তাগা বশতঃ আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে  
পারিতেছি না ; আমার কিছুই জানা নাই । ব্যাভিনায়া  
ব্যক্তির উপরে অনেক কল্পিত গল্প প্রচলিত থাকে ; সে  
গুলির উপর আস্থা স্থাপন করা কর্তব্য নয় । কালিদাস  
ও ভবভূতি এক সঙ্গে কবিতা প্রস্তুত করিয়াছেন, সে  
কবিতাও ত পণ্ডিতদিগের মুখে মুখে আছে । কালিদাস  
কবেকার ? ভবভূতি বা কবেকার ?

চৈতন্যদেব, রঘুনাথ ও রঘুনন্দন এক সময়ের লোক,  
এমন কি তিন জনেই এক বাসুদেব সার্কভোমের ছাত্র  
বলিয়া প্রসিদ্ধি, কিন্তু ইহার মূলে কি কিছু আছে ?  
জ্যোতিষ ভদ্র দৃষ্টে জানা যায়—চৈতন্য হইতে রঘুনন্দন  
প্রায় ৮০২০ বৎসর পরে প্রোদ্বৃত্ত । বৈষ্ণব গ্রন্থের কোন  
স্থানে পাই নাই চৈতন্যদেব আয়শাজ্ঞ পড়িয়াছেন ।  
পুরীতে বাসুদেব সার্কভোম, চৈতন্যদেবকে দেখিয়-  
ছিলেন ; কৈ কোন স্থানেই নাই, তিনি তাঁহার ছাত্র  
ছিলেন । রঘুনাথ সার্কভোমের নিকট পাঠ শেষ করিয়া  
মিথিলায় পক্ষবরের নিকটে জায় পড়েন ও মিথিলার  
আয়শাজ্ঞ বাঙ্গালায় আনেন ; এ প্রবাদের মূলে কি  
বুঝি না ।

বহু পূর্বে ভূরমুট বাঙ্গালী শ্রীধরাচার্য্য জায়  
কন্দলী লিখেন । উদয়নাচার্য্যকেও আমরা বাঙ্গালীই  
বলি । বাঙ্গালী কুলুকভট্টও নৈয়ায়িক ছিলেন, মহুর  
টাকায় আশ্রয় পরিচয় দিয়াছেন । নবদ্বীপের শ্রীযুক্ত অজিত  
নাথ জায়রত্ন মহাশয়কে পত্র লিখুন ; তিনি যদি কিছু  
জানেন ।

আশীর্বাদক  
(বান্ধব) শ্রীযাদবেশ্বর শর্ম্মণঃ

শ্রীশ্রীহারিঃ

২৮ চৈত্র, নবদ্বীপ

পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত অজিত নাথ জায়রত্ন মহাশয়ের

মন্তব্য লিপি—

ভাষ্যধারি ত্রিঅজিত নাথ শৰ্ণগো বিজ্ঞপনমতঃ.

আপনার দুইখানা পত্রই পাইয়াছি কিন্তু নানা কার্গো ব্যস্ততা বশতঃ প্রত্যুত্তর দিতে বিলম্ব হইল ক্রটি হইবেন না।

রঘুনাথ শিরোমণি চতুর্দশ শত শকাব্দের শেষ ভাগে জন্ম হয় বলিয়া বো হয় ত্রিচৈতন্তের বয়ঃকোষ্ঠ ছিলেন। ইনি বাসুদেবের ছাত্র এ সম্বন্ধে নানা প্রমাণ ও কিং-বদন্তী ও যুক্তি আছে সামান্য পত্রে তাহা প্রকাশ করিলাম না। আপনার লিখিত প্রবন্ধ প্রতিভা পত্রিকায় আন্তোপাস্ত পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম।

জ্যোতি ব্রাতা অকুলীনে বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া একাদশশতাব্দীর রঘুনাথ বিবেকী হইয়া নবদ্বীপ আসিয়াছিলেন ও তিনি পঞ্চদশ গ্রামে প্রথম অধ্যয়ন করেন ইহা নূতন শুনিলাম ; বস্তুতঃ রঘুনাথের পঞ্চম বর্ষ বয়সে বিজ্ঞান পৰ্য্যন্ত বাসুদেবের নিকট হইয়াছিল। এ বিষয়ে নানা প্রমাণ আছে। আপনি সময়ের অসামঞ্জস্য দেখাইয়াছেন উহা বড়ই সমীচীন বলিয়া বোধ করিলাম। আমার একটা বন্ধু কান্তি চন্দ্র রায় নবদ্বীপ মহিষা নামক এক খণ্ড পুস্তক লিখিয়াছেন। দেখিয়াছেন কি না জানি না ঐ পুস্তকে ইহার বিশেষ প্রমাণ ও যুক্তি দেওয়া হইয়াছে। ঐ পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ হইতেছে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে আপনার নিকট একখণ্ড পাঠাইব দেখিবেন।

পদার্থ ধ্বন প্রণেতা রামভট্ট শিরোমণির পুত্র নহেন জানকী নাথ চূড়ামণির পুত্র “ভাতান্ততর্কসরসীকৃৎ কাননেয়ু” ইত্যাদি। রঘুনন্দন পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক হইলেও শিরোমণি চৈতন্তের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। রঘুনন্দনের জ্যোতিষ তত্ত্ব লিখিত আছে “নবাষ্ট শত্ৰু বীনের প্রকাশকেন বোজয়েৎ” ইহা দ্বারা তিনি শকাব্দ ১৪৫২ শকে ঐ গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। জ্যোতিষ তত্ত্ব তাঁহার শেষ বয়সের গ্রন্থ। ১৪৫৫ শকে চৈতন্তের লোকান্তর হয়, তখন রঘুনন্দন জীবিত। তাঁহার একাদশীতম হরিভক্তি

গ্রন্থের যে প্রমাণ দিয়াছেন ঐ গ্রন্থ চৈতন্তের সময় প্রস্তুত ইহাতেও জানা যায় যে, চৈতন্তের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন।

রঘুনাথ, রঘুনন্দন, চৈতন্ত এবং কৃষ্ণানন্দ আগম-বাগীস এই চারি জন বাসুদেবের প্রধান ছাত্র বলিয়া প্রবাদ, কিন্তু কতদূর সত্য স্থির করিতে পারি নাই। কারণ চৈতন্তচরিতামৃত ও চৈতন্ত ভাগবতে যাহা লিখিত আছে তাহাতে চৈতন্ত গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট কলাপ ব্যাকরণ পড়িয়াছিলেন অথ কোন দর্শন বা ধর্মশাস্ত্র কাহার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহার কোন উল্লেখ নাই এবং পুরুষোত্তমে যখন বাসুদেব সার্বভৌমের সহিত সাক্ষাৎ হয় তাহাতেও চৈতন্ত বাসুদেবের ছাত্র বলিয়া বোধ হয় না।

কুম্ভমঞ্জলি প্রণেতা উদয়নাচার্য্য অতি প্রাচীন বাঙ্গালী নহেন। বিখ্যাত নবদ্বীপ নিবাসী সুতরাং বাঙ্গালী। “হরের গদা, গদার জয়, জয়ের বিত্ত, লোকে কয়”। হরি রামের ছাত্র গদাধর গদাধরের ছাত্র জয়কৃষ্ণ, জয়কৃষ্ণের ছাত্র বিখ্যাত! কুম্ভকভট্ট বাঙ্গালী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ইহা তাঁহার নিজ লিখিত মন্তুর টীকায় প্রমাণ। উপর্যুক্ত বিষয় ও অন্যান্য বিষয় বিশেষ করিয়া পরে লিখিব। এক্ষণে এই পর্য্যন্তই রহিল ইতি।

—o—

## কবির বিয়ে

বরবা,

তোদের বাড়ী কেন এত ধুম ?

রন্ধুর গিয়েছে মারা

দর্দুর দিয়েছে সাড়া

জলদ বাজায় কাঁড়া

গড়-গড়-গড় !

গগনের নহবতে

কেন এত ধুম ?

ঘরপাল দাঁড় কাক

বাজার বিজয় ঢাক

শিঙা ফুকে দেয় হাঁক

হোমরা হুম্ !

কোকিল উকীল আজি

নীরব নিরুন্ !

ভাঙায় ডাকিল বান

ফুঞ্জে “কোকা” করে গান

ঝিঁঝি পোকা ধরে তান—

বে-মানুন্ “লুন্”

আজি যে তোদের বাড়ী

বেজায় জুন্ ?

কে তুমি ধানের ক্ষেতে

সাদিনের শয্যা পেতে

এ ভরা বাদর রেতে

চোখে নাহি ঘুন্ ?

একি ?

রামগিরি গেল গ'লে

শিপ্রা নদী কিপ্র চলে

পাহাড়ে পাহাড়ে ফলে

জল-জ্যাস্ত “জুন্”

অবুকের ঘরে আজি

সবুকের ঘুন্ !

কে গো অই আশ্রভালে

বিজলীর বাতি জালে ?

নদ-নদী-বিলে-খালে

মত্ত মুরমুন্ !

কবির হইবে বিয়া

আর শিখী শাঁক-নিয়া

গাওহে মল্লার মিঞা—

রিমি রিমি রুন্ !

তোরা,

কেতকী চায়র ঢুলা

প্রবণে রুমকা রুলা

ইন্দ্রচাপ অঙ্গে বুলা—

চন্দন কুছুন্ !

এয়ো-বো মৌমাছিয়া

বাজা সবে সপ্তস্বরা

আজি হবে স্বয়ম্বরা

কঁদম্ব কুছুন্—

পুলক ফুটিছে গায়,

পাগল পূবের বার

পরাগ মাধিয়া গায়—

তা-না-না-না-জুন্ !

গগনে পবনে বড়

লেগে গেছে ঘুন্ !

আজি,

গাহক সরাল শ্যামা

ডাহক মরাল মায়া

মণ্ডুকের সা-রি-গা-মা

ভেঙ্গে দিল ঘুন্

কপোত-কপোতী ডাকে—

“বাক্‌কুন্—বাক্‌কুন্ !”

শ্রীকুল চন্দ্র দে ।

## চন্দ্রকান্ত প্রসঙ্গ

সেরপুরে বহুলাত ।

( ৪ )

ভরকালকার মহাশয়ের পঞ্চম পক্ষের জী, আমাদের  
কবিত্রাতা শ্রীমান্ তারাম্ভবর বাচস্পতির জননী, যখন  
সজ্ঞানে ৮কাশীলাভ করেন, তখন ভরকালকার মহাশয়

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া কলিকাতা আসিয়াছেন। সেরপুর অবস্থিতি সময়ে তিনি যে সকল বিদ্যোৎসাহী ‘ভূস্বামী’ বন্ধুর সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেরই নাম ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহারা প্রকৃত পক্ষেই তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বিজ্ঞাবিভব, ও সুখ-সম্মান লাভের প্রতি যথেষ্ট আস্থা রাখিয়া করিছেন।—তাঁহাদের সাহায্য না পাইলে,—তাঁহাদের মত বিদ্যোৎসাহী ধনবান্ ও গুণবান্ ব্যক্তির উৎসাহ না পাইলে আজ আমরা তর্কালঙ্কার মহাশয়কে গগনের এত উচ্চ আসনে সমাসীন দেখিতে পাইতাম কি না বলিতে পারি না। অন্যের কথা দূরে থাক সেরপুরের পুণাশীলা ভূমিধিকারিণী শ্রীযুক্তা তারামণি চৌধুরাণী মহাশয়া তর্কালঙ্কার মহাশয়কে যেরূপ সাহায্য করিয়াছেন, তিনি তাঁহার পারিবারিক সুখদুঃখের সহিত যেরূপ জড়িত—আপদে বিপদে, আনন্দে ও উৎসবে যেরূপ সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন, প্রয়োজন মত অর্থ-সামগ্রী বা লোকজন দ্বারা যেরূপ সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন, এখনও তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পরিবারের প্রতি সেই সাধ্বী ভূমিধিকারিণী-যেরূপ সদয় দৃষ্টিপাত,—বর্তমান সময় তাহা অজ্ঞাত হইল। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বন্ধুবর্গের মধ্যে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ চৌধুরী মহাশয়ের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তর্কালঙ্কার মহাশয় “বহুবল্লভ” ছিলেন,—প্রায় সকল বন্ধুই তাঁহার জন্ত বিশেষ ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিতেন, অনেকেই তাহার যথেষ্ট দৃষ্টান্তও দিয়াছেন,—তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বন্ধুবর্গ সম্বন্ধে আমাদের একটু চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয় রহিয়াছে।

সংসারে আমরা অনেক প্রকার বন্ধু দেখিতে পাই। আমাদের আপদে বিপদে বাঁহারা সাহায্য করেন,—আমাদের দুঃখ-দারিদ্র্য মোচনকল্পে বাঁহারা দান বিতরণ করেন, বাঁহারা যে কোনও প্রকারে আমাদের সকল রকম উপকার করিবার জন্য প্রস্তুত থাকেন, সুখে দুঃখে হাসিকান্নার প্রতিধ্বনি জুলিয়া সামাজিকতার পূর্ণ

পরিচয়, প্রদান করিয়া থাকেন,—তাঁহারা ই আমাদের এক শ্রেণীর বন্ধু। ইঁহারা স্থলবিশেষে ‘দাতা’, ‘দয়ালু’, ‘পরোপকারী’, ‘সামাজিক’ বা ‘সহৃদয় ব্যক্তি’ নামে অভিহিত হইতে পারেন,—কিন্তু তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অধিকাংশ বন্ধুই আরও একটু উন্নত শ্রেণীর। তাঁহাদের বন্ধুতা তর্কালঙ্কার মহাশয় সংসারের সকল কার্যে সকল সময়ে সর্বপ্রকারে অনুভব করিয়া থাকিতেন। তাঁহারা তাঁহার পারিবারিক সকল ঘটনার কলাফলের সহিত জড়িত, সকল কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট, এবং সকল প্রকার সুখদুঃখের সহিত তুল্যানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অনেক বন্ধুকেই দেখিয়াছি। তাঁহারা বুকের রক্ত ধারা বিনিময়ে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সুখসৌভাগ্য সম্পাদন করিতে যেন প্রস্তুত থাকিতেন। তাঁহার বন্ধুগণ চিরকাল ‘বন্ধু’ ছিলেন। এখনও বাঁহারা জীবিত আছেন তাঁহারা সেইরূপই ব্যবহার করিয়া থাকেন। একরূপ বন্ধুলাভ প্রায় অনেকেরই ভাগ্যে ঘটে না। আমরা ‘দাতা’ পাইতে পারি, ‘পরোপকারী’ মহাশয় ব্যক্তি পাইতে পারি, ‘দয়ালু’ পাইতে পারি, ‘সামাজিক লোক’ পাইতে পারি, বাঁহারা দমাজ হিতার্থ সাহায্য করেন, কর্তব্যানুরোধে ‘দেবদ্র’, ‘ব্রহ্মদ্র’ প্রদান করেন, এখনকার দিনেও সেরূপ লোকের ত্র্যকান্ত অভাব হয় নাই বটে, কিন্তু তেমন সহৃদয় বন্ধু, তেমন একপ্রাণ মহানুভব বন্ধু, কয়জন দেখিতে পাই? তর্কালঙ্কার মহাশয় ভাগ্য-বলে অসুখরূপ বন্ধুলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধুগণও তাঁহাকে আদর্শ বন্ধুরূপেই পাইয়াছিলেন। তিনিও বন্ধুর সুখ-দুঃখে অতিমাত্র জড়িত ও সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁহার বন্ধু বাৎসল্য, বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। তিনি এ প্রাচীন বয়সে রোগাক্রান্ত শরীর লিয়া ও অনবরত বন্ধুগণের কার্য সম্পাদন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, সে চেষ্টার মধ্যে সামাজিকতার অভাব না থাকিলেও বন্ধুবাৎসল্য ও অকৃত্রিমতার পূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান থাকিত।

ভাব ১৯১

সেরপুরের জমিদারবর্গের বন্ধুতা তাঁহাকে সাধারণের বন্ধুতা হইতে বিচ্যুত করিতে পারেন নাই। অথবা তাদৃশ ধনবান্ ও জ্ঞানবান্ লোকের বন্ধুতার গর্বে তাঁহাকে একদিনের জ্ঞাতও কেহ অভিমান প্রকাশ করিতে দেখে নাই। তর্কালঙ্কার মহাশয় অতি আশ্চর্য্য রূপে পৃথিবীর বহুতর স্পৃহনীয় সম্পৎ লাভ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ততোধিক আশ্চর্য্যরূপে তিনি সে সকল সম্পদের সম্যাবহার করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি মনুষ্যত্ব সম্পন্ন উন্নত শ্রেণীর পুরুষ ছিলেন বলিয়া তাদৃশ ব্যক্তির সঙ্গেই বন্ধুতা ঘটিত, তাই তাঁহার এবং তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে সাধারণ অপেক্ষা কিছু বিশেষ মহত্ব আমরা দেখিতে পাই। তাঁহার “সেরপুরে বন্ধুলাভ” প্রসঙ্গে আমরা আরও দুই চারিটা বন্ধুর নাম উল্লেখ করিয়া অন্ত্যস্ত কথার আলোচনা করিব। বৈষয়িক বন্ধুদিগের মধ্যে সেরপুরের প্রসিদ্ধ তালুকদার ঐযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র পত্র-নবীশ মহাশয় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। পত্রনবীশ মহাশয় সেরপুর প্রদেশে অতিশয় বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত। আমরা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার বাসভবন সেরপুরে যখন যখন গিয়াছি, দেখিয়াছি বৃদ্ধ পত্রনবীশ মহাশয় প্রায় প্রত্যহ আসিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। দুই বন্ধুতে মিলিয়া অনেক কথাবার্তা হইয়াছে, অনেক রহস্য হইয়াছে, অনেক বৈষয়িক ব্যবহার বিষয়ে পরামর্শ চলিতেছে। বৃদ্ধ পত্রনবীশ মহাশয়ের একমাত্র পুত্র-বিরোগে তর্কালঙ্কার মহাশয় নিতান্ত মর্শ্ব-বেদনা অনুভব করিয়াছেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পরিবার মধ্যেও একটা শোকের প্রবল অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছিল। সমাজ সংস্কার সম্বন্ধেও পত্রনবীশ মহাশয়ের সঙ্গে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অনেক আলোচনা হইত। পত্র-নবীশ মহাশয় প্রাচীন তত্ত্বের লোক হইলেও বর্তমান নব্য তত্ত্বের প্রবল শক্তির সহিত কোন প্রকারে “ভাব রক্ষা” করিয়া থাকিবার জ্ঞান চেষ্টা করিতেন, এবং সেই

সকল ‘ভাব’ কিসে রক্ষিত হইতে পারে, পরমবন্ধু তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সঙ্গে তাহারই পরামর্শ বা আলোচনা চলিত। কিন্তু তর্কালঙ্কার মহাশয় অচল অটল ভাবে নিজের শাস্ত্রজ্ঞান ও বিবেকেরই মাত্র অনুসরণ করিয়া চলিতেন। এ ক্ষেত্রে বন্ধুবাৎসল্য তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না। আমরা বারাহুরে এ সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে ইচ্ছা রাখি।

এইবার আমরা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কয়েকটি “ব্রাহ্মণ পণ্ডিত” বন্ধুলাভের কথার অবতারণা করিব। তর্কালঙ্কার মহাশয় এদেশে অবস্থান কালে তিনটি পণ্ডিত বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন।

পাবনা জেলায় “হরিণা বাগবাটী” নিবাসী স্বর্গীয় যদুনাথ ত্রায়র মহাশয় একজন খ্যাতিমান সাহিত্যিক ও আলঙ্কারিক ছিলেন। তিনি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সহিত বন্ধুত্বহস্তে জড়িত ছিলেন। আমরা বিশ্বস্ত হস্তে অবগত আছি, উক্ত ন্যায়র মহাশয়ের নিকট তর্কালঙ্কার মহাশয় সাহিত্য ও অলঙ্কার সম্বন্ধে অনেক শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। অধ্যয়নকালে তর্কালঙ্কার মহাশয় সকল শাস্ত্র পড়েন নাই, কিন্তু তিনি যখন চতুষ্পাঠী খুলিয়া অধ্যাপনা কার্যে প্রবৃত্ত হন সেই সময় হইতেই প্রকৃত পক্ষে তাঁহার অধ্যয়ন আরম্ভ হয়। সেই সময় হইতেই তিনি দিবারাত্রি অক্লান্ত শ্রম সহকারে সকল শাস্ত্রের চর্চা করিয়া আসিতেছিলেন। মৃত্যুর ২১ বৎসর পূর্বে তাঁহার সেই অধ্যয়ন-কর্মতা মন্দীভূত হইয়াছিল মাত্র। তর্কালঙ্কার মহাশয় উক্ত ত্রায়র মহাশয়ের সাহায্যে অল্পদিন মধ্যেই স্বীয় প্রতিভা-বলে কাব্য এবং অলঙ্কারে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যগ্রন্থরাশি ও অলঙ্কার শাস্ত্রের মৌলিক গ্রন্থ “অলঙ্কারহর” তাঁহার সাহিত্য ও অলঙ্কার জ্ঞানের নিকট প্রস্তররূপে চিরকাল বর্তমান থাকিবে। এইরূপ নব্য ত্রায় ও প্রাচীন ন্যায় শাস্ত্রের অনেক মৌলিক তথ্যের অনুশীলন করিতে গিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয়

বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট সাময়িক আত্মকৃত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা এই কথার আলোচনা ইতি পূর্বেই করিয়াছি, তর্করত্ন মহাশয় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মুহূৎ শ্রেণীর অন্তর্গত হইলেও অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন না। কিন্তু যদুনাথ ত্রায়ের মহাশয় তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুশ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের আর একটা বন্ধু ছিলেন ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত “ন পাড়া” গ্রামনিবাসী স্বর্গীয় আনন্দকিশোর ত্রায়ালঙ্কার মহাশয়। উক্ত ত্রায়ালঙ্কার মহাশয় সাংখ্য ও বেদান্তাদি দর্শনে অতিশয় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি এতদ্দেশে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন এবং সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। ত্রায়ালঙ্কার মহাশয় তর্কালঙ্কার মহাশয়কে একান্ত ভাল বাসিতেন, তর্কালঙ্কার মহাশয়ও তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিতেন। সাংখ্য, বেদান্ত ও পাতঞ্জল দর্শনের অনেক স্থান উক্ত ত্রায়ালঙ্কার মহাশয়ের আত্মকৃত্য তর্কালঙ্কার মহাশয় আয়ত্ত করিয়াছিলেন। সেরপুরে অধ্যাপনার সময় এই মহাত্মার সাহচর্যে তর্কালঙ্কার মহাশয় অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই সকল উপকারের কথা তর্কালঙ্কার মহাশয় অতি সরলভাবে স্বীকার করিতেন, অনেক সময়ে নিজেও গল্প করিতেন। আমরা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মুখে ত্রায়ালঙ্কার মহাশয়ের অনেক প্রশংসাবাদ শুনিয়াছি। ত্রায়ালঙ্কার মহাশয় এবং স্বর্গীয় হরচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় এতদ্দেশে খুব বড় রকমের দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় ইহাদের জ্ঞান সর্বদা আক্ষেপ করিতেন। ইহারা যদি এই সুদূর পট্টপ্রদেশে জন্মগ্রহণ না করিয়া অন্য কোনও সমুদ্রতটে প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিতেন, তবে বৃষ্টি ইহাদের পাণ্ডিত্যে ও প্রতিভায় সকল জগৎ মুগ্ধ হইবার সুযোগ লাভ করিত। উক্ত বেদান্তবাগীশ মহাশয়ও তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বন্ধু ছিলেন।

মহাত্মা বেদান্তবাগীশ মহাশয় আমাদের পরমবন্ধু কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ন্যায়ের বর্তমান অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কামিনীনাঁথ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠতাত। ইনি ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত গোহাটা গ্রামে, প্রসিদ্ধ পূর্ণানন্দ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ববঙ্গ উত্তরবঙ্গ ও আসামে ইহাদের বহুতর সম্ভ্রান্ত শিষ্য বর্তমান। এতদ্দেশে ইহাদের সম্মান সামান্য নহে। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পিতৃদেব সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় যখন টোল করেন তখন বেদান্তবাগীশ মহাশয় সেই টোলের ছাত্র হন। বেদান্তবাগীশ মহাশয় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সহিত এক পাঠে ব্যাকরণ ও কাব্য অধ্যয়ন করেন, বেদান্তবাগীশ মহাশয়ও একান্ত প্রতিভাশালী ছিলেন,—সুতরাং প্রতিভার অবতার তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা সহজেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। উভয়ের জীবনের স্রোতঃ কালে বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু বিধাতার বিচিত্র নিয়মে গার্হস্থ্য জীবনে আবার দুই বন্ধু একই কক্ষক্ষেত্রে মিলিত হইয়া পরম সুখে কাল অতিবাহিত করিতে ও পরস্পর অঙ্কিত বিজ্ঞার বিনিময় দ্বারা অধিকতর জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় যে মনসী বন্ধুর সহিত জীবনের অধিকাংশ সময় অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন, সেই মহাত্মা বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলিয়া আমরা বর্তমান প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

এই সকল প্রাচীন কথার আংশিক আলোচনাতেও লাভ আছে। ইহা দ্বারা আমরা প্রাচীন রীতিনীতির অনেকটা আভাস পাইয়া থাকি; ইহা দ্বারা বিজ্ঞা ও মনুষ্যত্বে সকলের বরগীষ হইবার যোগ্যতা সবেও দেশের দুর্ভাগাবশতঃ একমত লোকলোচনের অগোচরে জীবন শেষ করিয়া গিয়াছেন, ইহাদের মধ্যে অনেককেই আমরা চিনিয়া রাখিতে পারি নাই, অথচ চিনিয়া রাখা নিতান্তই উচিত ছিল, পরন্তু চিনিয়া রাখিবার মত সামগ্রীও

তাহারা সক্ষম করিয়া গিয়াছেন, অন্ততঃ তাহাদের মধ্যে দু'একজনকেও হয়ত আমরা কিছু কিছু বুঝিতে পারিব,—এইজন্যই আমরা এ সকল কথার আলোচনা করিতে ভালবাসি। জানি না আমাদের প্রিয়পাঠক মহাশয়দিগের সঙ্গে একমত হইতে পারিলাম কি না, তবে ভরসা আছে এসকল প্রসঙ্গ নীরস হইলেও সমাজ-তত্ত্বের অমূল্যত্বের সাহায্যকল্পে তাহাদের ক্ষীণ কৌতূহল কণ্ঠে উজ্জীৱিত করিতে পারিবে।

বেদান্ত বাগীশ মহাশয় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অন্যান্য বন্ধ অপেক্ষা কিছু স্বতন্ত্র ছিলেন। সামাজিক ও শাস্ত্রীয় নিয়ম অনুসারে কতকগুলি অমূল্যত্বের মধ্য দিয়া পরম্পরের মানসিক প্রণয় জনসমাজে 'বন্ধুতা' আখ্যায় আখ্যাত হইবার রীতি সুদীর্ঘকাল হইতে এতদ্দেশে প্রচলিত আছে। ঐসকল অমূল্যত্বযোগে প্রণয়যুগল 'বন্ধুতা' সংস্থাপন করিয়া থাকেন। তাহার ফলে প্রণয়-যুগলের প্রণয় পরম্পরের পিতামাতা ভ্রাতা ভগিনী আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি সকল পরিবারের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া পড়ে। সকলের সঙ্গেই একটা অপূর্ণ মধুর সম্বন্ধ ফুটিয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ব্যবহার ও আতি অনিষ্ট হইয়া উঠে। এহেন বন্ধুতা,—যে বন্ধুতা শুধু জীবনে নহে মরণের পড়েও বন্ধুকে আতি আত্মীয়ের মত অশোচ গ্রহণ করাইয়া দেয় সেইরূপ বন্ধুতা,—বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মধ্যে নানাবিধ অমূল্যত্ব সহযোগে সম্পাদিত হইয়াছিল। এইরূপ বন্ধুতা তখনকার দিনে অনেক পরিবারের মধ্যেই দেখা বাইত, এইরূপ বন্ধুতার ফলে পুরুষাত্মকমে আত্মীয়তা রহিয়া যায়। কিন্তু এখন আমরা এইরূপ বন্ধুতার পক্ষপাতী নহি, কোনও বিষয়ের মধ্যে যে কিছু একটা অমূল্যত্বকে আমল দিতে আমরা মোটেই ইচ্ছা করি না। আমরা প্রায় সকল কাজই অতি সংক্ষেপে অতি গোপনে ও অতি সন্তর্পণে করিতে চেষ্টা করি, এমনভাবে কাজটি করিতে চাই যে আবশ্যক

বোধ হওয়া মাত্র তাহাকে বেমালাম স্বীকার করিবার সুবিধাটুকু যেন আমাদের হস্তচ্যুত না হয়!—আমাদের এখনকার বন্ধুতা অনেকস্থলেই একদিনের কথার একটা আঘাতে ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু আগেকার দিনের 'বন্ধুতার' যে নিয়মটা ছিল, যে অমূল্যত্বটা হইত, তাহাকে সহসা স্বীকার করা যাইত না। কোনও কারণে মানব বন্ধনটা সহসা শিথিল হইলেও বাহ্য বন্ধনটা তাহাকে ক্রমে দৃঢ়তর করিয়া তুলিতে পারিত, ফলে বন্ধুতা ক্ষণ ভঙ্গুর হইত না, বন্ধুতা না হয় মন্দ নহে, কিন্তু ক্ষণ-ভঙ্গুর বন্ধুতা মানব সমাজের বিশেষ অনিষ্টকারী সন্দেহ নাই। আমরা আজি দেখিব বেদান্ত বাগীশ মহাশয়ের সহিত বন্ধুতার ফলে তর্কালঙ্কার মহাশয় অনেক প্রকার উপকার পাইয়াছেন। কিন্তু এই উপকার, বন্ধুত্বযুগলের মধুর বন্ধুতার আনন্দাদিক ফল মাত্র।

যাহা হউক বেদান্তবাগীশ মহাশয় সাংখ্য, বেদান্ত, পাণ্ডুল, মীমাংসা ও গীতা প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তর্কালঙ্কার মহাশয় ইহার নিকট এসকল দর্শনের অনেক গ্রন্থ একরূপ অধ্যয়ন করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ত্রায় বন্ধুত্ব তর্কালঙ্কার মহাশয়কে যে কত বড় করিয়া তুলিয়াছিল তাহা আজ সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের দর্শন অধ্যয়ন সম্বন্ধে একটা বিচিত্র গল্প আছে। রংপুর তুঘতাওয়ারের জমিদার স্বর্গীয় কালীপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয় বেদান্তবাগীশ মহাশয়দিগের পৈতৃক শিষ্য ছিলেন। বেদান্তবাগীশ মহাশয় ব্যাকরণ ও কাব্যের পাঠ সমাপন করিয়া রংপুর শিষ্যালয় গিয়াছিলেন।

গুরুপুত্রের বিত্তা পরীক্ষা করিবার জন্ত চৌধুরী মহাশয় দর্শন শাস্ত্রের কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু বেদান্তবাগীশ মহাশয় দর্শন পড়েন নাই বলিয়া

সে সকল প্রশ্নের ভেতন সূচাক উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। চৌধুরী মহাশয় কিছু উগ্রপ্রভৃতির লোক ছিলেন। তিনি বেদান্ত বাগীশ মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “ঠাকুর কুমার! প্রশ্নের উত্তর করিবার মত বিজ্ঞা শিক্ষা না করিলে বার্ষিকের দাবি চলিবে না।” বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও হঠিবার পাত্র নহেন, তিনি তেজস্বিতার সহিত বলিলেন, “প্রশ্নই বা করেন ক জন, উত্তরই বা শুনেন ক জন—আর প্রশ্নের উত্তর পাইবার মত বিজ্ঞাশিক্ষার সাহায্যই বা করেন ক জন?”—শুনিয়া চৌধুরী মহাশয় মাথা হেঁট করিতে বাধ্য হইলেন। অচিরে গুরুপুত্রের বিজ্ঞাশিক্ষার ব্যবস্থা হইল। বেদান্ত-বাগীশ মহাশয় শিষ্যালয় রংপুর হইতেই বেদান্ত অধ্যয়নের জ্ঞান পুণ্যক্ষেত্রে ৬ নারায়ণ কালীধাম যাত্রা করিলেন। সেখানে যাইয়া পণ্ডিতস্বামী কি ‘আচার্য্য-স্বামী’ ঠিক বলিতে পারিতেছি না, ইহাদের একজনের নিকট দর্শন পড়িতে আরম্ভ করেন। ক্রমে চারি বৎসর কাল বেদান্ত প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া বেদান্তবাগীশ মহাশয় একজন ভাল পণ্ডিত হইয়া উঠেন। তিনি ষথারীতি ব্রহ্মচর্যা পালন পূর্বক ‘মঠে’ অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহার প্রতিভা ও সুশীলতা দেখিয়া ‘স্বামীজী’ তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। কিন্তু সত্যার্থ হিন্দুস্থানী বিদ্বার্ধি-গণ, কিছু ঈর্ষা করিতেন, বাঙ্গালীর চির অপবাদ ‘মন্ত্ৰভোজিত্ব’ পুণ্যক্ষেত্রে বারাগনসী ধামেও বেদান্তবাগীশ মহাশয়কে ‘অভিত’ করিয়া তুলিল। তিনি “মছলী-ধোর বাঙ্গালী” ইত্যাদি সম্ভাষণে সর্বদা সম্ভাষিত হইতেন। কথটা একদিন স্বামীজীর কানে গেল, তিনি প্রিয়শিষ্য বেদান্তবাগীশ মহাশয়কে কাছে ডাকিয়া স্নেহে বলিলেন, “বাবা, ইহারা তোমাকে বিরক্ত করিতেছে তুমি ইহাদিগকে পলাতুভোজী হিন্দুস্থানী বলিয়া প্রত্যুত্তর দিও দেখিবে গোলমিটিয়া যাইবে।” ফলে হইলও তাহাই। বেদান্তবাগীশ মহাশয় নিরুদ্দেশ হইলেন। কিন্তু এদিকে বেদান্ত বাগীশ মহাশয় দীর্ঘকাল

ব্রহ্মচর্যা আগ্রমে বাস করিয়া, বেদান্তদর্শন অধ্যয়নে ও সাধুসন্ন্যাসীদিগের দৃষ্টান্তে দণ্ডগ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন, তাঁহার চিন্তা ক্রমে নিবৃত্তিধানে প্রধাবিত হইতে লাগিল, তিনি দণ্ডগ্রহণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। সে যে কি আগ্রহ! সমস্তই প্রস্তুত, যাত্র গুরুজীর অনু-মতি গ্রহণের প্রতীক্ষা, কিন্তু গুরুজী জানিতেন বেদান্ত বাগীশ মহাশয় মাতাপিতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া আসেন নাই, সুতরাং তিনি দণ্ড গ্রহণে অনুমতি দিতে অস্বীকার করিলেন, পরন্তু নানা প্রকার প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে গৃহীত হইতে উপদেশ প্রদান করিলেন। বেদান্ত-বাগীশ মহাশয় যখন যথেষ্ট অনুমতি বিনয় করিয়াও গুরুজীর অনুমতি গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইলেন তখন বিষম্বদয়ে দেশে ফিরিলেন। বোধ হয় গুরুজনের আদেশ গ্রহণ করিয়া আবার দণ্ডগ্রহণের জ্ঞান ৬ কালীধাম যাই-বেন ইহাই উদ্দেশ্য; কিন্তু তাহা ঘটিল না, বহুবিধ চেষ্টায়ও কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া বেদান্তবাগীশ মহাশয় অগত্যা সংসারী হইয়া পাড়লেন, আর ‘দণ্ডগ্রহণ’ হইল না! কিন্তু জ্ঞানস্পৃহা তাঁহাকে আবার ৬ কালীধাম লইয়া গেল। তিনি ক্রমে দুই বৎসরকাল গীতা ও উপনিষৎ অধ্যয়ন করিয়া ‘বেদান্ত বাগীশ’ উপাধিলাভ করত দেশে প্রত্যাগত হইলেন। সেই হইতেই প্রায় অধি-কাংশ সময় পরমবন্ধু তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সহিত একত্র বাস করিতেন। অনেকদিন হইল বেদান্তবাগীশ মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। বেদান্তবাগীশ মহাশয়কে দেশের অল্পলোকেই জানিত, কিন্তু বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের প্রতিভার সাহায্যে যে মহানুভব পণ্ডিত কোনও কোনও বিষয় নিজ প্রতিভাকে উজ্জ্বলতর করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা সংসারে অতি অল্প। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের এইসকল বহুলাভ তাঁহার জীবনকে অতি মননীয় করিয়া তুলিয়াছিল। সহদয় বহুগুণের প্রভাব আমাদের মধ্যে অতি সহজে বিতৃতিলাভ করিয়া থাকে, এইসকল পুতচরিত্র বন্ধু ও নিজের পরস্পর



ভাষা ১০৭১

সাহচর্যে বহুবর্ণ—সকলেই আদর্শ-চরিত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইয়াছিলেন।

তর্কালঙ্কার মহাশয় কেবল বহুবর্ণের নিকট হইতে নহে, যেখানে যাহা নূতন পাইয়াছেন—যতটুকু সারবস্ত পাইয়াছেন অক্লান্ত অধ্যবসায় সহকারে তাহাই আয়ত্ত করিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি দেখিয়া সাধারণে বিশ্বাস বোধ করিত, কিন্তু এ স্মৃতিশক্তি যে কত সাধনার মহাহী ফল তাহা সকলে বুঝিত না। তর্কালঙ্কার মহাশয়কে অনেকেই দৈবশক্তি সম্পন্ন বলিয়া মনে করিত অনেকেই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিত না যে মানুষ কি করিয়া এত শাস্ত্র আয়ত্ত করিতে পারে। সুতরাং প্রায় অনেকেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল তর্কালঙ্কার মহাশয় কোনও দৈবশক্তির প্রভাবে এরূপ পণ্ডিত হইয়াছেন! হায়! দেশ কতকাল পুরুষকারের মাহাত্ম্য বিস্মৃত হইয়াছে!

কলিকাতা অবস্থানকালে একদিন একটা ভ্রমলোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—“মহাশয়, আপনার জিহ্বায় নাকি একজন সন্ন্যাসী একটা বৌদ্ধমন্ত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন?—কথাটা কি সত্য?” এ দৌন প্রবন্ধলেখক সেখানে উপস্থিত ছিল। শুনিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় একটু হাসিলেন, এবং বিনোদভাবে বলিলেন “মহাশয় আমি পঠিক্ষা হইতে যতদূর পরিশ্রম করিয়া বিচ্ছাভ্যাস করিয়া আসিতেছি সে রূপ পরিশ্রম আজকাল অনেকেই করিতে চাহেন না। যে সামান্য একটু জ্ঞান জ্ঞানিয়াছে বলিয়া আপনারা মনে করেন, তাহা আমার চিরজীবন অবিশ্রান্ত অধ্যবসায়ের ফল মাত্র!” ভ্রমলোকটা একটু লাজ্জিত হইলেন, আমরাও নিজেদের ত্রুটি অনুভব করিয়া নিতান্ত অপরাধীর মত মাথা হেঁট করিয়া রহিলাম। এইরূপ কতদিন কত প্রসঙ্গে সেই বহুপুরুষের কত উপদেশবাণী শুনিয়াছি, কত কণ্ঠব্যের জিজ্ঞাসিত পাইয়াছি, কত মহত্বের কথা “কাণের ভিতর দিয়া মরমে পাশিয়াছে,” কিন্তু হায় এমন উদাস্ত স্তরে জীবনের যন্ত্রটাকে ত এক দিনের জগৎ বাণিতে পারিলাম না!

( জমশঃ )

শ্রীকালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী।

## বৈষ্ণব কবির শ্রীরাধিকা

আজ শতাধিক বর্ষ অতীত হইল বঙ্গের সরস শ্রামল কুঞ্জে বসিয়া বৈষ্ণব কবিগণ একটী অপূর্ণ রমণী মূর্তি চিত্রিত করিয়াছিলেন। অতঃপরো রবির স্বর্ণাভকিরণ-রাস্তা প্রকৃতির শোভা যেমন মানব-চিত্তকে বিমোহিত করে, গভীর নিশীথে দুরাগত বংশীরব যেমন শ্রবণ-পথে অমৃতধারা বর্ষণ করে, সুশীল যমুনা-সৈকতে প্রেমময়ী রাধিকার উন্মাদিনী মূর্তি এবং তাঁহার মধুর প্রেম-রাগিণী তেমনি স্তম্ভদয় পাঠকের নয়ন-মন বিমুগ্ধ করে সন্দেহ নাই। একদিন একজন প্রেমিক কবির কাব্যে পাঠ করিয়াছিলাম

“পাই যদি কভু গঠিতে রমণী

প্রাণ ভরি গঠি তায়;

ছাঁকিয়া নবনৌ চাঁদের আঁচলে

কম করি গঠি তায়।”

বাস্তবিক কাব্যের জন্ম হইতে এ পর্যন্ত আমরা অনেক প্রকার রমণী-চিত্র দর্শন করিয়া মোহিত হইয়াছি। ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় কবিগণের হস্তে এই রমণী-মূর্তি এক একটা অপূর্ণ শোভায় স্ফুটিয়া উঠিয়াছে। সীতা, সতী, সাবিত্রী, শকুন্তলা, ডেসডিমনা, মিরণ্ডা, জুলিয়েট,—ইহারা সকলেই অপরূপ রমণী মূর্তি। ইহা-দিগের এক একটা জীবন-আলেখ্য সাধারণের আরাধনার সামগ্রী। কবিগণ ইহাদিগকে যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন তাহাতে দয়া, প্রেম, পুণ্য, অসামান্য পতিভক্তি, আত্ম-বিসর্জন প্রভৃতি সর্বপ্রকার গুণরাশি অতি সুস্পষ্ট স্ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বঙ্গীয় যুগে বৈষ্ণব কবিগণের হস্তে কলঙ্কিনী রাধিকার যে উন্মাদিনী মূর্তি দর্শন করিয়াছি তাহার নিকট বুকি সকল চিত্রই পরাস্ত। বৈষ্ণব যুগে বঙ্গদেশে প্রেমের অবতারণা হইয়াছিল। বৈষ্ণব কবিগণ প্রেমের যে নিষ্কাম মাধুর্য বর্ণনা করিয়াছেন তাহা প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে পবিত্রতার স্মৃতিধারা প্রবাহিত

করিয়া দিয়াছে। পদাবলী সাহিত্য প্রেমের রাজ্য। নয়নজলের রাজ্য। ইহাতে স্বার্থের আহুতি, অধিকারের বিলোপ। চিরবাহিতের দেহস্পর্শ করিতে, তাঁহার অপক্লপ রূপ দর্শন করিয়া জীবন-মন সার্থক করিতে, তাঁহার প্রেম-মকরন্দে চিরদিনের নিমিত্ত আশ্বাস হইয়া থাকিতে স্বর্গীয় প্রেমিক কবিগণ কাদিয়া বেড়াইয়া ছিলেন, পদাবলী সাহিত্য তাঁহাদের অশ্রুর ইতিহাস। এই অশ্রু হইতেই শ্রীরাধার জন্ম, এই অশ্রুতেই তাঁহার বিকাশ, এবং ইহাতেই তাঁহার বিলোপ। এই নিমিত্তই এই অপূর্ণ মূর্ত্তি প্রেমিক পাঠকের আরাধ্যা দেবী।

চণ্ডীদাস, বিজ্ঞাপতি, জয়দেব প্রভৃতি সকল কবিগণের কাব্যেই আমরা এই নারীমূর্ত্তির পরিস্ফুটন দেখিতে পাই। বৈষ্ণব কবিগণ রাধিকাকে কলঙ্কিনী বলিয়াই সাধারণের সমক্ষে বাহির করিয়াছেন। রাধা কলঙ্কিনী কিন্তু তান্মিত্তি তিনি লজ্জিতা নহেন। তিনি তাঁহার প্রিয়তমের দাসী এ কথা নগরে নগরে প্রচার হউক তাহাতে রাধার দুঃখ নাই। এ কলঙ্কের ডালি গোরবের ডালি বলিয়া রাধা নিজ মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন। তাই তিনি একদিন তাঁহার ননদিনীকে সন্মোদন করিয়া বলিতেছিলেন

‘ননদিনী বল নগরে নগরে

ডুবেছে রাই কৃষ্ণপ্রেম-কলঙ্ক-সাগরে।’

এ কলঙ্ক-সাগর হইতে উদ্ধার পাইবার নিমিত্ত রাধিকার বিন্দুমাত্রও আকাঙ্ক্ষা নাই। যিনি তাঁহার প্রেমাস্পদের চরণে দেহ মন প্রাণ সমস্ত অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার আবার আত্মাভিমান কিসের? যতক্ষণ আপনার বলিয়া কিছু রহিল ততক্ষণ আত্মোৎসর্গ হইল কই? রাধিকা-চরিত্রে এই অপার্বিব আত্মোৎসর্গের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই।

বৈষ্ণব পদাবলীতে একটা স্বর্গীয় উপাদান আছে। মানবীয় প্রেমগীতি গাহিতে গাহিতে সে গীত-লহরী সহসা কি এক অজ্ঞাত সুরলোকের বার্তা

আনিয়া দেয়। রাধা-চরিত্র অন্ধনেও সেই উপাদানের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। রাধিকার আত্ম-বিসর্জন ক্রমে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া এমন স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, যাহা কেবল ভক্ত ও ভগবানের মিলন-ভূমি। যে প্রেমিক সাধক আপনার বাহিতের চরণে সকল জীবন অর্পণ করিয়াছেন তাঁহার আবার লোকলজ্জা কিসের! প্রিয়তমের প্রেম প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া যদি গৌরবে তাঁহাকে বিদ্রুপ করে, তবে তাহা তাঁহার আপনাদ নহে আশীর্বাদ। রাধাপ্রেমেও এইভাবে অতি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাই ইহা এত মধুর। ইহা ত গেল আত্ম-বিসর্জন। এখন একবার এই অপূর্ণ তন্ময়ত্বের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখা যাউক। চণ্ডীদাসের বর্ণিত রাধিকাকে তিনি যখন প্রথম দেখাইয়াছেন তখনই উন্মাদিনীর বেশ। রাধিকা আপনার গ্রামল কুহলজ্বালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন, কারণ সেখানে কৃষ্ণরূপের মাধুরী আছে। গ্রামল মেঘমালায় দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন, কারণ মেঘমালা তাঁহার প্রিয়তমকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। তমাল-লতাকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত বাহ প্রসারণ করিয়া দিতেছেন, কেন না তিনি ভাবিতেছেন, “কৃষ্ণ কাল, ভামল কাল, তাই তমাল বড় ভাল বাসি।”

তাঁহার চিত্ত ওই গ্রামরূপে তন্ময়। চতুর্দিকে আর কিছুতে তাঁহার নয়ন মন আকৃষ্ট হয় না, কেবল “পলকে আকুল দিক নেহারিতে সব গ্রামময় দেখি।”

এই ভাব পাঠ করিতে করিতে আর একদিনের কথা স্মরণ হয়। সে দিন প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্য পৌর্ণমাসী রজনীর সুধাধারাপ্রাণিত গ্রামল সাগর বন্ধকে তাঁহারই প্রিয়তমের বন্ধ মনে করিয়া তাহাতে কল্প প্রদান করিয়াছিলেন। এই স্থানে দুইটা ভাবের পরস্পর মিলন দেখিতে পাওয়া যায়। তাই বলিতে-ছিলাম রাধাপ্রেমের চরমোৎকর্ষ প্রেমিক সাধকের ভগবন্তজিতে। তাই এ প্রেম সাধারণ সীমা

অতিক্রম করিয়া অপার্বিব স্বর্গলোকে গিয়া  
পৌছিয়াছে।

আমরা দেখিতে পাই যদিও রাধার অন্তর সর্বদাই  
তাঁহার প্রিয়তমের সত্তার পূর্ণ ছিল, তথাপি সময়ে সময়ে  
রাধা এ মধুর শ্রদ্ধা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেন না।  
এই সময়ই রাধিকার পূর্ণ বিরহের সময়। রাধিকার অন্তর  
এ তীব্র যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া উদ্ভ্রান্ত হইয়া  
উঠিত। তিনি তমাল-তলে, যমুনা-তীরে, গোচারণ-  
ভূমিতে তাঁহার প্রিয়তমের অঙ্গসন্ধান করিয়া বেড়াইতেন।  
শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনীপাঠে জানিতে পারা যায় যে,  
তিনিও মধো মধো এইরূপে তাঁহার প্রাণের দেবতার  
বিস্ফোরণ-বহুলা সহ্য করিয়াছেন। যখন শ্রীচৈতন্যের অকরে  
এরূপ গুরুত্ব আসিত তখন তিনি বাগকের দ্বারা  
ধূল্য পড়িয়া রোদন করিতেন। ভক্তবাহুসকলকে  
অধিকরণ তাহার প্রিয়তম ভক্তের কাতরতা সহ্য করিতে  
পারিতেন না; অচিরে দর্শন দিতেন। সধার  
আগমনে শ্রীগোরাঙ্গের হৃদয়কূটার চরিতার্থ হইত,  
হৃদয়ের ধারে প্রেমবিন্দু জড়িত হইয়া তাঁহার সুন্দর  
বককে প্রাণিত করিত। তিনি তাঁহার প্রাণেশ্বরের সহিত  
বিলিত হইয়া বাহ্যঙ্গণে বিস্তৃত হইতেন। রাধাপ্রেমেও  
আমরা এ ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হই। বিরহ-বিধুরা  
রাধিকা সন্ন্যাসিনী সাজিয়াছেন। তাঁহার আহার-বিহার  
আমোদ-প্রমোদ কিছুতেই ক্রটি নাই; অকস্মাৎ সংবাদ  
আসিল, তাঁহার প্রিয়তম মধুরা হইতে ফিরিয়া আসিয়া-  
ছেন। রাধিকা নয়ন ফিরাইয়া সে শ্রামল কান্তি নিরীক্ষণ  
করিভেই তাঁহার উদ্ভ্রান্ত চিত্ত সংযত হইল। তিনি পার্শ্ব-  
বর্তিনী সহচরীকে সন্ধান করিয়া কহিয়া উঠিলেন;

“আজু রজনী হাথ ভাগে গোহারহু

পেথহু গিয়া মুখচন্দা;

জীবন বোবন সকল করি মানহু

দশদিশ ভেল নিরদন্দা;

আজু মরু গেহ গেহ ভেল মানহু

আজু মরু দেহ ভেল দেহা—

আজু বিহি মোরে অনকুল হয়লো

টুটল সবহ সন্দেহা।”

তাই বলিতেছিলাম রাধাপ্রেম মানবীয় প্রেমের গভী  
অতিক্রম করিয়া অনেক উর্ধ্বে বাইয়া পৌছিয়াছে।  
আজ এই নিমিত্তই বঙ্গীয় পাঠকের হৃদয় বীণার তন্ত্রীতে  
এ প্রেম-রাগিণী বাজিয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষ আধ্যা-  
ত্মিকতার দেশ, ভারতবাসী চিরদিন আপনার হৃদয়-মন্দিরে  
প্রাণের দেবতাকে বসাইয়া বাহ্যঙ্গণে বিস্তৃত হইয়াছেন।  
তাই রাধাপ্রেমের এ গুটিল মনোবিজ্ঞান-ভর ভারত-  
বর্ষের প্রেমিক সাধক ভিন্ন অত্র কাহারও চিত্ত এতদূর  
স্পর্শ করে নাই। যাহাদের হৃদয় নাই তাহারা এ  
অপার্বিব প্রেমতত্ত্বের কি বুঝিবে! কিন্তু আমরা  
স্পর্শ করিয়া বলিতে পারি যাহাদের হৃদয় আছে, যাহারা  
অন্ততঃ একদিনের তরেও নয়নজলে আপনার জীবন-  
দেবতার অর্চনা করিয়াছেন, তাহাদের চক্ষে এ নারীমূর্তি  
অপার্বিব রমণী মূর্তিতে ফুটিয়া উঠিবে। সাধারণের চক্ষে  
রাধিকা কলঙ্কিনী বলিয়া অনাদৃত হইতে পারেন, কিন্তু  
যাহারা প্রেমিক সাধক তাহারা বুঝিবেন, যিনি আপনার  
জীবনবোবন, কুলশীল, লজ্জাভয়, সকল আপনার প্রিয়-  
তমের চরণে অঞ্জলি প্রদান করিয়া শুধু এক চিন্তা  
এক ধ্যান এক কামনা লইয়া ভগ্ন হইয়া থাকিতে  
পারেন, তিনি মানবী নহেন দেবী, তিনি ইহলোকে  
বাস করিয়াও সুরলোকবাসিনী, তিনি নারীকুলের  
আরাধ্যা সতীকুলের শ্রেষ্ঠা সতী।

শ্রীজ্যোতির্ষ্ময়ী গুপ্তা।

## পর্যটক

নিতে আসি নাই কিছু তোদের পৃথিবী হ'তে,  
 আসি নাট দিতে ;  
 কিংবা আসি নাই হেথা মিশিতে তোদের সনে  
 নৃত্য আর গীতে ;  
 খেলিতে আসিনি হেথা—আমারে পাবে না কিছু  
 জয়ে পরাজয়ে ;  
 হরিতে আসিনি কিছু অস্ত্র লয়ে দস্তা-সাজে,  
 কিম্বা চোর হ'য়ে ;  
 আসি নি ধনের লাগি, আসি নি যশের পাগি.  
 নাহি চাই জন,  
 নাহি চাই ভালবাসা, ভক্তি, প্রীতি, দয়া, মায়া  
 নাহি প্রয়োজন।  
 তোদের মলয়-সেবা তোদের জোছনা পান  
 মানি তুচ্ছ বলে,  
 তোদের ফুলের ভ্রাণে, পাখী-গানে মুগ্ধ হয়ে  
 রহিনি ভূতলে ;  
 কামিনীর হাসিটুকু কিংবা তার প্রেমালোপে  
 স্বর্গ মানি নাই ;  
 তার পায়ে অপরাধী—সংসারের কাণাগারে  
 রব না সদাই !  
 চৌদ্দ পুরুষের ভিটা, লাধি মেরে তার বুকে  
 ফেলে পিতা মাতা  
 রমণীরে কাঁধে লয়ে প্রবাসে নাচিব বলে  
 আসি নাই হেথা !  
 কর্তব্য তোদের যাহা, করিতে আসিনি আমি  
 হেথা সেই সব :—  
 ধর্মের প্রচার, কিংবা সমাজ-সংস্কার, কিংবা  
 “কংগ্রেস” উৎসব।  
 জীশিকা বিস্তারিতে—তারে দিতে স্বাধীনতা  
 আসি নাই হেথা ;

উপাধি কিনিতে, কিংবা “ডিগ্রী” নিয়ে বড় হ'তে  
 কিংবা হয়ে নেতা

জাতিভেদ উঠাইয়ে, ধর্ম দিয়ে বিসর্জন  
 ভারতের কাজ  
 সাধিতে আসিনি হেথা—যুগাইতে সভ্যতায়  
 স্বদেশের লাজ !!

গ্রহ হ'তে গ্রহাণ্ডের পর্যটন করি সদা  
 করঙ্গ-কম্বল লয়ে আমি পর্যটক ;  
 কোথা হ'তে কোন দিকে কত কোটা যুগ ধরে  
 কি কাজে চালায় মোরে বিশ্বের চালক !  
 ছুটিতে ছুটিতে আমি পথ ভুলে আসিয়াছি  
 তোদের ধরায়,  
 কোটা কোটা মায়া হেরি চারিদিকে ধেয়ে আসে  
 গ্রাসিবে আমায়।  
 কেহ নর, নারী কেহ, কেহ শিশু, বৃদ্ধ কেহ—  
 যুবতী যুবক—  
 কারো আশি ছিল ছল—কারো গোবে ছুটি আশি  
 অলে ধক্ ধক্ !  
 কেহ কহে ভালবাসি,—লয়ে যায় গৃহে মোরে  
 আদরে বরিয়া ;  
 ঘরের বাহির করে কেহ কহে শত্রু তুই,  
 ফেলব মারিয়া !  
 বিজনে বসিয়া হেথা নিজ মনে নিশি দিন  
 মাতি নিজ গানে,—  
 “কবি হ'তে চাহ বাছা”—এই ব'লে ওরা এসে  
 চুল ধরে টানে !  
 “সমালোচনার শূলে তোমাতে বসাব আমি  
 সচিব মাসিকে,”  
 ইঙ্গিতে আকারে মোরে এই বলে কেহ কেহ  
 নাচে সাহিত্যিকে !

“কি লিখিছ মাথাযুগ্ধ, প্রেমের কবিতা চাহি,”

—করে কেহ জেদ্

কেহ চাহে “অবরোধে সধবার দুঃখ,” কেহ

“বিধবার খেদ” !!

কেহ বলে “ভগু তুমি, মুক্ত যদি চাহ তবে

রাধাকৃষ্ণ কও।”

কেহ কহে, “মিথ্যা কণা সায়ন্ত শাসন পাবে.

‘ডেলিগেট’ হও !”

জাতীয় শিকার লাগি দিলাতে পাঠাতে কেহ

প্রাণ পণ করে !—

পথিক—পথিক আমি, আমারে পাবিনে তোরা,

কহি পায়ের ধরে !

শ্রীদুর্গামোহন কুশারী।

## শিলাপূজার মূলতত্ত্ব

শিলাপূজার নিদর্শন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই আবিষ্কৃত হইয়াছে। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই যে কোন না কোন সময়ে শিলাপূজা প্রচলিত ছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্তের পর্যালোচনা করিতে গিয়া বহুস্থানে শিলাপূজাতেই যে ধর্মের প্রথম আরম্ভ হইয়াছে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই শিলাপূজার বিশেষ প্রাচীনত্ব তদ্বারা নিঃসংশয়রূপেই প্রতিপালিত হয়। প্রাচীন বাইবেল গ্রন্থে পর্য্যন্ত শিলাপূজার উল্লেখ দৃষ্ট হইয়াছে। অতএব বাইবেল ধর্মোৎপত্তির পূর্বেই যে শিলাপূজার প্রচলন হইয়াছিল তাহা বুঝিতে কোন কষ্টই হয় না।\* এখানে আমরা আমেরিকাতে প্রকাশিত স্মপ্রসিদ্ধ অপেন কোর্ট (The Open Court) নামক মাসিক পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক মহাপণ্ডিত ডাক্তার পল কেরাসের (Dr Paul Carus) যন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

And if we consider that the most ancient

prehistoric monuments in European countries are an unequivocal evidence that the Teutons, the Celts, the Slavs, the Mongolians, and also the Semites must at some time or another, have practised stone-worship we come to the conclusion that at a certain phase of man's religious development it must have been all but universal. We find traces of it preserved in that greatest storehouse of religious monument, the Bible.” The Open Court, January, 1901.

পৃথিবীব্যাপিনী পুরোক্ত প্রাথমিক শিলাপূজার মূল কোণায়, এক্ষণে ইহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য হইতেছে। যে ভারতবর্ষে ধর্মের প্রথম উৎপত্তি হয়, শিলাপূজার উৎপত্তিও সেই ভারতবর্ষে হয় বলিয়াই আমরা মনে করি। ভারতের শিবপূজার সহিতই শিলাপূজার প্রথম যোগ বলিয়া আমাদের বোধ হয়। শিবের ‘গিরীশ’ ও ‘গিরিশ’ নামে এবং হুর্গার ‘পার্বতী’ নামে পার্বতের সহিত যেরূপ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় ভারতীয় আর কোন দেবতারই এরূপ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। পার্বত শিলাময় বলিয়া শৈল নামে কথিত হইয়া থাকে। শৈলের অধিষ্ঠাতা বলিয়া শিবও যে শিলার সহিত অভিন্ন-বাগ্মা বিবেচিত হইবেন তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। দ্বন্দ্বতঃ হিমালয় পার্বতের সর্বোচ্চ শিখর যে “গৌরীশঙ্কর” নামে অভিহিত হইয়াছে তাহাতেও পুরোক্ত কথাটিরই প্রমাণ পাওয়া যায়।

বেদের ‘রুদ্র’ দেবতা শিবের প্রকৃত স্বরূপ। এই রুদ্র দেবতা “গর্জনকারী বজ্রাশ্ব” বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। ইহাতে ‘বজ্র’ ও ‘রুদ্র’ অভিন্ন বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। বেদে রুদ্রের অস্ত্র বলিয়াও বজ্রের বর্ণনা পাওয়া যায়, যথা—

“Rudra undoubtedly is a wielder of the thunderbolt.” Vedic India by Ragozin. p. 209.

শিবলিঙ্গের উপরে যে বজ্র চিহ্ন স্থাপিত হয় তাহা

রুদ্র-বজ্রেরই নিদর্শন বলিতে হইবে। শিবের নমস্কার  
মন্ত্রেও তাহাকে বজ্রহস্ত বলিয়াই উল্লিখিত দেখা যায়; যথা।

“নমস্তস্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্রে।

নমঃ পিণাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ ॥”

বেদে যেষ ‘পর্কত’ নামে অভিহিত হইয়াছে। বজ্রায়  
যেষেতে অবস্থান করে বলিয়াই বজ্রায়িক্রুপী রুদ্র বা শিব  
পর্কত বা গিরিতে শয়ান বলিয়া যে ‘গিরিশ’ নাম প্রাপ্ত  
হইবেন তাহা অসম্ভাব্য বোধ হয় না। এবং ‘দুর্গা’ বিদ্যাৎ-  
ক্রুপিনী হইয়া যে ‘পার্কতী’ নাম প্রাপ্ত হইবেন তাহাও  
অসম্ভাব্য বোধ হয় না।

রূপক ভাবেই যে কেবল পর্কতের সহিত বজ্রের  
সম্বন্ধ তাহা নহে, কিন্তু প্রকৃত পর্কতের সহিতও বজ্রের  
সম্বন্ধ দোষিতে পাওয়া যায়। পর্কতের সহিত বজ্রের  
স্বাভাবিক আকর্ষণ হইতেই যেন সর্বদা পর্কতে বজ্রপাত  
হইয়া থাকে।

রক্তাদি জ্যোতিমান্ প্রস্তর বজ্রেরই বিকার বলিয়াই  
যেন সাধারণ বজ্র নামে অভিহিত হয়। সমস্ত মূল্যবান  
প্রস্তরই যে বজ্রপর্কতের অণুভুক্ত তাহা নিরোদ্ধত বর্ণনা  
হইতে জানিতে পারা যাইবে —

“বজ্রং মরকতকৈব পদ্মগাণ্ডক্যমৌক্তিকম্।

ইন্দ্রনীলং মহানীলং বৈদূধ্য গঙ্গাসংজ্ঞকম্ ॥

চন্দ্রকাশ্যং সূর্য্যকান্তং স্ফাটিকং বলকং তথা।

কর্কেতরং পুষ্পরাগং তথা জ্যোতীরসং দ্বিজ ॥

স্ফাটিকং রাগবর্ত্তকং তথা রাগমতং শুভম্।

সৌগন্ধিকং তথা গণ্ডং শঙ্খব্রহ্মময়ং তথা; ॥

গোমেদং রুধিরাত্মকং তথা ভস্মাতকং দ্বিজং।

ধূলী মরকতকৈব ভূথকং সৌম্যমেব চ ॥

পীলুং প্রবালকৈব গিরিবজ্রকং ভার্গব।

ভূজঙ্গমা মণিশৈব তথা বজ্রমণিঃ শুভঃ ॥

তিথিতঞ্চ তথাপাতং ভ্রামরঞ্চ তথোৎপলম্।

বজ্রাণ্যেভানি সর্বাণি ধার্য্যাণ্যেব মহাভূজ ॥”

ইতি শব্দকল্প দ্রুমধৃত বৃত্তিকল্পতরু।

ইহাদের মধ্যে বজ্রায়িক বা বিদ্যাৎ নিহিত হইয়াছে  
বলিয়াই ইহাদের জ্যোতিঃ প্রকাশ পায়—এই বিশ্বাস  
হইতেই বজ্রের বিকাররূপে ইহাদের বজ্র নাম কল্পিত  
হইয়া থাকিবে।

এই প্রকার পর্কত ও প্রস্তরের সহিত রুদ্র বা বজ্রায়িক  
সম্বন্ধ হইতেই রুদ্রের বিকাশ শিবের সহিতও ইহাদের  
সম্বন্ধ হইয়াছে। এই জন্যই শিব ‘কৈলাশ নিকেতন’  
নামে নির্দেশিত হইয়া থাকেন, এবং ধ্যানে তিনি ‘রক্ত-  
গিরিনিভং’ এই বর্ণনায় কৈলাশ গিরির সহিত তুলিত  
হইয়া থাকেন।

আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঋগ্বেদের প্রথম আরম্ভ  
ঋকটীতেই আমরা ঋগ্বেদে “রত্নপাতবম্” রত্নের বিশিষ্ট  
আধার রূপে বর্ণিত দেখিতে পাই। অথচ শিবের ধ্যানেও  
তিনি “রত্নকল্লোজ্জ্বলাঙ্গম্” বলিয়া কীর্তিত। দেখি  
বজ্রায়িক ও অগ্নি যে মূলে অভিন্ন বেদে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ  
পাওয়া যায়। সুতরাং প্রস্তর যে অগ্নি বা অগ্নিক্রুপী শিবের  
বিশেষ অধিষ্ঠান বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহা আমরা  
নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছি।

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা অনুমান করিতে  
পারি যে, প্রস্তরই প্রথম বজ্রায়িক্রুপ রুদ্র বা শিবের মূর্ত্তি  
বলিয়া পূজিত হইত। তাহা হইতেই প্রস্তর শিবের বিশেষ  
চিহ্ন হইয়াছে। বিশেষ চিহ্ন বলিয়াই ইহা প্রথম লিঙ্গ  
নামে কথিত হইত বলিয়া বোধ হয়।\* তাহাতেই প্রস্তরে  
শিবলিঙ্গ পূজার মাহাত্ম্য সর্বাঙ্গপেক্ষা অধিক বলিয়া শাস্ত্রে  
বিহিত দেখা যায় যথা—“পাষণে শিবপূজায়াং দ্বিগুণং  
ফলম্মীরিতম্।” ইতি শব্দকল্পদ্রুম ধৃত মাতৃকাভেদ তন্ত্রে  
১২শ পটল।

শিবলিঙ্গ পূজা এক সময়ে এরূপই বহল প্রচার লাভ  
করে যে, আর্য্য অনার্য্য ভূম্যভাবে ইহাতে অধিকার প্রাপ্ত  
হয়। তাহাতেই বাণাসুর কর্তৃক পূজিত লিঙ্গ ‘বাণলিঙ্গ’

\* “লিঙ্গ্যভে জায়তে অনেনেতি লিঙ্গম্” ব্যাকরণে  
লিঙ্গ শব্দের এইরূপ ব্যাংপত্তি পাওয়া যায়।

নামে আৰ্য্য অনাৰ্য্য সকলেরই মধ্যে অপর সকল লিঙ্গ অপেক্ষা অধিক বরণীয় হইয়াছে। এই লিঙ্গ নন্দাদা জলে স্বতঃই পরিত, হইতে স্থলিত হইয়া আসে এবং ইহার আকৃতি অলৌকিক সৌষ্টব ও প্রভাসম্পন্ন। বাণাসুর প্রথম ইহার আবিষ্কার করেন বলিয়াই ইহা তাঁহার নামেই পৃথিবীতে পরিচিত হইয়াছে। এখানে আমরা বাণ-লিঙ্গের আবিষ্কার তব শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,

‘দেবীং প্রতি শিববাক্যং—

“প্রশস্তং নার্মদং লিঙ্গং পঞ্চমুচ্চলিত।

মধুবর্ণং তথাশুকং নীলং মরুতপ্রভম্ ॥

হংসাডম্বাকৃতি পুনাঃ স্থাপনায়ং প্রশস্ততে।

স্বয়ং সংস্রবতে গিরিতে নার্মদাজলে ॥

পুরা বাণাসুরেণাহং প্রার্থিতো নার্মদাতটে।

আবিরাগং গিরৌ তত্র গন্ধরূপী মহেশ্বরঃ ॥

বাণলিঙ্গমপি ধ্যাওমতোঃইৰ্ধা জগতীতলে।

অভেবাং কোটিলিঙ্গানং পূজনে যৎ ফলং লভেৎ ॥

তৎফলং লভতে মৰ্ত্ত্যো বাণলিঙ্গৈক পূজনায়ং ॥”

ইতি শব্দকল্পদ্রুমমধুত যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ॥

নার্মদা বিষ্ণু পরিত হইতে উৎপন্ন হইলেও রুদ্র দেহ সন্তুতা বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে যথা—

“নার্মদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা রুদ্রদেহা বি নিঃসৃত।

ভাঃস্বয়ং সৰ্বভূতানি স্থাবরাণি চরানিচ ॥”

ইতি শব্দকল্পদ্রুমমধুত মৎস্ত পুরাণম্ ॥

এখানে রুদ্র যে পরিত ব্যতীত আর কিছুই নহে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

বাণাসুরের রাজধানী শোণিতপুর ছিল। এই শোণিতপুর ইজিপ্তের শুন্ত্ (Shoont) বলিয়াই প্রকৃতবাবিৎ পণ্ডিতগণ নিরূপণ করিয়াছেন। সুতরাং বাণাসুর কর্তৃক কেবল যে বাণলিঙ্গেরই আবিষ্কার হয় তাহা নহে, শিব-লিঙ্গ পূজাও যে তৎকর্তৃক ইজিপ্তে প্রবর্তিত হয় আমরা এই সিদ্ধান্ত অনায়াসেই করিতে পারি। বাণ শিব পূজা প্রচারে এরূপই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন যে,

শিবের লিঙ্গ যেমন তাঁহার নিজের নামে পরিচিত হইয়া তাঁহাকে ধ্যস্ত করিয়াছে, তেমনই শিব স্বয়ং নিজের নমস্কার মধ্যে “বাণেশ্বর” নাম ধারণ করিয়া তাঁহাকে চিরস্মরণীয় ও চিরগৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছেন, যথা—

“বাণেশ্বরায় নরকার্ণব তারণায় জ্ঞানপ্রদায় করুণা-

ময় সাগরায়

কপূরকুম্ভধবলেন্দু জটাধরায় দারিদ্রাহঃখদহনায়

নমঃ শিবায় ॥

অনার্য্য অগতে বাণের দ্বারাই শিব পূজার প্রথম বিস্তার হয় বলিয়া উদারহৃদয় আৰ্য্যগণ শিবকে বাণেরই প্রচারিত ক্রমের বলিয়া নির্দেশ করতঃ শিবপূজার ইতিহাসে তাঁহাকে সর্বোচ্চ আসন প্রদান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই।

শিবলিঙ্গ যেমন শিলাতে পূজিত হন বিষ্ণুচক্রও যেমনই শিলাতে পূজিত হন। শিবকে আমরা বেদের রুদ্র বলিয়া বলিয়াছি বিষ্ণুও বেদের সূর্য্য। বেদে যে “ইদং বিষ্ণুঃচক্রমে ত্রেধানিদধেপদম্” “বিষ্ণু তিন পদ বিক্ষেপ করিয়াছিলেন” ইত্যাদি বর্ণনায় বিষ্ণুর উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা সূর্য্য পক্ষে ব্যাখ্যাত হইয়া বিষ্ণুর তিন পদ সূর্য্যের পূর্ণগগন মধ্যাহ্ন ও পশ্চিম গগনের গতি বলিয়াই নির্দেশিত হইয়াছে। বিষ্ণুর যে ধ্যান মন্ত্র আছে তাহাতেও “সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্তী” বলিয়াই তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই প্রকারে বিষ্ণু সূর্য্যের সহিত মূলতঃ অভিন্ন হওয়ায় সূর্য্যমণ্ডলের চিহ্ন চক্রই বিষ্ণুর চক্রচিহ্ন হইয়াছে। বিষ্ণুর এই চক্র চিহ্ন হইতেই শালগ্রাম নামক চক্রাকার শিলা বিষ্ণুরূপে পূজিত হইয়া থাকে। শিলাতে বজ্রের অধিষ্ঠান হইতেই যেমন তাহা শিবলিঙ্গ হইয়াছে, তেমনই শিলাতে সূর্য্যতেজের অধিষ্ঠান হইতেই তাহা সূর্য্যরূপী বিষ্ণুর চক্র হইয়াছে। বিষ্ণুচক্রোৎপত্তির বর্ণনা পুরাণে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে, যথা—

“তথেষ্টাক্ষা সরবিণা ভ্রমৌক্কা দিবাকরম্।

পৃথক্ চকার তন্তেজচক্রং বিকোরকল্পয়ৎ ॥

ত্রিশূলকাপি রুদ্রস্ত বজ্র মিত্রস্ত চাধিকম্ ॥”

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত মৎস্ত পুরাণে ১১ অধ্যায়।

এখানে আমরা সূর্যের তেজঃই যে ত্রিশূল (অগ্নি) ও বজ্রের মূল তাহা দেখিতে পাইতেছি। বস্তুতঃ অগ্নি, বজ্র বা বিদ্যুৎ, এবং সূর্য্যাকরণ যে মূলে একই পদার্থ, এবং তিনটাই যে এক তেজেরই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র, বেদ-পুরাণে আমরা তাহার পারস্পরিক প্রমাণই প্রাপ্ত হই।

এই প্রকারে বজ্রাগ্নি সূর্য্যতেজের সহিত আভ্যন্তরীণ হওয়ার তেজঃগতির সূর্য্য তেজেরও যে প্রস্তরের মধ্যে বিশেষ অধিষ্ঠান করিত হইবে তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়।

শালগ্রাম শিলার উৎপত্তিবিবরণ পাঠ করিলে শিলাতে শিবলিঙ্গ পূজা হইতেই যে শালগ্রাম শিলাচক্রে বিষ্ণুপূজার কল্পনা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই থাকে না। উক্ত বিবরণে শালগ্রাম-শিলাগিরি যেমন শিবলিঙ্গাধিষ্ঠিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তেমনই শিবস্বরূপ বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছে যথা—বরাহ উবাচ

কথয়িষ্যামি তে গুহ্যং শালগ্রামমিতি শ্রুতম্।

তস্মিন্ ক্লেদে হরদেবো মৎস্বরূপেণ সংযুতঃ ॥

শালগ্রামে গিরৌ তস্মিন্ শিলারূপেণ তিষ্ঠতি।

অহং তিষ্ঠামি তত্রৈব গিরিরূপেণ নিত্যতঃ ॥

তস্মিন্ শিবাঃ সমগ্রান্ত মৎস্বরূপা ন সংশয়ঃ।

পূজনীয়াঃ প্রযত্নেণ কিংপুনশ্চক্রে লাক্ষিতাঃ ॥

লিঙ্গরূপেণ তু হরন্তত্র দেবালয়ে গিরৌ।

শিবনাভাঃ শিলাস্তত্র চক্রনাভান্তথাশিলাঃ ॥

সোমেশ্বরাদিষ্ঠিতস্ত শিবরূপোগিরিঃ স্মৃতঃ ॥

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত বারাহে সোমেশ্বরাদি লিঙ্গমহিমা বিমুক্তিক্রমে ত্রিবেণ্যাদিমহিমা নামাধ্যায়ঃ।

শিলাতে শিবপূজার আশ্রয়, শালগ্রামশিলাতেও বিষ্ণু পূজার মাহাত্ম্য সর্বাঙ্গেক্ষা অধিক বলিয়া শাস্ত্রে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে, যথা—

“শালগ্রাম শিলা যত্র ভক্ত সন্নিহিতোহস্মিঃ

শালগ্রামশিলা যত্র যত্র দ্বারবর্তী শিলা

মূলে বিষ্ণুপুরং যাতি কৃতার্থঃ যোঽর্জনভ্রমঃ ॥

ভ্রমঃ পূজা হোমশ্চ সৰ্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ ॥”

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত পাণ্ডে পাতাল ধণ্ডে ১১ অধ্যায়।

‘শালগ্রাম চক্র’ ‘মান্লে শালগ্রাম না-মান্লে শিলা’ প্রভৃতি প্রচলিত কথাতেও শিলারূপের সবিশেষ মাহাত্ম্যেরই প্রমাণ পাওয়া যায়।

যেমন ‘বাগলিঙ্গ’ শিবের সর্বাংকুষ্ঠ শিলারূপ তেমনই ‘শালগ্রামচক্র’ বিষ্ণুর সর্বাংকুষ্ঠ শিলারূপ। ইহাতে শিব ও বিষ্ণুই যে শিলাপূজার মূল দেবতা, তাহাই আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

পূর্বেকৃত ‘বাগলিঙ্গ’ ও ‘শালগ্রামচক্র’ নির্দোষন সম্বন্ধে শাস্ত্রে বেরূপ বিস্তারিত বিচার পাওয়া যায়, তেমনই ইহাদের পূজা সম্বন্ধেও বহুবিধ ব্যবহার উল্লেখ দেখা যায়। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যাউতে পারে যে, শিলা-পূজা ভারতে কেবল যে উৎপন্ন হয় তাহা নহে, ভারতে ইহা পূর্ণ বিকাশও প্রাপ্ত হয়। প্রতিমা পূজাকে আমরা লিঙ্গ ও চক্রপূজারই শেষ বিকাশ বলিয়া মনে করি।

ভারতকে আমরা শিলা পূজার মূলস্থান বলিয়া প্রতিপাদিত করিয়াছি। এক্ষণে এই শিলা পূজার প্রচার বিদেশে কিরূপে হয়, তাহাই আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব।

পূর্বে আমরা বলিয়াছি, ইজিপ্টের রাজা বাগাসুর লিঙ্গপূজা গ্রহণ ও প্রচার করিয়া সবিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেন। শ্রীকৃষ্ণ-পোত্র অনিরুদ্ধ বাগকন্যা উবার পাণিগ্রহণ করেন এবং এতদুপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বাণের রাজধানী শোণিতপুরে উপস্থিত হন, এইরূপ পুরাণকাহিনী আছে। সুতরাং বাগাসুর যে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক ছিলেন ইহা দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। মহাভারতে বলরামের দেহভ্যাগবর্ণনার দেখা যায় যে, তাহার মূখ হইতে সর্পগণ নির্গত হইয়া সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়



এবং মিশ্র প্রকৃতি জাতি; কর্তৃক তৎসমস্ত অভিনন্দিত হয়। এই মিশ্রজাতি আমাদের নিকট মিশরজাতি বলিয়াই বোধ হয়, কারণ পুরাণাদিতে ইজিপ্ত মিশ্রদেশ বলিয়াই কথিত হইয়াছে এবং এই মিশ্র নাম হইতেই বর্তমান মিশর নামের উৎপত্তি হইয়াছে। বলরামের মুখনির্গত সর্পগণ ত্রায় বংশধরগণ বা তাত আর কেহই নহেন। সুতরাং আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, বাণেশ্বর প্রথম ইজিপ্তে শিবপূজা প্রচার করিলেও, বলরামবংশধরগণ কর্তৃক ইজিপ্তে ও অপর অনার্য্য দেশে প্রকৃতপক্ষে শিবপূজা প্রচারিত হয়। বলরাম বংশধরগণ প্রথম বেবিলনেই উপনিবেশ সংস্থাপন করেন বলিয়া বোধ হয়—তাহাতেই সম্ভবতঃ তাঁহারই নাম হইতে বেবিলন নাম হইয়াছে। বলরাম ও ত্রীকৃষ্ণ যুগপৎবতার ছিলেন। বলরাম শিবেরই রূপ এবং ত্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুরই রূপ। সুতরাং বলরাম ও ত্রীকৃষ্ণে শিব-বিষ্ণুরই মিলন হইয়াছে। বলরামবংশধরগণ তাঁহাদের বংশের এই আদর্শই যে নিজেরা পূজা করিবেন এবং অজ্ঞাতও প্রচার করিবেন তাহা সম্পূর্ণই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। বলরাম বা বলদেবই বেবিলন ও অজ্ঞাত বেয়েল (Baal) দেব হইয়াছেন। এই শিববিষ্ণুর সম্মিলিত আদর্শের নামে যেমন আমরা শিবাবতার বলরামেরই প্রাধাণ্য দেখিতে পাই, তেমনই রূপেও শিবরূপেরই প্রাধাণ্য দেখিতে পাই।

ফিনিসীয়া প্রাচীন নিদর্শনের মধ্যে পূর্বোক্ত আদর্শের যে প্রতিকৃতি পাওয়া গিয়াছে, ১৯০৪খৃঃ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট মাসের কোর্ট পত্রিকায় ডাক্তার পল কেরাস তাহার এইরূপ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন —

“Baal Human on Votive Stones, Found at Cita, the present Constantine, Algiers. On one of the stones the god holds in his hand a branch, the symbol of vegetation and the rejuvenescence of life, on the other, the wand of Hermes, representing the solar disc, surrounded by the crescent, an emblem, that later on,

when no longer understood, was misinterpreted as two intertwined serpents.”

এখানে ডাক্তারের মতে স্বর্ঘ্যচক্র ও অর্ধচন্দ্রচিহ্নটিকেই পরবর্তী বাধ্যাকর্ষণ ভাবে সর্পাকৃতি বলিয়া মনে করিয়াছেন। যেরূপেই হউক ইহাতে আমরা শিব-বিষ্ণুর সাক্ষ্যমূল্য দেখিতে পাই। অর্ধচন্দ্র শিবেরই বিশেষ চিহ্ন; তাহাতেই তিনি অর্ধেন্দ্রশেখর। এ দিকে সর্পও তাঁহার চিহ্ন। তাহাতেই তিনি কলীভূষণ।

কার্ষেপে আবিষ্কৃত প্রতিকৃতি ও মুদ্রিত লিপির যে বিবরণ তিনি ঐ প্রবন্ধেই প্রদান করিয়াছেন তাহাও পূর্বোক্ত মতেরই পোষকতা করে। সেই বিবরণ এই —

“From the votive tablets of Carthage we reproduce one that is interesting in more than one respect. The inscription which stretches over the middle of the slab reads —

To the Lady Tanit-Pene-Baal and to the Baal Hammen in redemption of his vow Abdashman, son of Shafet.”

Above the inscription we see Astarte, the Lady of the countenance of Baal, holding in her hand the symbol of her divinity, a disc within a crescent.” Stone worship. pp. 42-50.

এখানে যেন আমরা হরগৌরী রূপেরই চিত্র পাইতেছি। গৌরীর অর্ধমুখ হরের অর্ধমুখের সহিত মিলিত হইয়া হরগৌরী রূপ হইয়াছে বলিয়াই অষ্টান্তি দেবী Baal এর মুখরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টান্তির যেরূপ অর্ধচন্দ্র চিহ্ন, গৌরী বা দুর্গারও তদ্রূপ অর্ধচন্দ্র চিহ্ন; যথা দুর্গার ধ্যান, “কটাজুট সমাযুক্তমর্ধেন্দ্রকৃত শেখরাম্ ॥” শিবের এক নাম যে ‘বাণেশ্বর’ বাণেশ্বরের লিঙ্গ হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শিবের এই ‘বাণেশ্বর’ নামের অপভ্রংশেও Baal হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে।

Baal এর সহিত যে Hammen নামের যোগ উপরে

পাওয়া গিয়াছে, ডাক্তার কেরস বলেন তাহা ইজিপ্তের Ammon নাম হইতেই গৃহীত। যথা Baal Hammen (the Phœnician name for the Egyptian Ammen) ইজিপ্তের Ammen নামটিকে আমরা সংস্কৃত অশ্বিন শব্দেরই অপভ্রংশ বলিয়া মনে করি। অশ্বিন শব্দের অর্থ প্রস্তুত। সুতরাং Ammen শিলালিঙ্গমূর্তি বুঝায় বলিয়াই আমাদের নিকট বোধ হয়।

আরবের কাবামন্দিরের কৃষ্ণপ্রস্তর ঋতুতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাহা এখনও তথায় বর্তমান রহিয়াছে। এই কৃষ্ণপ্রস্তর আমাদের নিকট শিবলিঙ্গের মূর্তি বলিয়াই বোধ হয়। ইহার প্রমাণস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মুসলমানদিগের মধ্যে এখনও প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, হিন্দুর শিব কাবাতে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। যদি হিন্দুগণ ইহার মাথায় কোন মতে বেলপাতা দিতে পারে, তবে শিব সমস্ত মুসলমানেরই ধ্বংস সাধন করিবেন। এই সংস্কারের বশবর্তী হইয়াই না কি মুসলমানগণ স্বধর্মে দীক্ষিত না করিয়া কাহাকেও কাবাতে প্রবেশ করিতে দেয় না।

ভবিষ্যপুরাণে মকায় ‘মুক্তেশ্বর’ শিব থাকার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ‘মুক্তেশ্বর’ নাম হইতেই মক্কা নাম হইয়া থাকিবে। আরবের ইতিহাসে সারস্বত ব্রাহ্মণ বংশ আরবে রাজত্ব করার বিবরণ পাওয়া যায়, এবং তাহাদের একজনের নাম ‘মুক্তেশ্বর’ থাকারও উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই মুক্তেশ্বরই পুরোক্ত মুক্তেশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠাতা।

শিবপূজা কেবল আসিয়া ও আফ্রিকাতেই আবদ্ধ থাকে নাই। ইহা অতি প্রাচীন কালেই ইউরোপে প্রায় সর্বত্রই ব্যাপ্ত হয়। তাহাতেই স্কেন্ডিনেভিয়া ও ব্রিটেন পর্যন্ত ইহার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সমস্ত স্থানের ক্রম্‌লেক্ (Cromlech), মেন্‌হির (Menhir) এবং টিউমুলি (Tumuli) প্রভৃতি প্রস্তরস্তম্ভসকলে যে সর্পিচিহ্ন বর্তমান দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতেই

এই সমস্ত যে লুপ্ত লিঙ্গপূজারই ধ্বংসাবশেষ তাহাই অনুমান হয়। সর্প বিশেষরূপে শিবের সহিতই সংযুক্ত তাহাতেই তিনি ‘নগিকেশ’, ‘নাগহার’, ‘অহিভূষণ’ প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। সুতরাং সর্পিচিহ্ন যে শিবলিঙ্গেরও জ্ঞাপক হইবে তাহা বুঝিতে পারা যায়। ফরাসীদেশের পিরীনিস্ (Pyrenees) পর্বতে লিঙ্গপূজার স্পষ্ট প্রমাণই পাওয়া গিয়াছে। তথায় এখনও মেন্‌হির প্রস্তর লিঙ্গরূপে পূজিত হইয়া থাকে। এই সমস্তের মধ্যে মধ্যবিন্দুযুক্ত একটি বৃত্ত চিহ্ন ○ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইহা শিবেরই জ্ঞাপক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ইহা আমাদের নিকট সূর্য্যচন্দ্র চিহ্নেরই সংমিশ্রণ বলিয়া বোধ হয়। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়ারলণ্ড, ব্রিটেনী, স্কেন্ডিনেভিয়া এবং ইউরোপের অপরাপর অংশে প্রস্তরের উপর যে সমস্ত চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের সহিত বাগানসৌর যোনিচিহ্নের অতি আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্যই দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল যে ইউরোপেই লিঙ্গ পূজা প্রচারের প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা নহে, আমেরিকায় পর্যন্ত যে ভারতীয় শিবোপাসকগণ কর্তৃক লিঙ্গপূজা প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত সম্বন্ধে এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় জে এইচ রিভেট কার্কে (J. H. Revett Carnac) যে গভীর গবেষণাপূর্ণ আলোচনা মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহা হইতে আমাদের উপরিউক্ত বক্তব্যের সমর্থন হয়। \*

\* “The serpent appears on the prehistoric cromlechs and menhirs of Europe, on which as stated in my paper on Kumaon Rock carving published in the Society Journal for January 1877, I believe the remains of phallic worship may also be traced. What little attention I have been able to give to the serpent symbol, has been chiefly in its connection with the worship of Mahadev or Siva with a view to ascertain whether the worship of the snake

তাহার পর্যাশোচনা হইতে আশ্রয় দেখিতে পাই যে  
পৃথিবীর সমস্ত বিশালপুঞ্জাই একত পক্ষে ভারতের শিবলিঙ্গ  
পূজার সহিত সম্বন্ধ।

ত্রিভুজলিঙ্গ চক্রবর্তী।

and that of Mahadeb or the phallus may be considered identical, and whether the presence of the serpent on the preshistoric remains of Europe can be shown to support my theory that the markings on the cromlechs and menhirs are indeed the traces of this form of worship, carried to Europe from the East by the tribes whose remains are buried beneath the tumuli.

I have now to state briefly the direction in which I would desire that these imperfect notes should be considered to lead. As the Society know, I have for sometime past been endeavouring to collect information on the points of resemblance between the tumuli of India, and the well-known types of Scandinavia, of Brittany, and of the British Isles. In my paper on the Kumaon Rock markings, besides noting the resemblance between the cup-markings of India and of Europe—I hazarded the theory that the concentric circles and certain curious markings of what some have called the “jews-harp” type, so common in Europe, are traces of phallic worship, carried there by tribes, whose hosts descended into India, pushed forward into the remotest corners of Europe and as their traces seem to suggest, found their way on to the American continent also.

No one who compares the stone *yonis* of Benares, sent herewith, with the engravings in the first page of the work on the rock markings of Northumberland and Argyleshire,

published privately by the Duke of Northumberland, President of the New Castle Society of Antiquaries, which is also set for the inspection of the Society, will deny that there is an extraordinary resemblance between the conventional symbol of Siva-worship of to-day and ancient markings on the rocks, menhirs and cromlechs of Northumberland of Scotland, of the Island of Brittany, of Scandinavia and other parts of Europe. And a further examination of the forms of the cromlechs and tumuli and menhirs, will suggest that the tumuli themselves were intended to indicate the symbols of the Mahadeb and *yoni*, conceived in no obscene sense, but as representing regeneration, the new life, “life out of death, life everlasting,” which those buried in the tumuli, facing towards the sun in its meridian, were expected to enjoy in the hereafter.

Many who indignantly repudiate the idea of the prevalence of phallic worship among our remote ancestors, hold that these symbols represent the snake or the sun. But admitting this, may not the snake after all, have been but a symbol of the phallus? And the sun, the invigorating power of nature, has ever, I believe, been considered to represent the same idea, not necessarily obscene, but the great mystery of nature, the life transmitted from generation to generation, or as Prof. Stephen puts it, “life out of death, life everlasting.” The same idea in fact which, apart from any obscene conception, causes the rude Mahadeb and *yoni* to be worshipped daily by hundreds of thousands of Hindus.

In a most interesting paper recently read at the Society of the Antiquaries of France, some extracts of which I am now preparing for the Society, the authors M. M. Edward

It might be expected that Naga or Cobra would be seen at its best in the carvings or idols of Nageswar, the Cobra or Snake Temple of Benares \* \* \* \*. A Bull or Nandi and Cobra faced Mahadeb. The contents of the inner temple were peculiar. The Mahadeb consists of broad blackstone in shape something like a tumulus. Further enquiry has confirmed the opinion expressed by me and supported by Mr. Campbell of Italy in my paper on Kumaon rock markings, that whatever, it may have meant on Europe, in India the sign ☉ means Mahadeb. There seems to be little doubt that at Nageswar the snake god is Mahadeb himself or that he is worshipped under that name and that Nageswar is a temple of Siva or Mahadeb in the form of a Naga or Cobra. The snake symbol in India, especially in connection with the worship of Siva by J. H. Rivett Carnac, Esqr, Journal of the Asiatic Society of Bengal. No 1, 1879.

ভাব ১৯৯১

নামে পরিচিত। ইনি মিসরদেশের দ্বিতীয় স্ট্রামি।  
অন্যকিম মাসিডনিয়ার অধিপতি এন্টিগনাস (Antio-  
gonos)। মক সাইরিগের অধিপতি মগস (Magus)।  
অলিকসন্দের ইপিরাসের (Epirus) অধিপতি দ্বিতীয়  
আলেকজান্ডার (Alexander)। ইনি খৃষ্টপূর্ব ২৬৮ অব্দ  
হইতে ২৫১ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন।

যবনরাজগণের সহিত ভারতবর্ষীয় নরপতিগণের  
অন্যান্য তিন বার সংঘর্ষ হইয়াছে। প্রথমতঃ মাসিড-  
নিয়ার অধিপতি সুবিখ্যাত অলিকসন্দর, দ্বিতীয়তঃ  
সিরিয়ার অধিপতি সিলুকস নিকেটর, তৃতীয়তঃ বেক-  
ট্রিয়ার অর্থাৎ বাজিলিক প্রদেশের অধিপতি মিনাভার।  
মিনাভার ভারতবর্ষে মিলিন্দ নামে বিখ্যাত।

সম্রাট অলিকসন্দের সময়ে উত্তরাংশে পনানন্দ  
সম্রাট ছিলেন। তাঁহার রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে  
ছিল; শতক্রন্দী পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল।  
পঞ্জাব প্রদেশ কতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল।  
কোন কোন রাজ্যে নরপতি ছিল, কোন কোন রাজ্যে  
প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রচলিত ছিল। প্রজাতন্ত্র শাসন  
প্রণালী ইয়োরোপের একচেটিয়া নহে, খৃষ্টপূর্ব সপ্তম  
শতাব্দীতেও ভারতের কোন কোন প্রদেশে প্রজাতন্ত্র  
শাসন প্রণালী প্রচলিত থাকার প্রমাণ আছে।

সম্রাট অলিকসন্দের পঞ্জাবে অবস্থান করার সময়ে  
চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার শিবিরে গমন করিয়া পাটলিপুত্র নগর  
আক্রমণ করিতে অজুরোধ করেন, যবনরাজ সে অজুরোধ  
রক্ষা করিতে পারেন নাই। যবন ইতিমধ্যে লেখক-  
গণ বলেন যে, তাঁহার সৈন্তগণ শতক্রন্দী আতিক্রম  
করিতে অসীকার করিয়াছিল।

সিলুকস নিকেটর ভারতবর্ষ আক্রমণ করার সময়ে

\* কপিলাবন্ত (শাক্যগণ); কুশীনগর (মল্লগণ);  
বিহলি ও বৈশালী (ত্রিভিগণ)।

Buddhist India, Rhys Davids. Chap I.

প্রঃ-সঃ।

বৌদ্ধাধ্য চন্দ্রগুপ্ত তাঁরতের সম্রাট ছিলেন। সিলুকস  
চন্দ্রগুপ্তের নিকট তাঁহার তনয়া সম্রাটান করিয়া  
স্বরাজ্যে প্রস্থান করেন। পঞ্জাব প্রদেশ এই সময়ে  
বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। চন্দ্রগুপ্ত যবনরাজ-  
নন্দিনীর পাণগ্রহণ করা যবন ইতিমধ্যে লেখকগণ  
প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় কোন গ্রন্থে এই  
বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না, কিন্তু এই বৃত্তান্ত কল্পনা-প্রসূত  
বলিয়া বোধ হয় না। তৎকালে কাতিচেদের এতাদৃশ  
কঠোরতা ছিল না। সমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত  
ছিল। সম্রাট অশোকের জননী ব্রাহ্মণ-তনয়া ছিলেন,  
কাতিচেদের এতাদৃশ কঠোরতা থাকিলে ইহা সম্ভব  
হইত না। তৎকালে বিদেশীয় ব্যক্তিগণ হিন্দু সমাজে  
প্রবেশ করিতে পারিত এবং বিদেশীয় ব্যক্তিগণ ভারত-  
বর্ষে প্রবেশ করিয়া হিন্দুসমাজভুক্ত হওয়ার ত্বরিত্তি  
দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

যবনরাজ মিলিন্ডের সময়ে পুণ্ড্রিয়ার যবনগণের অধী-  
শ্বর ছিলেন। পতঞ্জলি মহাত্মা ইহার প্রমাণ আছে।

অরুণ্য যবনঃ যাকৈতম্

অরুণ্য যবনঃ মাধ্যমিকান্

ইহ পুণ্ড্রিয়ার যবনগণঃ।

যবনরাজ মিনাভার পতঞ্জলির সময়ে সাক্ষ্যে  
(অর্থাৎ উত্তর কোশল এবং মাধ্যমিকা অবরোধ  
করেন। চিতোর হইতে সার্ক পঞ্চকোশ উত্তরে নাগরী  
নামক স্থান পূর্বে মাধ্যমিকা বলিয়া কথিত হইত।  
তিনি পুণ্ড্রিয়ার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন।  
মিনাভার পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। মিলিন্দ পন্থেই  
অর্থাৎ মিলিন্দপ্রণ নামে একখানা গ্রন্থ আছে ইহা  
পালি ভাষায় রচিত। এই মিলিন্দই বেকট্রিয়ার নরপতি  
মিনাভার। কাবুল প্রদেশ তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল।  
তিনি খৃষ্ট পূর্ব ১৫০ অব্দে পুণ্ড্রিয়ার কর্তৃক পরাজিত  
হইয়াছিলেন।

পুণ্ড্রিয়ার অধর্মযুক্ত যবন কবিরাহিলেন। মহাকবি

কালিদাসের মালাবিকার্মিহিত্র নাটকে পুষ্পমিত্রের অশ্বমেধ বল্লের উল্লেখ আছে। মহাবি পতঞ্জলি এই যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। সেজন্য মহাবি তাঁহার মহাভাষ্যে লিখিয়াছেন —

“ইহ পুষ্পমিত্রঃ যজ্ঞসামঃ”

বৃহস্পতির পুরাণে যে কলিতে সমুদ্রযাত্রা অশ্বাকার অশ্বমেধযজ্ঞ প্রকৃতির নিবেদন হইতে বাক্য দৃষ্ট হয়, তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই একপ উপলক্ষি হয় : নতুবা মহাবি পতঞ্জলি পুষ্পমিত্রের অশ্বমেধযজ্ঞে ব্যাপ্ত হইতেন না।

চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব সময়ে সিলুকস নিকেটর একজন দূত প্রেরণ করেন। এই দূতের নাম মিগাসথিনিস। ইনি দীর্ঘকাল পাটলিপুত্র নগরে অবস্থান করেন। মিগাসথিনিস ভারতবর্ষের তদানীন্তন ইতিবৃত্ত লিখিয়াছিলেন। সে গ্রন্থ এক্ষণ অপ্রাপ্য। পরবর্তী যবন ইতিবৃত্ত লেখকগণ এই গ্রন্থের বৃত্তান্ত স্থানে স্থানে লিখিয়াছেন। ক্রমেক ইয়োরোপীয় পাণ্ডিত পরবর্তী যবন লেখকগণের গ্রন্থ হইতে এই সমস্ত বিষয় উদ্ধৃত করিয়া তাহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। অধ্যাপক যেক্রিওল তাহা ইংরেজি ভাষায় অনূদিত করিয়াছেন। কিয়ৎকাল হইল অধ্যাপক রজনীকান্ত গুহ বুল গ্রন্থ বঙ্গ ভাষায় অনূদিত করিয়াছেন :

যবন ইতিবৃত্ত লেখকগণের গ্রন্থে গেজেরিডি নামে একটি প্রদেশের উল্লেখ আছে। ইহার মিগাসথিনিসের গ্রন্থ হইতে এই প্রদেশের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মিগাসথিনিসের বুল গ্রন্থ বিগুপ্ত হওয়ারূপে ইহার সম্যক বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। রোমেন কবি ভাকিলের গ্রন্থেও গেজেরিডির অধিবাসীগণের উল্লেখ আছে। গেজেরিডি রাজ্য কোন কোন স্থানে গেজেরিডর বলিয়াও অভিহিত হইয়াছে। এই রাজ্য কোনস্থানে কোন্ সময়ে বর্তমান ছিল তাহার বৃত্তান্ত প্রদান করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

যবন ইতিবৃত্ত লেখক দায়দরা (Diodorus) মিগাস-

থিনিসের গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে যে, গঙ্গানদী হিমালয় পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। তদনন্তর এই নদী মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। এই নদী গেজেরিডরগণের প্রদেশের পূর্বসীমা। ইহাদের মধ্যে অসংখ্য বিপুলকায় হস্তী আছে। একজন বিদেশীয় কোন নরপতি ইহাদের রাজ্য জয় করিতে পারেন নাই। অসংখ্য জাতিগণ এই রাজ্যের অসংখ্য বিপুলকায় হস্তীগণের পরাক্রমে ভীত।

মিনি বলেন গঙ্গানদীর শেষভাগ গেজেরিডিগণের দেশের মধ্যাদিয়া প্রবাহিত। গেজেরিডি কলিক্তের রাজধানী পার্শ্বলিস। এই দেশের নরপতির ৬০০০ পদাতি ১০০০ অশ্বরোহী এবং ৭০০ রণকুঞ্জর সৈন্য সর্বদা থাকে।

সলিন নামক অন্য একজন যবন লেখক বলেন যে, গঙ্গানদীর যে স্থানে সর্দাপেকা নান গ্রন্থে স্থান ৮ বাটল এবং যেখানে সর্দাপেকা অধিক স্থান ২০ বাটল। যেস্থান সর্দাপেকা নান গভীর সেস্থান ১০০ ফুট গভীর। এই নদীর সর্বশেষ স্থানের নিকট বাহারী বাস করে তাহাদিগকে গেজেরিডি বলে। এই প্রদেশের নরপতির সৈন্যসংখ্যা ৬০ হাজার পদাতি, ১ হাজার অশ্বরোহী এবং ৭০০ রণকুঞ্জর।

ভুগোলবেত্তা টলেমি বলেন যে, গঙ্গানদী যেস্থানে সাগরে প্রবেশ করিয়াছে তাহার নিকটে গেজেরিডিগণ বাস করে। এই প্রদেশের নরপতি গদে নামক নগরে বাস করেন।

একজন অজ্ঞাতনামা যবন লেখক বাগিডোর ইতিহাস লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থ খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীতে রচিত। \* ইহাতে লেখা আছে গঙ্গানদী ভারতবর্ষে সর্দাপেকা বৃহৎ নদী : এই নদীর তীরে গদে নামক

\* বোধ হয় লেখক The Periplus of the Erythraean sea গ্রন্থের উল্লেখ করিতেছেন—প্রঃ সঃ।

একটি নগর আছে সেখানে পান, জটামাংসী, মুক্তা এবং অতি পুষ্কর মসলিন বস্ত্র ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। এই নদীর নিকটে একটি দ্বীপ অবস্থিত।

রোমক কবি ভার্জিল এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার মন্দিরের দ্বারে গেদেরিডিগণের বুদ্ধ-বৃত্ত অঙ্কিত করিবেন।

এই সমস্ত উপাদান হইতে গেদেরিডি রাজ্যের কাল এবং বিস্তৃতি নির্ণয় করিতে হইবে।

মৌর্য সাম্রাজ্য চন্দ্রগুপ্তের সময়ে মিগাসথিনিস ভারতবর্ষে আগমন করেন। মিগাসথিনিস গেদেরিডি রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্তের অব্যবহিত পূর্বে মল্লবংশীর ধর্মামল উত্তরাংশে সাম্রাজ্য ছিলেন। অতএব মল্লবংশীর নরপতিগণের সময় হইতে গেদেরিডি রাজ্যের উদ্ভব অনুমান করা যাইতে পারে। তৎপূর্বে গেদেরিডি রাজ্যের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই।

খুষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভূগোলবেত্তা টলেমি বর্তমান ছিলেন। ইনি প্রিয়দর্শীর অনুশাসনের উল্লিখিত ভূখণ্ডের টলেমি নহে। টলেমির গ্রন্থেও গেদেরিডি রাজ্য বর্তমান থাকা দৃষ্ট হয়। এ প্রদেশের খুষ্টাব্দের তৃতীয় শতাব্দীর ইতিহাস অমানিশার শালবৃক্ষ-সম্বিত্তি অরণ্যানীর গভীরতম অন্ধকারে সমাহৃত। সে অরণ্যানীতে কোনোকার আলোকও দৃষ্ট হয় না।

খুষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্তবংশীর চন্দ্রগুপ্ত মগধে সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এই চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্তের উৎকোণ লিপিতে উবাক এবং সমস্তট প্রদেশের উল্লেখ আছে।

অতএব খুষ্টাব্দের তৃতীয় শতাব্দীর কোন সময়ে গেদেরিডি রাজ্য বিলুপ্ত হইরাছিল।

একজন গেদেরিডি রাজ্যের বিস্তৃতির বিষয় আলোচনা করা বাঞ্ছনীয়।

দারিদ্র্য যে লিখিয়াছেন যে, গঙ্গানদী গেদেরিডি

রাজ্যের পূর্ব সীমার প্রবাহিত তাহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। কারণ মৌর্য সাম্রাজ্য চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যের পূর্ব সীমা হইতে গেদেরিডি রাজ্য আরম্ভ; অর্থাৎ গেদেরিডি রাজ্যের পশ্চিম সীমা মৌর্যসাম্রাজ্য, পূর্ব-সীমা গঙ্গানদী হইলে এপ্রদেশ ক্ষুদ্রপ্রদেশ হয়, এরূপ ক্ষুদ্র প্রদেশের নরপতির সর্বদা ৬০ সহস্র পদাতা সৈন্য থাকা বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। অসংখ্য বিপুল-কায় রণকুঞ্জর দ্বারা ইহা গঙ্গানদীর পূর্বদিকে বিস্তৃত বলিয়া অনুমান হয়। পূর্ববঙ্গ বিপুলকার কুঞ্জরের আশ্রয়স্থান। বিশেষতঃ দায়দরার এই উক্তি পরবর্তী লেখকগণের উদ্ভার বিকৃত।

মৌর্য সাম্রাজ্য গেদেরিডি রাজ্যের পশ্চিম সীমা ছিল। অতএব মৌর্য সাম্রাজ্যের পূর্বসীমা নির্ধারিত হইলেই গেদেরিডি রাজ্যের পশ্চিম সীমা নির্ধারিত হইবে। প্রাচীনকালে 'বঙ্গ' বলিলে পূর্ববঙ্গ বুঝাইত। পশ্চিমবঙ্গ তৎকালে রাঢ়, লাড়, বা বঙ্গদেশ বলিয়া কথিত হইত। তাহার উত্তর-পশ্চিমে বঙ্গদেশ অবস্থিত ছিল।

রাঢ় এবং বঙ্গদেশ সেনরাজ্যগণের সময়ে এবং বোধ হয় ধর্মপাল এবং দেবপালের সময়ে একরাজ্যভূক্ত ছিল। অতঃপর কোন সময়ে এই দুই প্রদেশ এক রাজ্য ভুক্ত থাকা অনুমান হয় না। সুবিখ্যাত সমুদ্রগুপ্তের সময়ে রাঢ় প্রদেশ সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যভুক্ত ছিল, কিন্তু পূর্ববঙ্গ বর্তমান রাজ্য ছিল।

বর্তমান আফগানিস্তান বেলুচিস্তান এবং পারস্তদেশের কিরদংশ চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। সিলুকস নিকেটর চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া এই স্থান ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিয়াছিলেন।

পূর্বদিকে বঙ্গদেশ চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য ভুক্ত থাকার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁহার পৌত্র অশোকের সময় তিনি বঙ্গদেশে আধিপত্য স্থাপন করেন অনুমান করা যাইতে পারে, কারণ খুষ্টাব্দের দ্বিতীয়



শতাব্দীতে ইরাণচাও সম্রাটের অশোকের চৈতী দর্শন করিয়াছেন। অশোকের পরে মৌর্যসাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়।

এই সময় অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া রাষ্ট্র প্রদেশের পশ্চিম সীমা গেজেরিডি রাজ্যের পশ্চিম সীমা বলিয়া নির্ধারণ করা বাইতে পারে।

অজ্ঞাতনামা যবন লেখকের গ্রন্থে লিখিত আছে যে, গেজেরিডি রাজ্যের অন্তর্গত পদ্মানদীর নিকটে সুবর্ণময় একটি দ্বীপ আছে। যবন লেখকগণ অনেকই নানা প্রকার কথা প্রবণ করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এক্ষণে এই বৃত্তান্ত উপস্থাপনের মত বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক ইহা উপস্থাপন বা গল্প নহে; ইহার ভিত্তরে সত্য নিহিত আছে।

বর্তমান কালে গঙ্গার মোহনায় হিত সন্দীপকেই গ্রীকলেখকগণকথিত সুবর্ণদ্বীপ বলিয়া বোধ হয়।

খৃষ্টাব্দের পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে খৃষ্টাব্দের তৃতীয় শতাব্দীর কোম সময় পর্য্যন্ত গেজেরিডি রাজ্য বর্তমান ছিল, তদন্থে অশোকের সময়ে তিন এ প্রদেশের কিয়দংশে কিয়ৎকালের জন্য আধিপত্য স্থাপন করেন।

এই রাজ্যের নরপতি পরাক্রান্ত ছিলেন, তাহার ৬০ সহস্র পদাতি, একসহস্র অশ্বরোহী এবং সাত শত যুদ্ধহস্তী দ্বারাই পরাক্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। রোমককবি তালিসী এক্ষণে গেজেরিডিগণের যুদ্ধবৃত্ত অঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

গেজেরিডি নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে এতদ্রূপ বলা বাইতে পারে পদ্মানদী হইতে যবনগণ এই রাজ্য গেজেরিডি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

জিনির গ্রন্থে এই রাজ্য গেজেরিডি কলিঙ্গ বলিয়া উল্লেখ আছে। চোরমণ্ডল উপকূলের উত্তর হইতে সুবর্ণকুম্বির উপকূল পর্য্যন্ত সমস্ত উপকূল কলিঙ্গ বলিয়া

কথিত হইত। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত ছিল, যথা— কলিঙ্গ, মধ্যকলিঙ্গ, এবং মগ কলিঙ্গ।

গেজেরিডি রাজ্যের উপকূল মধ্যকলিঙ্গ বলিয়া কথিত হইত এক্ষণে প্লিনি এই প্রদেশ গেজেরিডি কলিঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

গেজেরিডি রাজ্যের রাজধানী প্রথমতঃ পার্বেলিস নগরে, পরে গঙ্গে নগরে ছিল।

পার্বেলিস নগর কোণায় ছিল তাহার নির্ণয় করা যায় না। গঙ্গে নগর সম্ভবতঃ সুবর্ণগ্রাম। গঙ্গে নগর গঙ্গার মোহনার নিকট এবং এ স্থানে আত্ম হস্ত মসলিন বস্ত্র ক্রয় বিক্রয় হইত। সুবর্ণগ্রাম পদ্মানদীর মোহনা হইতে অধিক দূরবর্তী নহে। বিশেষতঃ এই স্থানেই প্রাচীনকালে আত্ম হস্ত মসলিন বস্ত্র প্রস্তুত হইত।

জাহাঁগীর বাদশাহের সময়ে ঢাকা নগর সংস্থাপন হওয়ার পরে এই বস্ত্র ঢাকা মসলিন বলিয়া কথিত হইত।

কেহ কেহ গঙ্গে নগর তাম্রলিপ্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। তাম্রলিপ্ত পুরে সাগর তীরবর্তী ছিল, এক্ষণে তাহার ধ্বংসাবশেষ রূপনারায়ণ নদের তটে তমলুকে সাগর হইতে ত্রিশ কোশ ব্যবধান। তাম্রলিপ্ত এ প্রদেশে প্রধান বন্দর ছিল সন্দেহ নাই কিন্তু মসলিন বস্ত্রের জন্য তাম্রলিপ্ত বিখ্যাত ছিল না। বিশেষতঃ পদ্মানদীর মোহনা বাললে ভাগীরথীর মোহনা বুঝাইতে পারে না, পদ্মানদীর মোহনা বুঝাইবে। পদ্মানদীই প্রকৃত পদ্মানদী; ভাগীরথী শাখানদী মাত্র।

যবন ইতিবৃত্তলেখকগণ গেজেরিডি রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তাহাদের বর্ণনা অনুসারে এই প্রদেশের নরপতি পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। অথচ এই রাজ্য প্রায় ছয় শত বৎসর বর্তমান ছিল, পরে ইহার পতন হইয়াছে। কিন্তু এদেশের কোন গ্রন্থে এরাজ্যের বা এদেশের কোন নরপতির নামের উল্লেখ নাই।



বোধ হয় এই প্রদেশ তৎকালে অনার্যাদিগের নিবাস ছিল এবং অনার্যানরণতি এই প্রদেশে রাজত্ব করিতেন একত্ৰ ভারতবর্ষীয় কোন গ্রন্থে এপ্রদেশের উল্লেখ নাই। \*

শ্রীবেবতীমোহন গুহ।

## এই সমালোচনা

পাশ্চাত্যের কল্পনা—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

\* ইতিহাসে দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে কলিঙ্গ রাজ্য প্রবল পরাক্রান্ত ছিল। অশোককে সেই রাজ্য জয় করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। অসংখ্য প্রাণী কলিঙ্গযুদ্ধে মারা পড়িয়াছিল। কাকেই দেখাইতেছে যে, তৎকালে মৌর্য সাম্রাজ্যের সহিতও লড়িতে পারে এমন কেবলমাত্র এক কলিঙ্গ রাজ্যই ছিল। কলিঙ্গরাজ খারবেল ১৫৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন। কাকেই আমরা দেখিতেছি যে, অশোকের কলিঙ্গ যুদ্ধেই কলিঙ্গ রাজ্য নষ্ট হয় নাই। হাতীশুদ্ধা শিলালিপিতে দেখা যায় যে, অক্সরাক শাসকগণের সহিত খারবেলের বন্ধুতা ছিল। ভারতবর্ষের দক্ষিণে হিত এই দুই রাজ্যে বন্ধুতা থাকার উত্তরাপথের রাজগণ দক্ষিণ ভারতে যেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নাই।

প্রতিভা সম্পাদক।

ইহা একখানি কথা গ্রন্থ। “বধন বৌদ্ধধর্মের বড়ই প্রভাব তখন বুদ্ধদেবের পরম ভক্তেরা চালা করিয়া পাথর কাটিয়া আনিয়া বড় বড় স্তূপ নির্মাণ করিত এবং তাহার ঠিক দিকখানে বুদ্ধদেবের অস্থি রক্ষা করিত এবং সেই স্তূপকে বুদ্ধ ধর্ম ও সত্যের একত্র মিলন বলিয়া মহাত্ম্যেরে তাহার পূজা করিত; সেই স্তূপের চারিদিকে বড় বড় পাথরের রেল (বেটলী) দিত।

বামেণ খণ্ডে বেক্ট নামক স্থানে এইরূপ একটি প্রকাণ্ড স্তূপ ছিল। কালের কুটিল গতিতে বৌদ্ধধর্ম দিগের উৎপীড়নে সে স্তূপের অনেক ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। রেলিংয়ের যে অংশটুকু অতীত টাটকা ছিল, কানিংহাম সাহেব তাহা জুলিয়া আনিয়া কলিকাতার বড় বাজারে আবার সেইরূপে খাটাইয়া রাখিয়াছেন।” সেই বাজারে হিত রেলিংয়ের স্মৃতিস্থান। পাশ্বে তাহার ভগ্নকাল হইতে বাজারে আসা পর্যন্ত কি কি ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং অবগত হইয়াছে তাহারই ধারাবাহিক বিবরণ পাথরখানা নিজে বস্তুর আসন গ্রহণ করিয়া যেন বলিতেছে—ইহাই বর্তমান সমালোচনা গ্রন্থ।

রাখাল বাবু বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ব ও মুদ্রাতত্ত্ববিৎ। তাঁহার প্রত্নতত্ত্ব, মুদ্রাতত্ত্ব ও অক্ষরতত্ত্ববিষয়ক উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধগুলি এ পর্যন্ত এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ইণ্ডিয়ান এন্টিকোয়ারী, এপিগ্রাফিয়া ইত্যাদি জগৎবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্বালোচনার পত্রিকায়ই প্রকাশিত হওয়া আসিতেছে। তাহাদের কয়েকটির অনুবাদ সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায়ও প্রকাশিত হইয়াছে। জগতের পণ্ডিত-সমাজে রাখাল বাবু অনেক দিন হইতেই পরিচিত, কিন্তু বাল্যলী-পাঠক সাধারণের সহিত তাঁহার পরিচয় বেশী দিনের নহে। কিছুদিন হইতে তিনি আরও মাসিক পত্রের পট্টার বাল্যলী পাঠকগণকে ঘরা দিতেছিলেন, এবার প্রকাশ্যরূপে

বিশেষভাবে ধরা দিয়া পরিচয় স্থানিত করিয়া তুলিয়াছেন। তাহার মত পণ্ডিত ব্যক্তিকে বঙ্গবাণীর সের্বকরপে পাইয়া আমাদের অমনন্দে অবধি নাই।

আমাদের দেশের অনেক সুযোগ্য পণ্ডিতের অভিপ্রায় এই যে মাসিক পত্রিকার বিবর্তমান কালের পূর্ণ পরিবার জন্য ক্রমশঃ প্রকাশ আখ্যায়িকা বিভাগে অন্তর্ভুক্ত হইয়া রচনা লালসা-প্রকাশ করা রাখাল বাবুর উচিত হইতেছেন না। তাহার রাখাল বাবুকে প্রস্তুত ও মুদ্রিতের গহন কষ্টকরনে নির্বাসিত করিতে চাছেন। সাহিত্যের ভাষ্যলঙ্কারে তাহার প্রবেশ নিষেধ। যিনি অপব্যয় মধু মৌগাইতে পারেন, তিনি মধ্যে মধ্যে নির্মল জলভাও হস্তে আনিয়া উপস্থিত হইলে ব্যগ্র মধু লোভীর তাহা শ্রীতিজনক হয় সত্য, কিন্তু নির্মলজল পিপাসু ব্যক্তিরও অভাব নাই। তবে দৈবিত্তে হইলে যে তিনি মজুলগ্রহে রূপগতা করিতেছেন কি না। আমরা মধুলোভীর দলভুক্ত হইলেও জলের পিপাসাও আমাদের মধ্যে মধ্যে হয় এই দুর্বলতা স্বীকার করিতেছি। “তামাকের” সটকা হাতে পাইলে ভারী খুসী হইয়া যাই বটে কিন্তু ‘হুগে’ও আমাদের অরুচি নাই। প্রস্তুতচর্কা একরকম কঠিন নেশা, চক্ষিণ বটী যদি তাহাতেই ভোর হইয়া থাকিবার দজাজা হয় তবে প্রস্তুতচর্কের জীবন ভরাবহ হইয়া উঠিবে। মাঝে মাঝে সে যদি সাদা ভাষার দুই চারিটা সুখ হুগের কথা বলিতে প্রয়াস পায় তবে তাহাকে ধমকান নিশ্চরোজন।

মূলভাবে পাষাণের কথাকে ঐতিহাসিক উপভাস শ্রেণীভুক্ত করা যায়। ঐতিহাসিক উপভাস বঙ্গভাষার কয়েকখানি আছে—যথা, বজ্রমের রাজসিংহ, চন্দ্রশেখর, রমেশচন্দ্রের মতবর্ষ, রবীন্দ্রের বৌঠাকুরাণীর হাট, রাজবি ইত্যাদি। ইহার আর সমস্ত গুলিতেই উপভাস প্রবল, ইতিহাস দুর্বল। এগুলি পাঠ করিতে ইতিহাস ভুলিতে হয়, উপভাস-রসে মন বজিয়া উঠে। রাখাল

বাবুর গ্রন্থ ঐতিহাসিক কথা হইলেও কথা হইতে ইতিহাস ইহাতে অনেক প্রবল। পূর্ববর্তী গ্রন্থকারগণ ইতিহাসক্ষেত্রে কর্মদীপনে ঐতিহাসিক নরনারীদের সুখ-হুগের পরিচয় দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, রাখাল বাবু উপভাসক্ষেত্রে ইতিহাস বলিয়া গিয়াছেন। তাহার উপভাস অংশ কেবল কুটনাইনের চারিখিকে তিনিই বেঁটী। সেই বেঁটীও হানে হানে এত বন্ধ যে জাত সেখানেও পাঠকসাধারণ ভিত্ত রসের আবাদন পাইয়া মধ্যে মধ্যে মুখ ফিগাইবেন।

রাখাল বাবু পাষাণের কথা বলিয়াছেন। পাষাণের কথা বলিবার উপযুক্ত লোক তাহার মত বাঙ্গালাদেশে খুব বেশী নাই। পাষাণের কথাকে তিনি সর্বথা কোমল কাগ করিতে পারেন নাই, পাষাণের স্বদগত কাঠিও ক্রমে হানে লোর করিয়া আখ-প্রকাশ করিয়াছে। গ্রন্থের ভাষা মূলভিত্ত নহে—কোথাও অত্যন্ত সংকটগতী, কোথাও আবার ইংরেজীর অনুবাদের মত তদানন্দ। পাষাণের কথা বহুদিন বয়স ছিল কিন্তু তবু তত্বতক হইয়া বাহির হইয়া আসিতে পারে নাই। যিনি যখন মুদ্রাধর তাহার তখন দত্তের চরিত্রচিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থখানি পুনঃপুনঃ হউক এই আমাদের প্রার্থনা। তাহার এই প্রথম গ্রন্থে যেখানি রাখাল বাবু অবলম্বন করিয়াছেন তাহা অভিনব; প্রথম উদ্ভবেই তাহার যতখানি সফলতা তিনি দেখাউইয়াছেন তাহা ভবিষ্যতের বিপুল সাফল্যের ভিত্তি বহন করিয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছে।

শ্রীমলিনীকান্ত ভট্টশালী।

কাক্সহ সমালোচকের সংস্কার—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ষ বিভাগলক্ষ্য প্রণীত। পূর্ববঙ্গ কার্যসূচী গ্রন্থ—১ম সংখ্যা, মূল্য ৮০ আনা—ডবলক্রাউন, বোড়শাংশিত ১২০ পৃষ্ঠা। কার্যসূচীর কাজেই প্রমাণ করিয়াছে যে এক শ্রেণীর গ্রন্থের প্রচার হইতেছে ইহাও সেই রকমই একখানি গ্রন্থ। সমালোচনা নিশ্চরোজন। এই সকল গ্রন্থে কার্যসূচীর পূর্বপৌরব ও উন্নত অবস্থার পরিচয় প্রদান করে যাই।

শ্রীভার পাণ্ডিক।

## নটিকেতা

[ ভারতীয় মনুষ্য আত্মার অভিব্যক্তি কাহিনী ]

হে অমৃত পূজগণ শোন তোরা শোন!

বহ—বহ দূর হতে পড়েছি আসিয়া;

উষার উদয়স্থখী শুকতার হতে

জাতির পদোপ মোর এনেছি জালিয়া

রাগিনী ধরেছি মোর মহাকাশ হতে!

অনন্ত জীবন পথে চলিতে চলিতে

এ বিশ্ব ভাঙারে গুপ্ত প্রাণকুণ্ড হতে

লভিয়াছি প্রাণ সে আমার

অনলে, অনিলে, সূর্যো দৃষ্টিপথে বসতি যাগর;

তুহু'ব অলৌকিক যাহে গুপ্ত পথে ন'রে দনযামা

আসিয়াছি নটিকেতা আমি।

এই আঁধি দেবেরে—জগতের সীমা—

দেখিয়াছে পক্ষীর অন্তরে;

মুখামুখী দেখিয়াছে গুপ্তের মহিমা

ডুব দিয়া প্রত্যক্ষের আবরণী আড়ে!

আড়ালের দেবতা যমেরে

মুখামুখী পুচ্ছিয়াছে নিখিলের গুপ্ত সে বিজ্ঞান

—অম পথে যাহাব সকান!

দেখিয়াছে গুপ্ত সত্য—এ বিশ্বের রহস্য যতক

একের ভিতরে বহু, বহুমধ্যে দেখিয়াছে এক!

দেখিয়াছে স্রোত যেই সৃষ্টিক্রমে বিশ্ব এই গড়ে

জাম তাব ইচ্ছা পথে দিবানিশি তনুরূপে করে  
জীবের অন্তরে!

দেখিয়াছে অভেদের তিন

সত্য শিব সূর্যরক্ত সৃষ্টি সেই, একে বাহ্য তিন!

সকল শেষের শেষে নির্মিশেষে ডুবিয়া রসিয়া

একাকারে মিশে গিয়া উঠিয়াছে আবার ভাসিয়া

এলোকের মর্মধারে বিলাইতে অমৃত বারতা!

আনিয়াছি কথা তার, দেখাইতে প্রথা

আসিয়াছি অগ্নিপুত্র আঁধি নটিকেতা!

ব্রহ্মাণ্ডের এই পৃষ্ঠা নীলাক্ষরী ঘেরা

ভাতে যাত্রা যেন মহা মন্দিরের ধারা—

জগতের দেবতার বিশাল মন্দির

উর্ধ্ব ভেগি অসংখ্য কোটি কোটি কটাক্ষ সৃষ্টির

কোটি ভোতি ভাগ্যত আধির!

হেথা তানতোছি আমি এবিষের হৃদয়প্রাণিনী

কটিকা কল্লোল যেন গভীর পঙ্ক্তির

জগতের অনাহত তাব সরসার!

অনাদি পারিত রত বহুত সে ভূষণ শিখন

তানিতেছি অস্তঃকর্ণে, নূপুর নিকণ

কোটি তারা অপসারার বিশ্ব নৃত্য ভূমৈ!

জীবনের আনন্দের রসায়ন ধূমে!

সে নৃত্যে সঙ্গীতে

আলোকে কটাক্ষময়ী ছন্দ-সরসীতে

অতলে বিতলে ডুবি, ডুবায়ে হৃদয়—

আমার হৃদয়ে এই নিত্যবাহী সুষমঃস্বপ্নময়—

নিখিল সৃষ্টিরে গাজি ফেলেছি ঘেরিয়া;

শোন শোন, তাই লয়ে পড়েছি আসিয়া

মরণের দেশে গয়ে অমৃতের গীতা

ব্যোমকায় আমি নটিকেতা!

কে শুনিবে ইতিহাস, জীবনের রম্য ইতিকথা

বীজ মাঝে বট বৃক্ষ যথা

জীবতে আছিল বিশ্ব, বিশ্বমাকে জীব ছিল তথা—

অনাদিত সে সংবিত—অবোধ্য বারতা!

বাণী যারে সঙ্কোচিয়া আভাসে মিলায়

আকাশের বহির্ঘারে বিজলীর প্রায়!

দৃষ্টিরে অজাতম্পর্শে বার মূরছিয়া,

ভাবে অভাবে শূণ্যে দের হারাইয়া!

ক্ষুদ্র যথা বৃহত্তম, বৃহৎ সে ক্ষুদ্রতম যথা—

স্থিতিহীন স্থিতির বারতা!

অজানা সিঙ্গুর ডেউ আসিয়াছি আমি নটিকেতা!

( ক্রমশঃ ) শ্রীশ্রীশঙ্করমোহন সেন।

# প্রতিভা

৪র্থ বর্ষ

আশ্বিন-কার্তিক, ১৩২১

৬ষ্ঠ, ৭ম সংখ্যা

## নটিকেতা

ভ্রমতে মনুষ্য আত্মার অভিব্যক্তি কাহিনী

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

কে কবে কি ছিল আগে, কি ছিল সে প্রকৃতি তাহার  
না-ধাকার বুকভোড়া আকার ব্যাপার।  
স্বপ্নস্থিতি সম আসি উকি দেয় মনের নয়নে  
এ'পূরে হয়ালি সম নাহি ধরে বোধের বন্ধনে !  
কে জানে সে ছিহু কত কাল  
কালের অভীত, তথা নাহি সীমা আল।  
কে জানে কেমনে হ'ল সীমা এল অসীমের বুক  
দেশ কাল খাঁটার কুহকে  
কেমনে পড়িল ধরা অসীম সে মহিমার পাখী  
কোথায় ছিঁড়িয়া গেল মর্মতন্ত অঙ্গ হল আঁখি।  
মনে পড়ে তারপরে ঘোরাঘুরি নিত্য হাফাকারে—  
বিরহে ভিরিবা-ভরে কত কাল আঁধারে আঁধারে।  
সে ভিরিবা বশে আঁহা, কত ভাবে কত রূপ ধরে  
নিত্য আবর্তন গতি, গতি আঁহা আঁধারে আঁধারে।  
আভাসের স্মৃতি সেই, আভা শুধু ধারে ইবাড়ার  
মেঘ-আড়ে বিজলীর প্রার !

স্মৃতি সেই আল-ঝালে মম

ছিন্ন গ্রন্থি-তন্তুধারা সম—

একের বিচ্ছিন্ন স্তম্ভে শতে কাটা' লক্ষ্মণদ্বারে  
শত কাটা' আলোকে আঁধারে।

মনে পড়ে এই পথে অতর্কিত ছায়াবন্ধ কোঁকে  
কত কাল কাটায়েছি মহাপ্রান্ত লোকে !

তারপরে কত কাল বাহুভূত শক্তির অন্তরে,  
—কত কাল অধির জঠরে !

কত ভাবে কত রূপে মাটিবন্ধে ওষাট হইয়া  
ছিহু আঁহা স্মৃতিরঙ্গে আসিয়া বাইয়া !

কত কাল আবিল সে আঁধালাগা' অজুতব ঘোরে  
বৃক্ষরূপে, লতারূপে, ফুলরূপে, ফলরূপ ধরে,  
উর্দ্ধমুখে আকাশে চাহিয়া,

অগ্নি-রূপী সূর্য লক্ষ্যে আলোকের ধেরান ধরিয়া  
অব্যক্ত গোধূললোকে ভ্রূক, তুম্ব মরণে বাঁচিয়া।

তারপরে, কতকাল অজ্ঞান শক্তি সন্নে

লভিতে লভিতে গেল প্রাণের স্পন্দনে।

মতি এল উন্মাদের বুক

যুক্তি এল বন্ধবের শিলা-অঙ্গ হুখে !

আধুনিক-কালিক ১০২১

কত রূপ কত ভাব ধরি  
 কল্প বোনি পথে কত আইছ উত্তরি'।  
 আঁহা! আঁহা! সে অজানা অভাবের বশে  
 অপ্রাপ্তের পিপাসার রসে,  
 কত লক্ষ জীব-যোনি আইলাম অধোরে ঘুরিয়া।  
 আনিলাম আমার সে নিশানা মুছিয়া।  
 আসিছ সে বার্তা পুনঃ অণু দেহ বীজ মাঝে লয়ে  
 লক্ষ লক্ষ বৎসর গোঁয়ায়ে।  
 অবশেষে উপনীত মননের মানবের লোকে  
 উপস্থিত ইচ্ছাজ্ঞান ভাবের আলোকে।  
 যে আলোক মুহূর্ত্ত পুনঃ নিরমম  
 তাতে যেন অন্ধকার সম  
 জড়তার ওতপ্রোত জ্যোতি অল্পপম।  
 কে তুনিবে সেই কথা—অধোরের গহনের ব্যাধা  
 লক্ষ জীবনের গাথা বিন্দু মাঝে মম।  
 হইছ বুঝিছ বাহা লভিছ যা  
 নুহুগু ইবাড়া রূপে আছে লেখা সবি মোর গায়।  
 কত ব্যক্তি কত জাতি কত দেশ আইছ ঘুরিয়া  
 কে দেখিবে সে অতীতে গুপ্তনেত্রে আঁজি উঘারিয়া  
 অণু-পথে অনন্তে ডুবিয়া।  
 তারপরে কত কাল কত ভাব কত মুক্তি ধরি,  
 আসা যাওয়া উপরি উপরি,  
 ঘোরাঘুরি কিছু না বুঝিয়া।  
 কি আবেগে অভাবে মজিয়া।  
 যুগ যুগ ইতিবৃত্ত ধীরে ধীরে অধোরে বাহিয়া  
 সত্য শিব সূন্দরেরে তিলে তিলে হৃদয়ে সঞ্চারিয়া।  
 এইরূপে কত কাল! অকস্মাৎ কি ঘটিল মম।  
 হে মানব, অকস্মাৎ, শোন তাহা শোন।  
 কে যেন আগলে মোরে এক দিন অপূর্ণ ব্যাপার—  
 ক্ষমমে আগলে।  
 আকুল আবিগ সেই বিচকল মানস-সলিলে  
 ফুটিল হিরের পদ্ম তিলে।

বিবেকের খেত পদ্ম আলোকপিয়াসী সহস্রার  
 সৌরভে ভরিয়া এ সংসার;  
 বুকে লয়ে আলোকেকু গুপ্ত যথুধার।  
 আভাসে বুঝিছ যেন।  
 কে যেন বসিয়া হোথা হেন।  
 রয়েছে ছুঁইয়া মোরে শ্রীচরণে তার।  
 জাগরণ—অপূর্ণ ব্যাপার।  
 জীবনের অন্তস্তলে একদা সে গভীর আবেগে  
 একে—তিন; তিনে—এক প্রশ্ন যেন উঠিল ডাকিয়া—  
 'কে আমি, কেন বা আমি, কি করিতে আঁমি  
 বিপুল এ' বিশ্বলোকে উঠেছি জাগিয়া।'  
 প্রশ্ন সেই অসীম সন্তান  
 জানি জীব-জীবনের চরম সে রহস্ত বিজ্ঞান  
 আছে লুকাইয়া, যথা আছে ওই প্রশ্ন সমাধান।  
 শত চকলতা মাঝে শত ভ্রান্তি ভুলের আড়ালে  
 জানি ওই সমাধানে জীবের জীবন নিত্য চলে।  
 হাতে ধরি' অমৃতের স্বপ্ন স্বত্রে অনন্ত বন্ধনে  
 টানিছেন বিশ্ব-পিতা আপনার প্রিয় পুত্রগণে।  
 মনে আছে, সে জীবনে, একদা উবার—  
 কিরণ-কুন্তল উষা হৃদয় যাহার  
 তরুণ অরুণ রূপে উন্মোলিছে ধারে পূর্বাশার  
 নিখিল বিশ্বেরে ঘেরি' আপনার আকুল কম্পনে  
 হৃদয় জাগিল মম নিজের সে গুপ্ত নিকেতনে।  
 হৃদয় জাগিল মম—বিশ্ব জোড়া' জাগি—বিশ্বময়  
 দেখিল হৃদয়.  
 আলোকে আগুনে বিশ্ব হয়েছে তন্দ্রা।  
 নিরখিল আপনারে  
 সবার ভিতরে, পুনঃ—আশ্চর্য্য সে-সবার বাহিরে।  
 ব্যোমাতীত সঙ্গীতের জলংপিণ্ড হতে  
 ক্ষিপ্ত কথা আপনারে কবি বলে বুঝিল হৃদয়  
 পরিচিত বিশ্বনামে কি যেন সে নব পরিচয়।  
 চিনিলা জাগিয়া নিজে, যথা ওই উবার ধারার

ক্ষুদ্র ওই জুঁই ফুল, মধুগুপ্ত অশ্রুসিক্ত মুখে  
 প্রলুব্ধ করেছে ওই অলি একে বসিবারে বুকে !  
 জীবন মধুর হল, মধুর এ' বিশ্বের সকলি  
 সে ত কালো অলি নহে, বনীবৃত্ত আলোকের অলি !  
 ক্ষুদ্র সে জীবন-সূর্য্য অন্ধ এই হৃদয় ফুলের  
 হৃদয় কহিল ডাকি—উচ্চকণ্ঠে উচ্ছ্বাসিয়া কহিল তাহার  
 —“পেয়েছি তোমায় !”

বিশ্বের জীবন সূর্য্য বিশ্ব-মর্মে বাহিরে পুনঃ যে  
 এ' বিশ্বের বর্ণশিল্পী-নাম রূপ যথা হতে আসে !  
 এ বিশ্বের জড়ময়ী মসীময়ী দেহবৃত্তি-তলে  
 রসের ভাণ্ডার সেই, সর্ব্বগ্রাসী আলোকে অনলে  
 তামসীর মসীময়ী জ্যোতি-রসে দেয় যে মুছিয়া  
 গুপ্ত পথে সহসা বাধিয়া !

অগ্নি-হোত্রী নটিকেতা চিনিল সে আপনার রবি  
 —হইলাম কবি !

শোন শোন—হইলাম কবি !

বিশ্ব মাঝে কত জনে কত পথে চলে ;  
 কেহ বাধিবারে চায় শক্তির শৃঙ্খলে  
 শূভগতি বেগবতী বিপুল ধারায়  
 —গতি যার নিত্যগুপ্ত প্রত্যক্ষ অস্তরে !

কেহ দৈত্য পদক্ষেপে মানবের শির দগি যায়,  
 সোনার অসিতে কেহ বিশ্ব-হিয়া জিনিবারে চায়,  
 সাগরে সরিতে কেহ মরুবকে নিভৃত প্রান্তরে  
 আপনার নাম লেখে সোনা দিয়া কাটিয়া পাথরে —  
 জগতে শক্তির পূজা সোনার পাতৃকাদীর্ঘ সবি  
 তার মাঝে অপ্রত্যক্ষ অধরের জ্যোতি-স্বপ্না ছবি  
 আমি শুধু হইলাম কবি !

তুনিলাম মর্ষণপথে ধ্বনি-গীতি গুপ্ত বেদনার  
 কি কহিব, অর্ধ-কিবা অতীত তাহার !

শোন শোন—এককালে দূর—দূর—দূরান্তর হতে  
 পুনঃ যেন সত্তর্পণে অতি কাছে কানের গোড়াতে  
 কি গাহিছে—গাহিছে কান্ধারা

অশ্রুত ভাবার রীতি-আরতির ধারা  
 কালে আগে উদয়-উদয়ে—  
 “হও তুমি কবি স্তব্ধতার !  
 নীরব বিশ্বের নেত্রধর,  
 নিশা হবে দ্বিতীয় প্রহর,  
 দূরে কাছে মুহু গুধু ক্লিষ্টকার স্বর—  
 এক মনে তুনিতে তুনিতে  
 মন বাহে মজে আচম্বিতে  
 অকুল অতলস্পর্শে নিস্তব্ধ সে নিঃশব্দ পাথারে !  
 হৃদয় পলকে করে পরশি' শিহরে !  
 লহ তারে চিন্তপথে ভূতিপথে লহ সে বুঝিয়া  
 শব্দের মাঝারে যেই বসে আছে নিঃশব্দ হইয়া !  
 “হও তুমি কবি স্তব্ধতার—  
 কবি হও গভীরের—ঘন গহনায় !  
 ভারতের কবি হও, অসীমের ধারণা লইয়া  
 মৃগয়া প্রতিমা পায়ে পড়িছে যে আপোবে গুইয়া !  
 ক্ষুদ্রেরে করিয়া খুঁটি অসীমে যে দিলে হাল ছাড়ি'  
 বিন্দুর ভিতর দিয়া সিন্ধুর যে ঘোপাইছে পাড়ি !  
 জগতের ব্রাহ্মণ ভারত  
 দেহেরে ডিন্কায়ে যেবা আত্ম-লোকে ঢালাইছে রথ !  
 ব্রহ্মাণ্ড বিজয় করি' বিশ্বজিৎ বিপুল অধরে  
 সর্ব্বম্ব যে বিলাইছে পরে অকাতরে !  
 আপনার গৃহ-দেহ অপরের করেছে সঁপিয়া  
 মন নিয়ে ভবলোকে চাহিছে যে রহিতে মজিয়া !  
 পলাইয়া জীবন-সমরে,  
 অর্থ দুঃখ পলাইয়া আত্ম-ভৃগু বৈরাগ্যের ভরে  
 জীবনের সর্ব্ব কাজে একমুখে বাহিছে বিস্তরে—  
 গঙ্গা যথা সর্ব্বস্রোতে একলক্ষ্যে ঢালিছে সাগরে !  
 ধোয়াইছে সর্ব্ব আশা আদর্শে উদার —  
 হও সেই কবি স্তব্ধতার !”  
 হইলাম কবি সেই, নিজ মনে সে বাণী করিয়া  
 ভারতের মর্ষণ-গীতা গাণে বীণে গাহিয়া সাধিয়া ;

আখির-কার্তিক ১৩২১

দর্শনে পুরাণে কাব্যে ইতিহাসে বিপুল সম্ভারে—

আত্মরত সৃষ্টি মাঝে শতকণ্ঠে ডাকি মানবের,—

কত ভাবে কত মূর্তি ধরি’—

ভুলিলাম নিঃশব্দের রাগিণী লহরী!

সুর-রাণী, ভাবরাণী, দীপ্তিরাণী হইল ভারত !

সমগ্র এসিয়া তার সুরে-তানে ধরিল। সঙ্গ !

—না জানি কি ছিল হোথা, পারি নি ধরিতে—

নর-বন্ধঃ হল স্থির পশুদের ধমনী তাহার—

শক্তির ধমনী সেও আছিল কি সাপে সাধে তার ?—

হইল নিদ্রিত ধীরে, হল যেন মৃত্যুর আকার !

এবাহিল শক্তির সে নিদ্রারত সুস্মার ধারা !

শান্তি—শান্তি—শান্তি শুধু স্থির মহত্তর !

বুঝি নি ত, শান্তি সে কি তলে তলে মৃত্যুর সোনার ?

অমৃতের আভা পুনঃ নয়নে যাহার ?

মূর্ছা, সেত মূর্ছা নহে ? না জানি কেমন হলে ধরে—

আমার সে সুখাটুকু কি যে হল পশিয়া অপরে !

আমার সে জাগরণ আত্মরত গুরুতা মাঝার !

আত্মা সেই, বিশ্ব-আত্মা সহোদর যার !

কুসুম-কলির গর্ভে আলোক উঠে

জন্ম যার, পুষ্প হাসি-জন্ম-প্রকার—

জন্মে জাগিলা বিশ্ব—হাসি সহ তার !

জাগরণ—হেথা বাহা ভাতে যেন সৃষ্টির আকার !

এইরূপে কত কাল কত ভাবে হৃদয় আমার

জাগিলা ভারতবর্ষে শান্ত স্থির স্রুপ নির্মিকার !

( ক্রমশঃ )

শ্রীশশাঙ্ক মোহন সেন।

## বালচরিত

নাটকের পাত্রগণ

পুরুষগণ

নারদ, দেবর্ষি

বসুদেব, কৃষ্ণের পিতা

নন্দগোপ, বসুদেবের সখা ( গোকুলাধ্যক্ষ )

উগ্রসেন, কংসের পিতা

দামোদর

সম্বর্ষণ

} বসুদেবের পুত্রগণ

কংস, মথুরার রাজা

চাণুর

মুণ্ডিক

} মল্লবর ( কংসের আত্মীয় )

শ্রবসেন, ভট ( কংসের ভৃত্য )

বাল্লকি, কাঞ্চকীয় ( কংসের ভৃত্য )

শাপ, শাপের দেবতা

কুশোদর

শূল

নীল

মমোজন

} কাত্যায়নীর ভৃত্যগণ

গরুড়, বিষ্ণুর বাহন

চত্র

শাঙ্গ

শঙ্খ

নন্দক

} আয়ুধাধিষ্ঠিত দেবগণ

জনৈক ব্রহ্ম গোপালক

রুক্মি পুরুষগণ

দামক, জনৈক গোপালক

অক্লিষ্টর্ষভ, অম্বরবিশেষ

কালিক্স, যমুনাভ্রদবাসী মহানাগ

ত্রীগণ

দেবকী, কৃষ্ণের জননী  
প্রতীহারী, দেবকীর দ্বারপালিকা  
দ্বাত্রী, দেবকীর মায়াকঙ্কার উপমাতা  
চণ্ডাল সুবতীগণ  
কাত্যাবলী, কংশহন্তয়ুক্ত আকাশ দেবী  
গোপী ও ষোড়শমুন্দরীগণ  
রাজ্যঙ্গী, রাজ্যলক্ষ্মী  
অশুকলিকা, কংসের প্রতীহারী  
অশোভনিকা, ঐ  
কৌমোদকী, তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা

## বালচরিত \*

### স্থাপনা

নান্যাস্তে স্তত্রধারের প্রবেশ

স্তত্রধার। পুরাকালে সত্যযুগে যিনি শঙ্খাঙ্গীরবপু নারায়ণ, ত্রেতাযুগে যিনি সুবর্ণপ্রভ বিষ্ণু ও ত্রিভুবনে ত্রিপদবিক্রেপকারী, রাবণবধে যিনি দূর্কাক্রামতন্তু, দ্বাপরযুগে যিনি রাম ( বলরাম ), কলিযুগে যিনি সর্বদাই অজ্ঞানসন্নিভ, সেই দামোদর তোমাঙ্গিকে রক্ষা করুন।

আচ্ছা! ভক্তমহোদয়গণকে এইরূপই বলি। একি! আমার বক্তব্য নিবেদন কতে ব্যগ্র হয়েছি কিন্তু : কটাক্ষের মত যেন শুনিছি! রলো, দেখছি।

নেপথ্যে

আমি গগনবিহারী ( নারদ )

স্তত্রধার। হাঁ, এখন ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি।

আকাশ হ'তে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে, দেবগণ তুর্ধ্যধ্বনি

\* গঙ্গাধর জগৎ মহাকবি ভাসুদেব প্রবন্ধ ত্রুটিয়া।  
প্রতিভা লেখক, ১৩২১; ৮৩ পৃষ্ঠা।\*

কচ্ছেন, বৃক্ষকুলোদ্ভূত হরিকে দেখবার জন্য মহর্ষি নারদ আকাশপথে তাড়াতাড়ি মেমে আসছেন। [ প্রস্থান।

নারদের প্রবেশ

নারদ। আমি গগনবিহারী ব'লে ত্রিলোক-বিখ্যাত। কলহপ্রিয় নারদ ব্রহ্মলোক থেকে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে।

দেবাসুর যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, স্মরণ্য গগন-পথ এখন প্রশান্ত, সেখানে আমার আর প্রীতি জন্মে না! বেদ-পাঠের মাঝে মাঝে বীণার তারে বজ্রের দেওয়া আর শক্ততা ঘটানই কিন্তু আমার স্বভাব।

আবার বেদে আমার একান্ত ভক্তি, আর সমস্ত তপোবনই আমার বড় প্রিয়; কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলে মঞ্চ দিয়ে বীণা বাজিয়ে আর ভীষণ কলহ সৃষ্টি করেও আমার বড় সুখ। তাই লোক-কারণ, অবি-নয়ন ও পরিণামরহিত যেই নারায়ণ লোকহিতার্থে কংসবধের নিমিত্ত বৃক্ষকুলে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁকে দেখবার জন্য এখানে এসেছি। এই যে আর্ধ্যা দেবকী! মায়ী করে যিনি এখন শিশু হয়েছেন সেই ত্রিলোকে-খরকে গ্রহণ করে বসুদেবের সঙ্গে ক্রতপদে গৃহ হ'তে ব'হর্গত হচ্ছেন।

যিনি লোকের অত্যন্ত কারণ, সুরগণের গুরু, দৈত্যগণের সংহারকর্তা ও চক্রপাণি তাঁহাকে শোকার্তা ও শশীযুখী দেবকী প্রশান্ত ভাবে রজনীতে মন্দর পর্বতের ত্রায় দুই হাতে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে।

অনন্তবীর্ঘ্য, কমলায়তাক্ষ, সুরেন্দ্রাধিপতি, অমুর-দর্পহন্তা, ত্রিলোকের কেতু, জগতের কর্তা, আদিপুরুষ ও জনগণের পালনকারী ইনিই ভগবান নারায়ণ।

বাঃ, এইত কলহের একটা মূল সৃষ্টি হ'ল। আমিও এখন ভগবান নারায়ণকে প্রদক্ষিণ করে ব্রহ্মলোকে ফিরে যাব। ত্রৈলোক্য-কারণ ভগবানকে নমস্কার।

যিনি নারায়ণ, যিনি নরলোকের প্রধান আশ্রয়-ভূত, যিনি লোকের আনন্দরূপ, বাহার লোচন-



আখি-কাঠিক ১০২

হুগল কমলের ভায় অমল, যিনি রাম, যিনি রাবণ ও বিরোচনের (?) সংহারকর্তা; যিনি পরাক্রমের আধার ও যিনি বীর পুরুষ সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষকে মনকার। [প্রস্থান।

## প্রথম অঙ্ক

বালকহন্তে দেবকীর প্রবেশ

দেবকী। হা বিক! আমার বাছার জন্ম সময়ে বহু মহা মহা শুভ নিমিত্ত দেখেও দুরাত্মা কংসের নিষ্ঠুরতার কথা মনে করে বাছা আমার মহাপুরুষ হবে এই কথা বিশ্বাস করতে ভরসা হচ্ছে না। হায়! আমি কি মন্দ-ভাগিনী! আর্ধ্যপুত্র গেলেন কোথায়? এই যে! হর্ষে ও বিষয়ে উৎফুল্ল-লোচন আর্ধ্যপুত্র এদিকেই আসছেন!

বহুদেবের প্রবেশ

বহুদেব। (সখেদে) আঃ! এটা কি হ'ল!

প্রবল বায়ু ও নূতন মেঘের নির্ঘোষের সঙ্গে আকাশে বিদ্যুৎ খেলছে, মেদিনী কম্পিত হচ্ছে! অসুরসন্তের সংহারকর্তা বিষ্ণু গুপ্তভাবে লোক-রক্ষার নিমিত্ত নিশ্চয়ই অন্য অবতীর্ণ হলেন!

(চাহিয়া) এই যে দেবকী!

ছয়টি পুত্রের বিনাশজনিত শোকে নিতান্ত ধ্বংসনা; কিন্তু কংসের সম্বরূপ এবং স্বীয় তনয়রূপী সপ্তম শিশুর প্রাণ রক্ষার জন্য একান্ত যত্নবতী হ'য়ে তাকে নিয়ে যাচ্ছেন। এই পুত্রের জন্মকালে বহু শুভ লক্ষণ প্রকাশিত হ'য়ে তার অগণিত গুণেরই সূচনা কচ্ছে।

দেবকী। (অগ্রসর হইয়া) আর্ধ্যপুত্রের জন্ম হ'ক।

বহু। দেবকি, এখন মাত্র দুপুর রাত। মথুরায় \* সকল লোক নিদ্রিত। সুতরাং কেহ না দেখবার পূর্বেই ছেলেটিকে নিয়ে পালিয়ে যাব।

দেবকী। আর্ধ্যপুত্র, একে কোথায় নিয়ে যাবেন?

বহু। দেবকি, সত্য কথা বলতে গেলে আমিও

\* মূলে সর্বত্রই 'মথুরা' এই পাঠ আছে।

জানি না কোথায় নিয়ে যাব। কিন্তু দুরাত্মা কংস পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি। তাই তাবছি বাছাকে—বাছা আমার দীর্ঘায়ু হ'ক—কোথায় নিয়ে যাব! কি করব, দৈব যেখানে নিয়ে যাবে বাছাকে নিধি সেখানেই পালিয়ে যাব।

দেবকী। আর্ধ্যপুত্র, বাছাকে একবার ভাল করে দেখে নি।

বহু। হায়! পুত্রবৎসলে! কি আর দেখবে। রাহগ্রাসে শশাক দেখে আর লাভ কি? যতক্ষণ তুমি ভাল করে দেখবে ততক্ষণে কংস বৎসের সম্বরূপ হ'য়ে এসে উপস্থিত হবে।

দেবকী। না না, কংস কিছুতেই বাছাকে মারতে পারবে না।

বহু। তুমি যা বল, দেবতারা যেন তাই করেন। আচ্ছা নিয়ে এস।

দেবকী। আর্ধ্যপুত্র, এই নিন।

বহু। বাপরে! এই শিশু কত ভারি!

এই শিশু বিদ্যুৎ ও মন্দর পর্বতের সারভূত, পদ্ম-দলের ভায় চক্ষু বিশিষ্ট; এত ভারি সন্তানকে ধারণ কর্তে ধারণ করে তার ঐশ্বর্য নিশ্চয়ই অসীম।

দেবকি, অন্তঃপুরে ফিরে যাও।

দেবকী। হায় হতভাগিনী আমি! এই যাচ্ছি।

বহু। চন্দ্রলেখা আকাশে ও সলিলে যেমন দুই ভাগ হ'য়ে যায়, দেবকীরও হৃদয় ও শরীর দুই ভাগ হয়ে যাচ্ছে। হায়! দেবকী অন্তঃপুরে চলে গেল। আমিও এ বেলা নগর-তোরণের দিকে বাই।

প্রথম পুত্রের বিনাশেই আবার ক্রোধের স্ফার হ'য়েছে, এখন আবার কংস-ভয়ে ভীত হ'য়ে ভুল-সাহায্যে মন্দর পর্বতের ভায় পুত্রকে বহন করে ক্রতপদে পথ চলে যাচ্ছি। (পরিভ্রমণ করিয়া)

এই যে নগর-তোরণ! আচ্ছা প্রবেশ করা যাক। (প্রবেশ করিয়া) মথুরার সকল লোকই এখন নিদ্রিত।

তবে এই সুযোগেই পালিয়ে যাই। এই ত মথুরার সীমা ছাড়িয়ে এলুম। উঃ! কি ভীষণ অন্ধকার!

সমস্ত শরীরে যেন অন্ধকারের প্রলেপ দিয়ে দিয়েছে! আকাশ যেন অগ্নি বর্ষণ করেছে! অসং-পুরুষের সেবা যেমন নিষ্ফল, সেইরূপ দৃষ্টিও নিষ্ফল হ'য়ে যাচ্ছে!

উঃ! অন্ধকারে কি হ'য়ে গেছে! দিগ্‌নির্ণয় করা যায় না; গাছগুলি যেন সব একত্র জড়িয়ে গেছে। সুবিন্যস্ত পৃথিবীর যেন রূপ-বিপর্যয় হ'য়ে গেছে।

আর যেতে পরি না! এই যে সমুখে দীপালোক! দূরাদ্ধা কন্দ আবার পলায়নের সংবাদ পেয়ে আলো নিয়ে আমাদের খণ্ডে আসছে না ত? বেশ, আশুক, তা হ'লে আমিও তার দর্প খরঁ করব। (খড়্গ কোশযুক্ত করিতে উদ্ভত হইয়া নিবৃত্ত না: জন প্রাণী ত কিছুই দেখছি না।

আ! বুঝেছি; সমস্ত পৃথিবী অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, আমি পথ দেখতে পাচ্ছি না, সুতরাং আমার পলায়নের সুবিধার জন্য বৎসই আলোর সৃষ্টি করে দিয়েছে।

এই যে পথ। এবার পালাব। হায়! হায়! বর্ষাকালে পূর্ণতোরা যমুনা যে আমার সমুখে!—এখন কি করি! যমুনা উত্তীর্ণ হব কি করে? হায়! আমার সমস্ত পরিশ্রমই বার্ষ হ'ল! আচ্ছা, এক কাজ করা যাক।

এই নদী বিবিধ জল-জন্তু ও ভুজঙ্গ-সম্মুল; ইহার প্রচণ্ড উর্ধ্বগতিও মনে মনে অতিক্রম করা দুষ্কর। কিন্তু উদ্বেগ সিদ্ধির জন্য আমি এত কাতর হ'য়েছি যে, দৈবের সাহায্যে সমরণ করেই যমুনা উত্তীর্ণ হ'য়ে সিদ্ধি লাভ করব। (যমুনায় অবতরণ করিয়া সন্নিহনে) একি! জল যে দুই ভাগ হ'য়ে গেল। এই পাশে জলরাশি স্থির হয়ে আছে, ও-পাশে প্রবাহিত হচ্ছে! ভগবতী যমুনাই আমাদের পথ করে দিলেন। যাই, এবার পালিয়ে যাই। (গমন) এইবার যমুনা উত্তীর্ণ হলুম। একি! একটা হাজার শব্দ যেন শুনিলাম, বুঝেছি, আমি হতভাগ্য! গোপ-

পন্নীর নিকটে এসে পরেছি। আ! এই নিকটবর্তী বোম-পন্নীতেই ত সখা নন্দগোপের বাড়ী। কংসের আজ্ঞায় আমি তাকে কশাঘাত করে তার পায়ে শৃঙ্খল পরিয়ে দিয়েছিলাম। আচ্ছা গোপ-পন্নীর দিকেই যাই। কিন্তু রাত্রি কালে বশুদেব গোপ-পন্নীতে এসেছে এই কথা শুনে গোয়ালারা সব ত শঙ্কিত হতে পারে! তবে কি এই অগ্নি-তরুর তলে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব? হে অগ্নি-দেবতা, যদি এই বালক লোকহিতার্থ কংসবধের জন্য ব্যস্তকুলে জগৎগ্রহণ করে থাকে তা হ'লে বোমপন্নী হ'তে কেহ এখানে আসুক। না না, তা হ'লে আমার সখা নন্দগোপই আসুক।

কন্ডা লইয়া নন্দগোপের প্রবেশ

নন্দ। যাদুমণি, যাদুমণি, আমাদের গৃহলক্ষীকে আনন্দিত না করে, আমাদের সকলকে ছেড়ে, তুমি চলে গেলে! অহো! কি ভীষণ অন্ধকার! যেন শত শত মহিষ একত্র হ'য়ে আছে।

কি দুর্দিন! একটুও জ্যোৎস্না নেই! কোন জিনিষেরই আকার লক্ষ্য হচ্ছে না (আকাশ যেন মিলিয়ে গেছে)। মনে হচ্ছে যেন গোপী নীলবসনে সমস্ত দেহ আচ্ছাদিত করে ঘুরিয়ে আছে।

আজ দুপুর রাতে পত্নী যশোদা এই কন্ডাটি প্রসব করেছে। হতভাগিনী কন্ডাটি প্রসব করেই যে বৃচ্ছিত হয়েছিল সে বৃচ্ছ! এখনও ভাদে নি। কাল বোমগণের চিরানুষ্ঠিত ইন্দ্রযজ্ঞ উৎসব। যাতে গোপগণ এই দুঃখের ভাগী না হ'তে পারে সে জন্যই আমি একাকী শৃঙ্খলবদ্ধ-চরণে এই কন্ডাটিকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি। হতভাগিনী যশোদা বৃচ্ছিত—সে জানে না কন্ডা প্রসব করেছে, কি পুত্র প্রসব করেছে! হারে যাদুমণি!

বশু। রাত্রিকালে কে বিলাপ করেছে! এই হতভাগ্যও দেখছি আমরাই অবস্থাপন্ন (সমহৃৎসভাগী)।

নন্দ। যাদুমণি আমাদের গৃহলক্ষীকে আনন্দিত না করে, আমাদের সকলকে ছেড়ে তুমি চলে গেলে!

আধুনিক-কালিক ১০২১

বসু। এই স্বর যেন আমার পরিচিত বোধ হচ্ছে !  
এ যেন আমার সখা নন্দগোপ ! আচ্ছা, শব্দ লক্ষ্য  
করুই অগ্রসর হই না কেন ? সখা নন্দগোপ,  
এদিকে এস।

নন্দ। (সন্তরে) কি বিপদ ! কে আমাকে পরিচিত  
স্বরে নন্দগোপ, নন্দগোপ বলে ডাকছে ! এ কি রাক্ষস  
না পিশাচ ! এই ভীষণ রাত্রি ! আবার মৃত কণ্ঠ  
আমার হস্তে ! আমি এখন কি করি ?

বসু। সখা নন্দগোপ, শঙ্কিত হ'ওনা। এদিকে  
এস।

নন্দ। (কান পাতিয়া) স্বরে ইহাকে বসুদেব  
বলেই ত বোধ হচ্ছে। আচ্ছা এগিয়ে যাই। কিন্তু  
সেখানে গিয়েই বা আমার কাজ কি ? ইনি রাজা  
কংসের আদেশে আমাকে অপরাধীর জায় কশাঘাত  
করে আমার পায়ে শৃঙ্খল পরিয়ে দিয়েছিলেন।  
ধাক, আমি তাঁর কাছে যাব না। কিন্তু আমার  
এ নৃশংস ভাব ত ভাল নয়। বসুদেব আমার  
বহু উপকার করেছেন, তিনি আমার দুঃখে দুঃখিত হন,  
সুখে সুখী হন, শুধু রাজার আদেশেই ত আমাকে শৃঙ্খল-  
বদ্ধ করেছিলেন ! আচ্ছা, তাঁর কাছে গেলে দোষ কি ?  
এ মেয়েটাকে নিয়েই বা কি করি ! আচ্ছা এই করা  
জা'ক। রাত্রিও প্রভাত হ'য়ে এল। এ কি ! আর্ধ্য  
বসুদেবও যে একটি ছেলে নিয়ে আছেন দেখছি !  
প্রভুর জয় হ'ক।

বসু। বরন্ত নন্দগোপ, তোমার গন্ধগুলি সব ভাল  
আছে ত ?

নন্দ। হাঁ, প্রভু সব ভাল আছে।

বসু। তোমার পরিচয়নৈয়া সব ভাল আছে ?

নন্দ। পরিচয়ের কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছেন ? হাঁ  
সব ভাল।

বসু। বরন্ত, তুমি ঢেকে রাখছ কি ?

নন্দ। প্রভু, কিছুই না।

বসু। যদি সত্য কথা না বল তবে আমার প্রাণের  
দিব্য।

নন্দ। না ব'লে আর গতি নাই দেখছি। প্রভু তবে  
ভুলুন। আজ দুপুর রাতে আমার স্ত্রী—না না, আপনাদের  
দাসী—যশোদা একটি কণ্ঠ্য প্রসব করেই মৃচ্ছিত হ'য়েছে।  
কাল গোপদেব চিরানুষ্ঠিত ইজ্ঞাষজ্ঞ উৎসব। অস্ত  
গোপেরা এই দুঃখের ভাগী না হ'তে পারে এজন্য আমি  
একাধীই শৃঙ্খলিত চরণে মেয়েটিকে নিয়ে পালিয়ে  
এসেছি। হতভাগিনী যশোদা মৃচ্ছিত : জানে না  
দুঃখিনী ছেলেই প্রসব করেছে, কি মেয়েই প্রসব করেছে !

বসু। হায় ! লোকের আশ্রয়স্থল যমকে বঞ্চনা  
করা যায় না। বরন্ত মেয়েটির শরীর একেবারে কাঠ  
হ'য়ে গেছে—একে পরিত্যাগ কর।

নন্দ। প্রভু, পরিত্যাগ কত্তে পারি কৈ !

বসু। লোকধর্মই এই—পরিত্যাগ কর।

নন্দ। প্রভুর আদেশ পালন কত্তেই হবে। যাহুমণি !  
যাহুমণি ! (রোদন)

বসু। বরন্ত কেঁদে আর কি হবে ? ওঠ।

নন্দ। (উঠিয়া ও নিকটে আসিয়া) প্রভুর জয়  
হ'ক। এখন এ দাসের কি কর্তব্য ?

বসু। বরন্ত, তুমি ত জান দুরাত্মা কংস আমার  
ছয়টি ছেলেকেই একে একে হত্যা করেছে।

নন্দ। হাঁ প্রভু, তা জানি।

বসু। তাই এই সপ্তম পুত্র দীর্ঘায়ু হবে ! আমার  
পুত্র-সৌভাগ্য নেই। তোমার ভাগ্যে এই শিশু বেঁচে  
থাকবে। তুমি একে নাও।

নন্দ। প্রভু বড় ভয় হয় ! যদি রাজা কংস শোনে  
যে নন্দ গোপের গৃহে বসুদেবের পুত্র রক্ষিত হয়েছে  
তা হ'লে নিশ্চয় আমার মাথা বাবে।

বসু। (স্বগত) হায়। সব কাজ পণ্ড হ'ল।  
কিন্তু বুঝিয়ে বলে নৃশংসেরাও কৃতজ্ঞ হ'য়ে থাকে।  
বরন্ত নন্দগোপ !

যদি পূর্বে আমি তোমার বিন্দুমাত্রও উপকার করে থাকি তা'হলে জেন প্রতাপকারের এইই সময়।

নন্দ। কি! প্রতাপকারের কথা বলছেন? তবে কংসই হ'ক বা কংসের পিতা উগ্রসেনই হ'ক আমি কাকেও ভয় করি না। প্রভু ছেলেটিকে নিয়ে আসুন।

বসু। বয়স্ক, এই নাও।

নন্দ। প্রভু, মরা যেহে আমার কোলে ছিল আমি অশুচি হয়েছি; একটু অপেক্ষা করুন আমি যমুনা হ্বে গিয়ে স্নান করে শুচি হয়ে আসছি।

বসু। বয়স্ক, তুমি ঘোব-পন্নীতে থাক, তুমি ত স্বভাবতঃই শুচি, আবার স্নানের প্রয়োজন কি?

নন্দ। তা'হলে ঘোবদের অভ্যস্ত ধূলি-স্নান করেই আমি শুচি হব।

বসু। বেশ, তা'হলে ধূলি স্নানই করে এস।

নন্দ। প্রভু যা আদেশ কছেন তাই করব। (ধূলি-স্নান করিতে গিয়া সন্ধ্যায়) প্রভু, বড় আশ্চর্য্য! বড় আশ্চর্য্য! আমি ধূলি খুঁড়ছি আর অমনি মাটি ভেদ করে যুগের \* তায় একটা জলস্রোত প্রবাহিত হ'তে লাগল।

বসু। নিশ্চয় জেন এটাও এই বালকের প্রভাবেই হয়েছে! স্নান কর।

নন্দ। হাঁ প্রভু, স্নান করছি। (স্নান করিয়া) প্রভু, এই স্নান করে এসেছি।

বসু। এই নাও।

নন্দ। প্রভু আমার বাহ বড় দুর্বল। এই দুর্বল বাহ বন্দর পর্ত্তের তায় তারি এই ছেলেটি বেধ'রে রাখতে পাচ্ছে না।

বসু। বয়স্ক, আমি জানি তুমি ত বেশ বলশালী।

নন্দ। প্রভু আমার সামর্থ্যের কথা তবে শুনুন। শিং দিয়ে মাটি খুঁড়ছে এমন বৃষের শিং ধরেও আমি তার খাড় সোজা করে দিয়েছি। তাও বোঝাই পাড়ীর চাকা

\* জোয়াল।

কাদা থেকে একা তুলে দিয়েছি। আমার এত সামর্থ্য কিন্তু কি আশ্চর্য্য এখন এই ছেলেটিকে তুলে নিয়ে যেতে পাচ্ছি না।

পক্ষাযুগ ও গুরুড়ের প্রবেশ

গুরুড়। আমি সুন্দরপক্ষ বহাবেগশালী গুরুড়; আমি বিষ্ণুর রথ এবং ধ্বজ দুইই। পুরাকালে দেবাসুর যুদ্ধে বিষ্ণুর বলেই আমি বিষ্ণুকে বহন করেছি।

চক্র। আমি মধ্যাহ্ন-স্বর্ঘ্যের তায় উগ্রভেজা কৃষ্ণের কর-শোভী চক্র। বিষ্ণুর ত্রিপদ-বিক্ষেপ-কালে এবং অমৃতস্বন-সময়ে দানব ও দৈত্য-সমূহকে আমিই বিনাশ করেছি।

শাঙ্গ'। আমি শাঙ্গ'; আমার সুগোল মধ্যদেশ স্ত্রীলোকের ক্ষৌণ কটির তায় আনন্দদায়ক, এবং এই মধ্য দেশে বিষ্ণুর করণ হ'য়েই আমি যুদ্ধে পুরুষের তায় বীৰ্য্য-প্রদর্শন করে থাকি; আর বিষ্ণুর প্রয়োজন সাধনের জন্তই প্রবল যুদ্ধে হস্তা, অশ্ব, রথ, সৈন্য প্রভৃতি বিপুল শত্রু নাশ করি।

কৌমোদকী। আমি হরির গদা; আমার নাম কৌমোদকী। পুরাকালে বিষ্ণুর আদেশে আমিই সরস্বতী মন্থন করেছি, এবং যুদ্ধ-নিহত দানবগণের শোণিত-নদীতে কেলি করেছি।

শঙ্খ। আমি শঙ্খ। কীরৌদ সরস্বতী হ'তে বিষ্ণু স্বয়ং আমাকে উদ্ধার করেছেন। আমার শব্দ শুনেই দেবতার শত্রুগণ যুদ্ধে স্তিমিত হয়।

নন্দক (খড়্গ)। আমি নন্দক; সংগ্রামে কোথাও আমি পরাধু হই না। প্রভাবশালী বিষ্ণুর অরণ মাজেই আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হ'য়ে থাকি।

চক্র। চক্র, শাঙ্গ', গদা, শঙ্খ ও নন্দক—আমরা সকলেই দৈত্য সংহার করে থাকি। বাসুদেবের কার্য সাধনের জন্ত আমরা সকলে একত্র হ'য়ে আজ এখানে উপস্থিত হ'য়েছি।

ওহে তোমরা সকলেই এস। ভগবান বিষ্ণু বল্লভ্য-

আমিন-কার্তিক ১৩২১

লোকে অবতীর্ণ হ'য়েছেন, আমরাও তাঁর বালালীলা সাধন করার জন্য গোপাল বেশ ধারণ করে যোবপন্নীতে অবতীর্ণ হব।

সকলে। তথাক্ত (বিষ্ণুর নিকট আগমন)

বসু। বয়স্ক, এই বালককে নমস্কার কর।

নন্দ। প্রভু, তাই কচ্ছি। রাজকুমার, আপনাকে নমস্কার। আপনাকে ব'য়ে নিয়ে যেতে পারে এই গোপালকের এরূপ পরাক্রম কোথায়!

চক্র। ভগবান্ মহাবিষ্ণু, ভগবান্ নারায়ণ, আপনাকে নমস্কার।

অমরগণের কার্য্যাকার্য্য আপনার সংস্পর্শেই এই পৃথিবীতে প্রভাবশালী হ'য়ে থাকে, সুতরাং হে ষড়বংশ-কেতু, সাধারণ লোকের সংসর্গকারী এই অধমের প্রতি কৃপা করুন।

বসু। এই নাও।

নন্দ। প্রভু যা বলছেন। (গ্রহণ)

বসু। বয়স্ক, রাত্রি প্রভাত হ'য়েছে; এখন ফিরে যাও।

নন্দ। প্রভু, আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! আমার পায়ের ছুটা শিকলই খুলে গেল!

বসু। এই সমস্তই কুম্বারের প্রভাবে হচ্ছে। যাও ফিরে যাও।

নন্দ। প্রভুর যেমন আদেশ।

বসু। আচ্ছা, এস ত একবার আমার কাছে।

নন্দ। প্রভু, এই এসেছি।

বসু। ভূমি স্বভাবতঃই স্নেহশীল আমি জানি, তথাপি ছেলেটিকে খুব স্নেহ করো, এই আমার অনুরোধ। দ্বাদশশিষ্ট ষড়বংশের বীজ তোমার হাতে সমর্পণ করেছি, ভূমি ইহাকে রক্ষা কতে পারবে।

আচ্ছা ছেলেটিকে ভূমি কি রকমে রাখবে?

নন্দ। প্রভু শুনুন কি রকমে রাখব। এই শিশু এক বাড়ীতে যেয়ে ছুঁতে থাকবে, আর এক বাড়ীতে যেয়ে দৌঁতে থাকবে, অল্প আর এক বাড়ীতে গিয়ে নবনীত থাকবে এবং অপর এক গোপের বাড়ীতে গিয়ে বোলের ঘট দেখবে। বেশী আর কি বলব, এই শিশু সকল ঘোষের রাজা (কর্তা) হবে।

বসু। আচ্ছা তাই হ'ক। ভূমি ফিরে যাও।

নন্দ। প্রভুর যা আদেশ। [প্রস্থান।

বসু। নন্দগোপ ত চলে গেল। আমিও এখন মথুরায় ফিরে যাই। (পরিক্রমণ করিয়া) ক্রন্দন শব্দ শুনিছ না? তবে কি কংসের ভয়ে নন্দগোপ আবার ফিরে এল! (পরিক্রমণ করিয়া) একি! মেয়েটি যে বেঁচে উঠেছে দেখছি! বেশ হ'য়েছে; এই মেয়েটি দেবকীকে দিয়ে হুরায়া কংসকে বধনা করব। (গ্রহণ করিয়া) বাবা! কি ভারি! এই মেয়েটিও কুমার বাসুদেব হ'তে অল্প রক্ষা এক বিশেষ প্রাণী হবে সন্দেহ নাই। আচ্ছা এখন যাই। একি! ভগবতী যমুনা ঠিক তেমনই রয়েছে দেখছি। যাই তবে নদী অতিক্রম করি। এই যে যমুনা উত্তীর্ণ হলুম। এই যে নগর-তোরণ। মথুরার সব লোক তেমনই নিদ্রিত রয়েছে। আচ্ছা নগরে প্রবেশ করি। (প্রবেশ করিয়া) দেখে বোধ হচ্ছে হুরায়া কংসের গৃহে যেন অলঙ্কার অধিষ্ঠান হয়েছে; আর আমাদের গৃহ যেন লক্ষ্মী দেবা আশ্রয় করেছেন। যাই অকঃপুরে প্রবেশ করে দেবকীকে আশ্বাসিত করি গে। দেবগণ মঙ্গল করুন।

[প্রস্থান।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশুকবদ্ধ ভট্টাচার্য্য।

## পাটুনা \*

নীল নভ-পারাবার-পারে

অমৃত পুরী ;

হত-আশে ধরণীর কুলে

মরি গুরি' গুরি' ।

অন্ড-উেলাগুলি চেয়ে চেয়ে

ভাবি কোথা আছে মোর নেয়ে.

কোন তরী আসিবে সে বেয়ে

ক'রে মন চুরি ?

মহানীল অকুলতা দলি'

মন বেগে ছুটে যাবে চলি.'

ফুটা'বে সে হৃদি-কুল-কলি,

ত্রিতাপ বিদূর' ।

তার পরে উতরিবে তীরে,

দাঁড়াবে অপ্সরা ঘিরে,

যা আমার, মুখে দিবে ধীরে

স্তন-তার পুরি' ।

শ্রীহর্গামোহন কুশারী ।

## বাঙ্গালীর উচ্চারণ

বাঙ্গালী ঋগী উচ্চারণ করিতে অসমর্থ। এই প্রবাদ ছরপনয়। ইহাতে বাঙ্গালী আপত্তি করে না, করিতে পারেও না; কারণ, বাঙ্গালী বৃত্তিতে পারিতোছে, প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় আক্রমণের ফলে, তাহাদের বাগিল্লিয় এত বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছে যে, যদিও হিন্দু-স্থানীর অনুকরণ করিয়া উচ্চারণপরিভুক্তিকারী কোন কোন ব্যক্তি আত্মা, চক্ষু প্রভৃতি উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তথাপি শ-কারত্রয়ের এবং ব-কার দ্বয়ের পৃথক উচ্চারণ কিছুতেই সংঘটিত হইয়া উঠে না। এই রূপ অনেক বর্ণেরই উচ্চারণগত বৈকল্য ঘটিয়া থাকে। এই উচ্চারণ-বিভ্রাট কত কাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা একবার বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। সংস্কৃত শব্দের অবিকৃত উচ্চারণপট্ট বলিয়া যে সকল জাতি প্রসিদ্ধ, তাহাদের বাগিল্লিয় প্রকৃতির আক্রমণ হইতে সর্বতোভাবে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছে কি না, তাহাও একবার বিচার করা আবশ্যক।

যদি এই বিচারের ফলে আমরা দেখাইতে পারি যে, মানব মাত্রেয় বাগিল্লিয়েই প্রকৃতির কুলকল্য ব্যাসনের পারচয় পাওয়া যায়, তবে বাঙ্গালী-কুৎসন-প্রয়াসী জাতিকে স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহারা নিজের দোষ না বুঝিয়াই কেবল পরকুৎসনে অভিযুক্ত। জানি না কাহাকে লক্ষ্য করিয়া দাক্ষিণাত্যের পরিহাস-পেশল কবি একটি কবিতা পাঠ করিয়াছেন—  
“অবিদিত শব্দ বিশেষা বাণী বদনাদ্‌ বিনির্গতা বোম্ব।  
গুদবদন-বিবর-বিত্তোদো রদনৈবেব ধলু দৃশ্যতে তেবাম্।”

ইহার অর্থ এই—মহাদেয় মুখ হইতে বিনির্গত ভারতীতে শকার ত্রয়ের পার্থক্য পরিস্ফুট হয় না, তাহাদের মুখচ্ছিন্নের এবং অপাল-রক্তের প্রভেদ কেবল দন্তের দ্বারাই বৃত্তিতে হয়। আপাত দৃষ্টিতে এই প্রেক্ষীর পরিহাসব্যঞ্জক বচন বিজ্ঞাস কবিরের নিদর্শন বটে,

\* প্রকাশিতব্য গীতিকাব্য “কণ্ঠ” হইতে। স্বর  
“হুটিতে পারিত গো হুটিল না সে”

আবিন-কাঠিক ১০২১

কিন্তু একটু প্রণিধান সহকারে চিন্তা করিলে, এতদূশ বচনের অসারতাই প্রতিভাত হয়। কারণ, বেদের মধ্যে পর্য্যাপ্ত প্রকৃতির আক্রমণের পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি শকারের স্থানে সকারের উচ্চারণের ত কথাই নাই। যে সকারকে হকার উচ্চারণ করিয়া আমরা পূর্ববঙ্গবাসী বাঙ্গালীর অন্তর্গত “বাঙ্গাল” রূপ একটি স্বতন্ত্র আখ্যা লাভ করিয়াছি, খাঁচী বেদেও তাহার নিদর্শন দেখা যায়। শিরা “হিরা” হইয়া গিয়াছে (১)। ভাষ্যকার সায়ন শকারের স্থানে হকার “ছান্দস” বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। “ছান্দসই” হউক আর “আর্ধই” হউক, ইহা কেবল কথার কথা, ফলতঃ প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় প্রভাবেরই পরিচায়ক। যে প্রাকৃত ভাষা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া, ভারতের সর্বত্র সভ্য সমাজে সমাদৃত হইয়াছিল, যে ভাষার গ্রন্থাবলী আদর্শ নায়ক রামচন্দ্রেরও পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল, (২) সেই ভাষাতে একাধিক সকারের অধিষ্ঠান নাই। প্রাকৃত ব্যাকরণের সূত্রাবলীই এই বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কাহার উচ্চারণ যে খাঁচী, সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে, তাহার নির্ণয় হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। আখ্যাবর্তের বর্ণিত দাক্ষিণাত্যে বসিষ্ঠ, আখ্যাবর্তের শূকর দাক্ষিণাত্যের শূকর। এই সমস্তার ভঞ্জন করিবে কে ?

শকার জয়ের অধিকারগত বিবাদ অনেক কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। এই বিষয়ে প্রামাণিক

(১) অমর্য্য বস্তি বোঝিতে হিরা লোহিত বাসসঃ।

অথর্ববেদ সংহিতা—১৮ পৃঃ

(২) শ্রৈষ্ঠ্যং চান্দ্র সমূহেযু প্রাণোব্যামি \* প্রকেযুচ।

অর্থ ধর্মোচ সংগৃহ সূতন্ত্রো ন চালসঃ।

রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড ১ম সর্গ। ২৭ শ্লোক।

\* ব্যামি প্রকেযু প্রাকৃতাদি ভাষা—মিলিত নাটকাদিযু, ভিলক টীকা।

গ্রন্থকারদিগেরও বিভিন্ন মতের পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি যে সকল ধাতুকে মূল করিয়া শব্দে রূপ এবং অর্থ স্থির করা হয়, সেই সকল ধাতুগত শকার সম্বন্ধেই মহাবৈয়াকরণদিগের মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। এই স্থলে মাধবীয় ধাতুতত্ত্ব হইতে কয়টি উদাহরণ উদ্ধৃত হইল। সায়ন “কুস্প্রেষণে” এই কুস্ ধাতুকে দন্ত্যসকারান্ত পাঠ করিয়া বলিয়াছেন যে, দুর্গসিংহ এই ধাতুকে তালব্য শকারান্ত পাঠ করিয়াছেন। (৩) “মুসখণ্ডনে” খণ্ডনার্থ মুস্ ধাতুকে সকলেই দন্ত্যান্ত পাঠ করেন, কিন্তু আত্রেয় নামক গ্রন্থকার কাতন্ত্র ব্যাকরণে ইহাকে মুখ্যান্ত পাঠ করেন। (৪) অতঃপর বলিয়াছেন যে, অসুধাতু হইতে মুস্ পর্য্যন্ত সমস্তগুলি ধাতুই দন্ত্যান্ত। (৫)

এই উক্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বহু শতাব্দী পূর্ব হইতেই শকার জয়ের সঙ্গে তালব্য মুখ্য প্রভৃতি বিশেষণ লাগাইতে হইতেছে। উচ্চারণের দ্বারা পার্থক্য প্রদর্শনে দাক্ষিণাত্যবাসীর বেদ-বিশুদ্ধ বাগিঞ্জিয়ও অসামর্থ্য প্রদর্শন করিয়াছে। কারণ যদি উচ্চারণের দ্বারাই প্রভেদ বুঝাইতে পারিতেন, তবে শান্ত, ব্যক্ত, সান্ত বলিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, তালব্য প্রভৃতি বিশেষণ সন্নিবেশের কিছুই প্রয়োজন হইত না।

মূল ধাতুগত এইরূপ বৈষম্যের ফলেই মুসল প্রভৃতি শব্দে বিভিন্ন বকার দেখা যাইতেছে। কোষ প্রভৃতি শব্দ দ্বিরূপ হইয়া দেখা দিতেছে।

(৩) “কুস্প্রেষণে”—দুর্গন্তালব্যান্তঃ পপাঠ। ধাতু তত্ত্ব দিবাদি—১৮৩ পৃঃ

কোষ শব্দের অর্থ প্রদর্শন প্রসঙ্গে “ভাষ্যকী দীক্ষিত” বলিয়াছেন যে, ইহা হইতে স্বয়ং নির্গত হয়, এই অর্থে

(৪) “মুসখণ্ডনে” দন্ত্যান্ত ইতি সর্বে, আত্রেয়ঃ কাতন্ত্রে মুখ্যান্তোহয়ং।

(৫) অতাদয়োনি পৰ্য্যন্তা দন্ত্যন্তাঃ। এ।

কৃষ্ণাভূর উত্তর ষঞ্ প্রত্যয় হইয়া কোষ শব্দ নিপন্ন হইয়াছে। ইহার তালব্যান্তরূপও দেখা যায়। যেদিনী কোবে ছই প্রকার রূপই পঠিত হইয়াছে। (৬) তবেই দেখা যাইতেছে যে, উদাত্তাদি স্বর-পার্বক্য-প্রকটন-কুশল ভানুজী প্রভৃতিও কঠোক্তির দ্বারা শকার ভেদ প্রদর্শনের পরিচয় প্রদান করেন না। সুতরাং বাঙ্গালীই যে কেবল উচ্চারণে অসামর্থ্য বশতঃ তালব্য প্রভৃতি বিশেষণের সহিত শকারের পাঠ করে, একথা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে।

হিন্দুস্থানীগণ মূর্ধ্য বকারকে অনেক স্থলেই ষকার রূপে উচ্চারণ করেন; যেমন ভূষণ ভূষণ, ষটশাস্ত্রী ষটশাস্ত্রী ইত্যাদি। স্থল বিশেষে বাঙ্গালীর মুখেও এইরূপ উচ্চারণ হয়। যেমন চক্ষু, ইহার উচ্চারণে ককার ষকারের সংযোগই প্রকটিত হইতেছে। কিন্তু এই স্থলে হিন্দুস্থানীগণ বকারকে ষকার না করিয়া বকার রূপেই পাঠ করেন—চক্ষু।

আচার নিয়ম সম্বন্ধে হিন্দু মুসলমানের যেমন বৈপরীত্য দেখা যায়, বকারের উচ্চারণেও সেইরূপ হিন্দুস্থানীর ও বাঙ্গালীর রূচিভেদ দেখা যায়। বাঙ্গালীর মুখে উচ্চারিত লক্ষণ হিন্দুস্থানীর মুখ হইতে লঙ্ঘন হইয়া বাহির হইতেছে। এই উচ্চারণে একটু বিশেষ লক্ষ্য করিবার কথা আছে। হিন্দুস্থানী সকারকে ছকার রূপে উচ্চারণ করেন, সুতরাং লক্ষণের উচ্চারণে বকারের পরিবর্তে দন্ত্য সকারের উচ্চারণ ঘটিতেছে। নান্ন নাত প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণে বাঙ্গালীর মুখেও ছকারের আভাস পাওয়া যায়। মূর্ধ্য বকারের ও ষকারের

বাতায় প্রসঙ্গে পাণ্ড শব্দ দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিরুক্তি অনুসারে দেখা যায়, পাণ্ড শব্দের মধ্যবর্তী বর্ণ ষকার,—পালন করে বলিয়া বৈদিক ধর্মের নাম পা, সেই পাকে ষগুন করে বিধায় বেদবিরুদ্ধ আচরণ ও আচরণকর্তা পাণ্ড নামে কথিত হয় (৭)। কিন্তু বাঙ্গালী এই স্থলে ষকারকে বকাররূপে উচ্চারণ করিতেই অভ্যস্ত। বাঙ্গালীর টীকা প্রভৃতি দেখিয়াই বোধ হয় ভানুজী দীক্ষিত শব্দটিকে দ্বিগুণ বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। বকার ষয়ের লিপি বিস্তারিত বাঙ্গালী পার্বক্য প্রদর্শন করে না। দেবনাগর অক্ষরে বর্ণ্য বকারের মধ্যভাগে একটি ছেদ দেখা যায়। কিন্তু এই ছেদকে সর্বত্র উচ্চারণের প্রভেদ জ্ঞাপক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কারণ অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়মামুসারে যমক প্রভৃতি অলঙ্কারে বকারবয়ের ঐক্য অর্থাৎ একরূপ উচ্চারণ স্থিরীকৃত হইয়াছে। + সুতরাং বুঝা যায় যে, বাঙ্গালী যেমন উচ্চারণের দ্বারা শকারত্রয়ের পার্বক্য ব্যক্ত করিতে পারে না, অথচ লিপিতেও ভেদ প্রদর্শন করে, এইরূপ অন্যান্য দেশেও বকারের সম্বন্ধে ব্যবস্থা হইয়াছে।

প্রাকৃতের প্রভাব সংস্কৃত ভাষার এত অধিক মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহার ফলে সংস্কৃত শব্দের খাঁটি স্বরূপ কি ছিল তাহার নির্ণয় অনেক স্থলেই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। অমরকোষে এবং যেদিনী কোবে কোমবস্ত্র অর্থে দুক্ল শব্দ দেখা যায়। কিন্তু হেমচন্দ্রের অভিধানে এই শব্দটির “দুক্ল, দুগুল” এই দুই রূপ

(৬) কৃত্তি নিদ্ধামত্য মাৎ স্বয়মেব। অকর্তরিচ।

৩৩১৯ ইতি ষঞ্ ॥

মূর্ধ্যান্তে যেদিনী। তালব্যান্তোপায়ঃ। “কোশোজী” ইতি তালব্যান্তেবু যেদিনী।

(৭) পালনাচ্চ ত্রয়ী ধর্মঃ পাশঙ্কেন নিগততে।

তং ষগুয়ন্তি তে যমাৎ পাণ্ডা স্তেন হেতুনা।

† যমকাদৌ ভবেদৈকং ভলোর্ববোর্বব শুধা।

সাহিত্যদর্পণ।



আশ্বিন-কাৰ্ত্তিক ১৩২১

পঠিত হইয়াছে। অমর ও মেদিনীকার এই উভয়ের  
মতেই ওত্র পুণ্য অর্থে জপা শব্দ পঠিত হইয়াছে।  
কিন্তু ধর্মদাস নামক গ্রন্থকার জপা শব্দও পাঠ  
করিয়াছেন। \*

পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাস ভাষ্যে জপা শব্দই দেখা  
যায়। এই সকল রূপ বিপর্যয় যে প্রাকৃত প্রভাব  
গ্রন্থত, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু আদি  
যুগে ইহাদের যে কি রূপ ছিল তাহার নির্ণয় করা মানব  
শক্তির অতীত। প্রাকৃতের প্রভাবে প্রথম বর্ণের  
স্থানেও তৃতীয় হয় এবং তৃতীয়ের স্থানেও প্রথম বর্ণ হয়।  
অতরাং এইরূপ স্থলেই প্রাকৃতের সাহায্যেও মূল নির্ণয়  
অসম্ভব; অতএব উচ্চারণ বিভ্রাটের অভিযোগটা  
কেবল বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে ঠাড়া করা যাইতে পারে  
কি না, বিচারনিপুণ মনোবিগণ তাহা স্থির করিবেন।

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

হাসিছে মধুর হাসি

স্বপনে শিতুর প্রায়।

মন্দিরে আরতি-শব্দ

উঠিল স্বরগ পানে

শান্তি মন্ডাপিকনী-ধারা

বহে ধীরে ভক্ত-প্রাণে।

সাক্ষিয়া স্তম্ভর সাজে

সলাঙ্গ মধুর হাসে

ধীর পদে সন্ধ্যা ঐ

অভিগারে নেমে আসে

শ্রীচাক্র গুপ্তা

## সন্ধ্যা

সিদ্ধ-পুত্র তম্বুখানি

আবরি সোনালি বাসে,

সলাঙ্গ আমত মুখে

সন্ধ্যারাগী নেমে আসে।

সারাটি দিবস রবি

ছড়ায় রূপের রাশি,

সন্ধ্যার রক্তিম ক্রোড়ে

ঢলিয়া পড়িছে হাসি।

উজ্জল তারকা রাশি,

কুটিল গগন-গায়,

\* জবায়ান্ত জপা শব্দ। অমর বনোবধিবর্গ।

৭৬ শ্লোক হতানুজীটা।

## পাঁচদোনার দেওয়ান দর্পনারায়ণ

আজ যে স্বনামধন্য মহাপুরুষের জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে  
আমরা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম তিনি বঙ্গ-  
দেশের ইতিহাসে উল্লেখ-যোগ্য একজন সুপ্রসিদ্ধ লোক।  
কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, বঙ্গের কোনও  
ঐতিহাসিক কোনও ইতিহাসে ইঁহার নামোল্লেখ করেন  
নাই। অতীতের অন্ধকাররূপ স্ববনিকার অন্তরালে এই  
প্রকার কত ঐতিহ্যতত্ত্ব যে লুক্কায়িত আছে তাহার ইয়ত্তা  
করা কঠিন ব্যাপার। সেই সকল তথ্য উদ্ধার করা যে  
কত কঠিন কার্য্য তাহা শিদ্ধি লোক যাহেই অবগত  
আছেন। যেখানে ভবিষ্যদ্বাণী তালুকদারী সংক্রান্ত কাগজ-  
পত্র, দেশ প্রচলিত প্রবাদবচন ও বৃদ্ধদের মুখের কথা

ইতিহাসের প্রধান উপকরণ সেখানে অল্পমতি লেখককে পদে পদে ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা। যদি এই ক্ষুদ্র লেখকের লেখা পাঠ করিয়া কোনও ঐতিহাসিক বর্তমান প্রবন্ধে বর্ণিত বিষয়ের প্রকৃত বিবরণ প্রকাশ করিবার জন্য সমুৎসুক হন তাহা হইলেই লেখকের সকল পরিশ্রম সফল হইবে।

ঢাকা সদর ও নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অধীন মহেশ্বরদী পরগণা। এই পরগণা পূর্বে সুবর্ণ-পাঁচদোনার গ্রামের অধীন মখাদি নামে অভি-নামকরণ, অবস্থান হিত হইত। পরে বৈষ্ণবংশীয় ও সাম্যাজ্য বিবরণ মহেশ্বর নামক জনৈক বিখ্যাত ব্যক্তি মখাদিকে নিজ নামে মহেশ্বরদী বলিয়া পরিচিত করেন। এই পরগণার দৈর্ঘ্য উত্তরসীমা কঠিয়াদীর নিকট হইতে দক্ষিণ সীমা মুড়াপাড়ার দক্ষিণ পর্যন্ত প্রায় ৪১।৪৬ মাইল। প্রস্থ লক্ষ্য-নদীর পূর্ব তীর হইতে মেঘনার পশ্চিম তীর পর্যন্ত ১২ হইতে প্রায় ১৮ মাইল। ইহার উত্তর সীমায় মঠলার নিকট ব্রহ্মপুত্র প্রবেশ করিয়া এই পরগণাটিকে পূর্ব পশ্চিমে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থস্থান লাঙ্গলবন্ধের দক্ষিণে নীতল লক্ষ্যার শেব সীমায় ধলেশ্বরীতে পতিত হইয়াছে। এই ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তীরে পাঁচদোনা গ্রামটি অবস্থিত। ব্রহ্মপুত্র যখন সচল ছিল তখন পাঁচদোনা অত্যন্ত উন্নত ছিল। এখানে অনেক প্রাচীন দৌষি, পুন্ডরিনী, মঠ, ইষ্টকালয় প্রভৃতি বিস্তারিত থাকিয়া গ্রামের প্রাচীনতার ও পূর্ব সমৃদ্ধির পরিচয় এখনও দিতেছে। কথিত আছে, ত্রিপুরার মহারাজ প্রেরিত কোন সেনাপতি এখানে আসিয়া ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিয়া কোন ব্রাহ্মণকে পাঁচ জোণ ভূমি দান করেন। সেই অল্পসারে এই স্থান “পঞ্চজোণা” কালে পাঁচদোনা নামে অভিহিত হইয়াছে। এখনও পাঁচদোনার অনেক ভাস্কর সম্পত্তির কাগজে “ত্রিপুরা-পতি” বলিয়া লিখা হইয়া থাকে।

বর্তমান পাঁচদোনা গ্রামের দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে প্রায় অর্ধ মাইল। প্রস্থ পূর্ব পশ্চিমে প্রায় সিকি মাইল। গ্রামের মধ্য দিয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের একটি রাস্তা পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত। দুঃখের বিষয় এই রাস্তাটি ব্রহ্মপুত্রে বন্ধন করিয়া দিয়াছে। এই রাস্তা হইতে গ্রামের ভিতর অনেকগুলি লোকসবোর্ডের রাস্তা গিয়াছে। ব্রহ্মপুত্র-নদী উপলক্ষে প্রতি বৎসরই এখানে বহু হিন্দু নরনারী সমবেত হন। তৎপক্ষে একটি মেলা হয়। গ্রামে প্রায় ১৫০০ শত লোকের বাস। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কার্বয়, বৈষ্ণ, শূদ্র, বণিক, তেলি, গোপ, কুলকার, কর্ম-কার, নাপিত, ধোপা, ভুইয়ালী, কৈবর্ত, নমঃশূদ্র, সাহা, হুজুর, লখাচার্য প্রভৃতি নানান শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান আছে। ইহাদের মধ্যে বৈষ্ণ সম্প্রদায়ই সমধিক উন্নত।

মুসলমান রাজত্ব হইতে বর্তমান ইংরেজ রাজত্ব পর্যন্ত তাঁহার উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত আছেন। গ্রামে বহু শিক্ষিত লোকের বাস। এমন কি প্রবন্ধে বর্ণিত দেওয়ান দর্পনারায়ণ-বংশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধীধারিণী স্ত্রীলোকও এই গ্রামে বিস্তারিত আছেন। এই গ্রামে দুই শ্রেণীর বৈষ্ণবংশ বিস্তারিত। এক দেওয়ান দর্পনারায়ণের বংশ ও অপর হাওলার বংশ। দুইটাই অতি প্রাচীন ও উন্নত। দেওয়ান দর্পনারায়ণের সময় হইতেই তদীয় বংশ ও পাঁচদোনা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই বংশের প্রাচীনতার নিদর্শন একটি জীর্ণ প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। ইহা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই বংশীয়েরা পূর্বে গোড় দেশে (বর্তমান মালদহে) ছিলেন। দ্বিজ পুরুষ হইতে আমরা এই বংশের পরিচয় প্রাপ্ত হই। তাহার পুত্র কালীদাস, তৎপুত্র সুরানন্দ। সুরানন্দের পুত্র পরমানন্দ। পরমানন্দের পুত্র ত্রিনিবাস। তিনি মসনদআলীর সরকারে দস্তিদারের কার্য করিতেন। এরিপের মাপকাঠি তাঁহার হস্ত প্রমাণ ছিল। এমন কি তাঁহার দস্তখত ভিন্ন ঐ সরকারে কোনও কাজ হইত না। ইহা বারংবার প্রতিপন্ন

আধুনিক-কালিক ১০২১

হয় যে, তিনি উক্ত জমিদার সরকারে অতি প্রধান ও বিচক্ষণ কর্মচারী ছিলেন। পদ্মানদীর পশ্চিমে মধুরা-নামক স্থানে সম্ভ্রান্ত নামক রাজ্য রাষ্ট্র করিতেন। শ্রীনিবাস তাঁহার কন্যা হারাবতীকে বিবাহ করেন। তাঁহার দুই বিবাহ ছিল। ১ম জ্বর গর্ভে রাঘব রায়, ২য় জ্বর গর্ভে ১ম বলরাম, ২য় গৌরীকান্ত, ৩য় ভবনাথ এই পুত্রত্ৰয় জন্ম গ্রহণ করেন। বলরাম পাঁচদোনার সংলগ্ন ভাটপাড়ায় বাইয়া এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করিয়া তাহার তীরে বাসস্থান নির্মাণ করিয়া অবস্থান করেন। বর্তমান সময়ও সেই দীর্ঘিকা বিজ্ঞমান আছে। পরন্তু দীর্ঘির পাড় বলিয়া ভাটপাড়ায় একটা পাড়াও অস্ত্যপি বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। বলরাম সেন দেওয়ান জৈবর্ধার সরকারে পত্রনবীশের কাজ করিতেন। আজ পর্যন্তও মহেশ্বরদী পরগণায় “তালুক বলরাম পত্রনবীশ” নামীর অনেক তালুক আছে। ইহাচার্য্য তাঁহার শ্রেষ্ঠের পরিচয় পাওয়া যায়। ২য় গৌরীকান্ত সেনের নিবাস পাঁচদোনা ( নৌলাপাড়া )। ৩য় ভবনাথ সেনের বংশধরগণ পাঁচদোনা উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ায় বর্তমান আছেন। শ্রীনিবাস সেনই প্রথমতঃ গোড়দেশ পরিত্যাগ করিয়া সুরবর্গগ্রামে আসিয়া বাসস্থান নির্মাণ করেন। তিনি সুরবর্গ গ্রামে সেনপাড়া, কালীপাড়া, ভবনাথপুর গ্রাম সকল স্থাপন করেন। ভবনাথপুর গ্রামটি হারিয়া নামক প্রসিদ্ধ গ্রামের নিকট এখনও বিজ্ঞমান আছে। অস্ত্যন্তগুলি হুরভিক্রম্য কাল যেনায় কৃষ্ণগত করিয়াছে। সঙ্গ সঙ্গ প্রাচীন কীর্ত্তি কলাপাদিও বিনষ্ট হইয়াছে। অস্থমান ভবনাথের নামানুসারে ভবনাথপুর গ্রামের নামকরণ হইয়াছিল। পুথিতে উল্লিখিত আছে যে রাঘব রায় ভ্রাতৃগণকে সম্পত্তির কিছুই না দিয়া তৎপুত্র রত্নেশ্বরকে সকল বিষয়ের উত্তরাধিকারী করেন। এইজন্য ভ্রাতৃত্ৰয় দেশত্যাগী হন। এদিকে রত্নেশ্বর বগ সাহচর্য্যে সমাজ হ্যত

হন।\* পরন্তু যেনায় কালীপাড়া প্রভৃতি গ্রাম সকল নষ্ট করিয়া ফেলিলে তিনিও দেশত্যাগ করেন। বলরামাদি ভ্রাতৃত্ৰয় বঙ্গদেশে বিবাহ করেন। এই নিমিত্ত গোড়ীয় সমাজে মর্যাদা ভ্রষ্ট হন। এই বলরামাদি ভ্রাতৃগণই প্রথমতঃ পাঁচদোনার আসেন। ভবনাথের পুত্র রামজীবন সেন। তিনি বিক্রমপুর মুড়াকাটা গ্রামের ধনীগ্রাম দাসের কন্যার পাণি-গ্রহণ করেন। তৎপর লক্ষ্মীনারায়ণ সেন। তিনি বিক্রমপুর সোমভারা গ্রামে বিবাহ করেন। সেই জ্বর গর্ভে ৩ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ১ম সন্তোষনারায়ণ, ২য় দর্পনারায়ণ, ৩য় ইন্দ্রনারায়ণ। প্রত্যেকের বংশধরগণই অতি প্রসিদ্ধির সহিত পাঁচদোনাতে অবস্থান করিতেছেন। বর্তমান সুযোগ্য সিবিলিয়ান মিঃ বি, সি, সেন ও ইঞ্জিনিয়ার ৬ চারু চন্দ্র সেন ইহাদেরই বংশধর। বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ রূপচন্দ্র মুন্সী এই ইন্দ্রনারায়ণের কন্যা পক্ষের।

দেওয়ান দর্পনারায়ণ কোন্ সময় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার আলোচনা দরকার। দেওয়ান দর্পনারায়ণের দর্পনারায়ণের নিজ বাটীর ২য় সময় নির্ণয়। প্রকোষ্ঠের সিংহদ্বারের প্রাচীর-গাত্রে ভিতর দিকে “৬শ্রীদুর্গা” তাহার নিয়ে “১১১০” ও সর্ব্বনিম্নে শ্রীদর্প... .. লিখিত দেখিলাম। দর্পনারায়ণ সেন লেখাটির মধ্যের অক্ষরগুলি উঠিয়া গিয়াছে। লেখাগুলি প্রাচীর গাত্রে সুরকি দ্বারা লিখিত। নামটির মধ্যের অংশের আন্তর ধসিয়া যাওয়ায় নামটি সম্পূর্ণ নাই। এই ১১১০ বাঙ্গালা সন।

\* এদেশে প্রবাদ আছে যে কোনও বগ পান খাইয়া পানের রস সংমিশ্রিত থুথু ( দেশজ ভাষায় পানের পেচক ) উক্ত রাস মহাশয়ের শরীরে ফেলিয়াছিল। ইহাতে তিনি সমাজচ্যুত হন। বলা বাহুল্য সেই সময় হিন্দু সমাজ বর্তমান সমাজের তায় ছিল না। সমাজের বন্ধন অতি দৃঢ় ছিল।

কাজেই বর্তমান ১৩২১সন হইতে ২১১ বৎসর পূর্বের লিখা। দর্পনারায়ণকে ১ম পুরুষ ধরিয়া আনিলে তাঁহাদের কুলজি দৃষ্টে বর্তমান পুরুষকে ৬ষ্ঠস্থানীয় ধরা যায়। কাজেই ৬পুরুষে আমরা ২১০ বৎসর ধরিয়া লইলে অসঙ্গত হইবে না। যে দেওয়ান গাত্রে “১১১০” লিখাটি দেখিয়াছি তাহা ঠাকুর দালানের আজিনার সম্মুখস্থ প্রাচীরের সিংহ-ঘারে। হিন্দুগণ পাকাবাড়ী প্রস্তুত করিবার পূর্বে প্রথমতঃ ঠাকুর দালানই প্রস্তুত করান। তৎপর অগ্নাঙ্ক দালান প্রস্তুত করাইয়া থাকেন। বোধ করি এই ঠাকুর দালান ১১১০ সনে হইয়াছিল। সেই সময় তাঁহার বয়স অল্প ছিল বলিয়াই বোধ হয়। কার্যের উন্নতিও বিশেষ হয় নাই। ক্রমে কার্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃত বাড়ীঘর প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

তিনি ১১১০ সনের পূর্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে কত দিন পূর্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ঠিক বলা যায় না। আমরা দেশ প্রচলিত প্রবাদ বচন হইতে এই জানিতে পারি যে, তিনি মূর্শিদকুলিখাঁর সময় ঢাকাতে কার্যে যোগদান করেন ও তাঁহার রাজধানী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও মূর্শিদাবাদে যান। (১৭০৩ খৃঃ)। সেই সময় তাঁহার কার্যের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। তাহার ২।৪ বৎসর পূর্বে মাত্র কার্যে যোগদান করিয়াছিলেন। তখন পারশী ও সামান্য বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়াই লোক কার্যে ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইত। কাজেই ১৬১৭ বৎসর বয়সেই অনেকে কার্যে যোগদান করিত। দর্পনারায়ণেরও তাহাই হইয়াছিল। কাজেই ১৭০৩ খৃঃ (বাঙ্গালা ১১০২ সনে) আমরা দেওয়ানের ১১২০ বৎসর বয়স প্রাপ্ত হই। অতএব ১০২০ বাঙ্গালা সনের সাময়িক কালে দেওয়ানের জন্মের সময় ধরিয়া লইতে পারি।

নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাসে ত্রীযুক্ত

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে দর্পনারায়ণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তিনি কায়স্থ দেওয়ান দর্প-বংশোদ্ভব। তাঁহার বাসস্থান নারায়ণ কে? মূর্শিদাবাদের নিকটবর্তী ডাহার-পাড়ায় নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি নবাব আলিবর্দীখাঁর সরকারে কায়স্থনগোর কার্য করিতেন। আমরা যে দর্পনারায়ণের কথা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তিনি বৈষ্ণব বংশোদ্ভূত। তাঁহার নিবাস ঢাকা জিলার অন্তর্গত পাঁচদোনা নামক গ্রামে। তিনি মূর্শিদকুলিখাঁর সময় ঢাকাতে প্রথম কাজে নিযুক্ত হন। তৎপর ১৭০৩খৃঃ অঙ্গে মূর্শিদাবাদে রাজধানী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও মূর্শিদাবাদে যান। এক সরকারে একনামে দুইজন উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। কাজেই পরবর্তী কালে একের কীর্তিকলাপাদি অন্নের নামে সংযোজিত হইয়া যাওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে। দেওয়ান দর্পনারায়ণ প্রথমে শিক্ষানবীশী হইতে আরম্ভ করিয়া নিজ কার্যতৎপরতা দ্বারা কায়স্থ-গো ও তৎপর দেওয়ান পর্যন্ত হইয়াছিলেন। কাজেই ২জন দর্পনারায়ণ যে এক ঠেটে এক কায়স্থনগোর কাজ করিয়া পরবর্তী কালে এক ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইবেন তাহার বিচিত্র কি?

দেওয়ান দর্পনারায়ণের যে সকল কীর্তি এদেশে অজ্ঞাপি বর্তমান আছে তাহার প্রত্যেকটাই দেওয়ান দর্পনারায়ণের “দেওয়ানী উপাধির” সাক্ষ্যদান করিতেছে দেওয়ান দর্পনারায়ণ একজন ষষ্ঠপরায়ণ লোক ছিলেন। তিনি এই দেশে এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন যে, কোনও রোপিত বৃক্ষে ফল না হইলে, গাভী দোহন করিবার সময় গাভী লাগি দিলে, ইত্যাদি কার্যের সুফল প্রাপ্তির আশায় দেওয়ানের নামে মানসিক করার প্রথা প্রচলিত আছে। এই প্রকার ঘটনা পরম্পরায় দেওয়ান দর্পনারায়ণকে এই দেশীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব।

আবিন-কার্তিক, ১৩২১

আমরা নবাবী আমলের রাজ্য শাসন সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, নবাবী আমলের কার্যবিভাগ তখনও ভিন্ন ভিন্ন পদে ভিন্ন ভিন্ন লোক নিযুক্ত থাকিয়া রাজ্য কার্য সম্পন্ন করিতেন। আমরা মন্ত্রী বিভাগে (১) দেওয়ানী খালা (Prime minister) (২) দেওয়ান খালসা দরিকা (Finance minister) (৩) দেওয়ান-ই-তর্ন (Paymaster-General, and Minister of the Master) (৪) দেওয়ান-ই-বেহুতাং (Minister of domestic affairs) (৫) দেওয়ান-খান-সমান (Lord High Steward) প্রাদেশিক বিভাগে (১) দেওয়ান সুবাজাত (প্রাদেশিক মন্ত্রী) এই ৬ প্রকার দেওয়ানের কার্য দেখিতে পাই। এতদ্ব্যতীত অত্যাচ্ছ বিভাগে অত্যাচ্ছ কর্মচারী নিযুক্ত থাকিয়া দেশ শাসন করিতেন। দেওয়ান দর্পনারায়ণ যে কোন দেওয়ানী করিয়া এদেশে এত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা অতীব কষ্টকর। তবে এদেশ প্রচলিত জন-প্রভৃতি হইতে অবগত হওয়া যায় দেওয়ান দর্প-নারায়ণ যে যে তিনি নবাব বাড়ীর আসবাব-পত্র, বাড়ীর খরচ প্রভৃতি বিষয়ের দেওয়ানী অর্থাৎ সংসারের কর্তৃত্ব করিতেন। তাহা হইলে তিনি পূর্বোক্তাধিত ৪র্থ নির্দিষ্ট দেওয়ানী পদে কাজ করিতেন বলিয়া আমা-দের বিশ্বাস। আমরা পূর্বে দেওয়ানের সময় নির্ণয় করিতে বাইয়া যে সময় নিরূপণ করিয়াছি তাহাতে ১০২০ বাঙ্গলা সনে বা তাহার নিকটবর্তী কোন সময়ে দেওয়ানের জন্ম ধরিয়া লইয়াছি। ১০২০ সন = ১৬৮৪ খৃঃ অব্দ। যদি আমরা ৮০ বৎসর দেওয়ানের জীবিতকাল ধরিয়া লই তাহা হইলে ১৭৬৪ খৃঃ অব্দ বা তাহার নিকটবর্তী কোনও কালে তাহার মৃত্যু ধরিতে হইবে।

কাজেই ১৬৮৪-১৭০৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সময় তাহার জীবিত কাল ও কার্যকাল।

১৬৮৭ বৎসর বয়সে দেওয়ানের কার্য যোগদান ঘটয়া থাকিলে ১৭০০ খৃঃ অব্দ বা তাহার নিকটবর্তী কোনও সময়ে আমরা তাঁহাকে কার্যক্ষেত্রে প্রথম প্রবিষ্ট দেখিতে পাই। কাজেই মুর্শিদকুলিখাঁর সময় কার্যে প্রথম প্রবিষ্ট হইয়া তিনি নিজের প্রতিভাবলে ক্রমে উন্নতি করিয়া আলিবর্দীর সময় দেওয়ানের কার্য পান। সিরাজদ্দৌলার সময় কার্য পরিত্যাগ করিয়া আসেন। দেওয়ান দর্পনারায়ণ নবাব সরকারে ক্রমে ক্রমে ৩ জন নবাবের অধীনে কাজ করিয়াছেন। সিরাজদ্দৌলার আচরণে যখন তাঁহার কর্মচারীবৃন্দ তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন, তখন দেওয়ান সেই ষড়যন্ত্রে যোগদান করিবার নিমিত্ত অত্যাচ্ছ কর্মচারীগণ অনুরোধ করেন কিন্তু ধর্মভীরু, সরলপ্রাণ, কর্তব্যপরায়ণ, প্রভুভক্ত, বিশ্বস্ত ভূতা দেওয়ান দর্পনারায়ণ তাহাতে সম্মত না হইয়া পক্ষান্তরে নবাবকে সকল কথা জ্ঞাপন করেন। নবাব সিরাজদ্দৌলা সকল কর্মচারীকে আহ্বান করিয়া উক্ত ষড়যন্ত্রের কথা জিজ্ঞাসা করেন। হিন্দু ও মুসলমান সকল কর্মচারীই নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ বেদ ও কোরান স্পর্শ করিয়া প্রতজ্ঞাপূর্বক সকল কথা অস্বীকার করেন। ইহাতে নবাব দেওয়ানকে মিথ্যা-বাদী স্থির করেন। এই ঘটনায় দেওয়ান অত্যন্ত অপ্রতিভ হন এবং স্পষ্ট ভাষায় নবাবকে বলেন যে, “আমি এই নবাব সরকারে ক্রমাগত তিন নবাবের অধীনে কর্ম করিলাম। নিমক হারাম নহি। যে মনিব ভৃত্যকে অবিশ্বাস করেন আমি তাঁহার অধীনে কাজ করি না, এমন কি তাঁহার রাজ্যেও বাস করি না।” নবাব ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেওয়ান, তুমি আমার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কোথায় বাস করিবে?” তৎক্ষণে দেওয়ান বলিলেন “আমি ৬ কাশী বাসী হইব।” বলা-বাহুল্য সেই সময়ই কার্য পরিত্যাগ করিয়া বাড়ী

আসিয়া অমনি ৬ কাশী যাত্রা করিলেন। ৬ কাশী যাত্রাকালীন তাঁহার দত্তক পুত্র রামদাস ও ২য় স্ত্রীর গর্ভজাত একটি কন্যা (সেই সময় বিধবা) ও ২টা পুত্র শিবদাস ও কালিদাস বিজ্ঞমান ছিলেন।

আমাদের দেশে প্রত্যেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনীর স্ততিই এক একটা অলৌকিক দেওয়ান সম্বন্ধে উপন্যাস বিজড়িত থাকে। দেও-দেশ প্রচলিত যানের জীবনাতেও সেই প্রকার কতিপয় গল্প অনেক উপন্যাস বিজড়িত আছে।

১ম—বাল্যকালে দেওয়ানের অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। তিনি একদিন মিষ্টান্ন খাইবার জন্য তাঁহার মাতার নিকট আবদার করিলেন; অবস্থার দৈন্য প্রযুক্ত মাতা পুত্রের আবদার রক্ষা করিতে পারিলেন না। বার বার আদার করায় মাতা বিরক্ত হইয়া পুত্রকে প্রহার করিলেন এবং বলিলেন, “যে দিন নিজে উপার্জন করিয়া মিষ্টান্ন খাইতে পারিবে সেদিন খাইও।” মাতার এই শাসনে বালকের মনে উন্নতির বীজ উদ্ভূত হইল তৎক্ষণাৎ বালক নিজের কর্তব্য পথ অবেষণ করিতে বাড়ীর বাহির হইলেন কিন্তু “নবী” নাম্নী জনৈকা ধাত্রী অনেক সাধ্য সাধনার পর তাহাকে বাড়ীতে ফিরাইয়া আনেন। তখন বাঙ্গালার ঘরে ঘরে চড়কা ঘুরিত। উক্ত ধাত্রী হতা কাটিয়া স্ত্রীর বিক্রয় লব্ধি অর্থব্যয়্যে বালক দর্পনারায়ণকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইলেন। কিন্তু বালকের মন আর গৃহে তিষ্ঠিল না। তিনি বাড়ি হইতে বাহির হইবার স্বযোগ অবেষণ করিতে লাগিলেন। শিশুকাল হইতেই দেওয়ান স্বাধীন-চেতা, কর্তব্য পরায়ণ ও সংসাহসী ছিলেন। সেই সময় দেশে রেল জাহাজ দুয়ের কথা গমনার নৌকাও দুপ্রাপ্য ছিল। একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাওয়া এত সুগম ছিল না। উন্নতিচিকীর্ষ ব্যক্তিকে কিছুতেই কর্তব্য ত্যক্ত করিতে পারে না। সাধুসম্বল ব্যক্তির সাধু সম্বল কদাপি বিফল হয় না। তিনি পাঁচদোনা হইতে প্রায়

২৭২৮ মাইল দূরবর্তী ঢাকা নগরীতে পদব্রজে বাইয়া হাজির লইলেন। সেই স্থানে বাইয়া নিজের কর্তব্য খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন। তদানীন্তন ঢাকার দেওয়ান মুর্শিদ কুলিখাঁর নিকট বাইয়া কর্ম প্রার্থনা করিলেন। তখন রাজভাষা পারশী ছিল। গ্রামে গ্রামে এত স্কুল ছিল না। যাঁহারা পারশী জানিতেন বালকগণ তাঁহাদের নিকট হইতেই পারশী শিক্ষা করিত। বাঙ্গলা ভাষা সম্বন্ধেও এই কথাই ছিল। দর্পনারায়ণও পারশী জানিতেন। মুর্শিদকুলিখাঁ বালকের সংসাহস ও তেজস্বিতার পরিচয় পাইয়া রাজস্ব বিভাগে শিক্ষা নবীশের কাছে নিযুক্ত করিলেন। সৌভাগ্যলক্ষী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। তাঁহার কর্মপটীতায় সন্তুষ্ট হইয়া নবাব তাঁহাকে ক্রমে কান্তনগো ও সর্বশেষে দেওয়ানের কার্যে উন্নীত করিলেন।

২য়—তিনি অধিক বয়সে পুত্রমুখ দর্শন করেন। এই জ্ঞাত তাঁহার ভ্রাতৃ সহোদর সন্তোষনারায়ণের পুত্র ভবানীপ্রসাদ ও শব্দর সেনকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন। ইহার প্রমাণস্বরূপ ইহা বলা যায় তিনি যে প্রচুর ভূসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহার অধিকাংশই ভ্রাতৃপুত্রদের নামে করিয়া গিয়াছেন। তালুক সংক্রান্ত কাগজপত্রে খাজ পর্য্যন্তও ভ্রাতৃপুত্রদের নামই দেখা যায়। একদিন প্রাণপ্রিয়তম ভ্রাতৃপুত্র ভবানীপ্রসাদ নিজ বাটার নিকটবর্তী ব্রহ্মপুত্রের বাট হইতে “ময়ূরপঙ্খী নৌকায়” ঢাকায় রওনা হইলেন। বাধবদীর নিকটবর্তী ফারাক্কিরচর গেলে পরে নৌকার লগ্গি (চৈর) তালিয়া যায়; মাল্লাগণ অনন্তোপায় হইয়া ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী একটি বাঁশ কাটে। এই জ্ঞাত উক্ত স্থানের স্বত্বাধিকারী মাল্লাগণকে অনেক তৎসনা করেন; তজ্জবণে ভবানীপ্রসাদের আর ঢাকা যাওয়া হইল না। অমনি বাড়ী আসিয়া গৃহস্থার ক্রুদ্ধ করিয়া বাসিলেন। খুল্লভাত দর্পনারায়ণ দ্বার খুলিবার জন্য ভ্রাতৃপুত্রকে অনেক সাধ্য-সাধনা করিলেন কিন্তু

আধুনিক-কাণ্ডিক, ১০২১

কিছুই কল হইল না। ভ্রাতৃপুত্র আবদার করিয়া বলিয়া উঠিলেন যদি কানরাঙ্গিরচর, মুরালাপুর প্রভৃতি স্থান আমাদের না হয় তাহা হইলে আর দ্বার খুলিব না। ভ্রাতৃপুত্রগণ প্রাণ খুলিয়া ভ্রাতৃপুত্রের আবদার রক্ষা করিয়া নবাব সরকার হইতে উক্ত স্থানের মালিকের করমান আনিলেন। কথিত আছে ষত দিন পর্যন্ত এই স্থানের মালিক হইতে পারেন নাই ততদিন পর্যন্ত ভবানীপ্রসাদ এইপথে ঢাকা না যাওয়া ব্রহ্মপুত্র হইতে মেঘনা পর্যন্ত একটি খাল খনন করাইয়া সেই পথে ঢাকা যাতায়াত করিতেন। এখনও পাঁচদোনার পূর্বদিকে ভবানী খাল নামক একটি খাল ব্রহ্মপুত্রের সহিত সংলগ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এই খালটি বিষ্ণুমান থাকিয়া উক্ত প্রবাদ বচনের পক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে। ময়ূরপাখী নৌকার মুখটি বর্তমান থাকিয়া ভবানী-প্রসাদের নৌকার অন্তিমের প্রমান দিতেছে।

৩য়—উত্তর সাধারণ চর ও দক্ষিণ সাধারণ চরের স্রুত ও দধি এককালে এই দেশে বড় বিখ্যাত ছিল। দেওয়ানের ভ্রাতৃপুত্রগণ এ স্থান হইতে আনাওয়া স্রুত ও দধি খাইতেন। সময়ে ব্যবসায়ীরা অন্যত্র বিক্রয় করিয়া ফেলিলে তাঁহাদের ভাগ্যে আর ভাল স্রুত দধি জুটিত না। সেই জন্য ভ্রাতৃপুত্রগণ উক্ত দুই স্থানের মালিক হইবার জন্য খুড়া মহাশয়কে অনুরোধ করেন। তিনি নবাব সরকার হইতে উক্ত স্থানের মালিকের সনদ আনেন। এখনও ৩৫৪নং তালুক ভবানীপ্রসাদ সেন সদর জমা ১৯৭৯ টাকা। এই তালুক বর্তমান আছে। কথিত আছে ভ্রাতৃপুত্রদের এই প্রকার আবদার রক্ষা করিতে করিতে তিনি নিজগ্রাম পাঁচদোনা হইতে দক্ষিণ পশ্চিমদিকে ঢাকা পুরান নাকাশ ৬বুড়াশিবের বাড়ী পর্যন্ত অনেক স্থানের মালিক হইয়াছিলেন। উত্তর দিকে কিশোরগঞ্জ পর্যন্ত সম্পত্তি করিয়াছিলেন। বর্তমান সময়ও ৬বুড়াশিবের বাড়ী ও তাহার নিকটবর্তী স্থানে দেওয়ানের তালুক সম্পত্তি

বিদ্যমান আছে। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দাস একাউন্টেন্ট জেনারেলের সুপারিটেণ্ডেন্ট মহাশয় রমণাতে যে স্থানে বাড়ী নির্মাণ করিয়াছেন সেই স্থানে যে ঘরটি আছে সেইটি দেওয়ানের নির্মিত। চুংখের বিষয় উক্ত সুপারিটেণ্ডেন্ট মহাশয় ঘরের নিকট একটি পায়খানা প্রস্তুত করাইয়াছেন।

দেওয়ান দর্পনারায়ণ যে বিপুল সম্পত্তি করিয়া গিয়াছেন তাহার সকল গুলির বিবরণ সংগ্রহ করা অতি কঠিন ব্যাপার। অনেক দর্পনারায়ণ কৃত সম্পত্তি নিলাম হইয়া গিয়াছে সম্পত্তির মালিকা কাজেই সেই সকলের নাম সংগ্রহ করা আরও কঠিন। ময়মনসিংহ জেলায় কুড়িখাই পরগনায় দর্পনারায়ণ নামক যে মহাল ছিল ১৮৭৮ সালে বাকী খাজনার জন্য তাহা নিলাম হইয়া গিয়াছে। তিনি বহু গ্রামে সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন।

তাঁহার খনিজ বহু দৌর্যকা, পুষ্করিণী এখনও নানা স্থানে বর্তমান আছে। আমরা যে সংকলিত— কয়েকটি দৌর্যকা নাম সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম। নিজ গ্রাম পাঁচদোনার প্রকাণ্ড দৌর্য ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্করিণী, পাকলিয়ার দৌর্য, পাঁচকুখির দৌর্য, ভুলতার দৌর্য, দিনাজপুরের দৌর্য। সকল গুলিই এখন বিদ্যমান। পাঁচকুখির দৌর্য খনন করাইয়া তিনি কিঞ্চিৎ ভূমি সহ জনৈক ব্রাহ্মণকে ইহা উৎসর্গ করিয়া যান। রাজকীয় কোনও কার্য উপলক্ষে দিনাজপুর যাইয়া সে স্থানে এক দৌর্যকা খনন করিয়া আসেন। আজও দেওয়ান দর্পনারায়ণের দৌর্য মধে-শ্বরদী পরগণার অন্তর্গত মুড়াপাড়ার পূর্বদিকে ভুলতা নামক গ্রামে অবস্থিত। এত প্রকাণ্ড দৌর্য নিকটে আর কোথাও দেখা যায় না। ইহার দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর তিনটি পাড়ে ভিন্ন গ্রাম। ইহা দ্বারা ইহার বিস্তৃতির পরিমাণ বুঝা যায়। ইহা



খননের প্রবাদ বাক্য এই—দেওয়ান একদিন পাকীতে আরোহণ করিয়া কার্যব্যাপদেশে বাড়ী হইতে ঢাকা রওয়ানা হইয়াছেন। পাঁচরুখির নিকটবর্তী সোনাখালের তীরে পাকী গেলে পর, পাকী হইতে অবতরণ করিয়া বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া আছেন। এমন সময় নিকটে একটি জ্বীলোকের আর্ন্তনাদ শ্রবণ করিতে পাইলেন; কারণ অমু-সন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন একটি জ্বীলোক উক্ত খাল হইতে জল নিতে আসিয়া প্রসব বেদনায় অস্থির হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন। ইহা জানিতে পারিয়া তিনি আর পাকীতে উঠিলেন না। জ্বীলোকটির নিকটে যাইয়া বলিলেন, “মা তুমি পাকীতে উঠ। আমি তোমাকে বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিতেছি।” জ্বীলোকটিও অন্তোপায় হইয়া পাকীতে উঠিলেন। তখন দেওয়ান পাকীর সঙ্গে সঙ্গে ইটিয়া ঐ জ্বীলোকটির বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তখন দেখিতে পাইলেন যে ঐখান হইতে জ্বীলোকটির বাড়ী প্রায় ২ মাইল। তিনি ইহাতে মনে দারুণ কষ্ট পাইয়া গ্রামস্থ সকলকে ডাকাইলেন। গ্রামের সকলের পরামর্শ মতে তাহাদের প্রদর্শিত স্থানে এই সুবৃহৎ জলাশয় খনন করাইয়া তাহার ঘাটলা ঠাণ্ডাইয়া দেওয়াইলেন। পূর্ন পাড়ে একটি মঠ নির্মাণ করাইয়া তাহাতে ৬শিব স্থাপিত করিলেন। কথিত আছে যে, উক্ত দীঘি খনন করিবার সময় তাহার নিজ বাটীতে স্থাপিত যে ৬লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ আছে তাহা পাওয়া যায়।

সাধক-শ্রেষ্ঠ ভক্তবীর রাম প্রসাদের সিদ্ধ পীঠ চিনিশ-  
পুরের ৬কালী এদেশের হিন্দু  
দেবোত্তর, মুসলমান নির্বিশেষে সকলেরই  
ব্রহ্মোত্তর, পূজিত। দেওয়ান এই ৬কালী পূজার  
মুসলমানদের জ্ঞা চিনিশপুরের নিকটবর্তী স্থানে  
পীরান দেবোত্তর সম্পত্তি দান করিয়া গিয়া-  
ফকিরান ছেন। এখনও সেই সম্পত্তি বিস্ত-  
মান আছে। ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ মহ-  
কুমার অধীন ভোগবেতালের ৬গোপীনাথ অতি প্রসিদ্ধ।

সেই বিগ্রহের পূজার জ্ঞা যে ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন, ভোগবেতালের নিকটবর্তী স্থানে সেই সম্পত্তি অদ্যাপি বর্তমান। নিজ বাটীস্থিত ৬লক্ষ্মীনারায়ণ ও ৬ বৃন্দাবন চন্দ্র বিগ্রহের নামীয় সম্পত্তি আজও আছে। এই প্রকার দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি দেওয়ানের দেব-  
বিজে ভক্তির ও প্রচুর ঐর্থ্যের পরিচয় এখনও প্রদান করিতেছে। মুসলমানদের জ্ঞাও পীরান ফকিরান অনেক ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। চিনিশপুরের ৬ কালীবাড়ীর নিকট বাসাই গ্রামে পীরান সম্পত্তি এবং কিশোরগঞ্জের অধীন আশুতিয়া তালুকের মধ্যে সুখিয়া ও চর পলাশের মধ্যগত পাঁচ পীরের জায়গীর এখনও বর্ত-  
মান আছে।

যিনি দক্ষিণে ঢাকা হইতে উত্তরে কিশোরগঞ্জ পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ স্থানের অধিকাংশ গ্রামে ন্যূনাধিক ভাবে সম্প-  
ত্তির মালিক হইয়াছিলেন তিনি যে কত স্থানে কত ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করা মুকঠিন ব্যাপার। তাহার প্রদত্ত ভোগোত্তর ও নানকার সম্পত্তি এতদ্দেশে এখনও অনেকে ভোগ করিতেছে।

আজ দেওয়ানকৃত বাড়ী, ঘর, মঠ প্রভৃতির বিষয় লিখিতে যাইয়া মনে যে কত ভাবের সমাবেশ হইতেছে তাহা বলিতে পারি না। দেওয়ান রাজা রাজবল্লভের সমসাময়িক লোক। সর্কগ্রাসিনী পদ্মা রাজবল্লভের কীর্তি বিনষ্ট করিয়া তাহার কীর্তিনাশা নাম দৃঢ়তর করিয়াছে। যতদিন কীর্তিনাশা বিস্তমান থাকিবে তত দিন লোকে কীর্তিনাশার বিচিত্র নামধারা রাজবল্লভের কীর্তিকলাপের স্থতি মনে আনয়ন করিতে পারিবে। ১৩০৪ সনের প্রবল ভূকম্প দেওয়ানের কীর্তি-  
ধ্বংস করিয়াও সেই রকম স্থায়ী হইয়া রহিয়াছে। দেওয়ান পাঁচদোনাতে এক বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া তাহার পশ্চিম তীরে পাশাপাশি ভাবে ৩ ভ্রাতার জ্ঞা ৩টি প্রকাণ্ড বাড়ী



আধুনিক-কালিক, ১৯২১

নিৰ্মাণ করেন। বড়বাড়ী—পঞ্চরত্ন (একটি প্রকাণ্ড এক-তালা দালান, তদুপরি ৪ কোণে ৪টি ঝিকটি ঘর \* ও মধ্যস্থানে একটি মঠ); পঞ্চরত্নটি এখনও সম্পূর্ণ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই। দেওয়ানখানা, ৬দুর্গামণ্ডপ, ৬ঠাকুর দালান দ্বিতল প্রকাণ্ড বাসভবন, আর ও ২৩ খানা ছোট বাসভবন। সকল দালানই আংশিক ভাবে বিদ্বমান। একটি নবরত্নের মাত্র ভিত্তিগুলি বিদ্বমান আছে।

মধ্যমবাড়ী—অম্বর মহালে ১৪ কোঠা বিশিষ্ট একটি প্রকাণ্ড দ্বিতল বাসভবন। এখনও অবিকৃত অবস্থায় আছে। ৬দুর্গামণ্ডপ ইষ্টক নিৰ্মিত অত্যুচ্চ দোলমঞ্চ। বহিরাটির প্রকাণ্ড ফটক—এইগুলি বাহিরাটিতে অবস্থিত। সকলগুলিই আংশিক বিদ্বমান আছে। মধ্য প্রকোষ্ঠে ৬ লক্ষ্মীনারায়ণের প্রকাণ্ড দ্বিতল ঝিকটি প্রাসাদ। দেওয়ানের দ্বিতল বাসভবন অগ্ৰা ২১ খানা ছোট দালান। এইগুলিও আংশিক ভাবে বিদ্বমান আছে।

ছোটবাড়ী—একখানা প্রকাণ্ড দ্বিতল প্রাসাদের তদ্বাবেশ, অগ্ৰ একখানা অবিকৃত দ্বিতল প্রাসাদ, ২খানা একতালা দালান। ৬বিগ্রহের প্রকাণ্ড ঝিকটি প্রাসাদ।

উল্লিখিত বাটীগুলির প্রত্যেকটি দালানেই লাদাও কাল (সাধির বর্ণা ব্যতীত)। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন দেওয়ান বংশীয় ১২১৩ বাড়ী বৈজ্ঞ এই গ্রামে অতি সন্মানের সহিত অবস্থান করিতেছেন। প্রত্যেকেরই অগ্ৰাধিক ভূসম্পত্তি আছে। সকল বাড়ীতেই ২১ খানা বা ততোধিক ইষ্টকালয় আছে। উল্লিখিত ৩ বাড়ীর দালান সকল ভগ্ন হইলে পর ২১ খানা টিনের ঘর ও ছনের ঘর করা হইয়াছিল। কয়েকবৎসর গত হয় একবার সৰ্বভূক অগ্নিদেব সেই সময় গৃহের সঙ্গে সঙ্গে দলিলপত্রগুলিও ভগ্নাবশেষ করিয়াছেন।

তিনি বজ্র করিবার জন্ত নিজবাটীর পূৰ্বদিকে ব্রহ্মপুত্রের তীরে যে সকল বজ্রকুণ্ড ও মন্দির নিৰ্মাণ করাইয়াছিলেন তাহার নষ্টাবশেষ এখনও বিদ্বমান। একাধি, পঞ্চাধি, সপ্তাধি, নবাধি ও তুলাযজ্ঞ করিবার জন্ত ভিন্ন ভিন্ন মন্দির নিৰ্মাণ করাইয়াছিলেন। ছুরতি-ক্রম্য কাল সেগুলিকে চূর্ণ করিয়াছে। রাশীকৃত ইষ্টক ও বুদ্ধদের মৌখিকবচন ভিন্ন সেগুলিকে বোধগম্য করিবার অজ্ঞ উপায় নাই। এই স্থানে প্রকাণ্ড ৪টি মঠ ও ১টি মঠের তদ্বাবেশ এখনও বিদ্বমান। প্রত্যেকটিতেই ৬ শিব স্থাপিত। তদ্বাটীর ৬ শিবটি নিকটেই একটি টিনের ঘরে স্থানান্তরিত হইয়া বর্তমানে পূজিত হইতে-ছেন। ৫টি মঠের মধ্যে ২টি দেওয়ানের দুই মহোদয়ের, ১টি তাঁহার বাগ বিধবা কন্যা সিদ্ধেশ্বরীর, ১টি তাঁহার নিজের ও অগ্ৰাটি তাঁহার বাড়ীর তহবিলদার “শ্রী” র নাম ঘোষণা করিতেছে। কন্যা সিদ্ধেশ্বরীর মঠ সম্বন্ধে জন-শ্রুতি এই যে, সিদ্ধেশ্বরীর মৃত স্বামীর চিতার উপর সিদ্ধেশ্বরীর কথায় এই মঠ নিৰ্মাণ করান। কাজেই সেইটি সিদ্ধেশ্বরীর মঠ নামে পরিচিত। ভ্রাতৃবৎসল দেওয়ান দুই ভাইর নামেও -টি মঠ প্রস্তুত করান। সেই ২টি মঠ তাঁহার ভ্রাতাদের নামানুসারে—সম্বোধ সেনের ও ইঞ্জ নারায়ণের নামে পরিচিত।

“শ্রী” তহবিলদারের মঠ সম্বন্ধে দেওয়ান বংশীয় প্রাচীনদের মুখে যে গল্প শুনিয়াছি তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম। পূৰ্বেই বলিয়াছি দেওয়ান রাজা রাজ বল্লভের সময়ের লোক। আমরা যে সময় দেওয়ানের জীবিত কাল ধরিয়াছি তাহাতে নিঃসন্দেহে তাঁহাকে রাজা রাজবল্লভের সময়ের লোক বলিয়া ধরা যায়। বিক্রমপুরের কোনও সম্ভ্রান্ত বৈজ্ঞবংশের একটি সৰ্ব্ব মূলকণা স্মন্দরী কন্যার সহিত রাজা রাজবল্লভের পুত্রের বিবাহের আলাপ হয়। সেই কন্যার সহিত দেওয়ানের ভ্রাতৃপুত্রের বিবাহ হইবারও প্রস্তাব হয়। দেওয়ান কৌশলে উক্ত কন্যা আনিয়া নিজ ভ্রাতৃপুত্রের সহিত বিবাহ দেন। ইংতে রাজ-

ঝিকটি ঘর—একটি প্রকাণ্ড একতালা দালান।  
তদুপরি দুইচালা ঘরের নক্সা বিশিষ্ট দালান।

বল্লভ অগমান বোধ করিয়া ক্রোধবশ হন এবং দেওয়ানের বাড়ী লুণ্ঠ পাঠ করিবার জ্ঞাত বহু লোকজন সহ ব্রহ্মপুত্র উচ্চাইয়া পাঁচদোনার নিকটবর্তী স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। দেওয়ান তখন তাঁহার কার্যস্থল মুর্শিদাবাদে ছিলেন। তদীয় ভ্রাতৃপুত্র ভবানীপ্রসাদ নিজ লোকজন সহ পাঁচদোনার নিকটবর্তী কবিরাজপুর নামক স্থানে জলযুদ্ধে বিপক্ষের অনেক লোকজন হত ও তাহা-দিগকে পরাস্ত করেন। ভবানীপ্রসাদ এই ঘটনার সমস্ত বিবরণ খুল্লতাতকে জানান। অধিকন্তু ইহাও জানান যে, রাজা রাজবল্লভ আমাদের অনেক জিনিসপত্র লুণ্ঠন করিয়া নিয়া গিয়াছেন। পত্র পাঠ করিয়া দেওয়ান সকল কথা তদানীন্তন নবাব আলিবর্দীখাঁকে বিবৃত করেন। নবাব দেখিলেন দুই জনই তাঁহার কর্মচারী। কাজেই তিনি সেই প্রকার কোন ও বিচার না করিয়া বলিলেন, “তোমার লুণ্ঠিত জব্বের তালিকা দেও! আমি রাজবল্লভের নিকট হইতে সেই সকল জব্বা আদায় করিয়া দিব।” দেওয়ান বলিলেন, “আমি এখান হইতে সকল জব্বের তালিকা দিতে অসমর্থ। যেহেতু কিকি জব্বা লুণ্ঠিত হইয়াছে তাহার কিছুই আমি অবগত নহি। বিশেষতঃ সকল জিনিস পত্র সনাক্ত করিতেও আমি অসমর্থ। আমার বাড়ীর তহবিলদার “শ্রী” সকল জিনিস পত্র সনাক্ত করিতে পারিবে। নবাব তখন দেওয়ানের প্রার্থনা মতে রাজবল্লভকে সকল জিনিস পত্র ফিরাইয়া দিবার জ্ঞাত এক আদেশ পত্র দিলেন। অধিকন্তু দেওয়ানের প্রার্থনা মতে সঙ্গে কতিপয় বরকন্দাও দিলেন।

দেওয়ান উক্ত লোক সহ আদেশ পত্রখানা তাঁহার নিজবাটাতে ভ্রাতৃপুত্রের নিকট পাঠাইয়া নিজেও ভ্রাতৃপুত্রের নিকট লিখিয়া দিলেন যে “শ্রী”কে নবাবের লোকজন সহ রাজবল্লভের বাড়ী পাঠাইয়া জিনিসপত্র আনিয়াইয়া সইবে। তদনুসারে “শ্রী” রাজবল্লভের বাড়ী পৌছিয়া নিজ ইচ্ছামত জিনিসপত্র বাছিয়া লইলেন। বলা বাহুল্য নবাবের লোকজন ও আদেশ পত্র বুটে রাজবল্লভ

কোনও উচ্চবাচ্য করিলেন না। জব্বা সহ “শ্রী” বাড়ী আসিলে ভবানীপ্রসাদ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। কতিপয় দিবস পরে দেওয়ান বাড়ী আসিয়া যখন জানিতে পারিলেন যে, এই জিনিসপত্র তাঁহার নহে তখন তিনি ভ্রাতৃপুত্রকে অনেক ভৎসনা করিলেন এবং বলিলেন যে, অন্তায়লব্ধ এই সকল জিনিসপত্র আমার বাড়ীতে থাকিতে পারিবে না। ধর্ম-প্রাণ দেওয়ানের কথায় কেহই প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। অবশেষে স্থিরীকৃত হইল, ইহা: “শ্রী” নিয়া যাউক। শেষে তাহাই হইল। “শ্রী”ও নিষ্কৃত পাপকর্ম বুঝিতে পারিয়া, সেই সকল জিনিস বিক্রয় করিয়া সেই অর্থ দেওয়ানের হস্তে প্রদান করিলেন। দেওয়ান সেই অর্থ ও নিজে আরও অর্থ দিয়া “শ্রী”র নামে এক প্রকাণ্ড মঠ প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে শিব স্থাপিত করিলেন।

দেওয়ান যে সময় জীবিত ছিলেন সেই সময় ঢাকা বঙ্গ শিল্পের ও মুর্শিদাবাদ রেশম শিল্পের জ্ঞাত বড় বিখ্যাত ছিল। প্রবাদ যে দিল্লীখর মুর্শিদাবাদের নবাবকে ১ লক্ষ টাকা দ্বারা একখানা চম্ভাতপ প্রস্তুত করাইয়া দিতে আদেশ করেন। নবাব বিখ্যাত কর্মচারী দেওয়ান দর্পনারায়ণকে এই কার্য সম্পাদনের ভার দিলেন। দেওয়ান ৭০ হাজার টাকা দিয়া কার্য সম্পন্ন করিয়া বাকী ৩০ হাজার টাকা নবাবকে প্রত্যর্পণ করিলেন।

নবাব দেওয়ানের এই সাধুতা ও লোভ শূন্যতা দর্শনে বিস্মিত হইয়া বিখ্যাততার পুরস্কার স্বরূপ ঐ ৩০ হাজার টাকা দেওয়ানকে দান করিলেন। সেই সময়ের ৩০ হাজার টাকার মূল্য বর্তমান এক লক্ষ টাকারও অধিক।

ময়মনসিংহ জিলার কড়িবাড়ী পক্ষতের পশ্চিম হইতে পারো পাহাড়ের পূর্বসীমা পর্যন্ত স্থানকে মূলকে সূচক কহে। যোগল সম্রাটদিগের সময় সূচকের জমিদার-গণ অত্যন্ত সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

আধুনিক-কালিক ১০২১

মোগল সম্রাটগণ তাঁহাদিগকে ১২৫ জন অখারোহীয়া মুসল্কী দিয়াছিলেন এবং পাঁচ হাজার গারোভাষী জমিদার বলিয়া উক্ত সম্রাট দরবাবের তাঁহারা বিশেষ সম্মান পাইতেন। সেই সময় মুর্শিদকুলিখাঁ বাঙ্গালার দেওয়ান (নবাব) ছিলেন। বাঙ্গালার রাজধানী ঢাকা ছিল। তদানীন্তন বাঙ্গালার সুবেদার আজিম উসমানের সহিত রাজকীয় কার্য্য নিয়া মুর্শিদকুলিখাঁর বিবাদ হওয়ায় তিনি ঢাকা হইতে মুকস্‌দাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া নিজের নামানুসারে সেই স্থানের নাম মুর্শিদাবাদ রাখেন (১৭০৩খঃ)। রণসিংহ সেই সময় সুবঙ্গের রাজা। এরূপ একটা জনশ্রুতি আছে যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র কুমার কিশোর সিংহ ও রাজসিংহকে বাকী রাজ্যের জন্ত ঢাকার সহকারী দেওয়ান ধরিয়্য আনেন। সঙ্গে প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত বৃদ্ধ ভৃত্য বাহ্যারামও আসেন। সহকারী দেওয়ানের আদেশ হইল যে কুমারস্বয়কে বেত্রোঘাত করিয়া বাকী রাজ্য আদায়ের বন্দোবস্ত করা হউক। এই কঠোর আদেশ শুনিয়া কুমারস্বয় ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়া উঠিলেন। আত্মা বেন দেহ ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। প্রভুভক্ত ভৃত্য প্রভু-পুত্রের রক্ষার জন্ত নিজ জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া স্বপুষ্ঠে বেত্রোঘাত লইয়া জগতে প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন; কিন্তু এত করিয়াও বাকী রাজ্যের দায় হইতে মুক্তি পাইলেন না। সহকারী দেওয়ান বাঙ্গালার দেওয়ানের অধীন থাকিয়া কাজ করিতেন। তিনি বাকী রাজ্যের জন্ত জমিদারী অস্ত্রের নিকট বন্দোবস্ত দিলেন। এই দেশে প্রবাদ যে সেই সময় দর্পনারায়ণকে উক্ত জমিদারীর বন্দোবস্ত দেওয়া হইল। সুবঙ্গের তদানীন্তন রাণী কুমারস্বয়কে ও প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত ভৃত্য বাহ্যারামকে সঙ্গে লইয়া পাঁচদোনার দেওয়ান দর্পনারায়ণের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেওয়ান বংশীয়গণ এখনও নির্দিষ্ট করিয়া বলেন যে মধ্যবাড়ীর (দেওয়ানবাড়ীর) অন্দর মহলের প্রকাণ্ড

বিভল বাস-ভবনে রাণী অবস্থান করিয়াছিলেন। পুণ্যময়ী রাণী ইহাতে অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া আজও এই দালানটী অটুট অবস্থায় বর্তমান আছে। এই ঘটনার সময় দেওয়ান কার্য্যস্থানে ছিলেন। কিয়-দিবস পর বাড়ী আসিয়া দেখিলেন যে সুবঙ্গের মহারাণী তদীয় ভবনে সমুপস্থিত। ইহাতে তিনি একদিকে যেমন গৌরবান্বিত হইলেন বলিয়া ভাবিলেন অতৃদিকে ভগবানের বিচিত্র বিধান দেখিয়া নিজকে স্তম্ভিতও মনে করিলেন। কেন না মহতের পতন দৃষ্টে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। বলা বাহুল্য তিনি রাণীর নিকট কিছু না উনিয়াই অবিলম্বে কুমারকে যজ্ঞোপবীত দিয়া দক্ষিণা স্বরূপ তাঁহাদের রাজ্য তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিলেন।

এখনও পাঁচদোনার পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া বাহ্যারামখাল নামক একটা রামখাল বিদ্যমান আছে। অনেকে অনুমান করেন যে মহারাণী রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া প্রভুভক্ত ভৃত্যের নাম চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত এই দেশে এই খাল খনন করাইয়া বান। ইহার মূল কি বলা যায় না।

দর্পনারায়ণ নবাব ছেটে দেওয়ানী করিয়াছিলেন যদিও তাহার বিশেষ প্রমাণ নাই। তথাপি তাঁহার প্রচুর ভূসম্পত্তি, বিস্তীর্ণ বাড়ীঘর, দৌষি, পুষ্করিণী, মঠ, দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, ভোগোত্তর পীরান্, ককিরান্, এই দেশ প্রচলিত নানা প্রকার প্রবাদ বচন ও তাঁহার নামের পূর্বে যে এই দেশ প্রচলিত সর্ব্ববাদি সম্মত দেওয়ান বিশেষণটী সংযুক্ত রহিয়াছে, এই সকল দ্বারা বলা যায় যে, তিনি নিশ্চয়ই রাজকীয় উচ্চকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। নতুবা এতগুলি কীর্ত্তি এক জীবনে রাখিয়া বাইতে পারিতেন না। বিশেষতঃ আমাদের দেশে আর একটা কথা প্রচলিত আছে যে, যদি কোনও ব্যক্তি কোনও স্থানে বাইবার জন্ত অস্ত্র কাহারও নিকট বলে “আমি এখন যাই” তাহা হইলে ২য় ব্যক্তি ১ম ব্যক্তিকে ব্যঙ্গচ্ছলে বলে যে রাজা রাজবল্লভ গিয়াছেন, দেওয়ান

দর্পনারায়ণ গিয়াছেন তুমি আর কি? যদি তিনি একজন  
স্বকৃতী পুরুষ না হইতেন; তাহা হইলে একই ব্যক্তির  
স্বকৃত্য দেশে পুরুষাণুক্রমে এতগুলি প্রবাদ-বচন চলিয়া  
আসিত না। পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার  
করিতেছি যে দেওয়ানের বংশধর কয়েকজন ভজ  
সহোদর আমাকে এই প্রবন্ধ রচনায় যথেষ্ট সহায়তা  
করিয়াছেন। তাঁহাদের সহায়তা ভিন্ন আমি দ্বারা এই  
কাজ সম্পন্ন হইত না।

শ্রীমহিমচন্দ্র নন্দী।

## শরৎ-চিত্র

### প্রভাত

সুবর্ণ। করীট গিরে, প্রসন্ন নয়ন.  
হাস্যোৎফুল্ল চারু আশ্র, উজ্জল বরণ.  
কেবা শুই দেব-দূত কল্পলোক হতে  
বহায়ে চেতনা বগ্না যুগন্ত জগতে  
দেখা দিল আকর্ষণ! স্নিগ্ধ সমীরণ  
আগমনী বার্তা বহে, বিহঙ্গমগণ  
গাহে আরতির গান! প্রকৃতি সুন্দরী  
গাঁথি' হর্ষে পুষ্প-মালা বন-গাজ ভরি'  
দাঁড়াল চরণ-প্রান্তে করিতে বরণ  
উপাস্ত বাঞ্ছিত যেন! হাসিল ভুবন  
নিরাধি সে স্বয়ম্বর! বিশ্ব-আমন্ত্রণ  
পশে নি এ শূন্ত-প্রাণে, পীযুষ বর্ষণ  
হয় নাই শুষ্কচিত্তে! নিখিল উৎসবে  
দেবী দ্বারা বন্ধ মোর পূর্ণ আন্তরবে!

### মধ্যাহ্ন

অতি হৃদয় উড়ানীর মত  
নৌহার-নীরবপুঞ্জ নিখিল আকাশ  
ছেদে আছে, বায়ু ফেলে রৌদ্র-তপ্ত হাস,—  
অতি ধীরে তরু-বল্লী কাঁপে অবিরত!

কভু ঘনীভূত মেঘ কণিকের তরে,  
কণিকে সহস্র-অংগ স্নিগ্ধ মলিন;—  
দিগন্তে প্রাপ্ত-বৃকে সুবর্ণ নবীন  
আলোছায়া পরস্পর নাচে হাত ধরে!  
বস্ত্র কপোতের গীতি উদাস-গম্ভীর  
ভেসে আসে সুনিকুম্বর অরণ্যানী হতে,  
মনে হয় বিরহিনী কানন-লক্ষ্মীর  
মন্দ-ব্যথা অতর্কিত উথলে মরতে!  
প্রিয়ার মিলন-স্বপ্নে মোর প্রান্ত প্রাণ  
অন্তর-অন্তরে পশি করিছে সন্ধান!

### সন্ধ্যা

ধীরে নেমে আসে সন্ধ্যা মন্দর-চরণে  
সপ্তপু ধরণী-বৃকে, শ্রান্ত দানবগণ  
লুটায় অঞ্চল ভলে, মেঘের তরণী  
উড়ায় রঙ্গিন ধ্বজা নির্মল গগনে!  
মন্দার শিরীষ সুপ্ত—গ্রাম পত্রদল  
কুঞ্চিত আনন্দমুখী, মূহল পবনে  
ধীরে দোলাইছে শাখা, সরসী-দর্পণে  
নাচিছে তরঙ্গ-ছায়া মোহাগ-চঞ্চল!  
নাড়-যাত্রী বিহঙ্গের কল-কণ্ঠ সনে  
“হলু” দেয় দিক্-বধু, মাগতী সুন্দরী  
সাজায় বরণ-ডালা, সারা নিশি ধরি'  
অর্চিবারে যেন কারে নিভৃত গোপনে!  
মলিন ব্যাকুল চিত্ত কণে কণে চায়  
বিশ্ব সাথে ডুবে যেতে মহাস্তব্ধতায়।

### নিশি

স্তব্ধ সব কোলাহল, বসুধা ঘুমায়ে  
রূপসী জ্যোৎস্না-কোলে শিশুটির মত,—  
নীতল সমীর ধীরে চায় চুম্বন  
হরি' ক্লান্ত-অবসাদ মেহভরে কত!

আখিন-কাস্তিক ১৯২১

শেকালীর গন্ধটুকু কভু ভেসে আসে  
মুখর ঝিল্লীর মূহ একতান সনে.  
অলে না একটি তার। নিধর আকাশে  
ডুবে গেছে চাঁদিমার অমিয় প্লাবনে !  
সরোজিনী হাসে সরে শশী দোহাগিনী  
প্রাণেশে প্রাণের মাঝে পেয়েছে দরশ,  
লহরে লহরে নাচে রক্ত-তটিনী  
সিদ্ধ-প্রেমে পাগলিনী পুলক-বিবশ !  
বিরহী হৃদয় মোর খুঁজিতে প্রিয়ায়  
কোথা যেন অতর্কিতে ফলে গেছে হার !

শ্রীভীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

## সাধু ভাষা বনাম প্রাদেশিক ভাষা

ইতিপূর্বে সাহিত্য সম্মিলনীর এক মাসিক অধিবেশনে ভাষার “গ্রহণ ও বর্জন” সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করি, সেই প্রবন্ধে তিনটি বিষয়ের আলোচনা উপস্থিত করি। দুর্ভাগ্যক্রমে সম্পাদক মহাশয় নিয়মাবলীর একটি ধারা প্রয়োগ করিয়া আলোচিত বিষয়ের বিশদ বিস্তৃত সমালোচনা নিরস্ত করিয়া দেন এবং পরবর্তী অধিবেশনেও তাহার আলোচনা হয় না। তখনই আমার মনে হইয়াছিল আলোচিত বিষয় তিনটি পৃথক ভাবে উপস্থিত করিব এবং সম্মিলনীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিব। আমার সেই প্রবন্ধের মূল তিনটি বিষয় এই—(১) সাধু ভাষা বনাম প্রাদেশিক ভাষা (২) বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (৩) বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্য হইতে বিভিন্ন ভাবমূলক শব্দ ও পদ রচনা। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে বিগত ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনে এবং চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মিলনে বিজ্ঞানচর্চা শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় বিশেষ আলোচনা উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং সাহিত্য পরি-

ষদেও এ বিষয়ে আলোচনা হইতেছে। এ সম্বন্ধে আমার বাহা বলিয়া আছে তাহা বারাহরে প্রকাশ করিব। আজ পূর্বোন্নিখিত প্রথম বিষয়েরই আলোচনা করিব। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়া সাধারণ পাঠকের অধিগম্য হইয়াছে।

যেমন কোন লোকের শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে যথাযথ বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে তাহার ঔষধ ও পথ্যের কিছুই ব্যবস্থা চলে না, তেমনি আমাদের সাহিত্য-চর্চার কোথায় কি দারিদ্র্য কোথায় কি সম্ভাবনা আছে, তাহার সুস্পষ্ট ধারণা না থাকিলে সাহিত্যের পুষ্টিব্যবস্থা সম্ভব হইবে না। কতকগুলি লোক আছেন তাঁহারা অন্ধভক্তিকে প্রকৃত অনুরাগ বলিয়া মনে করেন এবং দেশের সমাজ বা ধর্ম সম্বন্ধে কোন কথা উঠিলে যেমন আমাদের মন্থ পরামর্শ বাসবাবুজী, আমাদের বেদ, স্বত্ব, পুরাণ বলিয়া ভাবে গদগদ হইয়া পড়েন, তেমনি ভাষার কথা উঠিলেই আমাদের সংস্কৃত ভাষা বলিয়াই ধলায় লুটাইয়া পড়েন, দ্বিতীয় কথা বলিবার অবকাশ দেন না। এই শ্রেণীর লোকের নিকট ভাষার অভাব ও সম্ভাবনীয়তার আলোচনা করিতে গেলে বড় বিপদ উপস্থিত হয়। আমার পূর্বোন্নিখিত তিনটি বিষয়ই প্রত্যেক প্রকৃত সাহিত্যানুরাগীর ভাবিবার বিষয়; এই সব বিষয়ে যত আলোচনা হয় ততই সাহিত্য ও ভাষার মঙ্গল।

ভাষার সহিত সাহিত্যের অঙ্গাদী সম্বন্ধ। একের পুষ্টিতে অন্নের বিকাশ। বিভিন্ন দেশের ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিলে প্রত্যক্ষমান হইবে যে যখন যে ভাষা অবাদে সহজে অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, এবং আপনার পুষ্টির জন্ত বাহির হইতে গ্রহণ করিতে দ্বিধা করে নাই, সেই ভাষা ও সাহিত্য অপূর্ণ শ্রী ধারণ করিয়াছে। আর যেখানে ভাষাকে নিয়মের প্রাচীর দিয়া রক্ষা করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে সেখানেই ভাষাও দুর্বল হইয়াছে সাহিত্যও স্থায়ী সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। শ্রাকসনদের ভাষা

যখন বিবেচনা নরমানের ভাষা ও ভাবের সংক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছিল তখন সে পন্নীতে নির্বাসিত হইয়া দীন ভাবে জীবন রক্ষা করিতেছিল এবং সাহিত্যও পশু ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। আর ক্রমে যখন নরমান ভাব ও ভাষা আয়ত্ত করিয়া অত্যাশঙ্ক্য ভাবপ্রকাশক অপর ভাষার শব্দ সকল আয়ত্ত করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিল তখনই ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের অপূর্ণ সম্ভাবনার দ্বার খুলিয়া গেল। সেই হইতে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য যে অব্যাহত গতি ও শক্তি লাভ করিয়াছে তাহাতেই জগতের ভাষা ও সাহিত্যে সে আজ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

সমাজে যেমন সর্বদা নূতন ও পুরাতনের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, এবং প্রাচীনত্বের হেতুবাদে পুরাতনকে কেহ কেহ শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া নূতনকে উপেক্ষা করিতে চাহেন, তেমনই সাহিত্যেও নূতন কিছুই অবতারণার সময় তাহা হিতকর হইলেও, প্রতিবাদে প্রবল তরঙ্গ উপস্থিত করে। সর্ব বিষয়ে প্রাচীন-রীতি-পদ্ধতি প্রিয়তা মানুষের পক্ষে এত স্বাভাবিক,—কন না ইহাতে এমন আত্মপ্রসাদপূর্ণ, অলস প্রাধিকার ভাব আনিয়া দেয়, এবং আত্মসম্পূর্ণ সাধনার দায় হইতে মুক্ত করিয়া অনায়াসে আরাম লাভ করিবার সুযোগ করিয়া দেয়,—যে হহার প্রলোভন সহজে পরিত্যাগ করা যায় না কাজেই ইহার প্রভাবও এত বেশী। সাহিত্যের প্রাচীন রীতিও এই কারণে সাধারণের নিকট এত দৃঢ়প্রসারী। সাহিত্যের ভাষা সাধারণের ভাষা হইতে পৃথক থাকিবে কি না, প্রাচীন রীতিসম্মত ও বিস্তৃত ব্যাকরণগুণমোদিত হইবে কি না, এ প্রশ্নের মীমাংসা সকল জীবন্ত সাহিত্যেরই করিতে হইয়াছে। এই প্রশ্নের মীমাংসা দ্বারা সাহিত্যের গতি ও শক্তি নিয়মিত হইয়াছে ইংরাজী সাহিত্য ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে এ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া আপনার ভবিষ্যৎ পরিষ্কার করিয়া

লইয়াছে। অনেকে মনে করেন সাহিত্যের ভাষা যদি নিত্য চলনসই রকম হইয়া যায় তবে তাহার সম্পূর্ণ অগোচর হয় এবং সাহিত্যও শ্রীহীন হইয়া পড়ে। সাধুভাষা শিশু অথবা মুদ্রিত পুস্তকে দেখিলে তাহার শিহরিয়া উঠেন। সাহিত্যকে যদি জনসাধারণের ভাষাচ্ছাদের ও ভাবাবিনিময়ের এবং চিন্তা-কল্পনার বিস্তৃতি ও উৎকর্ষ সাধনের উপকরণ বলিয়া মনে করি, তবে আর তাহাকে বিস্তৃত পানীয় জলের পুষ্করিণীর মত প্রাচীরবেষ্টিত করিয়া রাখিলে চলিবে না। তাহাতে বিস্তৃতি রক্ষা হইতে পারে কিন্তু জনসাধারণের ভাব ও চিন্তার ক্ষেত্রে উৎকর্ষ করিয়া দিবে না। ঐ সকল নদীতে স্রোতস্বতীর মত সাহিত্যের ভাষা কখনও বিজ্ঞানের গিরিগহ্বর, কখনও দর্শনের শৈলশৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া, কখনও ভাব ও চিন্তার জনপদ প্রাবিত করিয়া গ্রাম্য কুলবধু ও গৃহস্থের নিকট প্রেম-পবিত্রতা, আশা, আনন্দ ও সান্ত্বনার নির্মল জলধারা উপস্থিত করিবে; তাহাতেই সাহিত্যের পরিপূর্ণ সার্থকতা। আজ আমাদের শিক্ষিত সাধারণের দৃষ্টি আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি পড়িয়াছে। নানা ভাবে সাহিত্যের সেবা করিবার জন্য অনেকের প্রাণে অকৃত্রিম অতুরাগ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। এই সেবার ভাবকে প্রকৃত পথে পরিচালিত করিতে হইলে এবং ইহাকে উদ্দীপ্ত রাখিতে হইলে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের অভাব ও সম্ভাবনাকে ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে।

সাহিত্যের ভাষা কি বর্তমান প্রচলিত পুস্তকের ভাষা বা সাধুভাষা বা ব্যাকরণসম্মত ভাষা থাকিবে? না জনসাধারণের সহজগম্য ও সর্বতোভাবে স্পষ্ট ও জীবন্ত কারিবার জন্য ইহাকে সহজ ও স্বাভাবিক করা যাইতে পারে? এই সমস্তের আলোচ্য বিষয়ের দুইটি দিক বিবেচনা করতে হইবে। সাধুভাষা অথবা ব্যাকরণসম্মত ভাষা না থাকিলে ভাষা সহজ করিবার

আধুনিক কালিক ১০২১

কত প্রাদেশিক ভাষার আগ্রহ লইতে হইবে কি না? এবং সে কোন প্রদেশের ভাষা? তাহাতে প্রদেশ বিশেষের প্রাধান্য স্থিতি হইবে কি না? সাধু ভাষার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না? দুই দিক হইতেই তীক্ষ্ণ তীব্র শর পাড়িবে আশঙ্কা করিতেছি।

প্রথমতঃ সাহিত্যের ভাষা যদি সংস্কৃত-মূলক, ব্যাকরণ-সঙ্গত, অভিধানাশ্রিত হইয়া থাকে তবে অনেক সময় তাহা সাহিত্যের বিষয় না হইয়া প্রকৃতত্বের বিষয় হইয়া পড়ে। সে ভাষা বিশেষ বিশেষ সভ্যত্বের উপস্থিতি করিয়া তামাসা করা যায়, কিন্তু তাহাতে নিত্যজীবন-যাত্রা নির্বাহ হয় না। এই ভাষা যে সাপের খোলসের মত আপনি আপনি খসিয়া পড়ে তাহারও প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের সেই প্রথম যুগে যখন পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের তামাক সাজিয়া ও গরুর ঘাস কাটিয়া তালপাতে বা কলাপাতে লেখা পড়া লিখিতে হইত, সেই সময়কার “শিশুবোধকে” পত্র ও দলিল লিখবার আদর্শ প্রণালী দেওয়া আছে। সেই সংস্করণ শিশুবোধক এখন আর পাওয়া যায় না। এই শিশুদিগের বিদ্যালয়িকার প্রথম গ্রন্থে স্বাক্ষর “শ্রীচরণ-সরসী-দিবানিধি-সাধন-প্রয়াসী মালতী মঞ্জরী—ঐহিক পারত্রিক ভাবার্ণব-নাবিক প্রাণেশ্বর মধ্যম ভট্টাচার্য্য” মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছেন এবং তদন্তরে “পরম-প্রণয়ার্ণব-গভীর-নীরতীর-নিবসিত কলেবরাজ-সম্মিলিত-নিভাত-প্রণয়প্রিত” ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে উত্তর লিখিয়াছেন, তখনও কোন দল্পতী এই আদর্শ অনুসরণ করিয়া পত্র লিখিতে সক্ষম হন নাই, এবং এখনও কোনও অধ্যাপক মহাশয়ের অকৃত্রিম সংস্কৃতানুরাগ থাকিলেও তিনি এই প্রণালীতে তাঁহার ব্রাহ্মণীকে পত্র লিখিতে পারিতেছেন না। আমার “বৎস! দেবা হৃদয়মানা হইলে কিরূপে তাঁহার চিত্তস্থানাদন সম্পাদন করিতে হয় তাহা তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ” এইরূপ ভাবে কনিষ্ঠের সহিত

আলাপ বিতর্ক ব্যাকরণসঙ্গত হইলেও এখন আর কেহ স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিতেছে না। কোন গ্রন্থেরই কথোপকথনের ভাষা ইহার অনুসরণ করিতে পারিতেছে না। এখন কোন দেবর যদি ত্রাতৃবধূকে “দেবি, দেখুন দেখুন, হরশরাসনভঙ্গবার্তা শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া ক্রান্ত্র কুলান্তকারী তগবান কৃষ্ণ-নন্দন আমাদের অযোধ্যা-গমন-পথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন” ইহার অনুসরণে অভিভাষণ করেন, তাহা হইলে হান্তের রোল পাড়িয়া যায় এবং দেবরের কর্ণমর্দনের সম্ভাবনা স্থানান্তরিত হইয়া পড়ে। “জনস্থান মধ্যবর্তী প্রভঞ্জন গিরিশিখর দেশ আকাশ পথে সতত সঞ্চরমাণ নবজলধরপটলসংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত”। এইরূপ রচনা কালকদিগের হৃৎকের দাঁত ভাঙ্গিবার পক্ষে পরম উপ-যোগী হইলেও জীবন্ত ও উন্নতিশীল সাহিত্যে ইহার অনুসরণ করা চলে না, আমাদের সাহিত্যই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিতেছে। কিন্তু শব্দবোদ্ধনাকৌশলের প্রভাব অতিক্রম বিহীন; এখনও আমরা ইহা হইতে মুক্তলাভ কারিতে পারি নাই। শাস্ত্রে কথিত আছে কোন বিষয়ের সম্পূর্ণ জ্ঞানহ সে বিষয়ের বন্ধন হইতে মুক্ত করে। এই প্রণালীরাবণের সম্পূর্ণ জ্ঞান হইলেই আমরা ইহার মোহ কাটাইতে পারি। সাহিত্যরথী বন্ধিমচন্দ্র ও দ্বৈত গুপ্ত ভাষার এই সুবর্ণ শৃঙ্খল উন্মোচন করিয়া সাহিত্যকে মুক্ত, সরল ও স্বাভাবিক করিয়া যান। তবে বন্ধিমও ইহার কৃষ্ণ ছায়ার হস্ত হইতে একেবারে সম্পূর্ণ মুক্ত হন নাই। আমার এই আলোচনার রকম দোষিয়া কেহ কেহ হয় ত মনে করিতে পারেন আমি ভাষার ঐশ্বর্য্যকে নিভাত তুল্য মনে করি। যে বেশভূষার সহায় গতির বাধা জন্মায় এবং অনাবশ্যক সজ্জারূপে উপজব উপস্থিত করে তাহা মূল্য বান হইলেও পরিত্যজ্য। এই প্রসঙ্গে একটি কথা উঠিতে পারে এই, উচ্চ শ্রেণীর প্রাচীন রচনাপদ্ধতির



(Classical style এর) কোন প্রয়োজনীয়তা আমি স্বীকার করি না অথবা সাহিত্যের কোন বিভাগে ইহার স্থান আছে বলিয়া মনে করি না। কাহারও এইরূপ ধারণা হইয়া থাকিলে সংশোধন হওয়া আবশ্যক। যোগেশনাথ বিজ্ঞানভূষণের আত্মোৎসর্গে, কালীপ্রসন্ন ঘোষের প্রভাত চিন্তা ও নিশীথচিন্তায়, রজনীকান্ত গুপ্তের ইতিহাসে, টডের রাজস্থানের বঙ্গানুবাদে, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সামাজিক প্রবন্ধে এবং প্রচুর মুখোপাধ্যায়ের গ্রীক ও হিন্দুতে এই প্রণালী বেশ মানাইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বা চন্দ্রনাথ বসুর রচনাপ্রণালীতে তাঁহাদের বিষয়-গাভীর্যের কোন অগৌরব হয় নাই। আবার পূর্ব কথিত প্রাচীন প্রণালীকে সর্ববিষয়ে আদর্শ করিতে গেলে কি বিপদ ঘটে, কথামালায় “শশকগণ ও ভেকগণ” এবং কোমল কবিতার কবিতা হইতে (যাহার অধিকাংশই কোমলও নহে কাবতাও নহে) কিছু অভ্যাস পাওয়া যায়।

কিছুকাল পূর্বে প্রাদেশিক ভাষায় পাঠ্য রচনা লইয়া এদেশে যখন আন্দোলন উপস্থিত হয় তখন ইহার রাজনৈতিক দিকটা লইয়া যত নাড়াচাড়া দেওয়া হইয়াছিল, সাহিত্যের দিক দিয়া এ বিষয়ে কি বলবার আছে সে বিষয়ে একেবারেই কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই। শিশুপাঠ্য গ্রন্থের ভাষা ও সাধারণ সাহিত্যের ভাষার মধ্যে একটি স্থাননিষ্ঠ রেখাপাত করবার আবশ্যকতা হ'ল থাকে না, যদি সাধারণ সাহিত্যের ভাষাকে অসাধারণ করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারি। সাহিত্য সাধারণের হইবে, জন কয়েক বিজ্ঞার বা বিজ্ঞানজ্ঞারের সম্পত্তি হইবে না অথবা সম্পূর্ণরূপে আভিধানপ্রাপ্ত হইবে না, একথা চিন্তাশীল ব্যক্তির মাঝেই স্বীকার করিবেন। সুতরাং বিষয়-বিশেষের রচনাপ্রণালীতে বিস্তৃত শব্দসংগ্রহ ও শব্দবিভাগ কোশলের সার্থকতা থাকিলেও সাহিত্যের জীবন-রক্ষা,

বিস্তৃতি ও যথাযোগ্য উন্নতির জন্ত সাহিত্যের ভাষা এমন সহজ সরল ও কমনীয় হওয়া আবশ্যক, যাহাতে সাহিত্যের ভিতর দিয়া সকল প্রকার ভাববৈচিত্র্য ও কলানৈপুণ্য এবং তত্ত্বসংগ্রহ বাঙ্গালার সর্বসাধারণের অধিগম্য হইতে পারে। হয়ত কেহ বা বলিতে পারেন প্রচলিত বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা ইহার সম্পূর্ণ উপযোগী কি না? তাহার উত্তরে আমি বলিতে বাধ্য হইক এবং যাহা বলবার জন্ত এতদূর অগ্রসর হইয়াছি বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে সেখানে হইতে তাহাকে আর একটু অগ্রসর করিয়া দিতে হইবে। ইহাকে আরও গমনশীল ও তরল করিতে হইবে যেন অনায়াসে সর্বত্র প্রবাহিত হইয়া যাইতে পারে। সম্প্রতি এই পারবর্টনের যুগ উপস্থিত হইয়াছে যখন প্রাচীন আদর্শ প্রণালীকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর, তারাকান্ত তর্করত্ন, দারকানাথ বিজ্ঞানভূষণ প্রভৃতি যে রচনাপ্রণালী প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, পরবর্তী যুগে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাসুদেব চট্টোপাধ্যায় ও চন্দ্রনাথ বসু তাহার আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া ভাষার সহজ গতি ও প্রসার স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা কোথায়ও কষ্টকল্পিত বা অকারণ শব্দধন-ঘটা-সমাক্ষর নহে, তাহার গতি অতি সরল ও স্বাভাবিক। শিল্পনৈপুণ্য ও শব্দ সম্পদের অভাব নাই অথচ সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও সাধারণের সম্পূর্ণ বোধগম্য। তাহার লিপিকুশলতা ও স্বচ্ছতা পূর্ণবর্ষী যুগের শব্দ বিস্তৃতির সংক্রমণ হইতে সম্পূর্ণ রক্ষা পায় নাই। কিন্তু এই যুগের সাহিত্যের গতি হইতে জীবন্ত বর্ধনশীল সাহিত্যের গতি নির্ণয় করিতে পারা যায়। এই সময়েই বাঙ্গালা সাহিত্যের উজ্জল ভবিষ্যতের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়। বিষয় বিশেষে এই প্রণালী প্রযুক্ত্য নহে, এবং বিষয় বিশেষের গাভীর্য রক্ষার জন্ত বিস্তৃত শব্দ-বিন্যাস প্রকৃতির প্রয়োজন বলিয়া এই সময়েই একটা কথা



আধুনিক-কালিক ১৯২১

উঠে। কালীপ্রসন্ন ঘোষের গ্রন্থগুলি আপত্তিকারী দিগের মত কিয়ৎ পরিমাণে সমর্থন করে। বঙ্কিমের পরবর্তী যুগে এই সন্দেহের সম্পূর্ণ মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভিন্ন ভাষার দার্শনিক প্রবন্ধ সকলের বঙ্গানুবাদে, বঙ্কিমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৌলিক দার্শনিক ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধাংশীতে, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর গভীর তত্ত্বালোচনামূলক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রবন্ধাদিতে এবং রবীন্দ্রনাথের লোক-চরিত্র, দেশচর্যা, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ক প্রবন্ধাদিতে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সরস ও কোমলময় সাধারণের বোধগম্য ভাষায় সাহিত্যের সকল বিভাগে পরিপূর্ণ সাফল্য লাভ করা যাইতে পারে। এখন এই সাধারণের বোধগম্য ভাষা কি?

বাঙ্গালার উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিমে সকল অংশেই যে এক সাধারণ বাঙ্গালী ভাষা প্রচলিত আছে, প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করিলে তাহার বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায়। চণ্ডীদাসের পদাবলী ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ মেদিনীপুরের মুদ্রা ও ত্রিপুরার কুব্জক অনায়াসে উপভোগ করিতেছে। শিক্ষা বিস্তৃত, ও সাহিত্যকে সতেজ ও সফল করিতে হইলে সাহিত্যের ভাষা বাঙ্গালার সকল অংশের নরনারীর অধিগম্য হওয়া আবশ্যিক। বর্তমান ইংরাজী সাহিত্য যে এত অপূর্ণ প্রতিষ্ঠা ও প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহার এক স্বাভাবিক কারণ ইহার ভাষা সর্বপ্রকার কৃত্রিমতা ও বাহ্যভঙ্গের আবর্জনা পরিহার করিতে পারিয়াছে। এমনকি বিজ্ঞান গ্রন্থের ভাষা ও গল্প, কোমল ক্ষুদ্র প্রবন্ধের ভাষার মধ্যে কোন ভেদ নাই। সাধারণের বোধগম্য যে বাঙ্গালী ভাষা, অর্থাৎ ভদ্র সাধারণ যাহার ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সকল অঞ্চলের লোকেই সহজে বুঝিতে পারেন, তাহাকে আদর্শ সহজ বাঙ্গালী বলা

যাইতে পারে। এই ভাষায় বাঙ্গালার এক অংশের লোকের সহিত অন্য অংশের লোকে সহজে স্বাভাবিক ভাবে কথোপকথন করিতেছে এবং ইহা সাধারণ লোকে এমন কি যাহারা ব্যবহার করিতেছে না তাহারও সহজে বুঝিতেছে, গণিত, গ্রিয়ারসন নদীয়া, কলিকাতা, চন্দ্রিশপরগণা, হুগলী, হাবড়া, মুর্শিদাবাদের শিক্ষিত ভদ্রলোকের ভাষাকে আদর্শ বাঙ্গালী ( বা Standard Bengali ) বলিয়া তাহার Linguistic Survey of India Vol V, Pt. I এর ৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করিয়াছেন। এবং ৮৪৪৬,৯৯৬ জন এই ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকে বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এখন বোধ হয় আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালার সকল জেলার শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা যে ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকেন এবং যাহা সকল জেলার সাধারণ লোকেও বুঝিয়া থাকে, সেই ভাষাকে সাধারণ বাঙ্গালী ভাষা বলা যাইতে পারে। এই ভাষাই যে বিস্তৃত ভাষা এবং জনসাধারণের সহজগম্য ভাষা সে বিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। এই চলিত ভাষার আদিস্থান নির্দেশ করিতে গিয়া আমি হয়ত অপ্রিয় হইয়া উঠিতেছি। এই চলিত ভাষার মধ্যেও যে কিছু কিছু স্থানীয় বিকৃতি আছে এবং তাহা সম্পূর্ণ পরিভাষ্য, তাহা স্বীকার করিতে আমি ইতস্ততঃ করিতেছি না। তবে সাধারণতঃ ইহা অপেক্ষাকৃত বিকৃতিশূন্য এবং সহজ ও সাধারণগম্য। এই ভাষাই যে বাঙ্গালার জনসাধারণের ভাষা তাহার সর্বাঙ্গের প্রাথমিক যখন যে অঞ্চলে যে গান কবিতা বাঙ্গালার রচনা করিয়াছে তাহা স্বাভাবিক ভাবে এই ভাষাকেই আশ্রয় করিয়াছে। এই অঞ্চলেরই দেওয়ান রঘুনাথ বা পাঁচালীকার দত্তরায় প্রভৃতি যে গান রচনা করিয়াছেন যাহা এখনও পর্যন্ত রামপ্রসাদের গানের ন্যায় বাঙ্গালার জনসাধারণের সম্প্রতি হইয়া রহিয়াছে, তাহা স্বাভাবিক ভাবে এই ভাষাতেই রচিত হইয়াছে।

যে সুবাসিক বা সাময়িক পত্রিকা কলিকাতা ও উপকণ্ঠস্থ নিত্যস্থ স্থানীয় বিকৃতিগুলিকে সাহিত্যের ভাষায় স্থায়ী স্থান দিবার হস্তক্ষেপ রূপা চেষ্টা করিতেছেন তাহা পশুশ্রম মাত্র। এই রূপা চেষ্টা চলিত ভাষা প্রসারে বাধা দিতেছে, এবং সাহিত্যের উন্নতির পথে অন্তরায় হইতেছে। ইহা সর্বতোভাবে পরিত্যজ্য বলিয়া মনে করি— কেন সাহিত্যের ভাষার দিক দিয়া এগুলি যেমন আবর্জনা স্বরূপ তেমনি দেশের দিক দিয়া এগুলি তেমন অমঙ্গলজনক। তোমার অশোভন ও অকারণ বিশিষ্টতা যদি ক্রমাগত আমাকে পীড়ন করিতে থাকে তাহা হইলে তোমার গ্রহণ বোঝা অংশও আমার স্বাভাবিক ভাবে অপ্রিয় হইয়া উঠে। আমি যে চলিত ভাষাকে আদর্শ সাধারণের ভাষা বলিয়া বর্ণনা করিলাম তাহার কোন বিশেষ স্থান নির্দেশ না করিয়া তত্র সাধারণের পরস্পরের কথোপকথনের ভাষা বলিলে বোধ হয় সংজ্ঞানির্দেশ বিশেষ অন্তর্ভুক্ত হইবে না এবং বিরোধের কারণ কমিয়া যাইবে। অনেকে হয়ত বলিবেন—এবং সাহিত্য সেবক লক্ষপ্রতিষ্ঠ শিক্তি কেহ কেহ আমার কাছে বলিয়াছেন— যে “এই অঞ্চলের কোন কোন কথা সম্পূর্ণ সংস্কৃত মূলক সেগুলি না জানিয়া তোমরা প্রাদেশিক বলিয়া পরিত্যাগ কর। সেগুলিকে সাহিত্যের ভাষায় বেশ স্থান দিতে পার।” তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিয়া থাকেন—

অদ্ব—অদস্ শব্দের রূপান্তর

করিয়াম—করিষামঃ বা করিষ্যামির রূপান্তর

যারাম্—যাম্ বা যারামঃ এর রূপান্তর

ইতান্—এতান্ শব্দের রূপান্তর

তে—এক বচনের পরিবর্তে বহুবচন

কইতাম্—তুম্ এর পরিবর্তে তাম্ রূপ প্রত্যয় মাত্র

মাথানে—মধ্যাহ্নের রূপান্তর বিকল্পে অপরাহ্নের

পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় ইত্যাদি।

এই সকল তুলিলে প্রথমতঃ আমার বাল্য

কালের পণ্ডিত মহাশয়ের কথা মনে হয়। একদিন স্কুলের পরামর্শে পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম Stupid এর সংস্কৃত কি? পণ্ডিত মহাশয় অগ্নানবদনে বলিলেন Stupid গাঁটা সংস্কৃত কথা, ইষ্টপিট, ইষ্টং পিনটি যঃ স ইষ্টপিট—নিপাতনে সিদ্ধ। আমরা ত অবাক। দ্বিতীয়তঃ মনে হয় সংস্কৃতমূলক বলিয়াই কোন শব্দকে মাথায় তুলিয়া লওয়া যায় না। প্রাদেশিক শব্দ বিকৃতি ও সেই সঙ্গে উচ্চারণ বৈষম্য ভাষাকে কি অদ্ভুত আকার দিতে পারে তাহা পণ্ডিত গ্রিয়ারসনের পূর্বোক্তাধিত পুস্তকে বেশ কৌতুকজনক প্রমাণ পাওয়া যায়। যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধার করিতেছি—

ইহার অল্পদিন পরে কানিষ্ঠ পুত্রটি সমস্ত একত্র করিয়া দুঃদেশে যাত্রা করিল  
লিখিত ভাষা বা এবং সেখানে অপরিমিত আচারে  
পুস্তকের ভাষা তাহার সমস্ত বিষয় অপচয়  
করিয়া ফেলিল।

ইহার কিছুদিন পরে ছোট ছেলেটি সব জিনিস  
পত্র নিয়ে দূরদেশে গেল এবং  
হাবড়া কলিকাতা সেখানে বদধৈয়ালী করে সমস্ত  
বিষয় উড়িয়ে দিল।

তার পর বেশী দিন না যেতেই ছোট ছেলেটা  
আপনার যা কিছু ছিল সব একত্তর  
কাটোয়া করে দূরদেশে চলল মেল আর  
সেখানে গিয়ে ওড়বাগির করে  
সব সম্পত্তি ঘাচিয়ে ফেললো।

ছোট বন ব্যাটা লেওয়ার কান্দন পর ভিন্ন দেশে  
গেল। সেটা ব্যাটা লাঠাধোঁ করিয়া  
বগুড়া টাকা কড়ি উড়িয়া দিল।

খোড়া কান্দন বাদ শিশুরা বেটা তাহান সম্পত্তি  
একেটে কোরে দূর দেশে পালায়ে  
গেল। এঁটে ব্যাটা হানে যেই সেই  
খরচ কোরে অর সম্পত্তি ছুরায় দিল।

আধুনিক-কাস্টিক ১০২১

কিছুদিন পর ঐ ছোট ছাওয়ালাডি তার সগল টাকা  
করি যাকাত কইরা যাক দূর  
টাকা আশে চইলা গ্যালো। সেখানে  
গিয়া তার যা কিছু আছিলো  
তাবদ খ্যালি কৈরা উড়াইয়া দিলো।

অল্প কদিন বাদে হোড় পোয়া হকলাইন অন্তর  
করি এরে দূরে এক দেয়ত্ গেল।  
চট্টগ্রাম হেসে মস্তামি করি তার ধন হক-  
লাইন উড়াইল।

কিছুদিন বাদ ছোট ছাওয়া তাবৎ এক ঠাঠি করে দূর  
দেশে চলে গেল। আর সেই ঠাঠি  
দিনাঞ্চুর পে যাতা বেভারে আপনার সমপৎ  
উড়ায়ে দিলে।

বহৎ দিন না বিৎতে ডোটো ছেল্যা সব যাকটে কর্যা  
বিদেশ চল্যা গ্যালো। আর সে  
মালদহ বদচালে আপনার মালমাতা সব  
খোয়াইয়া দিলে।

অল্পদিন পরে ছোটো ছাওয়াল সকল জিনিস পত্তোর  
খড়ো কর্যা দূর আশে যাতার  
পাবনা করলো এবং সেখানে বদকাম কর্যা  
নিজের বিষয় আবেয় উড়ায়ে  
দিলো।

খুন্স দিল বাদ ছোট ব্যাটা মালমাতা জমা করি দূর  
আশে চলি গেল হিয়ানে সে বেহ-  
নোয়াখালি (সন্দাপ) দিগি করি নিজ দৌলত্ উড়াইল।

দিন হতো বাদে ছোটুগগা পোলা বেবাক একন্তর  
হরিয়া দূর আশে মেলা হরিল।  
বরিশাল হেখানে হে লুচামি হরিয়া তার  
বস্তবেশাদ বেবাক উড়াইয়া দিল।

খুরা দিন বাদে ছোটকা তার হগ্গল মাল ব্যাপৎ  
খুয়াইয়া দূর মুল্লকে গেল। হেইখানে  
ময়মনসিংহ কৈলামি কৈর্যা হলগ্গল খোয়াইল।

কয় দিন বাদে হক পোলা হগলতান একন্তর কৈরা  
বহ দূর আশে গেল। আর হেই-  
ত্রিপুরা খানে বাউয়ামি কইরা হগলতান  
খোয়াইল।

কিছুদিন পরে ছোট ছেলেটি সব জিনিস পত্র নিয়ে  
দূর দেশে গেল এবং সেখানে  
নদীয়া চকিগ পরগণা বদকাজ করে সমস্ত বিষয় উড়িয়ে  
দিল।

আর অধিক উদ্ধার করিবার আবশ্যক নাই এই  
উদ্ধৃত অংশ সকলের তুলনা করিয়া প্রাদেশিক ভাষার  
কোনটি সর্বসাধারণের বোধগম্য হইতে পারে তাহা  
সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। ইহার মধ্যে কোন  
নমুনাটি আমার পূর্বকথিত ভ্রমসাধারণের কথোপ-  
কথনেন্দ্র ভাষার অনুরূপ তাহা সকলেই নির্ণয় করিতে  
পারিবেন। সাধুভাষা বা অভিধানান্বিত ভাষাকে  
পরিভ্রাণ করিয়া যদি প্রাদেশিক ভাষা গ্রহণ করিয়া  
সাহিত্যকে সরল করিতে হয় তাহা হইলে বোঁদ্ধ যুগের  
ভাষ্যশাসনের ভাষা সাহিত্য বিশেষ গবেষণার বিষয় হইয়া  
পড়িবে; প্রদেশ বিশেষে বোধযোগ্য হইলেও সাহিত্যের  
হিসাবে তাহা নিতান্ত হান্তজনক ও অক্লিষ্টকর হইয়া  
পড়িবে। গান কবিতায় যদি এই জাতীয় প্রাদেশিক  
ভাষার প্রাক্তর্ভাব হয় তাহা হইলে ব্যাপারটা কি  
হইয়া পড়ে তাহার নমুনা কিছু দিতেছি —

বরিশাল পটুয়াখালি মুসলমানদের গান

লালমতি কয় তোমেরদি খানিক রহ বসি  
খানিক বিলং কর সারি পইরা আসি  
তোমেরদি এ মুল্লহে মোরে রেহো না।

বরিশাল পিরোজপুর হিন্দুগান

এসহে গহর চাঁদ মোগো আসরে

ডাকি পেরছ তোমারে।

মোরা বয় \* পাইয়া তোমায়ে ডাকি

এস মার্গ আসয়ে।

(গহর চাঁদ হে)

### বরিশাল হিতৈষীতে প্রকাশিত

বালোর কপালে পরুক ছাঃ

অমন বালোতে কাম নাই।

হালের জোবা গেলো বইয়া

জান বাছামু কিবা খাইয়া।

চাষা মানুষ মোরা বাই—

মহোর্দয়ার বুজি কি ছাই।

গরীব মানুষ অমুপায়

খাইয়া জান বাছান দায়।

হেইয়ার উপর আরেক দায়

ছদাছদি পরসা ব্যায়।

আমারগো কি ওয়া হাজে

ভদোরে কাম ভদোরে বোকে।

### নোয়াখালী—রামগঞ্জ

মাডের হস্তুর বাসু বাসের হস্তুর চাসু।

ফোলা ফানের ফিলাই হস্তুর বুড়ার হস্তুর কাসু॥

হাঁকের হস্তুর বেজি সুইরের হস্তুর হেনা।

হউরি সুতের বৌর হস্তুর বোয়ে কিন্দেলে তেনা॥

হইরের হস্তুর বাইরা কাল মাছের হস্তুর জাব।

আন্ধকের হস্তুর উচিত কথা দুই চউক লালু॥

### নোয়াখালি সন্দীপ

নাইয়া তুট না বাহনে যদি হয় কুজি

উজান গাঙ্গে পাল খাটিলে তুট দাড়ি মাঝি।

ধুকা দিয়ে টাকা কুজি করে টল্লিগণ

পরসা লইয়া গোপনেতে তুট আশলাপণ।

হাকিম তুট হুকুমেতে যদি না হয় রদ

কিসের টাকার উকীল তুট বিছা কথার হদ॥

আশা করি এখানে শেষ করিলে কেহ ক্ষুণ্ণ হইবেন না। কোন কথা বলিবার পূর্বে এখানে আর একবার সরল সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়া রাখি ভারতীতে সভোক্ত নাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাণী স্মৃতি প্রভৃতি প্রবন্ধে যে সকল পশ্চিম বঙ্গের প্রাদেশিক বিকৃতি অব্যাহে অকুতোভয়ে প্রচলন করা হইতেছে সেগুলিও এত শ্রেণী হইতে পৃথক নহে। সাহিত্যের হিসাবে সকল প্রাদেশিকতাই সমান ভাবে পরিগাধ্য।

কবি নবান চন্দ্র যদি এইরূপ প্রাদেশিক ভাষায় কবিতা লিখিতেন, তাহা হইলে তাহা অবকাশ-রঞ্জিনী বা কুরুক্ষেত্রে না হইয়াও অবকাশ-রঞ্জনের উপযোগী হইত এবং তাহা আয়ত্ত করিতে কুরুক্ষেত্রের মত অষ্টাদশ অকৌহিনী সাহিত্যিকের সমাবেশ হইত এবং তাহা দেশের আবালবৃদ্ধ নরনারী সহজে উপভোগ করিলেও বাঙ্গালার জনসাধারণের নিকট নিতান্ত দুর্গম ও প্রহেলিকাময় হইয়া থাকিত। সাধু ভাষা নয় অথচ সরল শুদ্ধ ভাষা যাহা ভদ্র সাধারণে ব্যবহার করে, এবং প্রাদেশিক বিকৃতিপূর্ণ নহে অথচ সাধারণের বোধগম্য, এত ভাষা যে সকলের হউক তাহাই আমাদের সরল সাহিত্যের প্রাণ।

সকল বিভাগেই আমাদের দেশে বেশ একটু সংকর্ণ-গভী-অনুরাগ রহিয়াছে তাহাতে আমরা সকলেই বেশ আনন্দ অনুভব করি। গভীর অনুরাগ আবশ্যক মত কখন জেলার উত্তর কখনও দক্ষিণ, আবার কখন জেলা কখনও বিভাগ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। আবশ্যক মত সংকোচন ও প্রসারণে বেশ সুবিধাও আছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া যখন ভাষাতত্ত্ব বা সাহিত্যের কোন বিষয়ের আলোচনা করিব, তখন বেন সর্বদা মনে রাখি, বঙ্গ সাহিত্যের ভবিষ্যৎ উত্তর বা পূর্বের অঙ্গ নহে, দক্ষিণ বা, পশ্চিমের অঙ্গ নহে। এখন আমরা কোন প্রশ্নকেই স্বতন্ত্র স্থানীয় বিশিষ্ট ভাবে দেখিব না। এই সাহিত্যের মিলন-বন্ধিরে আমরা জাতীয় জীবনের প্রাণপুরুষকে লাভ

\* —ভয়। সাধারণ 'ব' এর উচ্চারণ দ্বারা পূর্ববঙ্গের 'ভ' উচ্চারণের নির্দেশ ঠিক হইবে না। প্র, স।

আধুনিক-কালিক ১০২১

করিব, এখানে আসিয়া আশা, বল ও আনন্দ লাভ করিব। সকল আবর্জনা দূর করিয়া মন্দির-দ্বার দেশের নরনারীর ওস্তাদ উন্মুক্ত করিয়া দিব। দেবতার যুগে আপনার সন্ধানও অচিৎ হইয়া আসিলে যেমন তাহাকে দূরে সরিয়া যাইতে বলি, তেমনই আমাদের আপন প্রাদেশিক বিরুদ্ধিতাও দূরে কেলিয়া দিব। নিজের গ্রামের বা নিজের জেলার প্রাদেশিক বিরুদ্ধ শব্দে সংকুত বা প্রাকৃত শব্দের মূলোদ্ধার করিয়া তাহাকে রক্ষা না সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার রক্ষা চেষ্টা না করিয়া যাহা সরল, সহজ ও সুন্দর তাহাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিব। এই সরল, সুন্দর বাঙ্গলা ভাষা আমাদের সকলের আপনার বাঙ্গলা ভাষা ইহাতে তোমার আমার বোল আনা সমান অধিকার।

আমাদের সাহিত্যকে সম্পূর্ণরূপে জনসাধারণের উপযোগী করিতে হইলে এবং শোভন ও সার্থক করিতে হইলে, সমাস ও অল্পপ্রাসের সুবর্ণ শৃঙ্খল খুলিয়া দিতে হইবে, এবং সংকুতমূলক শব্দনৈপুণ্যের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। সাহিত্যের ভাষা ও সাধারণ ভক্ত লোকের কথোপকথনের ভাষার মধ্যে এখনও যে আকাশ পাতাল প্রভেদ আছে তাহা দূর করিয়া দিতে হইবে, অথচ সরলতার ব্যপদেশে কোন অক্ষরের প্রাদেশিক বিরুদ্ধিতা প্রবেশ করিয়া ইহাকে কলুষিত না করে সে বিষয় প্রথমে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। রোগনিবারণের পরে রোগীকে যেমন যথেষ্ট ভোজনের হস্ত হইতে সাবধানে রক্ষা করিতে হয়, তেমনই বিস্তৃত শব্দাভ্যাসের বিকার দূর করিয়া ভাষাকে গ্রাম্যতার হস্ত হইতে সাবধানে রক্ষা করতে হইবে। অসঙ্গতি, অসুষ্ঠু এবং শিষ্টতার সহিত উজ্জল ওস্তাদ হস্ত-কৌতুক সহজ ভাবে মিলিত হইয়া সাহিত্যকে মধুর ও সুন্দর করিবে। তরল স্বচ্ছতা কোন বিষয়ের গভীরতার পৌরব হাস করিবে না কেবল তাহার সৌন্দর্য্য এবং রমণীয়তা বৃদ্ধি করিবে মাত্র। গাভীর্ঘ্য ও মর্যাদার সহিত সৌন্দর্য্য, সরলতা, স্বচ্ছতা ফুটিয়া উঠিবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বহু চেষ্টায় অধিবেশনে

সভাপতি শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকার মহাশয় বলিয়াছেন “ভাষাকে জীবন্ত রাখিতে হইলে তাহা সাধারণের বোধ-গম্য করা আবশ্যক। আর তাহাকে সুন্দর করিতে হইলে তাহাতে রস-সংযোগ করা আবশ্যক।” সাহিত্যের ভিতর দিয়াই সাধারণ শিক্ষা সরল, সহজ ও সুবিস্তৃত হইবে। বস্ত-বিজ্ঞানের সুপ্রসিদ্ধ সভাপতিসকলে সাধারণের আয়ত্ত ও সুগম করিতে হইলে, দেশবিদেশের নানা তথ্য, নানা তথ্য জনসাধারণের দ্বারে উপস্থিত করিতে হইলে ভাষাকে এই ভাবেই বাড়াইয়া তুলিতে হইবে। শক্তি ও সৌন্দর্য্যের সহিত যাহাতে সরলতা ও স্বচ্ছতার সমাবেশ হয় তাহাই করিতে হইবে। কৃষ্ণবাসের রামায়ণের মত বাঙ্গালার সাহিত্য শ্রীহট্ট হইতে মানভূম, চট্টগ্রাম হইতে জলপাইগুড়ি পর্যন্ত সকল দেশের নরনারীর হৃদয় অধিকার করিবে। যেখানে বাহা সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল, সাহিত্য তাহা গ্রহণ করিয়া সহজ, স্বাভাবিক ভাবে দ্বারে দ্বারে বিতরণ করিবে। ইহাতেই সাহিত্যের পরিপূর্ণ চরিতার্থতা। আমরা এই পরিবর্তনের যুগে রক্ষা বাহু চাকচিক্যেও মুগ্ধ হইব না, গভীর অহুরাগেও অন্ধ হইব না। আমরা সাহিত্যের গতি ও জীবনের দিকে দৃষ্টি রাখিব। যেখানে বাহা পাইব তাহা ধরে-বিধরে ভাষার ভাঙারে সাজাইয়া রাখিব।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, সাহিত্যের কোন বিভাগেই কি ভাষার ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজনীয়তা নাই! তাহার উত্তরে বলি, ভাষা ভাবোজ্জল ও প্রাণম্পর্শী হইবে অথচ শব্দ-ভারে পীড়িত হইবে না, সরস, কৌতুকময় হইবে অথচ গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট হইবে না, ওজস্বিতা ও ভাববিচিত্রতা থাকিবে অথচ শব্দবিগ্নাসকৌশলে বিবর্ত হইবে না। সাহিত্যের ভাষা চিরদিনই সরল ও স্বচ্ছ হইবে, অথচ সম্পূর্ণরূপে প্রাদেশিক বিরুদ্ধিতা হইবে, তরল ও নমন-শীল হইবে অথচ বিষয় বিশেষে গাভীর্ঘ্য ও মর্যাদা শূন্য হইবে না। এই দিকেই বর্তমান যুগে সকল সাহিত্যের গতি। আমরা সকলে এই গতির বেশ বৃদ্ধি করিয়া

দিব, এবং সাহিত্যের প্রসার ও জীবনকে স্বাধী ভূমিতে  
দণ্ডায়মান করিব। সাহিত্যের ভাষা সাধারণের সম্পূর্ণ  
নিজস্ব সামগ্রী হইবে অথচ ইহাতে যেন কোন গ্রাম্য শব্দ  
বাঁকিয়া না উঠে।

শুশীল চক্রবর্তী।

## শার দীয়া

বন্ধ হিহু বরষ ধরে  
সোনার কাঠির পরশ করে  
লম্বাছাড়া। আন্তকে তোরা

আমায় কেন কেপালি ?

ওই কাশের হাসি নদীর কূলে  
রৌদ্রছায়া বাধির মূলে !  
তোর নাহতে বনের পথে  
গাহে ও কে ভূপালী !

জলে স্থলে কিসের স্বাপ  
শিশির-তাজা শীষের প্রাণ !  
দাঘির জলে আঙণ জলে  
মুক্তা ধরে তরু-তলে—  
শঙ্খবল শেকালী !

আপন ঘরে ঘুমিয়েছি  
বপ্নে কেন কেপালি ?

কলমী দলের ফাঁকে ফাঁকে  
“দলপিপি” আর ডাহক ডাকে !  
কেগো, বিশ্ববাদী করলে বাহ  
ঢেলে !দলে দুধা বাহ  
কালো জলে আলো জেলে  
করে দ্বিাল রূপালি ?

মৃগনাভির কোঁটা খুলে

কে ছড়াল ফুলে ফুলে

পন্নীতে কি এলো ভুলে

নৈনিভালের নেপালী !

হোনাকীরা নীপের পাখে

প্রদীপ জ্বালে লাখে লাখে

আকাশ ভরা তারার ঝাকে

আন্তকে সোনার দীপালী !

ঘরের বাহির করে তোরা

আমায় কেন কেপালি ?

শ্রীকুলচন্দ্র দে।

## সন্তান পালন

শৈশবের বিশেষত্বই মানুষকে মানুষ করিয়াছে।\*  
কথাটা শুনিতে সামান্য বটে কিন্তু ইহার মধ্যে যে  
সত্যটি নিহিত আছে, সেটি বড় সামান্য নহে। জীব-  
জগতে মানুষের পরিণতি ও গঠনকাল যত দার্ঘ্য, এমন  
আর কোন জীবের নহে। এ সময়টার প্রধান বিশেষত্ব  
এই যে, এ সময় মানুষের মন ও দেহ উভয়ই একান্ত  
কোমল ও নমনীয় থাকে। সুতরাং তাহাকে ইচ্ছামত  
গড়িয়া পিটিয়া তুলিতে পারা যায়। মোটের উপর  
মানুষের পরমায়ু যদি ৭০ বৎসর ধরা যায়, তাহা  
হইলে তাহার ২ অংশ অর্থাৎ তাহার জীবনের প্রথম  
২৪:২৫ বৎসরকে তাহার পরিণতির কাল বলিতে পারা  
যায়। এসময় মানুষ জীবনের পথে যাত্রা করিবার  
জন্ত আপনাকে প্রস্তুত ও সজ্জিত করে মাত্র। জীবরাজ্যে  
যে জীবটি যত নিয়মদ্বীতে আবদ্ধ তাহার এই  
পরিণতিকাল বা শৈশবাবস্থা ততই অল্পকাল স্থায়ী হয়।

“It is babyhood that has made man what  
he is”

আশ্বিন-কাষ্ঠি ১০২১

কড মৎস্য (Cod fish) জীবনের আরম্ভকাল হইতেই স্বাধীন, তাহার পক্ষে কোনরূপ শিক্ষারই আবশ্যক করে না। সে জন্মিয়াই আপনার স্বাভাবিক আহরণ করিতে পারে—কি করিয়া আহার করা করিতে পারে তাহাও বেশ বুঝে; ফলতঃ তাহার জীবনে শৈশব বলিয়া কিছুই থাকিতে দেখা যায় না।

কিন্তু ইহার অপেক্ষা উর্ধ্ব পদবীতে অবস্থিত কোন জীবের বিষয় আলোচনা করিতে গেলে এই দেখা যায় মাতৃ গর্ভেই তাহার পরিণতির শেষ হয় না। ভূমিষ্ট হইবার পর, সে একবারে স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করিতে পারে না। তাহার শৈশব বলিয়া একটা নির্দিষ্ট কাল আছে। এ সময়টাকে তাহার পরিণতি ও শিক্ষার কাল বলা যাইতে পারে। কুকুর-শাবক জন্মবার পর একান্ত অসহায় থাকে। তাহার মাতার চেষ্টা ও যত্ন ভিন্ন তাহার কিছুতেই চলিতে পারে না। এইরূপে মাতৃ-যত্নে লালিত পালিত হইয়া শেষে সে একদিন স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করিতে সক্ষম হয়। এ কথা সত্য বটে কুকুর-শাবকের এই অসহায় শৈশব কালটা অধিক দিন স্থায়ী হয় না। সে কিছু দিন মধ্যেই আপনাকে চালাইবার মত শক্তি সামর্থ্য যোগ্যতা অর্জন করিয়া লয়। তাহার শৈশব যতই অল্পদিন স্থায়ী হোক না কেন কুকুরকে কিছু শিখাইতে হইলে, তাহা শৈশবেই করিতে হয়। যাহারা কুকুরকে দিয়া বিবিধ ক্রীড়া দেখাইয়া থাকে, তাহার এ কথাটা বুঝে।

কুকুর অপেক্ষা আরও উচ্চশ্রেণীর জীবে গেলে তাহার শৈশবকাল আরও দীর্ঘকালস্থায়ী হইতে দেখা যায়। শিশু বনমানুষ জন্মকালে একান্ত অসহায় থাকে এবং এই অসহায় অবস্থাতেই তাহাকে কয়েক বৎসর অতি-বাহিত করিতে হয়। ইহার পর আরও উর্ধ্ব আসিয়া আমরা যখন মানুষের নিকট পৌঁছাই তখন এই দেখিতে পাই, সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করিবার উপযোগী শক্তিসামর্থ্য ও যোগ্যতা লাভ করিতে

হইলে, তাহাকে ২৫ বৎসর ধরিয়া শিক্ষালাভ করিতে হয়। ২৫ বৎসরের কমে তাহার দেহ ও মন সম্পূর্ণ পরিণত হইতে পারে না।

মানুষের পরিণতি অতিশয় মনোযোগিনী। দেহের অপেক্ষা মনের পরিণতি আরও মনোযোগিনী। আশ্চর্য্য এই যে দেহের ও মনের পরিণতিতে ঠিক যেন সামঞ্জস্য নাই মন যেন দেহের সহিত ছুটিতে সমর্থ হয় না। তাহার দৃষ্টান্ত এক বৎসরের শিশুর মাথাটা তাহার পিতার মাথা অপেক্ষা খুব বেশী ছোট নহে। পিতার মাথা যদি ৩ হয়, এক বৎসরের শিশুর মাথা তাহা হইলে ২ হইতে দেখা যায়। বাহ্যতঃ এরূপ হইলেও, কার্য্যতঃ উহাদের মধ্যে প্রভেদ কত? দেখিতে এক ভাগ কম হইলেও কাজের বেলায় লক্ষ্য গুণ কম বলিলেও অভ্যুজিত হয় না।

২০।২২ বৎসর ধরিয়া রীতিমত শিক্ষা ও কর্ণন করিলে, তবে তাহার মাথা একদিন তাহার পিতার মাথার তুল্য শক্তিশালী হইতে পারিবে। ১০ বৎসর বয়সকালে, শিশুর ও তাহার পিতার মাথার আকার-গত কোনই পার্থক্য থাকিতে দেখা যায় না। পিতার টুপটা এ সময় পুত্রের মাথার ঠিক বসিতে দেখা যায়। পুত্রটি বাপের টুপটা মাথায় দিবার উপযুক্ত হইয়াছে বলিয়া। তাহার কাঙ্ক্ষিত চালাইবার মত শক্তি ও যোগ্যতাও যে প্রাপ্ত হইয়াছে এমন কথা নিতান্ত পাগল ভিন্ন আর কেহই মনে করিতে পারে না। অনেক বৎসরের সাধনা ও শিক্ষা ভিন্ন এ হইবার জো নাই। এ শক্তি আপনা হইতে জন্মায় না। এ জন্মলব্ধ জিনিস নয়। ইহা শিক্ষা ও অনুশীলন দ্বারা অর্জন করিয়া লইতে হয়।

ভূমিষ্ট হওয়ার পর সন্তানের প্রতি বাপ মার যে সকল কর্তব্য আছে, সেগুলি বড় সামান্য নহে। বাপ মাও যে তাহা না জানেন এমন নয়। তথাপি সন্তান-পালন ও তাহাদের শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা পদে পদে ভুল করিয়া বসি। তত্ত্ব বশে জন্মাইলেই যে তত্ত্ব হয়, আর

বাপ শিক্ষিত ও পণ্ডিত বলিয়া পুত্রও যে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হইবে এমন মনে করার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। চরিত্র-গঠন বিষয়ে কেবলমাত্র বংশানুক্রমের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। অবিশ্রাম চেষ্টা ও যত্নেরও আবশ্যক।

আমাদের মধ্যে অনেকেরই এমন ধারণা যে কতকগুলি সঙ্গুণ আছে, যেগুলি বিনা চেষ্টায় আপন হইতেই বংশাধিকার হুত্রে সন্তানদের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া থাকে। ভদ্র ঘরের ছেলে, অতএব সে ভদ্রই না ভদ্র হইবে? বলা বাতুল্য এ বিশ্বাস একান্ত ভ্রান্ত। আজন্ম ভদ্র নিতান্তই বিরল। যে সকল ব্যক্তি ভদ্র বলিয়া পরিচিত, তাহারা শৈশব ও বাল্য হইতেই ভদ্রতা শিক্ষা করিয়াছে। শিষ্টাচার, সৌজন্য, মার্জিতা-চরণ, সধিবেচনা, এবং সমাজের গতি-বিধির বিষয়ে জ্ঞান থাকা ভদ্রতার অত্যাবশ্যক অঙ্গ তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু এগুলি ভদ্রতার বাহিরের অঙ্গ। এসব ছাড়া ভদ্রতার আর কতকগুলি ভিতরের অঙ্গও আছে। প্রকৃত ভদ্র ব্যক্তি নিঃস্বার্থপর হইবেন তিনি যেমন আপনার কল্যাণ ভাবিবেন, তেমন পরের কল্যাণও ভাবিবেন; তিনি দয়াপরবশ ও উদারচিত্ত হইবেন; তাহা যথেষ্ট আত্মসন্মান জ্ঞান থাকিবে; এ সবগুণ যাহার নাই, তাহাকে প্রকৃত ভদ্র বলা যাইতে পারে না। আশ্চর্য্য এই যে, এ সবগুণ যদি খুব ছেলেবেলা হইতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা না করা যায় পরে আর তাহা হইতে দেখা যায় না; আত্মসন্মান-বোধ ও উদারতা মানুষ যেমন দেখিয়া শুনিয়া শিখিতে পারে, এমন বোধ করি আর কোন গুণ নয়। বালক যদি সদা-সর্বদা ঐ সকল গুণের দৃষ্টান্ত দেখিতে পায়, তাহা হইলে, তাহার পক্ষে নীচস্বভাব, প্রত্যারক ও বক্রবুদ্ধ হওয়া একবারেই অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। সুশিক্ষার গুণে বালকের চরিত্রে নিঃস্বার্থপরতা গুণটির যেমন বৃদ্ধি ও পরিণতি সম্ভব সুশিক্ষার ইহা আবার তেমনই নষ্ট

হওয়াও সম্ভব। আমরা কন্যাসকলের কুসঙ্গ ও কুদৃষ্টান্ত-দ্বারা স্বাভাবিক উদারতা নষ্ট হইতে দেখিয়াছি। যে গৃহে বাপ-মা ছেলেদের সঙ্গ ইচ্ছা, সকল কামনা অবশ্যে পূর্ণ হইতে দেন এবং গৃহের অপর পাঁচ জনকে, তাহাদের আজ্ঞানুবর্তী হইতে বাধ্য করেন, সে গৃহে ছেলেদের নীচ ও স্বার্থপর না হইয়া আর গতান্তর নাই। পথিবীতে মানুষ আপনা হইতে যতখানি স্বার্থপর হইয়া পড়ে, শিক্ষার দোষে তদপেক্ষা ঢের বেশী হয় একবার সন্দেহ করিবার কোন কারণ থাকিতে দেখা যায় না। মানবজীবনে শৈশব ও বাল্যের প্রকৃত স্বার্থকতা আমাদের মধ্যে কয়জন উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। এ সময়ে মানুষের চরিত্রের উপর শিক্ষার প্রভাব যে কতটা করে তাহা মৃত্যুকাল পর্যন্ত থাকিতে দেখা যায়। অনেকের বিশ্বাস ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাত্মরাক্তি যেন প্রকৃতি-গত জিনিস। বাস্তবিক কিয় তাহা নহে। মৃত্যুকোড় হইতেই মানুষ ধর্ম শিক্ষা করে। জীবনের প্রথম ১২ বৎসর মানুষ যে ধর্ম-বিশ্বাসের মধ্যে প্রতিপালিত হয়, বড় হইলে, তাহাকে সেই ধর্মই অবলম্বন করিতে দেখা যায়। এ সময় শিশুর হৃদয়-ক্ষেত্রে যে কোন একটা মতের বীজ বপন করা যায়, কালক্রমে তাহা প্রকাণ্ড মহাক্রান্ত হইয়া দাঁড়ায়। ১৫ বৎসর বয়সের মধ্যে বালককে যে মত্রে দীক্ষা দেওয়া হয় মৃত্যুকাল পর্যন্ত সে সেই মত্নেরই রূপ করিতে থাকে। বংশানুক্রমিক আধিকার বলিলে, ঠিক কি বুঝায়, অনেকে তাহা জানেন বলিয়া বোধ হয় না। উত্তরাধিকার হুত্রে মানুষ যতটা পাব মনে করে, অনেক সময় তাহা ঘটিতে দেখা যায় না। পিতা-মাতার গুণটি সন্তান ঠিক পায় না, তবে সেই গুণটি লাভ করার উপযোগী শক্তি ও সামর্থ্য প্রাপ্ত হয় মাত্র। শিক্ষা ও অনুশীলন দ্বারা এই উপযোগিতা ও শক্তিটি কার্য্যে পরিণত হইতে দেখা যায়। কখনগরের কুমারদের মাটির পুতুল ও খেলেনাদি প্রস্তুত করার আশ্চর্য্য ক্ষমতা থাকিতে দেখা যায়। সম্ভবতঃ এ



আধুনিক-ভাষিক ১০২১

কমতাটি তাহাদের বংশগত। কিন্তু শিল্প-নৈপুণ্যটা সম্পূর্ণ যৌগিক। বংশগত শক্তি সঙ্গেও যদি তাহারা এই শিল্পের অনুশীলন না করে, তাহা হইলে, তাহাদের মধ্যে কেহই নিপুণ, দক্ষ শিল্পী হইতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, স্বাভাবিক বুদ্ধির অনুশীলন ও কর্ষণ করিলে, তবেই তাহাতে ফল উৎপন্ন হয়। তাহা না করিলে, সে বুদ্ধি কোন কালেই ফলিতে পারে না। কিন্তু সময়ে সময়ে পৃথিবীতে এমন ছুই চারিজন ক্ষণজন্মা পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, যাহারা শিক্ষা ও অনুশীলন ব্যতিরেকেও অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন। এইসব ক্ষণজন্মা পুরুষদের লোকে প্রতিভাবান বলিয়া থাকে। প্রতিভাকে সাধারণ নিয়মের গভীর বাহিরে মনে করিতে হইবে। সাধারণ নিয়ম এই যে, কাহারও কোন বিষয়ে যদি স্বাভাবিক বুদ্ধি থাকে শৈশবে ও বাল্যে শিক্ষার দ্বারা সেই বুদ্ধিকে ও বুদ্ধিও পরিণত করিতে হইবে। এরূপ করিলেই তবে তাহাতে সফল জন্মিতে পারিবে, নচেৎ নহে।

মানুষের দেহ ও মন ঠিক একসঙ্গে পরিণত হয় না। তাহার দেহ যেরূপ বেগে পরিণত হয়, মন তাহা পারে না। শিশুর মস্তিষ্ক ও অগ্নাত্ন স্নায়ুগুণী একান্ত অপরিণত থাকে। এই কারণে শিশুর পক্ষে কোন এক বিষয়ে অধিকক্ষণ মন সংলগ্ন করিয়া রাখা একেবারেই অসম্ভব। এরূপ করিতে বাধ্য করিলে, তাহার স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতি হইবার কথা। তথাপি এমন অনেক শিশু দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা শৈশবেই বিশেষ বুদ্ধির পরিচয় দেয় তাহাদের কথাবার্তা, কাজ-কর্ম দেখিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। ইহাদিগকে “অকালপক” বলা যাইতে পারে। এ অবস্থাটিকে স্বাভাবিক মনে করা উচিত নয়! ইহার প্রেরণ দিতে নাট। ইহার পরিণাম ফল কখনই ভাল হইতে পারে না। এই সব শিশুর শরীর ও মন কোনটাই সম্পূর্ণ ভাবে পরিণত হইতে পারে না। আত্মকা মহাদেশে

কতগুলি বর্ষের, আদিম, অসত্য জ্ঞান আছে যাহারা মোটের উপর ১০ বৎসরের অধিক বাঁচে না। ইহাদের শিশুরা খুবই অকালপক। ইহারা এত অল্পবয়সে হাটিতে শিখে, শুনিতে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ১০ বৎসরের মধ্যে ইহাদের দেহের ও মনের পরিণতি শেষ হইয়া যায়। কাফি শিশুরাও খুবই অকালপক বলিয়া বিখ্যাত। পৃথিবীতে সকল জাতির মধ্যে ককেশীয় জাতিরই সর্বাপেক্ষা বিলম্বে পরিণতি সাধিত হয়। এবং ককেশীয় জাতিরই যে বিজ্ঞা, বুদ্ধি ও সত্যতায় সকলের শ্রেষ্ঠ, একথা কাহারই অবিদিত নাই।

“অকাল পকতা” নানা কারণে সম্ভব হইতে পারে এবং ইহার শ্রেণী-বিভাগও করা যাইতে পারে। রোকফোর্ড ( Rochford ) অকালপকতাকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর অকাল-পকদের তাহাদের বয়সের তুলনায় অধিক বড় ও বেশী বুদ্ধিমান দেখায়। ইহাদের দেহ সাধারণতঃ বেশ বলিষ্ঠ। সমবয়স্কদের সঙ্গে অপেক্ষা বয়স্কদিগের সঙ্গেই ইহারা অধিক পছন্দ করিয়া থাকে। ছেলেদের স্বাভাবিক দৌড়াপে ইহাদের তেমন মন লাগে না। লেখাপড়া ও জ্ঞান চর্চাতেই ইহারা বেশী মুখ পাইয়া থাকে। শিক্ষক মহাশয় ও বাপমার নিকট সর্বদা উৎসাহ ও বাহবা পওয়াতেই ইহারা লেখাপড়াকেই একমাত্র ব্রত করিয়া তুলে। ইহার ফলে তাহারা অসময়েই দিব্য পাকিয়া উঠে, বটে কিন্তু তাহা বেশী দিন স্থায়ী হয় না। অসময়ে পাকিয়া তুললে ফলের যে দশা হয় ইহাদের বেলাতেও ঠিক তাহাই হইয়া থাকে। এইসব শিশুদের মানুষ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নয়। ইহাদের প্রতি সর্বদাই লক্ষ্য রাখার দরকার। ইহাদের স্বাভাবিক জ্ঞানস্পৃহাকে উৎসাহ দিতে নাই। হিসাব করিয়া মানুষ করিলে, এইসব শিশু বড় হইলে, অসাধারণ মানসিক শক্তির পরিচয় দিতে সমর্থ হয়। অন্যথা শিশুকালে প্রভূত বুদ্ধির পারায় দিলেও বড় হইলে তাহার

আর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না—ইহাদের সকল বুদ্ধি বিশ্ববিজ্ঞানের পরীক্ষারাজি উত্তীর্ণ হইতেই শেষ হইয়া যায়।

দ্বিতীয় প্রকার “অকাল পক” শিশুরা দেখিতে প্রথম শ্রেণী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহারা প্রায়ই রুগাকার। ইহাদের এই রুগতা হয় বংশগত নয়তো গোন রোগ সত্ত্বত।

ইহাদের বংশে প্রায় স্থানেই ক্ষয়কাশ (phthisis) রোগের ইতিহাস থাকিতে দেখা যায়। ইহাদের দেহ যেন নিতান্তই ক্ষণভঙ্গুর। ইহাদের গাত্রবর্ণ বেশ উজ্জ্বল গৌর; মুখশ্রীতে দিব্যালাবণ্য থাকিতে দেখা যায়। চক্ষুহুটি বেশ উজ্জ্বল। তাহাদের হৃদয় খুবই ব্রহ্মও প্রেমপরায়ণ। ইহাদের মানসিক শক্তি খুবই উচ্চতর বলিয়া বোধ হয় কিন্তু ইহাদের শরীরের অবস্থা এমন যে, কোন বিষয়ে অধিকক্ষণ নিযুক্ত থাকা ইহাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। ইহাদের বুদ্ধি কেবল একটি মাত্র বিষয়েই পরিস্ফুট ও পরিণত হইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ ইহাদের অরুণশক্তি খুবই তীক্ষ্ণ। ইহাতে দেখা যায় অরুণ শক্তির যে পরিমাণে উন্নতি হইতে দেখা যায়, আত্মন্য মানসিক শক্তির সেই হারে অবনতি ঘটিতে দেখা যায়। শিশুকবি, শিশু গণিতবিদ ও শিশু-সঙ্গীতজ্ঞ সাধারণতঃ এই শ্রেণীর অকালপকদের অন্তর্গত। ইহাদের সকল মানসিক শক্তি মূধু একটি মাত্র বিশেষ গুণের পরিণতিকল্পে ব্যায়িক হইতে থাকায়, বড় হইলে, ইহাদের নিকট বেশাকিছু আশা করিতে পারা যায় না। এই শ্রেণীর অকাল পকদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ইহাদের শরীরের বাহ্যতে বিশেষ উন্নতি হয় সদা সরদা তাহার প্রাপ্ত লক্ষ্য রাখা দরকার। ইহাদের মানসিক শক্তির অবাধ-পতির পথে বিঘ্ন উপস্থিত করা আবশ্যক। এবিষয়ে ইহাদের উৎসাহ না দিয়া বরং নিরুৎসাহ করা দরকার।

সন্তান-পালনের সাহিত্য শিক্ষার একান্ত সমিষ্ট

সম্বন্ধ রহিয়াছে। শিক্ষা অর্থে ছেলেকে “ইন্ডুলে দেওয়া” মাত্র বুঝিলে হইবে না। হারবার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) শিক্ষাকে ৫টি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

তাহার মধ্যে শিক্ষার ৫টি উদ্দেশ্য :—

- (১) সাক্ষাৎ ভাবে আত্মরক্ষা করিতে শিক্ষা করা।
- (২) গোপনভাবে আত্মরক্ষা করিতে শিক্ষা করা।
- (৩) সুপিতা হইবার উপযোগতা লাভ করা।
- (৪) সুনাগরিক হইবার উপযোগিতা লাভ করা।
- (৫) শীলতা, ভদ্রতা, এবং চিত্তরঞ্জিনী বিভাদি শিক্ষা করা।

এই পঞ্চবিধ বিষয়ের প্রাপ্ত লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে তবেই সন্তানটি “মানুষ” হইতে পারে। ইহাদের কোন একটি বিষয় অবহেলা করিলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় এবং ছেলেটি ঠিক “মানুষটি” হয় না। কি করিয়া আপনাকে বাচাইতে হইবে, কি করিলে রোগাদির আক্রমণ এড়াইতে পারা যাইবে, আঘাত ও অস্ত্রাঘাত দৈব বিপদ-পাত নিবারণ করিতে পরা যাইবে—এ সকলই শিক্ষাসাপেক্ষ। কিন্তু এ সকল বিষয়ে শিক্ষালাভ করিলেই যে আত্মরক্ষা বিষয়ে বড়েই হয় তাহা নহে। জীবন-ধারণের জগৎ অর্জেরও আবশ্যক অতএব অর্থকরী বিভাগে শিক্ষা করিতে হইবে। কৃষকের বিষয় কেবল অর্থকরী বিভাগকেই আমরা একমাত্র শিক্ষার বিষয় করিয়া তুলিয়াছি সেইজন্য আমাদের শিক্ষা অনেকাংশেই অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে। কি করিলে সুপিতা হইতে পরা যায়, এসম্বন্ধেও সকলের জ্ঞান থাকা কর্তব্য কেন না ইহারই উপর জাতীয় উন্নতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া থাকে। মানুষ সামাজিক জীব অতএব সুনাগরিক হইতে হইলে যেসকল গুণের আবশ্যক, সেগুলিও শিক্ষা দ্বারা অর্জন করণ প্রয়োজন। ইহার জন্ম রাজনীতিতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও নীতিবিজ্ঞান প্রভৃতিতে জ্ঞানলাভ করার দরকার। শীলতা, ভদ্রতা এবং বিবিধ দিশুদ্ধ আচরণ প্রমোদ

বাধিন-কাণ্ডিক ১০২১

উপভোগ করিবার ক্ষমতাও অনেক পরিমাণেই শিক্ষা-সাপেক্ষ।

সন্তানপালন সম্বন্ধে পুস্তকে লেখা যত সহজ, কাণ্ডে কিন্তু ততটা সহজ নয়। এ বিষয়ে পারিবারিক চিকিৎসক অনেক কাণ্ড করিতে পারেন। চিকিৎসা-পত্রে তাঁহাকে অনেক পরিবারেই গমনাগমন করিতে হয়। তিনি সে সকল পারবারের প্রত্যেকেরই সহিত বিশেষভাবেই পরিচিত। কোন শিশুটি কিরূপ ভাবে বার্কৃত ও পালিত হইতেছে ইহা তাঁহার নিকট অজ্ঞাত থাকিতে পারে না। এই সকল কারণে কোন শিশুর পালন সম্বন্ধে যদি কোন ভ্রম ঘটে ইচ্ছা করিলে তিনি সরাসরি সংশোধন করিয়া দিতে পারেন। দুঃখের বিষয় এ সম্বন্ধে চিকিৎসকদের যে একটা দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে, এ কথা তাঁহাদের একেবারেই মনে হয় না। তিনি অনেক সময় শিশু-টির মাতার স্বকের উপর সমস্ত দোষ চাপাইয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকেন। ইহাদের অনেকেই বলিয়া থাকেন বর্তমান সময়ে জননীরা শিশুপালন বিষয়ে অতিশয় অমনোযোগিনী তাঁহাদের উপদেশ থাকা পালন করা ইহারা কর্তব্যের মধ্যেই মনে করেন না। বলা বাহুল্য এবিষয়ে আমরা তাঁহাদের সহিত সম্পূর্ণ একমত হইতে পারি না। এখনকার জননীরা পূর্বকালের জননী-দের অপেক্ষা সন্তানের ওভাঙত বিষয়ে যে অধিক উদাসীন এ কথা কোন প্রকারেই বলা যাইতে পারে না। সন্তানের মঙ্গলের জন্ত এখনকার মাতারাও তাঁহাদের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিতে সম্পূর্ণই প্রস্তুত আছেন। তবুও যে সন্তানপালন বিষয়ে ভ্রম-প্রমাদাদি ঘটে, তাহার একমাত্র কারণ অনাভিজ্ঞতা ও বিচারবুদ্ধির অভাব তিন্ন আর কিছুই নহে।

বর্তমান কালের জননীদের স্বন্ধে দোষারোপ করিবার সময় আমরা এ কথাটি ভুলিয়া যাই যে, আমা-দের পিতামহীদের আমলে সন্তানপালন ব্যাপারটা

যত সহজ ছিল, এখন আর তাহার কথাটা নাই। সেসময়কার অবস্থাতে আর এখনকার অবস্থাতে আকাশ পাতাল প্রভেদ। তখনকার সভ্যতাও যেমন সহজ ছিল, ছেলে “মামুষ” করাও তেমন সহজ ছিল। এখনকার সভ্যতাও যেমন দিন দিন জটিল হইয়া পড়িতেছে সন্তান-পালনও তেমনই দিন দিন জটিল হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহার জন্ত আমাদের দায়ী করলে চলিবে না। কালের ধর্মই এই। অভ-এব হারই মধ্য হইতে আমাদের গর্ভস্থ নিরুপিত করিয়া লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। কাল শ্রোতকে ফিরাইতে চেষ্টা করা আর সাগরাভিমুখিনী স্রোতস্থিনীকে জ্ঞাতাবর্তন করিতে বগায় কিছু প্রভেদ নাই। পরিবর্তনশীল অবস্থা নিচয়ের মধ্যে আমরা গম্বগ্রহণ করিয়াছি। ইহাতে একদিকে আমাদের অসুবিধা যেমন হইয়াছে, লাভও তদপেক্ষা কম হয় নাই। আমাদের শৈশবে দেশের ও সমাজের যে অবস্থা ছিল এখন তাহার কতই না পরিবর্তন হইয়াছে! এই সব পরিবর্তনের লাভ লোকসান আমাদের গুল্য ভাবেই সহ্য করিতে হইবে। এ কথা স্বীকার করিতেই হয় যে, সন্তানের প্রতি পিতামাতার যত পূজাপেক্ষা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে যে সন্তান-পালন বিষয়ে ভ্রম-প্রমাদ ঘটিতেছে, সে কেবল সময়েরগুণে ও অবস্থার পরিবর্তনের জন্তে। সত্য কথা বলিতে কি পূজাপেক্ষা এখন ছেলের কথা মামুষ যেন বেশী করিয়াই ভাবিয়া থাকে। বর্তমান কালের বিশেষত্ব এই। এখন একটি ছেলের জন্ত বাপ মা যত ভাবেন, যত করেন তাহা যদি আমাদের পিতামহগণ দেখিতেন তাহা হইলে, তাঁহাদের বিশ্বাসের আর সীমা থাকিত না। শিশুদের জন্ত আজকাল অনেক শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী বিশেষভাবে শিক্ষালাভ করিতেছেন শিশু-পাঠ্য হাজার হাজার পুস্তক-পুস্তিকা প্রতিদিন প্রকা-শিত হইতেছে। শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রেরও অভাব

নাই। ফলতঃ এখনকার ছেলেমেয়েদের বাড়ীতে ও সমাজে যে একটা স্থান দেওয়া হইয়াছে, ৫০ বৎসর পূর্বে কোথাও তাহা ছিল না। কিন্তু স্থলবিশেষে ইহার একটু বাড়াবাড়ি ও অপব্যবহারও যে না হইতেছে, তাহা নহে। এক একটা বাড়ীতে গিয়া দেখি, সেখানে ছেলেদের একটা প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের এতদূর বাড়াইয়া তোলা হইয়াছে, তাহাদের উপর এমন সব কাজের ভার দিয়া রাখা হইয়াছে যে, সে সব বহন করা তাহাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। সন্তানপালন বিষয়ে আর একটি ভুল অনেক বাড়ীতেই ঘটিতে দেখা যায়। অনেক বাপ-মা ছেলে মেয়েদের অষ্টপ্রহরের জন্ম সঙ্গী করিয়া রাখেন।

বয়স্ক ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে বয়সের যে একটা পার্থক্য আছে, এ কথাটা যেন তাঁহারা একেবারেই ভুলিয়া যান। ইহারা যেসব আয়োদপ্রমোদে মুখ ভোগ করেন শিশুদেরও তাহার অংশীদার করিতে চেষ্টা করেন। গিয়েটার দেখিতে হইলে, কোলের ছেলেটিকেও লইয়া যাইতে ভুলেন না। শিশুদের ও বালকদিগের পক্ষে এসব আয়োদপ্রমোদ কোন মতেই ভাল নয়। ইহাতে তাহাদের কচি মস্তিষ্ক ও অগ্নাশ্ন স্নায়ুমণ্ডলী অগ্নাশ্নভাবে উত্তেজিত হয়। ইহার ফলে শৈশবেই বিবিধ স্নায়বীয় রোগের বীজ বপন করা হয়। বড় হইলে এই সব ছেলেরা নানা প্রকার স্নায়বীয় দৌর্জল্যে কষ্ট পাইতে থাকে। শিশুর পক্ষে ছেলেবেলা দৌড়, কাঁপ প্রভৃতিই একান্ত স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর ক্রীড়া। বয়োরজ্জির সহিত শিশু একে একে তাহার শৈশবের খেলাগুলি আপনাই হইতেই ত্যাগ করিতে থাকে, কিন্তু তাহার পূর্বেই যদি তাহা-দিগকে ঐ সকল খেলা ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে তাহাদের প্রতি অগ্নাশ্ন জ্বলম ও অত্যাচার করা হয় মাত্র। হৃৎকেন্দ্র বিষয় অনেকের বাড়ীতেই শিশু-দের এইরূপ অগ্নাশ্ন জ্বলম সহ্য করিতে বাধ্য হইতে হয়

আরটিমাস্ (Artemus) বলেন—এমন অনেক অবিবেচক বাপ-মা আছেন তাঁহাদের কেমন স্বভাব, যেসব জায়গায় গেলে শিশুর ভয় পাওয়ার সম্ভব সেখানে তাহাদের যেন না লইয়া গেলেই নয়। ভয় পাইয়া শিশুর প্রাণব্যয়োগ হইয়াছে এমন কথাও শুনিতে না পাওয়া যায়, এমন নয়। যাহা দেখিলে, কি শুনিলে, শিশুর মনে ভয় জন্মাইতে পারে, এমন কিছু করা বা বলা অতিশয় অগ্নাশ্ন। তথাপি এ অগ্নাশ্ন অনেককেই করিতে দেখা যায়। শিশুচারিত্রে অনভিজ্ঞতা ও অমমোযোগিতাই ইহার একমাত্র কারণ। জীব-বিজ্ঞা শিশুদের পক্ষে উত্তম শিক্ষা সন্দেহ নাই। কিন্তু যে সব শিশু স্বভাবতঃই ভীক-স্বভাব, তাহাদিগকে কিছুতকিমাংকার জন্ত ও কুৎসিৎ, কদাকার সরীসৃপাদি দেখাইতে না লইয়া যাওয়াই ভাল। এই সব দেখিয়া শুনিয়া বেচারারা দিনটা তো ভয়ে ভয়ে আড়ষ্ট ভাবে কাটাইয়া দেয় আর রাত্রে ভয়ের স্বপ্ন দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। এই সব শিশুদের হাতে বাপ, ভ্রাতৃক ও অগ্নাশ্ন ভাষণ বগ্ন জন্তুদের গল্পের বই দিতে নাই, তাহাতে তাহাদের উপকার অপেক্ষা অপকারই হইতে দেখা যায়। কোন শিশুর যদি কোন বিষয়ে ভয় থাকে, তাহা হইলে, তাহাকে দোর করিয়া তাহার ভয়ের কারণটির সম্মুখবর্তী করিতে নাই ইহাতে তাহার ভয়টি তো যায়ই না, উপরন্তু সে আরও কাপুরুষ হইয়া পড়ে। এরকম করায় তাহার মস্তিষ্কের বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে। ভয় পাইলে শিশুর “গা গরম” হইতে পারে, এ কথা অনেকেই অবগত আছেন। এ ছাড়া আরও অনেক মৃদু গোছের রোগ আছে, তাহাদের কারণ ভয় পাওয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আজকাল মেয়েদের মধ্যে হিষ্টেরিয়া, ও ছেলেদের মধ্যে স্নায়ুদৌর্জল্য যেন সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে বর্তমান কালে, ছেলে-

আশ্বিন-কার্তিক ১৩২১

মেয়েদের এমন সব সামাজিক অবস্থার মধ্যে থাকিতে হয়, যাহাতে তাহাদের মস্তিষ্কের অত্যধিক উত্তেজনা ও খাটুনি না হইয়া যাউতে পারে না। বাপ-মা ইচ্ছা করেন তাহাদের ছেলেটির দেহ ও মন উভয়ই বেশ উন্নত ও পরিণত হোক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে বর্তমান কালের সামাজিক অবস্থার দোষে তাহাদের এ বাসনা ব্যর্থ হইতে বাসিয়াছে। আমরা নিজেরাই শিশুর সুপরিণতির পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছি। স্নায়ু-দৌর্বল্যের বীজ শিশুকালেই বপন করিয়া থাকি। শিশুকে লইয়া এত নাড়াচাড়া করি, তাহাকে এত বেশী খেলা দিয়া থাকি যে, তাহার স্নায়ুগুলি বিশেষ ভাবেই পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে। শিশুর ও যে আমাদের মত স্নায়ু আছে একথা আমরা পদে পদে ভুলিয়া বসি। অতিরিক্ত আদর সোহাগের ও নাচানোর জন্য আমরা অনেক শিশুর অনিদ্রা রোগ জন্মাইতে দেখিয়াছি—ইহার জন্য তাহার মেজাজ বিটখিটে হইতে দেখিয়াছি। যদিচ শুনিতে কঠিন, ওপাতি আমরা বলিতে বাধ্য অনেক সময় শিশুদের নাচান বা খেলা দেওয়া, তাহাদের লইয়া কৌতুক রঙ্গাদি করা, একবারে বন্ধ করাই অধিক শ্রেয়স্কর। এ সব না হইলেও শিশু ভাল ভিন্ন মন্দ থাকে না। শিশু আমাদের আমোদ দেওয়ার ও খেলা দেওয়ার অপেক্ষায় বসিয়া থাকে না। সে নিজের আমোদ নিজেই যেন দেখিয়া লইতে জানে।

শিশু যেই একটু বড় হয়, তাহার বুদ্ধিবৈবেচনা যেই একটু পরিপুষ্ট হয়, আমরা অমনি তাহার মস্তিষ্কের উত্তেজনায় পরিমাণের বৃদ্ধি করিতে থাকি। ইহাতে যেসকল শিশু স্বভাবতঃ দুর্বল, তাহাদের স্বাস্থ্যের বিশেষ অনিষ্ট হইতে দেখা যায়।

খুব ছোট শিশুকে নাড়িয়া চাড়িয়া, তাহাকে নাচাইয়া ছুলাইয়া, তার বাপ-মাই বেশী আনন্দ পান, ইহাতে শিশু কত যেন আনন্দ পায়, তাহা তাহাবারও

দরকার হয় না। কিন্তু শিশুটি যখন একটু বড় হয়, তখন সে কিসে আনন্দ পাবে, সেটাও তাহাবার দেখিবার আবশ্যক হইয়া পড়ে। তখন তাহার চিন্তাবিনোদের জন্য তাহার হস্তে খেলনা দেওয়ার, এবং আর কত কি করার দরকার হয়। দুঃখের বিষয় এ সম্বন্ধে অনেক স্থলেই অত্যন্ত বাড়াবাড়ি ঘটতে দেখা যায়। শিশুর চিন্তাবিনোদের উপকরণের ব্যবস্থা করিবার কালে, অনেকেই একথাটি ভুলিয়া যান যে, ৬গণ্টা শিশুর নিকট চিরসবুজ ও চিরনবীন। আমাদের মত পৃথিবীটা তাহাদের কাছে একান্ত পুরাণ ও এক্ষেয়ে হইয়া উঠে নি। ছোট শিশু অতি সামান্য, তুচ্ছ, নগণ্য জিনিসেই বিমুগ্ধ হয় এবং তাহাতেই সে যথেষ্ট আনন্দ পায়। এরূপ স্থলে, তাহার হস্তে অত্যন্ত জটিল খেলনা দিবার আবশ্যক কি আমরা তো তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। শৈশবের একটা মন্ত বিশেষত্ব এই যে, শিশুর এক একটা বিশেষ জিনিসের প্রতি বেজায় ঝোঁক থাকে ইহাতে তাহার আর যেন অকুচি হয় না। ছেলেভুলান ছড়া, “রাজ পুতুরের” গল্প ইত্যাদি শিশুর নিকট কোন কালেই পুরাণ হইতে জানে না। সে প্রতিদিন ঠাকুরমার কাছে শুনিতেছে, তবুও যেন তাহার আকাঙ্ক্ষা মিটে না। খেলনা সম্বন্ধেও এরূপ বিশেষত্ব না থাকে এমন নয়। কতকগুলি খেলনা শিশুদের একান্ত প্রিয়। এগুলি অগ্রাঞ্জীর্ণ হইলেও তাহারা ইহাদের ছাড়িতে পারে না। এ গুলিতে তাহারা যত আনন্দ পায় তেমন জাঁকাল মূল্যবান খেলনাতে কখনও পায় না। এমন কেন হয় তাহার একটা কারণও যে না দিতে পারা যায় এমন নহে। শিশুর মানসিক শক্তি নিতান্তই অপরিণত। তাহার ধারণা-শক্তিও নিতান্ত অপরিপুষ্ট। সে তাহার পুরাণ খেলনাটির সহিত বিশেষভাবেই পরিচিত।

বিবিধ কৌশলপূর্ণ জাঁকাল নূতন খেলনা হাতে দিলে, সে তাহা বুঝিয়াই উঠিতে পারে না কাজেই

তাহাতে তাহার কোনই আনন্দ হইতে পারে না। নূতন খেলনাটিকে বুঝিতে চেষ্টা করিতে গেলে তাহার হৃৎকল মন ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। এই কারণেই সে বহুমূল্য নূতন খেলনাটি দূরে নিক্ষেপ করিয়া তাহার ভগ্নপ্রায় পুরাতন খেলনাটার দিকেই অধিক আকৃষ্ট হয়। শিশুকে নিত্য নূতন নূতন খেলনা দিয়া আদর করিতে থাকিলে, নূতন খেলনা লাভ করিবার জন্য তাহার একটা অস্বাভাবিক আগ্রহ জন্মায়। শেষে এক দিন এমন হয় তাহার এই অস্বাভাবিক আগ্রহ মিটাটবার আর উপায় থাকে না। এরূপ শিশু সন্তোষ কাহাকে বলে তাহা জানিতে পারে না। ইহার জন্য সে নিজে দায়ী নয়, দায়ী তাহার যাহারা কক্ষিতমাত্র ভবিষ্যৎ বিবেচনা না করিয়া, তাহার হাতে যখন তখন, যেসে খেলনা দিয়া আদর করিয়া আসিতেছেন। যে শিশুর খেলনার পরিমাণ যত অল্প সে ততই সুখী, ইহা আমরা কতবার লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি।

মনের পরিণতি অতিশয় ধীরে ধীরে সম্পাদিত হয়। শিশু যখন খুবই ছোট থাকে সে সময়ের জন্য রুম-ঝুমির মত খেলনাই তাহার চিত্ততৃষ্টির পক্ষে সহজ ও যথেষ্ট মনে করিতে হইবে। তারপর সে যখন একটু বড় হয়, তখন রুমঝুমিতে তাহার চিত্ত প্রসূত হইতে পারে না। তখন তাহার খেলনার পরিবর্তন করা আবশ্যিক। ইহার পর সে যখন আরও বড় হয় তখন তাহার খেলনাগ্রিয়তা নানা প্রকার শিশুশুলভ ক্রীড়া ও পুস্তকানুসারে পরিণত হয়। তখন সে কিছুক্ষণ পড়ে, বাকী সময় দৌড় ধাপ করিয়া বেড়ায়।

বয়সের তারতম্যানুসারে আশোদপ্রমোদেরও পার্থক্য হওয়াই একান্ত স্বাভাবিক। শিশুর যাহাতে আনন্দ, যুবাব তাগাতে আনন্দ থাকিতে পারে না। আবার যুবাব যাহাতে আনন্দ বৃদ্ধির তাহাতে কোনই

আনন্দ হয় না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বর্তমান কালে আমাদেরকে শিক্ষার দোষে, শিশু, যুবা, বৃদ্ধ সকলকেই একই প্রকার আশোদে যোগদান করিতে হয়। ইহাতে শিশুর দেহ ও মনের উপর অসম্ভব চাপ পড়িতেছে, তাহার কল্পনা শক্তি অস্বাভাবিক রূপে উত্তেজিত হইতেছে। জগতে সন্তোষেই যন্ত্রণার একমাত্র সুখ। বাসনার পরিতৃপ্তিতেই সন্তোষ জন্মায়। সেই শিশুই প্রকৃত স্থায়ী, যে সন্তোষ সরল আশোদ প্রমোদেই সন্তুষ্ট থাকিতে শিখিয়াছে। যে শিশু বড় বড়দের আশোদপ্রমোদ উপভোগ করিয়া তাহাতে বিভূক্ত হইয়াছে তাহার জুলা জুলাগা আর কে আছে? সাদাসিধে সহজ রুচি লইয়া যে ব্যক্তি আরম্ভ করিয়াছে, তাহার পক্ষে শিথিলতার অনেক উপকরণ থাকে। আর শৈশব ও বাল্যেই যাহার সকল আকাঙ্ক্ষা—সকল আশা পূর্ণ হয় তাহার পক্ষে ভাবনটা একটা মগ্নতার ও অসুখের কারণ হয় মাত্র।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাগায়ণ বাকচী।

## আহ্বান

আকাশ তোরে ডাক দিয়েছে,

ওরে আমার খাঁচার পাখী !

আগলে তোর ঐ বন্ধ আগল

আজও আটক রইবি না কি ?

দূরে দূরে গগন মাঝে

সুরে সুরে যে গান বাজে,

হাজার স্বরের আনন্দে সে

সুরটি রে তোর রইল বাকী ;

আকাশ তোরে ডাক দিয়েছে,

ওরে আমার খাঁচার পাখী !

আশ্বিন-কাষ্টিক ১৩২১

নিখিল তোরে কোল দিয়েছে,  
ওরে আমার ভুবনছাড়া,  
কোন ভ্রগতের মন্দাকিনী  
নন্দনে তোর চালুল ধারা !  
গন্ধ-আকুল বকুল বনে  
বাতাস বহে অকারণে,—  
কোন সুদূরের গান গাহে সে  
উদাস সুরে পাগলকরা !  
নিখিল তোরে কোল দিয়েছে,  
ওরে আমার ভুবনছাড়া !

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ ।

## নন্দ হুলাল

চারিদিকে নিস্তরঙ্গ নীরবতা ; আকাশে, বাতাসে, প্রান্তরে, মেখে রৌদ্র-কিরণের মায়া মাখানো। বাড়ীর চারিদিককার আমগাছগুলি হইতে স্নিগ্ধ অম্রমুকুলের সুস্থ মধুর গন্ধ মধুপুঞ্জনের সঙ্গে জড়িত হইয়া তপ্ত বায়ু-তরঙ্গে ছড়াইয়া গিয়া সমগ্র মধ্যাহ্নটিকে অত্যন্ত নিজাতুর করিয়া তুলিয়াছিল।

প্রতিদিন ঠিক এই সময়ে রৌদ্রোজ্জ্বল মধ্যাহ্নের সমুদয় মাদকতা সৌদামিনীর কোমল-তপ্ত হৃদয়টুকু পরশ করিয়া তার গোলাপী রংটি দেখাইয়া দিত। তার হৃদয়ের সুন্দর পেয়ালাটি কোন সুদূর স্বর্গরাজ্যের ক্ষতিকর অশ্রুজলে—কোন সন্নিহিত মরণ-রাজ্যের কণিকের আনন্দ-রসে পূর্ণ-উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। সে মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া দেখিত গাছে গাছে যেন কার বন-ফুলের মালা হাওয়ায় হুলিতেছে, কান পাতিয়া স্পষ্ট শুনিতে পাইত অদূরে তরুজলের নিক ছায়াতলে যেন কার অদৃশ চরণে সোনার নুপুর বাজিয়া উঠিয়াছে। তার বকের ভিতরটা আনন্দে গুরু-গুরু করিয়া উঠিত।

আবার কখনো কখনো আকাশের পানে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তার মনে হইত রঙীন মেঘের তরা বহিয়া যেন কোন অকুলের নাবিক অনন্ত নীল সাগর পাড়ি দিয়া রঙীন মেঘের খেয়া-নৌকায় ইহলোক হইতে পরলোকে, পরলোক হইতে ইহলোকে বিশ্বের নরনারী পারাপার করিতেছে। চিত্রগুলি বালিকার হৃদয়ে খুব পরিষ্কার হইয়া না ফুটিলেও উহাদের ঈপ্সিত ভাবের আশাসগুলি হৃদয়ের সুখহৃৎকের মাঝে বরাবর ঝিলিক দিয়া উঠিত। এমন করিয়া প্রতিদিন তার হৃদয়ের সমুদয় আকাজ্জা, বেদনা, স্বপ্নে ও সত্যে, আলো ও ছায়ায় বিচিত্র হইয়া দিন দিন এক অভিনব সৌন্দর্য্যে মগ্নিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

সেদিন দুপ্রহরের রোপ্য রৌদ্রজাল শ্রামল তরুলতার অন্ধ, নব কিশলয়ের মুখে, দিগন্তমীন সুনীল আকাশ-প্রান্তে বসন্তের মধুর আনন্দটুকুর মত ঝিকমিক করিতেছিল। সৌদামিনীর মা শোয়ার ধরে নীতল মেঝের উপর পাটিতে শুইয়াছিলেন। একখানা বই পড়িতে পড়িতে তাঁর হুঁচোখের পাতা ঘূমের আলস্তে ভাঙ্গিয়া আসিতে-ছিল। মেয়েটি তার চুলগুলি অঙ্গুল দিয়া চিরিয়া চিরিয়া দিতেছিল।

যখন মার হাতের থোলা বইখানা আলগোছে তাঁর বকের উপর পড়িয়া গিয়া বন্ধ হইয়া গেল এবং চোখ-ছুটি ঘূমের ঘোরে বুজিয়া আসিল, তখন সৌদামিনী ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। তার হাতের চুড়িগুলি, কানের হুলগুলি রুণু-রুণু বাজিয়া উঠিতে চাহিয়াছিল। তাদের মুখের শিঞ্জন কোনমতে সামলাইয়া লইয়া সৌদামিনী বরাবর দোতালার সিঁড়ি দিয়া ছাদের দিকে চলিয়া গেল।

ছাদের চাল কোঠার পাশে ছোট একটি কামরার দরজা ভেজান। দরজার ফাঁক দিয়া সৌদামিনী উকি দিয়া একবার কি দেখিল। তারপর ছুটি প্রহর কামরার মত পায়ের উপর ভর দিয়া ধীরে ধীরে সে দরজাটি

খুলিয়া নিঃশব্দ চরণে ঘরের ভিতরে গিয়া দাঁড়াইল। মুহূ অন্ধকারের ভিতর একটি বেদীর উপর একখানা রূপার বিমান, তার ভিতরে কতগুলি ফুল-পাতার রাশি অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। ঘরটি ফুল-চন্দনের ও ধূপ নৈবেদ্যের সুমিষ্ট গন্ধে ভরা।

সেই নীরব মধ্যাহ্নের নিভৃত পূজা-গৃহের সুবাসিত অন্ধকারে এই একমাত্র পূজারিণী ক্ষণেক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বিমানের ভিতরকার ছায়ামিষ্ট সুন্দর পুষ্পস্তূপের পানে কতক্ষণ সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া থাকিল। তারপর বিমানটির কাছে আসিয়া তার মৃণাল-গুহ্র কোমল বাহুলতাখানি কুসুমরাশির ভিতরে ঢুকাইয়া দিয়া সে চোরের মত ব্যস্ত ভ্রম্ভ ভাবে কি যেন খুঁজিতে লাগিল। কিছু কাল পর, ফুলপাতার অন্তরাল হইতে স্বর্ণাকলের এক প্রান্ত মুহূ অন্ধকারে ঝকঝক করিয়া উঠিল। সৌদামিনীর দুই চক্ষু সহসা পুলকে বিষ্ময়ে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি দুই হাতে ফুলের রাশি ঠেলিয়া দিয়া প্রস্তর-নির্মিত ছোট সুন্দর একটি প্রতিমূর্তি বাহির করিয়া আনিল। সৌদামিনীর সুমধুর স্পর্শের ভিতর বোধ হয় তার সবটুকু কচি প্রাণ চালিয়া দিয়াছিল, তাই তার পরশ লাগিতেই যেন নিদ্রিত বনমালা সহসা সৌন্দর্য্যের মধ্যে জাগিয়া উঠিলেন। ক্ষুদ্র পায়ের উপর ছোট নূপুর পরা পায়ের উপর পা রাখিয়া বনমালা জিতজব বেশে তার ছোট ভক্তিমতী পূজারিণীটির সমুখে রঙীন ঠোঁটের উপর বাণীটি তুলিয়া লইলেন। অশ্রুট ফুলটির মত হাসি হাসি বুথখানির ঐ রঙীন ঠোঁটের পরশে মোহন বাণীতে বুঝি এখনি একটি অশ্রুত সুন্দর কোমল মিলনের গাথা বাজিয়া উঠিবে।

সৌদামিনী বিস্মিত-ভূষিত নেত্রে অনেকক্ষণ ধরিয়া মূর্তিটি দেখিয়া লইল। জননী বৈষ্ণব নবপ্রেম-বিকশিত-নেত্রে প্রথম প্রস্তুত শিশুটির পানে চাহিয়া থাকে, চাহিয়া হৃদয়ান্ত চোখের দেখার সাধ মিটে না, সৌদামিনীর

চোখে মাতৃস্নেহ সেই সুধামাখা মেহদৃষ্টি উৎপলিতেছিল, যেন একখানা ছবি—অশ্রু কলা-শিল্পেরই সাধনার জিনিস।

বনমালা এখনই তার হাস্যোদ্ভিগ্ন অধর-প্রান্তে বাণীটি বাজাইয়া চারিদিক পুনরিত করিয়া তুলিবেন, এখনি তার অশ্রুত-সুন্দর জীবন্ত বাণীগীতি সৌদামিনীর হৃদয়-কুঞ্জে মন্ত্ররিত হইয়া উঠিবে, বোধ হয় সেই আশায়ই সে মূর্তিটি হাতে লইয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিল। বাণী যখন বাজিল না, তখন আঁচল দিয়া দেবতার মুখ হইতে পরম মেহে চন্দনের গন্ধমাখা পুষ্পরেণু মুছিয়া লইয়া সৌদামিনী আবার মেহপূর্ণনয়নে মূর্তিটির পানে চাহিয়া দেখিল, বিমানের বিশৃঙ্খল পুষ্পরাশির মাঝে মূর্তিটি রাখিয়া দিয়া আর একবার হৃদয়ের সমুদয় ক্ষুধায় লোচন পূর্ণ করিয়া লইয়া ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। তারপর একটি মুহূ অপ্রসক্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সৌদামিনী নিঃশব্দে সে পূজার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সিঁড়ি দিয়া বরাবর নীচে নামিয়া যেখানে অজস্র নুতন বোলের ভারে আমগাছের কচি ডালখানি হেলিয়া পড়িয়া সিঁড়ি-ধাপের একাংশ ছায়ামিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল, সৌদামিনী সেইখানে আসিয়া পা মেলিয়া বসিয়া পড়িল। সেখানে বসিয়া সে নীরবে কাঁদিতে লাগিল। অশ্রুবিন্দুগুলি তরল মুক্তাবিন্দুর মত নেত্র-পল্লবের উপর ছল ছল করিতে লাগিল। এরূপ নিম্নক হৃপ্রহরে স্নিগ্ধ তরুচ্ছায়ে মাতৃস্নেহ ব্যথিত চিত্ত সহজে অবরোধমুক্ত হয় বটে, কিন্তু সৌদামিনী বালিকা—যার এখনো পুতুল খেলার বয়স পার হয় নাই,—তার আবার কিসের হৃৎকণ্ডার উপর তার এমন করুণ-কঠিন অশ্রু-সজ্জল গুরু অভিমান! সেই দিন হইতে এখন সৌদামিনী নিরালা পাইলেই চুপ করিয়া কাঁদে। এখানে ওখানে, ঘুঁইগাছের পাশে, বাধাঘাটের আড়ালে তার লুকাইয়া কালা আর শেব হয় না। রাত্রির অন্ধ-কারে বালিশের ভিতর মুখ লুকাইয়া কাঁদবার সময়



আধুনিক-কালিক ১০২১

তার বুক কে কোন সুদূর জন্মান্বয়ের বেদনা ধ্রুব হইয়া উঠিত, সে কথা কে বলিতে পারে ?

বছর বছর শ্রীপঞ্চমীর সময় গ্রামে মন্ত মেলা বসে। সেবার মেলা হইতে সৌদামিনীর মা মেয়ের জ্ঞা একটি ভারি সুন্দরপুতুল-মেম কিনাইয়া আনিলেন। যেমন খাসা তার মুখ চোখ, তেমনি তার খোপাবাধার জাপানী কাগদা। নেহাৎ ভঙ্গপ্রবণ চীনা মাটির পোষাকপরা পুতুল হইলেও খাঁটি তার পরিচ্ছদের ব্যাপারটা মেম সাহেবদের মতই—অত্যন্ত আঁটা, জমকালো ও বাহুল্য পূর্ণ। পুতুলটির আর একটি বিশেষত্ব এই যে, একবার চাবি দিয়া দিলেই মেমসাহেব খাড়াটি সুন্দর কাৎ করিয়া বেহালা বাজাইতে আরম্ভ করেন—ভারি চমৎকার, সুন্দর সে বাজনা।

পুতুলটি পাইয়া সৌদামিনী প্রথমে ভারি খুসী হইল, সে কখনো মেম সাহেবের সঙ্গে খেলা করিত, কখনো নিৰ্জ্জনে বসিয়া তার বেহালার গৎ শুনিত। কখনো বুক চাপিয়া সোহাগ করিত, আবার কখনো তাহার পুতুলের সঙ্গে মামুষের মত কথা বলিত। পুতুল-মেমটি ঠিক খাঁটি বিলাতি মেমের মতই সৌদামিনীর বিস্ময় বাংলা আলাপ কিছুমাত্র বুঝতে না পারিয়া কেবল হাসি দিয়াই তার অজ্ঞতার লজ্জা চাপা দিতে চেষ্টা করিত।

কিন্তু দুই দিন অনবরত দম দেওয়াতে সে দিন মেম সাহেবের হাতের বেহালা আর বাজিল না। সৌদামিনীরও মেম সাহেবের উপর আসক্তিটা অনেকটা শিথিল হইয়া আসিল। ছপুর বেলায় বাড়িতে আর আর সকলে যখন ঘুমাইয়া পড়িল তখন সে তার খেলার ঘরে আসিয়া ধীরে ধীরে তার অনেক কালের বেতের কাজের কাঁপিটি খুলিল। সে প্রকাণ্ড কাঁপি খেলনা পুতুলে একেবারে বোঝাই! কাঁপির ভিতরে ঢালা বিছানায় এক সঙ্গে মেছুনী ও ভিক্ষুক, নর্তকী ও বন মামুষ, ফুলবারু ও ভিঁজিওয়ালা, দাড়িচাঁচা

অজীর্ণরোগগ্রস্ত কেরানী ও ঠাঁড়িওয়ালা বাবুর্চি সাহেব বসিয়া আছেন। সেখানে যেন কোন জাতিভেদ নাই! যেন তারা সব কটিতে মিলিয়া এক সখের পরিবার ভুক্ত হইয়া পরম সখ্যে সংসার করিয়া আসিতেছে! তাদের মধ্যে কারো হাসিমুখ, কেউ বিরস বদন, কেউ গর্মিত, কেউ ভীক, কারো পেটের ক্ষুধা দূর করিবার আয়োজন, কারো মন ভুলাইবার সরঞ্জাম—হু বহু সংসারের চিত্র। কেবল তফাৎ এই যে, আমাদের জাতিভেদ, সামাজিক দলাদলি ও কলহের কোন এলাকা তারা রাখিত না।

কাঁপির ডালা খুলিয়া সৌদামিনী মেম সাহেবটিকেও সেই কাঁপির ভিতর রাখিয়া দিয়া তাকেও সেই বিচিত্র সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইল। তাহাতে মেম সাহেব কোনও আপত্তি উত্থাপন করিল না। মেমটিকে সেই কাঁপির ভিতর রাখিয়া সৌদামিনী একবার সবগুলি পুতুলের পানে কৌতুকপূর্ণ নয়নে চাহিয়া দেখিল। দেখিতে দেখিতে তার চোখের পাতা আবার ছল ছল করিয়া উঠিল। কৈ! তার বহুদিনের উপবাসী হৃদয়ের ব্যথামাথা অপরিমুট আকাঙ্ক্ষাটুকু তো পূরিল না! তাই তার বুকের মাঝে নীরব বেদনার কুজ্জটিকার ভিতরে সেই সহস্র মুখ পরগলাশনয়ন নন্দমূলালের কথাই পুরিয়া ফিরিয়া মনে পড়ে।

এমনি করিয়া নিত্য নব সুখ-দুঃখের লুকোচুরির ভিতর দিয়া অনেক গুলি বছর ম্যাজিক লঠনের চল ও দৃশ্যের মতন খুব তাড়াতাড়ি পার হইয়া গেল। এখন নব বসন্তের আশ্রয় পল্লবের অন্তরালে চূতকষায়কণ্ঠ কোকিলের সাড়া পাড়িতেই সৌদামিনীর সমুদয় হৃদয়টি কামনায়, স্বপ্নে, বিশ্বাসে, বেদনায়, অশ্রুতে, ছন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নিরুন্ম ছপুর বেলায় তার ছাদের উপরকার পূজার ঘরে তার নিঃশব্দ গোপন গতিবিধিটুকু এমনি অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল যে, সে এখন চোক বুজিয়া পূজার ঘরে বাইতে পারিত এবং চোখ বুজিয়াও সে ঐ দেবতার

ভুবনমোহন মধুর রূপ দেখিতে পাইত। তাই এখন দুপুর বেলায় পুতুল খেলায় আর তার মন বসিত না। সে সময় সে সকল মোহ কাটাইয়া, সকলের চোখ এড়াইয়া সেই জনহীন পূজা-গৃহে দেবতার সম্মুখে আসিয়া তরুণ তপস্বিনীটির মত দাঁড়াইত। রাজা কিশলয়ের মত সেই বনমালীর কচিমুখের নীরব হাসিটুকুর পানে চাহিয়া তার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিত, তবু তার দেখিবার সাধ মিটিত না। সে তার সসকল সুন্দর চোখ দুটিতে নয়ন-জলের অঞ্জলি সাজাইয়া রাখিত। যেন তার সমুদয় অন্তঃকরণ বলিতেছে—এসো দেব, এসো এসো, শূন্য হৃদয়-মান্দরে এই যে আমি মেহের ফুল-চন্দন গইয়া তোমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছি! মধুর নুপুর-শিঞ্জে ব্যথিত বন-বীথির দুই পাশে ফুলের দাঁপালী সাজাইয়া দিয়া এসো, এসো হে হৃদয়-রঞ্জন, হৃদয়ে এসো! তোমার চরণ-রেণুর পরশ পাইয়া আমার বক্ষ-নীড়ের অশ্রুট মাতৃ-মেহটুকু সৌন্দর্যে মগ্নিত হইয়া যেন আমার নারী-জীবন ধন্য করিয়া দেয়। সে দেবতার সহিত সৌদামিনীর অশ্রুর না জানি কেমন একটা আশ্চর্য্য সম্পর্ক ছিল। পূজাগৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিবার সময় প্রত্যহই যেন সে তার হৃদয়ের পাত্রটি অশ্রুজলে পূর্ণ করিয়া গইয়া ফিরিয়া আসিত। তার পর কয়েকদিন ধরিয়া গাছের আড়ালে, ঘরের কোণে, রাত্রির অন্ধকারে সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিত। এমন করিয়া কিছুদিন কাটিলে পর তার হৃদয়ের বেদনার উপর আবার আশাব রঙীন আলো ঠিকরাইয়া পড়িত। তুমারামাত-ধ্বংস শুষ্ক বৃক্ষশাখাটি বসন্তের প্রথম স্পর্শেই যেরূপ সবুজ হইয়া উঠে, তারপর পত্র-পল্লবে সাজিয়া উঠে, তারপর ফুলে ফলে ভরিয়া যায়, তেমনি একটু একটু করিয়া আশার আলোকে সৌদামিনীর সারা বুক ভরিয়া উঠিত। সে যেন কান পাতিয়া শুনিতে পাইত, যে গানের সুরে চাঁদ হাসে, ফুল ফোটে যমুনার নীল জল উজান বহিয়া যায়, সেই গানে তার অশ্রুনায়ে ফোটা হৃদয়-পদ্মটি ধীরে ধীরে ফুটিয়া

উঠিতেছে। সে চোখ মেলিয়া—চোখ বুজিয়া, দেখিতে পাইত সেই ভক্ত-বৎসল অমিয়মুরতি, সেই আঁধার সজল দৃষ্টি, সেই স্বর্কপ্রসূতিত ফুলটির মত মুখের হাসি হাসি আভাস—সে মুখ দেখিয়া সৌদামিনীর জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত অন্তরের ক্ষুধা চোখের পলকে পরিতৃপ্ত হইত, সমুদয় হৃদয় হুঁইয়া পড়িত। সৌদামিনী আবার মুষ্কার মত পূজার ঘরে প্রবেশ করিয়া ফুলের ভিতরে নিমজ্জিত তার হৃদয়দেবতাটিকে বাহির করিয়া তার উচ্ছ্বসিত বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিত। যখন দেবতার আরক্ত সুন্দর মুখে তার অধর দুটি যোজনা করিয়া একটি মেহ-চূষনে তার অংগের সমুদয় মাতৃ-মেহ উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিত, তখন মেহাবেশে তার রক্ত নয়ন পল্লব দুটি আপনি মুদিয়া আসিত। চোখ মুদিতেই সে দেখিতে পাইত সেই নন্দছাল বনমালী স্বর্গলোক পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া তার হৃদয়ের মাঝে নন্দন-সুখমা ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

সৌদামিনীর ক্রীণ তনু-লতাটিকে নব যৌবনের অশ্রুট লাবণ্যে মগ্নিত করিয়া বঙ্গভূমি পার হইয়া গেল। এখনো তার বেতের কাঁপিটার ভিতরে মেছুনী, পঙ্কিত, নষ্টকী, বনমাতৃ প্রভৃতি পুতুলগুলি সকলে মিলিয়া সংসার করিতেছে।

কিস্ত কৈ? সে পূজা-ঘরের নন্দছাল বনমালীর মত তেমনি আর একটি জীবন্ত পুতুল কৈ—যার ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়! তেমনি পদ্ম-পলাশ চক্ষু, তেমনি অর্দ্ধবিকশিত ফুলটির মত হাসি হাসি মুখ। যে মুখের উপর মাতৃমেহ নিঃশব্দ ফুলের মত আপনি ঝরিয়া পড়ে।

এখন তার পুতুল-খেলার বয়স গিয়াছে বটে কিন্তু পুতুল পাওয়ার সাধটুকু সম্পূর্ণ মিটে নাই। তাই এখন প্রাণভরা সচেতন পুতুলের মত শিশুগুলিকে দেখিতে পাইলে সৌদামিনীর হৃদয় কোমল মেহরসে আর্দ্র হইয়া উঠিত। এ তরুণতা

আধুনিক-কাহিনী ১০২১

ঘেরা সুন্দর জগতের পথেঘাটে শিশু, গৃহে গৃহে, উজানে প্রান্তরে শিশু, কোলে কাখে, ছায়ায় রৌদ্রে শিশু ! বিধাতা যেন পৃথিবীর বুক ভরিয়া কতই না রহস্যের বীজ বপন করিয়া রাখিয়াছেন, সেই বীজ হইতে কালে কালে ঝাকে ঝাকে, লাখে লাখে কত শিশুফুল ফুটিয়া উঠিতেছে ! এ বিচিত্র জগতে যেন চিরকাল ধরিয়া শিশুর মেলা বসিয়াছে । কারো লাল লাল টোপা টোপা গাল, কারো মোটাসোটা, গোলগাল হাত পা, কারো টলমল চোখ । কেউ মার কোলে বসিয়া আকাশের চাঁদ হুঁইতে উঠিতেছে । কেউ মুখের ভিতর নিজের আঙ্গুল চালাইয়া দিয়া দেবভোগ্য অমৃতের আশ্বাদন করিতেছে, কেউ বা স্মৃতিস্তম্ভ শয্যায় আরামে ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিয়া এক একবার হাসিয়া উঠিতেছে !

সৌদামিনীর শৈশব সঙ্গিনীদের মধ্যে যাদের আগে বিবাহ হইয়াছিল তাদের কেউ কেউ এমন একটি ছুটি করিয়া শিশুফুল পাইতে আরম্ভ করিয়াছে । সৌদামিনী কোথাও শিশু দেখিতে পাইলেই ছুটিয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হইত । কোনটিকে দোলা দিয়া খুঁদী করিত, কোনটিকে কোলে করিয়া চুম্বা খাইত, কোনটিকে বকের ভিতর পরম আগ্রহে চাপিয়া ধরিত । এমন করিয়া একটি সুন্দর শিশু-জগৎ সৌদামিনীর হৃদয়খানির উপর চারিদিক হইতে মোহজাল বিস্তার করিত । তাদের কোমল গুঞ্জে তার হৃদয়ের রেহরাশি উছলিয়া উঠিত । কিন্তু তবু তারা একটু চোখের আড়াল হইতেই তার হুঁই চক্ষে অশ্রুধারার বান আসিত !

এ জগতে শিশুর অভাব নাই সত্য কিন্তু সৌদামিনী তার মনের মত আর একটি স্বপ্নের শিশুর জন্য তার বুকভরা স্নেহের ভিতরে কেমন একটা বেদনা বোধ করিত । সেটি যে নিতান্ত তারি নিজস্ব জিনিস—হাসিতে হাসিতে স্নেহের তুফান তুলিয়া তার বকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে, তার বকের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া স্নেহ স্নিকোমল হৃদয় মাঝে প্রবেশ করিয়া আরামে চোখ

মুদ্রিয়া ঘুমাইয়া পড়িবে ! সেই নন্দজলাল বনমালীর মত পদ্মপলাশনয়ন, তেমনি ফুলের মত হাসিমাখা মুখ !

একদিন স্নিকোজল চক্ষালোকে সৌদামিনীর সহিত তার প্রফুল্লের চারি চোখের মিলন হইল । সৌদামিনী প্রফুল্লকে আর কখনো দেখে নাই, কিন্তু অপরিচিতকে দেখিয়া আজ তার মনে হইল প্রফুল্ল আর কারো নয়—যেন তার বহুকালের বহু ভ্রমজন্মান্তরের পরিচিত । প্রফুল্লের নীরব স্নেহময় দৃষ্টি-ধারা সৌদামিনীর হৃদয়ের ভিতরে স্বপ্নরাজ্য সৃজন করিল । প্রফুল্লের মুখ হাসি ও নব বিস্ময়মাখা মুখখানির উপর চাঁদের আলো চলিয়া পড়িয়াছে । সৌদামিনী তার হৃদয়-তটে সুদূর বনজলীর অশ্রুট মধুর মর্ষর-ধ্বনি শুনিতে পাইল । প্রফুল্লের মুখ দেখিয়া সৌদামিনীর মনে হইল যেন প্রফুল্লের মুখের নীচে হাসিটুকু বসন্তের আকুল সৌরভ ও সৌন্দর্য্যে মাখা । ঐ ভাসা চোখে শৈশবের স্বপ্ন-জড়িত পদ্মপলাশেলোচনের ইঙ্গিতটুকু অতি স্পষ্ট ।

প্রফুল্ল বাহিরের জগৎ হইতে আহরণ করিত, সৌদামিনী গৃহে সঞ্চয় করিত । কক্ষের বাহ্যিক বশতঃ প্রফুল্ল বৈশীকর্ণ সৌদামিনীর সহিত থাকিতে পারিত না । অনেকদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত প্রফুল্লকে ঘরে বসিয়াও কাজ করিতে হইত । সৌদামিনী তার হৃদয়খানি অতৃপ্তি ও আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ করিয়া দীপোজ্জ্বল গৃহে চূপ করিয়া বসিয়া থাকিত । গৃহের দাপটি উজ্জ্বল করিয়া দিয়া প্রেমের আলোকে চোখেছুটি ভরিয়া লইয়া সে কঠোর কন্ঠনিরত স্বামীর নিষ্ঠামণ্ডিত মুখখানার পানে অতৃপ্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সৌদামিনীর সমুদয় হৃদয় স্বপ্নরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিত । সে পরিষ্কার দেখিতে পাইত স্বামীর চোখে তার শৈশব-দেবতার সুন্দর চাহনিটুকু আর মুখে অশ্রুট ফুলের শোভার মত নীরব হাসির রেখা । স্বামীর ঐ চোখ, ঐ হাসি দেখিয়া সৌদামিনীর হৃদয় এখন ঐ রকম একটি ছোট

শিশু লাভ করিবার জগৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে দেখিতে হইবে ঠিক সেই নন্দদুলাল বনমালীর মত। তেমনি পদ্মপলাশ চক্ষু, তেমনি হাসিটুকু ফুলের মাধুরী মাথা। সে যখন শযায় শুইয়া থাকিত, তখন তার লীলায়িত বাহুল্যটির উপর একটি আতপ্ত কোমল শিশুর মস্তকের মুহূর্ণ্পর্শ অনুভব করিয়া শিহরিয়া উঠিত। সে মনশ্চক্ষে স্পষ্টই দেখিতে পাইত যেন তার বাম বাহুটির উপর মাথা রাখিয়া ঠিক নন্দদুলালের মত একটি ফুটুকুটে টুকটুকে ছেলে বিড়ানার উপর ঝলমল করিতেছে। সেই হাসি, সেই চোখ, —ছায়া-সুখমা-ধেরা কোমল মুখ থানার মাঝে সেই মৃদু গোলাপী আভাটুকু। তার আনন্দমাগা আশ আশ কথাগুলির মাধুরী যেন সৌদামিনীর হৃদয়ের মমতার সহিত জড়াইয়া বাটত। তার বহুকালের কোমল হৃদয় স্নিগ্ধ-শীতল করিয়া দিবার মত একখানা মমতাস্থেরা চাঁদমুখ—যাকে হৃদয়ের মাঝে পাইবার অতীত আশায় সৌদামিনীর শৈশবের স্বপ্নরাজ্য নব যৌবনের ফুলবন পর্যন্ত তার পিছু পিছু বুরিয়া মরিতেছে।

কিছুকাল পর ধীরে ধীরে সৌদামিনীর গতি মত্তর এবং সারা অঙ্গ আলস্তের জড়তায় ভরিয়া আসিল। মুক্লিত চুত লতার মত তার মুখ-শোভা অতাপ্ত পাণ্ডুর হইয়া উঠিল। সে এখন আকাশ-ঢাকা রঙীন মেঘে, চঞ্চল দক্ষিণ পবনে, সন্ধ্যার স্নিগ্ধ নক্ষত্রপুঞ্জে যেন কোন অপূর্ণ স্বপ্ন-জগতের সন্ধান পাইত। বিস্ফারিত চোখ দুটি তার নবীন আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। সে মুখ দেখিলে মনে হইত যেন সুদূর স্বর্গরাজ্য হইতে তার শৈশব-দেবতা নীল স্নিগ্ধ দৃষ্টি-ধারায় তার সমুদয় হৃদয় সিক্ত করিয়া সরস করিয়া দিয়াছেন। সে কোমল—পুষ্প-কোমল অঙ্গের অমিয় পরশ পাইয়া যেন সৌদামিনীর-মাতৃস্বের সকল সাধ চরিতার্থ হইয়া গেছে।

তারপর একদিন গভীর নিশীথে অসহ বেদনা

সৌদামিনীর সন্নিহিত মাতৃস্বের বিকাশ সূচনা করিল। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে অসহ বেদনার ভিতর দিয়া নারী যে পূর্ব, মহত্ব ও মাতৃত্ব-সফলতা প্রাপ্ত হয় সৌদামিনী বাসিত, পাণ্ডুর, আশাপূর্ণ ও উৎকণ্ঠিত যুগে সেইখানে আসিয়া পৌছিল। সৌদামিনী চোখ বুজিয়া ভাবিল। এইবার বুঝি আমার নন্দদুলাল বনমালী স্বর্গ হইতে কোলে নামিয়া আসিল। সে চোখ বুজিয়াও পরিষ্কার দেখিতে পাইল, সেই ফুলের মত হাসি, তেমনি পদ্মপলাশ নয়ন।

অনেকক্ষণ পরে সৌদামিনী যখন চোখ মেলিয়া চাহিল তখন ধাত্রী একটি শিশু আনিয়া সৌদামিনীর সপ্তখে ধরিল। সৌদামিনী দেখিল, কৈ এ ত তার আশৈশবের বাঞ্ছিত নন্দদুলালটির মত একটি প্রিয়দর্শন স্নকুমার শিশু নয়! এ যে এক রতি মেয়ে! চোখদুটি ছোট ছোট, মুখখানা ফ্যাকাসে, মুখে সে হাসির আভাস কোথায়? একটা শূণ্যবায়ু যেমন বনানীর পত্র-পল্লব ছিন্ন, লুপ্তিত, বিদীর্ণ করিয়া ছ ছ করিয়া বহিয়া যায়, সৌদামিনীর হৃদয় হইতে তেমনি একটা হাহাকার বৃকের অনেক কালের সঞ্চিত, পালিত, আশাগুলি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়া বহিয়া চলিয়া গেল।

স্মৃতিকাগু হইতে বাহির হইবার পর একদিন সৌদামিনী নিঝুম হৃপুর বেলায় দুর্বল মেয়েটিকে পুরু তোয়ালের ভিতরে জড়াইয়া আবার তাহার ছেলে বেলার বেতের ঝাঁপটি খুলিয়া বসিল। দেখিল ঝাঁপির ভিতরে মেছুনী, ভিক্ষুক, নর্তকী, বনমাতৃ প্রভৃতি হরেক রকমের পুতুলগুলি তেমনি ছেলেবেলার মত সখের সংসার পাতিয়া বসিয়া আছে! না জানি কি খেলার বশে একবার তার কোলের মেয়েটি বিরসবদন ভিক্ষুকের পাশে রাখিয়া কেমন দেখায় সে তা দেখিল। তারপর একটি নিখাস ফেলিয়া, তার কোলের মেয়েটিকে বৃকের ভিতর তুলিয়া বেতের ঝাঁপি বন্ধ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিল। তার আশৈশবের স্মৃতি

আখিন-কাঠিক ১০২১

আকাজ্জাটি যেন মিটিল না। সেই দুঃখটি ভুলিবার জন্তই যেন মেয়েটিকে সৌদামিনী আরো বেশী করিয়া ভালবাসিতে লাগিল।

আবার বসন্ত ফিরিয়া আসিল, আবার হৃদয়ের নিরাশার যেষে আশার রঙীন আলো মাখিয়া দিয়া অচির বসন্ত অতীতের দেশে চালিয়া গেল। প্রফুল্লের কন্মক্ষেত্র এখন বিস্তৃত। জীবনের অবসর বড়ই অল্প, চিন্তের প্রফুল্লতা যেন কন্মসাগরে জলাঞ্জলি দিয়া সে প্রচুর ধনের অধিকারী হইয়াছে। প্রচুর ধনের অধিকারী প্রফুল্লকে অর্থ উপার্জনের নেণা একেবারে পাইয়া বসিয়াছে। স্বামী যখন অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘরে বসিয়া একমনে কাজ করিতেন, তখন সৌদামিনী অনেকদিন ছায়ার আড়ালে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া একদৃষ্টে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া থাকিত। আসের মত সে প্রফুল্ল মুখশ্রী আর নাহি। মাথার চুলগুলি আর নবীন মেঘের কালরের মত সুন্দর নয়। চোখের নীল তারা আপসা। তবু হঠাৎ চকল দীপালোকে সৌদামিনী দেখিতে পাইত, প্রফুল্লের বিষম মুখের বিবর্ণতার মুখোশ ভেদ করিয়া মুখের কোলে সেই চর নবীন মোহমাখা তরুণ বয়সের পুরাতন গোলাপী আভাটুকু বিদ্যুৎ চকিতের মত ক্ষণিকের জ্ঞান প্রফুল্লের সবখানি মুখ একবার রঞ্জিত করিয়া দিয়া আবার সেই স্নান পাণ্ডুর মুখমণ্ডলের মাঝে কোথায় মিলাইয়া যাইত। আবার সৌদামিনীর স্বতি উজ্জল করিয়া সেই ক্ষণিকের দীপ্তিতে রঙীন যন্ত্রণালব্ধিত বন-মালীর তরুণমুষ্টি তার মুখ চোখের সমুখে ভাসিয়া উঠিত। সেই বনমালীর মতই একটি সুকুমার প্রিয়-দর্শন শিশু অঙ্কে ধারণ করিবার জন্ত আবার তার সমুদয় ব্যথিত মাতৃ-হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিত।

কয়েক বৎসর যাইতে না যাইতেই আবার প্রস্ফুটিত দোহদ চিহ্নগুলি সৌদামিনীর খাসর মাতৃহৃদয়ের গুহ্য সংবাদ সূচনা করিল। আবার একটি নব শিশু—বেটা-

ছেলে বটে। কিন্তু বিশ্রী কাহিল। তার শৈশবেব চিত্ত-রঞ্জন বনমালীর সহিত সাদৃশ্য এর কোথায়? নিরুৎসাহ হৃৎপ্রহরে সৌদামিনী বেতের কাঁপি খুলিয়া ছেলেটিকে নড়কীর পাশে রাখিয়া দিয়া দেখিবার সময় তার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

আশার রত্নস্বীপ যতই স্নান হইয়া আসিতে লাগিল সৌদামিনীর হৃদয়ের অন্ধকার ততই হৃৎসহ ঠেকিতে লাগিল। এখন যা কমলা প্রফুল্লের নিকট তাঁর ঐখ্য-ভাঙারের চাবি দিয়াছেন। কন্মের যজ্ঞশালা আরো বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, মন দুর্ভাবনায় ও চিন্তায় আরো অপ্রসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এখন সৌদামিনীর সহিত প্রফুল্লের বড় একটা আলাপের অবসরই ঘটিয়া উঠে না। তবু অনেকদিন আড়াল হইতে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া থাকিবার সময়, সেই কৈশোরের জ্যোৎস্না রাত্রির কথা সৌদামিনীর মনে পড়িত—মনে পড়িত। সেই হাসি। সেই চোখ মুখের সেই গোলাপের আভা।

আরো অনেক বছর কাটিয়া গিয়াছে। তবু আশার স্বর্ণরেখা এখনও সৌদামিনীর হৃদয় হইতে একেবারে মিশিয়া যায় নাই। সেই শৈশবের নন্দ-হলালের নীল হুঁচোখ। হাসিমুখ, আনন্দ-মুরতি স্বতির কুজ্জটিকা ভেদ করিয়া থাকিয়া থাকিয়া মধুর স্বপ্নের মত উঠিত। অবশেষে আবার সৌদামিনী মাতৃহৃদয়ের সম্ভাবনায় সুন্দর হইয়া উঠিল। এবার প্রসবের সময় সৌদামিনী কঠিন ব্যারামে পড়িল, বাঁচিবার আশা একেবারে ছিল না। অনেক দিন পরে সে যখন ক্রমশঃ শাশ্বত জাগিয়া উঠিল, তখন মনে হইল বুঝি নন্দ-হলাল। নীল চোখে হাসিমুখে তার শীর্ণ বাহুটির উপর মাথা রাখিয়া তার মুখের পানে চাহিয়া আছে। সৌদামিনী ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কোথাও কিছু নাই—কোড় শূণ্য পড়িয়া রহিয়াছে। মাতৃ-স্তনের পরিবর্তে শুষ্ক ব্যাথা তার সমুদয় হৃদয় ভারিয়া

রহিয়াছে! ধাত্রীকে ডাকিয়া সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল তার কি হইয়াছে? বুকের ভিতর এমন বাঞ্ছিতেছে কেন? তার সাধের নন্দহুলাল কোথায় গেল? ধাত্রী অঁচলে চোখ মুছিল, সৌদামিনীর প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিল না।

বহুবৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। সৌদামিনীর মেয়েটির অনেক দিন বিবাহ হইয়াছে। এখন নাতি নাতিনৌরা দ্বিদিমার মেহতুর্গ লুণ্ঠন করিতে ছাড়িত না। সৌদামিনীও তার স্তদয়ের তুর্গদ্বার বন্ধ করিয়া কোন রূপ আত্মরক্ষা করিত না! কিন্তু তবু তার শৈশবের স্বপ্ন আজো সফল হয় নাই। এরা কেউ তার নন্দ-হুলালের মত চোখ পায় নাই। তেমন ফুলের মত হাসি হাসি মুখ তো এদের কারো নয়!

আরো কিছুকাল পর সে তার ছেলেটিকেও বিবাহ দিয়া নববধূ ঘরে আনিল। সৌদামিনীর পুত্রবধূ বাস্তবিক সুন্দরী বটে! কিন্তু .স নবীন প্রেমের মাঝে নিমজ্জিত, তার রূপের গর্ভ রাধিবার স্থান ছিল না! সৌদামিনী অনেক দিন হইল নানা পীড়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া শুকাইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু পুত্রবধূ তার রূপ ও গৌরব লইয়া ব্যস্ত ছিল—অতীতকে আর তার দৃষ্টি ছিল না।

অবশেষে সৌদামিনী যখন শয্যাশায়ী হইয়া পড়িল, তার বিছানা হইতে উঠিবার শক্তি প্রায় লোপ হইয়া আসিল, এমন সময় একদিন সকালবেলা তার নিকট সংবাদ পৌঁছিল তার পুত্রবধূ একটি সুন্দর নবকুমার প্রসব করিয়াছে। আবার বহুদিনের পর যেন নন্দন হইতে নদী, প্রান্তর, পল্লত, কাঞ্চার প্রাবল্য করিয়া এক নবীন বিন্দু আলোক-পুঞ্জ সৌদামিনীর হৃদয়ে গিয়া স্পর্শ করিল। তার কানের ভিতর দিয়া শিশুর কুজন-গুজন, হাসিকারু মর্শের নিভৃত কুঞ্জে সুধাবৃষ্টি করিতে লাগিল। তার উজ্জ্বলিত হৃদয়কে সে আর ধামাইয়া রাখিতে পারে না। নবজাত কুমারটিকে এক-

বার নয়ন ভরিয়া দেখিবার উৎকর্ষায় তার বহুদিনের পুরানো বাধি যেন আজ হঠাৎ কোথায় নিকল্লেখ হইয়া গেল।

শীর্ণ কাম্পিত পদে সে আঙ্গিনা পার হইয়া পুত্রবধূর স্মৃতিকা ঘরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। যে মাতৃষ বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারিত না তার পক্ষে ইহা কম কথা নয়। কিন্তু কবি গাহিয়াছেন, আশা এমনি হুরারোহিনী! সেই চাঁদপানা মুখখানার পানে চাহিয়াই সৌদামিনী স্তম্ভুর বিষয়-জলধির মাঝে ডুবিয়া গেল। তার মনে হইল যেন এত কাল পরে নারী-জগের সকল অভুগু বাসনা আজ সফল হইল—এই তো সেই হাসি হাসি ফুলের মত মুখখানার উপর আনন্দ ও স্বাস্থ্যের গোলাপী আভা! যেন তারি শৈশবের স্বপ্নে রঞ্জিত হইয়া, হৃদয়ের আজন্মাক্ষিত মমতায় মধুর হইয়া, সেই নন্দহুলাল বনমালী আজ তার ঘরে আসিয়াছেন—যেন সেই শৈশবের স্বপ্নঘেরা নন্দহুলাল বনমালী—সেই পদ্ম-পলাশ নয়নে তেমন বিন্দু কোমল মধুর দৃষ্টি!

ব্যথিতা নারীর সমুদয় ক্ষুধিত চিত্ত একটি মেহ-চুষনের আকাজ্জা লইয়া তার তৃপ্ত অধর প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। তাড়াহাড়ি সে ঘুমের শিশুকে বিছানা হইতে তুলিয়া আপনার উজ্জ্বলিত বুকের উপর চাপিয়া ধরিল।

নিজোন্মিত শিশু তার পদ্মপলাশ নয়ন মেলিয়া নির্বাক, বিষয় ও আনন্দভরা চোখে সৌদামিনীর মেহ-সকরণ মুখখানার পানে চাহিয়া রহিল। সৌদামিনীর সমুদয় অঙ্গ পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

সেই স্বপ্নের মাঝে সহসা কার পদ-শব্দ শুনিয়া চকিতার প্রাণ চমকিয়া উঠিল। সে তাড়াহাড়ি পিছনে ফিরিয়া দেখে তার সুন্দরী পুত্রবধূ তার পানে এক দৃষ্টে তাকাইয়া আছে, তার সুন্দর দৃষ্টির উপর অভিমান বেন উছলিয়া পড়িতেছে—সে অভিমানের সঙ্গে একটু হিংসার ছিট মাখানো। তার ছেলেটি লইয়া সৌদামিনীর এত স্নেহ যেন তার সহ্য হইতেছিল না।

আশ্বিন-কাষ্ঠিক ১৩২১

বধু একটু নিষ্ঠুর পরিহাসের সহিত বলিল, “রক্ষা কর মা ! হুঁ বাপরে বাপ ! রক্ষা কর মা । মায়ের চাইতে যে বেশী ভালবাসে তারে দূর থেকে নমস্কার !”

একটা ভীষণ জলন্ত কামানের গোলা পড়িয়া সৌদামিনীর ক্রীর্ণ হৃদয়-দুর্গ একেবারে বিদীর্ণ হইয়া গেল । তার হৃদয়টা যেন গন্ধক ও বারুদের তীব্র ধূমে একেবারে কণ্ড পর্য্যন্ত ভরিয়া উঠিল ।

সৌদামিনী কিছু বলিল না । শুধু সে তার ইহকালের—চিরকালের বাঞ্ছিত, জীবন্ত, সুন্দর নন্দভূলাটিকে প্রাণপণ স্নেহে তার শুভ বক্ষের ভিতর চাপিয়া ধরিল । একটি চুষনের ছলে তার সমুদয় হৃদয় অশ্রুজলে গলাইয়া লইয়া পুষ্পপেলব অধর-পুটে ঢালিয়া দিল ।

সৌদামিনী এখন আর উঠান সমুদ্র পাড়ি দিয়া উঠিতে পারে না । আজ তার আশা পূর্ণ হইয়াছে কিন্তু হৃদয় চূর্ণ হইয়াছে । বক্ষস্থলে ব্যথার অকূল পাথর-বারি-রাশি ধু ধু করিতেছে । কূলে বাদ্য আশার তরলী আজ তরঙ্গবাত্তে ভাঙিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে ! তবু তাকে কোন মতে ধরে ফিরিয়া আসিতে হইল ।

ধরে ফিরিয়া আসিয়া সৌদামিনী আজ আবার অনেক দিন পরে তার শৈশবের স্মৃতিমাথা বেতের কাঁপটির ঢাকনি খুলিয়া দিল । চাহিয়া দেখিল সেই মেছুনী, ভিক্ষুক, ফুলবাবু, নর্তকী, বনমাতুল ! তারা সকলে মিলিয়া সেই সখের সংসারটি তেমনি জমাইয়া রাখিয়াছে ! সৌদামিনীর শৈশবে যেমন ছিল তেমনি—কাল যেন তাদের স্পর্শও করিতে পারে নাই ! সৌদামিনীর সবই শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পৃথিবীর যেন তাতে কিছুই ক্ষতি হয় নাই ! খেলা যেমন চলিতেছিল, ঠিক তেমনি চলিতেছে ।

ধীরে ধীরে বেতের কাঁপির ডালাটি বন্ধ করিয়া সৌদামিনী বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল । সে চক্ষু মুদিয়াও দেখিতে লাগিল সিন্ত অর্ধ প্রস্ফুটিত রক্ত কমলটির মত শিশুর সেট অশ্রুসিক্ত হাসি হাসি মুখখানি ।

সারাদিন সৌদামিনী বিছানা হইতে উঠিল না । সন্ধ্যার সময় নীরব গৃহ ধীরে ধীরে ধূসর তমসাম্বল হইয়া আসিল । কন্দরত সংসারের কলরব তখন ক্রীণ হইয়া আসিয়াছে ।

এমন সময় কানের কাছে চারিদিকের অন্ধকার সঙ্গীতময় করিয়া কে যেন অতি মধুর কণ্ঠে ডাকিল—  
“মা ! আমি জানি ব্যথা তোমার কোথায় ! তবে আমার হাত ধরে চলে এসো মা । যেখানে তোমার নন্দভূলাল বনমালী বাস করেন তোমার আমি সেখানে নিয়ে যাব ।”

সে বিচিত্র সঙ্গীতময় কণ্ঠের মধুর আশ্বাসে ভরা । সৌদামিনীর সারা অঙ্গ কটকিত হইয়া উঠিল । একবার গাঢ় অন্ধকারের ভিতরে তার দুই চক্ষু মেলিয়া দিয়া সৌদামিনী দেখিল কোনও ভুল হয় নাই—ঠিক সেই পদ্ম-পলাশ নয়নদুটি, ফুলের মত সহাস্য তরুণ মুখখানার উপর গোলাপের রক্তিম ছায়া !

তার সেই চির সাদের নন্দভূলাল বনমালী তাঁর লাবণ্য-পুঞ্জে গঠিত অভয় বাহুটি তার পানে মেলিয়া দিয়া স্নেহ-মাথা নয়নে তার দিকে চাহিয়া চাহিয়া, হাসিয়া হাসিয়া ডাকিতেছেন—মা, এসো ।

ত্রিপুরেশ চন্দ্র সিংহ শর্মা ।

## চাকুরিয়ালোকের দ্রুংখ

[ পুরাতন কাগজপত্র খাটিতে খাটিতে একদিন হঠাৎ একখানা জাণ তুলট কাগজে বক্ষ্যমান কবিতাটি পাইয়াছি। এই কবিতাটিতে চাকুরিয়া জীবনের দ্রুংখ-কাহিনী অতি সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। কবিতাটি কতদিনের রচনা বলা যায় না, তবে যে কাগজে ইহা লিখিত আছে উহার অপর পৃষ্ঠায় “ঐহরি” নামের নীচে “সন ১২৫৬” লেখা দেখিতে পাওয়া যায়। কবিতাটি হয়ত ইহার পূর্বের বা এই সময়েরই রচনা হইবে। তাহা হইলেও অন্ততঃ ৬৪ চৌষটি বৎসর পূর্বে সাধারণ চাকুরীজীবীগণ তাঁহাদের অবস্থাটুকি রকম মনে করিতেন তাহার একটি সুন্দর চিত্র এই কবিতায় পাওয়া যাইবে। কবির নাম “কবিচন্দ্র রায়” ইহা ছাড়া তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। ইহাতে লিপিকারের নাম নাই। এই কবিতার বর্ণাঙ্কিতগুলি যেমন আছে তেমনই রাখা হইল। কবিতাটি যে ভাবে লেখা হইয়াছে যেরূপ দাড়ি কমার পারিবাতে বিসর্গের ঞায় দুইটি পুটলি দ্বারা যাত চিহ্নাদি দেওয়া হইয়াছে তদ্রূপই দেওয়া গেল।

—শ্রীযোগেন্দ্র কিশোর রক্ষিত।]

শোন ২ সভাধন : করি এক নিবেদন :

চাকুরিয়া লোকের যত দ্রুংখ :

ছয় দিবশের কালে : বদখতা ভুলিয়া ভালে :

না লিখিলেক তাহাদের সুখ :

তাহার প্রমাণ শোন : বিস্তারিয়া কহি পুন :

জনম হল বিত্যাহিনের যয়ে :

সিযুকাল হতে লিখে : সেবাগত সিরিস্তা শিখে :

আহু বাথে উপকার করে :

অন্ত শাস্ত আছে ভত : তাহাতে হয় রাগ হত :

সদং চাকরি করে ধ্যান :।

যে জাহা মনেতে ভাবে : সে তাহা অবশ্য পাবে :

যুনি বাক্য পুরান প্রমান :

চারি নিজ দেশ বাড়ি : করে কত ওমেদোয়ারি :

নানা দেশে দেশে দিগন্তরে :

কোন কোন স্থানে জায় : গতমাত্র জগাব পায় :

বলে কার্য নাই এ সরকারে :

তাহা যুনে হয় গুণাব : যুখেতে ন স্বরে রব :

কত দ্রুংখ ভাবে মনে মনে :

সেবা পাণ্ডা প্রমাদ : সেবক হইতে সাদ :

তাহা না ঘটয়ে কোন খানে :

দ্রুংখী হয়ে উঠে যায় : পুন অগ্র দ্বারে যায় :

আরোহিয়া আশা মনোরথে :

কোন কালে কোন জোগে : অদৃষ্ট ফলের ভোগে :

কাষ পাইলে স্বর্গ পায় হাতে :

মনিব সন্তোষ তরে : সতং বিনয় করে :

বচন উদগারে যেন মধু :

পর পুরুষের যেন : হরিয়া লইতে মন :

সদা ভাবে তোশে কুলবধু :

সদা সচকিত থাকে : জগাব করে এক ডাকে :

করে কার্য হকুমাম্বারৈ :

হকুমাম্বার হয় খাড়া : কুকুর হতে দৌরে তার :

মনিবের কায সাধিবারে :

যেখানে আদেশ পায় : সেখানে চলিয়া জায় :

কাল-কাল কিছু না বিচারে :

কিবা দিবা সন্ধ্যা : রোজ রুই আদি করি :

কিবা ঘোরতর অন্দকারে :

কখন বা সত্য কয় : কতু মিথ্যা কথা কয় :

পাপ পুণ্য (পুণ্য) কিছু না বিচারে :

সন্দা পুজা না করি : খেইয়ে জল তারাতারি :

সদা খারা থাকেন দরবারে :

যদি প্রভুর আজ্ঞা হয় : যুজনে কটু কয় :

হৃদয়ে না ভাবে কোন বেথা :



আখিন কাণ্ডিক ১৩২১

যেমন সিফাই লোক : কিঞ্চীৎ না করে শোক :  
 চক্ৰমে কাটঘে বাপের মাথা :  
 চাকুরিয়া লোকের রিতি : জত স্ব বিপরিত :  
 বিষয় হইলে ধরে ভুতে :  
 নাহি লাজ ভয় তিক : এমন সময় ধিক :  
 বাপের নিকাশ করে যুতে :  
 বিদেশেতে জনম কাটে : বারি জাওয়া নাহি ঘটে :  
 না দেখে আপন যুতদারা :  
 দৈবে যদি কোন দিনে : বাড়ি ঘর পড়ে মনে :  
 তবে ভাবে কে কোন আকার :  
 অহুমান বুঝি হেন : ফাটকে আটক জেন :  
 বন্দি আর থাকে বাড়ি মাষ :  
 তেমতি চাকুরিয়া লোকে : সদা কাল বন্দি থাকে :  
 বলে রাজ কাজ অনুকাষ :  
 সদেশে চাকুরিয়া জারা : কিছু মুখ করে তারা :  
 বাড়ি জায় দুই তিন মাসে :  
 দেখি-দারা-মুত-মুখ : দুরে জায় সব দুঃখ :  
 যাকিক করার পুন আইশে :  
 যারা অতি সয়িকটে : তারা অতি ভাল বটে :  
 নিত্য খেইতে যুতে বাড়ি জায় :  
 গতমাত্র সর্ককাজ : তৈয়ার পুজার শায় :  
 নিত্য ২ রান্না ভাত খায় :  
 ছরদেশী প্রবাশি : সকল দোশের দুশী :  
 সকল হতে বেশী দুখ পায় :  
 বারমাশ থাকে পরো : পাম হৈয়ে জায় মৈজে :  
 তত্রচ বিদায় নহে পায় :  
 কেহ করে অভিমান : পুন বিদায় নাহি চান :  
 কেহ কহে অগ্নের দ্বারায় :  
 কেহ বা কাহেল হৈয়া : বিস্তর প্রকারে কৈয়া :  
 নৌকাযোগে দেশে চলি জায় :  
 বাড়ি গেলে রোগী দেখি : পিতামাতা হয় দুখী :  
 রমানির হরিশে বিশাদ :

সেবা করে নিন্দাভয় : মনে ২ কত কয় :  
 এ বালাই বিষম প্রমাদ :  
 মুখ হলে পরবাস : পৈরে থাকে বার মাস :  
 কাহিল হইলে আইসে বাড়ি :  
 যুখের প্রসঙ্গ কিবা : দুখে ভাবি রাত্র দিবা  
 পতি বর্তমানে জেন রাড়ী :  
 পুত্রকন্ঠা হবে ছাই : আসলেতে দেখা নাই  
 ফুগাইছে বিবাহের দায় :  
 মনাগুন কেবা জানে : কারে কব কেবা যুনে  
 মনাগুনে মন জলে জায় :  
 বরঞ্চ কান্দাল যারা : কিবা পশু পক্ষিপারা :  
 জদি নিজ পতি থাকে শাতে :  
 বিধাতা তোমাকে কই : আর জদি নারী হই :  
 না পরি যেন চাকুরিয়ার হাতে :  
 ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জত : ব্যবহার শাস্ত্র মত :  
 শাস্ত্র ছারা নাহি কোন কাম :  
 এই এক দোশের দোসি : সেই গুণ রাশি রাশী :  
 তাহাদের উদ্দেশে প্রণাম :  
 ছর দেশে নাহি জান : জদি নিমন্ত্রন পান :  
 তবে জান নিকটা নিকটে :  
 দৈবে যদি জান ছরে : মাশ মধ্যে পুনঃ ফিরে  
 ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভাল বটে :  
 পষ্ট হয়ে কৈতে নারে : মনে মনে চিন্তা করে  
 ভার হৈয়ে অধমুখে রয় :  
 কিবা নিশী দিসি কালে : খামিরে বিরলে পেলে :  
 কত কথা বুঝাইয়া কয় :  
 এবার সারিলে প্রভু : বিদেশে না জাইয় কভু :  
 সেবা দেশে কিবা নিধি পাও :  
 জাতায়্যাতে পথে ঘাটে : কবে কি প্রমাদ ঘটে :  
 কি কারণে আমরা জালাও :  
 এদেশেতে রাজা আছে : আপনি তাহার কাছে :  
 গতমাত্র দিবেন বিষয় :

অল্প লভ্য হৈলে দেশে : তাহাতে জুরিয়া আইশে :  
 বিদেশের সর্থী কিছু নয় :  
 জা জুরিবা তাই খাইবে : মাসে মাসে দেখা পাবে :  
 রাখ প্রভু আমার মন্ত্রনা :  
 তখাচ না যুনে স্বামি : পুন হুরদেশে গাম :  
 হৈয়া ভোলে যতেক মন্ত্রনা :  
 কশানেরা হাল বায় : খুদা হৈলে বাড়ি যায় :  
 রমণি জোগায় অর্থজল :  
 স্ততে বৈসে সন্ধে খায় : কত বা আনন্দ পায় :  
 ভুলে যায় শে দুঃখ সকল :  
 ধিবরে ধরে জে মিন : জলে থাকে শারাদিন :  
 শন্দাকালে নিজ গ্রহে জায় :  
 দেখী দারাবুত মুখ : হুরে জায় সব দুখ :  
 মুখভোগে রজনী গোয়ায় :  
 আর দেখে জোলা তাত : সারা রাইত জেইলে বাত :  
 গৃহে বশি সদা তাত বোনে :  
 না'হ জানে পরবাশ : ঘরে থাকে বাড়ি মাশ :  
 যুতদারা সদা দেখে যুনে :  
 এমত প্রমাদ জত : বিস্তারিয়া কব কত :  
 কবিতা অনেক বেড়ে জায় :  
 পরিজনগন লাগি : এসকল মুখভোগী :  
 কহিলেক কবি চন্দ্র রায় :  
 ইতি—

## আলোচনা

বর্তমান সনের আষাঢ় সংখ্যা প্রতিভায় আমার সংগৃহীত ভাটিয়াল গান সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র কুমার কর মহাশয় রুত আলোচনা পাঠ করিয়া বড়ই সুখী হইলেন।

গত বৈশাখ মাসের প্রতিভায় প্রকাশিত একটি ভাটিয়াল গানে “সানাল” শব্দটি আছে। উক্ত শব্দের

আলোচনা করিতে গিয়া হরেন্দ্র বাবু “সানাল ফকির” সম্বন্ধে যে তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন তজ্জগৎ আমি তাহার নিকট কৃতজ্ঞ। ঐ শব্দের “ঈশ্বর” অর্থ আমি নিজে করি নাই, বাহার নিকট গানটি সংগ্রহ করিয়াছি সেই মাঝিই এই অর্থ করিয়াছে।

হরেন্দ্র বাবু এক ধারগায় লিখিয়াছেন যে, আমি নিজে দুইটি গান একএ করিয়া একটি গান করিয়াছি এবং অর্থ সামঞ্জস্য রাখা করবার জন্ত উহার একটি পংক্তিতে “চোর” স্থলে “চোট” লিখিয়াছি। ইহা হরেন্দ্র বাবুর কল্পনা—আমি গানের একটি শব্দও নিজে বদলাই নাই, বে মাঝি আমাকে গান দিয়াছে তাহার মুখে যেরূপ শুনিয়াছি ঠিক সেইরূপই লিখিয়াছি। আমার শুনিতেও ভুল নাই, কারণ “চোট” শব্দটি আমি বার বার প্রজ্ঞাসা করিয়া লিখিয়াছি। স্মরণ “চোট” শব্দ রাখিয়া গানের যেরূপ অর্থ আমার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে তাহাই প্রকাশ করিয়াছি। তবে আমার রুত অর্থই যে, সকলেই অমুমোদন করিবেন ইহা আমি কখনও মনে করিতে পারি না। দুইটি গান ঘোড়া দেওয়ার অপরাধও (জানি না এ অপরাধ সত্য কি না) আমার নহে। এই সব বিষয়ে কবিতা মাঝিটিও নির্দোষ হইতে পারে; কারণ মুখে মুখে প্রচারিত হওয়ার সময় এই সকল গানের পাঠে কাহাছারা কত রকম পরিবর্তন হয় কে বলিতে পারে? আমার নিবেদন এই যে আমি নিজে কোন গানের পরিবর্তন করি না, কারণ ওরূপ করা আমি অজ্ঞান মনে করি।

শ্রীযোগেন্দ্র কিশোর রক্ষিত।

## বাল্মীকি সাহিত্যে দৃশ্যকাব্য\*

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

স্বপ্নবিলাসের পরবর্তী গ্রন্থ দিব্যোন্মাদে রুক্ষকমলের কবিত্ব-স্রোত অব্যাহত আছে কিং এই দিব্যোন্মাদ গ্রন্থও পূর্ববর্তী স্বপ্নবিলাসের মত ঘটনা অথবা কল্পনা বৈচিত্র্যমান। স্বপ্নবিলাসে যেই সমস্ত ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে দিব্যোন্মাদেও সেই সমস্তের কথাই আবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলা হইয়াছে। গল্পাংশটি প্রায় একই রকমের। সেই স্বপ্ন দেখিয়া যশোদার রুক্ষের জন্ম হুঃখ, সেই রাধার বিরহের বর্ণনা এবং অবশেষে রুক্ষের সহিত মিলনে গ্রন্থের সমাপ্তি। বাস্তবিক স্বপ্নবিলাসের সাফল্যে ঠিক তাহারই অনুকরণে আর একখানি গ্রন্থ রচনা দেখিয়া কবির নাটকীয় প্রাতিভা যে শৈশবাবস্থা অতিক্রম করিতে পারে নাই তাহা বেশ বুঝা যায়। গল্পে বৈচিত্র্য অবতারণা করিবার ইচ্ছা এবং বোধ হয় ক্ষমতাও রুক্ষকমলে ছিল না। তাহার ছিল একখানা অক্ষয় বৈষ্ণব হৃদয়, একখানা বিধাদরাগিনীপূর্ণ বাঁণ। তিনি শত যুগে তাহা দ্বারা সেই অনন্ত প্রেম বিরহের কাহিনীই গাহিয়া গিয়াছেন। তাহাতেই তাহার কবিত্বের চরম আভিযুক্তি, তাহাতেই তাহার রচনার শ্রেষ্ঠ সার্থকতা। দিব্যোন্মাদে স্বপ্নবিলাসের হস্তজনক অনুকরণ দেখিয়া কবিকে বটতলায় বসাইয়া দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু স্বপ্নবিলাসেই যেই বিষয় গাহিয়া গাহিয়া নিঃশেষিত করিয়াছেন, একটু বিশ্রামান্তে সেই বিষয়েই আবার এত নূতন সুর লাগাইতে দেখিয়া এত নূতন কথা কহিতে দেখিয়া অবাক হইয়া বাইতে হয়। অন্তর্নিহিত সলিলের চাপে যেমন পার্শ্বতা উৎস

নব নব ধারায় উচ্ছ্বসিয়া উঠিতে থাকে, বিরহিনী রাধার অনন্ত হুঃখ-কাহিনীও রুক্ষকমলের কবিত্ব-উৎসকে ভেদনি অশেষ ধারায় রহিয়া রহিয়া উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিয়াছে। রাধাক্ষের বৈকুণ্ঠের খাতায় কেদার বৈকুণ্ঠকে বলিতেছে—“আপনার এই আশ্রমটিতে এলে..... মনে হয় যেন কেবল এক বোড়া জংপিণ্ডের উপরে এক-খানি মুণ্ড নিয়ে বসে আছি।” কিন্তু শুধু এক বোড়া জংপিণ্ডের সঙ্গে একটি মুণ্ডের সংযোগ রুক্ষকমলের কাব্যবালিতে যেমন দেখা যায় অজ কোথাও এমন নহে। শুধু একটি অনন্ত বেদনাবাহী হৃদয় অনন্ত বিরহগীতি গাহিয়া চলিয়াছে, হস্তপদাদি অনাবশ্যক প্রত্যঙ্গের উৎপাত অনুপস্থিত।

পূর্বেই বলিয়াছি দিব্যোন্মাদের গল্পাংশে আর স্বপ্নবিলাসের গল্পাংশে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। প্রথম দৃশ্যে যশোদা শ্রীরুক্ষকে স্বপ্নে দেখিয়া সখীগণের নিকট বিলাপ করিতেছেন, সখীগণ তাহাকে প্রবোধ দিতেছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে শ্রীদাম সুবল ইত্যাদি রাখালগণ রুক্ষবিরহে তাহাদের হুঃখ-কাহিনী কহিতে কহিতে ব্রজ পথ দিয়া চলিয়াছে। তৃতীয় দৃশ্যে শ্রীরাধা বিষন্ন বদনে উপবিষ্ট, সখীগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া রুক্ষস্মৃতির চর্চা করিতেছে। একজন সাধ প্রস্তাব করিল যে, গ্রাম যে এভাবে তাহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। একবার কুঞ্জে কুঞ্জে তাহার খোঁজ করিয়া দেখা উচিত। বিরহিনী রাধার কথাটি মনে লাগিল, সে গ্রাম অবশেষে বাহির হইল, সখীগণ তাঁহার পাছে পাছে চলিল। চতুর্থ দৃশ্যে রাধা কাননে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। মনের আবেগে সে অতি ক্রম পথ অতিক্রম করিতেছে—সখীগণ তাঁহার সহিত হাটিয়া পারিতেছে না। সখীগণ তাই রাধাকে একটু ধীরে চলিতে অনুরোধ করিয়া বলিল রাস্তার কটক ভুলঙ্গ ইত্যাদি আছে, একটু ধীরে চলাই উচিত। আর ক্রম চলিলেই কি রুক্ষ পাওয়া যাইবে? রাধা তাহার

উত্তরে দীর্ঘকাল সাধনাধারা করিলে সে ভুজঙ্গবন্ধ করিল, কিন্তু কিছুকাল পরেই ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণ রাধিকার নিকট যে দাসখণ্ড দিয়াছিলেন তাহা চাহিয়া লইল। অভিপ্রায়, কৃষ্ণ অমনি না আসিলে দাসখণ্ড দেখাইয়া আপন জোরে কৃষ্ণকে বাধিয়া নিয়া আসিবে। রাধিকা চক্ষাকে সাবধান করিয়া দিলেন যে কৃষ্ণকে যেন বেশী অগ্রিয় কথা বলা না হয়। সপ্তম দৃশ্বে চক্ষা মথুরার রাজপথ দিয়া চলিয়াছে। মথুরার নাগরিকাগণ কলসী-কক্ষে জল আনিতে চলিয়াছে। চক্ষার রূপ দেখিয়া তাহার বলাবলি করিতে লাগিল। চক্ষা বলিল যে রাজ-দর্শনে বাইবে। নাগরিকাগণ তাহাকে বলিল যে সিংহ দ্বারে শত শত গ্রহরী পাছারা, সন্মুখ দ্বার দিয়া সে বাইতে পারিবে না। পেছন দ্বারা দিয়া অনেক দাস দাসী যাতায়াত করে তাহাদের সঙ্গে ঢুকিয়া পড়িলে অনায়াসে তাহার রাজ-দর্শন হইতে পারে। অষ্টম দৃশ্বে চক্ষা মথুরা-রাজ-বাটির অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে। একটি মণিপৰ্য্যায়বৃত্ত কক্ষে কৃষ্ণ প্রবেশ করিলেন। চক্ষা মৈথিল্যে থাকিয়া জয় রাধে শ্রীরাধে উচ্চারণ করিয়া উঠিল। সহসা অনেক দিন পরে রাধার নাম শুনিয়া কৃষ্ণের পূৰ্ণস্বভাব জাগরিত হইয়া উঠিল। তিনি নানা বিলাপ করিয়া অবসর ভাবে পর্যাঙ্কে উপবেশন করিলেন। চক্ষা বুঝিল যে কৃষ্ণ রাধাকে ভুলে নাই তখন সে কৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হইল। কৃষ্ণ প্রথম চক্ষাকে চিনিতেই পারিলেন না এবং চক্ষা সেই সুযোগে কৃষ্ণকে মিঠে কড়া বেশ হুকথা শুনাইয়া দিল। অবশেষে চিনা পরিচয় হইয়া গেলে চক্ষা কৃষ্ণ-বিরহে বৃন্দাবনের কি অবস্থা হইয়াছে তাহার বর্ণনা করিতে লাগিল। কৃষ্ণ অবিলম্বে বৃন্দাবনে বাইবেন প্রতিজ্ঞা করিলে চক্ষা বিদায় গ্রহণ করিল। ৯ম দৃশ্বে রাধা কৃষ্ণের নিকুঞ্জ কাননে মিলনে নাটক শেষ হইয়াছে।

করিল, কিন্তু কিছুকাল পরেই ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণ রাধিকার নিকট যে দাসখণ্ড দিয়াছিলেন তাহা চাহিয়া লইল। অভিপ্রায়, কৃষ্ণ অমনি না আসিলে দাসখণ্ড দেখাইয়া আপন জোরে কৃষ্ণকে বাধিয়া নিয়া আসিবে। রাধিকা চক্ষাকে সাবধান করিয়া দিলেন যে কৃষ্ণকে যেন বেশী অগ্রিয় কথা বলা না হয়। সপ্তম দৃশ্বে চক্ষা মথুরার রাজপথ দিয়া চলিয়াছে। মথুরার নাগরিকাগণ কলসী-কক্ষে জল আনিতে চলিয়াছে। চক্ষার রূপ দেখিয়া তাহার বলাবলি করিতে লাগিল। চক্ষা বলিল যে রাজ-দর্শনে বাইবে। নাগরিকাগণ তাহাকে বলিল যে সিংহ দ্বারে শত শত গ্রহরী পাছারা, সন্মুখ দ্বার দিয়া সে বাইতে পারিবে না। পেছন দ্বারা দিয়া অনেক দাস দাসী যাতায়াত করে তাহাদের সঙ্গে ঢুকিয়া পড়িলে অনায়াসে তাহার রাজ-দর্শন হইতে পারে। অষ্টম দৃশ্বে চক্ষা মথুরা-রাজ-বাটির অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে। একটি মণিপৰ্য্যায়বৃত্ত কক্ষে কৃষ্ণ প্রবেশ করিলেন। চক্ষা মৈথিল্যে থাকিয়া জয় রাধে শ্রীরাধে উচ্চারণ করিয়া উঠিল। সহসা অনেক দিন পরে রাধার নাম শুনিয়া কৃষ্ণের পূৰ্ণস্বভাব জাগরিত হইয়া উঠিল। তিনি নানা বিলাপ করিয়া অবসর ভাবে পর্যাঙ্কে উপবেশন করিলেন। চক্ষা বুঝিল যে কৃষ্ণ রাধাকে ভুলে নাই তখন সে কৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হইল। কৃষ্ণ প্রথম চক্ষাকে চিনিতেই পারিলেন না এবং চক্ষা সেই সুযোগে কৃষ্ণকে মিঠে কড়া বেশ হুকথা শুনাইয়া দিল। অবশেষে চিনা পরিচয় হইয়া গেলে চক্ষা কৃষ্ণ-বিরহে বৃন্দাবনের কি অবস্থা হইয়াছে তাহার বর্ণনা করিতে লাগিল। কৃষ্ণ অবিলম্বে বৃন্দাবনে বাইবেন প্রতিজ্ঞা করিলে চক্ষা বিদায় গ্রহণ করিল। ৯ম দৃশ্বে রাধা কৃষ্ণের নিকুঞ্জ কাননে মিলনে নাটক শেষ হইয়াছে।

দিব্যোদ্ভাস নামে রাধিকার প্রেমোদ্ভাসের বর্ণনা  
কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা নবদীপের  
চৈতন্যের সেই প্রেমিক পাগলের প্রেম উন্মত্ততার  
আদর্শ একখানি মধুর চিত্র। দিব্যোদ্ভাসের  
গৌরচন্দ্রে তাহার পরিচয় আছে।

আখিন-কাস্তিক ১০২১

যথা—

ভিন ভাব মনে করি স্বাদিতে নিজ মাধুরী  
রাধার স্বরূপ ধরি নবদীপে অবতরি.

নিজ ভাব পরিহারি নাম ধরি গৌরহরি,  
হরির বিরহে হরি কাদে ব'লে হরি হরি।

“হুটি চক্রে” ধারা বহে অনিবার দুঃখে বলে বার বার,

স্বরূপ দেখাবে একবার নতুবা প্রাণে মরি।

কণে গৌরাটাদ হয়ে দিব্যোন্মাদ

উদ্যোপন ভাবে ভেবে কালাটাদ

ধরতে যায় করে দৈন্ত ॥

চৈতন্যের আশ্চর্যজনক প্রেম ভক্তির আদর্শ না  
পাইলে কৃষ্ণকমল তাহার প্রেমবিহ্বল রাধিকার চিত্র  
অঙ্কিত করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ।

নাটকের প্রারম্ভে প্রস্তাবনায় জানান হইয়াছে যে, যে  
অবধি নন্দ গোবিন্দকে মধুপুরে রাখিয়া আসিল সে অবধি  
ব্রজধামের দুঃখের আর সীমা পরিসীমা নাই। যশোদা  
কীর-নব-নীতহস্তে বসিয়া থাকেন আর “গোপাল”  
“গোপাল” বসিয়া উচ্চস্বরে ডাকিতে আরম্ভ করেন।  
অবিরত নয়নের জলে বক্ষ ভাসিয়া যায়। একদিন স্বপ্নে  
কৃষ্ণকে দেখিয়া জাগিয়া আর তাহাকে পাইলেন না।  
তখন তাহার শোক-সাগর উথলিয়া উঠিল।

প্রথম দৃশ্যে যশোদা সখীগণের নিকট তাহার দুঃখ  
কাহিনী বলিতেছেন। স্বপ্নবিলাসেও  
স্বপ্নবিলাসের তিনি স্বপ্ন দেখিয়া উঠিয়া নন্দকে  
সহিত তুলনা নিজের দুঃখ কাহিনী বলিয়াছিলেন।  
কাজেই দিব্যোন্মাদের এই প্রথম  
দৃশ্যে নূতনত্ব বিশেষ কিছুই নাই। কৃষ্ণকমলের অঙ্গপ্রাঙ্গণ-  
শ্রিয়তা প্রথম লাইন হইতেই দেখা দিয়াছে।

ভররে দারুণ বিধি, তোমার এ দারুণ বিধি

বিধি হয়ে অবিধি করিলি,

কেন দস্তাগছারী হলি।

ত্রিভুবনে যার নাহি প্রতিনিধি

রূপা করি দিলি হেন নিধি

দিয়ে দুঃখ নিরবধি দুঃখিনীয়ে বধি

কি বাদ সাধি নিধি হরে নিলি।

এইখানে ‘ধ’ এর অঙ্গপ্রাঙ্গণ মোটেই কর্ণকটু হয় নাই।  
তবু আধুনিক রুচিকে গাছারভেই এই অঙ্গপ্রাঙ্গণ একটু  
পীড়া দেয়।

স্বপ্নবিলাসের প্রথম দৃশ্যেই দুঃখিনী যশোদাকে কৃষ্ণ-  
বিরহ-ক্লিষ্ট রাখাল গণ আসিয়া সাশ্বনা দিয়াছিল। এখানে  
দ্বিতীয় দৃশ্যে রাখাল গণকে উপস্থিত করান হইয়াছে—  
বস্তুবা একই। সুবল কৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখিয়াছে, সেই বিবরণ  
রাখালগণকে বলিতেছে—রাখালগণ কৃষ্ণ-বিরহে নিজ  
নিজ হৃদয়-বেদনা বর্ণনা করিতেছে।

তৃতীয় দৃশ্যের পূর্বে একটু ভূমিকা আছে। একদিন  
প্রভাতে উঠিয়া রাধা বিষম বদনে বসিয়া আছেন,  
সখিগণ কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সখিগণ ও রাধিকার  
কথোপকথনই তৃতীয় দৃশ্য। সখিগণের জিজ্ঞাসায়  
রাধিকার দুঃখ-সাগর উঘেলিত হইয়া উঠিয়াছে। বিরহ-  
বর্ণনায় কৃষ্ণকমলের তুলনা নাই। রাধা ও কৃষ্ণ ভারত-  
বর্ষে সর্ব যুগে প্রেমিক-প্রেমিকা গণের প্রতিনিধি।  
অনন্ত জন-প্রবাহের অসংখ্য স্ত্রী-পুরুষের অভাবনীয়  
বৈচিত্র্যময় প্রেম-বিরহ হইতে তিল তিল মধু লইয়া ভারতের  
এই দুইটি কমনীয় লীলোত্তম ও তিলোত্তম যুগ যুগ  
ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এমন ক্ষেত্রে যত্ন বাধিয়া তান  
ধরিবা মাত্র তাহাতে নূতন রাগিণী ধ্বনিত করিয়া  
তোলার ক্ষমতা বীণাপাণির বিশেষ অনুরোধের দান।  
তৃতীয় দৃশ্যে রাধার দুঃখ-কাহিনীর বর্ণনা আরম্ভ হইবা-  
মাত্র আগর জমিয়া গেল—যে সকল শ্রোতা উঠিবার  
উদ্যোগ করিয়াছিলেন তাহারা আবার ঠিক হইয়া  
বসিলেন।

চতুর্থ দৃশ্যে শ্রাম অন্বেষণ করিতে রাধা কাননে  
প্রবেশ করিয়াছেন—মনের আবেগে দ্রুত চলিয়াছেন,  
সখিগণ কণ্টক ভূজঙ্গের ভয় দেখাইতেছেন। কিন্তু

প্রেমোন্মাদিনীর কি কণ্টক ভুজ্জের ভয় আছে! তিনি প্রেম-সাধনায় যে সমস্ত জয় করিয়াছেন। প্রবল বাতায় পতিত তরলীর আরোহী যেমন প্রথম তরঙ্গাভি-  
ষাতেই বিপদের পরিমাণ বুঝিয়া দৃঢ় হইয়া উঠিয়া বসে, যেমনি প্রেম-প্রবাহে ভাসমান জীবন-তরলীতে আসিয়া প্রথম অমুরাগের তরঙ্গ আঘাত করিল তখনই রাধা বুঝিতে পারিল যে জীবনের মহা সাধনা—  
জননের মহা সার্থকতা তাহার আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। তিনি প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। রাধা বলিতেছেন—

যখন নব অমুরাগে, জন্মে লাগিল দাগে  
বিচারিলাম আগে, পাছের কাজে।

( যা যা করতে হবে গো, আমার বঁধুর লাগি, )  
প্রেম করে রাধালের সনে ফিরতে হবে বনে বনে

ভুজ্জ-কণ্টক-পঙ্ক মাঝে  
( সখি আমার যেতে যে হবে গো,  
রাই বলে বাজিলে বাণী )—

অঙ্গনে ঢালিয়ে জল করিয়ে অতি পিছল  
চলাচল তাহাতে করিতেম।  
( সখি আমার চলতে যে হবে গো  
বঁধুর লাগি পিছল পথে )  
হইলে আঁধার রাতি পথমাঝে কাঁটা পাতি  
গতাগতি করিয়ে শিখিতেম  
( সদা আমার ফিরতে যে হবে গো  
কণ্টক কানন মাঝে )

এলে বিব বৈভগণে বসিয়ে নির্জন বনে  
তন্ত্রমন্ত্র শিখেছিলাম কত  
( কত যতন করে গো—ভুজ্জ দমন লাগি )  
বঁধুর লাগি কৈলেম যত, এক মুখে ক'ব কত,  
হতবিধি সব কৈল হত।

পক্ষ্ম ঘুস্তে রাধা কদম্ব-কাননে প্রবেশ করিয়া-  
ছেন—যেই কদম্বমূলে কান্ন বসিয়া বেণুর তানে ব্রজ  
পাগল করিতেন তাহা দেখিয়া রাধার কত পূর্ব কথাই

মনে পড়িতেছে! কদম্ব-মূলে বাণী সময়ে অসময়ে  
বাজিয়া উঠিত আর তড়িৎ প্রবাহে তড়িৎ শলাকার  
মত বৃন্দাবনের তরুণী হৃদয় সমূহ চঞ্চল হইয়া উঠিত।  
তাহারা পথ বিপথ না জানিয়া মুরলীধ্বনি লক্ষ্য করিয়া  
ছুটিত। এই কাননেই একদিন এমন একটি আনন্দ-  
ময় ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহার স্মৃতি রাধার নিকট  
রূপণের সঞ্চিত ধনের ন্যায় প্রিয় হইয়া রহিয়াছে।  
চম্পকবরণী রাধার ধ্যানে তন্ময় কক্ষ একদিন চম্পকফুল  
দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া “কোথা রাধা” বলিয়া অচেতন্ত  
হইয়া এই কাননেই পড়িয়াছিলেন। সুবল শ্রীদাম  
ইত্যাদি সঙ্গীগণ যখন প্রাণপণ যত্ন করিয়াও তাহার  
চৈতন্ত্য সম্পাদন করিতে পারিল না তখন তাহার  
গোপনে যাইয়া গৃহকর্তারতা রাধিকাকে সংবাদ দিল।  
প্রিয়তম তাহারই নাম লইয়া বুদ্ধিত হইয়াছেন  
ভুনিয়া রাধা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কি করা যায়,  
না যাইলেই যে নয়। তখন—

আপন ভূষণ দিয়ে সুবলকে রাই সাজাইয়ে  
এলাম আমি সুবল সাজিয়ে।  
( ধরাচূড়া পরে গো সুবলের,  
বৎস কোলে লয়ে গো কাঁচলি ঢেকে )  
দেখে নীলগিরি ধূলায় পড়ে অগ্নি তুলে নিলেন ধূলা বেড়ে  
রাখিলেম শ্যাম হিয়ার উপরি  
( কত যতন করে গো )

আমার পরশে চেতন পেয়ে বলে আমার মুখ চেয়ে  
কোথায় আমার পরাণ কিশোরী  
( সুবল বল্ বল্ রে, কেঁদে কেঁদে বলে )  
বল্ লেম—আমিই তোমার সেই দাসী  
( নাথ আমায় বুঝি চিন নাই হে )  
অমনি হৃদয়ে ধরিল হাসি  
( বঁধু কতই বা সুখে )

এই সুখ-কাহনী বলিতে বলিতে রাধার নয়ন যে  
অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতেছে তাহা আমরা অনায়াসে

আবিন-কার্তিক ১৩২১

অহমান করিয়া নিতে পারি—কারণ বাহার্য্য শুনিতে-  
ছেন তাহাদেরও নয়ন শুক থাকে না। বসন্তঃ যেখানে  
কৃষ্ণকমলের প্রতিভার প্রকৃত উদ্দীপনা হইয়াছে সেখানে  
সমালোচনা সজ্জিত হইয়া যায়, লেখনী অবশ হইয়া  
আইসে, অপূর্ণ আনন্দরসে হৃদয় কুলে কুলে পুরিয়া  
উঠিয়া আলোচককে কৃতার্থ করিয়া দেয়।

যত দৃশ্যে নিকুঞ্জকাননে রাধা তখনও অতীত যুগ্মবর্ণে  
বিচরণ করিতেছেন। নিকৃত নিকুঞ্জে শ্রামের স্বাভাবিক  
বিজ্ঞাপিত শত চিহ্নাদি দেখিয়া ক্ষুব্ধ সিন্ধুর মত রাধার  
হৃদয় ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। তিনি, যেখানে শ্রাম  
মোহন ভাঙতে চরণ ফেলিয়া বসিতেন সেই স্থান  
সাধুগণকে দেখাইয়া দিতেছেন। তখন কি গৌরবের  
দিন! ছল, শ্রাম-সোহাগে সোহাগিনী রাই তখন গগনে  
আপনাকে সকলের চেয়ে সুখী মনে করিত। কুণ্ড-  
ভবনে বাসিয়া শ্রাম প্রিয়তমারে সঙ্গে বসাইতেন গজ-  
দণ্ডের চক্রণী দিয়া রাধার চুল আঁচড়াইয়া দিতেন  
কত আদরে বেণী বানাইয়া কবরী বাঁধিয়া তাহাতে  
মালতীর মালা জড়াইয়া দিতেন এবং অবশেষে সেই  
বিধুবদনের দিকে ভ্রময় হইয়া চাহিয়া থাকিতেন—অবি-  
রত নয়ন জলে গগনস্থল ভাসিয়া বাহিত! সেই গৌর-  
বের—সেই তীব্র অনুভূতির দিন চলিয়া গিয়াছে—  
রাহিয়াছে কেবল স্বাভাবিক লোহ-বস্ত্রের মত তীব্র  
পেষণে হৃদয়-রক্ত বলকে বলকে অগ্ররূপে নয়ন দিয়া  
বাহির করে।

পরবর্তী অংশের বর্ণনাও সুন্দর। সহসা সারসের  
ধ্বনি শুনিয়া রাধার ভ্রম হইল যে কৃষ্ণের বাঁশী বুকি  
আবার বাজিতেছে। ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া গমনোন্মুখ  
হইয়া সম্মুখে কৃষ্ণমুখ দেখিয়া রাধার কৃষ্ণভ্রম হইল—  
তাহার পরেই সেই বিখ্যাত গান।

কি ভাবিয়ে যেন দাড়িয়ে ওখানে, এসেছে

একবার নিকুঞ্জ কাননে কর পদার্পণ।

গানটি কৃষ্ণকমলের সঙ্গীতাবলির মধ্যে একটি প্রেষ্ঠ

রচনা, ভাবে ভাবার অপূর্ণ। রাধার আর্জ হৃদয়ের  
বাধা ইহার ছত্রে ছত্রে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

যেব বীরে ধীরে চলিয়া গেল—রাধা বিহ্বল হইয়া  
তাঁহাকে কত কথাই বলিল—যেব থাকিল না। রাধা  
বৃদ্ধিত হইয়া পড়িল। কৃষ্ণকমলের কবিশ্বের চরণ  
অভিব্যক্তিও এই কালে শেষ হইল। তাহার পরে  
সখিগণের মুচ্ছা, চন্দ্রাবলীর আগমন, রাধিকার চৈতন্ত-  
সঞ্চার, চন্দ্রাবলীর কৃষ্ণ আনিতে যথুরার গমন—রাধা-  
কৃষ্ণের মিলন ইত্যাদিতে কৃষ্ণকমলের অসাধারণ  
প্রতিভার পরিচয় বড় বেশী নাই।

যুগ্মবিলাস ও দিব্যোন্মাদ কৃষ্ণকমলের প্রেষ্ঠ রচনা।  
তাহার নিজের ভাষায় তিনি “নিজ তুবা ঘুচাইতে”  
কৃষ্ণলীলা আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে শুধু  
ভাষারই যে তুচ্ছা ঘুচিয়াছে তাহা নহে, তিনি তাহার  
এই দুই গ্রন্থে যে ভক্তি-অমৃত সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া  
দিয়াছেন তাহা শত শত তাপিত হৃদয়ের তাপ ঘুচাইয়াছে  
এবং ভক্তি-নত-হৃদয় বঙ্গবাসী চিরদিন এই দুই পাত্র  
হইতে—“আনন্দে করিবে পান সুখা নিরবধি।”

কৃষ্ণকমলের শেষ রচনা বিচিত্রবিলাস তাঁহার  
লেখনীর উপযুক্ত হয় নাই। এই  
বিচিত্রবিলাস গ্রন্থখানাতে গীতের ভাব হইতে  
নাটকীয় ভাবের প্রাধান্য দেখা যায়।

কিন্তু কৃষ্ণকমলের নাটকীয় প্রতিভা বিশেষ ছিল না,  
আর গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়ও রাধাকৃষ্ণের বিলাস ও  
মিলন—তাই গ্রন্থ কোথাও আঁট বাঁধে নাই। কেবল  
চতুর্থ দৃশ্যে যেখানে প্রসাধনরতা রাধা বেণুর ধ্বনি  
শুনিয়া ব্যাকুল হইয়া প্রসাধন অসমাপ্ত রাখিয়াই আত্ম-  
খালু ভাবে দৌড়িয়া ভ্রামকে দেখিবার জন্য ছাদে  
বাইয়া উঠিয়াছেন এবং অর্জ বৃদ্ধিতার ভ্রায় ললিতার  
কক্ষে ভ্রম করিয়া ভ্রামকে দেখিতে চেষ্টা করিতেছেন  
কিন্তু অবিরত নেত্রজলে কিছুই দেখিতে পারিতেছেন  
না আর সখিগণ তাঁহাকে শাসাইতেছে—

ভোরে নিয়ে যোদের হল একি বিষম দার।

না দেখিলে মরবি, দেখলেও এমন করবি,

তবে কিসে জীবন ধরবি, না দেখি উপায়।

সেইখানে প্রেম-পাগলিনী রাধার মূর্তি পনকে  
আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করিয়া নেয়। এর পরে বিচিত্র-  
বিলাসে উল্লেখযোগ্য আর কিছুই নাই।

কৃষ্ণকমলের দ্বারা পুষ্টকৃত দৃশ্যকাব্যের স্রোত নানা  
নব নব রূপে পরিবর্তিত হইয়া অবশেষ গীতাভিনয় নাম  
ধারণ করিয়া এখন বিরাজ করিতেছে। আমরা পরে  
তাহার ক্রম বিকাশ আলোচনা করিব।

কৃষ্ণকমল যখন উন্মাদিনী রাধিকার বিরহ-গাথা  
গাহিয়া পূর্ববঙ্গ মাতাইয়া তুলিয়া-  
বাক্সা দৃশ্যকাব্যে ছিলেন তাহার কিছু পূর্ব হইতেই  
সংস্কৃত নাটকের কলিকাতার নাটকের জন্মচক  
প্রভাব। আবহাওয়া বহিতেছিল, এবং  
“কলিরাজার স্বাত্রা নাটক” “বিষ্ণু-  
সুন্দর নাটক” ইত্যাদি দুই একটি হৃদয়ঙ্গমী ফুল কচিৎ  
প্রস্ফুটিত হইয়া করিয়া পড়িতেছিল। এমন সময় নাটকে  
রামনারায়ণ সংস্কৃত নাটকের আসর ভাঙ্গিয়া  
নামাবলিতে সংস্কৃতের পুষ্পসার মাখাইয়া কুলীনকুল-  
সর্বস্বহাতে আসিয়া বাক্সাল, দৃশ্যকাব্যের রঙ্গক্ষে-  
ত্রাড়াইলেন। বাক্সাল সাহিত্যে দৃশ্যকাব্যের মধ্যযুগ বা  
দ্বিতীয় যুগের আরম্ভ হইল।

ত্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালা।

## শঙ্কট-তরাণীর ব্রত

ত্রিপুরাভেলার শঙ্কট-তরাণীর ব্রত প্রচলিত আছে।  
কোনও শঙ্কট হইতে উদ্ধার হওয়ার জন্য বঙ্গগৃহের  
কুললক্ষ্মীগণ এই ব্রত মানস করিয়া থাকে। এবং  
শঙ্কট উত্তীর্ণ হইলেই এই ব্রতের অন্ত্যস্তান করে।

তিনজন, পাঁচজন কি দশজন ত্রিভিনী মিলিয়া  
বৃহস্পতিবারে কিংবা রবিবারে শঙ্কট-তরাণীর ব্রত  
করিয়া থাকে। হুপুর বেলায় উন্মুক্ত জমানে পুরোহিত  
শঙ্কট তরাণী মেরীর পূজা করিয়া থাকেন\*। এই  
ব্রতের প্রধান উপকরণ খোলা পিঠা ১। এক এক  
ত্রিভিনীর জন্য তিনটি করিয়া খোলা পিঠা একটি কলার  
ডিগ-পাতে সাজাইয়া দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করা  
হয়†। এবং পূজার অন্তে ত্রিভিনীগণ সেই দিন মাত্র  
পিঠা খাইয়া কাটাইয়া দেয়।

ব্রতের কথা।

( ১ )

এক ধনী সওদাগর। তার সন্তান হয় না। পরে  
শঙ্কটতরাণীর ব্রত করিয়া সওদাগরের স্ত্রী একটি মেয়ে  
প্রসব করিল। মেয়ে হওয়ার পরই সওদাগর বাণিজ্যে  
গেল। বাণিজ্যে গেলে বার বৎসর আর দেশে ফিরতে নাই।  
এই বার বৎসর মেয়ে আবিয়াতা (১) রহিল। সওদাগর  
বার বৎসর পরে দেশে আসিল। মা মেয়েকে বলিল,  
“তুই কার (অ) (২) উঠা থাক, অতবড় মাইয়া  
আবিয়াতা দেখলে রাগ্ অইব।” মেয়ে তাহাই  
করিল।

\* ভূজৈষ্ঠ দশার্ভিযুক্তাং লোচন ত্রিতরাধিতাং।

বালার্কমণ্ডলোপেতাং বরপদগদাধরাং।

ত্রিশূলভষকচাপ-বড়ল-চন্দ্র-বিভূষিতাং॥

১ জল ছাড়া সিদ্ধ চাউল আঠা আঠা করিয়া বাটিয়া  
ভরলভাবে জলের সহিত মিশাইয়া মিটি না দিয়া বাটির  
ইাড়িতে রমণীগণ এক প্রকার পিঠা প্রস্তুত করে।  
অন্ত নাম চিঠৈ পিঠা।

† যে কলাপাত এখনও সম্পূর্ণরূপে বহির্গত হইয়া  
বিস্তৃত হয় নাই।

(১) অবিবাহিতা।

(২) চালের নীচে জিনিষপত্র রাখার জন্য বাঁশের  
বা তক্তার পাটাতন।



সওদাগর খেতে বলিয়াছে, মিট মিট করিয়া প্রদীপ জলিতেছে। সওদাগরের সঙ্গে সওদাগর-পত্নী কেবল কথাই বলিতেছে, আলোটি প্রায় নিব নিব হইয়াছে। তখন খেয়েটি 'কার' হইতে এক টুকরা লাকড়ি দিয়া প্রদীপের শালিভাটি (৩) বাড়াইয়া দিল। সওদাগর মাত্র মেয়ের হাতটি দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, পত্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কে?" প্রথমটা পত্নী চাপিয়া গেল। সওদাগরের মনে নানা সন্দেহ হইল, সওদাগর রাগিয়া উঠিল। সওদাগরের রাগ দেখিয়া পত্নী অবশেষে সকল কথা খুলিয়া বলিল। কতটিও 'কার' হইতে নামিয়া আসিল।

সওদাগর এত বড় মেয়ে দেখিয়া বলিল, "কি আমার মাইয়া অত বড় অইয়া রইছে! কা'ল সকালে প্রথম বার মুখ দেখি তার কাছেই এই মাইয়া বিয়া দিই।" এই অস্বাভাবিক প্রতিজ্ঞা শুনিয়া সওদাগর-পত্নী ও সওদাগর-কন্যা উভয়েই অগ্নয়ের সহিত শব্দটতরাণীকে ডাকিতে লাগিল। এই বার বৎসর কিন্তু শব্দটতরাণীর কথা তাহারও মনে ছিল না। বিপদে পড়িয়া সমস্ত দেবভক্তি আজ জীবন্ত ও সজাগ হইয়া উঠিল। দুইজনই প্রাণের সমস্ত একাগ্রতা দিয়া দেবীকে ডাকিতে লাগিল ও তাঁহার ব্রত করিল।

আর এক দেশের এক সওদাগর পুত্র হরিণ শিকারে এই সওদাগরের দেশে আসিয়াছিল। হঠাৎ ঝড়ুটি আরম্ভ হওয়ার সওদাগর-পুত্র সমস্ত লোকজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ও দিশাহারা হইয়া মাত্র দুইজন লোক সঙ্গে রাতে সওদাগরের বাড়ীতে আসিয়া পড়িল। তাহার বৈঠকখানার আসিয়া ডাকা ডাকি হাঁকাহাঁকি করিতে লাগিল। গোলমাল শুনিয়া সওদাগর-পত্নী একজন দাসী পাঠাইয়া দিলেন। দাসী সকল কথা শুনিয়া আসিয়া সওদাগরের স্ত্রী-লিঙ্গট বলিল।

সওদাগর-পত্নী শুনিয়া ভোর না হইতেই সওদাগর-পুত্র নিজদেশে চলিয়া যাইবেন, তখন তিনি দাসীকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন ইহাতে তাহাদের আপত্তি নাই কিন্তু তিনি যত সকালেই যান অবশ্য বাড়ীর কর্তার সঙ্গে একবার দেখা করিয়া যাইবেন।

তখনও ভোর হয় নাই। কাকগুলি তখনও ডাকিতে আরম্ভ করে নাই, মাত্র বিবিধ পক্ষীর মধুর কলরব গ্রামান্তের বৃক্ষ-কুঞ্জ হইতে আকাশে ভাসিয়া আসিয়া শূণ্ডময়-নারীর ঘুম ভাঙ্গিয়া দিতেছে। সওদাগর-পুত্র আসিয়া বাড়ীর কর্তা সওদাগরকে ডাকিতে লাগিল। বাহিরে আসিয়া প্রথমেই কর্তা এক সওদাগর-পুত্রের মুখ দেখিলেন। তখন সওদাগর তাহাকে বলিলেন, "ভূমি এখন যাইতে পারিবে না, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।"

সকাল হইল। সওদাগর হাত মুখ ধুইয়া বৈঠক-খানায় আসিয়া বসিলেন এবং সওদাগর-পুত্রকে ডাকিয়া আদিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞার কথা বলিলেন। সওদাগর-পুত্র ত শুনিয়া অবাক্। যাহা হউক তাহাকে বাধ্য হইয়া সেই দিনই সওদাগরের কন্যাকে বিবাহ করিতে হইল। প্রথম প্রথম আগন্তুক একটু আপত্তি করিয়াছিল কিন্তু তাহার আপত্তি শুনে কে? সওদাগর-পুত্র বলিয়াছিল "আমার ত মা-বাপ আছে তাহাদের অনুমতি ছাড়া ও তাহাদিগকে না জানাইয়া আমি কিরূপে বিবাহ করি?" কিন্তু কতকটা সকলের অনুরোধে ও কতকটা কন্যার সৌন্দর্য্যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও পরে বিবাহ করিতে সম্মত হইল।

আজ রবিবার। বাসর শয্যা। বিপদ কাটিয়া গিয়াছে তাই আর শব্দটতরাণীর কথা কারও মনে নাই। আজ তাঁহার ব্রত হয় নাই। তখন দেবী শব্দটতরাণী ধীরে ধীরে শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া মেয়েটির দুই পাশে, বেশ করিয়া দুটি চপেটাঘাত করিলেন এবং ব্রত করে নাই বলিয়া গালাগালি দিতে লাগিলেন।

কন্যা তখনই শয্যা হইতে উঠিল। কলার মাথায়

“নিচুনি পিচুনী”র (১) গুঁড়ি লইয়া তিনটি ছোট পিঠা করিল। পিঠা তিনটি প্রদীপের শীর্ষে (২) সেকিয়া লইল। এবং দূরীর আগার জল দিয়া দেবীর পূজা করিল। এসমস্ত জিনিষ বাসর ঘরে বিবাহের কুলায়ই ছিল সুতরাং ব্রত করিতে মেয়েটির কোনই কষ্ট হইল না।

সওদাগর-পুত্র যাত্রা শুইয়াছিল, তখনও ঘুমায় নাই। সে এই সব কাণ্ড দেখিয়া বিস্মিত হইল। পরে কত্তাকে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি এই সব কি করলা?” প্রশ্ন শুনিয়া কত্তা স্তম্ভিত হইল, কি রূপে সে বরের সঙ্গে কথা বলিবে! আবার শঙ্কট-তরাণীকে ডাকিতে লাগিল, দেবী আদেশ করিলেন, “কোন লজ্জা নাই তুই সকল কথা ক’।” দেবীর আদেশ পাইয়া বরকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। সওদাগর-পুত্র জিজ্ঞাসা করিল, “এই ব্রত কল্পে কি অয়?” কত্তা বলিল, “নির্ধৃত্যর ধন অয়, আপুত্রার পুত্র অয়, অন্ধলের চক্ষু অয়, আড়াইল (৩) ধন ঘর লয়, কাটা মাথা জোরা লয়।”

“আচ্ছা বুঝাচ্ছ” (৪) তুমি কেমন বর্ত্তের বর্ত্তিনী, আমি আইছি ঘোড়ার যদি যাইতে পারি নায় (৫)।”

কত্তা আবার একাগ্রচিত্তে শঙ্কটতরাণীকে ডাকিতে লাগিল। ভোর হইলে সওদাগর-পুত্র গিয়া কামার দোকানে বসিল। অমনি যুবল ধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল, ছুপুর পর্যন্ত অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইল। ‘পাক-সাক’ হইল পাত পিড়ী (৬) হইল, সকলের ডাক পড়িল জামাইর

(১) শুকনা ও আঠা আঠা করিয়া চাউল বাটিলে ইহাকে পিটালি বলে। সেই পিটালি দিয়া ছোট ছোট মোদকের মত করিয়া ইহাদের উপর বাঁশের সরু শলার তুলা লাগাইয়া বাসাইয়া দেয়।

(২) শিখা।

(৩) বাহা হারাইয়া গিয়াছে।

(৪) বুঝিবা।

(৫) নৌকায়।

(৬) খাওয়ার যায়গা।

ডাক পড়িল। কোথায়? জামাই বাড়ীতে নাই। তখন কত্তা দাসীকে বলিল, “কামার দোকানে খোঁজ কর।” দীর্ঘ হইতে একখান নৌকা তোলা হইল এবং এই নৌকায় জামাই কামার দোকান হইতে বাড়ী আসিল।

বর ও কত্তা নৌকা সাঝাইয়া বিবাহের প্রচুর যৌতুক লইয়া দেশে যাত্রা করিল। যাত্রা একজন দাসী কত্তার সঙ্গে গেল। সাতদিন সাত রাত্রি নৌকা বাহিয়া সওদাগর-পুত্র বাড়ীর নিকট একটা বড় নদীতে আসিয়া পড়িল। এই নদীর পাড়েই সওদাগর-পুত্রের বাড়ী। নদীতে পড়িয়াই সওদাগর-পুত্র দাসীকে বলিল, “দেখ সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া দিতে কও। এই নদীতে ডাকাই-তের ভয়।” তদনুসারে কত্তা গায়ের সমস্ত গহনাগুণ্ডি খুলিয়া দিল। সওদাগর-পুত্র অলঙ্কারগুলি ও বিবাহের সাড়ীটি একটা পানের বাটার আটকাইয়া নদীতে ফেলিয়া দিল। কত্তা এই বিপদে আবার শঙ্কটতরাণীকে মনে করিল, ও যাহাতে গহনাগুণ্ডি রক্ষা পায় তার জন্য দেবীর চরণে প্রাণের আকুল প্রার্থনা জানাইতে লাগিল।

কিছুকাল পরেই সওদাগরের পুত্রের নৌকা ঘাটে লাগিল। লোকে মেয়ে দেখিয়া কানাকানি করিতে লাগিল, “ওমা! এ কেমন মাইয়া! গায় একখানা গয়না নাই, পরণে একখান সাড়ী নাই! সওদাগরের পোলা এ কেমন মাইয়া বিয়া কৈরা আনল!”

বাড়ীর লোকেরা নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। সওদাগর-পুত্র কোনই উত্তর দিল না। তাহার সকলে যুথ ‘চাওয়া (১) চাওরি’ করিয়া বলিতে লাগিল, “এইটা কার মাইয়া না কার মাইয়া জানি পোলাটা (২) বিয়া কৈরা আনল!”

মেয়ের পাকস্পর্শ হইবে। বহু লোকজনের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। বাড়ীর কর্তা পুত্রে ভাল ফেলাইলেন একটা

(১) একে অন্তের যুথপানে ডাকান।

(২) ছেলেটা।

আদিম-কার্তিক ১০২১

পুঁটিও জালে উঠিল না। তিনি বড়ই চিন্তিত হইলেন। নুতন বৌ দাসীকে দিয়া খত্তরের নিকট বলিয়া পাঠাইল, “আপনি চিন্তা করবেন না আমরা যে বড় গাছ দিয়া আইছি হেই গাছে জাল ফালান বড় মাছ উঠবে।” সুবাদ পাইয়া বৌ মনে মনে শকটতরাণীকে “হাকারিতে” (১) লাগিল। সওদাগর অবিলম্বে নদীতে জাল ফেলিবার বন্দোবস্ত করিলেন। একটা প্রকাণ্ড বোয়াল মাছ উঠিল। সওদাগরের আর আনন্দ ধরে না। কিন্তু কি সর্বনাশ! মাছ বে কাটা যায় না! দা, কুড়ালি কিছুই মাছের গায়ে বসে না। নুতন বৌ বলিয়া পাঠাইল, “মাছটা পিছত্বারাে পাঠাইয়া দেন আমি কাটু।” মাছ আসিল বৌ বলিল, “একটা মশের টালাইয়া দাও। আমি মশেরের তলে মাছ কাটু।”

বৌর কথা মত মশারি খাটান হইল। বৌ শকট-তরাণী দেবীকে স্মরণ করিয়া মাছ কাটিতে গেল। মাছের গলা কাটা মাত্রই পেট হঠতে অলঙ্কার ও সাড়ীর পেটিকা বাহির হইয়া পড়িল। মাছ কাটা শেষ হইলে দাসী জল আনিয়া দিল। বৌ হাত-পা ধুইয়া অলঙ্কার ও সাড়ী পরিয়া মশারির মধ্য হইতে বাহিরে আসিল। এই ব্যাপার দেখিয়া সকলের মনেই একটা বিস্ময়ের ভাব জাগিয়া উঠিল।

বৌ অস্বস্তি করিল, কিন্তু এইসকল অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া নিমন্ত্রিত সকলেই হির করিল কেহই এই বৌর হাতের রাঁধা খাইবে না। যে এই অস্বাভাবিক কাণ্ড করিতে পারে সে মানুষ নয়, নিশ্চয়ই ভূত বা পিশাচ। ভূতের রাঁধা কে খাইবে? ফলে তাহাই হইল। সময় মত রান্না হইলে বাড়ীর কৰ্ত্তা সকলকে ডাকিলেন, নানা প্রতিবন্ধক দেখাইয়া কেহই আসিল না। কেহ বলিল, “আমার পেটের অনুৰা।” কেহ বলিল, “আমার অর।” কেহ বলিল “নিমন্ত্রণ খাইলে আমার লর না।”

এবার বৌ প্রাণেশ্বর সমস্ত ভক্তি ও সমস্ত একান্ততা একত্রে করিয়া আঁহুল ভাবে শকটতরাণী দেবীকে ডাকিতে লাগিল, “মা, আমার এই কলঙ্ক দূর কর।”

আর কি রক্ষা আছে। শকটতরাণী দেবী রাজ্রে সকলকে বিছানায় যাইয়া চরাইতে লাগিলেন ও নির্বংশ হওয়ার ভয় দেখাইলেন। সকলে তৎক্ষণাৎ খাইতে আসিল। কৰ্ত্তা বলিলেন, “ভাত তরকারি সমস্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে এখন আর ভাতলোককে খাওয়ান যায় না।” সকলে কিন্তু ক্ষেদ করিতে লাগিল, আমরা এখনই খাইব। নুতন বৌ পরিবেশন করিবে। ভাত-লোকের অমুরোধ এড়াইতে না পারিয়া কৰ্ত্তা বৌকে বলিলেন, “মা, তুমি বলিলে সকলকেই বসিতে বলি।” বৌ বলিল, “সকলকেই বসাইয়া দেন, চিন্তা করবেন না। ভাত তরকারি সমস্তই গরম আছে।” কি আশ্চর্য! সকলে খাইতে বসিয়া দেখিল সমস্ত জিনিসই গরম রহিয়াছে—যেন এখনই রান্না হইয়াছে। খাইয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইল, বলিল, “এমন রাঁধা আমরা জীবনে আর খাই নাই।”

(২)

নুতন বৌর একটি ছেলে হইয়াছে। সওদাগর একটা প্রকাণ্ড দীঘি কাটাইয়াছিল কিন্তু দীঘিতে জল উঠে না। পাড়ে পাড়ে ফল ফুলের সুন্দর বাগান, সুন্দর সুন্দর ঘাটলা কিন্তু দীঘির তল ধু ধু করিতেছে জল নাই। সওদাগর কিছুই হির করিতে পারে না। এক দিন পুত্রকে ডাকিয়া বলিল, “বাবা, আমার বংশে এ যে একটা তরকারি কুকীর্ণি রহিয়া গেল।” পুত্র বলিল, “আপনার বৌকে জিজ্ঞাসা করুন।” বৌ বলিল, “আপনি একদিন ছান কৈরা দীঘির পারে ‘হত্যা’ (১) দেন, যা শোনে আমারে কৈবেন।” খত্তর তাহাই করিল। সাত দিন পরে গঙ্গার আদেশ হইল, “তোরা নাতি কাটা দিলে দীঘি ত জল উঠবে।”

(১) মনে মনে অকাণ্ডতার সহিত ডাকা।

(১) দেবতার উদ্দেশে প্রায়োপবেশন; ধরা।

আদেশ শুনিয়া সওদাগরের প্রাণ শুকাইয়া গেল। যে আশাটুকু ছিল তাহাও শেষ হইল। বুদ্ধ খাওয়া দাওয়া পরিত্যাগ করিল, নিজাদেবীও বুদ্ধকে তাঁহার অঙ্গগ্রহ হইতে বঞ্চিত করিলেন। অনেক পিড়াপিড়িতে বুদ্ধ পুত্রের নিকট গঙ্গার আদেশ-বাণী বাজ করিল। বৌ কিন্তু কিছুই জানিল না।

দীঘি প্রতিষ্ঠা হইবে। দেশ বিদেশের পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। যে দীঘিতে এত কাল জল উঠে না কি সাহসে সওদাগর সেই দীঘির প্রতিষ্ঠা করিতে প্রস্তুত হইয়াছে! কি জানি একটা অলৌকিক কাণ্ড ঘটবে ইহা মনে করিয়া বহু লোক আসিল—নিমন্ত্রিত আসিল নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে—বাহাদুরের ঠেকা ছিল তাহারাও আসিল। আর বহু অনিমন্ত্রিতও আসিল—দেখিতে!

বৌ ত রান্নাঘরে রান্নার কাজে ব্যস্ত। বহুলোক খাইবে। ছেলের কথা বৌর আর মনে নাই। ছেলে গুরিয়া গুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রতিষ্ঠার দেবকার্য্য হইয়া গেল। সওদাগরের পুত্র সকলের অলঙ্ক্যে আপন ছেলেটিকে দীঘির মধ্যে লইয়া গিয়া কাটিয়া দিল। কাটা মাত্রই দীঘির তল হইতে হু হু শব্দে জল উঠিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে কানায় কানায় দীঘি ভরিয়া গেল। সকলে ধস্তা ধস্ত করিতে লাগিল। এত দিনে সওদাগরের কলঙ্ক গুচিল, পাপ ছুই হইল, পরকালের স্বর্গ-পথ সুগম হইল।

ছেলেটিকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মায়ের সন্দেহ হইল। ছেলের মা বলিল, “আমি নূতন দীঘিতে গিয়া গা ধুইবু। লোক জনের খাওয়া দাওয়া চুইকা গেছে গা ধুইয়া আমি একটু শুইয়া থাকবু।”

শুণ্ডর প্রথমে একটু অনভিমত প্রকাশ করিল—কত দেশের কঁত লোক আসিয়াছে—কোণের বৌ কেমন করিয়া বাহিরের দীঘিতে স্নান করিবে? পুত্র কিন্তু বাধা দিল না। ছেলের মা দীঘিতে নামিয়া স্নাতার দিয়া গিয়া হবের (১) বাঁশ ধরিল। বাঁশ ধরা মাত্রই শঙ্কটতরাণী

তাহার দুই গালে দুই চর দিয়া বলিল, “পোলা কাটা দিছে সকালে আমি এতখন্ কোন্ (অ) লইয়া বৈয়া রইছি—তোমার এতখনে পোলায় খোদ অইছে।” বলিয়া ছেলেটি মায়ের কোলে দিয়া দেবী অগ্রহিত হইলেন। ছেলে কোলে লইয়া যখন সওদাগর-বধু দাঁদির পাড়ে উঠিল তখন এক মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সওদাগর বাস্তে ভাঙে গৌকে ঘরে আনিলেন—নাতি ফিরিয়া পাইয়া সওদাগর বিশেষ আনন্দিত হইল। কলঙ্ক গুচিল, শোক গেল, বুদ্ধ ধীরে ধীরে যেন নূতন জীবন পাইতে লাগিল।

অনেক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে! বাগানেব গাছ-গুলি বড় হইয়াছে। অসংখ্য ফুলের গাছ, অসংখ্য ফলের গাছ—ভাজা, নবীন, সবুজ, সুন্দর! কিন্তু একটা গাছেও ফুল ফোটে না, ফল ধরে না। লোকে সওদাগরের নাম লয় না। যার গাছে ফল ধরে না তার নাম লইলে অমঙ্গল হয়। সওদাগরের আবার একটা নূতন হৃৎকের সূচনা হইল। কত কষ্টে, কত সাহস করিয়া এক কলঙ্ক দূর হইয়াছে! সে কথা মনে হইলে এখনও তার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠে—প্রাণের মধ্যে পিতৃহত্যার তরঙ্গ বহিয়া যায়!

সওদাগর আবার ‘হত্যা’ দিল। সাত দিন পরে আবার আদেশ হইল—“তোমার নাতি বাগান্ (অ) কাটা দেও বাগান ফলন্ত অইব।”

সওদাগর আবার দেশ বিদেশে নিমন্ত্রণ পাঠাইল। এবার পূরীপেক্ষা অনেক বেশী লোক হইল। সওদাগরের সমস্ত ব্যাপারই অলৌকিক! এবার না জানি আর একটা কি আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটে!

ব্যাপারের (১) দিন আসিল। বৌ রান্নাঘরে রান্নার ব্যস্ত। দীঘির পারে যজ্ঞ হইতেছে! দেবকার্য্য শেষ হইলে পর সওদাগর-পুত্র এবারও সকলের অলঙ্ক্যে আপন ছেলেটি আনিয়া বাগানে গাছের আড়ালে

আধুনিক-কাহিনী ১৯২১

কাটিয়া দিল। কাটিয়া দেওয়া মাত্র ফুলের গাছ ফুলে ফুলে ভরিয়া উঠিল—ফলের গাছ ফুলের ভাবে হুইয়া পড়িল। সময় গুণ গুণ করিতে লাগিল, পক্ষিকুল কল-বরে বৃক্ষকুল মুখর করিয়া তুলিল। গাছে গাছে, ফুলে ফুলে যেন একটা নূতন জীবনের সঙ্গার হইল। সৌন্দর্য্য-গৌরবে, রস সম্পদে, গন্ধ-সম্ভারে, চন্দ্র-প্রভে উজ্জ্বলভূমি সচেতন হইয়া উঠিল।

লোকজনের খাওয়া দাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। লোকের গল্পনাও অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে; তখন অবসর হইয়া ছেলের মা ছেলের খোঁজ করিতে লাগিল। কিন্তু ছেলেও কোথাও নাই। এদর ওদর, এবাড়ী সেগাড়ী, এপথ-ওপথ, গাছের খোপ, বাঁশের খোপ তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা হইল ছেলে মিলিল না। মায়ের মনে আবার সন্দেহ আসিল। এবার কাহাকেও না বলিয়া সওদাগরের পুত্র-বধূ ফুল বাগানে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া মাত্রই একটি সুন্দর গোলাপ কুঞ্জের ছায়া-শীতল অন্তরালে পুত্র-কোলে দেবীকে দেখিতে পাঠল। দেবী দুই গালে দুই চর দিয়া মায়ের কোলে ছেপে দিয়াইয়া দিয়া বলিলেন, “দুই বার দুই বার পোলা বাচাইলাম আর বাচাইয়ু না।”

মাতা দেবীর পারে পড়িয়া অশ্রুজলে মায়ের চরণ ছুটি ছুইয়া দিল। একটিও কথা বলিল না। দেবী আশীর্বাদ করিয়া অন্তহিত হইলেন। সওদাগর-পুত্র দেখিল শব্দ-তরাণীর বরে সত্য সত্যই “আপুণার পুত্র অগ্র আরাইল ধন ঘর লয়, কাটা মাথা জোরা লয়।” তখন হইতে শব্দ-তরাণী দেবীর প্রতি তাহার হৃদয়ের তাক্তি-শ্রোত অবাধবেগে ছুটিয়া বাহির হইল, এবং তখন হইতেই পৃথিবীতে শব্দ-তরাণীর ব্রতের প্রচার হইল।

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

## পুষ্প

পুষ্প নিঃস্বপ্নতার অপূর্ণ সৃষ্টি। এমন ননোমোহকর জিনিস কখনো অতি থলুই আছে। বিকট কুমুমের অমল সৌন্দর্য্যে, প্রাণ মাতান স্বপ্নকে মুগ্ধ না হয়, পৃথিবীতে এমন লোক নাই।

জানোয়ারের প্রথম যুগে, ফুলের বাঁধনতা ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, মানুষ ভগবানের ভাব সাগরে ডুবিয়া যায়। কিন্তু বহুমান সমাজ প্রায়সী বৈজ্ঞানিকগণ জ্ঞানেত্রে স্রষ্টার সৃষ্টি বৈচিত্র্য নিরীকণ করিয়া, নিগূঢ় সৃষ্টি রহস্য উদ্ভাটন করিতেছেন। কারণ ভিন্ন কার্যোৎপত্তি হয় না, এই চিন্তায় বৈজ্ঞানিকের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইল। তাই তাহারা ফুলের বর্ণ-বৈচিত্র্য, তন্মধ্যে মধুর স্বাবির্ভাব, ফুল ও ফলোৎপত্তির অবাবহিততা পদ্ধতির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পাত করিলেন। তাহারা দেখিলেন মকরন্দ পরিপূরিত সৌন্দর্য্যময় কুমুমরাজি, দুই চারি দিনেই বৃষ্টিচাপ হইয়া নীরবে ভূমি-শয্যা গ্রহণ করে, আর তৎসঙ্গে সঙ্গেই, সেই বৃক্ষে অথবা একটি পদার্থের কর্ম বিকাশ লক্ষিত হয়। এই জিনিষটিই রসায়নে পরিণত হইয়া আমাদের রসনার তৃপ্তি সাধন করে। পুষ্পধ্বংস ও ফলোৎপত্তি সঙ্গে সঙ্গেই ঘটিতে থাকে দেখিল, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত করিলেন, ফুল নিশ্চয় ফলোৎপত্তির কারণ। কিন্তু ফুলের এত পৌরুষ কেন? এত সৌন্দর্য্য কেন? ইহার অস্তিত্বের মধুরই বা প্রয়োজন কি? সামান্য সমীরণ ভরেই সে বৃষ্টিচাপ হইয়া পড়ে, তাহার এত রূপ কেন? এই চিন্তা প্রথম যখন অমূল্যস্বপ্নের হৃদয়ে উদ্ভূত হইয়াছিল, তখন তাহারা মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন,—ফুল বড় পুরাণের। ফুলের মতো নিজ অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া যাইবে, সেই চিন্তায় অধীর না হইয়া, সে কত হাসি-

মুখে সৌরভ ছড়াইয়া, মধু বিলাইয়া আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিতেছে। আমাদিগের তৃষ্টির জন্যই ফুল হাস মুখে প্রস্ফুটিত হয়। ক্ষীণক্লীবন প্রজাপতিকুলকে জীবিত রাখিবার জন্যই, ফুল মধু বিতরণ করিয়া থাকে। ফুলের জায় দাতা, ফুলের তুলা পরার্থপর ভগবতে কেহই নাই। কিন্তু অষ্টার উদ্দেশ্য সৃষ্টি বৈচিত্র্যের আবরণে দীর্ঘ দিন আবৃত রহিল না। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা সহকারে সিদ্ধান্ত করিলেন, বীজ বৃক্ষের বংশ বৃদ্ধির প্রধান কারণ, এবং ফুল না ফুটিলে বীজোৎপত্তি হয় না। সুতরাং উদ্ভিদ আমাদিগের তৃষ্টির জন্য পুষ্প ধারণ করে না; স্বকীয় বংশ বৃদ্ধির কামনায়, তাহার ফুল প্রসব করে।

একণে পুষ্পের অঙ্গাবলী আলোচনাধারা দেখা যাউক, উহাও মধ্যে কি কি রহস্য লুকায়িত আছে। প্রথমে শাখার অগ্রভাগে অথবা গাত্রে একটি সূক্ষ্ম গুটিকা দেখা যায়, পরে উহা ক্রমে ক্রমে বিকাশ লাভ করিয়া বর্ণ-বৈচিত্র্যময় ফুল কুসুমের পরিণত হয়। প্রস্ফুটিত কুসুমটিকে পরীক্ষা করিলে, উহার মধ্যে চারিটি স্তর দৃষ্ট হইবে। প্রথমতঃ ফুলের বোঁটার নিকট একটি বাটার জায় থাকার বিশিষ্ট সবুজ পদার্থ এই জিনিষটির মধ্যে অবিকশিত অবস্থায় ফুলটি-লুকায়িত ছিল। উহা কণ্ড নামে কথিত হয়। দ্বিতীয়তঃ বর্ণ-বৈচিত্র্য-পূর্ণ সৌরভময় পত্রবৎ পদার্থ; বাহা অক্ নামে পরিচিত। এই দুইটি আবরণ ছিন্ন করিয়া ফেলিলে, মধ্যে কতকগুলি নলাকার পদার্থ দৃষ্ট হয়। এইগুলি পুষ্পের জননেন্দ্রিয়। উহাদের দুইটি শ্রেণী আছে—যে গুলি বহির্দিকে অবস্থিত সেগুলি পুংজননেন্দ্রিয়। পুংজননেন্দ্রিয়ের সংখ্যা প্রায়ই অল্প। উহার প্রত্যেকটি একটি থলের-জায় পদার্থ—উহা রেণু বা পরাগপূর্ণ। একত্রে থলেটি রেণুহীন বা পরাগকোষ নামে খ্যাত। রেণুহীনের গুহা বিচিত্র। কোন ফুলের রেণুহীনের উপর একখানি পর্দা আছে,

রেণু পরিপক্ব হইলে, পর্দাখানা সরিয়া পড়ে। কোন ফুলের রেণুহীন পাকিলে, উহা দোপাটি ফুলের তৃতীয় জায়, এত জোরে বিদীর্ণ হয় যে তাহার ফলে রেণুগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। অপর একশ্রেণীর উদ্ভিদ আছে, উহাদের রেণুহীনের মুখ, যেন দুখানা কবাট মিলিয়া রুদ্ধ করিয়াছে। রেণু পাকিলে, কবাট দুখানা উন্মোচিত হয়, ও রেণুগুলি বাহির হইয়া পড়ে। এই জননেন্দ্রিয় চিনিবার তিনটি উপায় আছে। প্রথমতঃ উহা পুষ্পদলের অগাধবিত্ত পরেই অবস্থিত; দ্বিতীয়তঃ উহার গঠন স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের গঠন হইতে ভিন্ন; তৃতীয়তঃ পুং জননেন্দ্রিয়ের অগ্রভাগে একটি রেণুহীন আছে, থলেটি চেপ্টা ও দার্ব।

পুংভাগ ত্যাগ করিলে কোন ফুলে একটি, কোন কোন ফুলে বা একাধিক নলাকার পদার্থ দেখা যায়। এই নলগুলির গোড়ার দিকে একটি স্থল জিনিষ আছে। উহা কণ্ডন করিলে, মধ্যে কতগুলি গুটিকা-কার পদার্থ লক্ষিত হয়। এই গুটিকাগুলি ভবিষ্যতে বাজে পরিণত হইবে! একত্রে এগুলি বীজাণু ও স্থল জিনিষটি বীজ কোষ নামে খ্যাত। বীজকোষ হইতে যে নলাকার শূন্যগর্ভ জিনিষ উপরাদকে বদ্ধিত হয়, উহাই স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়। স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের অগ্রভাগে, গোলাকার একটি পদার্থ আছে। উহাকে চিহ্ন বা পীঠ বলে। পরিণত পুষ্পের চিহ্ন আটাল। পুষ্পের অঙ্গ সমূহের মোটামুটি এই পরিচয়ই যথেষ্ট।

পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রত্যেক পুষ্পে উভয় প্রকার জননেন্দ্রিয় প্রায়ই নাই। কোন পুষ্পে পুং জননেন্দ্রিয় আছে, স্ত্রী জননেন্দ্রিয় নাই; এই গুলিকে পুং পুষ্প কহে। যে পুষ্পে কেবলমাত্র স্ত্রী জননেন্দ্রিয় আছে, তাহা স্ত্রী পুষ্প নামে কথিত হয়। উভয় প্রকার জননেন্দ্রিয় যুক্ত পুষ্পকে পূর্ণপুষ্প কহে। জননেন্দ্রিয় হীন অর্থাৎ ক্লাব পুষ্পও প্রকৃতির মধ্যে দেখা যায়। উহার সংখ্যা অল্প। পুং জননেন্দ্রিয়

আধুনিক-কালিক ১৯২১

হইতে পক্ষ পুংরেণু স্ত্রী পুষ্পের পীঠে পতিত হইলে, উভয়ের মিলনে ফলোৎপত্তি হয়।

কোন পূর্ণপুষ্পের পুংরেণু, সেই পুষ্পের চিহ্নে পতিত হইয়া যে মিলন হয়, তাহাকে স্বভঃ সন্মিলন কহে। একজাতীয় বিভিন্ন শ্রেণীর পুষ্পের যে পরাগ মিলন হয়, তাহাকে শব্দর সন্মিলন কহে। শব্দর সন্মিলনে ফলফুল খুব বড় হয়, এবং ফুলটি পুং ও স্ত্রী এই উভয় ফুলের বর্ণ লাভ করিয়া মিশ্রবর্ণ বিশিষ্ট হয়। পুং ও স্ত্রী ফুলের মধ্যে মিলন সময়, যাহার শক্তি অধিক থাকে, শব্দর জাতকের মধ্যেও তাহার বর্ণ ও অবয়বের নৈকট্য থাকে। অল্পদিন হয়, অল্পিয়ায় আঙ্গুরের উৎপত্তির পরিমাণ কমিয়া গিয়াছিল সে জগৎ তদ্ভূদনীয় উদ্ভিদবিজ্ঞাবিশারদ পণ্ডিতগণ আমেরিকা হইতে উৎকৃষ্ট আঙ্গুরের কলম আনিয়া, উভয় প্রকার গাছের মিলন করাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে অতি সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়াছে। আঙ্গুরের আকার এত বৃহৎ ও ফলন এত অধিক হইয়াছে যে, তাহা দেখিয়া সলেই স্তম্ভিত হইয়াছেন। উন্নতিশীল আমেরিকান বৈজ্ঞানিকবর্গ এই উপায়ে অনেক মিশ্রফলফুল উৎপাদন করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহা সহজসাধ্য নহে। পুষ্পপ্রকৃতি শব্দর মিলন ইচ্ছা করে না। যদি ইহা প্রকৃতির অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে সচরাচরই বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভিদে পরাগমিলন দৃষ্ট হইত।

প্রকৃতির মধ্যে পূর্ণ পুষ্প বেশী নাই। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, এক পুষ্পের পুংরেণু, সেই পুষ্পের স্ত্রী ভাগে পড়িয়া যে মিলন হয়, তাহা স্বভঃ সন্মিলন নামে অভিহিত হয়। কিন্তু এক পুষ্পের উভয় ইঞ্জিরের বিচ্যুততা সত্ত্বেও অনেক সময় উক্ত প্রকার মিলন হইয়া উঠে না। কারণ অল্পসময়ে জানা গিয়াছে যে, অনেক পূর্ণ পুষ্পেরই উভয় ইঞ্জির এক কালে পরিপক হয় না। হয়ত যখন পুংভাগ বিকাশ লাভ করিয়া জ্বকহিতে আরম্ভ করে, তখন স্ত্রীভাগে বিকাশ লক্ষণ

দেখা যায়। কোন ফুলে বা টেহার বিপরীত অবস্থা। অনেক সময় দেখা যায়, পূর্ণ পুষ্পের উভয় ইঞ্জির, একসময় পরিপুষ্ট হইলেও স্ত্রীভাগ অল্প ফুলের পুং রেণু গ্রহণ করিয়া মিলন ক্রিয়া সম্পাদন করে। ইহাও লক্ষিত হইয়াছে যে, পূর্ণ পুষ্পের পুং রেণু টেহার স্ত্রীভাগের মধ্যে পতিত হওয়ার ফলে, ফুলটি অতিরিক্ত কাল মধ্যে বিবাক্ত হইয়া মরিয়া গিয়াছে। পুং ও স্ত্রী ভাগের অবস্থান বৈষম্যও অনেক সময়, স্বভঃ সন্মিলনে বাধা দান করে।

উদ্ভিদ যেন পরাগ সন্মিলন ভালবাসে না। তাহারা ইহা বুঝে, পরাগ সন্মিলন বংশ রক্ষার অঙ্গুল নহে। মনুষ্য সমাজে স্বগোত্র কিম্বা নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহপ্রথা বংশ রক্ষার অঙ্গুল নহে বলিয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। উদ্ভিদও যেন এই সত্য অবগত আছে। একজাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে কোনটি কেবল পুং পুষ্প ও কোনটি কেবল স্ত্রীপুষ্পবাহী; যেমন তাল, পেঁপে প্রভৃতি। আবার কোন কোন উদ্ভিদ পুং ও স্ত্রী উভয় পুষ্প বাহী; যেমন লাউ, কুমড়া, শসা, বিস্মা প্রভৃতি। বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, উভয় পুষ্পবাহী গাছের পুং পুষ্পের রেণু, সেই গাছের স্ত্রী পুষ্পে মিলিত হয়, ইহা উদ্ভিদ বিশেষ ইচ্ছা করেন না।

পরন্তঃ সন্মিলন প্রকৃতির বাঞ্ছনীয়। এই পব পরাগ সন্মিলন নানা উপায়ে সংঘটিত হয়। বায়ুস্রোত, জল-স্রোত, প্রজাপতি, মধুমক্ষিকা, পৌপিলিকা প্রভৃতির সাহায্যে এই মিলন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। বিভিন্ন উপায়ে সন্মিলন ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার জন্য, পুষ্পের অবয়ব ও প্রকৃতি বিভিন্ন। বায়ুদ্বারা যে সকল উদ্ভিদের মিলন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সে সমস্ত পুষ্প দীর্ঘ বৃক্ষের উপর জন্মে। এবং পত্র বাহাতে বায়ু প্রবাহের বাধক হইতে না পারে, তজ্জন্ত পুষ্পগুলি পত্রগুলোর বাহিরে প্রস্তুতিত হইয়া বায়ু প্রতিকূলে মুখ স্থাপন করিয়া অবস্থান করে। বায়ু



সম্মিলিত পুষ্পগুলির মধু বড় ও দলগুলি বহির্দিকে বিস্তারিত। এই শ্রেণীর পুষ্পের বর্ণ ও সৌরভের চমৎকারিত্ব নাই। ইহারা বায়ু হইতে ভাসমান পুংরেণু গ্রহণ জন্ত গর্ভদণ্ডটিকে দলবৎ হইতে, রপচড়ার আয় বহির্দিকে প্রকাশ করিয়া দেয়। পরাগ মিলন হইলেই ফুলের স্রব নষ্ট হইয়া যায়, এবং বীজকোষ পূর্ণ হইয়া ফল উৎপন্ন হয়। এই সময় উদ্ভিদগণ ফলটিকে কাক, বানর, শিলাপাত, ঝড়ুটি প্রভৃতির উৎপাত হইতে রক্ষা করিবার জন্ত, আশে আশে পত্রগুলির মধ্যে লুকাইয়া ফেলে। ফলন্তন মাসে আম্রবৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় যেন, গাছটি একমাত্র পুষ্পদ্বারা সুশোভিত হইয়া আছে। পত্রগুলির উপর পুষ্পগুলি স্তম্ভজ্ঞান ভাবে সম্ভ্রান্ত আছে : সমীরণ তখন চূত কুমুমের মিলন ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া দেয়। মিলনের ফলে যেই ফল উৎপন্ন হয়, অমনি উহার নবজাত সহকারী কিশলয়াভ্যন্তরে লুকাইয়া পড়ে।

প্রজাপতি বাহাদের মিলন সংঘটক, সেই পুষ্পগুলির অঙ্গ সৌষ্ঠবপূর্ণ, বর্ণ বিচিত্র, এবং উহাতে মধু ও সৌরভ থাকে। মধুযুক্ত পতঙ্গকুল অহোরাত্র পুষ্পসৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া, এক ফুল হইতে অন্য ফুলে বিচরণ করিতে থাকে। মধুকর স্বকাৰ্য্য সাধন জন্ত কুমুমে কুমুমে বিচরণ করিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পের গুচ উদ্বেগ পূর্ণ হইতেছে! কেন না ফুলের মধু গর্ভকোষের নিকট অবস্থিত থাকে; সুতরাং মধুকর মধুলোভে ফুলের গর্ভকোষের নিকট উপস্থিত হয়। তথা হইতে নিজস্ব হইবার কালে, উহার গাত্র পুং-রেণু পূর্ণ হইয়া যায়। এই মধুকরটি যখন জীপুষ্পে উপস্থিত হয়, ঐ পুষ্পের পরিপক জীভাগ প্রজাপতির গাত্র হইতে পুং রেণু প্রাপ্ত হইয়া অভ্যন্ত সিদ্ধ করে। এই প্রকারে প্রজাপতি শ্রেণী দ্বারা উদ্ভিদ জাতির মহোপকার সাধিত হয়।

প্রজাপতি দ্বারা বাহাদের মিলন সম্পন্ন হয়, সেই পুষ্প সমূহের গঠন, প্রজাপতির উপলক্ষ্যেই অল্পকাল।

কোন কোন ফুলের একটি দল দীর্ঘ দীর্ঘ, যেন একখানা পিড়ী। ফুল যেন, প্রজাপতির মত আসন পাতিয়া অপেক্ষা করিতেছে। ভাল ফুলে উহা লক্ষ্য করা যায়।

যে সমস্ত পুষ্প রাত্রি প্রাণুটিত হয়, তাহাদের সম্মিলন ক্রিয়াও রাত্রি সম্ভটিত হয়। এই শ্রেণীর পুষ্পের বর্ণ গৌরব নাই; আছে কেবল উগ্র গন্ধ। ঐ উগ্র সৌরভে একপ্রকার পিপীলিকা ঐ ফুলে উপস্থিত হয়। পুষ্প হইতে পুষ্পাহরে নমণশীল এই পিপীলিকা দ্বারা নৈশ কুমুমের মিলন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রজনীগন্ধা, ষেটকুটি প্রভৃতি পুষ্পের প্রতি লক্ষ্য করিলে, ইহার সম্ভাব্য প্রমাণ হইবে।

জলজ উদ্ভিদের পরপরগ মিলন, কলশোভ দ্বারা সম্পন্ন হয়। একটি জলজ উদ্ভিদের আশ্রয় সম্মিলন কৌশল বর্ণনা করা যাইতেছে। অনেকেই পাতত পুকুর কিংবা খালের নিকট পাটা নামক গাছ দেখিয়াছেন। এই গাছের পাতাগুলি সহজে ভাঙ্গিয়া চরিয়া যায়। ছেলেদের কাল্পনিক মহোৎসবে পাটাপাতা পুটির অভ্যাস প্রচলিত। চিনির কারখানায়ও পাটাপাতা ব্যবহৃত হয়। চারি পাঁচ হাত জলের নীচে এই উদ্ভিদের কাণ্ড অবস্থিত থাকে। কাণ্ড হইতে বহুদীর্ঘ বৃন্ত-পত্র উপর দিকে বর্ধিত হয়। ইহাদের একই গাছে পুং ও স্ত্রীপুষ্প বিভাজিত থাকে। জীপুষ্পগুলির বোঁটা দূর আয় পাক দেওয়া, পুং পুষ্পের বোঁটা ধর্ক; এক পুষ্পগুলি কাণ্ডের নিকটেই প্রাণুটিত হয়। যখন জীপুষ্প পূর্ণ প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার বৃন্তের পেস খুলিয়া যায়। ফুলটি ফুলের উপর ভাসিয়া উঠে, এখানে উভয়ের মিলন হয়। আশ্রয় বিহীন, মিলন সম্পন্ন হইলেই, জীপুষ্পের বৃন্ত পূর্ণবৎ দূর আয় পেস জন্মাইয়া, ফুলের নীচে ডুবিয়া যায়। অধেষণ করিলে প্রকৃতির ভাঙারে স্ত্রী বৈচিত্র্যের অভাব নাই। শিক্ষায় বাহারা ইচ্ছা, সৌন্দর্য্যে বাহারা স্পৃহা, তিনি স্থির নয়নে লক্ষ্য করিলে, কুমুমের প্রতি পটলে, পাতার অঙ্গুল কলাকৌশল দেখিতে পাইবেন।

শ্রীচিন্তাহরণ দে।



## আলোচনা

ভারতের “প্রতিভা” পূর্ববঙ্গ-কায়স্থসভা হইতে প্রকাশিত “ত্রিপুরাচন্দ্র” নামক বিদ্যালয়কার প্রণীত “কায়স্থ সমাজের সংস্কার” নামক পুস্তকের অতি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা দেখিলাম। সমালোচক “ত্রিভাষাংশিক” লিখিয়াছেন, “কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করিবার জন্য আজকাল কে একপ্রকার গ্রন্থের প্রচার হইতেছে ইহাও সেই রকমই একপ্রকারি গ্রন্থ।” সমালোচনা নিম্নরূপে। এই সকল গ্রন্থ কায়স্থ জাতির পক্ষে গৌরব ও উন্নত অবস্থার পরিচয় প্রমাণ করে নাই।

ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মুখপত্রে পুস্তকখানার এইরূপ সমালোচনা পাঠ করিয়া দুঃখিত হইলাম। পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই গ্রন্থকার আমাকে এক বড় উপহার দিয়াছিলেন; তাহা আমি পাঠ করিয়াছি। আজ কাল জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে সাহিত্যিক ঐতিহাসিকগণের শ্রদ্ধা ও সুবাদরের অযোগ্য এক প্রকার পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে সত্য; কিন্তু আলোচ্য পুস্তক সেই শ্রেণীর নহে, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। শুধুকে যে সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, এবং তাহার সন্ধানশ্রেণী ঐতিহাসিক বিচার প্রণালির দ্বারা প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ত্রাণপাশিক মহাশয়ের যত্নে গ্রন্থখান্য এই পুরোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত, সুতরাং সমালোচনার অযোগ্য। • • • যিনি নিরপেক্ষভাবে পুস্তকখান্য পাঠ করিবেন তিনিই অসুত্ব করিবেন যে সমালোচক “ত্রাণপাশিক” হইলেও তাহার সমালোচনা কার্যকর হয় নাই।

ত্রিভাষাবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়।

“কায়স্থ সমাজের সংস্কার” গ্রন্থখানির যে সমালোচনা প্রতিভার ভাষ্য সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে পুস্তকখানির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শিত হইয়াছে।

মনে করিয়া ঢাকা সাহিত্য পরিষদের অনেক কাম্বূজ সত্যও ক্ষুদ্র হইয়াছেন।

প্রতিভা ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মুখপত্রে এবং সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক পত্রিকা। ইহা সমালোচনার কাহারও প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শিত হয়, বা কেহ বনে কোনরূপ ব্যাঘ্র পান, ইহা পরিষদের ও পুস্তক সম্পাদকের অভিপ্রেত নহে। কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক বিষয়ের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোনরূপ আন্দোলন ও আলোচনা পরিষদের এবং প্রতিভার নিয়মবিকল্প। “কায়স্থ সমাজের সংস্কার” পুস্তকখানির সামাজিক আন্দোলনের পক্ষ সমর্থনের উপযোগিতা সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া সাহিত্য হিসাবে উহার নিরপেক্ষ পরিচয় যাত্র প্রদান করে এই ভাবিয়া উক্ত সমালোচনা পত্র প্রকাশ করা হইয়াছিল। বাহ্যিক, এই সমালোচনার সম্বন্ধে একটা আপত্তি উঠাতে উপরোক্ত আলোচনা পত্র প্রকাশ করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করা হইল।—প্রতিভা সম্পাদক।]

## রাখালের গান ও

## গোরক্ষ নাথের স্মৃতি

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

রাখালের খেলায় অনেক বিশেষত্ব ছিল। সে খেলার সুখ আজকালের ক্রিকেট, ফুটবল, বা টেনিসে নাই; সে সুখ বঙ্গের পল্লীতে ছিল। রাখালের একজনকে রাজা সাজাইয়া কোনও গাছের তলায় উই-টিপির উপর বা অন্য কোনও প্রাকৃতিক উচ্চস্থানে বসাইয়া কেহ উড়ির কেহ নাড়ির হইয়া বসিত। তখন আইনকানুন তৈয়ারী হইত। কত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কৃষক, ইত্যাদি বিষয় তখন সমাধা হইত।

কেহ চুরির কেহ বা বাপ-মার অবাধ্যতার দরুণ রাজার সম্মুখে ধৃত হইয়া আনীত হইত। যে দারোগা পুন্ডিয়া, দোড়িয়া চোর ধরিতে পারিতেন তিনি ভালপাতার টুপী বখশিশ পাইতেন। ভালপাতা ও নারিকেল পাতায় রাখালেরা যে সুন্দর টুপী বানাষ্ট তাহা উচ্চশিল্পের পরিচায়ক না হইলেও প্রশংসাই ছিল, রাখালের এই বাক্যই দেখিয়াও কবি গাইলেন

“বধূ! তোমায় করব রাখা একতলে।”

রাখালেরা বিবাদ করিত, তাহারাই সালিশী করিত। তাহার সীমাংসা করিত। নেংটিপরা পাঁচনধারী হিন্দু মোসলমানের ছেলেরা মিলিয়া খেলিত, আর দুই ছই মনে ‘বন্ধু’ পাতিয়া লইত। বন্ধুর সঙ্গে ভাব ছুটিয়া গেলে—ছন্দ সালিশ রাখিয়া বলিত

“বিয়া পাতা কাল

বন্ধু আমার শালা

বস! অতঃপর বন্ধুর টুটিয়া গেলে : কিয় শকত হইল না। এই ‘শালা’ গালি সচক নহে। তাহাদের ধারণা এই শ্লোকটি মূনি ঋষিদিগের রচিত : সুতরাং ইহা বলিলেই বেদ বিধমতে বন্ধুর কাটাকাটি হইয়া গেল, কখন কখন আবার বিক্ষিপ্ত বন্ধু পুনঃস্থাপিত হইত। এই বন্ধুর কাহারও কাহারও চিরজীবন স্থায়ী হইত। দেখা গিয়াছে।

রাখালদের দুই নম্বরের খেলা ছিল ‘তা ডু ডু’ বা ‘ডুগ্ ডুগ্’। তিন নম্বরের খেলা ‘হুন কোট’। চারি নম্বরে ‘মল দাটর’ পাঁচ নম্বরে ‘কান্দায় সে কান্দে সে’ বা ‘গাছো’। ছয় নম্বরে সাতার কাটিয়া ‘বলাই বলাই’ সাত নম্বরে ‘ডাকসই’, আট নম্বরে ‘গুলি দাঁড়া’। আর দুপুরের ‘মাথা ফাটা’ রোজে পাছতলায় ঘর আঁকিয়া ‘বাঘবন্দী’ বা ‘বোল কটি’ ‘দশ পুঁচশ’, ‘কড়ি’ বা ‘বিলা’ খেলা হইত। এই শেষোক্ত খেলাগুলিকে তাহার ‘কুড়ুমী’ খেলা বলিয়া ঘৃণা করিত। চঞ্চল বালকের দল ছুটাছুটি করিতেই ভালবাসিত। তাহাদের দেহ ষষ্টি দিনে দিনে লাউয়ের ডগার মত ‘ফণ ফণে’ হইয়া উঠিত। আর দিদিমা আশীর্বাদ করিতেন ‘বেটে থাক—সোহাগে লোহা’

হজম করা। আর ব্যারামের প্রতি আমরা যতই ঔদাসীণ্য প্রদর্শন করি ব্যারামও আমাদের তত নিকটবর্তী হইয়া পড়িতেছে।

রাখালের দুই তাহার স্ক্রুর উপর গুরুত্বলিখে যথেষ্ট যত্ন করে। গুরু বাছুর হুইলে রাখালের আনন্দের আর সীমা থাকে না। বাবাল নবজাত বাছুরটির গলায় কত বৎসরের ফিতা বাঁধে, তাহাকে কোলে ভুলিয়া লয়।

নবজাত বৎসর বয়স ১০-১২ দিন হইলেই গোয়াল ঘবেব দরজায় গোরকনাগের সান্নিধ্য দেখা যায়। ‘এই উৎসবে রাখালের পাবা’। আমাদের দেশে ঐহিত্য-গাভীর তত্ত্ব ১০-১২ দিন পর্যন্ত ব্যবহৃত হয় না। এই গাভীর তত্ত্ব (প্রসবের চার দিন পরে) দোহন করিয়া তাহাঙ্গার দাঁশ ক্ষীণ ক্ষীরপূরি প্রভৃতি ভোগ্য করা হয়। এসকল দবা রাখালদের ফরমাইস মত বাড়ীর গিন্নিরাই করিয়া থাকেন।

সন্ধ্যার পরে গোয়াল ঘরের দরজার বাহিরে কলার আগ পাতায় খেঁচড়া, দাঁদ, ক্ষীণ, ক্ষীরপূর, শুড়, কলা প্রভৃতি মাখাইয়া গিন্নির কবিতা বা ছড়া পাঠ করা হয়। এই পৌরোহিত্য মুসলমান বা খ্রীষ্টান হিন্দু সকলেই করিতে পারেন। পুরোহিত বা শ্লোকপাঠক দূরে দাঁড়াইয়া উচ্চস্বরে কবিতা আবৃত্তি করে—আর পাড়ার যত নিম্নস্থিত রাখাল-চাকর বাকর সমন্বয়ে হাঁচো হাঁচো \* করিয়া থাকে। তৎপরে ৩ শীতকালে প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যার পর গ্রামের কোনও না কোনও বাড়িতে হাঁচো হাঁচো শোনা যাইত। এখন গুরুত্ব কম—রাখালও প্রায় নাহি বলিতে চলে।

গোরক নাগের যে ছড়া আমাদের দেশে গীত হয় তাহাতে পাঠক তৎকালের একটা অস্পষ্ট ছায়া দেখিবেন। আমরা ছড়ার অনেক স্থানে অর্পগ্ৰহ কুরিতে সমর্থ হই নাই। ‘যথা শ্রুতং তথা লিখিতং’।

পুরোহিত বা

মণ্ডল

সকলে—হাঁচো হাঁচো।

মণ্ডল—খোব নাড়া খোব বাজে,

\* সত্যি, সত্যি—“সব সত্যি”।

(১) খোবঅর্থে স্বাক্ষরিত কি?

রাখাল ভাই খোব। (১)

আবিন-কার্তিক ১৩৩৯

সকলে—হাঁচো হাঁচো। প্রতিছজেই এইরূপ।

চালকরাটি খুঁসুর বাজে।

বাজে তাল বাজে ধামাল (২)

আমার গোরখনাথ অগৎমাল। (৩)

অগৎমাল...কিমি কিমি

সোনার বাক্স পাঁচটিমি (৪)

সোনা বাক্সিয়া বাক্স মোয়া (১)

আমার গোরখনাথ খাইলেন গুয়া (২)

গুয়া খাইতে লাগল চূর্ণ

কে কে বাইবে...কিমিপুর।

মালি বলে...মিলে আমার কথা শোন

প্রথম বৈশাখ...নালিতা (৩) গোন। (৪)

নালিতা বুনলে হটব ডাঙ্গর। (৪)

আগধান খাইবাম। গুঁড়িধান ফালাইবাম।

মাবখান সাগরে (৬) ভিছাইবাম।

সাগরে ভিছাইলে হটব কুইয়া (৭)

পোলা পুলিয়ে লটবে ধুইয়া।

ফালাইবাম রইদ (৮)

পাট হটব মণ চৌদ

পাট বোলে মুই...বীর

হাতী বাক্স হাতী থির।

এখন 'পাট' নিছ প্রশংসা করিয়া হাতী, পোড়া, গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ ইত্যাদি বর্ণনেন।

২

সাত পাঁচ রাখালে তুইলা মাটি—

এই ঋতু বসাইলাম লোয়াইত আটি। (১)

(২) ধামাল, ভাকালো।

(৩) অগৎমাল.....অগতের সকলের উপর মল

(৪) অর্প বাক্স নাল

(১) মোয়া...মুখ, মাথা। (২) গুয়া...সুপারি এখানে পান সুপারি। (৩) নালিতা...পাট। (৪) বোন...বুনট-করা। (৫) ডাঙ্গর...বড়। সাগরে...জলে। (৭) কুইয়া...পাঁটা। (৮) রইদ...রোজে।

(১) লোয়াইত আটি—লোয়াইত, সম্প্রদায় বিশেষ। ইহারা মুড়ি থৈ, থৈর লাড়ু ইত্যাদি তৈয়ার ও বিক্রী করে। আটি অর্থে পাড়া। অর্থাৎ লোয়াইত পাড়ায় গেলে রাখালগণ আদরে থৈর লাড়ু পাইত।

ওরে ভাই লোয়াইত

আমার রাখালরে থৈ'র লাড়ু যোগাইবে।

লোয়াইত।—তোমার রাখাল কেমনে চিনি? (২)

রাখালের মালীকের পক্ষের উত্তর—

"হাতে লড়ি বিনান মুড়ি (১)

গালের কুলে দোড়া দোড়ি।

[গালের কুলে পাড়ে ডুক—পাঠান্তর]

সাত পাঁচ রাখালে তুইলা মাটি—

এখানে বসাইলাম গোয়াল আটি।

এই ভাবে কুমার মৌদক প্রভৃতি সর্বজাতির উপর রাখালের 'খাবার' দিতে, রাখালের সকল রকম সুবিধা করিতে বলিয়া দেওয়া হইল এবং সকলের নিকট রাখালের পরিচয় দেওয়া হইল।

পরিচয় ইত্যাদি শেষ হইলে সকলে মিলিয়া গোরকের প্রসাদ পাইল। প্রসাদ গ্রহণে জাতি বিচার আছে বটে। কিন্তু যে স্থানে প্রসাদ পাওয়া হয়—সেখানে গোবর দেওয়া নিষিদ্ধ। কেন? উহা কি অশুভ হইয়া উঠে?

প্রসাদ লওয়ার পর এক ব্যক্তি দধির পাতিলটা লইয়া সন্ধ্যারে ভূতলে ক্ষেপণ করিয়া তাহা চূর্ণ করে, এবং 'আগপাতা' খানি মুড়িয়া গোয়ালঘরের দরজার উপর—চালে গুঁড়িয়া রাখা হয়। তার পর গরুকে বাঘ, মহিষ, সিংহ, গঁড়া (গঁড়ার), প্রভৃতি জানোয়ারের হাতে রক্ষা করিতে পার্শ্বনা করা হয়। উপরোক্ত ভাঙ্গা পাতিলের টুকরা চারদিকে নিক্ষেপ করা হয়। ঐ সীমানার মধ্যে গরুর কোনও বালাই চুকিতে পারিবে না—ইহা গোরকনাথের আশীর্বাদ।

অবশেষে পুরোহিত পাঠ করিলেন—

"গোরকের দড়িটা বিছল ঘুণে,

গরু ছুটা হইল গোরকের পুণ্যে।"

গোরকের পুণ্য কলে গরুর রোগ, বালাই, আশকা সব দূর হইল। আমার গরু গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে 'ছুটা' খাইবে—কাহার সান্না বাধা দেয়। কারণ গোরক নাথের হুকুম।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য।

(২) লোয়াইত রাখাল চানতে চাইতেছে।

(১) লোয়াইত রাখাল চানতে চাইতেছে।

# কবি শ্যামদাস সেনের মীন চেনন

( প্রথম পাঠ্য লুপ্ত )

... .. গণ গৌরি ॥  
সকল জন্মিয়া রহিল ঠাই ঠাই ।  
সাক্ষাতে আছয়ে দেখে জনতের মাই ॥  
লোমে লোমে যত ইতি জন্ম হইয়া গেল ।  
অনন্ত স্বরূপ হইয়া সব উপজিল ॥  
এহি মতে পৃথিবী যে জন্মিয়া আছন্ত ।  
নানা মতে পৃথিবী যে হইল অনন্ত ॥  
বার বার যুগী সবে সে যোগ সাদিল ।  
অনন্ত প্রকারে যুগী তখনে হইল ॥  
অনাদি কহেন তব্ব মনে হেতু করি ।  
কোন জনে গ্রহণ করিবা এই নারী (১) ॥ \*

\* \* \* \* \*  
ইসব শুনিয়া সবে মাথা কৈল হেট ।  
বুজিলেক এই কল্পা সকলের জেঠ ॥  
তাহাতে জন্মিল পুনি না হএ উচিত ।  
জানিয়া করয়ে আজ্ঞা মনের বাঞ্ছিত ॥  
তবে পুনি আজ্ঞা কৈল ধর্ম নিরঞ্জন । (২)  
হর গৌরি দুই জন করিল মিলন ॥  
শুন শুন যএ হর পাইলা এই নারী ।  
এহারে গ্রহণ কর মোর বাক্য ধরি ॥  
হরগৌরী জাহ চাঁল পৃথিবীর মাজ  
এখানে রহিয়া তোমার নাহি কোন কাজ ॥  
ধর্মের আদেশ পাইয়া পৃথিবীতে যাইল ।  
... .. সকল রহিল ॥  
আদি পুরাণেত (৩) জান এই মত কএ ।  
তাকে বিচারিয়া চাহ হএ কি নু হএ ॥

... ..  
... কহি তনু সন্তে গৌরীর বিজয় ।  
তবে যদি হর গৌরী পৃথিবীতে যাইল ।  
মীন নাথে ... .. ॥  
পদ্মাসনে কাল সাদিলেক ভোগ ।  
বাউ পান করি মীন না করিল ভোগ ॥  
মিনের চাকরি করে যতক গোলাই ।  
... .. কানাই ॥  
শিবের ঠাই লৈয়া চলে হারিফা মিনাই ।  
পিঠ ভাগে গৌরী আছে জনতের মাই ।  
তাহার শিরেত গঙ্গা শুনহ কারণ ।  
সদাএ কৃষ্ণ ভাবে হর অঙ্গ নাহি মন ॥

(১) যে পৃথিবানি হইতে এই গ্রন্থের পাঠ উদ্ধার করা  
গেল তাহা অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ । প্রথম প্রত্যাখ্যান লুপ্ত  
হইয়াছে ; দ্বিতীয় তৃতীয় পাতাও 'এত জীর্ণ যে পাঠ  
উদ্ধার করিতে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে ।  
“কোন জনে গ্রহণ করিবা এই নারী” এই পদের  
পরে “শিবের কাছে লইয়া গেল হাড়িকা মিনাই” ইত্যাদি  
ছিল কিন্তু এই পদের এইখানে কোন অর্থ সঙ্গতি  
হয় না । অধিকন্তু এই পদ হইতে “ফিরিয়া দেখিল  
গৌরীর বদন” পর্য্যন্ত সঙ্গত ভাবে একটু পরেই আছে ।  
লিপিকার প্রমাদে অথবা প্রাচীন পুস্তকের প্রায়ই  
দুই তিন পাতা ছিন্ন ও জীর্ণ হইয়া যায় বলিয়া “কোন  
জনে গ্রহণ করিবা এই নারী” এবং “ইসব শুনিয়া সবে  
মাথা কৈল হেট” এই দুই পদের মধ্যে অশ্লোকখানি পড়িয়া  
গিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে । প্রথম পাতার স্থিতি-  
তত্ত্ব ব্যাখ্যাত ছিল । এই আবশ্যক অংশটি খণ্ডিত  
হইয়া যাওয়া অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হইয়াছে ।

(২) ধর্ম নিরঞ্জনকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইয়াছে  
হরগৌরী পর্য্যন্ত তাহার আদেশ মানিয়া চলিতেছেন ।  
মীনচেনন নাথধর্মের একখানা প্রধান ধর্ম পুস্তক এবং  
গৌরকনাথ-মীন নাথের কাহিনীও সর্বজন বিদিত ও  
দেশ মধ্যে বিশেষ প্রচলিত । এই গ্রন্থে ধর্ম নিরঞ্জনের  
শ্রেষ্ঠ স্থান গভীর অর্থভোক্তক ।

(৩) এই আদিপুরাণের উল্লেখ সহদেব চক্রবর্তীও  
তাহার ধর্ম শব্দে করিয়াছেন । ( বিশ্বকোষ ১৮-শ

এহি মতে নিজ কার্জ সাধি মহেশ্বর ।  
 অস্ত্র মন নাহি হর ভাবে নিরস্তর ॥  
 কামদেবে আসি হরে ভ্রমাইল তখন ।  
 ধ্যান ভঙ্গ হৈল হর আনন্দিত মন ॥  
 ফিরিয়া দেখিল হরে গৌরীর বদন ।  
 \* \* করিতে মায়া হইলেক মন ॥  
 তবে যদি হর-গৌরী একএ বসিল ।  
 শিবের চরণে দেবী কহিতে লাগিল ॥

তোমার গলেত প্রভু কিবা কণ্ঠমালা ।  
 কি কারণে ধর প্রভু গলে মুণ্ডমালা ॥  
 শিব বলে যত ক্রন্দ হইল আমার ।  
 এক জন্মের এক মুণ্ড গলাতে আমার ॥  
 হরের বচন যদি শুনিলেক গৌরী ।  
 পুনরপি দেবী পুছেস্ত যত্ন করি ॥  
 কোন যুগে জিয় প্রভু কোন যুগে বরি ।  
 হেন তব্ব কহ প্রভু যুগে যুগে তরি ॥  
 দেবীর বচন শুনি কহে মহেশ্বর ।  
 বরিতে চলহ প্রিয়া খীরা ( সুসাগর ) ॥  
 সাগরের মাঝে আছে টঙ্কি মনোহর ।  
 ই বলিয়া দুই জন চলিল সত্তর ॥  
 মৎস্ত রূপ ধরি গেল দুই মহাবল ।  
 হেটেত থাকিয়া মিনাই শুনিল সকল ॥  
 ( মহেশ্বর ) বোলে দেবী তুন সাবধানে ।  
 যতেক পরম তব্ব কহি তোমার স্থানে ॥  
 মহাদেব কহে যত সঙ্কেত বিচারণ ।  
 \* \* \* \* \*  
 নামাতে থাকিয়া মীন হকার পূরএ ।  
 মহাদেবের মনে লাগে দেবী ত্রাস পএ (১) ॥  
 চৈতন্ত পাইয়া দেবী ( বলিল বচন ) ।  
 ————— হর নিজার কারণ (২) ॥  
 দেবীর বচন শুনি চিন্তিলেক মনে ।  
 কহিতে হইবে কথা হকারিল কোন জনে ॥  
 ধ্যানেত জানিল হর হকারিলেক মীন ।  
 হরে বোলে হইবেক নারীর অধিন ॥

ভাগ ৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা ) তিনি আদিপুরাণ মতে স্বীয় গ্রন্থ রচনা করিলেন বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার গ্রন্থেও “শিবের নিকট ভগবতীর তত্ত্ব জিজ্ঞাসা উভয়ের বল্লভাতীয়ে আগমন, ভগবতীকে উপদেশ দান কালে শিব মুখ নিঃসৃত তত্ত্বকথা শ্রবণে মৎস্তগর্ভশায়ী মীননাথ যোগী মহাজ্ঞান লাভ, মীননাথের ভগবতী নিন্দা, তজ্জন্তু ভগবতীর শাপ হেতু কদলীপাটনে রমণীর মোহন-মস্ত্রে মীননাথের মেঘরূপে অবস্থান, শিষ্য গেরকনাথ কর্তৃক তাহার উদ্ধার” ইত্যাদি বিবরণ বর্ণিত আছে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, একই মূল আদিপুরাণ হইতে সহদেব চক্রবর্তী ও শ্রামদাস সেন তাহাদের বর্ণিতব্য বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন। সুলতান মামুদের সভাস্থ মহাপণ্ডিত আলবেকরী ( ১০৩১ খৃষ্টাব্দে ) তাহার ভারত বিবরণ গ্রন্থে ভারতে প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণের দুইটি তালিকা দিয়াছেন, তাহার প্রথম তালিকার প্রথমই আদিপুরাণের নাম দেখিতে পাই। বিম্বকোষের পুরাণের বিবরণেও এক জৈন আদি পুরাণের পরিচয় পাই। সহদেব চক্রবর্তী ও শ্রামদাস সেনের অবলম্বিত আদিপুরাণ এই উভয় পুরাণ হইতেই বিভিন্ন ছিল বলিয়া বোধ হইতেছে। সুকুর মহাক্ষদের মরনামতির গাথায় গোরকনাথ-মীননাথের কাহিনীর বিবৃত উল্লেখ আছে।

(১) মহাদেবের মন চঞ্চল করিল এবং দেবী ভয় পাইলেন।

(২) ভাল অর্থ সঙ্গতি হয় না। চেতনা লোপ অর্থে নিজা শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। লিপিকার প্রমাদেও ইহার স্থলে “নিজার” লেখা হইয়া থাকিতে পারে।

ক্রোধ হইয়া মহাদেব বলিল বচন ।  
 যে শুনিলা এইখানে হৈবা বি (স্মরণ) ॥  
 মহাদেব গৌরী উষ্ণি... ..  
 পুনরপি সিদ্ধা সব একস্তর হৈল ॥  
 আখ্যে গুরু মহাদেব পাছে আর সব ।  
 যোগ সাধে সিদ্ধা... .. ॥  
 মহাদেব ... .. কৈলাস ।  
 সেই স্থানে হর গৌরী কৈল গৃহবাস ॥  
 পূর্বদিকে হাড়িকা গেল দক্ষিণে মীনাই ।  
 পশ্চিমে গোর্ধনাথ উত্তরে কানাই ॥  
 পৃথিবী ভ্রমএ সবে যোগ পথ ধ্যাই ।  
 কৈলাসেতে হর গৌরী আছে এক ঠাই ॥  
 রহিলেক হর গৌরী কিবা কুতুহলে ।  
 তাহার... ..  
 সেই সব कहিলে কথা নাহি আদি অন্ত ।  
 যুগী হইয়া গেলে সব যোগেতে শুনন্ত ॥  
 একদিন হর গৌরী আনন্দে বসিল ।  
 ... .. कहিতে লাগিল ॥  
 ভবানী বোলেন হর শুন সাবধানে ।  
 তোমার জে শিষ্যে নারী না করে কি কারনে ॥  
 দেবের দেবতা হর নারায়ণ তুমি ।  
 গঙ্গা গৌরী দুই নারী গ্রহণ কৈলা তুমি ।  
 ধ্যানেন্ত সাদিল যোগ কি পাইল ফল ॥  
 অজ্ঞা কর গৃহবাস করুক সকল ॥  
 মহাদেব নোলে দেবী হেন শক্তি নাহি ।  
 কাম ক্রোধ মোভ মোহ রহিছে এড়াই ॥  
 ভবানী বোলেন হর না বলিয় আর ।  
 কাম ভোগ ভেজি হেন মানব আকার ॥ (১)  
 যদি অজ্ঞা কর হর করম নিবেদন ।  
 এহি সব ভোলাইব আমি করিয়া রচন ॥

এহি কথা শুনিয়া শিবে সিদ্ধা আশ্রয়িল ।  
 যতেক সিদ্ধাগণ ডাকিয়া আনিল ॥  
 একে একে আসন দিলেক জনে জন ।  
 বসিলা মণ্ডলী করি বত সিদ্ধাগন ॥  
 জগত মোহন রূপ ধরিয়া আপনি ।  
 আপনি পৈরএ (২) অন্ন শিবের ধরিণি ॥  
 ভুবন মোহনী দেবী সঙ্করের নারী ।  
 কটাক্ষে যে সিদ্ধাগনের প্রাণ নিল হরি ।  
 শিবের ধরিণী দেবী বড়ই চতুর ।  
 সোবর্ণ কোটরা করি জল দিল ছুর ॥  
 পত্র ভরিয়া জল আনি দিল জনে জন ।  
 জলের ছারায় দেখে কমল বদন ॥  
 দেবীএ করিল মায়া নানামত ছলে ।  
 বিষম কপট মায়া মূনির মন টলে ॥  
 দেবীর দেখিয়া রূপ রহিতে না পারে ।  
 কামবাণে দহে তম্বু বড় অন্তরে ॥  
 নানারূপ ধরে দেবী ভুবনমোহিনী ।  
 কামাতুর সিদ্ধাগণ হইল আপনি ॥  
 মনে মনে চিন্তে মিনে পাই এই নারী ।  
 ত্রিজগতে নাই যান এমন সুন্দরী ॥  
 বিচিত্র আসনে থাকি হেন নারী লইয়া ।  
 কেলি কুতুহল করি বুকতে থুইয়া ॥  
 বুজিয়া মিনের মন দেবী দিল বর ।  
 কদলি সহরে মিন চলহ সত্তর ॥  
 শোল শত নারী লৈয়া কর গিয়া কেলি ।  
 কদলীর রাজ্যে তুমি কাট যাও চলি ॥  
 দ্বিতীএ চিন্তিল মনে সিদ্ধা হাড়িকাএ ।  
 \* \* বেগ্ন মন সোন্দরি যদি পায়ৈ ॥  
 হাড়ি কর্ম করি যদি থাকি এহার পাশ ।  
 তথাপি পুরএ যোর মনের হবিলাস ॥  
 হাসিয়া বলিলা দেবি দিহু এই বর ।  
 (চলি যাও হাড়ি)কা জে মৈনামতির বর ॥

(১) কাম ভোগ ত্যাগ করিয়া থাকিলে এমন  
 সাধারণ মানুষের মতই আকৃতি থাকিত না ।

(২) পরিবেশন করে ;—পদটি বিশেষ জটিল ।

হাতে করিয়া পিছা কান্দে কোদাল লই।  
মেজের কোলেত জায় (১) পাইবা সেই ঠাই ॥

ত্রিতিএ \* \* \* \*

এমত সোন্দরি যদি থাকে মোর ঘরে ॥  
তার সঙ্গে কেলি করি মরিয়া যদি যাই।  
তথাপিয তার সনে আনন্দে গোঞাই ॥  
অঙ্গীকার কৈলা দেবী মনেতে ভাবিয়া।  
তুরিত গমনে জায় \* \* \* চলিয়া ॥  
বেই মনে কৈলা তুমি পাইলা সেই বর।

\* \* \* \* \* ॥

চতুর্থে মানস কৈল গাবুর সিদ্ধাই।  
এমন কামিনী যদি ভজে মোর ঠাই ॥  
তার লাগি যাএ যদি হাত কাটা।  
\* \* \* \* \* ॥

আজ্ঞা দিল ভবানী বুজিয়া তার আশ।  
বর দিল চলি যায় সত মাএর পাস ॥  
ভজিবেক সতমাএ দেখিয়া জীবন।  
এহার কারণে তুমি পাইবা আপন ॥  
পঞ্চমে ভাবিল গোকর্নে মনে করি সার।  
এহিরূপ জননী যদি হএত আমার ॥  
তাহার কোলেত বসি সুখে দুহুখাই।  
এমন জননী যদি পৃথিবীতে পাঠ ॥

যল যুগে সহে মোর পালে কাখে কোলে।  
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি যদি হরে যোরে বরে (২) ॥

\* \* \* \* \* দেবী সুরেশ্বরী।

অবশ্য ছলিমু তোরে আর রূপ ধরি।  
সর্ব সিদ্ধা চলি গেল জার জে আসনে।  
দেবীকে পুছিল কথা দেব ভগবানে ॥

(১) যাও।

(২) (ক) হর আমাকে বরদান করেন,

(খ) আমার হরণদ প্রাপ্তি হয়।

(গ) হর আমাকে পুত্র ভাবে ভজনা করেন।

কিমত দেখিলা দেবী মোকে কহ সার।

সিদ্ধা সবেব বুঝিলা কেমন ব্যবহার ॥

সিবেব আদেশে দেবী কহিল সকল।

জেই জেই সিদ্ধা সবে পাইল জেই বর ॥

গোকর্নের চরিত্র শুনি হাসে মহেশ্বর।

মহা অবধূত গোকর্ন ভগতের ভিতর ॥

তারে যদি দেবী তুমি না পার ছলিতে।

রাখিল মহিষা কিছু গোকর্ন অবধূতে ॥

দেবী বলে তাহারে ছলিমু আর রূপে।

দেখিব সকল হর জানিব সর্বরূপে ॥

তবে সিদ্ধা চলি গেল যার যেই ঘরে ॥

প্রথমে হাড়িকা গেল মৈনামতির ঘরে (১) ॥

হরিত গমনে গেল মৈনামতির পুরি।

তথা গিয়া বুড়লেক হাড়ি রূপ ধরি ॥

কালফা চলিয়া গেল অববির ঘরে।

গাবুর চলিয়া গেল আপনা বাসরে ॥

গোকর্নাথ চলি গেল বঙ্গ নিকেতন (২)

কদলিতে চলি গেল মিন মহাজন ॥

কদলিতে দেধে মিনে নারীগণ প্রজা।

নারীর যে হাট বাট নারী দেধে রাজা ॥

দেখিয়া যে নারী গণ ভুলিয়া গেল মন।

তখন পাইল দেখা কদলির গন ॥

(১) ময়নামতির পুথিতে হাড়িকার বিবৃত কার্য-কলাপ বর্ণিত আছে। মাতা ময়নামতির অহুরোধে রাজা গোবিন্দচন্দ্র হাড়িকার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাহার সঙ্গেই সন্ন্যাসে বাহির হন ॥

(২) ভবানী দাসের ময়নামতির পুথিতে গোরক্ষনাথ বলিতেছেন, “আমরাটি আছে কিন্তু বিক্রমপুর সহর”। এই পুথিতেও দেখিতেছি যে গোরক্ষনাথ বঙ্গ নিকেতন চলিয়া গিয়াছিলেন। ইহা হইতে এই বুঝা যাইতেছে যে, বঙ্গান্তর্গত বিক্রমপুরই ঐ গোরক্ষনাথের প্রধান লীলা ভূমি ছিল।

মোদলা কমলা দেখি ভুলি গেল মন ।

শুকুনাত্তে জল পাটল কেন মীন গন :: :: :: ॥

ইতি মিনের মন ভঙ্গ ॥ :: :: :: ॥

লাচাড়ি দীর্ঘ ছন্দ ॥ :: :: :: ॥

মিন নাথ যাইল যবে : কদলি দেখিল তবে :

চাহে সবে রাখিতে ভূলাইয়া ।

\* \* দেখি এই : আমি সবে তারে পাঠি :

আনন্দে রাখিব ভোলাইয়া ॥

মোদলা কমলা ছই : যোলশত নারী লই :

নিমেষেক করি সমুদীত ॥

মিননাথ ভোলাইতে : সব আইল একচিত্তে :

বেরিয়া রহিল চারিভিতে ॥

করিয়া নানান বেশ : মাথের লবিত কেশ :

গ্রীবার উপর গুঞ্জরে ভোমরা ॥

### চতুর্থ পাতা ( ১ )

খোলে তাথে রত্ন-হার : মানিক মুকুতা ভার :

দেখিতে যেন বড়ি উজ্জল :

করিয়া নানান সাজ : কেশরী জিনিয়া মাজ :

কটাক্ষে হানে পঞ্চশর :

চলিল নানান পতি : দশন মুকুতা পাতি :

শ্রাবল সুন্দর কলেবর :

কটীতে কিংকিনি বাজে : চরনে সুপুত্র সাজে :

দেখিয়া মূনির মন টলে ॥

ঈজিত নয়ানে চাহে : হরিহর মোহ জার :

নানা ভেসে দিল দরশন ॥

মিনের সম্মুখে আসি : মোদলা কমলা হাসি :

কহে সবে মধুর বচন ॥

নয়ানে নয়ানে চায়ে : হাত নাড়ি কথা কয়ে :

ঠমকে দেখায় ছই \* ॥

উরুতে জে হাতে তালি : কথা কয় ঠেলি ২ :

নানা মতে মধুর বচন ॥

কেহ নেয় ধনি কাড়ি : কেহ নেয় ব্যাগ ছড়ি :

নানা-ছলে মিনেরে বুঝায় ॥

কোন দেশে তোর ঘর : মাগি খায়ে নিরন্তর :

( কথা আ ) ইলা কেমনত উপায়ে ॥

হাতে কেন দণ্ড ধরি : কানে কেন দিছ কড়ি :

নিরন্তর বঞ্চ একান্তর ॥

মোর দেশে নাহি রাজা : তাই করি ভোমা পূজা :

তুমি (১) হয় রাজ্যরাজেশ্বর ॥

নারীর পাটন এই : যোল শত কদলী লই :

তার রাজা দেখ আমি হই ॥

নারী দেশে হয় রাজা : সবে মিলি করি পূজা

আমি সব কর পরিচাপ ॥

ছাড় অমঙ্গল বেশ : ভুঞ্জ অ কদলীদেশ :

নবদ ..... যাতে ॥

আমি ধরি হাতে পায়ে : চামর করি এ বায়ে :

দাসি হইয়া রহিবাম সাতে ॥

বিচিত্র বসনে পৈর : ক্ষ.....তুমি এড় :

সিঙ্গা-সনে কর আরোহন ॥

কদলীর রূপ দেখি মিনের পুলকে আশি :

গুনি সবে মধুর বচন ॥

পুলকিত মীননাথে দেখিরূপ সহসাতে :

দেখি সবে নতুন যৌবন ॥

ভোলেতে পড়িল মিন : হারাইল গুঞ্জর চিন :

কদলিতে ভুলি গেল মন ॥

বুঝি সবে অসুমান : অনানে দিলেক সান :

ধরিলেন মিন সব নারী ॥



বোলসত কদলি ধরি : হাতে ২ হাতে ধরাধরি :  
দোলয়ে সে সুবর্ণ \* \* ভরি ॥

### চতুর্থ পাতা ( ২ )

সিদ্ধাসনে বসাইল : প্রসাদ মালা গলে দিল :  
ছত্র ধরি করে হলাহলি ॥  
কদলিতে মিন রাজা : নাগী সবে করে পূজা :  
সবে মিলি ধরে ফিরি ফিরি ॥  
\* কেলি কুতুহল রসে : রাত্রিদিনে মিনে বৈসে :  
শিতলিত চামরের বায় ॥  
রাত্রিদিন করে কেলি : মন গেল কামে ভুলি :  
কোন নারী ধরে হাতে পায় ॥  
ভ্যাঙিল গুরুর বোল : কামে হত হইল ভোল :  
রতি রসে মগ্ন হইল অতি ॥  
সকল সুবত্তিগণ : কেলি করে অমুকণ :  
ক্রিয়া বিনে আর নাহি মতি ॥  
মিনে ভাবে অমুকণ : না জানি আইসে কোন জন :  
মোদলা কমলা লৈয়া জায় ॥  
আদেশিলা যে মিনাই : সুগী পায় জেই ঠাই :  
মারিয়া যে ফালায় নিশ্চয় ॥  
রাজার আদেশ পাইল : ধরে ২ থানা দিল :  
হেন মতে হইল অঙ্গীকার ॥  
নিশ্চিত রহিল মিন : নাহি জানে রাত্রি দিন :  
রহিলেক পুরীর মাঝার ॥  
নানা কুতুহল রসে : কতদিন মিনে বৈসে :  
নারী লইয়া থাকেস্ত বেড়িয়া ॥  
ভাঙুল যোগায় কেহ : চামড়ে করয়ে বাহ :  
কেহ দেয় চন্দন লেপিয়া ॥  
আনিয়া কাঞ্চন বারি : জ্বারের জল ভরি :  
পাখালি দুইখানি চরণ ॥  
কদলি সকল আনি : চরণের লইল পানি :  
বসিবার দিল সিদ্ধাসন ॥

চন্দ্র শেন সুশোভিত : তারাগণ বেষ্টিত :  
কদলিতে রহিলেক মিন ॥  
নানামতে কেলিরসে : কতদিন মিনে বৈশে :  
মোহাদেবী হইল গর্জবতী ॥  
কালে দিনে প্রসবিল : সুন্দর কুমার হৈল :  
মোদল করিল নানাভিত্তি ॥  
রাজার কুমার হইল : তখনে গনিয়া চাহিল :  
নাম খুইল বিন্দু জগজ্ঞাত ॥  
ভাট বিপ্রনারীগণ : ভূষিলেক দিয়া ধন :  
মোদলা রহিল তান সাত ॥

### ॥ ধর্ম ছন্দ ॥

মিন নাথ পরিলেক কদলির ভোলে ।  
গোকর্নাথ রহিলেক বকুলের তলে ॥  
হেনকালে ভবানী মনেতে ভাবি কাজ ।  
গোন্ধেরে দিবারে মুই না পারিল লাজ ॥  
এমত ভাবিয়া দেবী মনে কৈল ভ্রম ।  
বিবদ্যা হইয়া গেল গোন্ধের আশ্রম ॥  
সম্মুখে রহিল দেবী বিবদ্যা হইয়া  
\* \* \* \* করি ছুই জাহ্নু প্রসারিয়া ॥  
আসন ছাড়িয়া গোন্ধে যাইতে লালিল ॥

### পঞ্চম পাতা ( ১ )

হরের ধরিনি দেবী সম্মুখে দেখিল ॥  
বিবদ্যা দেখিয়া তবে মনেতে ভাবিল ।  
অভিভূত লগ্ন্য বেটী কিকর্ম করিল ॥  
আন্তে বেস্তে দেখিয়া যে গোন্ধে গেল ধাইয়া ।  
চাকিলেক \* \* বিশ্বগত দিয়া ॥  
গোকর্নাথের স্তানে দেবী বড় লাজ পাইল ।  
ততক্ষণে মোহামায়া বাহি রূপ হইল ॥  
আসনে বসিতে দেবী পেটেতে সামাইল ।  
মনেতে ভাবিল গোন্ধে ঘোরে ছন্দ দিল ॥

তখনে জানিল গোন্ধে দেবীর হেন কর্ম ।  
 উদরে রহিল দেবী জানিলেক কর্ম ।  
 ভালি মারি রহে নাথ দশবীর ছয়ার ।  
 প্রকাশ না পায় দেবী ছটফট সার ।  
 মহাছুক পাইয়া দেবী ডাকিয়া বলিল ।  
 ভুবি বড় সতীনাথ নিশ্চয় জানিল ॥  
 পথ এড়ি দেয় মোরে জাম মিজ ঘরে ।  
 বড় ছুক পাইল মুই তোমার ওদরে ॥  
 দেবীর বচনে গোন্ধ হাসিতে হাসিতে ।  
 কোন পথে এরি দিব লাগিল ভাবিতে ॥  
 ভাবিয়া চিন্তিয়া নাথে মনে কৈল সার ।  
 মার্গপথে গোকনাথে করিল বাহির ॥  
 বাউর ঠেলায়ে দেবী বাহিরে পড়িল ।  
 দোমের ঠেলায়ে বেধা কাকালিতে পাইল ।  
 কটা ভঙ্গ হইয়া দেবী তথাতে রহিল ।  
 তথাতে রহিয়া দেবী সকল সহিল ।  
 প্রতিদিন ভক্ষ্য এক মনুষ্য পাইল ।  
 প্রতিদিন এই মতে খাইতে লাগিল ॥  
 এখানে না পায় শিবে দেবীর জন্ম ।  
 গোন্ধেরে ধরিয়া শিবে করে কদার্নন ॥  
 কথা গেল মোর নারী ভূমি কে না কৈলা ।  
 তনিয়া যে গোকনাথে হাসিতে লাগিল ॥  
 ভাঙ্গ ধুতুরা খায়ে কি বলিব তোরে ।  
 কথায় হাড়াইলা নারি ধর আসি মোরে ।  
 তখনে যে গোকনাথে রাড়াত (১) চলিল ।  
 দেবীর সাক্ষাতে গিয়া গঞ্জিতে লাগিল ॥

কিবা কর্ম কর ভূমি কর অনাচার ।  
 দেবতা হইয়া কর মনুষ্য আহার ॥  
 সেইসে গোন্ধে তবে নিবন্ধ করিল ।  
 কালি বলি এক মূর্তি রাড়াত রক্ষিল ॥  
 গোরী লৈয়া আইল নাথে শিবের সমাজ ।  
 এথা দৈবে বিপারিত হইয়াছে কাঙ্গ ॥ (২)

\* \* \* \* \*

আমারে পাইতে স্বামীর মনের হভিলাষ ।  
 উধ্যাসনে মাগি বর শঙ্করের পাস ॥  
 কৈন্তার তপস্তা দেখি নিতি চিন্তে হর ।  
 গোকনাথে বিবাদ যে হইছে দেবীর ॥  
 কোন মতে বিরোধ হইব সমাধান ।  
 এহি কত্না গোন্ধে নেউক দিল ধামিদান ॥  
 সেবক বৎসল হর ক্রোড় সাগর ।  
 গোকনাথ পতি হউক ভোরে দিল বর ॥  
 আমার নাহিক কেহ ভোবন ভিতর ।  
 স্বামী হইতে তোমারে তাহারে দিল বর ॥  
 শিবের বচনে গোন্ধের হইল সঙ্কট ।  
 ভাল বর দিলা হর করিয়া প্রকট ॥  
 গুরুর গুরুর আত্মা পাণিবর চাহি ।  
 শিবের বচনে কত্না বোলিলেক যাই ॥  
 স্বামী পাইয়া বিরহিনী চলি গেল ঘর ।  
 নাথেরে লইয়া গেল পুরীর ভিতর ॥  
 তবে যদি সতী কত্না এ ধ্যানে কৈল ভোর ।  
 ছুঙ্কেয় বালক আইল পুরীর ভেতর ॥

(১) এইখানে দেখা যায় যে, রাঢ় দেশে যাইয়া গোকনাথে এক কালী মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন। গোকনাথ প্রতিষ্ঠিত কোন কালীমূর্তি রাঢ়ে আছে বলিয়া অবগত নহি। কালীঘাটের কালীর প্রসঙ্গ নয় ত ?

(২) এইখানে মূল পুথিতে পঞ্চম পাতার প্রথম পৃষ্ঠা শেষ হইয়াছে। দ্বিতীয় পৃষ্ঠার বাহা লিখিত হইয়াছে তাহার সহিত এই প্রথম পৃষ্ঠার প্রসঙ্গের মিল নাই। মধ্যে অনেকখানি লিপিকার প্রমাদ বাড়িয়া গিয়াছে।

স্তন খাইতে চাহে শিশু কান্দে হোয়া হোয়া ।  
 তা দেখিয়া রাজকন্যা বলে আচা ভূয়া (১) ॥  
 ভাল স্বামী পাইল আমি হুঙ্ খাইতে চাহে ।  
 তুনি কি বলিব মোর বাপ আর মায়েরে ॥  
 হাসিবে সকল লোকে বুঝা হৈল কাজ ।  
 বর না পাইল আমি পাইল মহালাজ ॥  
 মনেত ভাবিয়া হুঙ্ বহল কান্দিল ।  
 কান্দিতে কান্দিতে কন্যা বিমস্মিয়া (২) চাহিল ॥  
 গোন্ধের বুঝিল সব মায়ার চরিত্র ।  
 যায় করি ভণ্ডিতে তাহার হইল চিত্ত ॥  
 ই বলিয়া রাজকন্যা স্তম্ভিত আরম্ভিল ।  
 করণের করি নারী কহিতে লাগিল ॥  
 মহাদেব দিল বর স্বামী পাইল তোকে ।  
 কপট করিয়া প্রভু কেনে ভাঙে মোকে ॥  
 কপট ছাড়িয়া যদি না ভোব আমারে ।  
 স্ত্রীবধ দিব আমি কহিল তোমারে ॥  
 কুমারির স্বাক্ষর সুনি ইসিমে (৩) হাসিল ।  
 কন্যা সমুদ্রিয়া সিদ্ধা কহিতে লাগিল ॥  
 তোমারে ভাঙিল হরে কপট করিয়া ।  
 কহিব সকল কথা না করিবু মায়ার ॥  
 না হয় স্ত্রীপুরুষ দুই না হই যুবান ।  
 ভেদঃবীৰ্য্য নাহি মোর কহি তোমার স্থান ।  
 সুকুন শরীর মোর কাষ্ঠ সম সর ।

ছায়াতে নাহিক ফুল মান্দার সম সর ॥

(১) আশ্চর্য্য ।

(২) বিমর্ষ হইয়া; অথবা সংকুত বিষয়া হইতে

আসিয়াছে ধরিলে “চিন্তা করিয়া” এই অর্থ হয় ।

(৩) জঘৎ ।

শরীরেতে বিন্দু নাহি কাষ্ঠ সম সর ।  
 সিদ্ধার মেনেতে (১) নাহি মোর সমসর ॥  
 আমার বচন দেবী যদি ধর তুমি ।  
 পাইবা পুত্রুর বর যদি দিব আমি ॥  
 আমার কর্পটি জলের সর্ষ সিদ্ধি হয় ।  
 ভক্তি করিয়া তারে যেই জনে লয় ॥  
 এহি কর্পটির ধোয়া যদি কর পান ।  
 জন্মবেক সিদ্ধাপুত্র দেখে বিভ্রমান ॥  
 গোন্ধের বচন তবে শরীরেতে করিয় ।  
 কর্পটি ধুইয়া জল খাইল আনিয়া ॥  
 কর্পটি ধুইয়া যদি খাইলেক পান ।  
 সেই জোঙ্গে গর্ভবতী হৈল কন্যা ধানি ॥  
 - দশদণ্ড অন্তরে ছাওয়াল প্রসবিল ।  
 সর্ষ অঙ্গে সিদ্ধার বেশ তাহারে দেখিল ॥  
 দেখিয়া যে গোন্ধনাথে ধ্যান আরম্ভিল ।  
 স্ত্রীকর্পটিনাপ নাম তখনে রাখিল ॥  
 কন্যা সম্ভাষিয়া তবে গোন্ধে চলিল গেল ।  
 বিজয়নগর (২) ছাড়া বৈকুণ্ঠে গেল ॥  
 বৈকুণ্ঠে বসে নাথ করিয়া আসন ।  
 কালফা চলিয়া যায় সৈন্তেত গমন ॥  
 বায়বেগে চলি যায় মনে জপি গতি ।  
 তরুতলে বসিয়াছে গোন্ধ মহামতি ॥  
 ছায়ার শরীর গোন্ধ দেখে ততক্ষণ ।  
 হাসিয়া চলিল তবে গোন্ধ মহাজন ॥  
 এমত আছয়ে কোন সিদ্ধার ভিতর ।  
 না কৈল আমারে মাত্ৰ কিশের অন্তর ॥

(১) অর্থ কি ? বোধ হয় “মাত্ৰ” এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে ।

(২) বিজয় নগর কোথায় ? রাজসাহীর অন্তরে প্রসিদ্ধ বিজয়সেনের রাজধানী এক বিজয় নগর আছে ।

# প্রতিভা

৪র্থ বর্ষ

অগ্রহায়ণ ১৩২১

৮ম সংখ্যা

## ভারতীয় ধর্ম বনাম সাহিত্য (১)

মহুগুকে উপাসনাশীল জীব বলিয়া সংজ্ঞা নির্দেশ করিলে অভ্যক্তি হইবে না। পৃথিবীর পৃষ্ঠে যে স্থানেই মহুগুসংঘ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সকলের মধ্যে এই উপাসনার লক্ষণ দেখা যায় বলিয়া, আধুনিক ধর্মবিজ্ঞান এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছে না। মনোবিজ্ঞান যেমন ক্রমে সম্পূর্ণতার পথে অগ্রসর হইয়া নিখিল মহুগু-মনের অনন্ত একাত্মতা দর্শন করিতেছে, ধর্মবিজ্ঞানও প্রত্যেক প্রমাণপ্রাপ্তির সংগ্রহ এবং সমন্বয় পূর্বক সিদ্ধান্ত করিতেছে যে, মহুগুের এই উপাসনা-বুদ্ধি মূলতঃ এক এবং অখণ্ড। মহুগুকে জীবনমার্গে প্রতিপদেই জগতের বা জগৎব্যক্তির সমু-খীন হইতে হয় বলিয়া, নিজকে প্রতিপদে বাহিরের

প্রচণ্ড অজ্ঞাত শক্তির সমক্ষে ক্ষুদ্র বলিয়া অনুভব করিতে হয় বলিয়া, এই উপাসনা অপরিহার্য্য ভাবে উক্ত অনুভবের সহচর হইয়াছে। এই উপাসনা লক্ষণকে মহুগুের ধর্মবুদ্ধি নামে নির্দেশ করা হয়।

সকল ধর্মের আদি ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে ইহাও দেখা যাইবে যে, উহা সর্বত্র অসহায় মহুগুমনের ভয়, বিমোহ অথবা বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন হইয়াই ক্রমান্বয়ে অভিব্যক্তি লাভ করিয়া আসিতেছে। আদিম অবস্থার তাহার মধ্যে কোনরূপ অনুভূতি, অধ্যাত্মতা কিংবা প্রীতিপবিত্রতার নামগন্ধও মুখ্য হইতে প্যারে নাই। আত্মজীবন উপাসনা আর-দ্বান্দে কেবল ঐ অলমের প্রচণ্ড শক্তির তেজোবুলক স্তবস্তুতি কিংবা বশীকরণের উপায়বুলক মন্ত্রকৌশল অথবা পরিতোষার্থক উৎকোচদান ব্যতীত আর কিছুই নহে। বাস্তবিক উপাস্ত-উপাসকের মধ্যে ভক্তি, প্রীতি, অথবা পবিত্রতার উপর যে একটা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ তাহা নামান্বিতিক মহুগুের সমাজ এবং অব্যাক্সজীবনের ক্রমিক অভিব্যক্তি এবং অভিজ্ঞতার সাহচর্য্য বলিয়াও ধারণা করিতে থাকে।

আরও দেখা যাইবে যে, ঐ ভয়-বিশ্বাসের লক্ষ্য-বস্তু

(১) এই প্রসঙ্গ লেখকের বাসীপহা নামক বিস্তারিত গ্রন্থে “ভারতীয় সাহিত্যের অধোগতি” শীর্ষক অধ্যায়ের অন্তর্গত; এবং গত সনের বিজয়া পত্রিকার আখিন ও কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত “ভারতীয় ধর্ম-বিজ্ঞান ইতিহাস বনাম সাহিত্য” নামক প্রবন্ধের সহিত ক্রমশঃ সঙ্গত।—লেখক।

অক্টোবর ১৯৭১

‘অজ্ঞাত’ পদার্থকে প্রাচীনকালের মনুষ্য কচিৎ ‘এক’ বলিয়া অনুভব করিতে পারিয়াছিল। বিশ্বজগৎ প্রত্যক্ষতঃ বহুধা-বিভিন্ন কার্য্যকারণশক্তির সৌলভ্যলী বই নহে। প্রত্যেকের অন্তরালে কোন ‘একতা’ আছে কি না, এই প্রশ্ন এবং উহার সমাধান মনুষ্যের ক্রমাভিব্যক্ত বিজ্ঞান-বুদ্ধির উত্তর ফল। মনুষ্য অতীতকালের দীর্ঘ জীবনপথে চলিতে চলিতে কচিৎ-কখন ‘সূণ্যকরে’ তাহার সমুদীন হইলেও, উহাকে সজ্ঞানে এবং দৃঢ়ভাবে ধৃষ্টবদ্ধ করিতে পারে নাই। তাহার বিজ্ঞাননেত্রে সমন্বয়শক্তির (Synthesis) বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই জগতের আদিকারণবিষয়ে এই ‘একত্বের অববোধ’ বিকাশ লাভ করিয়াছিল। মানুষ ক্রমে বিকাশমান সামাজিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে এই একত্বের অনুভবে স্থিতির হইয়া উহার সঙ্গে সমন্বয়তাবের ‘পিতৃ’ ‘মাতৃ’ কিংবা সখ্যান্তমধুর রসের সম্বন্ধ অথবা ‘অভেদ-সম্বন্ধ’ পাতাইয়াছে; এবং ঐকান্তিকী ভক্তি ও পবিত্রতার আদর্শে কিংবা রসতন্ময়তার আদর্শে তদপত হইতে পারিতেছে।

এই সমস্ত মনুষ্যের আদিম উপাসনা-বুদ্ধি বা ধর্ম্মবুদ্ধির ইতিহাসের গোড়ার কথা বলিয়া এই বিষয়ে সকল উপক্রমের প্রাকালে তাহার নির্দেশ করা আবশ্যক হইয়া থাকে।

এখন মনুষ্যের এই আদিম উপাসনা-বুদ্ধি দেশকাল-পরিবেশের বাধ্য হইয়া-যে কত বিভিন্ন দিকে কত বিভিন্ন প্রকৃতি অবলম্বনে বিকাশিত হইয়াছিল, এই ক্ষুদ্র প্রসঙ্গে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। উহা কোন দেশে ‘প্রোতপূজা’ বা ‘পিতৃপূজা’রূপে, কোথাও স্বা-বিশ্ব-প্রকট নিসর্গ-শক্তিকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব প্রদান পূর্ব্বক ‘দেবপূজা’রূপে, তন-মন-ধন প্রভৃতি বিষয়ে অন্তর অথবা অন্তর্গত শক্তির উপায় স্বরূপ অভিযুক্ত হইয়াছিল। তবে সমস্ত ব্যাপারের আন্তরিক তথ্যটি এই যে, সমস্তই মনুষ্যের আদিম কারণপিণ্ডাসার বা চরমত্বের বিজ্ঞান

সুধার ফল। অপিচ, প্রাচীন মনুষ্যের পরিবার কিংবা সমাজজীবন, রাষ্ট্রের প্রকৃতি বা তাহার সাহিত্যের মূল গতি উহার প্রভাবেই অপরিহার্য্যভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। সুতরাং, মনুষ্যের এই বুদ্ধি এই প্রচেষ্টা এবং প্রাপ্তির ভালমন্দ বা উচ্চাভ্যস্ততার উপরেই যে তাহার সমগ্র জীবনের মূল গতি নির্ভর করিতেছিল, তাহার বিশ্বাসিত পদার্থের পাপপুণ্য লক্ষণের উপরেই যে তাহার জীবনের পাপপুণ্য উপাদান এবং গতি নির্ভর করিতেছিল, এই কথা আমাদের কাছে নিয়ত ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে ‘সামাজ্য’ একটা কথার উপরে, এবং ঐ কথার বিশ্বাস কিংবা অবিশ্বাস নামক একটা সামাজ্য মানসিক অবস্থার সূক্ষ্ম কাঁটার উপরেই যে মনুষ্যের সমগ্র জীবনের ভাবধর্ম্ম ক্রিয়াফল এবং উহার ভালমন্দের মানদণ্ডটুকু সূক্ষ্মভাবে নির্ভর করিতেছে, তাহাও আমাদের কাছে পুনঃপুনঃ স্মরণ করিতে হইবে। মনুষ্যত্ব, জগৎ কিংবা জগৎকারণের বিষয়ে কোন মনুষ্যের বা সমাজের বা জাতির প্রকৃত ধারণা কি তাহা জানিতে পারিলে তাহার ইহজীবনের ‘মহাদেশা’ নিরূপণ করিবার পথে অনেক বাধাই অপস্থত হইয়া যায়।

আরও দেখা যাইবে যে, এই ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রথমতঃ কেবল আচার অনুষ্ঠানরূপে উপলভ্য হইয়া ক্রমে দেব-পরিভূতির বিভিন্ন উপায় এবং কৌশলরূপেই নানাপ্রকার মনুষ্যজাত আচার গ্রহণপূর্ব্বক অভ্যস্ত জটিলতা এবং অপরিহার্য্যতা লাভ করিয়াছিল; এবং ক্রমে সকল দেশেই একশ্রেণীর লোকের মধ্যে একচেটিয়া হইয়া গিয়াছিল। আদিম মানব-ধর্ম্মের প্রায় সর্বত্র উপাস্ত এবং উপাসকের স্বাধীনতা পুরোহিত। এই পুরোহিতের হস্তে পড়িয়া সকল দেশেই মনুষ্য-মনের সহজসরল ধর্ম্মলক্ষণ নানাদিকে সার্বিক অথবা অর্থহীন গহনতা লাভ পূর্ব্বক প্রত্যেক মনুষ্যসংঘেই অনেক স্থলে এক একটা স্বতন্ত্র জাতির বা সমাজের

হুটি করে। ক্রমে মনুষ্যসমাজে রাজশক্তির উৎপত্তি, অভ্যুদয় এবং ক্রমপরিণতি সংঘটিত হইলেও এই পুরোহিত-শক্তি অনেক সময় উহার সহিত পাণ্টা দিয়া মনুষ্যের ইহকাল এবং পরকাল উভয়ের অধিকার লইয়াই গোপনে গোপনে অথবা প্রকাণ্ড-ভাবে যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে। কখন রাজা, কখন বা পুরোহিত জয়ী হইয়া মনুষ্যের অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। বলিতে কি এই পুরোহিতই পূর্বকালে মনুষ্যের সমস্ত সারস্বত ব্যাপারকে, শিকাদীকার ব্যাপারকে একচেটিয়া করিয়া রাখার দরুণ প্রাচীন মনুষ্যের সাহিত্যও বহুপরিমাণে (অনেক স্থলে নির্মিশেষে) ধর্মের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া গিয়াছিল; অনেক স্থলে পুরোহিতের স্বার্থ এবং স্বার্থসম্পর্কিত উপদেশের গুণ্ডা কিংবা প্রকাণ্ড সংগ্রহ-গ্রন্থ রূপেই পরিণত হইয়াছিল। ক্রমে মনুষ্যের সভ্যতা উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই এই পুরোহিতশক্তি রাজশক্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া গিয়াছে; মনুষ্য দেশসমূহে পুরোহিত রাজাধিষ্ঠিত সামাজিক সাধারণের নির্দোষিত ভূত্বরূপেই পরিণত হইয়া যাইতেছেন। মনুষ্য-অদৃষ্টের একটা প্রধান নিয়ন্ত্রণা এবং পাপ-নিয়তি সৌভাগ্যবান জাতিসমূহের মধ্যে এইরূপ পরিহিত হইতেছে। বহুপরিবর্তী কালের জাতি এবং ক্রম-বিকাশের ফল হইলেও এখানে মনে রাখা আবশ্যক যে, মনুষ্য-সভ্যতার প্রধান গতি এবং প্রবৃত্তি প্রকারান্তরে জন্মজাতগত পুরোহিতের স্বার্থকবল হইতে ধর্ম, সমাজ এবং সাহিত্য প্রভৃতির উদ্ভাবন বই নহে।

এখন এই স্থানে বলিতে হয় যে, বিভিন্ন দেশে কিংবা কালে এই 'ধর্ম' কোন কোন দিকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইলেও, উহার মূল অর্থ-ব্যক্তির কোথাও বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটে নাই। উহার একটা 'সংজ্ঞা' স্থির করিতে হইলে, সমস্ত বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের অন্তরালে অবস্থিত একটা তত্ত্বের নিরূপণ করিতে হইলে, বলিব যে, উহা মনুষ্যের সংজ্ঞাত 'রিপু'-

প্রবৃত্তিগুলির সংযম, এবং জীবনের শান্তি, পবিত্রতা এবং প্রেমপ্রবৃত্তিগুলির অনুসরণমূলক 'উর্দ্ধগতি' বই নহে। পুরোহিত্য কর্তৃক আবিষ্কৃত অনুষ্ঠানাদির মধ্যে উহা সর্বত্র প্রবল হইতে না পারিলেও, এই ধর্ম-সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানকে অবলম্বন করিয়াই মনুষ্যের সমাজ-বন্ধন শক্তি লাভ করিয়াছিল : ধর্মই 'মনুষ্য্য' লাভের সহায় বলিয়া মনুষ্যমাত্রেই যেন মানিয়া চলিতেছিল। স্মৃত্যুং এ যাবৎ মনুষ্যের বাহ্য উন্নতি, শ্রেয়ঃ, কিংবা ঐচ্ছিক ঘটনায়ে, তাহা যেমন এই ধর্মের দরুণেই ঘটনায়ে, তেমন, মনুষ্যের প্রধান অবনীতি, অবগীতি এবং অধঃপাত, বা জীবন-পথে তাহার সমস্ত দৃগিত, স্ফুটিত ভাবও এই ধর্মের গতিকেই ঘটনা আসিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। প্রাচীন মনুষ্যের 'ধর্ম' আদর্শ বিস্তারিত ভাবে কেবল 'আচার' সমষ্টিকেই, প্রকৃত প্রস্তাবে সামাজিকতাকেই অবলম্বন পূর্বক দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া জাতিবিশেষের সমস্ত পাপ, মৃত্যু, অধঃপাতও প্রধানভঃ তাহার 'ধর্ম' হইতে উৎপন্ন। মনুষ্যের হৃদয় তখন নিজের জ্ঞান, কর্ম এবং তাবের বৃত্তিকে পরস্পর কার্য সম্পর্কে পৃথক করিয়া দেখিতে পারে নাই, ধর্মবিধি হইতে সমাজ-বিধিকেও পৃথক করিতে পারে নাই; স্মৃত্যুং কেবল বাহ্যিক আচার সাহায্যেই ধর্মকে ধারণা করিতেছিল। এই কারণে কেবল প্রাচীন-প্রীতি এবং পরাচীনতাই ধর্ম আদর্শের বলবান্ ভিত্তি হইয়া পড়ে। এ স্থলে ইহাও বলিতে হয় যে, পূর্ব-প্রীতি যেমন মনুষ্য-সমাজের প্রবল রক্ষক, অতদিকে উহাই তাহার জীবন-পথে প্রবলতম অন্তরায়। যে মনুষ্য বা যে জাতি জগৎ-গতির সঙ্গে পূর্বাগতির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে, সে-ই সৌভাগ্যবান্। কিন্তু মনুষ্যজাতির সংখ্যায় ভুলনার উহার দৃষ্টান্ত এখনও বহু, এমন কি নাই বলিলেই চলে। ইহা জোরের সহিত বলিতে পারা যায় যে, এই ধর্ম বা উহার আচার আদর্শ হইতেই জগতের অধিকাংশ জাত নিজের পাপভাপ এবং মৃত্যু

অক্টোবর ১৯৭১

তোপ করিতেছে। যে জাতি নিজের অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মধ্যে, নিজের জ্ঞান-ভাব এবং কর্ম-আদর্শের মধ্যে, নিজের ধর্ম এবং আচার-আদর্শের মধ্যে জগৎ-জ্ঞানের সামঞ্জস্য করিতে পারে না, ঐ সামঞ্জস্য ঘটনার বিষয়ে বাহ্যিক ক্ষয় মধ্যে অনতিক্রম্য বাধাসমূহ বর্তমান আছে, বাহ্যিক সমাজনীতি বা আচার ধর্মনীতি অনতিক্রম্য প্রকৃতি এবং অচলতা লাভ করিয়া, তাহাকে অজুতা অথবা ভাবোন্নততার বশবর্তী করতঃ বর্তমানের বিষয়ে অচল অথবা ভবিষ্যতের বিষয়ে অন্ধ করিয়া রাখে, তাহার মূঢ়া অনিবার্য। তাহার রক্ষাভঙ্গ কে উদ্ধারণ করিবে? যেহেতু ধর্ম অপেক্ষা ইহলোকে মনুষ্যের আর কিছুই বড় নহে। ধর্মই মনুষ্যকে ‘অনন্তের সন্তান’ বলিয়া আশ্বাস দিয়া ইহজীবনকে উহার তুলনার মুহূর্ত্ত মাত্র বলিয়া—কেবল ‘শতবৎসরী’ পাট্টা বলিয়া বিশ্বাস জন্মাইয়া তাহাকে ইহজীবনের সমস্ত অপরিহার্য পাপতাপ বেদনার সমক্ষে ‘বে-পরোয়া’ করিয়া তুলিয়াছে! সুতরাং এই ধর্মই যদি অত্মদিকে তাহার চক্রে ধূলি দিয়া কতগুলি সংকীর্ণ মতামত বা অনতিক্রম্য আচার আদর্শের পর্দা তুলিয়া তাহাকে জগৎ বিষয়ে অন্ধ করিয়া রাখিতে চায়, তাহা হইলে মনুষ্যের আর সহায় কে? তাহার রক্ষকই ভক্ষক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিতেছি, জগতের সকল জাতির মধ্যেই এইরূপে রক্ষকটাই ভক্ষক হইয়া পড়ার দৃষ্টান্ত আছে! সকল জাতিই এই পৌরোহিত্য-অধিষ্ঠিত সংকীর্ণ ‘আচার’ আদর্শের অন্ধতা এবং অচলতার বিব-রসে কিছু-না-কিছু হুঁসিপাক তোপ করিয়া থাকে—উহা মনুষ্যের অপরিহার্য রোগ। সৌভাগ্যবান সেই জাতি, বাহ্যিক মধ্যে উহার মাত্রাটুকু কম। কিন্তু এই মাত্রার সাধারণ বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যই এই ক্ষেত্রে তিলকে তাল করিয়া তোলে। যাহা যাহা বাহ্যিক পার্থক্য, জীবিত কিংবা মৃত জাতির মধ্যে, প্রভুত্বাধী বা দাসত্বাধী জাতির পার্থক্যটাই এই ধানে! মনুষ্যের এবং পশুজাতির মধ্যস্থিত পার্থক্য-

টাও এই দ্বন্দ্ব মনে কি? মনুষ্যের ধর্ম তুলনার পতি-শীল; পশুদের ধর্মই একত প্রভাবে হিতশীল—যুগ যুগান্ত ধরিয়া ‘সনাতন’!

মনুষ্যজীবনের সকল বিভাগকেই অবিভক্ত করিয়া এমন কি পরিব্যাপ্ত ভাবে কবলিত করিয়া দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া, প্রাচীন মনুষ্যের নির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান-মূলক ধর্ম-আদর্শ হইতে তাহার সমাজ-সাহিত্য-শিল্পের নিয়ন্ত্রিত পৃথক করা যায় না। উহা মনুষ্যের সমস্ত অবিভক্ত এবং অবিশিষ্ট মনস্তত্ত্বের ওতপ্রোতঃ সম্বন্ধ হইতে উপজাত অথচ একটা ‘একহারা’ (Homogenous) পদার্থ! মনুষ্যের মন ক্রমাগত জীবনের স্রোত্রে এবং জগতের গতি-সঙ্গতে নানাপথে প্রবাহিত হইয়াই বা heterogeneity লাভ করিয়াই তাহার সাহিত্য প্রকৃতিকে অজ্ঞানমূলক ‘সনাতন ধর্ম’ প্রভুত্বের কবল হইতে স্বাধীন করিয়া তুলিয়াছে। মনুষ্যের ইতিহাস বজ্ঞান বা দৈনিকালের অবস্থা-পরিজ্ঞান ক্রমাভিব্যক্ত হইয়াই ‘বিশ্ব-মনুষ্যতা’ ‘বিশ্ব-মতাতা’ এবং ‘বিশ্ব-সাহিত্য’ প্রকৃত অদর্শ-মুষ্টি দর্শন করিয়াছে, এবং নিজ নিজ ‘জাতীয়’ আদর্শের সহিত উহার সঙ্গতি এবং সমন্বয় লক্ষ্য করিতেছে। এখনো ‘জাতীয় মতাতার’ অবস্থাতেই দেশে দেশে এই ‘সনাতনত্বের’ দৃষ্টান্ত আছে! এমন জাতিও আছে, বাহ্যিক ধর্ম কেবল কতগুলি মন্ত্রতন্ত্র এবং অনুষ্ঠান মধ্যেই পরিসমাপ্ত, বাহ্যিক বাস্তব-জগতের ধর্মোচ্চারণসম্বন্ধিত মন্ত্রমাধা ব্যতিরিক্ত আর কোনরূপ সাহিত্য-বিজ্ঞান নাই। ভারত মহাসাগরে এবং দক্ষিণ মহাসমুদ্রের ঘাঁপসমূহে যে সমস্ত অসম্ভাব্য বর্তমান আছে, তাহার কত যুগান্ত ধরিয়া এই পৃথিবীর উত্তর গোলাকর্ষের মনুষ্য মতাতার উপার্জন এবং উহার পরিচর-সংগ্রহ হইতে হ্রস্বতী থাকিয়াই পার্শ্বিক জীবন বাপন করিয়া আসিয়াছে। তাহাদের ধর্মপদ্ধতি মধ্যে এবং বাস্তব-জগতের মধ্যেও একটা যুগযুগান্তাধী অচলতা রক্ষণ করিয়া আসিতে-ছিল। উনবিংশ শতাব্দী হইতেই উহাদের মধ্যে

ইয়োরোপীয় কর্ম-পদ্ধতিগুলি জাতিসমূহের প্রভাব আণত হইয়া, তাহাদের 'সনাতন' ধর্মকে বিচলিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

প্রাচীন মনুষ্যের সমাজ এবং ধর্ম আদর্শের ওতপ্রোত বন্ধনের এই ইতিহাস. উভয়ের এবং সাহিত্যের এই অবিচ্ছেদ্য গ্রন্থি-সংযোগ, অপিত মনুষ্যের সভ্যতাগতি সহকারে ক্রমিক বিশ্লেষণ এবং স্বাভাব্য লাভের এই ইতিবৃত্ত, প্রত্যেক মনুষ্যের শিক্ষার প্রধান অঙ্গ, এবং ঐ শিক্ষাই মনুষ্যজাতির সর্বপ্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করি। কারণ, মনুষ্যজীবনের অর্ধেক ভুলত্রান্তি এবং দুঃখ এই শিক্ষার অভাব জনিত গোড়ামি হইতে, পূর্বাগত জ্ঞানের অভাব এবং সমাজবিধি ধর্মবিধি ও সাহিত্য আদর্শের বিরূপ 'আলঝালাল' পৃথক করার অক্ষমতা হইতেই উদ্ভূত। বলিতে কি, উক্তরূপ গোড়ামি হইতেই এখন বাৎসরিক সভ্যতা-অভিমানী জাতিসমূহের মধ্যেও এইরূপ শিক্ষার সাহায্যটুকু যথার্থভাবে অধিগত কিংবা ঐ কর্তব্যটুকু যথোচিত মতে অনুমত হইতে পারিতেছে না।

মানবের বর্তমান ধর্মগুলির তুলনা মূলক অধ্যয়ন পথেই দেখা যাইবে যে, মানুষ একরূপ জ্ঞানরূত অজ্ঞতার বশবর্তী হইয়াই, 'মনুষ্য' ধর্মের অন্তরঙ্গীয় এবং শাস্ত্রীয় নীতিকে নানাদিকে অবহেলা করিয়াই, কোথাও বা বাহ্যিক অজ্ঞানবিশেষকে অপরিহার্য ধরিয়া, কোথাও বা প্রাচীন গ্রন্থবিশেষকে অপৌরুষেয় বা ঈশ্বরের বাক্য, কোথাও বা ব্যক্তিবিশেষকেই ঈশ্বরের পুত্র বা প্রতিনিধি অথবা ত্রিকালজ এবং সনাতন শাস্ত্র বলিয়া ধারণা পূর্বক পরম্পরের বিষয়ে অসহিষ্ণু এবং ঐকান্তিক হইতে চেষ্টা করিয়াছে এবং নিজের সমস্ত স্বত্বদুঃখের এবং পাপপুণ্যের হ্রস্ব অদৃষ্ট পাকাইয়া বসিয়াছে। এই বেচ্ছাকৃত নাগপাশ হইতে মানুষ শতচেষ্টা সবেও বাধীন হইতে পারিতেছে না।

অল্প কথায় বলিতে গেলে, মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মে আদিম শোণিত-সংঘ হইতে অঙ্গসংগ পূর্বক বেদন

পরিবার এবং গোত্র, গোষ্ঠী এবং বংশবদ্ধ হয় তেমনই জীবন-নীতির বাধ্য হইয়াই গ্রাম-সমাজ গঠন করে। এই সমাজবিধি ক্রমে পৌরোহিত্য-অধিষ্ঠিত ধর্মবিধির সহিত পরস্পর জড়িত বিজড়িত হইয়া এবং 'গাঁট বাধিয়া' উভয়ের সন্ধি এবং বিচ্ছেদের স্বলগুলি পর্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দেয়! উহার বাধ্য হইয়া তাহার বস্তুগতি চরিত্র এবং বাক্যচেষ্টা পর্যন্ত নিরস্ত্রিত হইতে থাকে! মানুষ এই নিরস্ত্রিত শাসনাধীন হইয়া অরণ্যভীত কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। মনুষ্য সভ্যতাসহজে ক্রমে এই গাঁটগুলি একে একে খুলিয়া আপন ভবকে স্বাধীন করিতে চাহিতেছে বই নহে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কত বাধা-বিপর্যয়! কত বুদ্ধ! এবং তাহার জীবনশক্তির কত অপব্যয়! যুগে যুগে মনুষ্য মধ্যে 'জ্ঞানগণ মহাপুরুষ-গণ' অভ্যাসিত হইয়া নানাদিক হানকালের উপযোগী আদর্শে নব-নব 'ধর্মের' খ্যাপন পূর্বক মনুষ্যকে বাহ্যিক 'সনাতনতার' কবল হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বই নহে। তবে তাহাদের চেষ্টাও মনুষ্যের হ্রস্বদৃষ্ট গতিকের অনেক স্থলে যে নব নব বন্ধনের দড়িরাপেই বিপাক লাভ করিয়া আসিয়াছে, তাহাও নিঃসন্দেহে নির্দেশ করা যায়! ঐ আদিম কারণ গিলাগা এবং উপাসনা বুদ্ধির বাধ্য হইয়া হতভাগ্য মনুষ্য নিজের ধর্ম, আচার, সমাজ আদর্শ এবং পৌরোহিত্য প্রভৃতির বেড়া-জালে পতিত হইয়া কতদিকে পাশবদ্ধ এবং পজু হইয়া গিয়াছে। কত রকমের কত দেবদেবতার কল্পনা এবং পূজা অর্চনার ফেরে পড়িয়া কতদিকে ভ্রিয়মান হইয়া চলিতেছে! তাহার কারিক ও মানসিক পরমার্থ এবং স্বপ্নশক্তি কতদিকে ব্যাহত হইয়াছে। প্রকৃত 'মনুষ্য', মনুষ্যের সভ্যতা আদর্শ, মনুষ্যজাতির স্বত্ব-বৃষ্টি এবং জনের স্বত্ব-গতি কতদিকে পাকচক্রে পড়িয়া তাহাকে দেশে দেশে কোথাও বা অযোগ্য, কোথাও বা হিবর, কোথাও বা চিরকালের জন্য পজু করিয়া গিয়াছে। সর্বোপরি তাহার অস্বাভাবিক-ধর্মগর্ভ বা আচার



অগ্রহায়ণ ১০২১

অজ্ঞানের গোড়ারি বৃদ্ধি করিয়া তাহাকে কতদিকে  
অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। উহার ফেরে পড়িয়া পৃথিবীর  
বক্ষঃস্থলে কত রক্তারক্তি, কাটাকাটি, মারামারি এবং  
হলাহলি প্রাচীনতম কাল হইতে মনুষ্যসমাজে  
পণ্ডিতের লক্ষণকে অটল করিয়া রাখিয়াছে। পৃথিবীবাসী  
মনুষ্যের এই ধর্ম-ইতিহাস আলোচনা করিতে বসিলে  
হৃদয়বান মানুষমাত্রই অশ্রুবিসর্জন না করিয়া পারেন  
না। উপায় কি? হতভাগা মানুষ নিজের দেশকাল এবং  
জন্মগত নিয়তির বশেই কত দুর্ভট্ট ভোগ করে,  
তাহার সাহায্য করিবার কে আছে? যেমন ব্যক্তির  
জীবনে তেমন জাতির জীবনেও এই  
এত প্রবল দেখা যায় যে, বিজ্ঞানগর মহাশয়ের ঋয়  
সন্দেহ হয়—বুঝি, ছনিয়ার কোন মালীক নাই। দেবতা  
কি ঘুসাইতেছেন! সামান্য একটা বিশ্বাসের গতি-  
কেই, কেবল সমাজ-আদর্শের গতিকেই কত জাতি  
অনন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে! পৃথিবীর মানচিত্র-  
খানি খুলিয়া বসিয়া এক একটি দেশ-সীমা-নির্দিষ্ট  
মনুষ্যসংঘের অতীত এবং বর্তমান চিন্তা করিলে হৃদয়  
ক্ষমতাহীন দৈন্ত-কারুণ্যে আকুণ্ণ হইয়া উঠে! যেমন  
বলিয়াছি, যুগে যুগে মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া  
কোন কোন দিকে মানুষের হৃৎচক্র পরিবর্তিত করিতে  
চাহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগকেই বা মানুষ কতক্ষণ  
এবং কি ভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছে? এবং  
উহার শুভফল মনুষ্যের অতীত শতসংস্র বৎসরের  
ইতিহাস এবং হৃৎহর্জগ্যের ব্যাপকতার হিসাবে কত  
সামান্য! মানুষ কত ঘীরে ঘীরে প্রকৃত বিজ্ঞানপথে  
অগ্রসর হইতেছে! কত জাতির, কত সমাজের মুখ-  
মণ্ডলে কি অবিজ্ঞাত অত্যন্ত বেদনার আভাস। কত  
জাতির হৃদয়ে নিদারুণ নিয়তি-নিষেধের কি বুক-  
চাপা হাটাকার। কি অভাবনীয় কংকর্তব্য-বিমূঢ়  
দীর্ঘনিশ্বাস। কত জাতির ব্যক্তিমাত্রের মুখেই যেন  
হৃৎসহ হৃৎবেদনা ছায়া ফেলিয়া কালী মাথাইয়া

গিয়াছে! কত জাতির মুখে যেন গাছ-পাখরের বা  
'অহল্যা পাখাণীর' জড়তার, কাহারও বা মুখে কেবল  
সিংহ-ব্যাঘ্র-গজবানরের প্রকৃতিটাই ফুটিয়া উঠিয়াছে!  
অথচ ব্যক্তিমাত্রের যেন 'মুখে আছি', বলিয়া, 'বড়াই  
ধরিয়াই' বসিয়া আছে। ব্যক্তিকে দ্বিজ্ঞাসা করিলে ইহার  
কিছুমাত্র সত্ত্বর পাওয়া যাইবে না—অনেকেই অন্ধ  
এবং কোন দিকেই আশ্রয়গ্রস্ত নহে। কিন্তু  
ইতিহাসকে দ্বিজ্ঞাসা কর, উহাদের ধর্ম এবং  
সমাজবন্ধনের মূলতত্ত্বকে—উহাদের জীবনের মূলতত্ত্বকে  
দ্বিজ্ঞাসা কর, কি ভয়াবহ—কি হৃদয়বিহারক—অথচ  
অজ্ঞানিত হলাহলের পরিণতি! বলিতে হইলে সমস্তই  
মনুষ্যের আশ্রয়। অধিকাংশই স্বধাদ সলিলে ডুবিয়া  
মজার—অশিক্ষা, কুশিক্ষা, দুঃস্বাস্থ্যতা, স্বার্থ-নিয়তি এবং  
অহংকারের অপরিসীম পরিণতি। কোন জাতি  
ঐশ্বর্য্যক ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে এবং পরিবারে-পরিবারে  
ঐশ্বর্য্যাদর্শের অভেদ দেওয়াল ভুলিয়া জীপুরুষ উত্তর  
জাতির চোখে মুখেই স্বয়ং-অন্ধতার তুলি এবং ঘোমটা  
কিয়া একটা পরম-সম্মিলনের বা সমাজ-জীবনের  
আদর্শ পাকাইয়াছে বলিয়া প্রমাণ করিতে ব্যস্ত! কেহ  
নিজের পা কাটিয়া, পায়ে লোহার শিকল পরিয়া পা  
এবং নিজের অর্জ্জবকে পঙ্ক করিয়াই নিষ্পাপ চলাচলের  
পরমোত্তম দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিল বলিয়াই গর্ভিত।  
যে আশ্রয় লাগিয়াছে, কিন্তু চারি সহস্র বৎসর পূর্বে  
কোন পুণ্য পুরুষ চারিদিকে একটা ভাবুকতার কাব্য-  
গভা অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ  
আছে, 'স্বতন্ত্র প্রত্যক্ষ দেহটাকেই রক্ষা করিতে পারিতেছে  
না। কোন জাতি—জগদীশ্বর প্রাচীনকালে পরম পক্ষপাতের  
বশবর্তী হইয়া তাহাকে যে একটা পুঁথি দিয়াছিলেন,  
তন্মধ্যে এইরূপ অগ্ন্যুৎপাতের কোন উল্লেখ নাই, অতএব  
ইহা একটা অমূলক কল্পনা বলিয়া বনে করিতেই চেষ্টা  
করিতেছে। দরদরকা বন্ধ করিয়া এবং চোখ বুজিয়া  
বলিয়া থাকটাই শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছে।

আবার কোন জাতি উহা একটা অপরিহার্য কালধর্মের আশ্রয় ও অদৃষ্টের সৃষ্টি এবং এইরূপে পুড়িয়া মরিতে পারাই একটা পরম 'জাতীয় ব্যক্তিত্ব' ও মাহাত্ম্যের লক্ষণ বলিয়া বিশ্বাস স্থির রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াই পুড়িতেছে! অতদিকে, অনেক জাতিসমূহ কেবল চলৎশক্তির উপর নির্ভর করিয়াই পৃথিবীময় এইরূপ বিশ্বাসীর সুযোগ সন্ধানপূর্বক ঘুরিতেছে! মনুষ্য জাতির এবং মনুষ্য অদৃষ্টের নিত্য সত্য অন্তর ভেদের এই গ্রন্থ! আরও কত দেখিব—কি ভয়ানক—কি ভীষণ নিয়তি! স্বর্গে মর্ত্যে আমাদের সহায় কে!

অথচ এই ছুরদৃষ্টের মূলে কি? বিষয়টিকে নিরপেক্ষ ভাবে এবং স্পষ্টভাবে বুঝিয়া লইবার জন্য এখন সময় উপস্থিত। এত দুঃখ দুর্ভাগ্যক সত্ত্বেও 'বুদ্ধিমান' মনুষ্য তদ্ব্যবস্থা সহিষ্ণু এবং অচল থাকিবার মূল কারণ কি? অল্পকথায় বলিতে গেলে উহা ধর্মকর্তৃক অত্যাচারে অধিকৃত সমাজের আদর্শ! যেমন বলিয়াছি, মনুষ্যের প্রকৃত ধর্মতত্ত্ব একটা স্থির পদার্থ! উহার ক্ষেত্রে মানুষ-মানুষে বিশেষ কোন বিবাদ নাই বলিলেও চলে। অধিকাংশ দুর্গতিই প্রকৃত প্রস্তাবে মনুষ্যের প্রধান শক্তীভূত স্বভাব এবং দায়িত্বের, বা তাহার 'সম্মিলন' আদর্শের ফল! মনুষ্যের পূর্বপ্রীতিনামক মনোবৃত্তির ছিদ্রপথে পৌরোহিত্য কর্তৃক ধর্মের শীল-মোহর অঙ্কিত আচার-ভঙ্গের ফল; সমাজবদ্ধ মনুষ্যের পরস্পর সম্বন্ধের মধ্যে স্বভাব এবং দায়িত্ব নিরূপণ বিষয়ে অবিচারের ফল! দুর্ভাগ্যের বিষয়ে সবলের, অবোধের বিষয়ে বুদ্ধিমানের অত্যাচারের ফল! ধর্ম-অজ্ঞাতের অন্তরালে সুকারিত্ত্ব স্বার্থপরতা, হিংসা এবং অহঙ্কারের নানামুখী পরিণতি।

ভক্তবিশ্বাসিগণের অথবা 'ধর্ম'-আদর্শবাদিগণের এ মূলে একটা গভীর সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, এই দুর্ভাগ্য কেন? যে সকল জাতি ধর্মকে—পরমার্থকে—ভগবানকেই ভাবীবনের মূখ্য লক্ষ্যরূপে

মানিয়া চলিয়াছে পৃথিবীতে তাহাদের এ দুর্দশা কেন? তবে কি জগতের মালিক কেহ নাই, অথবা ধর্মের গতিই বিশ্বনিয়মের বিরোধী? এ মূলে বিষয়টির সকল দিকে দৃষ্টি করা আমাদের পক্ষে অবান্তর হইলেও, বলা অপরিহার্য যে আমরা মনুষ্যের ভাবজীবনের পরমতম দুর্ভাগ্যক এবং গভীরতম সমস্যার সম্মুখেই উপস্থিত হইয়াছি। 'ধর্মজগৎ গহনা গতি', কিন্তু ঐ গতি জগৎগতির বিপরীত বলিয়াও মনে করিতে পারি না। এই মূলে, চিন্তাশীল মনুষ্যের অধ্যাত্ম অনুভূতির ক্ষেত্রে একটা স্মরণীয় দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। বলিব যে, প্রকৃত ধর্মের পথ ছুরতায় ক্ষুরধার; উহা অনেক সময়েই ছুরবগাহ—প্রকৃতির সহিত প্রতীকমান প্রত্যক্ষের বিষম বিরোধ-বিসংবাদে পরিপূর্ণ! এই ক্ষেত্রে আপাতঃ দর্শনের কিছুমাত্র মাহাত্ম্য নাই। অনেক আপাতঃদৃষ্টে ধার্মিক কল্পে অধ্যাত্ম-জগতে প্রচণ্ড অধার্মিক হইয়া পড়িতে পারেন, সকল জাতির অধ্যাত্ম শাস্ত্রই তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতে কিছু-না-কিছু উদ্যম দেখাইয়াছে, স্মরণ্য, বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, এ দুর্ভাগ্য কেন হয়। দুর্ভাগ্য গতিকের মনুষ্যের দেহটাই একদিকে অধর্মের গুপ্ত সহায়! এই দুর্ভাগ্য গতিকেরই মনুষ্যের সমস্ত প্রকাশ্য ধর্ম-ভাব, অনেকমূলে অতর্কিতে কেবল তন-মন-মন প্রভৃতি ইষ্টলাভের জন্য 'চোরাকটাক' বই নহে! তাহার মুখোচ্চারিত 'ভগবান' শব্দের অর্থও তলেতলে মলব স্রাব্য করার উদ্দেশ্য বই নহে! তাহার 'ধর্মবুলিও' অনেক সময় 'আড়ালে-আড়ালে' কেবল লোক দেখাইবার লোক-শাসাইবার বা তর্কযুদ্ধের গুপ্ত-অস্ত্র রূপেই পরিণাম লাভ করে! এ দুর্ভাগ্য প্রত্যেক অধ্যাত্মপথিকের অনুভবগম্য! স্মরণ্য বাহ্যকে আপাততঃ ধার্মিকতা বা ভগবান্ধী বলিয়া বুঝিতেছি, তাহা যে অনেকমূলে আত্মবঞ্চনা এবং বিশ্ব-বঞ্চনার পরিণত হইয়া মনুষ্যকে জগৎপরিচালকের দয়্য হইতেও ইহপরকালে বঞ্চিত করিয়া রাখিবে,

তাঁহার উত্তর দিক খোঁসাইবে, উহা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। ইহা অধ্যাত্ম জগতের সত্য! যেমন ব্যক্তির, তেমন জাতির! ব্যক্তি যেমন কৃতপাপের ফলভোগ করে, জাতিকেও তেমন কৃতকর্মের পাপনিরয় অধোগতি এবং বৃত্ত্য-নিয়তি ভোগ করিতে হয়। এই পথেই ধর্মধর্মী জাতিসমূহের সমস্ত চূর্তাগ্যের স্বল্প কারণটুকু উদ্দেশ্য করা বাইতে পারে। অধ্যাত্মপথে পূর্ণ নাস্তিকতা কিংবা জড়বাদিতা হইতে উহার কিছুমাত্র বেগী বুল্য নাই। এই পথে আরও দেখা যাইবে যে, জাতিবিশেষ কেবল ধর্ম-আচার-তত্ত্ব হইয়াই অপর কোন জাতি হইতে অধিক ধর্মশীল হইতে পারে না। প্রকৃত ধার্মিকের সংখ্যা যখন হুল্লভ উহা যেমন “মহুত্যাগে মহত্রেয় কচ্চিৎ” তখন জাতির বিষয়ে কথাই উঠিতে পারে না। যেমন বলিয়াছি, ধর্ম প্রকৃত প্রভাবে ব্যক্তিগত জীবনের সত্যক সাধনার ফল; মহুত্বের রিপু-প্রবৃত্তিগুলির সংযম-পথে অধ্যাত্ম-ক্ষেত্রে “উর্দ্ধগতির” সাধনা। এই সাধারণতার ক্ষেত্র হইতে পরে-পরে এই ‘পথ’ ‘গতি’ অথবা উহার লক্ষ্য বিষয়ে আরও কত কথা আছে, তাহা এইস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যিক নহে। এখন, এই সাধনার পথে পুরাণকারগণের সেই ‘রূপক’ কথা—‘অপ্সরা’ ছলনার কথাটি সত্য বলিয়া সকল দেশের সাধকগণের আশ্রয়-অনুভূতিই সাক্ষ্যদান করিতেছে। এ ক্ষেত্রে যাহা ‘ধর্ম’ কিংবা ‘ভগবানের’ নামটাই এমন পদার্থ যে, উহার উচ্চারণ মাত্রই নানা বিপদের স্বরূপ হইবে! যে মুহূর্তে ভগবানের নাম করিয়াছে, বা প্রবৃত্তির সংযমপথে কৃতপাপকর হইয়াছে, সেই মুহূর্ত হইতেই তোমার মুক্ত আরম্ভ! তোমার আত্মপ্রকৃতি, সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতি যেন ‘শীকার পলাইতেছে’ বলিয়া বিশ্বণ প্রচণ্ডতা সহকারেই তোমাকে আক্রমণ করিতে থাকিবে! তোমার সংসার—পরিবার—সমাজ আপাততঃ পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইবে! এই সমস্তের বাধা

কিংবা প্রলোভন ছাড়াইয়া উঠা ত দূরের কথা, সর্ব-প্রথম তোমার ‘অহঙ্কার’ টাই সহস্রবৃত্তিতে ছলনা তত্ত্বতা এবং ‘মিথ্যাচার’কে অপরিহার্য করিয়া তুলিবে! এই কারণেই ‘ধর্মের পথ’ ক্ষুরধার! বলিতে কি, জগতে মহুত্যাগের মনেই কোন-না-কোন সময়ে পরমার্থের প্রবৃত্তিটা ‘মাথা উচু’ করিতে চায়, কিন্তু এই ‘বিরোধের’ গতিতে অনেক সময়ে এমন আঘাত-টুকু সামলাইতে না পারিয়াই অনেকে রণাঙ্গনে তলাইয়া যায়! সরল উদ্দেশ্যে ধর্ম-সাধন করিতে বাইয়াও অনেক সময় ঐ অহংকারের ফেঁদে পড়িয়াই কপটতা এবং তত্ত্ব তপস্বিতার আশ্রয় করিতে বাধ্য হয়। যেমন ব্যক্তি, তেমন জাতি!

কোন ‘গতভূগতিক’ আচারের আদর্শই যে মহুত্যা-সম্প্রদায়কে প্রকৃত ধর্মফল প্রদান করতে পারে না তাহা তুলসীদাস প্রভৃতি সকল ধর্মপথিকই বারংবার মাথায় দেখাই দিয়া চীৎকার করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে দেখা যাইবে যে অনেকসময় ব্যক্তি বা জাতি যাহাকে (সরলভাবে) ধর্ম বলিয়াই অনুসরণ করিতেছে তাহাই হয়ত ভিতরে-ভিতরে প্রচণ্ড অধর্ম, অথবা সম্পূর্ণ উদাসীন পদার্থ! উহা হয়ত নিত্য পরিবর্তন-শীল দেশকালের একটা সংকীর্ণ সামাজিক বিধি, অথবা পারিবারিক আদর্শের ‘মংলবা চাল’ বই নহে—বিশ্ব-নীতি, বিশ্ব-নিয়তি কিংবা মহুত্যাগের যুগধর্ম ও যুগনিয়তির সম্পূর্ণ বিরোধী, এবং হলাহল! অধ্যাত্ম-ক্ষেত্রে হুল্লভ মহুত্যাগের জীবনীশক্তির পূর্ণমাত্রায় অপব্যয় এবং ব্যক্তিচার! যাহা জগতের ‘প্রত্যক নারায়ণ’ের, বিজ্ঞানী, তখন (সংশয়গণ বলিতে পারেন) জগতের ‘অপরোক্ষ নারায়ণ’ বলিয়া কেহ থাকিলে তাঁহারও যে দয়া লাভ করিতে পারিবে না, উহাতে কিছুমাত্র বিচিন্তা নাই! সুতরাং এই পথেই প্রসন্নিত ধর্ম-চূর্তিব এবং ধর্ম চূর্তাগ্যের অনেক রহস্যোন্মেষ হয়। এই রূপে মহুত্বের ইতিহাসে অনেক ধর্মতত্ত্বই

(হয়ত প্রথম কিছুকাল হিতকর প্রতীয়মান হইয়া)  
জাতিবিশেষের অপরিহার্য বৃত্তা-নিয়তি রূপেই টাড়াইয়া  
বাইতেছে। “A good custom has corrupted the  
world !” বলিতে কি এক কালের “A good religion  
has corrupted the world !”

কুর্ত্ত ধারা নিষিদ্ধা হুর্ত্তায়া

হুর্গং পথন্তং কবরো বদন্তি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশীকমোহন সেন।

## গুণী কে ?

গুণী বলে আপনায়ে ভাব অনিবার।  
আপনার নহে গুণ, গুণ বিধাতার।  
যখন যখন আসি, আসিবে তোমার,  
বিজ্ঞা, জ্ঞান, গুণ তব কেড়ে নিয়ে যার।  
অপরে করিবে দান বিধাতা সে সব, -  
অস্ত্রে হ'বে দার্শনিক—অস্ত্রে হ'বে কবি।  
কিবে যবে জন্ম হ'বে, হ'তে পারে এই।  
বুর্খ বলে পায়ে তোমা ঠেলে সকলেই।  
যাহারে নিগুণ বলি হাস মনে মনে।  
হতে পারো কোনো জন্মে শিষ্য সে চরণে !  
শ্রীহর্গামোহন কুশারী।

## চন্দ্রকান্ত প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিচার সভা।

(৫)

আজকালকার দিনে বৈজ্ঞানিক আলোকমালা  
সমুদাসিত হাবভাববিলাসতদ্বিময়ী বারনারী তাও-  
বিত, রক্তরসের তরলরস বদীর রক্তরসের তথাকথিত

নাটক নাটিকার অভিনয়-ও উচ্চাষ নৃত্যগীতাদির  
দর্শন প্রবণে একান্ত পরিতৃপ্ত, নিতান্তপক্ষে সেই সকল  
“পেশাদারি” “থিয়েটারগুলির বর্তমান হাঙ্গামনক,  
অপকষ্ট অহুসরণ-প্রয়াসী ‘ব্যবসাদার’ যাত্রাওরাণা-  
দিগের যাত্রা বা গীতাভিনয় দর্শন প্রবণে বিরুদ্ধ-কৃতি,  
এমন একশ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা-  
দিগের অনেককেই ‘অশিক্ষিত’ বলিয়া উড়াইয়া দিবার  
উপায় নাই’ পরন্তু যাহারা দলেও নিতান্ত খাটো নহেন ;  
তাহারা প্রাচীন যাত্রাওরাণা ‘গোবিন্দ অধিকারী’  
প্রভৃতি এমন কি পরম ভক্ত কবি মুকুট পায়ক  
“নালকঠের” নামে তনিলে পর্য্যন্ত স্রগার নাসিকাভুঞ্জন  
এবং কর্ণে অঙ্গুলিপ্রদান করিতে মুহুঃমাত্র বিলম্ব  
করেন না। এই শ্রেণীর শ্রোতা বা দর্শক কেয়লমাত্র  
চিত্তরঞ্জিনীরতির সেবা করিবার জন্তই নাটকাত্মিনয়  
দর্শন বা সঙ্গীত প্রভৃতি প্রবণের উপযোগিতা স্বীকার  
করিয়া থাকেন। তাহারা প্রাচীনকালের ‘পরিশূর্ণ  
আদর্শ’ ও উপদেশাবলীযুক্ত গীতাভিনয় দর্শন প্রবণের  
মুখ্যতম উদ্দেশ্যটী স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু  
এই ভারতবর্ষের বিশেষতঃ সমস্ত বঙ্গের শিক্ষিত  
অশিক্ষিত হিন্দু অধিবাসীদিগের মধ্যে এমন কি  
প্রতিবাসী মুসলমান মণ্ডলীর মধ্যেও অহুসঙ্কান করিলে  
দেখা যাইবে যে, ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব সমাজনীতির শাসন-  
ন্যত্র ও আদর্শ চরিত্রের পবিত্র উজ্জল মধুর ভাবগুলি  
একমাত্র সার্বজনীন ‘যাত্রা’ ‘কথকতা’ প্রভৃতি দ্বারা  
নিজের প্রভাবটী বিস্তৃত করিতে পারিয়াছিল। আজ-  
কালকার দিনের এই আড়ম্বরপূর্ণ নাট্যাভিনয়ের সহিত  
তুলনা করিলে ‘কথকতার’ প্রতি আপাততঃ অপ্রজ্ঞা প্রদর্শিত  
পারে সত্য, কিন্তু তাহাচার্য্য এ দেশের যে সকল  
উপকার হইরাছে তাহা স্বীকার করিবার উপায় নাই।  
ঠিক এইরূপ আর একটি পরম উপকারী প্রাচীন  
প্রকার প্রতি আমাদের বর্তমান শিক্ষিত সমাজের  
একটু বিজ্ঞকতাব দোষেতে পাওয়া যায়। সেই প্রথাটী

অগ্রহায়ণ ১৩২১

এ দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিচারসভা। অবশ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিচারসভা বর্তমানে কোনও নৃ-  
ণীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে বর্তমান সময়ে প্রতীচ্য নিয়ম অনুসারে এই দেশে যে সকল সভাসমিতির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহাদের কতকগুলি অপরিহার্য্য অঙ্গ কিছু নূতন রকম দাঁড়াইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন, সঙ্গীত, শ্রীতিউপহার, কদাচিৎ ফটো, ফুলের মালা, পান-চুরুট, চা বা কদাচিৎ তাহারও ছুই চারি ধাপ উপরে;— সে বাহ্যহটক, ফলতঃ সময়ের পরিবর্তনে রীতিনীতির পরিবর্তন অবশ্যস্বাভাবী। তাই বলিয়া একটা গুরুতর পরিবর্তন, অন্ততঃ মৌলিকব্যাপারে. এখনও (ততটা) লক্ষ্য হইতেছে না। আগেকার দিনে সামাজিক বিচার সভার যে রীতি প্রচলিত ছিল, শাস্ত্রীয় বিচার সভারও সেই রীতিই প্রচলিত ছিল। ‘তর্কবাদ’ উভয় সভাতেই হইত, এখনও তাহাই হইয়া থাকে। বলিতে লজ্জা বোধ হয় তর্ক বা ‘দলদলি’ বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জাগত। এখনও আছে তখনও ছিল; নূতন সভাসমিতিও তাহার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে নাই। যাহা হউক, এই উপলক্ষে কাহাকেও আক্রমণ করা বর্তমান প্রবন্ধলেখকের উদ্দেশ্য নহে; তবে এ ক্ষেত্রে কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিচার সভাই দেশ-কালরীতির অনুসরণ করিতে বাধ্য হইয়া অথবা নিম্নাভাজন হইতেছে কেন? এই প্রশ্নটি শিক্ষিত সমাজের গোচর করিবার অধিকার সকলেরই আছে। সুতরাং আমরা ও বিনীত ভাবে তাহারই অবতারণা করিতেছি মাত্র। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের বিচার সভার ধারণাটি আমাদের শিক্ষিত সমাজ যে তাবে পোষণ করিয়া থাকেন, প্রকৃত পক্ষে সেইরূপ নহে। আগেকার দিনের কথা বলিতে চাহি না, যে সময়ে এদেশের সকল সভাই বিশিষ্ট সভ্য দেশের আদর্শ সভার প্রতিচ্ছবি করিতে সমর্থ হইত। বড় বেশী দিনের কথা নহে, যে সময়ে এদেশে “বাদ”

বিচারের (১) সমধিক প্রচলন ছিল, সেই বাদ বিচার সভার আদর্শ আমরা একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছি। এখনকার “বিতণ্ডা বিচার” সভার আদর্শকে উদ্দেশ্য করিয়া যদি শিক্ষিত সম্প্রদায় বিচার সভা মাত্রের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন তবে নিতান্ত অবিচার করা

(১) “বাদ” “জল্প” ও “বিতণ্ডা” নামক ত্রিবিধ বিচার দার্শনিকগণের অভিমত।

(ক) যে বিচারে জ্ঞানবান তত্ত্বদর্শী গুরু, জ্ঞান-পিপাসু শিষ্য, অথবা সত্যাত্মবোধী পণ্ডিতমণ্ডলী বিজিগীষা পরিহার পূর্বক কেবল সত্য নিরূপণের জন্ত প্রমাণাদির উপস্থাপন করতঃ স্বপক্ষ বা প্রতিপক্ষের সমর্থন করেন তাহার নাম “বাদ বিচার”।

(খ) যে বিচারে বাদী বা প্রতিবাদী স্বীয় স্বীয় পক্ষ স্থাপনের জন্ত বিজিগীষা পরতন্ত্র হইয়া (স্ব পক্ষের অধৈর্যতা বৃদ্ধিতে পারিলেও) পরপক্ষে দোষারোপ পূর্বক কেবল স্বপক্ষ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন তাহার নাম “জল্প বিচার”।

(গ) যে বিচারে (সত্য নিরূপণের আকাঙ্ক্ষা দূরে রাখিয়া) বিজিগীষা পরতন্ত্র হইয়া বাদী বিপক্ষে কেবল দোষারোপ করিয়া থাকেন তাহার নাম “বিতণ্ডা বিচার”।

বর্তমান সময়ে ‘বাদবিচারের’ স্থান ‘জল্প বিচার’ ও একরূপ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। এখন ‘বিতণ্ডা’ বিচারেরই পূর্ণ প্রভাব! এইজন্য মূলপ্রবন্ধে জল্প বিচারের নামোল্লেখ করা হয় নাই। সুতরাং ‘জল্প’ ও ‘বিতণ্ডা’ বিচারের ফল প্রতিপক্ষ-নিরাস আর ‘বাদ বিচারের’ ফল সত্যসিদ্ধান্ত প্রকাশ।

এসম্বন্ধে বাঁহারা বিশেষ জ্ঞানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহর্ষি গোতম প্রণীত ‘ভায়দর্শন’ ও ত্রীহর্ষ প্রণীত খণ্ডন খণ্ডখ্যাত নামক দার্শনিক গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন। —প্রবন্ধ লেখক।

হইবে। সেই 'বাদ' বিচার সভার আদর্শটাও স্বরণ করিতে হইবে। যখন কোনও শাস্ত্রার্থের সন্দেহ উপস্থিত হইত, সেই সময়ে প্রতিখনানা পণ্ডিতগণ পরিষৎ গঠন করিয়া যথামতি শাস্ত্রার্থের আলোচনা করিতেন। ধর্মনির্ণয় আবশ্যক হইলে প্রাচীন ঋষিগণ যেমন একত্র সমবেত হইয়া তত্ত্ব নিরূপণ করিতেন, সেই আদর্শে ইদানীন্তন পণ্ডিত সমাজও বাদবিত্তিতে বিচার করিতেন, তাহাতে পক্ষপ্রতিপক্ষের মধ্যে কোনও প্রকার দলদলির ভাব, হিংসা ঘেঁষাতির ভাব প্রকাশ পাইত না, সম্ভাবনাও ছিল না; এবং বর্তমান সময়ের বিতণ্ডা বিচার সভার জায় সভামণ্ডপটি 'হট্টক্রেতে' পরিণত হইত না। ধীর ও স্থির ভাবে পণ্ডিতগণ প্রকৃত শাস্ত্রার্থের আলোচনা করিতেন, যে সকল ধর্মশাস্ত্রা ধনবান ব্যক্তি সভা আহূত করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই শাস্ত্রজ্ঞ ও শাস্ত্ররসিক থাকিতেন তাঁহারা স্বয়ং সেই সকল বিচার শুনিতেন। যদিও তাহাতে পণ্ডিতগণের প্রতিভার তৎপরতম প্রকাশ পাইত সত্য, কিন্তু তাঁহারা প্রতিভা প্রকাশ করিবার জন্য বর্তমান অধিকাংশ বিচার সভার সভাপনের জায় অবৈধ উপায় অবলম্বন করিতেন না। সেই ধীরতা ও স্থিরতার আদর্শ ক্রমে 'বিতণ্ডা বিচারের' প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইতেছিল। যে সময় হইতে এদেশে বিতণ্ডা বিচারের আধিপত্য বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হইল, ঠিক সেই সময় হইতেই যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এমন অধীরতার (?) পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, বা এখনও যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই বিচারসভায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, এরূপ কথা বলা যায় না। তবে এই বিতণ্ডাবিত্তির একটা প্রধান দোষ এই যে, উহা বিচার সভার বিচার্য বিষয়ে জয়পরাজয়টাকেই সর্বাপেক্ষা 'নিজস্ব' বলিয়া বুঝাইয়া দেয়। তাহার ফলে এই দাঁড়ায় যে, সর্বসাধারণের সমক্ষে শাস্ত্র সিদ্ধান্তটি নিজের বোধ্যতা সিদ্ধান্ত অপেক্ষা অনেক খাট হইয়া পড়ে।

তখন শাস্ত্র অপেক্ষা আমরা নিজেদের বিভাবৃত্তি অভিমানটাকেই বড় করিয়া তুলি। বিতণ্ডাবিত্তি ইহাই সর্বাপেক্ষা বড় দোষ; তা ছাড়া দস্ত বা অভিমান অপবা সভাস্থলে সংঘের অভাব প্রদর্শন প্রভৃতি আত্মবন্দিক দোষ মাত্র। এই সকল দোষে বাদী প্রতিবাদী এমন কি অনেক সময় মধ্যস্থ পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন; এবং স্থানে স্থানে বিচার সভা যে প্রহসন সভার পরিণত হইয়া উঠে, এ সকল দোষই তাহার সর্বপ্রধান হেতু বলিয়া আমাদের ধারণা। এই সকল আত্মবন্দিক দোষে যদিও বাদী প্রতিবাদীরাই শিক্ষিত সমাজের চক্ষে কিছু খাট হইয়া পড়েন, তথাপি শাস্ত্রার্থের অপলোপ দেশের বা সমাজের ক্ষতি তদপেক্ষা যে অনেক গুরুতর হইয়া পড়ে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই সমস্ত কারণে বিতণ্ডা বিচার সভার প্রতি শিক্ষিত সমাজের অশ্রদ্ধা আসিতে পারে, কিন্তু 'বাদ বিচার' সভার প্রতি কিছুমাত্র অশ্রদ্ধা হইবার কারণ দেখা যায় না। পরন্তু বেক্রপ ধীর সংঘের সহিত বাদবিচার হইয়া থাকে, বা পূর্বের তাহার প্রতি শিক্ষিত সমাজের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজ্য বোধ হয় সম্ভব। বর্তমান কঠোর জীবনসংগ্রাম উচ্ছৃঙ্খলতার যুগে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই হউন, আর শিক্ষিত সমাজই হউন, কোনও শাস্ত্রার্থ নিরূপণ করিয়াই হউক, আর সামাজিক সমস্তা মীমাংসা করিয়াই হউক, তাঁহারা পক্ষপাতমূলক দলগঠন প্রণালী পরিত্যাগ পূর্বক বাদবিচার রীতিতে প্রকৃত সিদ্ধান্ত উপনীত হইবার চেষ্টা করিলে দেশের মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা কতটুকু, তাহা চিন্তাশীল পাঠকগণ বিবেচন করিবেন। বিতণ্ডা বিচারের দোষগুলি সংক্ষেপে বলিলাম, কিন্তু ইহার ক্ষতিকও গুণও আছে। যদি বিতণ্ডা বিচারের আত্মবন্দিক দোষগুলি, অনেক সময়ে অনেকের মধ্যে দেখা যায় না। বটে, কিন্তু তাহার দুই দোষটী,—শাস্ত্র অপেক্ষা নিজকে বড় বলিয়া ঘোষণা

অগ্রহায়ণ ১৩২১

করিবার স্পৃহা,—প্রায় সকলের মধ্যেই অস্বাভাবিক পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা সবেও বাহ্যিক বিতণ্ডা বিচারে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তির পরিস্ফুটন অনেক সময় এমন আশ্চর্যরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে যে তাহা বস্তুতঃই প্রশংসনীয়। ঐ সকল পণ্ডিত বিচার সভায় জয়পরাক্রমের চিন্তায় পাঠাবস্থা হইতে জীবনের চরম কাল পর্য্যন্ত একরূপ অস্থির থাকিয়া অধীত বিস্তার একান্ত অস্বাভাবিক ও নব নব তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। বাহ্যিক প্রাণে শেখরাগ্রে উঠিয়া অধীত গ্রন্থের আবৃত্তি ও আলোচনা করিয়া থাকেন, এখনও এমন দুই চারিটা পণ্ডিতের অস্তিত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে। এই শাস্ত্রানুশীলনস্পৃহা ও অধ্যবসায়টী বিতণ্ডা-রীতির উৎকৃষ্ট ফল। আবার বাহ্যিক অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধির সাহায্যে সকল শাস্ত্র আরও করিয়াও বিতণ্ডা বিচারের আকাঙ্ক্ষায় বা আশঙ্কায় সর্বদা শাস্ত্রানুশীলন করিয়াছেন বা করিতেছেন, অথচ বিচার সভায় কিছুমাত্র তথ্য বা অসংঘের ভাব প্রকাশ করিবার যত মানসিক সজ্জার অধীন হইতে নিত্যন্ত লজ্জা বোধ করিতেন, বা ও করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতি লক্ষ্য করিলে আমরা এই বিচার-সভার একটা উৎকৃষ্ট আদর্শ পাইব। যামরা যে মহাত্মার পুণ্য কাহিনী বর্ণনা করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি, সেই আদর্শ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তর্কালঙ্কার মহাশয়, জীবনের অধিকাংশ কাল বিচার সভায় বিচার করিয়াছেন। কালদেশের নিয়মানুসারে তিনি বিতণ্ডাবিচারই বেশী করিয়াছেন বটে; কিন্তু এক দিনের জন্যও তাঁহাকে কেহ দণ্ড প্রকাশ করিতে বা অসংঘের ভাব প্রদর্শন করিতে দেখে নাই। তিনি প্রাচীন ঋষিদিগের জ্ঞান ধীরে ধীরে হস্তগত করিয়া বিচার করিতেন। তাঁহার প্রতিপক্ষ বিচার শেষে তাঁহার সম্মুখে হিংসা, ঘেঁষ বা ভীষণতার পরিবর্তে এমন একটা প্রীতিমধুর প্রকার ভাব আহরণ করিয়া লইয়া যাইতেন যে, বিতণ্ডা বিচারের সেরূপ ফল বড় দেখা যাইত

না। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সমসাময়িক পণ্ডিতবর্গের মধ্যে এই শ্রেণীর সৌম্য-স্বভাব পণ্ডিত আরও কয়েকজন ছিলেন, এখনও তাঁহাদের দুই চারি জন বর্তমান আছেন। ‘দুই চারি জন’ বলিলাম এই জন্য যে বর্তমান সময়-কার নব্য পণ্ডিত শ্রেণীর এই সকল ‘বাল্য’ একরূপ নাই বলিলেই হয়। দেশে প্রচলিত কণ্ঠকণ্ঠার অভাব হেতু ‘সভা’ই প্রায় নাই, বিচার ত দূরের কথা। যদিও দুই চারিটা সভা কোনও বৎসর সম্ভবপর হইয়া উঠে, তখন আমরা সেই সকল বিচার-রীতির উপর ‘তথ্য-কথিত’ দোষগুলি আরোপিত করিয়া শিক্ষিত সমাজের অশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার চেষ্টা পাইয়া থাকি, কদাচিৎ বা তাঁহাদেরই অনুকরণে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিয়া থাকি, যদিও তাহাতে প্রায়ই কোন নূতনত্বের গন্ধ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। ইহার একদিকের ফল বড় ভাল হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। এখন আর তেমন একাগ্রতার সহিত শাস্ত্রানুশীলন করিতে কাহাকেও প্রায় দেখা যায় না। পল্লবপ্রাণিতা দ্বারা বিচারসভায় জয়লাভ ঘটত না, এখন তাহা দ্বারাও আমাদের কাজ চলিয়া যাইতেছে। আমাদের মনে হয় এদেশে আবার বাদবিচারের প্রবর্তনা আবশ্যিক। অন্ততঃ বিতণ্ডা বিচারও যদি দোষশূন্য হইয়া চলিতে পারে, তাহাতেও লাভ ছাড়া ক্ষতি হইবে না। আমরা অনেক সময়ে বাহিরের মোলারের আদর্শের অনুকরণ করিতে গিয়া নিজেদের পরম হিতকর মৌলিক প্রণয় উচ্ছেদ করিতে এতদূর ইতস্ততঃ করিতে জুলিয়া যাই। কোনও প্রাচীন আদর্শের যদি কোনও অংশে দোষ থাকে, তবে সেই দোষটুকু বর্জন করিয়া লহলেই আমরা তাহাকে কার্য্যক্ষেত্রে খাটাইয়া লাভবান হইতে পারি কি না, সেই বিচার করিবার পূর্বেই ‘সম্মতি-সরি’ তাহাকে ‘বাতিল’ করিয়া দিলে কি অনেক সময়েই আমাদের গণকে ঠকিতে হয় না?

আমরা এই প্রবন্ধে অনেক অসঙ্গত কথার আলোচনা করিয়া পাঠকগণের বিরক্তি জন্মাইয়া দিতেছি; কিন্তু



কথাটা যখন উঠিয়াছে তখন আরও দুই একটি বিচার সভার বিবরণ না লিখিয়া উপসংহার করিতে পারিতেছি না। অল্প দেশের কথা বালিতে ঢাছি না, পূর্ববঙ্গে ঢাকা চাঁদপ্রতাপ রোয়াইলের রাজমোহন রায় মহাশয়ের বাড়ীর বিচার সভা, এবং পশ্চিমবঙ্গে উলা বামনদাস বাবুদের বাড়ীর বিচার সভা, বিগত একশত বৎসর মধ্যে বিশেষ প্রাণচি লাভ করিয়াছিল। এই দুই স্থানেই ক্রিয়া উপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের নিমন্ত্রণ হইত, এবং রীতিমত বিচার সভা হইয়া, বিচার হইত, সেই সকল বিচারের ফলাফল অল্পসারে পণ্ডিতগণের 'সহচার' বা শ্রেণী নিরূপিত হইত। যে পণ্ডিত দ্বিতীয় বিচারে যোগ্যতার পরিমাণ পুনঃ নির্দ্ধারিত হইবার সুযোগ না হইত, সেই পর্য্যন্ত সেই সকল পণ্ডিত দেশের প্রায় সর্বত্র উলার বাবুদের বা রোয়াইলের বাবুদের বাড়ীর নীমাংসিত 'সহচার' অল্পসারে বিদায় পাইতেন। রোয়াইলের বাবুদের জমিদারীর আয় যে খুব বেশী ছিল তাহা নহে, কিন্তু আমরা শুনিয়াছি, রাজমোহন বাবু তাঁহার জননীর শ্রাদ্ধে সোনার দানসাগর এবং ধাতীর শ্রাদ্ধে রূপার দানসাগর করিয়াছিলেন! ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের মধ্যে যীথারা রোয়াইলের বাবুদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ না পাইয়াছেন তাঁহার। নিককে হুঁতগা বলিয়া মনে করিয়াছেন।

রাজমোহন বাবু বিচার সভার জন্ত পৃথক্ পৃথক্ স্থান নির্দ্ধাচন করিতেন, একত্র সকল শাস্ত্রের বিচার সভা বসাইয়া ভাষাশা দেখিবার মত প্রস্থান্ত তাঁহার। ছল না। তিনি নিজে বিচার শুনিতেন, এবং তাঁহার পরমবন্ধু ভারতের গৌরব মনোমোহন ঘোষ ও লালমোহন ঘোষের পিতা বার রামলোচন ঘোষ বাহাদুর মহাশয় প্রচার সাহিত বিচার সভায় যোগদান করিতেন। তিনও একাধারে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং পাশ্চাত্য শিক্ষিত উচ্চ রাজ-কর্মচারী ছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় রোয়াইলের বাবুদের বাড়ীতেও বিচার করিয়া বশবী হইয়াছিলেন।

বাহা হউক পূর্ববঙ্গে, ময়মনসিংহ, মুন্সীগাঁ, সেরপুর প্রভৃতি স্থানের জমিদার বাড়ীতেও বিচার সভা আহুত হইত। অল্পদের মহাশয়গণও অনেক সময়ে বিচার সভা আহুত করিয়া পণ্ডিতগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। ঢাকা ও ভাগাকুল, ত্রীনগর, ভাওয়াল প্রভৃতি স্থানেও বরিশাল কলসকাটির বাবুদের বাড়ীতে ক্রিয়া উপলক্ষে পণ্ডিতদিগের বিচার সভা হইত। তখনকার দিনের বিচার সভার প্রতি লোকের একটা প্রজ্ঞা-মাণ্ডিত পবিত্র ধারণা থাকিত, এখনকার দিনের কথা বলিবার প্রয়োজন নাই!

বাহা হউক, আমরা যে সময়কার কথা আলোচনা করিতেছি সেই সময়ে দেশের পণ্ডিত শ্রেণীর অবস্থা মোটের উপরে ভাল ছিল। বড় পণ্ডিতের সংখ্যাও কম ছিল না, বিচার করিয়া যোগ্যতানুসারে 'সহচার' হইত বলিয়া পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগতার ভাবটীও বেশ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইত। সেই প্রাতঃস্মৃতির ৪ তর্কালঙ্কার মহাশয় নিজের চারত্রেয় বিশিষ্টতাটুকু রাখিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে দেশে এবং অনেক বিচার সভায় অনেকেই বিচার ক, তাঁহার জীবনে অনেকবারই বিজ্ঞা বুদ্ধি ও স, পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে কিন্তু তিনি কখনও এ বিচলিত হন নাই। আমরা তাঁহার কয়েকটা বিচার সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়া অভ্যর্থনা মত বিদ্যা গ্রহণ করিব।

ঢাকা নবাবপুর নিবাসী ৩৮মদন মোহন বসাক তাঁহার পিতৃপ্রজ্ঞ উপলক্ষে তর্কালঙ্কার মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহ জেলার মাজ একখানা পত্র ছিল। তখন তর্কালঙ্কার মহাশয় সেরপুর অধ্যাপনা আরম্ভ করিয়াছেন। তখনও ঢাকা রেলপাড়ী হয় নাই। তর্কালঙ্কার মহাশয় সুখী গৃহস্থ, ও জমিদার শ্রেণীর সাহচর্য্যে বর্দ্ধিত বলিয়া পাকী করিয়া সেই প্রাণে গিয়াছিলেন। অধ্যক্ষ ছিলেন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ চাক



বঙ্গাব্দ ১৩১১

সুভাঢ়া গ্রাম 'নিবাসী' ও কলকাতা সার্কভৌম মহাশয়।  
বিক্রমপুরের প্রধান 'সার্ক' ও কলকাতা সার্কভৌম মহাশয়ের  
অন্ততম প্রধান ছাত্র, ঢাকা 'নংগা' নিবাসী ও হরিশ্চন্দ্র  
তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট দায়ভাগের  
একটি পূর্ণপত্র করেন। সেই সভায় মহামহোপাধ্যায়  
ও তারিণী চরণ শিরোমণি মহাশয় ও বিক্রমপুরের প্রধান  
বৈদ্যাসিক মহামহোপাধ্যায় ও প্রসন্ন তর্করত্ন মহাশয়  
স্বাক্ষরিত করেন। বিচারে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জয়লাভ  
হয়। সভায় কলকাতা সার্কভৌম মহাশয়ও উপস্থিত  
ছিলেন। সে দিন তর্কালঙ্কার মহাশয় সেই সভায়  
বিশেষরূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন। তখনই পাট, তাঁহার  
পাথের ব্যয় না কি প্রায় ৮০ টাকা পড়িয়াছিল। তিনি  
সেইজন্য কিছু লজ্জিত হইয়া বলিয়াছিলেন "আমি নিতান্ত  
অসমর্থ বলিয়া এতটাকা পাথের পড়িয়াছে। আমি ঢাকা  
পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে এইমাত্র প্রথম নিমন্ত্রণ পাইয়াছি,  
সুতরাং পাথের বিষয়ে চিন্তা করিবার অবসর আমার  
টে নাই। আমি নিশ্চয় হইতেও যদি পাথের বহন করিয়া  
স্বপ্ন সম্মান লাভ করিবার অবসর পাই তথাপি তাহাতে  
কিছু নহি।" বলা বাহুল্য, কর্তৃপক্ষ অতি সন্তুষ্ট হইতে  
সম্পূর্ণ পাথের বহন করিয়াছিলেন এবং বিক্রমপুরের  
প্রধান সার্কের সহচার চৌদ্দ আনি বিদ্যায় তাঁহাকে  
দেওয়া হইয়াছিল। সেই জিরাতে নাকি ২০ টাকা  
'সহচার' ছিল।

ইহার কিছুকাল পরে আর একবার ভাগ্যকুলের  
ভাগ্য-লক্ষ্মীর বরপুত্র কুণ্ড বাবুদের বাড়ীতে তর্কালঙ্কার  
মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়া যান। সেই সভাতেও কলকাতা  
সার্কভৌম মহাশয় প্রমুখ বিক্রমপুরের প্রধান পণ্ডিত-  
মণ্ডলী, বিক্রমপুরের প্রধান বৈদ্যাকরণ ও পীতাম্বর  
বিদ্যাক্ষর মহাশয়ের স্রবোণ্য পুত্র শ্রীমাদচরণ স্বতীভূষণ  
মহাশয় দ্বারা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট 'প্রাচ্য  
বিবেচক' একটি পূর্ণপত্র করা হইয়াছিল। তর্কালঙ্কার  
মহাশয় সেই সভাতেও জয়লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু

নব্য পণ্ডিত শ্রীমাদচরণ স্বতীভূষণ মহাশয়কে তিনি  
একান্ত প্রাণসংকট এবং সভায় লজ্জাবাদ প্রদান করিয়া  
সম্মানিত করিয়াছিলেন। বিক্রমপুরে বোধ হয়  
তৎপর আর দুটি একটীর বেশী বিচার  
তাঁহাকে করিতে হয় নাই। ইতঃপর তিনি  
সকল বিষয়ে বিচারেই প্রায় মধ্যস্থতা করিতেন।  
ময়মনসিংহ গেলোকপুরের শ্রীযুক্ত "কুমার" বাহাদুরের  
উপনয়ন উপলক্ষে তর্কালঙ্কার মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়া-  
ছিলেন। সেই সভায় বিচার-কেশরী ও কলকাতা সিদ্ধান্ত-  
বাণীশ মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিচার হইয়াছিল।  
সিদ্ধান্তবাণীশ মহাশয় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রতিভার  
সম্পূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় ইহাদেরই  
বাড়ীতে ও সোনামণি বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন  
করিয়া গিয়াছেন, ইহা সত্ত্বেও তাঁহার উদীয়মান প্রতিভা  
সিদ্ধান্তবাণীশ মহাশয়ের অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল,  
বোধ হয় এজন্যই এই বিচার অমুষ্ঠান। এই অবসরে  
শ্রীযুক্ত কুমার বাহাদুরের পিতা স্বর্গীয় রাজা হরিশ্চন্দ্র  
বাহাদুরের সংস্কারাগার ও পণ্ডিত-বাৎসল্য সত্ত্বে  
হ' একটি কথা বলা অপ্ৰাসঙ্গিক হইবে না। উক্ত রাজা  
বাহাদুর বর্ষাকালে প্রায় সপ্তদ্বিহী নৌকায় বাস করিতেন।  
তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিয়াছেন, ময়মনসিংহ হইতে নৌকা  
ভাঙ্গাইয়া রাজা বাহাদুর প্রায়ই জামালপুরে যাইতেন,  
এবং সেরপুর হইতে স্বর্গীয় তর্করত্ন মহাশয় এতদূর তাঁহাকে  
নৌকায় আনাইয়া ৫ দিন ৭ দিন রাখিয়া শান্তালোচনা  
করিতেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিয়াছেন, রাজাবাহাদুর  
বেশ ভাল সংস্কৃত জানিতেন, এবং যখন যে পণ্ডিতকে  
নিকটে পাইয়াছেন, তাঁহাকেই শাস্ত্রীয় কথা জিজ্ঞাসা  
করিয়াছেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিয়াছেন, রাজাবাহাদুর  
একজন দস্তর মত 'ব্রাহ্মণ পণ্ডিত' ছিলেন।

সুভাগাহার জমিদার বাড়ীতে অল্প এক বিচারসভায়  
কলিকাতা নিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও বংশধর বিজ্ঞান মহা-  
শয়ের সহিত বিচারে তর্কালঙ্কার মহাশয় বশোভাভ করেন।

কলিকাতা উত্তরপাড়ার মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় ককনাথ ভায়রপানন মহাশয়ের নিকট তর্কালঙ্কার মহাশয় পূর্বপক্ষ করিয়াছিলেন, বিচারে তিনি যথেষ্ট সময় লাভ করিয়াছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় নবদ্বীপ হইতে পাঠ সমাপ্ত করিয়া ভাটপাড়া হইয়া দেশে ফারিয়াছিলেন, সেই সময় ভাটপাড়া নিবাসী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতচূড়ামণি পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রাখাল দাস ভায়রপানন মহাশয়ের সহিতও তাঁহার বাদাধের আলোচনা হইয়াছিল। ভায়রপানন মহাশয় তর্কালঙ্কার মহাশয়কে প্রীতি, প্রজ্ঞা ও মেহের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এইরূপ সুবদ রাজধানীতে শিবপুর নিবাসী প্রধান স্মার্ত স্বর্গীয় তারাকান্ত ভায়রপানন মহাশয়প্রমুখ পূর্ণ-ময়মনসিংহের পণ্ডিতবর্গ প্রাণনাথ বিজ্ঞানর মহাশয় দ্বারা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট একটি পূর্বপক্ষ কথাইয়া-ছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় তাহার উত্তর করিয়াছিলেন। এই প্রকার কত সভায় ও কত বিচারে যে তাঁহাকে পূর্ববাদী ও উত্তরবাদী হইতে হইয়াছে, কত বিচারে যে তাঁহাকে নিরপেক্ষ মধ্যস্থের আসন গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তাহার সকল সংবাদ আমরা অনেকেই অবগত নহি; কিন্তু চরিত্রের বিশিষ্টতাই তিন আগাগোড়া রক্ষা করিয়া বাইছে পারিয়াছিলেন বলিয়া সকলেই তাঁহার প্রতি অশেষ প্রজ্ঞা প্রকাশ করিতেন। একবার সুবদ রাজধানীতে অত্র একটি ক্রিয়া উপলক্ষে নবদ্বীপের প্রধান স্মার্ত মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত বিজ্ঞানর মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সভায় তাহার নিকট প্রজ্ঞা বিবেকের একটি পূর্বপক্ষ হইয়াছিল। সেই সভায় তর্কালঙ্কার মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞানর মহাশয় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অধ্যাপক। পূর্বে নিরপেক্ষ ছিল, সভায় উপস্থিত হইয়া উপস্থিত থাকিলে গুরু নিকট উপস্থাপিত পূর্বপক্ষের উত্তর ছাত্রেরাই প্রদান করিতে চেষ্টা পাইতেন, তদনুসারে তর্কালঙ্কার মহাশয়ও অতি বিনয়ের সহিত উক্ত পূর্বপক্ষের উত্তর করিয়া গুরু পণ্ডিতমণ্ডলীর

নিকট অমুমতি প্রার্থনা করিলেন,—কিন্তু পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে অমুমতি দেওয়া সম্ভব বোধ করিলেন না যেহেতু বিদেশীয় পণ্ডিতগণের সহিত বিচার কালে দেশীয় পণ্ডিতগণের সর্বদাই একপক্ষ হয়। থাকিবার রীতি বঙ্গদেশে বহুকাল হইতেই প্রচলিত ছিল। এই অবস্থায় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রতি কেহ কেহ বিরক্তি প্রকাশ করিতেও ভুলিলেন না, অগত্যা তিনি নিরন্তর হইলেন। সেই সভায় বিজ্ঞানর মহাশয় অগ্রপুণনেত্র ও বাপ পদগদ কণ্ঠে তর্কালঙ্কার মহাশয়কে আলীকাদ ও বস্তুবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন, “আমি বস্তু যেহেতু ‘চন্দ্র’ আমার ছাত্র, এবং আমি আরও বস্তু যে উপাস্ত পণ্ডিতমণ্ডলী আমার নিকট হইতে যে উত্তর পাইবার প্রত্যাশা করিতে পারেন না, আমারই প্রিয়তম শিষ্য ‘চন্দ্র’ নিকট হইতে সেই উত্তর প্রাপ্তির সম্ভাবনা করিয়া আমাকে সমধিক গৌরবাবিত করিয়া তুলিয়াছেন।” বিচার শেষ হইল। বিজ্ঞানর মহাশয় উত্তর কারলেন।

একণে আমরা যে কতগুলি বিচার সভায় উল্লেখ করিলাম, বা এইরূপ শত শত সভায় বিবরণ আমরা যাহা অবগত আছি, কৈ তাহাতে ‘তথাকথিত’ অসভ্যতা, উচ্ছৃঙ্খলতা বা প্রহসন ত দেখিতে পাইতেছি না? আমাদের শিক্ষিত সমাজের লক্ষ্যভূত বিচার সভায় এ হেন দুর্দশার জন্ম কেবল পণ্ডিতমণ্ডলীই দোষী, অথবা সভাপ্রাধান্যকারী কর্ম-কর্তাদিগের উপযুক্ত ব্যবস্থা, গুণগ্রাহিতা, ও শাস্ত্রাত্মকতার অভাবও তাহার জন্ম দায়ী, সে বিষয়টী স্মৃতিসমাজের বিচার-সাপেক্ষ বলিয়া আমাদের এখনও ধারণা রহিয়াছে।

( ক্রমশঃ )

ঐকালীক সিদ্ধান্তশাস্ত্রী

## আগণে

বধূ,

ধরেছি তোমারে আলি  
বামালে!  
মুকোচুরি পড়লো ধরা  
কোথা যাবে গীতধড়া  
কত আর থাকবে শ্রাম!  
সামালে?

কালিন্দীর কলকলে  
খেলা কর কত ছলে  
কত বা নৌপের তলে—  
তমালে!  
কত বা জঁকাল রাজা  
কখনো রাঙ্গল-সাজা  
বাশরী বাজাও—তাজা  
ভামলে!

আলি,

ধরেছি তোমারে কান্ন  
বামালে!  
তুচ্ছ পুচ্ছ লীরে পর  
কত উচ্চ গিরি ধর  
কত সাজো গদা-চক্র-  
কমলে!  
নীরদে তোমার কান্তি  
সমুদ্রে—বরুণ-শান্তি  
শৈলে তব রুদ্ররূপ  
ভুবি ভূমি! বিশ্বভূপ!  
কমঠ-কটিন ভুবি  
কোমলে!

আলি, তুমি গিরে তোমার বধূ।  
বামালে!

হায়! একি হলো আলা  
সবি বে সবুজ-চালা  
নয়ন ভরিয়া গেল  
ভামলে!

ওধু,

গাহিছে “হলুদে পাবী”—  
("কামলার" প্রিয় সখী)  
গীতধড়া—আগণের  
ভামলে!

শ্রীকলচর দে

## বাল চরিত

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

### দ্বিতীয় অঙ্ক

চতাল যুবতীগণের প্রবেশ

চতাল হু। আনুন বহারাজ, আনুন; আপনার  
সঙ্গে আমাদের মেয়েদের বিয়ে হ'ক।

রাজার প্রবেশ

রাজা। এ কি কাণ্ড!

একাও একাও দালান সব গড়ে বাচ্ছে। একাও  
একাও চেউয়ের কোলে নৌকার মত সব ভু-ক্রেমিমাটা  
টল-বল কচ্ছে। পৃথিবীর সমস্ত জীবুই ব'ব ব'ব ও  
কর্মফল হ'চিত ওভাওত নিমিত্তের অবদান। আমি  
জানি না, এ সকল নিমিত্ত অদূর ভবিষ্যতে আমার ব্যসন  
হ'চিত কচ্ছে কি অভ্যাদর হ'চিত কচ্ছে!

চতাল হু। আনুন বহারাজ, আনুন; আপনার  
সঙ্গে আমাদের মেয়েদের বিয়ে হ'ক।

রাজা। এক জনও বকিগুরুব এখানে নেই, বীণ-  
বারিনী এক জন রমণীকেও দেখছি না! তাই মৌলগ

ও বজ্রের মত কৃষ্ণবর্ণ ভীষণ-বৃষ্টি চণ্ডালিনীগণ রাজপুরে  
প্রবেশ কতে সমর্থ হ'য়েছে।

চণ্ডাল হু। আশুন মহারাজ, আশুন; আপনার  
সঙ্গে আশাদের মেয়েদের বিয়ে হ'ক।

রাজা। আমার কোণে সমগ্র শত্রুপক্ষ উৎসন্ন হয়।  
হুয়া, শব্দ ও অগ্নিদেব সকলেই আমার অধীন। আমি  
যশের যম, ভয়েরও ভয়কারক। কিন্তু কি লজ্জার  
কথা! অবরোধযুক্ত এই চণ্ডালিনীগণ এইরূপ গর্হিত  
বাক্যবান্না আমার অপমান করে গেল।

চণ্ডাল হু। আশুন মহারাজ, আশুন।

রাজা। একি! অশুভশুভি দেখতে দেখতেই অশু-  
হিত হ'য়ে গেল। বাই, এখন অন্তঃপুরে প্রবেশ  
করি।

শাপের প্রবেশ

শাপ। ওহে, কোথায় যাচ্ছ? এই পুরী এখন আমার।

রাজা। মহেশ্বরের মুখ থেকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ  
ক্রোধবহির তায় আমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করে উদ্ধাহন্তে  
সহসা একে বহির্গত হল। অজ্ঞানরাশির তায় যোর  
কৃষ্ণবর্ণ কি ভীষণ দেহ! দত্তপংক্তি ও মুখমণ্ডলই বা কি  
ভীষণ! জ্ঞানবান্ নরন যুগল সর্পে চক্ষুর তায় পিঙ্গল!  
কি ভীষণ আকৃতি! আপনি কে?

শাপ। কি! তুমি আমাকে চিনলে না! আমি  
মধুক ঋষি শাপ—আমার নাম বজ্রবাহ।

রাজা কংসের দ্বারে প্রবেশ করার অল্প অতি বিরূপ  
চণ্ডাল-বেশ ধারণ করে, কপালের মালা গলায় পরে,  
অশানভূমি হ'তে আমি এখানে এসেছি।

কংস। তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব!

সুবর্ণময় গুহা, শৃঙ্গ ও নিকুঞ্জ-শোভিত রমণীয় মৈত্ৰ-  
পর্বত কি কাক-পক্ষ-বাতে কখনও বিচলিত হয়?  
তুমি নিতান্তই উপহাসের পাত্র দেখছি। তুমি কি না হুই  
হাতে সমুদ্রতরঙ্গ বিকোভিত করে মাত্র অঙ্গুলি সাহায্যে  
সমগ্র সমুদ্রবারি পান কতে ইচ্ছা কচ্ছ?

শাপ। আমি উপহাসের পাত্র কি না সময়ে জানতে  
পারবে।

রাজা। একি! দেখতে দেখতে অতর্কিত হ'ল। বাই  
আমিও শয্যা গ্রহণ করে বিষয়াস্তুরে নরন নিয়োজিত  
করিগে।

শাপ। বঃ! যুগ্মিয়ে পড়লে? ওগো অলস্শি, খলতি,  
কালরাত্রি, মহানিদ্রে, পিঙ্গলাক্ষি তোমরা সকলে একবার  
এদিক পানে এস; সকলে মিলে অন্তঃপুরে প্রবেশ  
করি।

চণ্ডাল হু। হাঁ যাচ্ছ গো, যাচ্ছ।

রাজশ্রী প্রবেশ

রাজশ্রী। না—প্রবেশ কতে পারবো না।

শাপ। আপনি কে?

শ্রী। কি! আমাকে চিন্তে পারলে না? আমি  
এই রাজ্যের রাজ-লক্ষ্মী।

শাপ। বটে! আপনি রাজশ্রী, চলে যান। এই  
পুরী এখন আমার হয়েছে!

শ্রী। বটে!

কি বলি মূঢ়! রাজিকাগে অমাকে অগ্রাহ্য করে কার  
বলে লঙ্কার তায় আমার এই পুরীতে তুই প্রবেশ কতে  
যাচ্ছিস? এই পুরী আমার আশ্রিত—প্রবেশ করা  
দূরে থাক তুই এই পুরী চোখেও দেখতে পাবি না।

শাপ। ভগবতা পদ্মালয়ে, কংস-শরীর পরিত্যাগ  
করে আপনি চলে যান। ইহা ভগবান বিষ্ণুর আদেশ।

শ্রী। কি! ইহা ভগবান বিষ্ণুর আদেশ! হায়! হায়!

এখানে এতাদর্শন রয়েছি, তাই রাজাকে ছেড়ে

যেতে আমার ঝড় কষ্ট হচ্ছে। মহারাজ কংস বিবিধ গুণের

আগার। ইহাও আমার আরও কষ্টের কারণ।

উপায় কি? ভগবান বিষ্ণুর আদেশ অতিক্রম করে কার

সাধ্য! বাই আমিও ভগবান বিষ্ণুর কাছেই যাই।

শাপ। রাজশ্রীও চলে গেলেন। বেশ হল। এখন

এই পুরী আমাদেরই আবাস স্থান। অলস্শি, খলতি,

প্রবাহন ১০৭১

কামরাজি, মহানিজে, পিজলাকি, এখন তোমরা অঃপুরে প্রবেশ করে আপন আপন কার্য্য কতে প্রবৃত্ত হও।

চণ্ডাল হু। আর থেকে তুমি ধর্ম্মভট্ট হ'লে।

শাপ। বধুক স্বপ্নির শাপ আজ হতে তোমার শরীরকে আগ্রস্র করে। এখন থেকে তুমি নিত্য অধর্ম্ম-পরায়ণ হলে; তোমাকে এখন আমি গাঢ় ভাবে আচ্ছিন্ন করব। আর তুমিও সমস্ত বিনাশ প্রাপ্ত হবে।

[ অন্তর্ধান।

প্রভাহারীর প্রবেশ

প্রভা। মহারাজের দর হ'ক।

রাজা। কে?

প্রভা। মহারাজ, আমি যশোধরা।

রাজা। যশোধরে, এই যে চণ্ডালিনীরা সব ভিতরে ঢুকে পড়েছিল তা তুমি দেখ নি?

প্রভা। কি! চণ্ডালিনীরা ঢুকে পড়েছিল? যারা সর্বদা মহারাজের কাছে থাকে তাদেরও এখানে প্রবেশ করা দুস্কর, চণ্ডালিনীদের ত দূরের কথা।

রাজা। তবে কি আমি স্বপ্ন দেখেছি? আজ্ঞা যশোধরে, তুমি যাও। বালাকি, তুমি একবার কাঞ্চীকে ডেকে দাও ত?

প্রভা। বখা আজ্ঞা, মহারাজ

[ প্রস্থান।

কাঞ্চীকের প্রবেশ

কাঞ্চী। মহারাজের দর হ'ক।

রাজা। আর্ঘ্য বালাকি; পুরুত (সাংবৎসরিক) ঠাকুর দিগকে জিজ্ঞাসা করুন ত আজ রাত্রে যে ঘূর্ণিবড়, ভূমিকম্প, উল্কাপাত প্রভৃতি হ'ল এই দৈব হুঁপমিষ্ট-গুলির কারণ কি?

কাঞ্চী। মহারাজ, পুরুত (সাংবৎসরিক) ঠাকুর হ'লেনই এই কথা বলেছেন—

রাজা। কি বলেছেন?

কাঞ্চী। শুধু মহারাজ—তারা বলেন,

“যে কামরাজগণী নরেন্দ্র, ভূতগণ নামা কাঞ্চীর হলে নরদৌকে জয়প্রদান করে। কিন্তু এবার যার জন্মে সঙ্গে সঙ্গে ভূ-কম্প ও আকাশে হুমুভিধ্বনি হ'ল তাঁর জন্মে কোন একটা বিশেষ ঘটনা ঘটবে।”

রাজা। কার জন্মে হেঁচু সশৈল বহুদর! এরূপে কল্পিত হ'ল? কেনে আহুন কার পুর হয়েছে, আর তার জন্মে উদ্দেশ্যই বা কি?

কাঞ্চী। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ

মহারাজের দর হ'ক। আমি আগে বা বলেছি জাট ঠিক। ভট্টিনা দেবকীর একটি মেয়ে হয়েছে।

রাজা। অথবা ব্রাহ্মণ বাক্য মিথ্যা হলেও আমি স্বতাই দেখছি। যাও, বহুদেবকে ডেকে নিয়ে এস।

কাঞ্চী। যে আজ্ঞা, মহারাজ

[ প্রস্থান।

রাজা। বহুদেব ধর্ম্মশীল ও সত্যবাদী। আমার কাছে তিনি কখনও মিথ্যা বলবেন না। আজ্ঞা, তিনি দেখি ব্যাপারটা কি।

বহুদেবের প্রবেশ

বহু। ক্রমে ক্রমে ছয়টি ছেলের বিনাশ দর্শন করেও এই শোক-ক্লম শরীর বহন কাচ্ছ। নিষ্ঠুর-কলস আবার ডেকে পাঠিয়েছে। আমাকেও পরাধীন ভূত্যের দায় বেতেই হবে।

হার! শোকের স্বভাবই এই।

রাজা শ্রবণ করলে তার কলমেও বেতে হবে, তার না কলমেও বেতে হবে। উত্তর পক্ষেই বেতে হবে—তারেই হ'ক, আর অভরেই হ'ক।

( অগ্নির হইরা )

শৌরসেনী-পুত্র, বসে আছে না কি?

রাজা। বাদবীপুত্র, এস, বস।

বহু। হাঁ, বসছি; ( বসিয়া ) শৌরসেনীপুত্র, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ কেন?

রাজা। দাদবীপুত্রের কী সন্তান এসব উঠেছে। এই বালকের বাহ্যল্যোগ বলেই এই মেয়েকে কেউ হত্যা করতে পারেনি।

বহু। হাঁ, সন্তান এসব করেছে।

রাজা। কি সন্তান এসব করেছে?

[ প্রস্থান। ]

বহু। (স্বগত) হায়! আমাকেও মিথ্যা বলতে হল! অথবা কুমারের প্রাণ রক্ষার জন্য মিথ্যা বললেও সত্যই বলা হবে। এখন কি করি? আম্মা তাই করা যাক। (প্রকাশ্যে) দেবী! একটি মেয়ে এসব করেছে।

রাজা। মেয়েই হউক আর ছেলেই হউক, বধ আমাকে কতই হবে। পুরুষকার দ্বারা আমি অবশ্যই দৈবকে বঞ্চনা করব।

প্রতীহারীর প্রবেশ

প্রতী। মহারাজের জয় হুক। ভট্টিনী দেবকী বলেছেন, “এটি মেয়ে, মহারাজ কি দয়া করবেন না?”

বহু। শৌরসেনীপুত্র, ছাখিনী দেবকীর এ অশু-রোধটি রাখ। মেয়ের প্রতি মায়ের স্নেহ স্বভাবতঃই বোঁদী হয়ে থাকে।

রাজা। তুমি বধুক ঋষির শাপ শুনে প্রতিজ্ঞা করেছিলে দেবকীর গর্ভস্থ সন্তান আমাকে দেবে, সেই প্রতিজ্ঞা কি তোমার মনে হয় না?

বহু। প্রতিজ্ঞা! প্রতিজ্ঞার কথা বলছি না।

প্রতী। মহারাজ ভট্টিনীকে কি উত্তর দেব?

রাজা। বশোধরে, দেবকীকে এই বলো যে, নির্বন্ধ অতিক্রম করা অসাধ্য। তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আর একটা কিছু করব।

প্রতী। \*যে আজ্ঞা, মহারাজ।

রাজা। বশোধরে, যা বলেছি তাই কর।

প্রতী। নির্বিঘ্নে প্রবেশ করুন।

বহু। আমি গোলমাল একেবারেই ভাল বাসি না। শেষে কিনা আমাধারাত অপরের অপত্য-বিনাশ সংসারিত হল! তবে কি কুমারকে এনে কংসকে প্রদান করব? না! এই কথা পূর্বে করে গিয়েছিল আমার বেঁচে

যাই, গিরে দেবকীকে একটু আশ্বাসিত করি।

রাজা। বশোধরে, নবপ্রহৃত মেয়েটিকে নিয়ে এস।

প্রতী। যে আজ্ঞা, মহারাজ [ প্রস্থান। ]

কন্যা লইয়া ধাত্রী ও রক্ষিণের প্রবেশ

সকলে। আর্ধ্যা, ধীরে ধীরে আশ্বাস—আমরা মধ্যম-ধারে এসেছি।

ধাত্রীর প্রবেশ

ধাত্রী। মহারাজের জয়! আমরা অনেকক্ষণ থেকে এ মেয়েটিকে পাহারা দিচ্ছি।

রাজা। আহা! মেয়েটি ত দেখতে বেশ দাঁড়া! হায়! শেষে আমাকে জীবদণ্ড কত্তে হল।

ধাত্রী। মহারাজ, ধীরে—ধীরে।

রাজা। এই যে কংসশিলা! এখানেই সেই নিষ্ঠুর কার্য শেষ কত্তে হবে!

ঋষি-শাপের বলে দেবকী সপ্তম গর্ভে এই শিশু ধারণ করেছে। ইহার বিনাশেই আমার শাস্তি হবে।

( শিশুগ্রহণ ও শিলাতলে প্রহার )

একি! একি! এক অংশ ভূতলে পড়ে গেল! আর এক অংশ সমুদ্রগম্য শব্দ হতে আমাকে বিনাশ করবার জন্য আকাশে উঠে গেল।

হায়। নিশ্চয় আমাধ বিনাশকাল উপস্থিত হয়েছে। তাই বুঝি ভীতক্রমে শূল ধারণ করে কাগরাদির ভায় রোজবেশে এই বৃষ্টি প্রাচুর্ভূত হল।

পাপপুণ্য কলমাজী সপরিবারা কাত্যায়নীর প্রবেশ

কাত্যায়নী। ওহ, নিশ্চয় ও মহিষাসুরকে বধ করে দেবগণকে নিশঙ্ক করেছে—এখন কংস-বংশ ধ্বংস করার জন্য কাত্যায়নীরূপে বহুদেব-গৃহে জন্মগ্রহণ করেছে।

কুণ্ডোদর। আমার নাম কুণ্ডোদর। আমি অনেক, রূপে আমার প্রচণ্ড প্রভাব। দেবী জন্মগ্রহণ করেছেন

সংস্করণ ১০২১

বলে তীব্র হকার কছি। 'নীল'ই আকাশ হ'তে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হব। বীর্ঘ্য-দর্পিত অশ্রুগুলিকে সাঁহার করাই আমার একাঙ ইচ্ছা।

শূল। আমার নাম শূল। দেবীর প্রসাদে উজ্জল ও চারুবেশ ধারণ করে আমি ভূতলে অবতীর্ণ হব। কার্তিকেয় যেমন বক্ররূপধারী তারকাসুরকে বধ করে সমুদ্র বন্ধ হ'তে দূরে নিক্ষেপ করেছিলেন, আমিও সেরূপ চুরাঙ্গা কংসকে যুদ্ধে বিনাশ করব।

নীল। আমার নাম নীল। আমি কলহের কর্তা। আমি সংগ্রামে সর্বদাই বীরত্ব দেখাই। কদাপি পরাভূত হই না। শক্তির কার্তিকেয় যেমন ক্রৌঞ্চাপুরকে বধ করেছিলেন আমিও সেরূপ যুদ্ধে দুর্জিনীত কংসকে বধ করব।

মনোজব। আমার নাম মনোজব। আমার বেগ বাহুর জ্বর। দেবীর কার্য সাধনের জন্তই এখানে এসেছি। অগ্নি নলবনকে বেরূপ দলন করে, রণক্ষেত্রের সমুদ্র ভাগে যুদ্ধ করে দৈত্যগণকেও আমি সেরূপ দলন করব।

কার্ত্যায়ী। কুণ্ডোদর, শঙ্কুকর্ণ (শূল), মহানল, মনোজব, তোমরা সকলে এদিকে এস। ভগবান গুরু বালাঙ্গীলামুষ্ঠানের সাহায্য কন্তে গোপাল বেশ ধারণ করে আমরা সকলেই বোম-পল্লীতে অবতীর্ণ হব।

সকলে। ভগবতীর আদেশ শিরোধার্য।

[ সকলের প্রস্থান।

রাজা। এই যে রাজি প্রত্যাহ হ'ল।

বাই এখন শান্তি লাভের জন্ত শান্তি-গৃহে প্রবেশ করে বিপুল শান্তিকর্ণের অনুষ্ঠান করিবে। তা'হ'লেই আমারও শান্তি লাভ হবে।

প্রবেশক

বৃদ্ধ গোপালকের প্রবেশ

বৃদ্ধ। ওহে যশদত্ত, যশদত্ত, কুন্তদত্ত, যোষদত্ত, গোধনগুলিকে সামলাও। বৃন্দাবনে প্রচুর জল পান করে ও হুয়া হুয়া রণ করে গরুগুলি সব মাসুছে। চেয়ে দেখ শিং দিয়ে বক্সীকের মূল খুঁড়েছে বলে এই বাঁড়টার শিংয়ে কাল রক্তের কতগুলি সাপ গুড়িয়ে গিয়েছে বোধ হচ্ছে যেন কেহ নীলপদ্মের মালা পরিয়ে দিয়েছে। আবার দেখ আর একটা চাঁদের বত সাদা বাঁড় জাহু ছুটি কুঞ্চিত করে, লেজ উঠিয়ে ও লেজের লোমগুলি ছড়িয়ে দিয়ে কেমন সুন্দরভাবে দৌড়ে আসিছে! মনে হচ্ছে যেন শিংয়ের আগা দিয়ে পৃথিবীটি তুল্লা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে! আচ্ছা, এ বেলা দামককে ডাকি। ওরে দামক, গাইগুলিকে ভাল বায়গার জড় করে বাছুরগুলির সঙ্গে নিয়ে আর।

দামকের প্রবেশ

দামক। আমাদের মনিব নন্দগোপের ঘাসের অভাব বোধেই। ছেলে হওয়ার দিন থেকে ঘাস যেন বিপুল আনন্দে কেবল বাড়ছেই। আচ্ছা, গরুগুলি এখানেই থাক, আমি আমার কাছে বাই। মায়া, প্রণাম কছি।

বৃদ্ধ। তোমাদের ও তোমাদের গোধন সকলের শান্তি হ'ক।

দামক। বাতুল, যে দিন থেকে নন্দগোপের পুত্র জন্মেছে সেদিন থেকে আমাদের গরুগুলির আর কোনই অনুত নেই। গোপেরা সকলেই কেবল আনন্দে আছে। আর যেখানে খাত সেখানেই প্রচুর মূল, যেখানে গুদ্র সেখানেই প্রচুর ফল।

বৃদ্ধ। দামক, এ আর কি আশ্চর্য্য! আরও আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটেছে। নন্দগোপের ছেলে হওয়ার দশ দিন পরে পুতনা রাক্ষসী বশোদার রূপ ধরে তখন বিব বেধে এসেছিল। তারপর ছেলে কোলে করে রাক্ষসী সেই বিবাক্ত তন তার মুখে পুতে দিল অবনি ছেদেও

রাক্ষসীকে চিনতে পেরে বেয়ে ফেললে। মিথ্যা বশোদটাও রাক্ষসীর রূপ ধরে সেখানে পড়েই মরে গেল। তারপর ছেলের বধন এক মাস বয়স হল তখন শকট দানব শকটের রূপ ধরে এল। ছেলেও চিনতে পেরে এক লাধি মেরে শকট চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেললে। সেই রাক্ষসও দানব রূপ ধরে সেখানে পড়ে তখনই মরে গেল। একমাস বয়স হলে পর নন্দ-নন্দন এক বাড়ীতে গিয়ে দুধ, এক বাড়ীতে গিয়ে দৈ, অল্প এক বাড়ীতে গিয়ে ননী, আর এক বাড়ীতে গিয়ে পায়স, অপর আর এক বাড়ীতে গিয়ে খোল খেয়ে বেড়াতে লাগল। গোপিনীরা গোপালের এই দৌরাশ্রো বিরক্ত হ'য়ে বশোদার কাছে এসে সব কথা বলে দিলে। বশোদাও ক্রটি হ'য়ে গোরাল ঘরের গরুবাঁধা দড়ি \* দিয়ে গোপালকে পেটে-পিঠে বেঁধে একটা উছুখলে বেঁধে রাখল। নন্দগোপের পুত্রও উছুখলটি নেড়ে-চেড়ে তখন সুগলরূপী যমলার্জুন ব্রহ্মের মাক খানে ফেলে দিল। এদিকে উছুখলটি ফেলে দেওয়া মাত্রই দেখতে দেখতে গাছ হুটাও ছোড়া লেগে গেল। কান্দে-কাঁদেই উছুখলটাও গাছের ভেতরে আটকে গেল। তখন নন্দগোপের পুত্র দড়িতে এত জোরে টান দিল যে বুলগুড় গাছ হুটা উপড়িয়ে ফেলল আর সেগুলি দানবের রূপ ধরে সেখানে পড়েই মরে গেল। এ সকল দেখে তখন গোপেরা বলতে লাগল, এই শিশু মহাবলশালী, আজ থেকে ইহার নাম দামোদর হ'ক। তার পর ছেলে বধন দৌড়ানড়ি কড়ে প্রাণে এমন সময় এক দিন প্রলম্বাসুর অবিকল নন্দরূপ সেজে এনে সতর্কণকে কাঁধে করে নিয়ে চমূল। সতর্কণও চিনতে পেরে অশ্রুতার মাধার এমন জোরে এক মুষ্টি প্রহার করে যে তার চোখ হুটো কোটর থেকে বেরিয়ে এল, আর দানবের আকার ধরে দৈত্যটাও সেখানেই পড়ে মরে গেল। একদিন দামোদর গোপদের সঙ্গে ভাল আদতে ভাল বনে গেল। তখন গাধার

রূপ ধরে বেহুকাহুর সেখানে এসে উপস্থিত। অশ্রুটাকে চিনতে পেরে তার বাঁ পা ধরে দামোদর তাল পাড়তে লাগল। বেহুকাও তখন দানবরূপ ধরে সেখানে পড়ে মরে গেল। তার পরে ছোড়া রূপ ধরে কেনী বৈভ্য এল। তাকেও চিনতে পেরে দামোদর তার মুখে কজুই চুকিয়ে দিল। তাতে সেই ছোড়া হুট খণ্ড হ'য়ে গেল, আর দানবের রূপ ধরে সেখানে পড়ে মরে গেল। দামোদর যে কেবল এ সকল অসাধ্য কাজই করেছে তা নয়। তা ছাড়া আরও অনেক আশ্চর্য্য কাজ করেছে।

দামক। মাতুল, এসব কথা এখন থাক। দামোদর আজ গোপ-কুমারীদের সঙ্গে রাসকেলি\* কত্তে আসবেন। বৃদ্ধ। তাহ'লে গোপদের সঙ্গে আমিও দামোদরের রাসকেল দেখব।

দামক। মাতুলের যেমন ইচ্ছা।

[ উভয়ের প্রস্থান। ]

### তৃতীয় অঙ্ক

বৃদ্ধ গোপালকের প্রবেশ

বৃদ্ধ। স্বর্ঘ্য উঠতে না উঠতেই প্রতিদিন জগন্নাথ মাতুলপিত্তী অমৃতপূর্ণ পাণ্ডীগণকে অভ্যস্ত আদরের সহিত প্রণাম করবে।

আমাদের মত সামান্য লোকেরও সমৃদ্ধি কম নয়। বাই জাঁকজমক ও আড়ম্বর করে কাপড়চোপড় পরে আসি গে। ওগো গোপকুমারীগণ, ওগো দোষহীন বনমালা, চন্দ্ররেখা, সুপাক্ষী, তোমরা এস।

দোষহীনরূপের প্রবেশ

সকলে। মাতুল, প্রণাম করছি।

বৃদ্ধ। ওগো গোপ-সুন্দরীরা, গরুর হৃথের মত পাণ্ডুবর্ষ সতর্কণ অর গোপকুমারদের সঙ্গে দামোদর এদিকেই আসছে—বোধ হচ্ছে যেম একটা সিংহ ওহা থেকে বেরিয়ে আসছে।

\* চলিত ভাষায় বাকে দাওরইন বলে।

\* মূলে 'হরীসক' পাঠ আছে।



অগ্রহায়ণ ১৩২১

গোপকুমারগণের সহিত দামোদর ও সর্ষপের প্রবেশ

দামো। আহা! গোপকুমারীগণ একেই স্বভাব-  
সুন্দরী। তাতে আবার পরিচ্ছদের পারিপাট্য! কি সুন্দর!

এদের সমস্তই সুন্দর! গায়ের রং চমক চাপার মত,  
মুখ পদ্মের মত, আর চোখ নীলোৎপলের মত,— আবার  
নানা রঙের সুন্দর সুন্দর পোষাক পরেছে! এদের  
কথাগুলিই বা কত মিষ্টি! অলকদাম বনকুসুম  
সাজিয়ে এদিকেই আসছে।

সর্ষ। এই যে গোপালনাগণ এসে পড়েছে দেখছি।

কেহ কেহ রক্তবর্ণ ডিঙিম বাকিয়ে যাচ্ছে, আর  
ডিঙিমের বাজনা শুনে সঙ্কট হ'য়ে অনেকে একস্থানে  
জড় হয়ে হর্ষধ্বনি কচ্ছে। কেহ বা আবার নানাতাবে  
কেলি কচ্ছে! তাদের সকলেরই মুখ পদ্মের মত, আর  
নয়ন পদ্মদলের মত। ঘোষ পল্লীতে হুতা শব্দ শুনে  
উত্তেজিত হয়ে সকলেই বৃন্দারণ্যে এসে নিভান্ত পুলকিত  
চিত্তে গান কচ্ছে।

বৃদ্ধ। প্রভু, সকলেই সাজগোজ করে এসেছে।

দামক। প্রভুর জয় হ'ক।

সর্ষ। দামক, গোপকুমারীরা কি সকলেই এসেছে?

দামক। হাঁ প্রভু, সকলেই কাপড়চোপড় পরে  
সেজেগেজে এসেছে।

দামো। ওগো, ঘোষ সুন্দরীগণ! ওগো বনমালা,  
ওগো চন্দ্ররেখা, ওগো মৃগাক্ষি, ঘোষ পল্লীর অঙ্গরূপ রাস-  
কেলি আরম্ভ কর।

সকলে। যথা আজ্ঞা, প্রভু।

সর্ষ। দামক, মেঘনাদ, তোমরা খোল, পাখোয়াজ\*  
প্রভৃতি বাজাতে আরম্ভ কর।

উভয়ে। হাঁ, প্রভু, এই বাজাচ্ছি।

বৃদ্ধ। প্রভু, আপনারা ত সকলেই রাসকেলি আরম্ভ  
করেন, আমি এখন কি করি।

দামো। কেন? তুমি দেখ।

বৃদ্ধ। বাজা, তাই কচ্ছি।

( সকলের নৃত্য )

বৃদ্ধ। বাঃ! বাঃ! সকলেই বেশ নাচ্ছে, বেশ  
বাজাচ্ছে, বেশ নাচ্ছে, আমিও তবে নাচি। বাবা!  
নাচাও ত কম পরিশ্রম নয়!

গোপালকের প্রবেশ

গোপালক। প্রভু, প্রভু এখান থেকে শীগ্গির  
পালিয়ে যান।

দামো। দামক, তুমি ত ভয় পেরেছ কেন?

গোপালক। প্রভু, পিণ্ডাকার দানব অরিষ্ট বৃষভ  
খুর-প্রহারে পৃথিবাকে দানত করে ক্ষেত্রের ভায় ভীষণ  
গর্জন কতে কতে এদিকে আসছে—তাই তাত হয়েছি।

দামো। বটে! অরিষ্টব্রত এসেছে। তাতে ভয়  
কি? তুমি গোপকুমার ও গোপকুমারীগণকে নিয়ে  
পর্বত শিখরে আরোহণ করে আমাদের বৃদ্ধ দেখ  
গিয়ে। আজ আমি অরিষ্টব্রতের দর্প চূর্ণ করব।

[ সর্ষপ সহ সকলের প্রস্থান। ]

দামো। এই যে ছুরায়া অরিষ্টব্রত!

এহ যে গোবৃষজ! ভীষণ গর্জন কতে কতে অঙ্গুর  
হচ্ছে—ভয়ান্ত গোপগণ ভীতিবিহ্বল হয়ে একতৃটে  
ভারই পানে চেয়ে আছে। ইহার খুর-প্রহারে বরা  
যেন হুঁতাগ হয়ে যাচ্ছে এবং শূলাঘাতে বহুশাবক  
আশ্রিত হচ্ছে।

অরিষ্টব্রতের প্রবেশ

অরিষ্ট। শত্রুবর্ষের নিমিত্ত বৃষজ ধারণ করেছি,  
শূলাগ্রের অসংখ্য কিরণরেখার আকাশ-তল কবিত  
করে, বৃন্দাবনে লীলাবিলাসে গর্জন কতে কতে আজ  
শত্রুকে বিধ্বস্ত করে মুখে বিচরণ করব।

আমার হকার শব্দে এই ঘোষ-পল্লীতে জীলোদক  
গর্ভপাত হয়, অর্ধচন্দ্রাকার আমার খুরপাতে বৃক্ষ ও  
কাননগন্ধুল সমগ্র পৃথিবী কল্পিত হয়।

\* মূলে "আতোজাখি" শব্দের প্রয়োগ আছে। খোল,  
পাখোয়াজের দ্বারা যে সকল বাস্তব চাপড়াইরা বাজাইতে হয়  
তাহাদিগকে 'আতোজা' বলে।

তাইত নন্দগোপ-পুত্র গেল কোথা ? ওহে নন্দগোপ-পুত্র তুমি গেলে কোথা ?

দামো। ওরে গোরুবাধন, এদিকে আর, এদিকে আর। আমি এখানে।

অরিষ্ট। ( অবলোকন করিয়া )

এই বালক বাস্তবিকই বলশালী। আমার স্ত্রীর মহাবলশালী দানবের উগ্ররূপ দেখে এবং ভীষণ গর্জন শুনে বিন্দুমাত্রও ভীত বা বিস্মিত হচ্ছে না। কি আশ্চর্য্য বালকের মনে একটু ভয়ও নাই।

দামো। কি বলে ? ভয় ! ভয়ের নাম ত আর আমি তোমারই মুখে প্রথম শুনলুম। ভীত জনকে অভয় দেওয়ার চক্রই আমি মহীতলে জন্মগ্রহণ করেছি।

অরি। তুমি বালক কি না তাই ভয় জান না।

দামো। ওরে গো বুধন ! বালক বলে তুই আমার অপমান কচ্ছিস্ ! শিশু কক্ষ সর্পের দংশনে কি লোকের মৃত্যু হয় না। বালকবীর কার্তিকেয়ই পুরাকালে ক্রৌঞ্চাসুরকে বধ করেছিলেন।

\* \* \* \* \*

দেখ বুধ, শোন, বজ্রপাতে শৈলশাল। সামান্য পন্নবের স্ত্রীর সমভূমি হ'য়ে যায় ! তুইত কয়েকটি কঠিন উপলের সমষ্টি মাত্র।

অরিষ্ট। নন্দগোপ-নন্দন, তুমি কি করবে ?

দামো। তাকে নিধন করব।

অরিষ্ট। পারবে ?

দামো।। বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই।

অরিষ্ট। বেশ, তা হলে, তোমার অভ্যন্তর শত্রু গ্রহণ কর।

দামো। আমার শত্রু গ্রহণ কভে হবে ! তোর মত দুর্বলের তত্ত্ব গিতিবলের স্ত্রীর কঠিন আমার বহুলয় এই বাহই মধ্যেই। যদি এই ভুল দণ্ড দ্বারা নিষ্পত্তি করে তোকে ভূতলশারী কভে না পারি তবে আমি দামোদর নই।

অরিষ্ট। বেশ, তা হলে মুখে প্রবৃত্ত হও।

দামো। দেখ, গো-বুধন, এই আমি এক পায়ে উপর দাঁড়ালুম, যদি শক্তি থাকে ত আমাকে সরা।

অরিষ্ট। এতে আবার সন্দেহ ! ( সরাসিতে চেঁচাও বর্জিত হইয়া পতন )।

দামো। ওরে গোরুবাধন, আশুত হ, আশুত হ। এই বল নিয়েই অহঙ্কার।

অরিষ্ট। ( একটু প্রকৃতির হইয়া স্বগত ) অহো, এই বালকে তেজ সত্য সত্যই অসহ।

এই বালক হয় রক্ত, নয় শত্রু, নয় স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস ইনিই পুরোষোত্তম।

আ। যেখানেই আমরা জন্মগ্রহণ করেছি ত্রিলোক-পালক মধুসূদনও দানব-নিধনের চক্র সেখানেই অবতীর্ণ হয়েছেন।

যদি বিষ্ণুর হাতে মরি তা হলে আমার অকর স্বর্ণ লাভ হবে, এ হ'তে আর কি সৌভাগ্য হ'তে পারে। স্মৃতরাং মুক্ত করাই প্রেরণ। ( একান্তে ) নন্দগোপপুত্র, আমার আমার দর্প ভেগে উঠেছে।

দামো। হঁ,—আজ্ঞা একটু রসো।

বর্ষাকালে বর্ষণমুক্ত হলেও যেব যেমন জমে উঠে সেটরূপ আমার বাহগত হ'য়েও তুই গর্জন কচ্ছিস। আর, বজ্রাহত অজ্ঞান পক্ষীর মূল দেশেব স্ত্রীর এখনই তোকে ভূতলশারী করব।

এই যে দুঃখা দানব অরিষ্টর্ষভ বজ্র-ভয় শিখরায় গিরি-দেহের স্ত্রীর গতকীর্ণ হয়ে ভূপতিত হ'ল। ইহার নাসিকা, মুখ ও চক্ৰ হ'তে নিঃসৃত রুধিরধারা অসীম বেধে গিয়েছে। ঝুঁটির রোমগুলি কম্পিত হচ্ছে। আর পা গুলিও থেকে থেকে নড়ে উঠছে।

দামকের প্রবেশ

দাম। প্রভু হ'ক, বহুদেব হ'য়ে মহাদানব কালিয় দেখা দিয়েছে পর্বত শিখরে এই সংবাদ শুনে গেয়ে প্রভু সর্বাঙ্গ সেদিকে চলে গিয়েছেন। প্রভু, সর্বাঙ্গকে নিবারণ করুন ! নিবারণ করুন।

জানুয়ারী ১৯২১

হাসিমাখা আঁধিও শুনেছি সর্পসাজ কালির বড়

হাসিমাখা আঁধি আজ তার দর্প চূর্ণ করব।

হুয়াস্তা কালির গোত্রাকর্ণাদি জীবগণকে হিংসা করে,  
আজ থেকে সে শান্ত ও নিস্তেজ হবে। [ প্রস্থান।

( ক্রমশঃ )

শ্রীগুরুবজ্র ভট্টাচার্য্য।

## মায়াময়ী

১

কত কাল দেখিনিকো

তবু যেন মনে হয়,

হাসিমাখা আঁধি দু'টা

প্রাণে ঘোর ভেগে রয়।

ছন্দর-গগনে মম

একি নিতি নিক্রপম

উদিয়াছে উষাকালে

এ যুগল শুকতারী,

নিরমম বসুধায়

যোগ-শোক-বেদনায়

নীরবে ঢালিতে শুধু

আকুল স্রবার ধারা।

কত কাল দেখিনিকো

তবু যেন মনে হয়,

হাসিমাখা আঁধি দু'টা

প্রাণে ঘোর ভেগে রয়।

২

কত কাল কেটে গেছে

সে গেল বিদায় নিয়ে,

তবু যেন সে রয়েছে

দেহে মনে জড়াইয়ে !

পরশন-মধু তার

জোছনা-প্রলেপ-সার

আজো এ তাপিত কার

স্বপ্ন শীতল করে ;

আজো এ অধর-আগে

তপত চূষন আগে—

নিজুত মরমখানি

শিহরে হরষ ভরে !

কত কাল কেটে গেছে

সে গেল বিদায় নিয়ে,

তবু যেন সে রয়েছে

দেহে মনে জড়াইয়ে !

৩

কত কাল শুনি নাই

সুমধুর বাণী তার,

তবু যেন বাজে বুকে

প্রতিধ্বনি অনিবার।

সে যেন আমার কাছে

এখনো বসিয়ে আছে

ভেমতি দিয়েছে খুলে

ছনয়ের সুরধুনী,—

সেই 'কুল'-'কুলু'-ভাষা

সেই সাধ সেই আশা

প্রেমের প্রাবন সেই

অনন্ত জীবন চুনি'।

কত কাল শুনি নাই

সুমধুর বাণী তার,

তবু যেন বাজে বুকে

প্রতিধ্বনি অনিবার।

৪

অগ্নি মায়াময়ী দেবী,

একি মারা-সীলা তব,

আকুল অবাচ্ হয়ে

চেয়ে রই সুনীরব !

সবে ভাবে বহু দূরে

তুমি আছ সুর-পুরে—

ভাবি আমি হবে তাই

গেহ মোরে একা ফেলি—

আবার দেখিতে পাউ

তুমি ছাড়া আমি নাই

কত কাছে আছ তুমি

সব বাধা অবহেলি !

অগ্নি মায়াময়ী দেবী

একি মায়ী-লীলা তব.

আকুল অবাচ্ হয়ে

চেয়ে রই সুনীরব !

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

## লাভোয়ালিসিয়ার রাসায়নিক গ্রন্থ

( বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বিগত কলিকাতা

অধিবেশনের বিজ্ঞান শাখায় পঠিত )

আমরা যে প্রসঙ্গ আলোচনার বৃত্ত হইতেছি, তাহাতে অনেক অবান্তর কথাও বলিতে হইবে; নহিলে, কন্ঠীর কর্মজীবন বিশেষভাবে পরিপূর্ণ হইবে না, কারণ, তিনি বিজ্ঞান-জগতের যুগান্তর সংঘটক, সমগ্র রাসায়নবিদগণের কর্মের বিচক্ষণ সমালোচক ও বিচারক এবং পরিমাণাত্মক রাসায়ন শাস্ত্রের আবিষ্কর্তা; অতএব, পাঠকবর্গের একটু বৈধাধারণ পূর্বক অবহিত হিঁতে পাঠ করিতে হইবে।

লাভোয়ালিসিয়ার রাসায়ন শাস্ত্রের মৈত্রিক। তাহার পরিমাণাত্মক সভ্য, রাসায়নের ভায়শাস্ত্র। তাহা ও

সাহিত্যে যেমন প্রবেশ ও সম্বন্ধ আছে, তেমনি রাসায়ন রসায়নী-বিজ্ঞান ও নব্য রসায়নী-বিজ্ঞান মধ্যে প্রবেশ ও সম্বন্ধ আছে। প্রাচীন রসায়নী-বিজ্ঞান, ভাব প্রকাশের উপায়ের ক্রমবিকাশের ফল বা ভাষা, আর নব্য রসায়নী বিজ্ঞান তাবের ক্রমবিকাশের ফল বা সাহিত্য। ভাব স্রষ্টা, ভাষা সৃষ্ট। আবার, ভাব ও ভাষার সম্বন্ধসীতুত সময়র বা নিম্নাংশই সাহিত্য। ভাষা সাহিত্যের সৃষ্টি করে, আবার সাহিত্যের আশ্রয়ে ভাষা আত্মরক্ষা করে। বাস্তবের ভাষার সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, সে সাহিত্য স্নাতন হইয়া থাকে, মানব-চিন্তা-সমূহ যখন বিভিন্ন বিষয় অবলম্বন করিয়া ভাষার সাহায্যে পোক-সংক্ষেপে আত্ম-প্রকাশ করে, তখন হইতে সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ব্যাকরণ যেমন ভাষার ভায়শাস্ত্র, তেমন এই পরিমাণাত্মক রসায়ন, প্রাচীন রসায়ন শাস্ত্রের ব্যাকরণ বা সংঘম। ব্যাকরণ ভাষার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশ্লেষণ, অস্থি, মজ্জা, মেদ, মাংস, শিরা, স্নায়ু প্রভৃতির পরীক্ষা।; ভাষার প্রয়োগ সম্বন্ধে নৈপুণ্য ও অভিজ্ঞতা জন্মিলে ভাষার অন্তর্নিহিত সূত্র-সমূহ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হয়। ভাষা ব্যবহার করিতে অভ্যাস করিয়া এবং ভাষার প্রয়োগ দেখিয়া ভাষার মধ্যে যে, ব্যাকরণচর্চা প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, সুজ্ঞানার্থে সেই প্রণালীর আলোচনা এবং তাহার নিয়মসমূহ ও বৈয়াকরণিক রীতি-গুলি আবিষ্কার করিতে হয়। তাহাকে আয়ত্ত করিবার পর ভাষার মৌলিক উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করিয়া ভাষার সাধারণ নিয়মগুলি অর্থাৎ ভাষার সূত্র বা ব্যাকরণ শাস্ত্র বাহির করিতে হয়। চিন্তাশক্তির বিশেষ বিকাশ না হইলে, এই বিশ্লেষণ-কার্য যেমন সমাধা হইতে পারে না কারণ প্রকৃতপক্ষে ইহা ন্যায়শাস্ত্রের কার্য, তেমন রসায়নে নৈপুণ্য ও অভিজ্ঞতা না জন্মিলে—সর্বোৎকৃষ্ট পরীক্ষাত্মক বিশ্লেষণ না জন্মিলে এই রসায়নশাস্ত্রের ভায়শাস্ত্রের পরিমাণাত্মক অধিকার জন্মিবার

অধ্যায় ১০৭২

সত্যবাদীরাই; সুতরাং উপরিউক্ত ভাষাশিক্ষাপ্রণালীর প্রাচুর্যসায়নী বিজ্ঞা শিক্ষা করিতে হইবে। যেরূপ বাক্য-রচনার নৈপুণ্য জন্মিলেই ভাষা আয়ত্ত হইতে পারে এবং সর্বোৎকৃষ্ট ভাষার সাহায্যে এবং তাব প্রকাশের প্রণালীর উৎকর্ষে ভাষার পরিপুষ্টি সাধিত হইলেই সাহিত্যে বৃৎপত্তি জন্মে, নতুবা নহে। সেরূপ বিশ্লেষণ প্রণালীতে বিশেষ নৈপুণ্য জন্মিলেই পরিমাণাত্মক বিজ্ঞান আয়ত্ত হইতে পারে, নতুবা নহে। অতএব, পরিমাণাত্মক বিজ্ঞানই, “রাসায়নিক সাহিত্য।”

বস্তুর অবিনশ্বরত্বের উপর সমগ্র রসায়ন শাস্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত। পরিমাণাত্মক-সত্যরূপ বজ্রলেপদ্বারা প্রকৃত নব্য-রসায়ন-মন্দিরের ভিত্তিস্বরূপ “বস্তুর অবিনশ্বরত্ব” অর্থাৎ পরমাণুর ধ্বংস বা হ্রাস বৃদ্ধি নাই এমত মহাজ্ঞানী লাভোয়্যাসিয়েই বিশেষভাবে আলোচনা বা বিকাশ করিয়া গিয়াছেন। লাভোয়্যাসিয়েই এই ভিত্তিকে পরিমাণাত্মক পরীক্ষামূলক সত্যে পরিণত করিয়া রসায়ন শাস্ত্রকে পরিমাণাত্মক শাস্ত্রে পরিণত করিয়াছেন। সুতরাং তিনিই এই সিদ্ধান্তের প্রকৃত প্রচারক এবং নব্য রসায়নী-বিজ্ঞান স্থষ্টিকর্তা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

জার্মানীর ষ্টাল ও বেকার, ইংলণ্ডের জোসেফ প্রিষ্টলী ও হেনরী ক্যাবেন্ডিশ, স্কটলণ্ডের জোসেফ ব্ল্যাক, সুইডেনের শীলে প্রকৃতি সুপ্রসিদ্ধ রাসায়নিক-গণই মহাত্মত্ব লাভোয়্যাসিয়ের নিকট চিরঞ্জী ও জীহার শিষ্যে আবদ্ধ। তাঁহারা সকলেই অন্ধের হস্তিদর্শনের দ্বারা হাতড়াইয়া বেড়াইতেছিলেন—রসায়ন শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম গ্রহণে সমর্থ হন নাই। পাঠক, এরূপ অন্ধবিশ্বাস কখনই রাখিবেন না যে, লাভোয়্যাসিয়ে কেবল পরের আবিষ্কৃত বিষয়গুলি আত্মসাৎ করিয়া জড়িয়া গাঁথিয়া বা অর্ধ-সংস্কার করিয়া রসায়নকে নূতন ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি অসাধারণ বী-শক্তি সম্পন্ন উচ্চশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক ছিলেন

এবং কোন বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া তাহার প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সে সময় বিজ্ঞান-জগতে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। কারণ, ভাষাই প্রথম, ব্যাকরণ পরে। ইহা স্বাভাবিক নিয়ম।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষে বস্তু অনশ্বর এবং পরমাণু-সমষ্টিদ্বারা গঠিত এই মত চলিয়া আসিতেছে। মহর্ষি কপিল বলেন, “নাবশ্বণো বস্তু সিদ্ধিঃ” অর্থাৎ পূর্কায়িত বস্তু না থাকিলে আপন হইতে বা স্বতঃ কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না। বৈশেষিক দর্শনকার মহর্ষি কণাদ বলেন, “জড় পদার্থের পরমাণু যাত্রেই, আর পরমাণু সমষ্টিরূপ ঘটপটাদি সাবয়ব দ্রব্য আনিত্য।” আমাদের দেহও প্রকৃত পক্ষে নশ্বর নয়। মৃত্যুর পর, যে পঞ্চভূতের সমবায়ের ইহার স্থিতি হইয়াছিল, সেই পঞ্চভূতেই পুনর্বার লীন হয়, অর্থাৎ “পঞ্চতত্ত্ব প্রাপ্ত” হয়। আবার বৈশেষিক দর্শনের অনেক পূর্বে ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে জানা যায় যে, “মৃত্যুর পর দেহ মৃত্তিকাতে লীন হয়”। অতএব, হিন্দু ও গ্রীক দার্শনিকদের মতে পৃথিবীর বাণতীয় পদার্থ পঞ্চভূত (স্থল ও স্থল) সমবায়ের স্থিতি হয়; এবং বিনাশ হইলে পুনরায় তাহা পঞ্চভূতে পরিণত হয় অর্থাৎ স্থিতি পঞ্চভূতের সমন্বয়, এবং বিনাশ পঞ্চভূতে পরিণয়। সময়ের পৌর্কায়িত্য বিচার করিলে প্রতীয়মান হয় যে, ভারতে এই মত অনেক পূর্বে প্রচলিত ছিল। উপরিউক্ত সিদ্ধান্তে বস্তুর অবিনশ্বরত্ব বেশ স্পষ্টরূপে স্থচিত হইতেছে। ভারতের প্রাচীন দার্শনিকেরা কল্পনা, যুক্তি ও অনুমানের সাহায্যেই কেবল সত্যের সন্ধান করিতেন বলিয়া অনেকে দোষারোপ করিয়া থাকেন। এই দোষারোপের ভিত্তি যে কতদূর পোক্ত তাহাও সাহস করিয়া বলা কঠিন। কেন না প্রকৃত সত্যই নিত্য—অপ্রকৃত সত্য অনিত্য। যেমন “ব্রহ্মলেনপ” নামক সিনেট বা আন্তরের দ্বারা ভারতের প্রাচীন হিন্দুরাদি প্রকৃত হইত বলিয়াই “সহস্রাবৃতবর্ষহারী”

হইয়া রহিয়াছে। আর, প্রাচীনেরা পঞ্চভূতকে আবার  
মূল ও হ্রস্বরূপেও বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাও একটা  
বিশিষ্ট প্রমাণরূপে বোধ হয় গণ্য হইতে পারে।  
অতএব, তাঁহাদের জ্ঞান যে কেবল গোপন পরিমিত  
হানেই আবদ্ধ ছিল, তাহাও বলা যাইতে পারে না।  
তবে, প্রাচীনিক গ্রন্থাদির অভাবেই হউক, কিংবা বিস্তৃত  
জ্ঞানের লব্ধিরূপে টীকা-বর্জিত মূলস্থিত বিপর্যয়-কঠিন  
রূপ প্রাচীর দ্বারাও অবরুদ্ধ থাকিতে পারে। অতথা.  
বিশিষ্ট প্রমাণভাবে শ্রেষ্ঠতা আরোপ করিলেও  
পক্ষপাতিত্ব করা হয়—সেও দোষ; কেন না, বেদের  
বদেশ-বিদেশ নাই, বেদ সার্বভৌমিক। তবে, দেখা যায়,  
অজ্ঞান, পর্যবেক্ষণ, ও পরীক্ষণ এই তিনের সমবায়ের  
“বিজ্ঞান”—অজ্ঞানই আবার বিজ্ঞানের ভিত্তি।  
অজ্ঞানকেও অবজ্ঞা বা প্রত্যাখ্যান করিলে চলে না।  
কারণ, ভিত্তিহীন সৌধ নিশ্চিত হইতে পারে না।  
অজ্ঞান যতদিন পর্যন্ত পরীক্ষিত তথ্যের বিরোধী না  
হয়, ততক্ষণ উহা গ্রহণীয়। সচরাচর কোন বিষয়ের  
তথ্য উদ্ঘাটন বা কারণ অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি হইয়া  
তৎসংক্রান্ত বিবিধ ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে  
সত্যই নানারূপ অজ্ঞান করিতে হয়। এই অজ্ঞান  
সাহায্যে ঐ সকল বিষয়ের বিশেষরূপে কারণ নির্দেশ  
হইলে ‘অজ্ঞান’ ক্রমশঃ সত্য বলিয়া গৃহীত হয়। কিন্তু,  
তৎপরে আবার নূতন নূতন ঘটনা পর্যবেক্ষণ কালে  
উক্ত অজ্ঞান দ্বারা সত্ত্বোৎপন্নক মীমাংসা না হইলে  
উহা অমূলক প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে, তখন আর সত্য  
বলিয়া আদর হয় না। অতএব, হিন্দু দার্শনিকদের  
কার্য্যতঃ পরীক্ষার অভাবেই হউক, বা অত্র যে কারণেই  
হউক, তাঁহাদের মধ্যে “বস্তুর বিনাশ নাই” এই  
মহাসত্যের বিশেষ আলোচনা বা বিকাশ হয় নাই, দেখা  
যাইতেছে; সুতরাং ‘লাভোরাসিয়েরকেই’ এই সিদ্ধান্তের  
প্রকৃত প্রচারকর্তা এবং নব্য-রসায়ন-শাস্ত্রের ‘অমরদাতা’  
বীকার করিতে হইবে।

এই বস্তুর অবিনশ্বরতা প্রমাণ করিবার জন্ত  
লাভোরাসিয়ের নিম্নলিখিত পরীক্ষাটি করিয়াছিলেন।  
একটা কাচনির্মিত বকযন্ত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাঙা বা  
নীলা গ্রহণ করিয়া যতক্ষণ রাঙা গলিয়া না গিয়াছিল  
ততক্ষণ পর্যন্ত বাতাস যন্ত্রে উত্তপ্ত করিয়াছিলেন।  
উত্তাপ বশতঃ যে পরিমাণ বায়ু সহিগত হইয়া গেল,  
তিনি তাহা সংগ্রহ করিয়া ওজন করিলেন তৎপরে,  
বকযন্ত্রের সর্ব মুখ গলাইয়া বন্ধ করিয়া ওজন করিলেন  
বদ্ধাবস্থায় বকযন্ত্রকে পুনরায় উত্তপ্ত কারতে লাগিলেন  
এবং ক্রমে রাঙা রাঙা-ভস্মে পরিণত কারতে লাগিলেন।  
বকযন্ত্রের ভিতরে বায়ু যত বেশী থাকিবে রাঙাও  
তত বেশী পরিমাণে ভস্মে পরিণত হইবে। যখন আর  
রাঙা রাঙা-ভস্মে পরিণত হইতেছে না তখন (এমন  
অবস্থায়) বকযন্ত্রকে ঠাণ্ডা করিয়া পুনরায় তাহার  
ওজন লইলেন। তাহাতে দেখিলেন, তাহার ওজন  
বাড়েও নাই, কমেও নাই, ঠিক সমানই আছে। যদিও  
রাঙা রাঙা-ভস্মে পরিণত হইয়াছে, যদিও এখানে একটা  
রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হইয়াছে, তথাপি রাসায়নিক  
ক্রিয়ার পূর্বে এবং পরে ওজন ঠিক আছে।

বকযন্ত্র ঠাণ্ডা হইলে পুনরায় তাহার সর্ব মুখ খুলিয়া  
ফেলিলেন, এবং তখন দেখিলেন বাহিরের বায়ু সশব্দে  
বকযন্ত্রের ভিতরে প্রবেশ করিল। কেন প্রবেশ করিল  
—ইহার তাৎপর্য্য কি? রাঙা ভস্ম হইবার সময় ভিতর-  
কার বায়ুর কিয়দংশ টানিয়া লইয়াছিল। বকযন্ত্রের  
মুখ খুলিবামাত্র বাহিরের বায়ু ভিতরের সেই শূন্য স্থান  
অধিকার করিবার জন্য সশব্দে ভিতরে প্রবেশ করিল।  
তিনি পুনরায় ঐ বায়ুপূর্ণ বকযন্ত্র ওজন করিয়া দেখিলেন,  
ওজন প্রায় দশ গ্রেণ বাড়িয়াছে। তৎপরে, রাঙা-ভস্ম  
ও নির্দিষ্ট ওজনের রাঙা একত্রে ওজন করিয়া দেখিলেন  
যে, গৃহীত রাঙা অপেক্ষা রাঙা-ভস্মের ওজন বাড়িয়াছে,  
রাঙা-ভস্মের ওজন কতটা বাড়িয়াছে?—তিনি দেখিলেন,  
বকযন্ত্রের ভিতরে বায়ুর ওজন যতটা কমিয়াছিল ঠিক

জানুয়ারি ১৯২১

সেই পরিমাণে রাঙা অপেক্ষা রাঙা-ভস্মের ওজন বাড়ি-  
যাচ্ছে। উত্তপ্ত করিবার পর বদ্ধ বকবস্তুর মুখ ভাগাতে  
যতটুকু বায়ু প্রবেশ করিল, তাহা হইতে বকবস্তুর বদ্ধ  
করিবার পূর্বে উত্তপ্ত করিবার সময় যতটুকু বাহির  
হইয়াছিল, তাহার ওজন বাদ দিলে বায়ুর ওজন যতটা  
কমিয়াছিল, তাহা পাওয়া যাইবে।

তবেই দেখা গেল যে, রাঙাকে রাঙা-ভস্মে পরিণত  
করিবার সময় কোন নূতন বস্তুর সৃষ্টি হয় না।  
নির্দিষ্ট ওজনের রাঙা নির্দিষ্ট ওজন বায়ুর সহিত সংমিশ্রিত  
হইয়া দুইয়ের সমষ্টি ওজনের রাঙা রাঙা-ভস্মে পরিণত  
হইয়াছে। সেইরূপ সকল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বস্তুর  
পরিবর্তন বা অবস্থান্তর হয় যাহা : সৃষ্টি বা বিনাশ হয়  
না। পূর্বে যে, রাঙা-ভস্মের ওজন বাড়িয়াছিল, দেখা  
গিয়াছে তাহা কেবল অল্পজ্ঞান-সংযোগের ফল। বাস্তবিকই  
জগতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সংগ্রহে যদি নূতন বস্তুর  
সৃষ্টি বা বিনাশ হইত, তাহা হইলে, এতদিন বস্তুর  
আধিক্য বা অভাবের জগতের বিনাশ সাধিত হইত।  
লাভোয়ারসিয়ে রসায়ন লইয়া বহু পরীক্ষা করেন। কি  
উপায়ে রসায়ন পরিণত হয় ও কেন হয় এবং তাহার  
ওজনই বা কেন রাঙা পায় ইত্যাদি বিষয় অনুসন্ধান  
তিনি বহুদিন ব্যাপৃত থাকেন। সাধারণতঃ বোধ হয় যে,  
রসায়ন রসায়নকে রক্ষা। কিন্তু যে ওজনের রসায়ন জারিত  
হয় সমগ্র ভস্ম তদপেক্ষা গুরু। সুতরাং মারণ কালে  
রসায়ন হইতে কোন উপাদান দূরীভূত না হইয়া বরং বাহির  
হইতে স্রষ্ট কোন নূতন পদার্থ রসায়নের সহিত আসিয়া  
সংযুক্ত হইয়া থাকে। অল্পজ্ঞানের সহিত রসায়নের সং-  
যোগকেই রসায়নের মারণ কহে। লাভোয়ারসিয়ে আরও  
বুঝিলেন যে, রসায়ন জারিত হয়, তখনও বায়ু হইতে  
এই উপাদান পৃথক হইয়া রসায়নের সহিত মিশ্রিত হয়।  
অপর পক্ষে মারণ প্রক্রিয়ার শেষে বায়ুর যে অল্পতম  
উপাদান অবশিষ্ট থাকে, তাহা দ্বারা আর রসায়ন ক্রিয়া  
সম্পন্ন হয় না, তাহাই যবকার জল ( Nitrogen )। রস-

মারণ প্রক্রিয়া হইতে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত  
হইয়াছিলেন, তাহা নিম্নোক্ত পরীক্ষাগুলি দ্বারা আরও  
বৃদ্ধিমান হইবে। এখানে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যিক  
যে, এই সময়ের প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে অর্থাৎ  
১৬৩০ খৃঃ অব্দে জন রে ( John Rey ) নামক কন্সালী  
দেশীয় পণ্ডিত বুঝিয়াছিলেন যে, রাং বা সীসা বায়ুর  
সংস্পর্শে গলাইলে ক্রমশঃ ওজন বাড়ে এবং তাহার  
কারণ এই দর্শাইয়াছিলেন যে, যেমন বালুকারাশির  
উপর জল ঢালিলে বালুকা-কণাগুলি জল টানিয়া লয়,  
তেমনি শাত্তবস্তুর বায়ুকণার সহিত সংলগ্ন হইয়া থাকে।  
শাত্ত ভস্ম হইবার সময় যে ওজনে বাড়ে বিখ্যাত রবার্ট  
বয়েলের ( Robert Boyle ) এরূপ ধারণা ছিল।  
তিনি পদার্থসমূহের গঠনে তাপের শক্তি বিষয়েও বিশেষ  
আলোচনা করেন। বয়েল এরিস্টটলের অনুগামী ছিলেন।  
সেইজন্য পদার্থের গঠন-প্রণালী সম্বন্ধে তাহাদের  
উভয়েরই একমত। ১৬৭৫ খৃঃ অব্দে তিনি এই মত  
প্রকাশ করেন যে, উদ্ভাপ পাইলে শাত্তের পরমাণুগুলি  
অগ্নির পরমাণুর সহিত মিশ্রিত হয়। অগ্নি বা তেজ  
পঞ্চভূতের অল্পতম, অর্থাৎ মৌলিক পদার্থ বিশেষ।  
এক পদার্থ অল্প পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইলে যে মিশ্র  
পদার্থের ওজন বাড়িবে ইহাতে বৈচিত্র্য কি? তিনিও  
রাংকে ভস্মে পরিণত করিয়া সমাধান করিয়াছিলেন  
যে, গৃহীত রাং অপেক্ষা প্রাপ্ত রাং-ভস্মের ওজন অনেক  
বেশী। পাঠক, বুঝিবেন যে, উভয়ের মতেই মতের  
কিঞ্চিৎ আভাস আছে যাত্র। ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যার  
জ্ঞান রাসায়নশাস্ত্রবিৎগণ মহাজ্ঞানবান লাভোয়ারসিয়ের  
নিকটই বসে। ইংলণ্ডের আর একজন প্রসিদ্ধ রাসা-  
য়নিক জন রেও এন্টনিয় নামক শাত্তকে ভস্ম করিয়া  
দেখাইয়াছিলেন যে, শাত্তভস্ম গৃহীত শাত্ত অপেক্ষা  
ওজনে ভারী। ইহাদের পরীক্ষার ফল ঠাল ও বেকারের  
অবিদিত ছিল না; কিন্তু তাহারা ইহাদের প্রতি বদ্ধ  
একটা মনোযোগ করেন নাই।

ইহার দ্বারা আর একটা বিশেষ কার্য সম্পাদনের পথ পরিষ্কৃত হইল—বহুদিনের দৃঢ়ত্ব মহাত্ম্যের সংস্কার হইতে চলিল।

ধাতু অপেক্ষা ধাতু ভস্মের ওজন অধিক এই সত্য আবিষ্কারের পর “ক্লজিষ্টনবাদের” পতন অবগুস্তানী হইয়া পড়িল। কিন্তু, বহুদিন পর্য্যন্ত ধাতুভস্মের ওজন বৃদ্ধির তেজ্ ঠিক নির্ণীত না হইয়াছিল, ততদিন “ক্লজিষ্টনবাদের” বিরুদ্ধে কোনও নূতন মত লাভোয়াসিয়ে প্রচার করিতে পারেন নাই। সেইজন্ত ধাতুর সহিত কোন পদার্থ সংযুক্ত হইলে ধাতুভস্ম প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা নির্ণয় করিবান জন্ত লাভোয়াসিয়ে সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। তাঁহার এই ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা বড়ই শিক্ষাপ্রদ। তাঁহা কর্তৃক উক্ত মত-বাদের উচ্ছেদের বিবরণ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, কেমন করিয়া ধীরে ধীরে একটীর পর আর একটা করিয়া বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হয়। কত অক্লান্ত পরিশ্রম, অনন্ত সহিষ্ণুতা, বিচিত্র ভাব প্রবণতা এক একটা বৈজ্ঞানিক সত্যের আবিষ্কার কাহিনীকে চির গৌরবান্বিত করিয়া রাখে। এই “ক্লজিষ্টনবাদের” সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্ত কত মহাপুরুষ সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতা সহকারে সমস্ত জীবন কেবল নানাবিধ পরীক্ষার অভি-বাহিত করিয়াছেন। সহিষ্ণুতাই সিদ্ধির জনক বা প্রাপক। বাস্তবিক, সহিষ্ণু না হইলে কোন বিষয়েই সিদ্ধিলাভ করা যায় না। তাই, ইংরেজিতে রাসায়নিক-দের সম্বন্ধে একটীকথা আছে, “A Chemist is the most patient animal even the ass not excepted”—চির-সহিষ্ণু পশুও অপেক্ষাও রাসায়নিককে সহিষ্ণু হইতে হয়। মূল কথা, জ্ঞান-সাধকগণ সাধনাকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া থাকেন—জ্ঞানের উন্নতিকেই একমাত্র প্রবৃত্তি মনে করিয়া জ্ঞানের সেবার জীবন অভি-বাহিত করেন।

কিছুদিন পর যখন এই ভ্রম-সংস্কার বিষয়ে রসায়নবিদগণের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকৃষ্ট হইল, তখন ক্লজিষ্টনবাদিগণের মধ্যে একটা পোল বাধিয়া গেল। কেহ কেহ ইহার একটা খেলো অর্থাৎ অর্বণ্ড মীমাংসা করিয়া দিবার জন্য বলিলেন যে, ক্লজিষ্টনের ওজন নাই। উহা মাধ্যাকর্ষণের দ্বারা পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট না হইয়া বিপরীত দিকে অর্থাৎ উপরের দিকে উঠিয়া যায়। সুতরাং ইহার সংযোগে ভ্রমের ওজন কমে, ও নিয়োগে ওজন বাড়ে। যদি দাহিত বস্তু হইতে ক্লজিষ্টন বাহির হইয়া যায়, তাহা হইলে উহার ওজনের হ্রাস প্রাপ্ত হওয়াই উচিত। ক্লজিষ্টনবাদিগণ ইহাতে বলেন যে, ক্লজিষ্টন সংযোগে পদার্থ মিচনের লব্ধ সাধিত হয় (Phlogiston possesses a negative weight)। উহা একটি বড় অদ্ভুত মীমাংসা। যদি ক্লজিষ্টন মাধ্যাকর্ষণের দ্বারা আকৃষ্ট না হয়, তবে, উহা কিরূপ বা কোন ভাৱী পদার্থ এবং কিরূপেই বা অপর পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইবে? অনেক দিনের ভ্রান্ত সংস্কার সহজে অপনীত হয় না। এ ক্ষেত্রেও এইরূপ একটা কাল্পনিক মীমাংসার সন্ধান হইয়া তাৎকালিক রসায়নবিদগণ ক্লজিষ্টনবাদের ভুল দেখি-য়াও দেখিতে পাইলেন না। তাৎকালিক সমগ্র রসায়ন শাস্ত্রের পরিভাষা ক্লজিষ্টনবাদের পরিভাষা লইয়া গঠিত হইয়াছিল। বেকার (Becher, 1615—1682) এবং ষ্টাল (Stahl, 1660—1734) উভয়েই বোর ক্লজিষ্টনবাদী ছিলেন এবং ইঁহারা এই “অদ্ভুত তেজোবাদের” প্রথম প্রচারক। জোসেফ্ প্রীটলী, হেন্স কাবেভিল, জোসেফ্ ব্লাক্ এবং লীলে প্রভৃতি বাবলীয় রসায়নিকই এই ক্লজিষ্টনবাদের পরিপোষক ছিলেন। আবার, হমবার্গের (Homberg, 1652—1715) দ্বারা পদার্থ-সমূহের দাহনের একমাত্র কারণ “গন্ধক” (Sulphur) এবং উহা সকল পদার্থেই বর্তমান আছে। এ দ্বারা ইহাও স্বরণ করিলে যথেষ্ট হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না



অক্টোবর ১৯২১

যে, কাম্বেকেলের (Kunkel 1630—1703) ধারণা ছিল যে, সবচেঁ পদার্থেই “পারদ” (mercury) বর্তমান আছে। তিনি কস্ফরাস (Phosphorus) প্রভৃতি লইয়া অনেকগুলি মৌলিক গবেষণা প্রকাশ করিয়া রসায়ন শাস্ত্রের উন্নতি বিধান করেন। একদা ক্ষেত্রে নানা বাধা বির-আপত্তি ঘটন করিয়া লাভোয়্যাসিয়ে নির্ভয়ে “ক্লজটেনবাদ” প্রমাণক বলিয়া ঘোষণা করিলেন। প্রথমে অনেকেই লাভোয়্যাসিয়ের মতের বিরোধী হইয়াছিলেন। শেষে সত্যের জয় হইল। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার সমসাময়িক টেমপের দুই জন প্রসিদ্ধ রাসায়নিক দুইটি আঁত প্রয়োজনীয় রাসায়নিক তথ্যের আবিষ্কার করিলেন, তাহাতেই লাভোয়্যাসিয়ে ক্লজটেন বাদের এর সম্যকরূপে দেখিতে পাইলেন। প্রিষ্টলীর দ্বারা অক্সিজেন এবং ক্যার্বোডিক্সের দ্বারা জলের রাসায়নিক স্বরূপ আবিষ্কৃত হইল। এই দুইটি আবিষ্কারের ফলে লাভোয়্যাসিয়ে ক্লজটেনবাদকে চিরদিনের জন্য রাসায়নিক হইতে বিচূরিত কারতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ক্লজটেনবাদের এর প্রদর্শন করিয়া রসায়নকে নূতন ভিত্তির উপর স্থাপন করা লাভোয়্যাসিয়ের পৌরবিক মহাকাঙ্ক্ষা।

লাভোয়্যাসিয়ে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন লোক ছিলেন। তাঁহার তুলনামূলক স্বল্পবৃষ্টি দেখিতে পাইল যে, এই নূতন বায়ু ক্লজটেনবাদের বজ্রসম কঠিন প্রাচীর ভেদ করিবে। অতএব, প্রিষ্টলীর পত্রীকার সত্যতা অবধারণের জন্য তিনি প্রথমে তুলানিতে তাহার বিচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনিও দেখিলেন যে, লোহিত বর্ণ পারদ-তম (Red oxide of mercury) হইতে এক প্রকার বায়ু নির্গত হয়, তাহাতে নির্লোহিত প্রায় তড়কাট, দ্ব্যমবাতি প্রভৃতি দ্রব্য সাধারণ বায়ু অপেক্ষা এই নূতন বায়ুতে অধিকতর উজ্জলভাবে জলে এবং ইহা সাধারণ বায়ু হইতে ভিন্ন ও গন্ধময়; কিন্তু বোধ হয় সাধারণ বায়ুতে এই নূতন বায়ু অল্প কোন

প্রকার বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া আছে এবং দ্রব্য বস্তু জলিবার সময় এই নূতন বায়ু দ্রব্য বস্তুর উপাদানের সহিত সংযুক্ত হয়। তিনি সাধারণ বায়ু হইতে এই নূতন বায়ু সংগ্রহ করিবার জন্য সচেঁট হইয়া খানিকটা নির্দিষ্ট ওজননের পারদ একটি বকবয়ে (Retort) গ্রহণ করিলেন। এই বকবয়ের মুখ, অপর একটি পারদপাত্রে আংশিকভাবে নিমজ্জিত বায়ুপূর্ণ ঘট্টাকৃতি কাচপাত্রে (Bell Jar) প্রবেশ করাইয়া দিলেন। প্রথমে একখণ্ড কাগজ দ্বারা কাচপাত্রের বায়ুর পরিমাণ মাপ করিয়া লইয়া বকবয়্যস্থিত পারদকে প্রায় একপক্ষকাল অগ্নিতে উত্তপ্ত করিতে লাগিলেন। ক্রমে দেখা গেল যে, বায়ুর পরিমাণ প্রায় চয় ভাগের এক ভাগ কমিয়া গিয়াছে এবং বকবয়্যস্থিত পারদের উপর একপ্রকার রক্তবর্ণ স্তর-পড়িতেছে অর্থাৎ লোহিতবর্ণের পারদ তম প্রস্তুত হইয়াছে। কাচপাত্রস্থিত অবশিষ্ট বায়ু পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, উহাতে আর মোহবাতি প্রজ্জলিত হয় না। তিনি আরও দেখিলেন যে, অপর পাত্রস্থিত পারদও ক্রমশঃ ঘট্টাকৃতি কাচ পাত্রের ভিতর উঠিতেছে। ইহার কারণ এই যে, বকবয়ের মধ্যস্থিত বায়ুর কিয়দংশ যখন পারদ সংযোগে অপসারিত হইল, তখন আত্যন্তিক বায়ুর চাপ অপেক্ষাকৃত কমিয়া গেল; সুতরাং বাহিরের বায়ুর চাপ (Atmospheric pressure) বশতঃ পারদ ক্রমশঃ কাচপাত্রের ভিতর উঠিতে লাগিল।

লাভোয়্যাসিয়ে এই পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন যে, সাধারণ বায়ুতে এমন এক উপাদান আছে, যাহা উত্তাপ প্রয়োগে পারদের সহিত সংযুক্ত হয় অর্থাৎ পারদ সাধারণ বায়ুস্থিত এই নূতন বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া পারদ-তমে পরিণত হইয়া থাকে। এই লোহিত বর্ণ তম একটি বৌগিক পদার্থ। এই বৌগিক পদার্থ পুনরবার তীব্ররূপে উত্তপ্ত হইলে বিগ্নিষ্ট হয় এবং উপরি উক্ত বায়বীয় উপাদান বহির্গত হইয়া কেবল পারদ পড়িয়া থাকে। এইরূপে প্রাপ্ত লোহিত পারদ তম

উত্তপ্ত করিয়া তিনি উহা হইতে এই নূতন বায়ু অনেক ধানি পাইলেন। এই পরীক্ষা দ্বারা তিনি সাধারণ বায়ুতে এই নূতন বায়ুর অতিশয় নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করিতে পারিলেন। এইরূপে অজ্ঞাত বাতুও এই নূতন বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া বাতুতম্বে পরিণত হয়। রস-যাতন প্রক্রিয়া হইতে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা উপরিউক্ত পরীক্ষা দ্বারা দৃঢ়মূল হইল। এই পরীক্ষা দ্বারা আরও সপ্রমাণ হইল যে, বায়ু বা সাধারণ বাতাস একটি মূল পদার্থ নহে, পরন্তু উহাতে দুইটা বায়বীয় পদার্থ বিস্তারিত আছে। বায়ুর এই নবাবিষ্কৃত উপাদান বাহা বাতু ও অজ্ঞাত দাহ্য পদার্থের সহিত সংযুক্ত হয়, তাহার নাম রাখিলেন “অক্সিজেন” বা “অক্সিজেন” (Oxygen)। কিন্তু যদি অকার কিংবা গন্ধক দহন করা যায় তাহা হইলে বায়বীয় (gaseous) পদার্থের সৃষ্টি হয়; অকার ও গন্ধক-দহনে উৎপন্ন উভয় বায়ুই জলে দ্রবীভূত হয় এবং এই জলের অন্ন আবাদ ঘটে, এই কারণে সাধারণ বায়ুর এই উপাদানকে লাভোয়াসিয়ার “অক্সিজেন” নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, সোডিয়াম (Sodium) পোটাসিয়াম (Potassium) প্রভৃতি বাতু অক্সিজেনের সহিত সংযুক্ত হইলে যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহার আবাদ অন্ন না হইয়া বরং কারের মত হয়। সুতরাং বাতাসের এই উপাদানের “অক্সিজেন” নামকরণ ঠিক হয় নাই। লাভোয়াসিয়ারের “অক্সিজেনের” “অক্স” একপ বুঢ়িয়া গিয়াছে।

এখন লাভোয়াসিয়ারে প্রচার করিলেন যে, ক্লোরিন বাদে বিলক্ষণ ভ্রম-প্রবাদ আছে। বাতু ভস্ম হইলে, তাহার ওজন ত কমবেই না বরং বাড়িয়া থাকে। এই ওজন বৃদ্ধির কারণ, আর কিছুই নয়, বাতু সাধারণ বায়ুর অত্যন্ত উপাধিক অক্সিজেনের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে। যখন বাতু ভস্ম অকার প্রভৃতির সহিত উত্তপ্ত হইয়া বাতুতে পরিণত হয়, তখন অকার বাতু

ভস্মের অক্সিজেনের সহিত সংযুক্ত হইয়া আকারের (Carbonic acid gas) পরিণত হয়, এবং অসংযুক্ত বাতু পড়িয়া থাকে। “ক্লোরিন” বলিয়া কোন পদার্থ নাই, উহা একটা ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। লাভোয়াসিয়ারের এই অপূর্ণ নূতন আবিষ্কার রসায়ন জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিল। প্রথম প্রথম কেহ তাঁহার মতের পোষকতা করিল না। ক্লোরিনবাদীগণ ভুল আশ্বাস দান করিলেও শেষে লাভোয়াসিয়ারের মতই বলবৎ রহিল কারণ সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। ক্রমে ক্রমে তাঁহারই আদর্শমত (১৮৭ খৃষ্টাব্দে) ডি, মরভিউ, বার্খোলে, ফুরক্রয় প্রভৃতি ফরাসী, ব্র্যাক প্রভৃতি ইত-রাসায়নিকগণ তাঁহার মতের পোষকতা করিলেন। কেবল প্রিষ্টলী ও ক্যাম্বেন্ডিস্ চিরজীবন ক্লোরিনবাদী রহিয়া গেলেন। তাঁহারা তাঁহাদের ভ্রম বুঝিয়াও বুঝিতে পারিলেন না।

কিন্তু এখন পর্য্যন্তও লাভোয়াসিয়ারের অক্সিজেনবাদ একটি বিষয়ের সম্যক স্বীকৃতি করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাঁহার, ইহার পূর্বেই জানা ছিল যে, বস্ম রস প্রভৃতি বাতু যখন জলীয় বা তরলীকৃত সলফার বা গন্ধকাসে (Dilute hydrochloric or sulphuric acid) দ্রবীভূত হয়, তখন হাইড্রোজেন (Hydrogen) নামক একটা খুব লঘু গ্যাস বাহির হইতে থাকে এবং বাতু ভস্ম হইয়া অক্সের সহিত সংযুক্ত হইয়া লবণে (Salt) পরিণত হয়। ক্লোরিনবাদীরা বলিতেন যে, এই অতি “লঘু উদ্ভাজনই” “ক্লোরিন” ; এবং অন্ন সংযোগে বাতু হইতে ক্লোরিন বাহির হইয়া যায় এবং অবশিষ্ট বাতু ভস্ম পড়িয়া থাকে। লাভোয়াসিয়ারে ইহার উত্তরে বলিলেন যে, এই উদ্ভাজনবায়ু লঘু হইলেও উহার ওজন আছে, তবে, উহা বাহির হইয়া গেলে কেমন করিয়া বাতুভস্মের ওজন বাতু হইতে বেশী হইয়া থাকে? তিনি ক্লোরিন বাদীদের ভ্রম বলিয়া দিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার নিজের মতানুযায়ী প্রমাণের বিশেষ নীতি।

অক্টোবর ১৯২১

করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এমন সময়ে ইংলণ্ডের তাত্‌কালিক অগ্রতম প্রধান রাসায়নিক ক্যাবেণ্ডিস্‌ জলের রাসায়নিক স্বরূপ নির্ণয় করিলেন এবং জলের বৈশিষ্ট্য সপ্রমাণ করিলেন। লাভোয়্যাসিয়ে প্রমুখ রাসায়নিকগণের গবেষণায় সাধারণ বায়ু অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন নামক দুই বৈশিষ্ট্য পদার্থের মিশ্রণ বলিয়া পূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছিল। পিষ্টলী “অক্সিজেন” এবং ক্যাবেণ্ডিস্‌ “জলজান” আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, কিন্তু তাহার বিশেষ গুণাগুণ পরীক্ষা বা তৎসম্বন্ধে আর কোন বিশেষ আলোচনা করেন নাই। বরং তাহার পূর্বাগত প্রচলিত মতের সম্পূর্ণ পুনরাবৃত্তি ছিলেন এবং তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন নাই। কেবলমাত্র লাভোয়্যাসিয়েই এই বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব জগতে প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জলের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও তুমুল বিতণ্ডা হইয়াছিল।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ক্যাবেণ্ডিসের একজন বন্ধু ও সহকারী, সার্বচালস ব্র্যাকডেন্‌ ক্যাবেণ্ডিসের এই সকল পরীক্ষার ফল লাভোয়্যাসিয়ের গোচরে আনয়ন করেন। তিনি ১৭৮৭-৮৮ ক্যাবেণ্ডিসের পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করিয়া অনেকখানি জল প্রাপ্ত হইলেন। এখানে ইহাও জানা আবশ্যিক যে, সেই বৎসরই কনাসীয়েনের আর একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক লীপ্লাস ক্যাবেণ্ডিসের পরীক্ষার অনুসরণ করিয়া তাহার সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। লাভোয়্যাসিয়ে আরও জলীয় বাষ্পকে একটা পোর্সেলেনের (Porcelain) নলে উত্তপ্ত লৌহের উপর চালনা করিয়া উহা হইতে উদ্‌জান বায়ু (Hydrogen) প্রাপ্ত হইলেন। এই পরীক্ষার জলীয় বাষ্প-বিযুক্ত (Decomposed) হইয়া উদ্‌জান ও অক্সিজেনে পরিণত হয় এবং অক্সিজেন গ্যাস লৌহের

সহিত সংযুক্ত হইয়া লৌহভস্মে (Oxide of Iron) পরিণত হইয়া থাকে ও উদ্‌জান বাহির হইয়া আসে। এখন এই বিবিধ পরীক্ষা দ্বারা জলের পরিমাণাত্মক রাসায়নিক স্বরূপ সম্বন্ধে আর সন্দেহ রহিল না। লাভোয়্যাসিয়ে কেবলমাত্র এই সকল পরীক্ষার স্মৃতি হইলেন না। তিনি এখন দেখিতে পাইলেন যে, এই আবিষ্কার ক্রিজিষ্টেনবাদাদিগের শেষ আশাও নির্মূল করিলে। এত দিনে তিনি ধাতু ও জলীয় অম্লের সংযোগে উদ্‌জান প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার স্মরণ বীমাংসা করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন যে, এখানে নিরসিদ্ধি ক্রিয়া সাধিত হইতেছে—প্রথমে জল বিশ্লিষ্ট হইয়া অক্সিজেন উদ্‌জানে পরিণত হয় ও পরে অক্সিজেনের সহিত সংযুক্ত হইয়া ধাতুভস্মে পরিণত হইয়া থাকে। সেই ধাতুভস্ম অম্লের সহিত সংযুক্ত হইয়া লবণে (Salt) পরিণত হইয়া থাকে এবং উদ্‌জান বায়ু আবিষ্কৃত অবস্থার বাহির হইয়া আসে। অতএব, ধাতু ও জলীয় অম্লের সংযোগে কাল্পনিক ক্রিজিষ্টেনের উদ্ভবের কোনও সম্পর্ক নাই। জলের বিয়োজে একদিকে উদ্‌জান বায়ু বহির্গত হয় ও অপর দিকে ধাতুভস্ম প্রস্তুত হয়। মূল কথা, পিষ্টলী ও ক্যাবেণ্ডিস ক্রিজিষ্টেনবাদের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহিত না হওয়াতে এই সকল পরীক্ষার মধ্যে নিহিত গুঢ় সত্যের সন্ধান প্রাপ্ত হন নাই। একমাত্র লাভোয়্যাসিয়েই যে এই বিষয়ের গুঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা স্মরণার্থে স্বাক্ষর করিতে হইবে।

স্বাক্ষর:

ব্রিটিশলীকাঙ্ক স্বাক্ষর।

## পাবনা জেলার প্রচলিত

### প্রবাদ বচন

১। নিজে পায় না শোয়ার আগা (=জায়গা)  
শোয়ার মাক্ ( মাকে ) ডাকে মধ্যে শো গা।

২। ভাত পায় না সাকের বাটা, পোলা ভাজা খায়।

সাক্—শেখ, মুসলমান।

পোলা—পটল

৩। মার চেয়ে মাসী আপন, তারে বলে ডান।

ডান=ডাইনা।

৪। হাড় খাব মাংস খাব, চামড়া দিয়ে ডুগ ডুগি  
বাজাব

৫। যত হাসা, তত কারা, বলে গেছে রাম শরা  
( =শর্মা )

৬। দাদা কানা, আমি চোখে দেখি না।

৭। যার বিয়ে তার মনে নাই, পাড়াপড়শীর ঘুম  
কানাই।

৮। যার ঘোড়া তার ঘোড়াই নয়, চ্যারাক্দারের  
ঘোড়া।

চ্যারাক্দার=বে আলো ধরে।

৯। বিয়ের সময় কড়া বলে, আমি হাসবো।

১০। শুন্তেই শোনা যায় সোণারগাঁ বিক্রমপুর  
সুখী বতটা শুনা যায় প্রকৃত পক্ষে তত নয়।

১১। তোর তেল আঁচলে ঢাল, আমার তাড়ি  
আপুই কর।

তাড়ি=মাটির তৈয়ারী তৈলাধার বিশেষ। আপুই  
করা অর্থাৎ, তোমার কতি হয় হউক, কিন্তু আমার কাজ  
হওয়াই চাই।

১২। নিজের ঘান পাতিছে, এখন মারুক খরা।

খরা=অতি রৌদ্র, অনাবৃষ্টি। অর্থ, নিজের কার্য  
নিহইলেই হইল।

১৩। খেয়ার কড়ি, ডুবে পাগ।

১৪। শক্ত মর্দের দক্ষিণ ছয়ার।

১৫। শুইলে দুই পা পৈখামেই যায়।

অর্থ—একই কথা।

১৬। ধন দিলি তো বয়ে দে।

১৭। যার ছাওয়াল খত খায়, তার ছাওয়াল ততই  
লালায়।

ছাওয়াল=ছেলে

লালায়=চায়

১৮। ছাইমুখে দেবতার ঘঁসির নৈবিত্তি।

ঘঁসি=ঘুঁটে

১৯। যেমন দেবতা তার তেমনই বাহন।

২০। পেটে খেলে পিঠে সয়।

২১। জলের ছিট্যা দিলে চো'ড়ের শুভ্যা খেতে হয়।

চো'ড়=নৌকা বাহিবার নগী।

২২। একগুণ রায়রুণ, তার তিন গুণ ভায়াবান।

অর্থ=বাহ্যাভ্যর্থই বেকীর ভাগ।

২৩। নিজের বান নিজে রাখি, কাটা কান চুল দিয়ে  
চাকি।

২৪। ধরি মাছ, না ছুই পানি।

অর্থ=ফাঁকে ফাঁকে থাক।

২৫। চোরের মারের ডানব গলা—

ডানব=বড়

২৬। বাঁশের চেয়ে ককি দড়।

দড়=শক্ত

২৭। যার জন্মে করি চুরি দেই বলে চোর।

২৮। যারে দেখতে নারি, তার চলন মন্দ।

২৯। না দেওয়া কাঠালের খাওনে মাখ।

কাঠাল বাসে এক ব্যক্তি আর এক জনের কাছে ভাষার  
গাছের একটা কাঠাল চাহিয়াছিল। কিন্তু কাঠাল দিবার  
বুদ্ধিমত্তা আদৌ ইচ্ছা ছিল না। অর্থ লক্ষ্য বশতঃ  
অবীজ্য করিতে পারে না। তখন সে বলিল যে গাছের

অগ্রহায়ণ ১৩২১

কাঠাল ভো এখন পাকে না—শ্রাবণ মাসে পাকে (শাওনে)

৩০। দুই দিনকার বৈরাগী নয়, ভাতেক বলেন অন্ন।

৩১। জাতও গেল, পেটও ভরল না।

৩২। একা রাখে রক্ষা নাই, দোসর লক্ষণ (সুগ্রীব)।

৩৩। বিশ্বকর্মার ব্যাটা চাম্‌চিকা।

৩৪। করজ ক'রে বাওয়া, আর ভাট্যাল নাও বাওয়া।

ভাট্যাল=ভাটীর দিকে

নাও=নৌকা।

৩৫। স্নেহের কড়ি সা'ঙ্গে চলে

সা'ঙ্গে=কোনও ভারী বস্তু কাঁধে করিয়া বহিবার

ধাঁশ।

অর্থ—স্নেহ এত দ্রুত বাড়িয়া চলে যে তাহা কাঁধে বহিয়া লইতে হয়।

৩৬। কোথায় রাণী ভবানী, আর কোথায় ঘুঁটে-  
কুড়ানী।

৩৭। রাম না জন্মিতেই রামায়ণ।

৩৮। জ্যাংটার আবার চোরের (বাটপারের) ভয়।

৩৯। চৌক চাকার রথ দেখান।

অর্থ=বিষম সুক্লে ফেলান।

৪০। গঙ্গাতীরে বাসী।

৪১। জানে না শুনে না ধামন

চিন্মার ক্যাতে বুনে আমোন।

চিন্মা=শস্ত বিশেষ।

আমোন=আমন ধান।

৪২। মামার শালা পিস্তার তাই,

তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই।

৪৩। মার কোড়ে না, পোড়ে মাসীর

বাল খেয়ে মরে পাড়াপড়লী।

৪৪। গোলেমালে হরিবোল।

৪৫। বেঁচে থাকতে দেয় না ভাত কাগড়

ম'লে করবে দানসাগর।

৫৬। যার শীল যার লোড়া

তারই ভান্নে দাঁতের গোড়া।

৫৭। আতি চোর, পাতি চোর

দিনে দিনে সিধ চোর।

৫৮। সাথে কি বৈরাগী নাচে চিন্মার ছালার কাছে—

( চিন্মার ছালা কাঁধে )

৫৯। কল্লার নেমস্তন্ন, না আচালে বিশ্বাস নাই।

৬০। সব শিয়ালের এক ডাক।

৬১। —নাই চাম,

রাধা কৃষ্ণ নাম।

অর্থ—নিজের ভাত জোটে না, অথচ পরের দরবার করিয়া বেড়ায়।

৬২। অতি লোভে তীতি নষ্ট।

৬৩। অতি বৃত্তির গলায় দড়ি।

৬৪। কাণা গরুর ব্যালোক, ঘাঁটা।

ব্যালোক=পৃথক, আলাহিদা

ঘাঁটা=পথ রাস্তা

৬৫। মশার কামড় না স'য় পায়।

ভোট লোকের কথা না স'য় গায়।

৬৬। বারো মাস ব্রহ্মোত্তর, অজ্ঞান মাসে খামার।

ধান ধান ভবানন্দ, ব্রহ্মোত্তর আয়ার।

কোনও জমিদার একজন ব্রাহ্মণকে কিছু ব্রহ্মজ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার গোমতা ভবানন্দ অগ্রহায়ণ মাসে ধান পার্কে, ভমির কল সরকারী খামার এই অজুহাতে আত্মসাৎ করিত। দরিদ্র ব্রাহ্মণ অন্তোপাস হইয়া জমিদারের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহার লোক দ্বারা জমিদারকে প্রকৃত ঘটনা বুঝাইয়া দিল।

( ক্রমশঃ )

শ্রীমদ্রবীণা কবিতা

## ভারতবর্ষের প্রাচীন নগর

শিল্পকার্যের উৎকর্ষ সভ্যতার পরিচায়ক। সভ্যজাতি তাঁহাদের বাসস্থানের নির্মাণেই শিল্পের প্রথম প্রয়োগ করিয়া থাকে। সুতরাং তাঁহাদের নগরাদি নির্মাণে শিল্প-কৌশলের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইতে আমরা তাঁহাদের সভ্যতার প্রমাণ পাঠিতে পারি। ভারতবর্ষের প্রাচীন নগর নির্মাণের যে বিবরণ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইতে আমরা যেমন ভারতের প্রাচীন শিল্পোৎকর্ষের প্রমাণ প্রাপ্ত হই, তেমনই ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার উৎকর্ষ সম্বন্ধেও প্রমাণ প্রাপ্ত হই।

‘নগর’ যেমন সভ্যতার কেন্দ্রস্থান ছিল পুরও তেমনই কেন্দ্রস্থান ছিল। কিন্তু ‘নগরই’ সর্বপ্রধান কেন্দ্রস্থান বলিয়া বিবেচিত হইত; ‘পুর’ তদপেক্ষা অপ্রধান কেন্দ্রস্থান রূপে বিবেচিত হইত। নগর ও পুরের প্রভেদ শাস্ত্রাদিতে কিরূপ করা হইয়াছে তাহা নিম্নোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে—“বহুগ্রামের ব্যবহার অর্থাৎ ব্যবস্থাদির স্থান পুর—পুর সকলের মধ্যে প্রধান স্থানই নগর।” সুতরাং পাশ্চাত্য বর্তমান City ও Town এর মধ্যে যে প্রভেদ দেখা যায় পূর্বতন ‘নগর’ও ‘পুরের’ মধ্যে সেইরূপ প্রভেদই বিদ্যমান ছিল। উপরি উক্ত বিবরণ হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, পুর বৃহৎ হইলে তাহা নগর বলিয়া কথিত হইত।

পুর পূর্বে পর্বতের উপর নির্মিত হইত বলিয়াই ইহার শব্দার্থ দ্বারা বুঝা যায়। কারণ ‘নগ’ শব্দের অর্থ পর্বত, তদন্তর অত্যর্থে ‘র’ প্রত্যয় করিয়া ‘নগর’ হয়। অভিধানে ‘নগর’ শব্দের ব্যুৎপত্তিস্থলে কিন্তু পর্বতের পরিবর্তে উচ্চ আসাদদি বিদ্যমান আছে বধায় এইরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া গিয়াছে, যথা—“নগা ইব আসাদাদয়ঃ পর্বতঃ”। দুর্গস্থান পাশ্চাত্য নগরের প্রধান চিহ্ন বলিয়া উচ্চ আসাদ (Citadel) নামে কথিত হয়—পক্ষতরূপ স্বাতন্ত্র্যক

দুর্গস্থানও তেমনই প্রাচ্য প্রাচীন নগরের বিশেষ চিহ্ন হওয়াতেই উহা ‘নগর’ নামে অভিহিত হইত বলিয়া বোধ হয়।

দেবীপুরাণ হইতে নিম্নে আমরা একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি—তাহা হইতে নগর সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ই জানিতে পারা যাইবে—

‘ঐশ্রোতরঃ সবে ভূমৌ পুরং দুর্গঞ্চ শত্ৰুতে ।

চতুরশ্রমখ্যাতং ত্র্যশ্রং দীর্ঘমথাপি বা ॥

পুরং স্বধাক্ষমাৎ শ্রেষ্ঠং মধ্যমোত্তমকমসম্ ।

সমস্তাদ্ বোজনাত্তটাবৈশ্রং দেবপুরং মতম্ ॥

দশাং বৈষ্ণবং প্রাহঃ বর্তমানন্ত শাকরম্ ।

দশ ত্র্যক্ষাং তথা পঞ্চ সামান্তং সার্কৌত্তমিকম্ ॥

যোজনান্ধাক্ষি মানানি পুরাণি সন্নিবেশয়েৎ ।

মধ্যে রাজগৃহং কার্যং বিপ্রাণাকোত্তরাদিতঃ ॥

ক্রমাদ্ধেবাণি কার্য্যাণি প্রকৃতিবাহুতঃ পুরাৎ ।

বসেদ্বরতথাদোষো বর্শশকরকোমহান্ ॥

কৃত্রিমেষু চ দুর্গেষু চেষ্টপ্রাকারকল্পনা ।

চতুঃ পঞ্চকমানেন কল্পয়েদ্বিধিনা যুনে ॥

খাতিকারচিতং কার্য্যং প্রণালীভিঃ সমাধিতম্ ।

চত্বাৰ্থাধবা ত্রিণি ঘোবা কামবশান্তবেৎ ॥

নবদুর্গাসমৈতঞ্চ সশিবং ভূজগান্বিতম্ ।

নগরং সার্কৌত্তমং কৰ্ত্তব্যং কচকং পিবা ॥

শক্তিকং মধ্যমং কার্য্যং কুমারীপুরমেবচ ।

চতুঃপথ চতুর্ভুজং সার্কামমুখাবহম্ ॥

ছিন্নকর্ণং বিনাসং হুঃস্থিতং কুশদুর্গলং ।

নগরং ন প্রাপ্যসি গর্ত্তবিক্রং বিভেদিতম্ ॥

অগ্রতঃ স্বল্পপ্রাঙ্গণং ভিন্নজাণং বিদুর্কৃষাঃ ।

দ্বিমুখং কর্ণহীনন্ত কুশং মধ্যে কুশং বিষ্ঠী ॥

হুঃস্থিতং নিয়ং বাসান্ত নৈখতং ধনদুর্গলং ।

সৌম্যং সার্কমুখাচ্ছাদি পুস্তিতং বাক্ষণং বশম্ ।

বাব্যবাহুঃপ্রদং পূর্ণনগরং প্রীতিবর্জনম্ ।

উচ্চস্থানং সংপূর্ণ সার্কোরণ্য মুখপ্রদম্ ॥

অগ্রহায়ণ ১৩২১

মধ্যঃ চতুস্পাথোপেতঃ ন চ তৎ পীড়য়েৎ কচিৎ ।

ত্র্যক্ষস্থানং হিতং বিপ্র শিবস্তত্র সঙ্গা দ্বিতঃ ॥

চতুর্বিংশতি নাভাস্ত দ্বস্তানষ্টমতং পরম্ ।

অত্রমধ্যঃ প্রশংসতি হু যোৎকৃষ্ট বিবজ্জিতম্ ॥

অথ কিছু শতাশ্রয়ী প্রাহমুখ্যং নিবেশনম্ ।

নগরার্দ্ধক বিকল্পং যেটংগ্রামঃ তদর্কতঃ ॥

নগরাদ্ যোজনং যেটং যেটাদ্ গ্রামার্দ্ধযোজনম্ ।

ত্রিংশতঃ পরমাসীমা ক্ষেত্রসীমা চতুর্দ্বয়ঃ ॥

ত্রিংশতঃ প্রাথম্যঃ সীমামার্গো দশৈবতু ।

ধনুঃষট্ দশ বিভীর্ণঃ শ্রীমান্ রাজপথঃ কৃতঃ ॥

নৃবাজিরথনাগানামসম্বাধ স্তম্ভঃ ॥

ধনুঃষট্ চৈব চত্বারি শাখা তথ্যাস্ত নির্মিতাঃ ॥

ত্রিকরা শোপারথ্যাস্ত ত্রিকরাপ্যুপারথ্যাকাঃ ।

জম্বাপথ শতস্পাদঃ ত্রিপদং স্তাদ্ গৃহান্তরম্ ॥

বৃত্তীপাদর্দ্ধপাদং প্রাথম্যঃ পাদিকঃ স্তুতঃ ।

অবকরঃ পরিচারঃ পাদমাত্র সমস্ততঃ ॥”

দেবীপুরাণ, ৭২ অধ্যায় ( বঙ্গবাসীর ছাপা )

ঈশানকোণে নিরূত্ভাগে নগর এবং দুর্গরূপন প্রাপ্ত । চতুর্ভুজ, ত্রিংশত, এবং দীর্ঘ নগর যথাক্রমে শ্রেষ্ঠ, মধ্যম উত্তম এবং কনিষ্ঠ । চতুর্দিকে অষ্ট যোজন যে নগর তাহা একপ্রদেবপুর । দ্বাদশ যোজন নগর বৈষ্ণবপুর । ষট্ যোজন নগর শৈবপুর । দশ যোজন পরিমিত নগর ত্র্যক্ষপুর এবং যোজন পরিমিত নগর সামান্ত সার্ক-ভৌমিকপুর । সাধারণ নগর কোশ পরিমিত হইবে । রাজগৃহ নগর মধ্যে হইবে । উত্তরাদি দিক্চতুর্দিকে ত্র্যাক্ষপাদি চতুর্ভুজের বসতি যথাক্রমে হইবে । তদ্বিত্ত নীচ অর্ধেকের বসতি যথাক্রমে পুরবাহো হইবে । এইরূপ না হইলে মধ্যম বর্ণনকর দোষ ঘটিয়া থাকে । কৃত্রিম দুর্গে ইষ্টকের প্রাকার করিবে । চার পাঁচটা প্রাকার যথাবিধি করণীয় । প্রাকারবেষ্টিত দুর্গ খাতপরিবৃত্ত করিবে । খাতের প্রাণালী রাখিবে । এই প্রাণালী ভূমি বিশেষবাহু-সারে চারিটা, আটটা, তিনটা বা দুইটা কর্ণব্য । মধ্যদুর্গা,

শিব এবং নাগ-প্রতিমাব্যুক্ত নগর সর্বতোভদ্র । ক্রটক নগরও এইরূপ : যন্তিক নামক নগরের মধ্যে কুমারীপুর স্থাপনীয় । যন্তিক নগরে চারিটা চতুস্পাথ থাকিবে । যন্তিক নগর সর্বকামসুখাবহ । নাগাহীন, কর্ণহীন, কৃশ, দুঃস্থিত, দুঃসল, গর্ভাবদ্ধ এবং বিভেদযুক্ত নগর প্রশস্ত নহে । নগর-সমুদ্যে প্রাসাদ অল্প থাকিলে সেই নগর নাগাহীন ( বিনাস বা ছিন্ন ভাণ ) নামে অভিহিত । বিমুখ নগর কর্ণহীন পদবাচ্য । মধ্যে কৃশ নগর, তাহাই কৃশপদবাচ্য । দক্ষিণ-নিম্ন নগর দুঃস্থিত নামে অভিহিত । নৈঋত-নিম্ন নগর দুর্জল বা ধনহুমল নামে অভিহিত । উত্তরভাগে পরিপূর্ণ যে নগর তাহা সর্বসুখানন্দ জনক । পশ্চিমভাগে নগর সর্ববশকারী, এবং দক্ষিণভাগে পরিপূর্ণ যে নগর তাহা আয়ুঃপ্রদ এবং প্রৌতিবর্দ্ধন । ঈশান কোণে বা পূর্বদিকে পরিপূর্ণ নগর সর্কারোগ্যসুখদায়ী । মধ্যপূর্ণ চতুস্পাথোপেত নগর কদাচ পীড়িত হইবার নহে । একরূপ নগর ত্র্যক্ষস্থান, শিব তথায় সর্বদা অবস্থিত । হে বিপ্র, একরূপ নগর হিতজনক । দ্বাদশ কোশ অষ্টমত হস্ত, মধ্য নগরের পরিমাণ, মধ্যনগর সর্বদিকে সমান হইবে । ত্র্যাক্ষদ্বি থাকিবে না । অষ্টমত কিছু মধ্যমুখানিবেশন । যেট বা বিকল্প নগরার্দ্ধ পরিমিত । গ্রাম যেটের অর্দ্ধ, যেট নগর হইতে যোজনমাত্র ব্যবহিত । যেট হইতে গ্রাম অর্দ্ধযোজন । দুই কোশ হইল পরমসীমা, চারিধনুপরিমিত স্থান ক্ষেত্রসীমা । ত্রিংশৎ ধনুঃ গ্রামের ন্যূন পরিমাণ । সীমাপথও দশ ধনু । আর শ্রীমান্ রাজপথ দশ ধনু অর্থাৎ ৪০ হস্ত বিভীর্ণ হইবে । একরূপ হইলে মনুষ্য, অথ, রথ, ও হস্তী দিগের অবাধ সঞ্চার হইতে পারে । শাখাপথ চারি ধনু হইবে । উপরথ্যা ( পথবিশেষ ) তিন হস্ত, অন্নরথ্যা ( তদন্তর্গতপথ ) দুই হস্ত পরিমিত হইবে । জম্বাপথ চতুস্পাদ পরিমিত । ত্রিপদের পর গৃহান্তর সংজ্ঞা । বৃত্তীপাদ অর্দ্ধ পাদ পরিমিত । প্রাথম্য ( বজ্রী বাদ বিশেষ ) পাদ পরিমিত হইবে ।” বঙ্গবাসীর অনুবাদ ।



উক্ত বর্ণনা হইতে প্রাচীন নগর সকলের গঠন সম্বন্ধে ধারণা বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে উহা যে বর্তমান পাশ্চাত্য নগর গঠনপ্রণালী অপেক্ষা নূন ছিল না, তাহা প্রতীয়মান হয়। দেবতা ধর্মান নগরে একটি বিশেষ লক্ষণ দেখা যায়। পাশ্চাত্য Parish এ যে ধর্মমন্দিরের চতুর্দিকে গ্রামাদি পত্তনের ব্যবস্থা দেখা যায় ভারতীয় নগর, দেবাধিষ্ঠানও তদনুরূপ ব্যবস্থা হইতে হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। নগরমধ্যে চারিটি চতুষ্পথ বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। এই চতুষ্পথ যে বর্তমান নগরের স্কোয়ারেরই (Square) অনুরূপ তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। স্কোয়ারগুলি নগরের মুক্তস্থান বলিয়া যেমন নগরের পক্ষে বিশেষ উপযোগী চতুষ্পথগুলি সেক্ষেপ উপযোগী বলিয়াই বিশেষভাবে উল্লেখ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বর্তমান নগরের রোড (road) স্ট্রীট (street) লেন (lane) বালেইন্স (by-lane) ফুটপাথ (foot path) প্রভৃতি রাস্তার যে সমস্ত বিবিধ বিভাগ দেখা যায় প্রাচীন নগরের রাস্তাপথ, শাখাপথ, উপরথ্যা, অন্নরথ্যা, ওজাপথ প্রভৃতিতে আমরা তদনুরূপ বিভাগই দেখিতে পাই। রাস্তার নাম যে 'রথ্যা' দেখিতে পাওয়া যায় ইহা 'রথ' শব্দ হইতেই নিস্পন্ন। রথচালনের উপযোগী রাস্তাই রথ্যা নামে অভিহিত হইত। বর্তমানে যেমন মধ্যরাস্তা গাড়ী প্রভৃতি চালনার জন্য নির্দিষ্ট দেখা যায় রথ্যাও সেইরূপ ভাবেই রথচালনার জন্য নির্দিষ্ট থাকত বলিয়া বোধ হয়। বর্তমান নগরে যেমন আমরা রাজ-প্রতিনিধির আবাস ও দুর্গ সন্নিবেশ দেখিতে পাওঁ তদ্রূপ প্রাচীন নগরেও রাজগৃহ ও দুর্গের সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমান নগরে বিভিন্নকালের সম্বন্ধে নির্দিষ্ট স্থান বিভাগ দেখিতে না পাঠিলেও ইউরোপীয় ক্রান্তি-দিগের জন্য প্রায়ই স্বতন্ত্র স্থান বিভাগ দেখিতে পাই। পূর্বের নগরে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ক্রান্তির জন্য নগরের ভিন্ন-

ভিন্ন স্থান বিভাগ নির্দিষ্ট থাকার ব্যবস্থা দেখা যায়। এই ব্যবস্থা স্বাস্থ্য, ধর্ম, সমাজ সকল বিষয়েই যে অধিক সুবিধাজনক ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। উপরের বর্ণনায় "সেট" বর্তমান Suburb বা নগরোপকণ্ঠ বলিয়াই বোধ হয়।

রাজ্য স্বয়ং যে নগরে বাস করিতেন তাহা একটি বিশেষ নামে কথিত হইত। ইহার নাম ছিল 'পত্তন'—যথা 'স্বয়ং রাজা তৎপরিচারকাস্ত তিষ্ঠন্তি তৎ পত্তনম্'। ইতি শব্দকল্পদ্রুমতত্ত্ব ভরতঃ। যেখানে রাজা ও তাঁহার পরিচারকগণ বাস করেন তাহা পত্তন। রাজধানী বলিলে আমরা যাহা বুঝি 'পূর্বে' পত্তন তাহাই ছিল। এই রাজধানী বা রাজপুরী সম্বন্ধে আমরা সংস্কৃতপুরাণ হইতে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি—

রাজ্য সহায়সংযুক্তঃ প্রভূত যবসেনানম্।

রম্যমানন্ত সামন্তং যথ্যং দেশমাবসেৎ ॥ ১

বৈভ্র শূদ্র জনপ্রায়মনাহার্যং তথাপয়ঃ।

কিঞ্চিৎকৃষ্ণং সংগুপ্তং বহুকর্মকরং তথা ॥ ২

অদেবমাতৃকং রম্যমহরক্তজনাশিতম্।

কঠোরপাণ্ডিতঞ্চাপি বহুপুষ্পফলং তথা ॥ ৩

অগম্যং পরচক্রান্নাং তথাসংগৃহ্যমপি।

সমদুঃখসুখং রাজ্যঃ সত্যতং প্রিয়মাহিতম্ ॥ ৪

সরীসৃপ দিহীনঞ্চ ব্যাঘ্রতরুর বর্জিতম্।

এবংনিধং যথালভ্যং রাজ্যং বিষয় মাবসেৎ ॥ ৫

তত্রচর্গঃ নৃপঃ কুর্য্যাৎ বরামেকতমং বুধঃ।

ধনুর্দুর্গং মহীদুর্গং নরদুর্গং তথৈবচ ॥ ৬

বান্ধকৈবানুদুর্গক গিরিদুর্গক পাণ্ডিব।

সর্কেষামেব দুর্গানান্ গিরিদুর্গং প্রথমভূতে ॥ ৭

দুর্গক পরিদোপেতং বপ্রাটালকসংযুতম্।

শতদ্বী বহুদ্বৈশ্চ শতশ্চ সমাবৃতম্ ॥ ৮

গোপুরং সপাটক তত্রত্যং সুনমোহরম্।

সপতাকং গজাক্রো যেম রাজ্যং বিশেষং পুরম্ ॥ ৯



চতুর্ভুজ তথা তত্র কার্যান্তারত বীধয়ঃ ।

একশিংশতত্র বীধ্যগ্রে দেববৈশ্ব তবৈব দৃঢ়ম ॥

বীধ্যগ্রেচ দ্বিত্যয়েচ রাজবৈশ্ব বিধীয়তে ।

ধর্ম্মাধিকরণং কার্য্যং বীধ্যগ্রেচ তৃতীয়কে ॥ ১১

চতুর্ভুজ বীধ্যগ্রে গোপূরঞ্চ বিধীয়তে ।

অগ্নিতং চতুরঙ্গং বা বৃত্তং বা কারয়েৎ পুরম ॥ ১২

মুক্তিহীনং ত্রিকোণঞ্চ যবমধ্যং তথৈবচ ।

অর্দ্ধচন্দ্র প্রাকারঞ্চ বজ্রাকারঞ্চ কারয়েৎ ॥ ১৩

অর্দ্ধচন্দ্রং প্রশংসাত নদীতীরেষু তদ্বসন ॥

অন্যং তত্র ন কর্তব্যং প্রযত্নেন বিজ্ঞানতা ॥

তত্র তত্র বসাহ্বানং রাজা বিজ্ঞায় সারথীন ॥

দদ্যাদাবসগস্থানং সর্বেষামনুপূর্ব্বশঃ ॥

যোধানাং শিল্পিনাঞ্চৈব সর্বেষামাবশেষতঃ ॥

দদ্যাদাবসগস্থানং দুর্গে কালমন্ত্রবিদানু শুভানু ॥

গোবৈশ্বানরশ্চৈবদ্যাক্ষং গজবৈশ্বানরশ্চৈবচ ॥ ১৫

আহরত তুং রাজা দুর্গে হি প্রবলারুহঃ ।

কুশীলবানং বিপ্রাণাং দুর্গেষ্টানং বিধীয়তে ॥ ১৬

ন বহুনামতো বিনাকার্য্যং তথা ভবেৎ ।

দুর্গেচ তত্র কর্তব্যং নানাগ্রহরণা যতঃ ॥ ১৭

সহস্রঘাতিনো রাজ্যৈত্তত্ত্ব রক্ষা বিধীয়তে ।

দুর্গে দ্বারাগি ওপ্তানি কার্য্যান্তাপিতভূত্বা ॥ ১৮

সুন্দরশ্চাত্র সর্বেষামানুধানাং প্রশস্ততে ।

বহুবাং ক্ষেপণীরানাং ভোমরাগাঞ্চ পাথিব ॥ ২০

বজ্রাঘ্রাণ্টালচরোপপন্নং সমগ্রধানৌষধসম্প্রযুক্তম্ ॥

বণিকজনৈশ্চাত্মতমাবসেত দুর্গং সুশুভং নৃপাতঃ

সদৈব ॥”

মৎস্তপুরাণ, ২১৭ অধ্যায়, বঙ্গবাসী মুদ্রিত ।

“মধ্যদেশেই রাজার বাসযোগ্য । যেখানে কাঠ

ও বাসাদি প্রচুর পরিমাণে বিস্তারিত, সমস্ত রাজগণ

স্বর্গ্য বসীকৃত, যেখানে শত্রু জাতির বাহুল্য, যেখানে

স্বল্প জ্ঞানগণের বাস, যেখানে বহু কর্মকারের নিবাস,

যেখানে প্রকাশ্য অসুস্থত্ব, যেখানে বহু পুষ্কল বর্জিত,

যাহা পত্র-সৈন্যের অগম্য, যাহা রম্য, যাহা ব্যাঘ্র-

সরীসৃপহীন, যাহা তত্ত্ববর্জিত, নদীমাতৃক এবং

করভারে প্রসীড়িত নহে, তাহাশুভস্থলসম্বিত

যথাক্রমে দেশে রাজা স্বকীয় সহায় সহিত বাস করিবেন ।

বুদ্ধিমান রাজা ঐরূপ দেশে বর্জ্য দুর্গের যে কোনরূপ

দুর্গ নির্মাণ করাইবেন । ধনুর্দুর্গ, মহীদুর্গ, নরদুর্গ বৃক্ষ-

দুর্গ, জলদুর্গ ও গিরিদুর্গ এই ছয় দুর্গ মধ্যে গিরি দুর্গই

প্রশস্ত । দুর্গের চতুর্দিকে পরিখা, প্রাকার ও অট্টালিকা

নির্মাণ করাইবেন । চতুর্দিকে শতদ্রু ও অপরাপর স্বল্প-

সকল বহুলরূপে স্থাপন করাইবেন । পুরদ্বার অতিমনো-

হর কবাট দ্বারা সুশোভিত করিবেন । রাজা পতাকাযুক্ত

হস্তীতে আরোহণ পূর্ব্বক সেই দ্বার দিয়া পুর-প্রবেশ করি-

বেন । চারটি আয়ত বীধি ( পথ ) প্রস্তুত করাইবেন ।

ঐ সকল বীধির প্রথমটীর অগ্রভাগে দেবগৃহ

নির্মাণ করাইবেন । দ্বিতীয় বীধির অগ্রভাগে

রাজভবন, তৃতীয় বীধির অগ্রভাগে ধর্ম্মাধিকরণ এবং

চতুর্থ বীধির অগ্রভাগে পুরদ্বার নির্মাণ করাইবেন ।

রাজপুর আয়ত, চতুরঙ্গ, বৃত্তাকার, মুক্তিহীন, ত্রিকোণ,

যবমধ্য, অর্দ্ধচন্দ্রাকার, অথবা বজ্রাকৃতি করা কর্তব্য ।

তন্মধ্যে নদীতীরস্থ অর্দ্ধচন্দ্রাকার পুরই প্রশস্ত । জানবানু

রাজা নদীতীরে অশ্ববিধ পুর নির্মাণ করাইবেন না ।

রাজা সেই সেই স্থানে সারথিদিগের বখাযোগ্য

বাসস্থান প্রদান করিবেন । যোদ্ধা, শিল্পী, কালজ ও

মন্ত্রীদিগের উত্তম বাসস্থান দিবে । এতদ্বির গোবৈশ্ব

অশ্ববৈশ্ব, ও গজবৈশ্বও দুর্গমধ্যে রাখিবেন, কারণ

দুর্গে রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে । দুর্গে জ্ঞান ও

চারুগণের বাসস্থান থাকিবে । কার্য্য ব্যতীত দুর্গমধ্যে

বহুলোকসমাগম অবিধেয় । সহস্রবীরঘাতী নানা

গ্রহরণধারী বীরগণ দুর্গরক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে ।

দুর্গের কয়েকটি ওপ্তদ্বারও থাকা আবশ্যক । দুর্গমধ্যে

ধনু, বাণ, ক্ষেপণী ও ভোমর প্রভৃতি সর্বপ্রকার অস্ত্র

শস্ত্রাদিরই সংগ্রহ থাকা উচিত । নৃপতি সর্বদা বহু

আরু ও অষ্টলক্ষযুক্ত, ধাতু-ওষধি প্রকৃতি জব্যাপারপূর্ণ  
এবং বণিকজনে সমারুত পুরমধ্যে বাস  
করিবেন।”

এরূপে সর্গ রাজধানীর যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে  
তাহার সহিত সৈক্যবাস ও বত্বর দোকানপাট বিশিষ্ট  
কোটউইলিয়মসম্বিত কলিকাতা রাজধানীর যথেষ্ট  
সাদৃশ্যই দেখিতে পাওয়া যায়। উপরি বর্ণিত রাজ-  
ধানীর ক্ষমতা-কলিকাতাও নদীতীরবর্তিনীই বটে।

আমরা পূর্বে কেবল শাস্ত্রকারের পরিকল্পনারূপে  
নগরের বর্ণনা পাইয়াছি এক্ষণে আমরা ভারতবর্ষের  
একটা বাস্তব প্রাচীন নগরীর বর্ণনা প্রদান করিয়া  
আমাদের প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ইহা রামায়ণে  
আদিকবি বাত্মকিকৃত ভারতবর্ষের সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন  
অযোধ্যানগরীর বর্ণনা।

“কোশলোনাম মুদিতঃ ক্ষাতো জনপদো মহান্।

নিবিষ্টে সরযুতীরে প্রভূতধনধাতুবান্ ॥ ৫

অযোধ্যানাম নগরী তত্রাসীলোকবিশ্রুতা।

মহুনা মানবেশ্রেণ য়া পুরী নির্মিতা যয়ং ॥ ৬

আর্যতা দশচ যেচ যোজনানি মহাপুরী।

শ্রীমতী ত্রীণিবর্তীণী সুবিত্তমহাপয়া ॥ ৭

রাজমার্গেণ মহতা সুবিত্তেন শোভিতা।

যুক্তপুষ্পাবকীর্ণেন জলসিক্তেন নিত্যশঃ ॥ ৮

তাং তু রাজা দশরথো মহারাট্টবৈবর্ধনঃ।

পুরীমাবাসসামাস দিবি দেবপতির্ধ্বজা ॥ ৯

কপাট-তোরণবতীং সুবিত্তাঃ প্রাপণাম্।

সর্বযন্ত্রাযুধবতা সুবিতাং সর্বশিল্পিতঃ ॥ ১০

সুতমাগধ সখাং শ্রীমতীমতুল প্রভাম্।

উচ্চাটালজলবতীং শতশ্রীশতসমুলাম্ ॥ ১১

বধূনাটকসংলগ্নং সংযুক্তাং সর্বতঃ পুরীম্।

উজানাত্রবীণোপেতাং মহতীং শালমেষলাম্ ॥ ১২

হর্ষগভীরপরিধাং হর্ষামন্যোহুর্গাসদাম্।

বাজিবারপস্পূর্ণাং গোভিক্রষ্টেঃ ধীরভবা ॥ ১৩

শামন্তরাজসংলগ্নং বলিকর্ণভিরাবৃতাম্।

মানাদেশ-নিবাসিগ্ণং বণিক্তিরূপশোভিতাম্ ॥

প্রাসাদৈরহরবিকৃতৈঃ পর্কটৈরিব শোভিতাম্।

কুটাগারৈশ্চ সম্পূর্ণামিশ্রেণ্যামবৃতাম্ ॥ ১৫

চিত্রামষ্টাপদাকারাং বরনারীগণাবৃতাম্।

সর্বরত্ন সমাকীর্ণাং বিমানগৃহশোভিতাম্ ॥ ১৬

গৃহপাট্যাবচ্ছিত্রাং সমভূমৌ নিবেশিতাম্।

শালিততুলসম্পূর্ণামিক্ষুকান্তরসোদকাম্ ॥ ১৭

হৃদুভীতিমৃদলৈশ্চ বীণাভিঃ পণবৈবৃতাম্।

নাদিতং ভূশমভ্যর্থং পৃথিব্যাং তামহুতমাম্ ॥ ১৮

রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ৫ম সর্গ—বলবাসীর ছাপা।

“সরযুতীরে নিবিষ্টে প্রমোদ্যবিত, প্রচুর ধনধাতু-

শালী, অতিবৃহৎ ও ক্রমশঃবর্ধমান কোশলনামক দেশে

সর্বলোক বিখ্যাত অযোধ্যানামী নগরী আছে;

যে নগরীকে মানবেশ্রেণ মগ্ন যয়ং নির্মাণ করিয়াছিলেন,

যে মহাপুরী সুবিত্ত মহাপথে সুশোভিতা, বাহন

যোজনায়তা, দ্রিযোজন-বিত্ততা ও অতিশয়-শোভাবতী

এবং বাহ্যর সুন্দর সুবিত্তত বৃহৎ বৃহৎ রাজপথগুলি

সর্বদা সলিলসিক্ত ও প্রস্তুতিত পুষ্পে বিকীর্ণ

ধাকিত। যেসকল দেবতা ইন্দ্র বর্গলোকের বসতি

বৃদ্ধি করেন, তদ্রূপ মহারাট্টবর্ধন রাজা দশরথ সেই

নগরীর অনেক বসতি বৃদ্ধি করেন। সেই নগরী কপাট-

তোরণাঘিটা, সুবিত্তত সুপ্রপথপরিশোভিতা, সমস্ত

যন্ত্রপাতিবতা; অতুল প্রভাবতী, সর্বাযুধবতী এবং

অতি শ্রীমতী। তাহাতে সর্বশিল্পবিজ্ঞাবিশারদ ব্যক্তি

এবং অনেক সূত ও মাগধ বাস করত। তাহাতে জল-

শালী উচ্চ উচ্চ অট্টালিকা, শত শত শতশ্রী উজান ও

আত্মকানন ছিল। তাহার সর্বত্রই গীমভিন্দীদিগের

নাট্যশালা ছিল। সেই নগরী জলহর্ষম পরিধা পরি-

ব্যাপ্ত থাকা প্রযুক্ত সকলেরই হর্ষম্যা; বিশেষতঃ পক্ষ-

পক্ষ তাহার নিকটেও গমন করিতে পারিত না।

সেই নগরীতে বহুসংখ্যক অশ্ব ও হতী, অনেক গো,

অগ্রহায়ণ ১৩২৫

বহুসংখ্যক উষ্ট্র ও গর্ভত, অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করদ রাজা, নানা দেশাগত বণিকগণ, পক্ষতুল্যা, অতুল্য, রত্ননির্মিত অট্টালকাসমূহ এবং যেরূপ ইজের অবশ্যবর্তী নগরীতে জ্রীমগের জ্রীড়াগৃহ আছে সেই রূপ নারীগণের অনেক জ্রীড়াগৃহ ছিল। সুবর্ণ মণ্ডিতা, সর্বরত্ন সমাকীর্ণা, সপ্ততলগৃহশোভিতা ও সমভূমি নিবেশিতা সেই অপূর্ণ নগরীতে অনেক সুন্দরী রমণী ছিল। গৃহ সকল নিকটে নিকটে অবস্থিত ছিল, তাহার কোন স্থানই বাসগৃহশূন্য ছিল না। সেই নগরী দ্বার ও তুলপরিপূরিতা এবং ইক্ষুরস তুল্য সুবাহু জলশালিনী। তাহাতে হৃদয়, মৃদঙ্গ, বীণা ও পণ্ডর সকল যুহুহু ধ্বনিত হওয়ায় সেই নগরী পৃথিবীর সমস্ত নগরী হইতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে।

এখানে রাজপথ কুসুমাতীর্ণ হওয়ার যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহা প্রণিধান যোগ্য। রাজপথে পুষ্প বিক্ষেপে যেমনই শোভা দ্বারা নয়নরঞ্জন হইত, গন্ধের দ্বারা নাসিকা পরিভূষিত হইত, তেমনই দৃশ্যিত বায়ুও সংশোধিত হইত। ইহাতে পথ যে বিশেষরূপে সুখ-পথ্য ও প্রীতিকর হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্তমান উন্নত পাশ্চাত্য নাগরিক ব্যবহার কিন্তু এই প্রকার অভিজ্ঞ দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্তমানে এই প্রথা বিলুপ্ত হইয়া গেলো পাশ্চাত্য সাহিত্যে “Flowery path”, “path strewn with flower”, “পুষ্পময় পথ”, “পুষ্পাবকীর্ণ পথ” প্রভৃতি যে আলংকারিক কথা পাওয়া যায় তাহার উৎপত্তি-মূলে যে পুরোক্ত প্রাচ্য প্রকার ত্রায় প্রথাই বিস্তারিত তাহা সন্দেহই বীকার করিতে হইবে।

চন্দ্রধের সরযুতটস্থিত অযোধ্যার পুরোক্ত প্রাচীন চিত্র আমাদের সম্মুখে ধরিলে ইহা বহুপথ-সুবিভক্ত নিত্যজলসেকার্দ্রব্য, বহুদেবী বাণিজ্যসমুদায়, উচ্চাউপবনপরিশোভিতা, সহস্র গ্রহরী বাসিতা, দুর্ভেদ্য দুর্গ-দুর্গা, নাট্যশালা প্রমোদশালাযোগে আমন্দময়ী,

রাজা মহারাজগণের প্রাসাদোক্তির দ্বারা ঐশ্বর্যময়ী, বহুজনসমাকুল, নিবিড় বসতি, গদ্যতটবর্তিনী ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী মহানগরী কলিকাতা বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে। কেবল তাহাই নহে পৃথিবীর বর্তমান যে কোন মহানগরীর বিচিত্র চিত্রের পাখিই রামায়ণাঙ্কিত অশেষ সমৃদ্ধিশালিনী প্রাচীন অযোধ্যার চিত্র স্থাপিত হউক না কেন তাহা যে বিশেষ জ্ঞান বলিয়া প্রতীয়মান হইবে তাহা আমাদের বিশ্বাস হয় না।

ত্রীশতলচন্দ্র চক্রবর্তী।

## সন্ধ্যা

পশ্চিমদিকতকোলে জ্ঞান আলোরোধা  
নিঃশেষে মিলায়ে গেল; নাহি ঘাঁর দেখা  
সুদূর মাঠের পারে তরুবাধি আর,—  
আকাশ ধরণী সবি লুপ্ত একাকার।  
ধীরে ধীরে ঘিরে আসে নীরব নিবিড়  
গোপন চরণ-পাতে সন্ধ্যার তিমির  
পসারিয়া হিম-বাহু, তারি স্নেহ-চুম্ব  
চপলা ধরণী পড়ে এলাইয়া গুমে।

আমার এ ক্ষুদ্র বৃকে পরশ তোমার  
বুলাইয়া দাও ধীরে,—অস্তর আমার  
তোমার তিমির সম পূর্ণ অচপল  
নীরবে খনিয়ে হোক সাধক সকল।  
বিছাইয়া দাও তব স্নেহাকলধানি,  
ভূষণ কর, সিন্ধ কর, বৃকে লয়ে টানি।

ঐ পরমলক্ষ্মীর ঘোষ।

## হিন্দু সমাজনীতির বৈষয়িক ভিত্তি\*

প্রয়াগের 'পানিনি আপিন' হিন্দু-সাহিত্য-প্রচার-কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। 'অষ্টাধ্যায়ী পানিনির' কীৰ্ত্তিমান সম্পাদক রায় বাহাদুর শ্রীশচন্দ্র বসুর অধ্য-কৃত্য এই কার্যে আত্মসুচারুক্রমে সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে। হিন্দুর সাহিত্য ও শাস্ত্র গ্রন্থাদি প্রকাশিত করিয়া এলভাবাদের পানিনি কার্যালয়ের দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন সন্দেহ নাই। তাহার এক মনোজ্ঞ বিবরণ ইতিপূর্বে অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 'পূর্ব' পত্রিকায় প্রচারিত করিয়াছিলেন। বাহাদুর পানিনি কার্যালয়ের বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগকে উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

অক্লিষ্টকর্মী স্বদেশপ্রাণ বিনয়কুমার সরকার মহা-শয় ইতিপূর্বে গুরুনীতি ইংরেজী ভাষায় অনুদিত করিয়া-ছিলেন। তাহা পানিনি কার্যালয়ের হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থাবলী-ভুক্তরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। গুরুনীতি শাস্ত্র সম্পর্কিত গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থ তত্ত্ব করিয়া অধ্যয়ন করিলে হিন্দু-দিগের বৈষয়িক জ্ঞান যে কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাই বিস্তৃত ভাবে সন্নিবেদন করিয়া বিনয়বাবু সম্প্রতি উক্ত গ্রন্থের এক ভূমিকা লিখিয়াছেন। এই ভূমিকার নাম রাখিয়াছেন হিন্দু সমাজনীতির বৈষয়িক ভিত্তি (The Positive back

ground of Hindu sociology) কিন্তু এটি গ্রন্থ উক্ত ভূমিকার প্রথম ভাগ মাত্র। দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইবে। এই গ্রন্থও পানিনি কার্যালয়ের হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থাবলী-ভুক্ত করা হইয়াছে।

গুরুনীতি পাঠে হিন্দুদিগের নবতত্ত্ব, বাস্তব, উদ্ভি-তত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্বাবয়বক জ্ঞানের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা এই প্রথম ভাগে আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে হিন্দুদিগের শিল্প, ধর্মনীতি ও আচার ব্যবহার, শিল্পপ্রণালী, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, রাজস্ব নীতি, ব্যবহা-বিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক বিধিব্যবস্থা (International law) বিষয়ক জ্ঞানের বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

প্রাচীন হিন্দুগণ দর্শন শাস্ত্রে অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু বৈষয়িক জ্ঞানে ইহারা নিতান্ত পশ্চাৎপদ ছিলেন ইহাই আমাদের বহুদূর সংস্কার। গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, আমাদের এই ধারণা অমূলক। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস এ পর্যন্ত বহুদূর আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাও এই ধারণার বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য প্রদান করে। ভারতবর্ষে পুনঃ পুনঃ বৃহৎ সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, যশোধর্মদেব, হর্ষবর্দ্ধন, রাজেন্দ্র চোল, ধর্মপাল প্রভৃতি মর্যাদাপূর্ণ বিজ্ঞান সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। বৈষয়িক জ্ঞান হইতে একেবারেই বঞ্চিত হইলে তাহারা এরূপ বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন বা তাহা শাসন করিতে সমর্থ হইতেন না। এতদ্বিধ, এরূপ বিস্তৃত ভূখণ্ড বাহাদিগের শাসনাধীনে ছিল রাজ্য শাসন সম্পর্কে তাহারা কোনরূপ সূচিকিত বোধবাধ বা বিঘনি প্রতিষ্ঠিত করিয়া বান নাই এরূপ হইতে পারে না। গুরুনীতি, কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র, মুক্তি

\* The Positive Back ground of Hindu sociology. By Professor Benoy Kumar Sarkar, M. A. Published by Sudhindra Nath Vasu, at the Panini office, Bahadurganj, Allahabad.

জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

কল্পতরু প্রকৃতি গ্রন্থটি সেই চোঁটারই কল । এত সমস্ত  
গ্রন্থ হিন্দুদিগের রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্ববিধ  
বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করে ।

হিন্দুদিগের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্পর্কেও আমরা ব্রাহ্ম  
সংসার গোবর্ষ করিয়া আসিতেছি । হিন্দুরা কখনও  
বিজ্ঞানালোচনার পারদর্শী ছিল এ কথা বলিলে এত-  
কোঁর শিক্ত লোকের নিকট হাস্যস্পদ হইতে হয় ।  
কিন্তু আপামের খ্যাতিনামা শিল্পী ও লেখক শ্রীযুক্ত  
কাকাসু ওকাকুরা (Kakasu Okakura) এসম্বন্ধে Ideals  
of the East (প্রাচ্য আদর্শ) নামক গ্রন্থে বাহা লিখিয়া-  
ছেন তাহা আমরা নিরে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি —

India has carried and scattered the data of  
intellectual progress for the whole world, ever  
since the pre-Buddhistic period when she produc-  
ed the Sankhya philosophy and the Atomic  
theory ; the 5th century, when her mathematics  
and astronomy find their blossom in Aryabhatta ;  
the 7th, when Brahmagupta uses his highly  
developed Algebra and make astronomical  
observations ; the 12th, brilliant with the glory  
of Bhaskaracharya and his famous daughter,  
Jyoti to the 19th and 20th centuries themselves  
with Ramohandra (?) the mathematician and  
Jagadishchandra, the physicist.

( Ideals of the East )

ভাষ্য—বৌদ্ধগণের পূর্ব হইতেই সমগ্র জগতের  
উপকারার্থ ভারতবর্ষ মানসিক উন্নতির মূল স্রোতস্বিনী  
বারাবাহিকরূপে অঙ্গুলরণ ও প্রচার করিয়াছে । ঐ  
সময়েই ভারতবর্ষে সাংখ্যদর্শন ও পরমাণুতত্ত্ব আবিষ্কৃত

হইয়াছিল । পঞ্চম শতাব্দীতে আর্য্যভট্টের প্রতিভা পাচী-  
গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিকশিত হইয়াছিল ; সপ্তম  
শতাব্দীতে ব্রহ্মগুপ্ত-বীর উন্নত বীজগণিতের ব্যবহার ও  
জ্যোতিষশাস্ত্রের পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন ; অষ্টম  
শতাব্দী ভাস্করাচাৰ্য্য ও তাঁহার কন্তার গৌরবে আলোকিত  
হইয়াছিল । ঊনবিংশ শতাব্দীতেও গণিতশাস্ত্রবিদ  
রামচন্দ্র (?) ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিদ জগদীশচন্দ্র  
আবিষ্কৃত হইয়াছেন ।

হিন্দুদিগের বৈজ্ঞানিক বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্বন্ধে  
ব্রাহ্ম ধারণার কারণ এই যে, ভারতের কাব্য, দর্শন ও  
পুরাণ প্রকৃতি সাধারণ্যে যতদূর প্রচারিত হইয়াছে,  
ততদূর বা লীলাবতীকাতীয় গ্রন্থ ততদূর হয় নাই ।  
ইহার আরও এক কারণ আছে, গ্রন্থকার মুখবন্ধে তাহা  
উল্লেখ করিয়াছেন । হিন্দুদিগের পঞ্চদশ শতাব্দীর  
বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সহিত লোকে সাধারণতঃ পাস্চাত্য-  
জ্ঞানের ঊনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের  
তুলনা করিয়া থাকে । ইহা নিতান্ত অত্যাচার ; কারণ  
ইউরোপীয়দিগের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের চরমোন্নতি বিগত  
১০০ শত বৎসর মধ্যেই হইয়াছে । সুপণ্ডিত ডাক্তার  
ব্রহ্মেন্দ্রনাথ শীলের যত উদ্ধার করিয়া গ্রন্থকার  
দেখাইয়াছেন যে, এই ১০০ শত বর্ষে ইউরোপীয় বিজ্ঞা-  
নের যে উন্নতি হইয়াছে তাহা বাদ দিলে হিন্দুদিগের  
বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের নিকট ইউরোপীয়দিগের বৈজ্ঞানিক  
জ্ঞান প্রকৃতই আসন লাভ করিতে পারে না । \*

\* The astronomy and mathematics (of the  
Hindus) were not less advanced than those of  
Tycho Brahe, Cardan, and Fermat, the anatomy  
was equal to that of Vesalius, the Hindu logic and  
methodology were more advanced than those of  
Ramus and equal on the whole to Bacon's ; the  
physico-chemical theories as to combustion,  
heat, chemical affinity, clearer and more  
rational and more original than those of Von  
Helmont or Stahl, and the grammar whether of  
Sanskrit or Prakrit, the most scientific and  
comprehensive in the world before Bopp, Risk  
and Grimm. Introduction pp. xvi.

বৈবরিক জ্ঞান ও পরমার্থিক জ্ঞান কতকটা পরস্পর-বিরোধী সম্বন্ধে নাই। কিন্তু এই বিরোধের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টাই হিন্দু-সভ্যতার অপূর্ণ বিশেষত্ব। সুতরাং হিন্দুসভ্যতার পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে কেবল হিন্দুদিগের পরমার্থিক জ্ঞানের আলোচনাই যথেষ্ট নহে, বৈবরিক জ্ঞানের আলোচনাও আবশ্যিক। বর্তমান গ্রন্থে বিনয় বাবু সে আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন।

গুরুন্যাসিত কথাই এই গ্রন্থের প্রধান কথা হইলেও গ্রন্থকার কেবল গুরুন্যাসিত আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। গুরুন্যাসিতে যে যে বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটি সম্বন্ধে সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে যতদূর আলোচনা ও অনুশীলন হইয়াছে গ্রন্থকার তাহা উল্লেখ করিয়া তুলনার সমালোচনা করিয়াছেন—যেমন, গুরুন্যাসিতে স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি বিবিধ ধাতুর প্রকৃতি ও ব্যবহার বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার এই প্রসঙ্গে বৈদিক সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া তাত্ত্বিক সাহিত্য পর্যন্ত সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা করতঃ হিন্দুদিগের ধাতুজ্ঞানের এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করিয়াছেন। তত্ত্বের আধুনিক প্রকৃত্ত্ববিদগণ ও পাশ্চাত্য পণ্ডিত-মণ্ডলী কর্তৃক এবিষয় কিরূপ আলোচনা হইয়াছে তাহারও বিবরণ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। গুরুন্যাসিত উদ্ভিদ-বিজ্ঞা, প্রাণীবিজ্ঞা প্রভৃতির আলোচনারও ঠিক এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থ প্রণয়নে গ্রন্থকারকে যে কতদূর গবেষণা করিতে হইয়াছে সহজেই অনুমিত হইতে পারে। ফলতঃ এই পুস্তকখানিকে একখানা ছোটখাট বিশ্বকোষ বলিলে অত্যাঙ্কিত হয় না। একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ইহার বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করা অসম্ভব।

গ্রন্থকারের বিচার-প্রণালীও আমাদের নিকট সুসঙ্গত বোধ হইয়াছে। কিন্তু একটি বিষয় এই প্রবন্ধে উল্লেখ করা আবশ্যিক বনে করি। কোন বিষয়ের

অনুসন্ধান দৃষ্ট হইলেই তাহার অনতিদূর করা করা পাশ্চাত্য প্রকৃত্ত্ববিদগণের বৈজ্ঞানিক বিচারপ্রণালীর অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেইরূপ কোন বিষয়ের বর্তমান সময়ে অতাব দৃষ্ট হইলেও সিদ্ধান্ত করা হয় যে প্রাচীন কালে তৎসম্বন্ধ জ্ঞানের অভাব ছিল। বৌদ্ধপূর্ব যুগের কোন অট্টালিকা এখন ভারতবর্ষে বর্তমান নাই। এই কারণে সিদ্ধান্ত করা হইল যে, অশোকের পূর্বে ভারতবাসীরা অট্টালিকা নিৰ্মাণ করিতে- অনিউন না। এ যুক্তি যে ভ্রমপূর্ণ তাহা বলা অসম্ভব। তর্ক শাস্ত্রে ইহাকে argumentum ad silentio বলা হইয়া থাকে। গ্রন্থকার যয়ঃ এই প্রণালীর নিষ্পত্তি করিয়াছেন কিন্তু তথাপি কোন কোন বিষয়ে তিনিই আশ্রয় এই প্রথা অবলম্বনে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

গ্রন্থের পরিশিষ্টও অতিশয় মূল্যবান। উহাতে শ্রীযুক্ত এজেন্সি নাথ শীল হিন্দুদিগের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত উহার তুলনার সমালোচনা করিয়াছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশীয় বিজ্ঞান শাস্ত্রে বাহাদের পত্তীর অধিকার নাই তাহাদের দ্বারা এই কার্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না। ফলতঃ শ্রীযুক্ত এজেন্সি নাথ শীল তত্ত্বের আতি অল্প লোকেরই এবিধে হস্তক্ষেপ কারবার সামর্থ্য আছে। তাহার আলোচনা সংক্ষিপ্ত ও চমকিত হইলেও তিনি এক প্রয়োজনীয় বিষয়ের সুবন্ধ কল্পিয়াছেন। বিনয় বাবু উহা গ্রন্থশেষে সন্নিবেশিত করিয়া গ্রন্থখানাকে অধিকতর মূল্যবান করিয়াছেন। এই গ্রন্থে আরও অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের অবতারণা আছে, হানাতাবে তাহাও আলোচনা করা গেল না। শিক্ষিত ব্যক্তি যাদেরই এই গ্রন্থ পাঠ করা উচিত।

## গ্রন্থসমালোচনা

**মল্লিকা।** শ্রীমতী চারুবালা দেবী প্রণীত।  
মূল্য ১০ আনা।

প্রকাশক শ্রীমদ্বাবনচন্দ্র বসাক, এলবার্ট লাইব্রেরী,  
নবাবপুর, ঢাকা। গ্রন্থের ছাপা, কাগজ ও পরিচ্ছদ  
উত্তম।

এখানে কবিতা গ্রন্থ। লেখিকা হিন্দু ভক্ত পরি-  
বারের অন্তঃপুরবাসিনী। তিনি স্বয়ংই লিখিয়াছেন  
“মাতৃভক্তির লিখিত যে ভাবের পরিচয়, সে ভাবের সেবা  
করা, সে ভাবকে ভালবাসা, কতব্য কন্ম বলিয়া আমার  
বিশ্বাস, এই ‘মল্লিকা’ তাহারই অতি অক্ষম নিদর্শন।”  
লেখিকা আরও বলিয়াছেন যে তিনি কবিতা-প্রাধিকার  
হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন না। লেখিকার বিনয়  
প্রশংসনীয় কিন্তু তাঁহার কাব্যের রচনাকে কোন ক্রমেই  
অক্ষমতার নিদর্শন বলা যাইতে পারে না। এই গ্রন্থে  
এমন অনেক কবিতা আছে যাহা কেবল ছন্দোবদ্ধ কথার  
সমষ্টি মাত্র নহে। বিশেষতঃ কয়েকটি শোকের কবিতার  
ভাবের আন্তরিকতা মর্মে মর্মে অনুভূত হইবে।

**কুসুম-মণ্ডলিকা।** শ্রীমদ্বাবনাথ দেন প্রণীত।  
মূল্য এক টাকা।

এখানে অনেক বই। ১১ এগারটি গল্প সুবৃহৎ মণ্ডলে  
সুচারুভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রায় সমস্তকে উপহার দিবার  
অনুপযুক্ত নহে।

গ্রন্থকার রবীন্দ্রবাবু বাঙ্গলা সাহিত্যের  
পাঠকের অপরিচিত নহেন। রবীন্দ্র বাবুর লেখাতে যে  
একটি অপূর্ণ মিস্ট্র আছে তাহা অস্বীকার করিবার  
উপায় নাই। গল্পোন্নিবিষ্ট পাত্র-পাত্রীর স্থান-কাল  
বর্তমান বঙ্গদেশ হইতে দূরবর্তী হওয়াতে উন্নিবিষ্ট  
অপূর্ণত্বের রমণীয়তা বর্ধিত হইয়াছে।

গ্রন্থকারের সাহিত্য-কৃতিত্ব বর্ধিত হইবার আশা  
আছে বলিয়া আমার তাঁহারি একটি বিষয় ক্রটির কথা  
লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইলাম। রবীন্দ্রবাবুর ভাষা  
স্থানে স্থানে অপূর্ণ সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিলেও  
সকল স্থানে নির্দোষ নহে। রবীন্দ্রবাবু একেবারে নুতন  
লেখক নহেন। অতএব তাঁহার ভাষাপ্রয়োগে আকৃতিগত  
ও আঙ্গিকারিক দোষ থাকি। প্রাচর্য্য ও পারতাপ উভয়েরই  
বিষয়। আশাকরি গ্রন্থকার ভবিষ্যতে সাবধান হইবেন  
ও এই পুস্তকখানির একটি দোষযুক্ত সংস্করণ করিবেন।  
ব্যাকরণগত ও আঙ্গিকারিক দোষ থাকিলেই যে ভাষা  
সুপ্রাচ্য ও ভাবপ্রকাশক হইয়া উঠিবে তাহা নহে।  
বরং সুমধুর ভাষাটি দূষিত ভাষায় প্রকাশিত হইলে  
শিক্ষিত পাঠকের পক্ষে রসবোধের ব্যাঘাত উপস্থিত  
হয়। আমরা রবীন্দ্রবাবুর হিতাকাঙ্ক্ষা বলিয়াই এত কথা  
বলিলাম।

সমালোচক



মনে ভাবি গোন্ধ নাথে তানে পাঠাইল।  
 বাঁধিয়া আনিতে তারে পানাই (১) পাঠাইল।  
 তখনে পানাই গীয়া ধরিলেক বলে।  
 নামাএ আসনে তারে ধরিয়া আচলে।  
 তাহারে দেখিয়া তবে বলিলেক রোবে।  
 এমত আসনে যায় কেমত সাহসে।  
 গোকের বচনে যোগী বহল কেটাই। (২)  
 আমার বচন শোন নাকর বড়াই।  
 বনমধ্যে তুমি ওতি যে গোকীই।  
 এখানে রৈয়াছ তোমার গুরু কোন ঠাই।  
 বড়াই না ছাড় গোক তিরানর কোন ফলে। (৩)  
 তোমার গুরু পড়িয়াছে কদলার ভোলে।  
 যোর গুরু চাহতে বেড়ানু এতুৎনে।  
 ত্রিতে ত্রিতে গেলাম কদলার স্থানে।  
 দেখিলাম \* \* \* \* নাহি।  
 \* \* \* \* \*  
 দশন গলিত হৈল পাকা মাথার কেশ।  
 কামিনার কোলে তার ভীষন কৈল শেব।  
 বয়স হৈল তার দিন নাহি আর।  
 শরীরেত রস নাহি অস্থিচর্শ সার।  
 তাহারে দেখিয়া গেল যমের তোবন।  
 তখাতে দেখিল (৪) আমি তাহার লিখন।  
 তিন দিন বাকী আছে আর হৈল শেব।  
 তাহাকে আনিতে যবে করিছে আদেশ।  
 যদি বা না চায় গোক কলঙ্কের ডর।  
 ত্রিতে তবে ত গিয়া গুরু রক্ষা কর।

তত্ত্ব কথা কহি আমি শুনরে গোকীই।  
 ছেন গুরু রক্ষা পার ঠাকুর মিনাই।  
 কানাইব বচনে গোকের আ (খাস) বিশেষ।  
 তোমার গুরুর নাম হইতে শুনহ উদ্দেশ।  
 বন্দ্য হৈছে তোমার গুরু মেহারকুলেতে।  
 নির্ণয়ে দেখিল আমি কহিল তোমাত্তে।  
 মেহার কুলেত আছে পড়িহি ডাকনি।  
 মৈনামতি নাম তার দাকার বারনী।  
 বিধবা রমণী সে যে পুত্র রাজেশ্বর।  
 দৈবমতি হাড়িকা এ বকে তার ঘব।  
 তার পুত্র গুপিচান্দে বান্ধিয়া রাখিল। (৫)  
 মাটির করিয়া পড় তাহাকে খুইল।  
 হস্তি সব বান্ধি থাকে তাহার উপর।  
 রাজি দিন বকে সিদ্ধা তাহার ভিতর।  
 দুই শিষ্য পাইল দুই গুরুর উদ্দেশ।  
 দুইর হইল তবে তেন মত ভেস।  
 কোলাকুলি করি তারা একত্রে বলিল।  
 যাএ যেই গুরুর যে উদ্দেশে চলিল।  
 কালফা চলিয়া গেল মেহার কুলেত।  
 ততক্ষণে গোক নাথ চলে কদলিত।  
 ভাবিয়া চিন্তিয়া চাইল যতি যে গোকীই।  
 যমপুরে গিয়া যে গুরুর লেখা চাই।  
 সিদ্ধের বাতা সিদ্ধের সুল তুলিয়া দিল নাএ।  
 হাতে লাঠি লইল পানাহি দিল নাএ।  
 এহি মতে চলিয়া গেল যমের আলএ।  
 সস্তা করি বলিয়াছে যম মহাশয়।  
 গোকেরে দেখিয়া যম উঠিল আপনে।  
 হাত ধরি বৈসতিল আপনা আসনে।

(১) কুড়া; উপানং হইতে আসিয়াছে।

(২) কেটকেটাইয়া, একিয়া।

(৩) বাঁচিয়া থাকার ফল কি?

(৪) উত্তম পুরুষে “দেখিল” “গেল” ইত্যাদি প্রথম

পুরুষের ক্রিয়াপদ ব্যবহার এইরূপ।

(৫) হাড়িকার উপর কুড় হইয়া গোপীচাঁদ তাহাকে মাটির নীচে বন্দি করিয়া রাখিয়াছিল এই বিবরণ ভবানী দাসের মরনামাতর পুথিতে নাই, কিন্তু দিনাকপুর হইতে প্রাপ্ত গুরুর মহামন্দের মরনামতির পুথিতে আছে।



যমরাজে বলে শোন গোন্ধনাথ বতি।  
 কি কারণে আগমন এথা মহামতি ॥  
 গোন্ধনাথে বোলে শুন ধর্ম অধিকারী।  
 আমার বচন শুন ধর্ম অজুসারি ॥  
 অনাদি নিধন জান মিন মহাশয়।  
 গুরুরূপে কদলিতে পড়িছে নিশ্চয় ॥  
 তুলিয়া রহিল মিন কদলীর নগরী।  
 তাহারে তরুণ কেনে মৃত্যু অধিকারি ॥  
 যদি জুগি আনিতে চাও আপনা তবন।  
 চল তুমি আমি যাউ ব্রহ্মার সদন ॥  
 বিষয়ের কালে কেহ না চিনে আপনা।  
 মনেত ভাবিয়া চাহ তুমি কোন জনা ॥  
 আমার বতের দল জানহ যখন।  
 পৃথিবী সাহেত তোরে করিমু গ্রহণ ॥  
 কেবা তোরে দিল বিষয় কহ মোর ঠাই।  
 কহ কহ করি গোন্ধে উঠিল কেটাই ॥  
 সাকী হৈয় চক্রে সূর্য্য তোমরা ত্রিভুবন।  
 কোথ হইয়া কামবান টানে মহাজন ॥  
 হুঙ্কার করিয়া গোন্ধে কামে (১) কৈল মন।  
 টলমল কৈল যত যমের ভবন ॥  
 কোথ দেখি গোন্ধনাথের যম কাঁপে ডরে।  
 বতের কাগজ আনি দিলেন পোচরে ॥  
 একে একে যত পড়ি চাহে বিচারিয়া।  
 আপনা গুরুর লেখা চাহে মন দিয়া ॥  
 গুনিয়া যমের কথা হরষিত মন।  
 মুছিল কাগজ চাহিয়া গুরুর লিখন ॥  
 লেখা মুছিয়া গোন্ধনাথ আসিল উঠিয়া।  
 বকুল বৃক্ষের তলে বসিল আসিয়া ॥  
 বত নাথে বলে নন্দ মেনন্দ মোর ভাই।  
 ভাগ্য কলে রক্ষা পাইল ঠাকুর মিনাহ ॥

ভাগ্যে আসি কালকাএ মোরে দিল খোটা।  
 ইকিতে বাদিল আমি যমরাজ্যর খাটা ॥  
 গুরুর নামে কাটা দিয়া আইলাম যমরাজ্য পুরী।  
 এজন্যে শবনের ভয় রাখিলাম সবার ॥  
 কায়্য গুণি বাইলেক বোলশ কদলি।  
 যত রাস আছিলেক সব নিল হরি ॥  
 সাত পাঁচ ভাবি নাথ মনে কৈল সার।  
 নিশ্চয় করিমু মুই গুরুর উদ্ধার ॥  
 নিজরূপ ধার যদি কদলিতে জাহ।  
 ভোগেতে পড়িছে গুরু দৈবে দেখা পাই ॥  
 গোন্ধনাথে বোগে নন্দ মোহানন্দ ভাই।  
 শ্যামত ব্রাহ্মণরূপে গুরুরে বুঝাই ॥  
 নন্দ মহানন্দে যদি প্রভুর রাজ্য পাই।  
 রাজ্য অরূপে কর্ম করিবারে চাই ॥  
 নাথ বোলে কাটে যায় বিশ্বকর্মার ঠাই।  
 আমার সংবাদ জানে কহিবা বুঝাই ॥  
 তাহান স্থানে সংবাদ কাহবা ভালে ভাল।  
 রত্নময় করি দেউক হুই জোড় তাল ॥  
 কাব্য নাম খাদল দেউক বাঁচএ জে ছানি।  
 সুবর সুন্দর যেন জগতে বাখানি ॥  
 তার ঠাই মোর যে আছে কএক কথা।  
 সোবর্ণের গুণ গঠিয়া দেউক যে পিতা ॥  
 সোবর্ণের লাড় দেউক সুবর্ণের ছাতি।  
 সুবর্ণের গাড়ু দেউক সুবর্ণের জুতি ॥  
 ততক্ষণে বদিলেক গুরুর চরণ।  
 প্রভুর আদেশে নন্দ করিল গমন ॥  
 বিশ্বকর্মা জানে নন্দ দিল দরশন।  
 কহিল নাথের যত সন্তাধ (২) চন ॥  
 কদলির ভোলে মিন ডুবয়া রহিল।  
 জানে উদ্ধারিতে নাথ আপনি চলল ॥

যোগীরূপে বাইতে নারে কদলির দেশ ।  
 বিজ্ঞরূপে যথা ভবা করিব প্রবেশ ॥  
 ব্রাহ্মণের সর্জদ্বিতে করিছে আদেশ ।  
 পথ নিরক্ষিয়া নাথে বসিছে বিশেষ ॥  
 বিশ্বকর্মাএ বাদ পাইল নাথের সংবাদ ।  
 সুবস্ত্রের সর্জ দিল করিয়া প্রসাদ ॥  
 ভাঙ ভরিয়া সর্জ লাহলেক নন্দ ।  
 দেখিয়া সুবর্ণ সর্জ হইলেক রঙ্গ ॥  
 গলে তিন গুণ দিল কপালেতে ফোটা ।  
 মাথিতে আলিঙ্গা ছাতি নন্দে লইল লোটা ॥  
 আগে পাছে দুই দ্বিধা নন্দ মহানন্দ ।  
 হাতে তুলি লইল নাথে সুবর্ণের ভাঙ ॥  
 ব্রাহ্মণ হইয়া নাথে কদলিতে যায় ।  
 এক দৃষ্টে কদলির সভাএ রঙ্গ চায় ॥  
 নমস্কার কৈল বোলে হও দীর্ঘজীবী ।  
 সভা আশীর্বাদ কৈল প্রভু থাক সবী ॥ (১)  
 যতিনাথে বগে নন্দ উঠি ফির যাই ।  
 এইমতে নাপারিষু আনিতে গোঁগাই ॥  
 বিজ্ঞরূপে দেখি সব কৈ নমস্কার ।  
 আশীর্বাদ না করিলে লোকে কৈব ভাড় ॥  
 সিংহার বচন যথা না হয় কদাচন ।  
 আশীর্বাদ দীর্ঘজীবী হৈব সর্জনন ॥  
 বলিয়া জতিনাথে আসিল উঠিয়া ।  
 পুনরাপি বৈষ্মু জুগি কন্তে কুণ্ডল দিয়া ॥  
 নাথে বোলে শুন কহি মহানন্দ ভাই ।  
 যোগীরূপে আসিবাম গুরুরে বুঝা ॥  
 ই বলিয়া জাতনাথে আসন তুলিল ।  
 বুঝাইতে মিননাথ গোকর্ষে চলিল ।  
 আসন তুলিয়া নাথ শূভ্রে কৈল ভর ।  
 সাহান (২) উড়য়ে যেন আকাশ উপর ॥

(১) প্রভুর সেবাতে অবস্থান কর ।

(২) বোধ হয় একরকম পাখী । (চিল ?)

ভ্রমিতে ভ্রমিতে নাথ যায় ধীরে ধীরে ।  
 যেন দেখে চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবীত কীরে ॥ (৩)  
 চাহিতে চাহিতে দেশ কদলিতে যারে ।  
 গগনে থাকিয়া বত দেবগণে চাহে ॥  
 বায়ুভরে যায় যোগী বিদ্যাতের গতি ।  
 ঘরে ঘরে পতাকা দেখয়ে পাতি পাতি ॥ (৪)  
 খেটমুখে চাহে নাথ সৈন্যে করি ভর ।  
 মঙ্গল বিধানে দেখে কদলির ঘর ॥  
 একে একে গোক নাথ সর্জরাজ্য চাহে ।  
 স্থানে স্থানে অগুরু চন্দন গন্ধ পাই ॥  
 নাথে বলে এই রাজ্য অতি বড় ভালা ।  
 চারি কড়া বিকি যায় চন্দনের তোলা ॥  
 সকলের গাএ দোখ পাটের পাইড়া ।  
 প্রতি ঘরে ঘরে দেখ সোণার কুমোর ॥  
 কাহার পুঙ্কনির জল কেহ নাহি খাএ ।  
 হিরামন মাণিক্য দেখি রৌদ্রেত শুকাএ ॥ (৫)  
 এক রাউলের (৬) ঘরে দেখে দুই তিন নারী ।  
 যোশ রহণী লৈয়া মিনে করে কেলি ॥  
 সুবর্ণের গৃহ সব বিচিত্র নগর ।  
 সকল নগরে দেখে বড় বড় ঘর ॥  
 কাকনে রচিত ঘর রত্নশোভা করে ।  
 সুরমা পতকা তাথে প্রাচীর উপরে ॥  
 রাজ্যের ভিতরে নাথে দেখে নানারঙ্গ ।  
 মিননাথ রাহিয়াছে যুঁতীর সংহ ॥  
 ধর্ম্ম রাজ্য গুরুদেব করিল বাসখানি ।  
 সোনার কলাস ভরি লোকে যায় পানি ॥

(৩) চন্দ্রসূর্য্য যেমন করিয়া পৃথিবীকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া  
 দেখে সেই রকমে ।

(৪) সারি সারি ।

(৫) ভবানীদাসের মরনামতীর পুথিতে এই দুই  
 লাইন প্রায় অবিকল ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে ।

(৬) গৃহস্থ (৭) বাড়ির বিপরীত ।

সরসাক্ষ্য দেখে নাথে এক সমসর । (১)

শুক দিছে সরোবর দেখয়ে সমর ।

উত্তম যে সরোবর নির্মল যে জল ।

হংস চক্রবাক শোভে পদ্ম যে উৎপল ।

তারার উত্তর পাড়ে উত্তম বকুল ।

বকুলের তলেদেখে নির্মল আছে তল ।

আসন মেলাইয়া বসে বকুলের তলে ।

আসন নামাইয়া নাথে হরি হরি বোলে ।

কেহতে জানিব আমি রাজ্যের বিবরণ ।

সরস \* \* \* করিল অরণ ।

কার ঠাই পুছিযু যে বুলিবাম সার ।

কেহতে জানিব মুঠ রাজ্যের ব্যবহার ।

সাতপাঁচ ভাবি মনে দেখে গোকর্ক চাহি ।

কাথে কুন্ত বাইল এক কদলির বাই ।

তরুতলে বসিয়াছে গোকর্ক মহামুনি ।

আচম্বিত মিলিল আসি নগরের জুগিনি ।

জলে ভরি উটে নামে সরোবর কুলে ।

নাথে যোগিনীরে দেখে জল ভরি চালে ।

দেখিয়া নাথের রূপ নারী গেল ভোলে ।

হানিল স্বনরূপ শরীরের দলে ।

চাহিতে চাহিতে নারী নিকটে আসিল ।

আপনার যতগুণ কহিতে লাগিল ।

কটিদেশে হাতদিয়া বামা কহে ছলে ।

পরোধরে বস্ত্রনাহি রত্নহার ধোলে ।

কোন দেশে থাক যোগী কোন দেশে বর ।

কি কারণে আসিয়াছ কদলি নগর ।

আমার রাজ্যের রাজা জৈবর বিনাহ ।

সে অবধি নাহি দেখি প্রদেপী (২) যোগাই ।

প্রদেপী যোগীয়ে পাইলে চরে নেয় ধরি ।

দক্ষিণ পাটনে নিরা ফালাএন্ত বারি ।

(১) সংসার ।

(২) বিদেপী ।

লৈকে লৈকে যোগী সব ফেলিয়াছে বারি ।

বরার দুর্গকে পথে চলিতে না পারি ।

বত যোগী মথিতেছে আসিয়া কদলী ।

মাংস খাইয়া যথাপুষ্ট দুর্জল ত্রীকালি ।

অনেক মরিল যোগী কদলিতে আসি ।

আজি কালি মধ্যে তোরে মাঝে হেম বাপি ।

বত যোগী কদলিতে দিয়া আছে সাল ।

রাতি দিনে খায় মাংস শুকুন ত্রীকাল ।

মল্লা কমলা আর দুই পাটেশ্বরী ।

তাহারে যে সেবা করে ষোলশত নারী ।

বুড়া যোগী পাইলে চাপড়ে ভাঙ্গে গাল ।

বুঝা যোগী পাইলে তুলিয়া দেয় সাল ।

অধ্যবসের (৩) যোগী পাইলে কমরে তুল কাটে ।

পোলা যোগী পাইলে পাটাতে তুল বাটে ।

স্বন্দর দেখিয়া তোমা পোড়ে ঘোর মন ।

তে কারণে কহিল আমি ইসব বচন ।

ধন্য ধন্য যোগী তুমি ধন্য মায় বাপ ।

কমল শরীর তোম দেখে লাগে তাপ ।

তব্ব না জানিয়া যোগী এখানে আইলা ।

এ দেশে আসিয়া তুমি বিপাকে পড়িলা ।

## নাচাড়ি দীর্ঘ ছন্দ ॥

দেখিয়া নাথের রূপ : যোগিনী হইল সজ :

সুন সুন প্রদেপি যোগাই ॥

বত কিছু আমি কই : সত্য হেন জানিবা সেই :

আমার বাড়ীতে চল বাহি ॥

তোমার সাহস বড় : মনেত নাহিক ডর :

না ভায়ে দেশের ব্যবহার ॥

(৩) অর্দ্ধ বয়সের ।

# প্রতিভা

৪র্থ বর্ষ

পৌষ ১৩২১

৯ম সংখ্যা

## আহোম-আকবর রুদ্রসিংহ

বঙ্গের লোকসাধারণ এখন আসামের কথা কিছু কিছু জানিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইতঃপূর্বে আসাম বলিলেই 'চা-বাগান', 'কালাজর' ইত্যাদির কথাই তাহাদের মনে উদ্ভিত হইত। সম্প্রতি আসামের অনেক কথা বাঙ্গালার আলোচিত হওয়াতে অজ্ঞতা কিছুটা কমিয়াছে। ইংরাজের অধিকারের পূর্বে এই আসাম যে একটি পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজ্য ছিল, এবং বহু পূর্বেও যে ইহা গৌরবমণ্ডিত প্রাগজ্যোতিষ বা কামরূপ রাজ্যের একটা বিশিষ্ট অংশ ছিল, এই কথা এখন শিক্ষিত লোক বাজেই অবগত আছেন। তথাপি আহোমগণের পরিচয় এতলে সংক্ষেপে দুই চারটি কথায় বলা আবশ্যক মনে করিতেছি।

ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ষাঁহাদের কাছ হইতে আসামের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা ই আহোম জাতীর ছিলেন। ইহাদেরই নাম অনুসারে এই প্রদেশের নাম 'আসাম' হইয়াছে। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে আহোমগণ ব্রহ্মদেশ হইতে গিরিমালা ও অরণ্যানী অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উত্তর-

পূর্বাংশ অধিকার করেন, এবং ক্রমশঃ চুটিয়া ও কাছাড়ী-দিগকে তাড়াইয়া দিয়া সমগ্র উপত্যকার অধিকাংশ আপনাদের শাসনাধীনে আনয়ন করেন। ইহারা মূলতঃ বগ্দের সগন্ধ অনার্য্য হইলেও এই উপত্যকার আসিয়া হিন্দু সভ্যতালোকিত কাছাড়ী, কোচ প্রভৃতির সংস্রবে পড়িয়া ক্রমে ক্রমে আৰ্য্যোচার গ্রহণ পূর্বক দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তিপরায়ণ হইয়াছিলেন।

প্রবল পরাক্রমের সহিত আহোমরাজগণ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার রাজদণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন। এমন কি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মহাপরাক্রান্ত মোগল সাম্রাজ্যের সহিত যখন আহোমদের সংঘর্ষ ঘটিল, তখন তাঁহারা মোসলমান সৈন্য কর্তৃক নিজ রাজ্য আক্রমণে প্রবল বাধা দিতে সমর্থ হইলেন, এবং কিকিদ্দিক অর্দ্ধ শতাব্দী কাল যুদ্ধ করিয়া পোয়ালপাড়া জেলার পূর্ব সীমানা পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার পূর্বক মোহনদীর অনীকিনীর সর্বত্র অপ্রতিহত গতির ব্যাঘাত-প্রাকার রূপে সগৌরবে বিরাজমান হইয়াছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর এই গৌরবমণ্ডিত শৈব পাদের ইতিহাস বৈচিত্র্যময় ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ। ঐ সময়ের সকল কথার এতলে আলোচনা করাও সম্ভব হইবে

বিবেচনা আয়োম-রাকুল-ললামত্ব। সত্য  
কল্প রসসিক্ত পবিত্র কাহিনী এখন  
বালাগা 'পুস্তক' ও 'পত্রিকা'-পাঠক বর্ণের  
বিবিত্ত নাই,—তাহাও এই সময়েরই একটি ঘটনা;  
কল্পসংকে তাৎকালিক ইতিহাসের বহু কথা সপ্রতি  
সত্যের সাহিত্য সেবার অনেকটা পারচিত হইয়া পড়-  
য়াছে। আয়োম-রাকুলের রূপসিংহ সত্য-নিরোমণ  
কল্পসংকেই পড়সমুদৃত।

আমরা এই আয়োমবংশ-ভাষ্যর রূপসিংহকে  
মোগল কুলরবি আকবরের সঙ্গে তুলিত করিতেছি।

আকবরের পিতা হুমায়ুনকে যেমন পৈতৃক সিংহা-  
সনে হইতে আততায়ী কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া দুর্গম  
পর্বত-কাছারে পরিত্রাণ করিতে হইয়াছিল, সেট-  
রূপ রূপসিংহের জনক গদাধরসিংহও পিতৃরাজ্য  
হইতে বঞ্চিত হইয়া অরণ্যগিরিসংকুল অসত্য জ্ঞাতি  
কর্তৃক অধ্যবিত্ত কু-তাপে বিচরণ করিতে বাধ্য হইয়া-  
ছিলেন। উভয়েরই শৈশবাবস্থা দুঃখে কষ্টে নানা  
অসুখের মধ্যে বাপন করিতে হইয়াছিল—ইহাতেই  
উভয়কেই লেখাপড়ার শিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত হইতে  
হইয়াছিল। উভয়েরই রাজত্বকালে স্ব স্ব বংশের  
রাজ্যের চরম পার্শ্বাতি ঘটিয়াছিল। আকবরের  
সময় পরেই যেমন মোগল সাম্রাজ্যের অধোগতির  
মুহুর্ত্ত হইয়াছিল, রূপসিংহের পরেও তেমন কিছু  
কালের মধ্যেই আয়োম বংশের অধঃপাতের সূচনা  
হইল।

১৬০৬ খ্রীস্টাব্দে রূপসিংহ ও আকবরের অবাধিত পর-  
স্পরিক মরণোৎসব একটা শত্রুজের কথা উল্লেখযোগ্য।  
মোগল বাকশাহ যেমন সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের জীড়নক  
বশত হইয়া লাঞ্চিত হইয়াছিলেন, রূপসিংহের পুত্র শিবসিংহ  
ও রাজ্যে ফিরিয়া আসার উপর রাজকর্মে পরিত্রাণের  
কল্প করিয়া মিলেইকানে অবস্থান করিয়াছিলেন।  
১৬০৬ খ্রীস্টাব্দে আয়োম বংশের যে অধঃপাত  
হইল তাহাও ঘটিয়াছিল।

মহারাজ রূপসিংহ ১৬১৬ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসন  
আরোহণ করেন। খেসকল ব্যক্তি মহাবীর রাজনীতি  
লগাটে ধারণ করিয়া কার্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হন, সূচনারই  
তাঁহাদের মাহাত্ম্য প্রকাশ হইয়া পড়ে। আয়োম-  
রাজবংশের প্রথা ছিল, সর্বপ্রথম সিংহাসনে আরোহণ  
করিবার সময় বহুস্তে একটি নরদেহ তরবারি দ্বারা  
বিষাক্ত করিয়া নব ভূপতি স্বীয় নিবন্ধন ক্রমতালান্তে  
পতিত হইতে দান করিতেন। রূপসিংহ মাতৃবেগে পরিবর্তে  
একটি মাহিষ কাটিয়া সিংহাসনারূঢ় হইয়া একটি  
অসুখ নৃশংস প্রহার মূলোচ্ছেদ করেন। অশ্বচ বলবতার  
প্রভাবে মাহিষ পাটা মাহিষ কাটা অপেক্ষা অধিকতর  
শ্রেষ্ঠবাক্যক। আকবর যেমন বিশাল ও মনোহর  
সমাদি-মন্দির নিৰ্ম্মাণ করিয়া স্বীয় পিতা হুমায়ুনের  
কৃত অসাধারণ ভক্তি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন  
মহারাজ রূপসিংহও তেমন পিতা গদাধর সিংহের  
সমাধিস্থানে তাঁহার প্রাতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া দৈনিক  
সিঁতার প্রাণ পাশ্ত্র দ্রব্য দ্বারা পূজা করিবার ব্যবস্থা  
করিয়াছিলেন। জননী জরমতী যে স্থানে প্রাণত্যাগ  
করিয়াছিলেন সেই স্থানে “জয় সাগর” নামক একটি  
প্রকাণ্ড দীর্ঘকা খনন করাইয়া দিয়া তাহার তীরে  
‘জয় দোল’ নামক বিষ্ণু মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন।  
‘জয়সাগরের’ আয় বিংশ সেরাবর আসানে আর  
নাই। ইহার পরিমাণ ফল ১৩২ একর হইবে।

আকবর যেমন নানারূপ সুরম্য দর্শ্য নিৰ্ম্মাণ  
করিয়া রাজধানী ভূষিত করিয়াছিলেন, রূপসিংহও  
স্বীয় রাজধানী রংপুর \* বিবিধ ইষ্টকালর দ্বারা  
শ্রুশোভিত করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার রাজ্যের  
তাল রাজস্বী না থাকাতে তিনি কোচরিবার রাজ্য  
বনজায় নামক জনৈক বাকানীমিত্রকে আনাইয়া

\* ইহা বঙ্গের রংপুর নগর, সর্বদা বিন্দুসাগর  
সমীপস্থ হইয়াছিল।

বিস্তারিত নির্ধারণ করা হয়নি। বনগ্রাম কুঙ্গসিংহের  
একই বহু অর্থ সম্বন্ধিগাহারে বাড়ী ফিরিয়া যাটনার  
নম্বর দেখা গেল যে, উহার নিকটে তাহার আবাসগৃহ  
প্রকৃতির নকশা রহিয়াছে। ইহাতে বনগ্রামকে সঙ্গে  
কুলমান নৃপতির চর মনে করিয়া উহার পানকও  
কিহিত হইয়াছিল। \*

আকবর শাহ যেমন নানা জাতি ও জনপদের  
মোগলবাহিনী প্রেরণ পুরস্কার আপন আদিপুত্র বিজয়  
ও সুদূর করিয়াছিলেন, মহারাজ কুঙ্গসিংহও রাজ্য  
ও অসুখীরদের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া আহোমদের বিজয়  
নাম গ্রীষ্ম প্রদেশের সুরমা নদীর তীর পর্য্যন্ত স্থপতিত  
করিয়াছিলেন। আগাম প্রদেশের চতুঃপার্শ্বে বহু পার্বত্য  
জাতির অধিবাস। কুঙ্গসিংহ সমস্ত জাতিতেই আশ্রয়  
বশে আনিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে আসামের  
পার্বত্য জাতিগণ একরূপ শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছিল যে,  
আজ ব্রিটিশ শাসনেও এতদপেক্ষা অধিকতর শান্তি  
আসামে হইয়াছে কি না সন্দেহ। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ  
মোগলমানদের বিরুদ্ধে বারংবার যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে  
পরাস্ত করিয়াছিলেন—আজিও উদয়াদিত্য, জয়ধ্বজ  
প্রকৃতি আহোম রাজগণের স্ববনবিস্ময়ক প্রাণসা-  
বাক্য নানাস্থানে প্রাণ্ড কামানের গায়ে পোদিত লিপিতে  
পাওয়া বাইতেছে। কুঙ্গসিংহেরও প্রবল বাসনা ছিল  
যে, মোগলমান রাজগণের সহিত এক বার স্রী পাতবলে  
পরীক্ষা করেন। তাঁহার পূর্ববর্তিগণ মোগলমানে আক্রমণ  
হইতে বর্জন বন্ধ করিয়া বর্জ্যবস্তার পরিচয় দিয়া-  
ছিলেন—তাঁহার অভিলাষ ছিল স্রী মোগল রাজ্য  
আক্রমণ করিয়া আহোম রাজ্য গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত নিবৃত্ত  
করেন। তখন বিপুল আয়োজনও হইয়াছিল এবং  
মিত্র মিত্র তিনি রাজধানী পরিগ্রহ পূর্বক

গৌহাটিতে অশ্রয় করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার  
লীলা অকস্মৎ অবসিত হওয়াতে তাঁহার সংকল্প  
পরিণত হইত পাণ্ডে নাই।

আকবরের জায় কুঙ্গসিংহও বিজ্ঞানসাহী ছিলেন  
তিনি আপন রাজ্যে বিজ্ঞানবানের সংখ্যা বিশেষ ভাবে  
পরিবৰ্দ্ধিত করবার জন্য এই চারকে বন্ধ, বিজ্ঞান  
বারাণসী প্রভৃতি নানা স্থানে প্রেরণ পূর্বক স্থানিক  
কায় আমাটরাছিলেন রাজ্যমধ্যেও বহু বিজ্ঞান  
সংস্থাপন পূর্বক সংশ্লিষ্ট প্রচেষ্টা বহু বিধান করিয়া  
ছিলেন।

আকবর যেমন ভগ্নাঙ্গ রাজগণের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধ  
কল্পে যত্নবান ছিলেন, কুঙ্গসিংহও তদৰ্থে অধ্যবসায়  
সম্পন্ন ছিলেন। সুদূর কাশ্মীর, পাঞ্জাব, রাজপুতানা প্রভৃতি  
স্থানেও দূত প্রেরণ করিয়া তত্ত্বস্থানের নরপতিগণের  
সাহিত সখা স্থাপন পূর্বক আহোমরাজ্যের নাম প্রচার  
থাপিত করিয়াছিলেন। এমন কি তিস্তেও দূত  
পাঠাইয়া বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন।

রাজা তোডরমল্লের সাহায্যে আকবর যেমন রাজ্য  
বিস্তারিত করিয়া রাজ্যের উন্নতি বিধান করেন, রাজা  
কুঙ্গসিংহও সেদরূপ স্রী রাজ্যে নানা স্থানে জয়  
করাইয়া রাজ্যের শৃঙ্খলা সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

সর্বশেষে ধর্মবিষয়ে সহায়তারও কুঙ্গসিংহ আক-  
বরের সঙ্গে তুলিত হইবার যোগ্য। কুঙ্গসিংহের পিতা  
গদাধর সিংহের সময়ে আসামের বৈক্য গোবামিগণ  
অনেকটা উৎপীড়িত হই অথচ আসাম বৈক্য-প্রধান  
ভায়। কুঙ্গসিংহ সিংহাসনাধিকৃত হইয়াই বৈক্যবর্গের  
প্রতি অগ্রহণপরায়ণ হইয়াছিলেন। বর্তমান কুঙ্গসিংহের  
বধো যে মাকুলী ঘোগুটি আসামের বৈক্য সমাজের  
বিশিষ্ট গোবামিগণের বসতি স্থান হইয়া তাঁহাদের বৈক্য  
উত্তরাহে মহারাজ কুঙ্গসিংহই তাঁহার বৈক্য  
মাকুলীতে বৈক্য গোবামিগণের প্রায় সমস্ত  
স্থান নির্দেশ করিয়া দেন। বৈক্যবর্গের

ইতিবাসে কথিত এইরূপই আছে। ইহার ভিত্তি  
কুঙ্গসিংহের সময়ে বহু কোণও কিছু ছিল

কুঙ্গসিংহের সময়ে

আউনিআটির গোবানীকে তিনি গুরুরূপে বরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মতমাংসভোজী আহোম রাজের ধাতুর সঙ্গে বৈক্য আচারের বিশ খাওয়া অসম্ভব। রুদ্রসিংহ শাক্ত দীক্ষার পর ব্যাকুল হইলেন। তিনি তদ্বিন্দিত বঙ্গদেশে লোক পাঠাইয়া শাস্ত্রিপুত্রের নিকটবর্তী মাণোপাড়া (৭) নামক গ্রাম নিবাসী শক্তি-সাধক কান্তপ-গোত্রীয় কঙ্করাম ভট্টাচার্য্যাকে আনয়ন করিলেন। \* এই কঙ্করাম সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে যে, জলাশয়ে নামিয়া স্নানান্তিক করিবার সময় শিলী বাছ তাঁহাকে দংশন করিল তাঁহার মৃত্যুতে জলাশয়ের সমস্ত শিলী মাংস করিয়া ভাসিয়া উঠে। তদবধি তাহার উপনাম শিলীমারা ভট্টাচার্য্য হয়। রুদ্রসিংহ কিন্তু কঙ্করাম হইতেও মন্ত্র গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করেন—ব্রাহ্মণ করিয়া হাইবার উপক্রম করিলে রাজ্যে এক ভীষণ ভূকম্প হয়। তখন রুদ্রসিংহ ভীত হইয়া তাঁহাকে কিরাইয়া আনেন এবং বন্দিও বরণ মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারেন নাই তথাপি তাঁহার পূজাপন এবং রাজ্যের বড় বড় কর্মচারী কঙ্করাম হইতে দীক্ষালাভ করেন। ৮ কামাখ্যাযাত্রিত

নীলাচলে রাজগুরুর বাগদান নির্দিষ্ট হয়। তাই তাঁহার বংশধরগণ ‘পূর্বতীয় গোঁসাই নামেই আসামে পরিচিত ও আজিও সম্মানিত।

খ্রী ১৭১০ সালে সাড়ে আঠার বৎসর রাজত্বের পরে রুদ্রসিংহ স্বর্গদেব\* স্বর্গারূঢ় হন। গোঁহাটি সহরের উত্তরে ব্রহ্মপুত্রের অপর পাড়ে তাঁহার শ্মশান ভূমিতে এক বিধাল মন্দির নির্মাণ পূর্বক রুদ্রেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ সংস্থাপিত করিয়া তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ তদীয় কীর্ত্তিযশিত নাম স্মরণীয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কিন্তু ১৩০৪ সালের ভীষণ ভূকম্পে ঐ মন্দির ধ্বংস হইয়া মানবকীর্ত্তির বিনশরূপে প্রমাণিত করিয়াছে।

আকবর শব্দের অর্থ “শ্রেষ্ঠ” : এই হিসাবেও রুদ্র সিংহ “আহোম-আকবর” নামে সংজ্ঞিত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্মা।

## কবির মৃত্যু

পুঞ্জ পুঞ্জ স্বর্ণ ঢালি

অন্তাচলে তপন বিলার

কুঞ্জে কুঞ্জে পুষ্প করে

গন্ধ তার বাতাস বিলার

বিলু বিলু মরে মেঘ

বসুন্ধরা কলশস্তে সাজে

কবি বার—বীণা তাঁর

সুখী-চিন্তে চিরদিন বাজে

শ্রীকুলচন্দ্র দে

\* আহোম-রাজগণ যোগিনী তন্ত্রাঙ্গসারে ইন্দ্র বংশীয় বলিয়া খ্যাত ছিলেন, এবং সেই জন্ত তাহাদের স্বর্গদেব উপাধি ছিল।

\* আসামের ইতিহাস লেখক মহামতি শ্রীযুক্ত গেইট সাহেব লিখেন যে, রুদ্রসিংহ আপন প্রজা বিশেষের নিকট নতজানু হইতে অনিচ্ছুক হইয়াই বিদেশ হইতে লোক আনিয়া মন্ত্রগ্রহণ করিতে অস্ত্রী-লাবী হইয়াছিলেন। রুদ্রসিংহ লেখাপড়া না জানিলেও অভিযয় প্রজাবানু এবং দেবযাজে ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার এইরূপ বাগকোচিত অভিমান অসম্ভব। বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত গেইট সাহেবই তদীয় গ্রন্থের অপর স্থানে লিখিয়াছেন—“The Auniati Gosain was specially honoured, as the king not only recalled him from his exile but appointed him his spiritual preceptor”. এই গোবানী আহোম রাজ্যেরই অধিবাসী ছিলেন ও রুদ্রসিংহের পিতা পলাশ্বর সিংহ কর্তৃক উপক্রম বৈক্য গোবানীগণের অন্তর্ভুক্ত।

## শত্ৰুনাথ শৰ্মা

( ঢাকা সাহিত্য পরিষদে পঠিত )

আমরা অতঃপূর্বে কাছাড় হইতে একটি আত্মজীবন সাহিত্যসেবীর জীবনী পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিব। এই মহাত্মা স্বর্গীয় শত্ৰুনাথ ভূমিকা শৰ্মা। আজ ৩৮বৎসর হইল তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার পুণ্যময় জীবনী-কথা, সাহিত্য চর্চায় অক্লান্ত সাধনার কথা, বঙ্গীয় সাহিত্যসেবীগণের অপরিজ্ঞাত। তিনি কাছাড় জিলার অতঃপাতা পরগণে উদারবন্দের হুর্গানগর গ্রামে, কাছাড় জিলা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভুক্ত হইবার তিন বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

শত্ৰুনাথের পিতা ৬ সোনারাম দেশমুখ্য অত্যন্ত নির্ভাবানু হিন্দু ছিলেন। তাঁহার ১২টি সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ৬ রসরাজ দেশমুখ্য ও তদীয় অল্পজ ৬ শত্ৰুনাথ দেশমুখ্যের নামই উল্লেখযোগ্য। বংশ পরিচয় শত্ৰুনাথের প্রাপিতামহ বনুদেব শৰ্মা কাছাড়-রাজ হরিশ্চন্দ্রের আশ্রয়ে রাজধানী খাসপুরের অনতিদূরবর্তী হুর্গানগর গ্রামে বাস স্থাপন করেন। নিম্নে বংশপত্রিকা প্রদত্ত হইল।

বনুদেব ( ইটা দক্ষিণ-গ্রীহট )

জয়রুক দেশমুখ্য

সোনারাম দেশমুখ্য

রসরাজ দেশমুখ্য

শত্ৰুনাথ দেশমুখ্য

( ১৮১৮—১৯১২ খৃঃ ) ( ১৮৩০—১৮৭৬ খৃঃ )

রাবণাধিকার, রামকুমার, রামভারত

বনুদেব ভ্রাতা ও কাঁচা খাতি ( কাঁচাখাউরী ) অর্থাৎ নরশোণিতসেবী তান্ত্রিক দেবীর পূজক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎপুত্র জয়রুক উদারবন্দে দেশমুখ্য অর্থাৎ সামাজিক বিচারপতি পদে কাছাড়রাজ কর্তৃক নিযুক্ত হন; এবং তৎপুত্র জয়রুকের পুত্র সোনারাম শৰ্মাও কাছাড়ের শেষ নৃপতি গোবিন্দনারায়ণ কর্তৃক ১৮২৪ খৃঃ অব্দে উদারবন্দ ও বাসকান্দি পরগণাভ্যন্তরে দেশমুখ্য কর্ত্তে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সোনারাম নিকটবর্তী খাসপুর রাজদরবারে বথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

১২৩১ সালে সোনারাম শৰ্মা, দেশমুখ্য পদে নিযুক্ত হইবার যে সনন্দ প্রাপ্ত হন, তাহাতে দেশমুখ্যের কর্তব্য কার্য—সামাজিক বিচার ও ব্যবস্থাপত্র—সম্বন্ধে রাজা-দেশ বাস্তব করা হইয়াছে। নিম্নে এই দলিল হইতে যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল—

দফে জায় মোকদ্দমা—

অপালন গোবধ আদি—১

অজ্ঞাত সংসর্গ পশ্চাদ জাত—১

শ্রাদ্ধ, পূর্ণ বিবাহ ও চতুর্ষ বিবাহ পতিত হওয়া—১

পুত্রে মাতা, পিতা, ভেঠা, খুড়া ও ভ্রাতা, শত্ৰু আদিকে মন্দ বাক্য বলিলে—১

জ্যেষ্ঠে, মোহেতে স্বামী স্ত্রীকে মাতা, ভগ্নি বলিলে এবং স্ত্রী স্বামীকে পিতা ভ্রাতা বলিলে—১

হিন্দু হইয়া বৃষকে দামা বলদ করিলে—১

ইত্যাদি ইত্যাদি

এই সম্পর্কে দলীলপত্রগুলি সমাজের এক বিচিত্র চিত্র প্রদান করিবে সন্দেহ নাই। বাহা হউক উদ্ধৃত অংশ হইতে শত্ৰুনাথের বাল্যজীবন কিরূপ আচারনির্ভরকণ্ঠস্বরূপ হিন্দু রীতিনীতির মধ্যে কণ্ঠিত হয় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই রকণ্ঠস্বরূপ ভাবগুলি উত্তরোত্তর শিশু শত্ৰুনাথের জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করিবে ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।



গৌর ১৩২১

সোনারাম দেশমুখ্য স্বধর্মনিরত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাহার কর্তব্যনিষ্ঠা ও নিষ্ঠানুরাগ বাল্যকাল হইতেই নিজ পুত্রগণের মধ্যে বিকাশ পাইতে থাকে।

শত্ৰুনাথের অগ্রজ রসরাজ দেশমুখ্য ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৯২২খৃঃ ২৪ ছইক্রান্তা—রসরাজ বৎসর বয়সে পরলোক গমন ও শত্ৰুনাথ করেন শত্ৰুনাথ তাহার ১২ বৎসরের কনিষ্ঠ কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর ৩৬ বৎসর পূর্বে ৪৬ বৎসর উত্তীর্ণ না হইতেই পরলোক গমন করেন। এতদ্ব্যতীত ছোট সহোদরের চরিত্রেও একটু পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

রামলা মোকদ্দমায় জ্যেষ্ঠের অসাধারণ প্রতিভা দৃষ্ট হইত। তিনি কাঠের কারবার ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে নিজ শক্তি নিয়োজিত করিতে বাস্তব থাকিতেন, আর কনিষ্ঠ সাংসারিক সর্বকাৰ্য্য হইতে পুরাম লাতের জ্ঞান বাগ্ৰ হইতেন। কিন্তু একটি বিষয়ে তাহাদের বৈষম্য দৃষ্ট হইত না। আত্মজীবন উত্তর দাতার মধ্যে অকৃত্রিম ভালবাসা বিরাজ করিয়াছিল এবং জ্যেষ্ঠ শত অশ্রুবিধা উপেক্ষা করিয়া কনিষ্ঠের সাহিত্যসেবার পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেন।

শৈশবে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হওয়াতে শত্ৰুনাথকে আত্মজীবন পদে অবস্থায় কাটাতে হয়। অঙ্গহানির নিমিত্ত তিনি স্বাধীন ভাবে চলাচল করিতে অপারগ ছিলেন। অপরের সাহায্য ব্যতীত গৃহ হইতে অস্ত্রত্বে গমন বা শারীরিক পরিশ্রমসাধ্য কোনও কার্য্য করিতে পারিতেন না। এই নিমিত্ত তিনি বাল্যজীবন চিরকুমার ত্রুত অবলম্বন করেন এবং হবিষ্কার ভোজন, ব্রতনিয়মের

অনুষ্ঠান, পূজা, অর্চনা, বিদ্যানান এবং ধর্মগ্রন্থের অঙ্কলিপি প্রণয়ন পূর্বক দুঃসহ জীবনের কষ্ট লাঘব করিতেন। দক্ষিণ হস্তের তিনটি অঙ্গুলী কার্য্যক্ষম ছিল না, তথাপি তিনি বুদ্ধা ও তর্কনীরাম সাহায্যেই

৩০ খানা গ্রন্থের অঙ্কলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

৩শত্ৰুনাথদেশমুখ্যের 'স্বহস্ত লিখিত পুস্তকাবলীর তালিকা।—

( পুস্তকের নাম, লেখার তারিখ ইত্যাদি সহ )

১নং—রামচন্দ্রের বনবাস (ভূতীয়া কাগজে ৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ), “সন ১২৫৭ বাংলা মাহে ১৮ মাঘ মকর রাশী স্থিতে সূর্যো, দিতপক্ষাষ্টাদশ দিনমেবচ। পূর্বমা মন্দবাসরে দ্বাদশবঙে গ্রহমেতৎ সমাবীনম্ লিখিতা বহুবক্তন শত্ৰুনাথ দ্বিজাতিনা”

২নং—জ্ঞানবলী, “১২৭৭ বাংলা মাহে ২শ্রাবণ”

কোন বাবে জ্ঞান হইলে কি কি ঔষধ পয়োগ করিতে হইবে।

৩নং—প্রবোধাধায়—“সন ১২৬১ বাংলা মাহে ২-জ্যৈষ্ঠ, শাক ১৭৮৩”

৪নং—তত্ত্বসার—

৭৮ পাতা পর্য্যন্ত আছে। অবশিষ্ট কীটদষ্ট হইয়াছে। তারিখ নাই।

৫নং—ভারত সাবিত্রী—

“১২৭৭ বাংলা ৩০ ভাদ্র বৃদ্ধবার শকাব্দা ১৭৯২ বাংলা।

“ইমাং ভারত সাবিত্রী পাতকুথায় যঃ পঠেৎ।

স ভারত ফলং প্রাপ্য পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥

সুপর্বৎ তাজ্জেৎ দোষান্ গুণান্ গৃহাতি সজ্জনঃ।

দোষগ্রাহী গুণগ্রাহী চালনীভ তথাবিম্ ॥”

“স্বাক্ষর শ্রীশত্ৰুনাথ শর্মা।”

৬নং—মহাশাস্তি—

১২৭২ বাংলা, মাস নাই

৭নং—শ্রীমদ্ভগবতী গীতা—

“শকাব্দা ১৭৮৬ শাকে কুম্ভমাসে অষ্টাদশ দিবসে ছত্ত্বাসরে ত্রয়দশান্তিখৌ চতুর্দশ দণ্ড সময়ে সমাপ্ত-শ্চেতি।”

৮নং—নানাবিধ শুভকবচের বহি (১নং) তারিখ নাই।

১১নং—গুরুগীতা—“শকাব্দ ১৭৮৬ শাকে ত্রিংশত দিবসে গুরুবাসরে সম্পূর্ণ আষাঢ়”

১০নং—শুব কবচাবলী (২নং) “১৭১৬ বাংলা ১৪ আশ্বিন”

১১নং—ককারাদি কালিকার সহস্র নাম (তারিখ নাই)

১২নং—বটুক ঠেড়ব শুব “১২৬৮ বাংলা ১৮ কার্তিক শনিবার আশ্বিনা দুই প্রহর মধ্যে।”

১৩নং—বজ্রোপবীত লক্ষণ

“১৮৮২ বাংলা ১০ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দ ১৭৯৯”

১৪নং—বিষ্ণুধর্মোত্তরীয় প্রাণ্টা বিধেয়বাস বিধি—তারিখ নাই। সম্পূর্ণ।

১৫নং—গঙ্গাবিধি (পিতৃদোড়ী ও মাতৃদোড়ী সহ)

“শাক ১৭৮৪ মাহে কল্যারাদৌ দ্বাবংশত দিবসে ভৌম বাসরে লক্ষ্মীপূর্ণিমাতিথৌ সপ্তদশ সময়ে।”

১৬নং—গয়া প্রয়োগ—সন ১২৬২ বাংলা ২৪ আশ্বিন।

১৭নং—কাশীবিধি—

“বেদান্তি নগ চন্দ্রাশ্চ শাকে কর্কটগে এবৌ।

সমাপ্তং জায়তে গ্রহং দিবায়ং দেবতান্তরৌ ॥

শ্রীসদাশ শর্মণশ্চ পিতৃকাব্যে সমাগতা

লিখনং কন্ম সমাপ্ত নিজাহুজন্ত ধীমতা ॥

শ্রীশতাব্দী শর্মণশ্চ শুভঃ চ সর্গরশ্মিনী।

লিখিতং বহু যত্নেন পিতৃযুক্তি তরশ্মিনী ॥

১৮নং—পদ্মপুরাণ (অসম্পূর্ণ)

১৯নং—বঙ্গীপুজা ১২৭৬ বাংলা মাহে আষাঢ়

২০নং—যজুর্বেদীয় সঙ্খ্যাবিধি

“নন্দা শ্রীভুবনেশ্বরী পদযুগং কারুণ্যধীরপ্রদং।

তেন শ্রীসচণ্ডিকা পদযুগে কোটি প্রণামং মম ॥

শাকে শূত্র ধৃতিস্তথা”

২১নং—শ্রীমাপুজা

“তত্ত্বজ্ঞান-বিনোদিনী-গিরিসুতা-পাদাশ্রয়ীকবকং।

নন্দা সাগরতরয়ে ফলীগঞ্জে শাকেহর্কষাপ্রবৌ।

দুর্গাপত্র গণ্ডেহবতার কামতে কাল্যাদিনকালিবেৎ  
হৈড়কন্তঃ উদারবন্দ বসতি শ্রীশতাব্দী দ্বিজঃ”

২২নং—অশৌচ মঞ্জরী

বাচস্পতি মিশ্র বিরচিত (তারিখ নাই)

২৩নং—মণিষোৎসর্গ বিধি

“স্বাক্ষর শ্রীশতাব্দী শর্ম্মা শকাব্দ ১৭৮২ সাল সৌর জ্যৈষ্ঠ ১৩ তীয় দিবসে ভূগুবাসরে তৃতীয় প্রহর সময়ে গ্রহ সম্পূর্ণ ॥”

মাদারকান্দ যাত্রিক চৌধুরী নৌকানিবাসী  
শ্রীশ্রীশিবচরণ শর্ম্মা চক্রবর্তীর গ্রন্থ হইতে বৈকুণ্ঠপুরের  
দাঠে দে পুস্তকা সংশোধিত হইল।

২৪নং—গায়ত্রী স্বরূপ ১২৮২ বাংলা ২৫ বৈশাখ।

২৫নং—ব্রহ্মগীতা ও গণ্ডোস্তব ১২৮২ বাংলা ২৩ জ্যৈষ্ঠ

২৬নং—দুর্গানাম মাহাত্ম্য ১২৬৬ বাংলা ১৩ই জ্যৈষ্ঠ।

২৭নং—একাদ্ধিষ্ট শ্রাদ্ধবিধি (কুচী শুব সহিত)

এই গ্রন্থরাজী বাণীত ৫৪ খানা হস্ত লিখিত গ্রন্থ তাঁহার  
নিজ পুস্তকাগারে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে শাকলা পরারে  
অনুদিত “চিকিৎসার্পণ”, কাছাড় রাজপরিবারের অভ্যাজল  
কাণ্ডি ভূবনেশ্বর বাচস্পতি প্রণীত শাকলা পরারে  
অনুদিত “নারদীয় পুরাণ” শত যন্ত্র-চিত্রে উজ্জল  
“মহা উদ্ভাষ তন্ত্র” প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বঙ্গীয়  
সাহিত্যসম্মেলনের দৃষ্টি এবিষয়ে পতিত হইলে প্রাদেশিক  
সাহিত্য-লক্ষ এইরূপ বহুগ্রন্থের প্রচার ফলে যে মাতৃভাষার  
পুষ্টি সাধিত হইবে ইহা বলাই বাহুল্য।

পিতৃবিয়োগের পর পিতৃভক্ত পুত্রব্রত গয়াপিত্ত  
প্রদানের লক্ষ আত্মীয়স্বজন, দাসদাসী, গুরু, নাপিত,  
ঘোপা মোট ৫১ জন লোক সহ নৌকা যোগে ৬ গয়াধাম  
অভিমুখে যাত্রা করেন। প্রতিদিন প্রাতঃকাল হইতে

সন্ধ্যা পর্যন্ত চলৎশক্তিহীন শঙ্কুনাথ নৌকার অগ্রভাগে  
লিপিবার সরঞ্জাম সহ বসিভেদ আর  
তীর্থযাত্রা নদী, খাল, বিল, পরগণা, গ্রাম,  
দেবালয়, হাট, বাজার, উৎসব  
ক্রিয়াদি এবং উত্তর তীরের উল্লেখযোগ্য বিবরণ এবং  
বিবিধ চিত্রপূর্ণ মানচিত্র অঙ্কন করিতে করিতে অগ্রসর  
হইতেন। ৫৭ হাত দীর্ঘ এই মানচিত্রই কাছাড় হইতে  
নৌকাযোগে তাঁহাদের ভ্রমণের কাহিনীর স্মৃতি স্মরণ  
ভাবন্যতে জীবিত রাখিবে। নৌকার বসিয়া মানচিত্র  
ব্যভীত পরাবিধি, কালীবিধি ও মহিষোৎসর্গ নামক  
কয়েক খানা পুস্তক তিনি লিপিবদ্ধ করেন। এই সকল  
ঘটনার তাঁহার অনুসন্ধিৎসা ও বিজ্ঞানচরিত্রের সম্যক  
পরিচয় পাওয়া যায়।

নয় মাস অতীত হইলে পর দুই ভ্রাতা তীর্থ হইতে  
গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ে জনৈক মণিপুরী  
দণ্ড্যর চক্রান্তে তাহাদের বাড়ী ভস্মভূত হওয়াতে তাহারা  
অত্যন্ত বিপদাপন্ন হন। সোভাগ্যের বিষয় শঙ্কুনাথের  
বড় সাধের পুস্তকাগার এই দুর্ঘটনার সময় রক্ষা পায়।  
পুস্তকগুলি তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ছিল। নিজ  
লিখিত ২৭ খানি বহি ছাড়া আরও প্রায় ৪৫ খানা বাহ  
তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ ও তৎপুত্রগণের চেষ্টায় অত্যাধি সম্বল  
রক্ষিত হইতেছে।

তাঁহার পিতামাতার প্রাদেশের ব্যয়ের তালিকা এবং  
অত্যন্ত বিষয়ে তাহার হস্তলিখিত ৩টি কাগজের বস্তাও  
তাঁহার স্মৃতির নিদর্শন স্বরূপ তত্ত্বপ প্রদ্বার সহিত  
রক্ষিত হইতেছে।

বিজ্ঞানদানেও তিনি পরাজুখ ছিলেন না। শিশুগণ  
তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে বেটনপূর্বক বিজ্ঞানভিত্তিক  
করিত, আর পাঠ্যভে তাহার সাধের হরিণ, ধরগোশ,  
বরনাগুলিকে পুরাকালের স্মৃতিস্মারকের দ্বারা ওস্তাব  
করিত। এইরূপে উদারবন্ধের প্রাচীনবর্গের মধ্যে  
অনেকেই তাঁহার নিকট বিজ্ঞান শিক্ষা করেন।

তিনি একাদশীতে নিরঙ্ক উপবাস করিতেন এবং  
স্বর্ণার্থ প্রত্যেক বৎসরের প্রারম্ভে এক খানি একাদশীর  
তালিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। আর প্রতিদিন  
প্রাতে ১০৮ বার করিয়া দুর্গানাম ও কালীনাম লিখিতেন।  
এক বস্তা দুর্গা ও কালী নামের কাগজ এবং  
একাদশীর তালিকা অত্যাধি দেশমুখ্য পরিবারে  
দেখিতে পাওয়া যায়।

তিনি গুরুপাদোদক বোতলে সঞ্চিত করিয়া বৎসর  
কাল প্রতিদিন কিছু কিছু ব্যবহার করিতেন।

দুর্গোৎসবের সময় দরিদ্র প্রতিবেশীবর্গকে নুতন বস্ত্র  
দান করিতে এবং আম কাঠালের সময়ে প্রতিবেশীদিগকে  
ফলাহার করাইতে তিনি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব  
করিতেন।

বিবিধ কার্যে তাঁহার বুদ্ধিমত্তার নিদর্শনে দাসদাসী  
এবং প্রতিবেশীবর্গ বিন্মিত হইতেন। বাড়ীর মধ্যে  
এক স্থান হইতে অল্প স্থানে বাইবার দ্রুত অতি কৌশলে  
তিনি একটি চারি চাকার গাড়ী প্রস্তুত করেন।

সময় সময় তদীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর হস্তীসহ কাঠের কার্যে  
পাহাড়ে থাকিতেন। এই সময়ে তাহার উপর সাংসারিক  
কার্যের ভার পড়িত। তিনি ক্ষেত্রে বাইতে পারিতেন  
না বটে, কিন্তু বাড়ী বসিয়াই কাগজে কবিতার নকসা  
আঁকিয়া কোন ভবিতে কি করিতে হইবে তত্ত্বাদিগকে  
দেখাইয়া দিতেন। এই প্রকারে বাড়ী বসিয়া তিনি  
কৃষির কার্য চালাইতেন আর অজ্ঞ চাষাগণ ইহাতে  
বিন্মিত হইয়া তাহাকে দেবতার দ্বারা ভক্ত করিত।

পক্ষ ছিলেন বলিয়া তিনি নিজের মনে সময় সময়  
অত্যন্ত বিষমতা অনুভব করিতেন। অদ্বৈতানি প্রবৃত্ত  
তিনি নিজ দুঃখের জীবনে যে সকল অশ্রাব অনুভব  
করিতেন তৎসমুদয় ব্যক্ত করিয়া তিনি একখানি  
বারবাসী রচনা করেন। আশ্রয় অতঃপর উহা পাঠক-  
গণের নিকট উপস্থিত করিব। এই বারবাসী  
একখণ্ড ক্ষুদ্র আত্মজীবনী বিশেষ স্মরণ্য এই বারবাসী

পাঠকগণের নিকট সুশ্রবণময় কবি জীবী সম্যক  
পরিচয় করবে।

श्रीकृष्ण। चित्त ।

অপ শস্তুনাথ শর্ম্মার স্বাক্ষর বারমাসি ।  
 তাবে স্বীকৃত শস্তুনাথে দিবস বকনো ।  
 কুজি নিকরুণা হৈয়ার হংমনযোহিনী ।  
 বৈশাখ মাসের তুংগ শুকল তুর্গা মাই ।  
 এ ভবে পাতিয়া যোগ কিছু নভা নাই ।  
 হংগল পদ পেল বসন মন ।  
 সকল ভাণ্ডার গণন যোবে কানি দীনহিন ।  
 যধু মাস পাতিয়া নানা জাতি ফুল ফোটে ।  
 হাটিয়া না তুলি পুষ্প যনে চৈত উঠে ।  
 পদ স্থানে ন বিলম্ব পুষ্প আয়োজন । (১)  
 হস্ত স্থানে না কলিমা দেবতা পূজন ।  
 কেশনে এ তুংগ সব সাগরে তৈর পার ।  
 এত মাস গণন তুর্গা না হ লায় উদ্ধার ।  
 কৈষ্ঠ মাসের তুংগ শুকল গো জননী ।  
 হস্ত পদ নিয়া কেন খুটি যি এ পরাণী ।  
 সূর্য নিশাথ সম্মান নিলার অঙ্গ জগার আশা ।  
 হাঠি কিবা নিয়া যাব যবে কৈণাথ ২ বাসি ।  
 নিশ বালক জানি যোগে কিছু পর যাবা ।  
 দত্ত ময়ী ন ম তব বাণেক কর দা ।  
 কৃষ্ণ শঙ্কর মারগো ডাকিতে তৈরারে ।  
 এত মাস পেল উদ্ধার না কৈণার আয়ার ।  
 আশুত মাসের দিন কবির ভবন ।  
 পিণ্ডারে কবাইল কুঁড়ি আমি থাকিহে শরন ।  
 এত তুংগ পাণে যের কত বা সতিমু ।  
 বা গ আ ম ব ম যের নত দনে হাঙ্গমু ।

দয়াময়ী । যি তে'য়ার 'স্বাধীন' ভূবনে ।  
 এত যাস 'গল' ছায়া না দিয়ায় চরণে ॥  
 প্রাণ যাসেব দিন তহু' তৈল নাথ ।  
 প্রাণী ত্রুত খাস হৈল পরকাণ ॥  
 ভাল তৈবার মানসেতে খুঁজিছ ভবাণি ।  
 তখাচ কি'কং দয়া না কৈলা দারুণ কাণি (৩) ॥  
 ভাল আশ ভা'জলায় হুর্গী মহাযাণি ।  
 এত যাস 'গল' তথা ন 'নগায়' তব ইয়া ॥  
 ভাল বাসে'র 'দন' বরষা'র 'শব' ॥  
 আর 'ত' 'ত' 'ত' 'ত' 'ত' 'ত' 'ত' 'ত' ॥  
 বস 'সময়ে' 'যেমন' 'কো' 'কলা' 'স্মৃত' ॥  
 হুর্গী 'ন' 'ম' 'ন' 'লে' 'খা' 'ম' 'ই' 'ট' 'ই' 'ট' 'ই' 'ট' ॥  
 ক' 'ত' 'র' 'ই' 'ট' 'ই' 'ট' 'ই' 'ট' 'ই' 'ট' ॥  
 এত যাস 'গল' 'ক' 'ক' 'ক' 'ক' 'ক' 'ক' 'ক' ॥  
 আ' 'শ' 'ন' 'যা' 'স' 'এ' 'ন' 'দ' 'ন' 'দ' 'ন' 'দ' ॥  
 বুধা 'ও' 'বে' 'দ' 'দ' 'দ' 'দ' 'দ' 'দ' 'দ' ॥  
 হস্ত 'হ' 'ন' 'প' 'দ' 'হ' 'ন' 'প' 'দ' 'হ' 'ন' ॥  
 দশ 'গ' 'তে' 'আ' 'ট' 'ন' 'এ' 'ন' 'প' 'া' 'র' 'ন' 'গ' 'তি' ॥  
 দো' 'প' 'দ' 'হ' 'ন' 'এ' 'ন' 'উ' 'দ' 'দ' 'ন' 'চ' 'ক' 'র' 'প' 'ো' 'চ' 'র' ॥  
 হ' 'টি' 'গ' 'ম' 'না' 'প' 'া' 'র' 'আ' 'ম' 'প' 'ু' 'ভ' 'ে' 'অ' 'প' 'ে' ॥  
 আ' 'শ' 'হ' 'ন' 'জা' 'ন' 'ক' 'র' 'ক' 'ি' 'ক' 'ং' 'ক' 'র' 'ণ' ॥  
 এত যাস 'গে' 'ন' 'আ' 'শ' 'ন' 'না' 'প' 'া' 'ল' 'আ' 'শ' ॥  
 কা' 'শ' 'িক' 'ম' 'প' 'ে' 'র' 'হ' 'ক' 'শ' 'ন' 'ম' 'হ' 'যা' 'ণ' ॥  
 'গে' 'থ' 'া' 'গ' 'লে' 'পা' 'ট' 'ন' 'হু' 'র্গ' 'ী' 'ভো' 'মা' 'র' 'চ' 'ণ' 'ছা' 'য়া' ॥  
 'ক' 'র' 'ণ' 'প্র' 'ব' 'ণ' 'া' (৪) 'অ' 'ক' 'ৈ' 'লা' 'হ' 'ান' 'ব' 'ল' ॥  
 দা' 'র' 'ু' 'ণ' 'কা' 'শ' 'িক' 'যা' 'সে' 'ই' 'ট' 'লা' 'ম' 'অ' 'চ' 'ল' ॥  
 এই 'ই' 'ট' 'তে' 'নৈ' 'রা' 'শ' 'আ' 'শ' 'ই' 'ট' 'লা' 'ম' 'ন' 'শ' 'ন' 'দ' ॥  
 'অ' 'প' 'া' 'দ' (৫) 'বি' 'না' 'ফা' 'ট' 'ক' 'ে' 'তে' 'যো' 'রে' 'কৈ' 'লা' 'র' 'ব' 'ল' ॥

(৩) **যনসা।**

( 8 ) મનો મનો ઠાહાર સ્વસ્થ થઈશ. ક્ષમા કરે

ତାହାର ଯୁକ୍ତା ସାଟ ।

( ८ ) जावहीन

(১) 'তন একগানা ৪ চাকার বাড়ী প্রস্তুত করেন।

উহার সাগাৰো চলা কিং ১ কৰিতেম।

(२) कश्चिन्नाय ।

কায়ে মনে চিন্তে আমি কিছুই না জানি ।  
 বালক জানিয়া হের কিঞ্চিৎ নয়নি ॥  
 হুংখি হইয়া ডাকি দুর্গা পাটয়া ভবের জাস ।  
 উদ্ধার না হইলাম আমি গেল এত মাস ।  
 অগ্রান মাসের হুংখি শুন পরিতের মাইয়া ।  
 সুরতের ভর নরিতে বন পড়ে খুয়া \* ॥  
 ছায়াতে থাকিয়া আমি না পাই গৌত্মের ফাপ । (৬)  
 অন্ধে ঘোর নাহি লাগে আগুনের তাপ ।  
 পকায়ত হস্তে তুলি মিঠা যেমন খাইতে ।  
 তাহা হইতে অধিক পৌষের বৌদ্ধ পুখাইতে ॥  
 এত আশা মিলুগুনে তুমি না তরাইলার ।  
 আশাহীন করি গুনে কি লাগিয়া পৈলার ॥  
 বিনয়েতে ডাকি দুর্গা হের একবার ।  
 এত মাস গেল আমি না হইলাম উদ্ধার ॥  
 পৌষ মাসে সর্বলোকে ধাতু কাটে বন্দে (৭) ।  
 হাটিতে না পারি আমি শুইয়া থাকি ঘরে ॥  
 মনে মনে ঠেছা করি যাইতাম বন্দে ।  
 পদ নাহি চলে ঘোর বিনা বেতে বান্দে ॥  
 কাতর হইয়া ডাকি দুর্গা ধরিয়া চরণ ।  
 এত মাস গেল আমার না হইল মরণ ॥  
 মাঘ মাসের দিন শীত অবশেষে ।  
 বসন্ত সময় আসি হইল পরবেশ ॥  
 চুতপুল আদি নানা পুষ্পের সংবাদ ।  
 কোকিলার করে দিবা মধুরে নাদ ॥  
 আর নানা উপক্রম তবির (৮) কারন ।  
 তথাপি দারুন গ্রাণ না হৈল মরন ॥  
 ভাগ্যমের উৎপাত শুনি লাগে বড় জাস ।  
 উদ্ধার না কৈল্যার দুর্গা গেল এত মাস ॥

কান্তন মাসের হুংখি শুন আগে উবা ।  
 দোল বাত্রা হেতু আইল গোবিন্দ পূর্ণিমা ॥  
 সকল সংসারে হলি কররে আনন্দে ।  
 দুর্গা দুর্গা ডাকি আমি শুইয়া নিরানন্দে ॥  
 কত লোক মরি গেলো আমি শরনে থাকিতে ।  
 বড় দুঃখ লাগে গ্রাণ বাহির না হইতে ॥  
 হারয়ে দারুন গ্রাণ ছাড় ভবের মায়া ।  
 পাপে লিপ্ত হইয়া রৈল্যাম কোন আশার লাগিয়া ॥  
 অপত্তি হইয়া দুর্গা ডাকি বায়ে বার ।  
 এত মাস গেল আমি না হইলাম উদ্ধার ॥  
 চৈত্র মাসের দিন মনে ধরে বউ । (৯)  
 পূর্বকথা মরণ হইলে মনে উঠে চেউ ॥  
 অধে হুংখি সমান করি পাপে দিলাম ভরা ।  
 চন্ডে ভাঙ্গি না দিলাম মধু নারায়ণে বারা ॥  
 প্রচণ্ড ভাঙ্গুর তাপে গ্রাণ ঘোর জলে ।  
 হাটিয়া না কৈল্যাম নান স্রোত নদীর জলে ॥  
 আর এক বাত্রা ঘোর আছিল বিশেষ ।  
 এক রাত্রি প্রবাস আমি না কৈল্যাম বিদেশ ॥  
 দারুন চৈত্রের ধরা অনলে দহে বন ।  
 তেলি মত চিন্তানলে দহে আমার মন ॥  
 অয়ে গো কঠিন দুর্গা কেন হেন কৈল্যো ।  
 অনাদরি গ্রাণ খুইয়া দেহ কেন নিলে ॥  
 আবেশে (১০) জানিলাম তুমার মদর কঠিন ।  
 না দিলাম চরণ ভায়া ঘোরে জানি দীনহীন ॥  
 গজার সতিনী তুমি দ্বারী দিগম্বর ।  
 কিঞ্চিৎ না কৈল্যায় দয়া গেল এ বৎসর ॥  
 কাতর হইয়া ডাকি দুর্গা পাটয়া ভবের জাস ।  
 উদ্ধার না কৈল্যার দুর্গা গেল এত মাস ॥

\* কুয়াশা

- (৬) উদ্ধাপ  
 (৭) মাঠে  
 (৮) সীপাহী বিজোহ

- (৯) মধু  
 (১০) ভাবে

বার দ্বারের ভেতর পদ যেরূপে গঠন।

কৈলাসেতে গতি হয় শ্রীর্গা চরণ।

শ্রীর্গাচরণ তলে শ্রীশঙ্করাখ শর্মা সং দুর্গানগর  
সন ১২৬২ বাংলা মাহে মাঘ।

শঙ্করাখ অন্নসময়ের মধ্যে যে একনিষ্ঠতার পরিচয়  
প্রদান করিয়া গিয়াছেন কল্পন সাহিত্যসেবী নিজ  
জীবনে এইরূপ একনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়া দেশের  
নৃপ উজ্জল করিতে সক্ষম?

৮ রসরাজ দেশমুখ্য সূত্রার প্রাকালে ৯১ বৎসর  
বয়ঃক্রমকালে কাছাড়ের ইতিহাসের এবং নিজ পরিবারের  
বহু তথ্য আমাদের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার  
হৃদয়োগ্য পুত্র সুলদ্বর শ্রীযুক্ত রামভারত শর্মাও এ  
বিষয়ে আশাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের  
উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ।

## লাভোয়াসিয়ের রাসায়নিক শ্রাব্য

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে রস-নৈসর্গিক লাভোয়াসিয়ে হীর-  
কের “কঠিন-কোমল” গুণের আবিষ্কার করেন।  
বহুল্পা হীরক যে অঙ্গার (Carbon) বিশেষ এবং  
তাহা যে ভস্মীভূত হইতে পারে; দৃঢ় হীরক, হীরক-  
ভস্ম (Carbon oxide or oxide of diamond) পরিণত  
হয় ও সম্পূর্ণ উদ্বারিত বস্তু তাহা তিনিই প্রথমে  
আবিষ্কার করেন। হীরকের রাসায়নিক উপাদান যে  
অঙ্গার, তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই জানা  
গিয়াছিল। এই বিষয়ে ইহার পূর্ব হইতেই অনেক  
অনেকটা ধারণা করিয়া আসিতেছিলেন। হীরক  
উত্তম হইলে পুড়িয়া যায় কেন? তাহার কারণ,  
উহা একটি মৌলিক দৃঢ় পদার্থ। উহা ক্ষটিকীভূত

অঙ্গার ভিন্ন কিছুই নহে। চারকোল (Charcoal)  
ও গ্রাফাইট (graphite) যে উপাদানে প্রস্তুত, হীরকও  
সেই উপাদানেই প্রস্তুত। একই উপাদানে প্রস্তুত  
হইয়াও পূর্ণোক্ত দুইটা পদার্থ হইতে হীরক এত পৃথক  
হইবার কারণ শুধু উহার বিশেষভাবে বদ্ধতা ও উহার  
অত্যন্ত বাহ্য কারণের উপর নির্ভর করে। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে  
বিজ্ঞানচর্চা নিউটনও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে,  
হীরক একটি মহনশীল-পদার্থ যে সকল যুক্তির সাহায্যে  
তিনি এই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা  
উত্তরকালে প্রাক্ত বাল্য প্রমাণিত হইলেও তাঁহার আবি-  
ষ্কারটি মিথ্যা হয় নাই। ১৬৯৪-৯৫ খৃষ্টাব্দে Grand  
Duke Cosmos III of Tuscanyর আজ্ঞামুত্রে  
Academia del cimento of Florenceএ হীরকের  
রাসায়নিক পরীক্ষা হয়। তাহাতে হীরক একটা ভয়া-  
নক কয়লার আশুনে অথবা একখানি সূর্যহ্ন অগ্ন্যুৎপাদক  
কাচ ফলকের রশ্মিকেন্দ্রে স্থাপিত করা হয়। তাহাতে  
দেখা যায় যে, হীরক না গলিয়া আয়তনে হ্রাস পাইতে  
থাকে, এবং অবশেষে একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায়।  
কিন্তু অগ্নি-প্রস্তুত (Silica) অংশটি থাকে না;  
তবে যে, হীরক পুড়িয়া ভস্ম বা ভাই হয়, তাহা নিশ্চয়ই  
উহার সাহিত মিশ্রিত পদার্থের দৃষ্টাবশেষ। এই অবি-  
শুদ্ধতার কারণ হীরকের কোন অংশে কি পরিমাণে  
থাকিবে সে বিষয়ে কোন স্থিরতা নাই। বাহা হউক,  
এই ইহাও বিশেষ প্রণিধানের বিষয় বটে। এই  
অবিশুদ্ধতা হীরকে খুব কমই বিদ্যমান থাকে; কারণ,  
তাহা হইলে তাহার ক্ষটিক-গুণ-বদ্ধতা থাকে না।  
আর যদিও থাকে, তাহার সাধারণ কারণগুলি এত নূন  
নূন থাকে যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারাও সেগুলি সকল হইলে  
দেখা যায় না। প্রাক্ত পরীক্ষাতে শুধু এই প্রমাণিত হয়  
যে, হীরক এমন একটি পদার্থ বাহা উত্তাপ পাইলে  
বাতাসে দিশিয়া যায়। কিন্তু এই দিশিয়া যাওয়া  
ব্যাপারটার প্রকৃত অর্থ কি তাহা বুঝা যায় না।

গৌর ১০০১

এতদিনে রসনৈজ্ঞানিক ল্যাবোরাসের বৈশেষিক সম্বন্ধে তাঁহার শাসনদণ্ডের প্রবল প্রত্যাপে হেয় বা কৃত্রিম সম্বন্ধের আশ্রয় সক্রিয়া গিয়া সব এক শ্রেণী হইল—এক চিত্তের সমস্ত পরিণত হইল—কোন পার্থক্য রহিল না। স্রোতে উত্তমের তুলনা করিতেই হীরকের সহিত তুলনা করিয়া বলিত যে, “যেন হীরার ধার” “হীরার চুকা” “হীরার মত চক্চকে”। এক্ষণে সেই হীরার আর সমুদ্রল প্রভা রহিল না—কালমায় আচ্ছন্ন হইল। হারেক এতদিন অধিকট্টিন, অত উজ্জল ছল—হারাক মত কট্টিন পদার্থ আর নাই এখন তাহা ‘কট্টিন কেমেল’ এবং ‘নিম্প্রভ’ হইল। ল্যাবোরাসের এই পরীক্ষা হইতেই প্রকৃত ‘টিফিন’ নামের সৃষ্টি হইল। জগতের পদার্থ নিচর বর্ণবর্ণভাবে বর্ণোৎপন্ন করণের সময় এই রূপই পড়য়। তাহার প্রশ্নসার আশ্রয় উন্মোচন করিলে অগ্রগলে যন্ত্রবিশেষের ভাগ এইরূপই প্রকাশ পায়। সহজে নিম্নের প্রকৃত অনেকই বুঝতে দেয় না। এই কাপটা বা বৈপর্য্য (Duplicity) জগতের একরূপ সাধারণ নিয়ম হইলেও প্রেত নগে।

পাঠক, বোধ হয়, এখানে বলিবেন, লেখক মহাশয় হীরককে যেন জৈবিকভাবে ধরিয়া তাহার প্রকৃতির পরিচয় দিতেছেন। বাহা বলিলেন, তাহা একরূপ ঠিক। হীরককে জৈবিক কি অজৈবিক পদার্থ বালব, তাহা লইয়া একটু বিপদেই পড়িতে হইয়াছে; কারণ, পূর্বে রসায়নবিদেরা জগতের সকল পদার্থ দুই ভাগে বিভক্ত করিতেন। জৈবিক ও অজৈবিক (Organic and inorganic); কিন্তু এখন আর তাহা বল, বাধ না—একটা অপরিহার্য সহিত মিশিয়া যাইতেছে। সেবেই যেন অবিভক্ত ভাব—অর্জনারাধার মূর্ত দাঁখতেছে। পূর্বে জৈবিক বলিলে বুঝা যাইত—যাহা জীব হইতে উৎপন্ন, অর্থাৎ জন্মগত পদার্থ। জৈবিক ভাষার সাহিত্য যেন জীবনী শক্তির একটা

অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে আর অজৈবিক বলিলে, জৈবিকের বিপরীত অর্থাৎ জন্মগত পদার্থ। সুতরাং জৈবিক বাতীত অজাত সকল জীবন বৃদ্ধান্ত। এঃ সংজ্ঞাসমূহের “albumen” “urea” ইত্যাদি পদার্থ পূর্বে জৈবিক বই অজৈবিক পদার্থের সমায়ে উৎপন্ন কর যাইত না; কিন্তু আজকাল তাহাও সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং জৈবিক ও অজৈবিক কথা দুইটি অনেকটা অর্থশূন্য বা ‘কথার কথা’ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেমন যেমন কতকগুলি পারমাণবিক স্রবণের লক্ষ এই কথা দুইটি রথ হইয়াছে।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অঃ ও বহির্জ্ঞানের বিচ্ছেদ ক্রমঃ পাল্লিত হইতেছে। জড়জগৎ ও জীব বিজ্ঞানের পার্থক্য ততোধিক হইতেছে; জড়জগৎ হইতে ও সজীবজগৎ জীব বিজ্ঞানে প্রযুক্ত হইতেছে এবং জীব বিজ্ঞানের নিয়ম ও ব্যাখ্যা জড়জগৎ প্রবর্তিত হইতেছে। জড় ও চৈতন্যের ভেদ-বুদ্ধ দূরীকৃত হইয়া বিজ্ঞানের সাহায্যে জগতের অবৈত ‘সাক্ষ’ “জড় চৈতন্য” সংসাধিত হইতেছে। অসংলগ্নতা হীরকের একটি সর্ব প্রধান গুণ। হীরককে সংস্কৃতে “অমৃত” বলে। ল্যাটিন Adamant এবং তাহা হইতে Diamond, Diamont or Diamond হইয়াছে। অপরাপর যাবৎ হীরক হইতে অধিকতর ক্ষয়শীল হইলেও তাহা আগুনে পুড়িয়া যায় না। হীরক অত্যন্ত মৃদু হইতে অক্ষয়শীল হইলেও আগুনে পুরিয়া যায়। শুধু পুড়িয়া যায় তাহা নহে, বিস্ফোরিত হইলে একেবারে পুড়িয়া হাওয়ায় মিশিয়া যায়। নিজের আগুনে কিছুই থাকে না। হীরক অমৃত (অমৃত) হইলেও অগ্নির সৎস্পর্শে উত্তপ্ত হইলে অদম্যের দমন হয় তাহা হইতে নিশ্চয়। উত্তাপে সকল জীবন, সকল যন্ত্রণা কাই বিস্মৃত হইয়া যায়; কিন্তু এমন কারণ হাওয়ায় মিশিয়া যাইলে কেবল হারকেই হয়। অতএব সর্বশক্তিমান জগতের রাজ্যে কেহই দর্প করিতে পারে

না—নবজ্জ্বলিত পাইরেন' হীরকের সহিত বিতৃষ্ণ অক্সিজেনের রাসায়নিক সমায়ায় হইতে হইলে ৮৪ ডিগ্রী স্ফটিক উত্তাপ আবশ্যক, কিন্তু বাতাসের অক্সিজেনের সহিত রাসায়নিক ভাবে মিশিতে হইলে অধিকতর উত্তাপের আবশ্যক, কারণ, বাতাসের অক্সিজেনে অক্সিজেন অনেক ভিন্দ্র মিশ্র আছে, যাহাতে উহার সহিত হীরকের মিশ্রনের প্রতিবন্ধক ঘটে। পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে, Saltpetre অথবা Potassium chromate এর সহিত মিশ্রিত করিয়া হাঁক উত্তপ্ত করিলে উহা অত্যন্ত সহজেই পুড়িয়া যায়। হীরক গলিত হয় কনা এবং ছোট ছোট হীরক গলাইয়া বড় হাঁক প্রস্তুত করিবার লক্ষ্যে সম্রাট Francis কর্তৃক নিযুক্ত Serzzolius Gussiot, Clarke, Despretz প্রমুখ বৈজ্ঞানিক মণ্ডল অনেক চেষ্টা করিয়াও হীরককে গলাইতে পারেন নাই।

লাভোয়াসিয়ের প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, হীরকের সাহিত বারবার অক্সিজেন মিশ্রা অক্সাইড-কربন (oxide of carbon) গঠিত হয়, সুতরাং হীরক কার্বন (carbon) ভিন্ন আর কিছুই নহে। Smithson Tennant, Sir Humphrey Davy, Kause, Guyton De Morveau প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ প্রত্যেকেই পরীক্ষা করিয়া লাভোয়াসিয়ের মতের সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, অগার ও হীরক মৌলিকভাবে এক পদার্থ। Arago ও Biot এর মত ছিল; হীরক একটি আর্দ্র কার্বন (Wet Carbon); কিন্তু Davyর পরীক্ষায় তাহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল।

নিশাদল উত্তপ্ত হইলে বাতাসে মিশিয়া যায়। কর্পুরের মত কবাহ নাই। বৈশেষ কোনরূপ উত্তাপ না পাইলেও উহা বাতাসে মিশিয়া বাইতে পারে। হীরকের বাতাসে মিশিয়া বাওয়া অপেক্ষা দুইটির মত নহে। হীরকের সাহিত অক্সিজেনের সংস্পর্শ না থাকিলে উহাকে বতাই উত্তপ্ত করা বাউক দা কেন,

উহা শুধু উত্তপ্তই হইবে, কিছুই উহার ওতনের হ্রাস হইবে না; কোন রাসায়নিক পরিবর্তনও ঘটিবে না। হীরককে অক্সিজেন সংস্পর্শে উত্তপ্ত করিলে এমন একটা রাসায়নিক সমায়া হয় যে, উহা বারবার হীন গরমীয় আকারে বাতাসে মিশিয়া যায়। তখন উহা আর কঠিন হীরক থাকে না এবং তখন উহা আর সংগ্রহ করা যায় না। উহাই হীরকের বিশেষত্ব। কিন্তু নিশাদল অথবা কর্পুর সম্বন্ধে এইরূপ নহে। বাতাসের সংস্পর্শেই উহা আর অসংস্পর্শেই উহা উত্তপ্ত হইলেই এতল উড়িয়া বাইবে। তবে, উত্তাপ অতিরিক্ত হইলে রাসায়নিক পরিবর্তনও ঘটিতে পারে, নতুনা শুধু উড়িয়াই বাইবে। ইচ্ছা করিলে, এটা নিশাদল অথবা কর্পুর মিশ্রিত বায়ু হতে পুনরায় কর্পুর ও নিশাদল নিষ্কাশন করিতে পারা।

উপারউক্ত পরীক্ষানিতে ক্রকটিনবাদের প্রমাণ হইয়া পড়িল। কারণ, ক্রকটিন যদি বাহির হইয়া যায়, তবে, কেমন করিয়া হীরক-কেন ওতন হীরক অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে? ইহাও তাহার “অক্সিজেন” আবদ্ধতার বিশেষ পোষিত, করিতেছে।

এই ক্রকটিনই জগতের সমস্ত বাতাসের ন্যায়—সকলের প্রাণবরণ। ইহার সাহিত সমস্ত জড় প্রাণ্যনীরাই দাম্পত্য-মুখে আবদ্ধ। তাহার প্রভু স্বামিত্ব সর্বত্রই। সুন্দরী লাভোয়াসিয়ের এইরূপ অনেক বিষয়েরই স্বাক্ষর বাহির করিয়া প্রকৃত মরী হইয়া জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তাহার ভুলনা-মূলক পরিমাণ-জাপক বিশ্লেষণ-বিচারে কেহই স্বপদে থাকিতে পারে নাহ।

লাভোয়াসিয়ের এইরূপে ক্রকটিনবাদকে রাসায়নিক হইতে একবারে উঠাইয়া দিয়া প্রাচীন রাসায়নিক নুতন ভাবে গঠিত করিতে লাগিলেন। পূর্বে বাতায় রাসায়নিক পারতা বা ক্রকটিনবাদের অধ্যয়ী ছিল, এখন তাহা ভাদিয়া-চুরিয়া নিজের মনের মত করিয়া



শেখ ১৩৭১

নব পর্ধ্যারে নূতন পরিভাষার সৃষ্টি করিলেন। তিনি অড়-পদার্থকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন—কঠিন, তরল ও বায়বীয়; এবং উদ্ভাপন সহযোগে কঠিন পদার্থ যে তরল ও ক্রমশঃ বায়বীয় আকার ধারণ করিতে পারে, তাহাও দেখাইলেন। তাৎপর্য বায়ুর রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলে অক্সিজেন ও নাইট্রজেন (Oxygen and Nitrogen or Azote, এই দুই বায়বীয় পদার্থের (গ্যাসের) সংমিশ্রণ মাত্র।) এতদ্ভিন্ন বাতাসে সর্বদা জলীয় বাষ্প, অম্লারাম বায়ু (Carbonic acid gas) এবং সামান্য পরিমাণ আর্গন (Argon), নিয়ন (Neon), জিনন (Xenon) ক্রিপটন (Krypton) আছে। জলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ জল যে দুই ভাগে আরতনের দ্বারা বায়ু বা উদজান ও একভাগ আরতনের অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন ইহা, আর অক্সিজেন, লবণ প্রভৃতির রাসায়নিক বিভাগ ও পারস্পর্য্য বাহির করিলেন। পুরস্কৃত (Philogisticated air, Dophlogisticated air) (অম্লজ্বলিত বায়ু উদ্ভূত তেজবায়ু বা অম্লজ্বলিত বায়ু) প্রভৃতি কথা একেবারে উঠাইয়া দিলেন। প্রাণিসমূহের শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের মধ্যে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় তাহারও আলোচনা করিলেন। পরীক্ষা দ্বারা দেখাইলেন যে, প্রাণিগণের শ্বাসপ্রশ্বাসগ্রহণ, দহন ক্রিয়া এবং বাতুত্ব প্রস্তুত পদ্ধতি এই তিন প্রক্রিয়ার রাসায়নিক পরিবর্তন এক রকমের। প্রাণিগণ শ্বাস লইবার সময় শরীরের ভিতর বায়ু গ্রহণ করে; বায়ুর অক্সিজেন শরীরের ভিতর ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া অক্সিজেনে পরিণত হয় এবং উহা বায়ুর নাইট্রোজেনের সহিত ও অক্সিজেনের সহিত বাহির হয়। আসে। দহন-ক্রিয়া ও বাতুত্ব প্রস্তুত প্রণালী এই অক্সিজেনের দ্বারাই শাসিত হইয়া থাকে। এখানে ইহাও জানা আবশ্যিক, এই দহন-ক্রিয়া ও শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্বন্ধে মনীষী বেণ্ড ও পর্ধ্যাবেষণ ও পরীক্ষা করিয়াছিলেন। বেণ্ড ও লাভোয়াসিয়ে উভয়েই

এই পৌরবের অধিকারী। লাভোয়াসিয়ে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে প্রাণিদেহের শ্বাস লইয়া পরীক্ষা করিতে-ছিলেন। কতকটা কাজ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। লাভোয়াসিয়ের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল, “কুর্পরেসেই কন্সার্ণি জিজীবিবেৎ শতং সমঃ।” কর্ম করিতে করিতে মানুষ শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে। কর্ম পরিত্যাগে মানুষের ক্ষমতাও নাই, অধিকারও নাই। কিন্তু, দৈব-বিড়ম্বনার তাহাকে একবার বৎসর বয়সেই মানবলীলা সংবরণ করিতে হইয়াছিল। যদিও তাহার অকাল মৃত্যু হইল বটে, কিন্তু তাহার কয়েক তাহাকে “শতায়ু” করিয়াছিল। কর্মই প্রকৃত জীবন। ঐ সময়ের কর্মসমষ্টি তাহাকে প্রান্তর “শতায়ু” পুরুষ” করিয়াছে।

লাভোয়াসিয়ে যে এক নব্যতর রসায়নের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার সন্মুখদান রহস্য হইতেছে যে, তিনি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পদে পদে তুল্যদণ্ডের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহা কেবল বস্তুগত শাস্ত্র ছিল, তাহা পদার্থশাস্ত্র হইয়া দাঁড়াইল। অর্থাৎ এই দ্রব্যের সহিত এই এই দ্রব্য সংযুক্ত হইলে অল্প দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু উহার কত পরিমাণ অপব্যয় দ্রব্যের কত অংশের সহিত সংযুক্ত হইয়া কত ওজনের দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা নির্ণীত হইল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার তুল্যদণ্ডের প্রচলন প্রাচীন রসায়নে বড় একটা ছিল না।

লাভোয়াসিয়ের জীবনের বিশেষত্ব এই যে, তাহার একাধারেই মঙ্গলের ত্রিশক্তিই বর্তমান ছিল। “কল্পনাশক্তি” “তাবপ্রবণতা” ও “স্মৃতি” লাভোয়াসিয়ের মধ্যে বহুল পরিমাণে ছিল। অপর যেখানে উন্টা দেখাযাইছিল, সেখানে এই শক্তির বলে তিনিই কেবল সবই সোজা দেখিলেন। অপর ৩ মিডের পরীক্ষার মধ্যে “সত্য” যেমত কোন অন্ধকারময়ত্বা গহবরেই লুকায়িত থাকুক না কেন, তাহার স্মৃতি

কখনও এড়াইতে পারে নাই। তাঁহার বিশেষত্ব এইখানেই দেখা যায়।

লাভোয়্যাসিয়ে এই ভাবেই নানাবিধের সংগ্রহে আসিয়া পরিমাণ জাপক ও তুলনা যন্ত্রক আশোচনা বা বিশ্লেষণ প্রণালীর ব্যবহারে বিশেষ গতি হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার স্বাধীন চিন্তা প্রসূত বৈজ্ঞানিক-পরীক্ষা-ফল-স্বরূপ প্রবন্ধ গ্রন্থাদির দ্বারা সমগ্র-রাসায়নিক-সাহিত্য সর্বশেষ সমুদ্র হইয়াছে। প্রকৃত সত্য প্রতিষ্ঠা পেলেন তিনিই পুরোক্ত আবিষ্কারগুলির একক জ্ঞান দায়ক। প্রাচীন আধুনিক ভ্রমতে বিস্তারিত তিনি সর্বদা পেশাও কর্মশক্তি-পুঞ্জের সহিত যত্নপূর্ণ পটভূমি গাঁথিয়া ভয় তাঁহার কর্মজীবন আলোচনা বিজ্ঞান-কৃতিগণের সর্বদা সচেতন থাকি উচিত। বর্তমান সমস্যাব্যবস্থা বিজ্ঞান-শিক্ষা-বিস্তারের যে প্রণালী নির্দিষ্ট হইতেছে তাহাতে আমাদের বিজ্ঞানশিক্ষার্থীগণের তাঁহার নির্দিষ্ট শিক্ষাপ্রণালীর গ্রন্থাদি সর্বশেষ পরিধানের যোগ্য। তাঁহার গ্রন্থ চিরদিন রসায়ন শাস্ত্রের প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিকট প্রথম আদর্শবীর হইয়া থাকিবে, ইতি নিশ্চয়।

কর্মই মানবের প্রকৃত জীবন। মনুষ্য জীবন একটি ধারাবাহিক কর্মপ্রবাহ। কর্মসমষ্টি গঠিতই মনুষ্য জীবন। এই কর্ম জ্ঞান যন্ত্রক—এই কর্ম সত্যজীবন। কর্মশূন্য জীবন পশু জীবন। কর্মময় জীবনই প্রকৃত ধর্ম-জীবন। বাস্তব জীবনে চিত্রিত কর্ম নাই, তাহার জীবন নাই।—তাই, আমরা বিশ্ববিশ্রুত কর্মীর বিশিষ্ট কর্ম জীবনই পূর্বে আলোচনা করিলাম, পরে, তাঁহার গার্হস্থ্য জীবন, শিক্ষা-দীক্ষা, প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি এবং তদানুসঙ্গিক কর্মপ্রবাহ এবং জীবনের পূর্ণতা—বৃত্তার বিবরণ আলোচনা করিতে যাইতেছি।

এন্টয়েন লোরঁ লাভোয়্যাসিয়ে (Antoin Laurent Lavoisier) ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে ২৬শে আগষ্ট তারিখে ফ্রান্সের সুপ্রসিদ্ধ রাজধানী প্যারিস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। পৃথিবীর বিজ্ঞানাত্মক মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কার

সার আইজ্যাক নিউটনের ঠিক একশত বৎসর পরে লাভোয়্যাসিয়ের জন্ম হয়। পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহার মাতৃব্যয়োগ হয়। তাঁহার পিতা ধনশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং পুত্রকে লালনপালন করিয়া তাঁহার উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে যত্ন করি কখনও ক্রটি করেন নাই। এতলে বলা আবশ্যক, অনেক বৈজ্ঞানিক মহাপুরুষেরই বাল্যে একরূপ খোঁজাখুঁজি ঘটিয়া উঠে নাই, অনেকেরই অর্থাভাবে বাল্য-কালে শিক্ষাশিক্ষণ সুবিধা হয় নাই; পরে, তাঁহারা স্বকীয় যত্নপূর্ণ বলে বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা অমর হইয়া গিয়াছেন। বড়সোফের মামরা যখন সে ছেলে হইলেও তাহার শিক্ষাশিক্ষণ উপায় বিচারে সর্বশেষ দৃষ্টি ছিল। লাভোয়্যাসিয়ে প্রথম অধ্যাপকগণের নিকট গণিতশাস্ত্র, উদ্ভববিজ্ঞান ও প্রাচীন পদার্থের শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া-ছিলেন। ইহাদের মধ্যে রসায়নের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক লাভিয়ের অধ্যাপনায় তাঁহার দৃষ্টি রসায়ন শাস্ত্রের উপর সম্বন্ধিত পতিত হয়। লাভিয়ের অধ্যাপনা সমুদ্র করাসী দেশে প্রসিদ্ধ ছিল এবং লাভোয়্যাসিয়ের সমসাময়িক অনেক প্রসিদ্ধ রাসায়নিক তাঁহার শিষ্য ছিলেন। তাঁহার সতীর্ঘগণের মধ্যেও অনেক রসায়নে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার ইচ্ছা ছিল যে, তিনি আইন শিক্ষা করেন এবং ব্যবসায়িক একবিশেষিত বৎসর সময়কমে তিনি আইন পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষায় তাঁহার আভ্যাসিক ইচ্ছা ও প্রীতি থাকায় তিনি আইন ব্যবসার ব্যস্ততা পরিচ্যাগ করিয়া বিজ্ঞান চর্চার জগৎ জীবন উৎসর্গ করিতে সম্মত করিলেন।

এই সময় হইতেই তাঁহার রাসায়নিক গবেষণা আরম্ভ হইল। দ্বাবিশতিবর্ষ বয়সে তিনি তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ রচনা করেন। তাহার পরবৎসর “বৃহৎনগর আলোকিত করিবার উপায়” নামক প্রবন্ধ রচনা করিয়া বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সভা করাসী একাডেমী হইতে একটি স্বর্ণপদক উপহার প্রাপ্ত হন; এবং সেই বৎসরই ঐ সভার সভ্যান্বীচিত হন। এই করাসী একাডেমী

গৌর ১৯২১

১৬-৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফরাসীদেশে গণিত, জ্যোতিষ, ভূমিবিদ্যা, রসায়ন পদ্ধতি খ্যাতি প্রাপ্ত পণ্ডিত মাত্রই এই সভার সভ্য ছিলেন। তাঁহাদের সংসর্গে আসিয়া নবাগত সংস্কৃত মৌলিক অনুসন্ধানের আগ্রহ বহুল পরিমাণে বর্ধিত হইল। সজ্ঞান-সম্মতির ফল বড়ই মঙ্গলসম্পন্ন—যে যুগে বড়ই উন্নত করে। তেঁথিতে পাওয়া যায়, অনেক বিজ্ঞানের উচ্চ উপাধিধারী যুবক কেন্দ্র স্থান-সংসর্গের অশ্রমে বিজ্ঞানাত্মকভাবে শিখণ-পণ্ডিত হইয়া সাধনাব মন্দির হস্তে সকালে বিদ্যায় আগ্রহ করেন, আবার অনেক ভাগ্যান্ধ যুবক অল্প শিক্ষিত হইয়াও সংসর্গস্থান জ্ঞানার্জনের অতুল আনন্দের আকুল হইয়া সাধনার পথে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হন। ভূমিবিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাক্ষ্যই হান যেন একবার আকৃষ্ট হইয়াছে, তিনি অনন্তকর্মী হইয়া মৌলিক গবেষণা কার্যে নিযুক্ত না হইয়া থাকিতে পারেন না। তাই, যুবক লাত্যের-সিয়ে সাধনায় প্রবর্তিত হইতে উত্তেজিত হইয়া উঠি-। তিনি এখন হইতে অনুপূর্ণভাবে মৌলিক গবেষণাকার্য্য করিতে লাগিলেন।

ফরাসী একাডেমীর সম্মান বৎসর বৎসর নানা বিষয়ে বিবরণী প্রকাশ করিতেন। লাত্যের-সিয়ের অসামান্য প্রতিভা ও সর্ববিজ্ঞায় পারদর্শিতা দেখিয়া সভার কর্তৃপক্ষগণ তাঁহার উপর এই সকল বিবরণী প্রকাশের ভার অর্পণ করিলেন। তিনি তাহা সুচারু-রূপে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। কয়েকবৎসরে তিনি দুই শত বিভিন্ন বিষয়ের বিবরণী লিখিয়াছিলেন। এইরূপে ফরাসী একাডেমীর সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা তিনি আজীবন রক্ষা করিয়া-ছিলেন। ঘোর ফরাসী বিপ্লবের সময় যখন সমস্ত বিবৎ সমাজ বন্ধ করিবার ভয় প্রস্তাব চলিতে ছিল, তখনও তিনি একাডেমীকে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। নিজে অর্থব্যয় করিয়া

প্রাচীন জগজীর্ণ নৈজান্তঃসংগণকে মাসিক বৃত্ত দিয়া একাডেমীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মান-সম্মতি প্রীতি এই প্রবল ছিল গুণের ফলর তিনি এই বৃত্তেই অবশেষে, তাঁহার সকল চেঁচা বার্থ হইয়া ছিল। তাঁহার জীৱনকালেই ফরাসী একাডেমীর অস্তিত্ব লোপ পাইল।

লাত্যের-সিয়ের অর্থের কোন দিম অভাব ছিল না। পিতার মৃত্যুর পর নিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া-ছিলেন। এই কারণে সকল অশা কবিতা ছিলেন যে, তিনি অর্থগামের অল্প উন্নয়ন অর্জন ন করিয়া অনন্তমনে নৈজান্তঃ গবেষণায় নিযুক্ত থাকি-বেন। কিন্তু ভবিষ্যৎ তাহা ঘটাইতে দিল না। তিনি যখন বিজ্ঞানে মনোনিবেশ করিয়া গণন করিতে, তখনই অজ্ঞাতসারে অপর পক্ষ ফাঁস কর্ত্তের প্রথম সোপানে স্থাপিত হইল। নির্দিষ্ট বর্ষ কণা, বোধ হয়, ভগতের অল্পলোকের ভাগ্যে ঘটনা থাকে। তিনি ফার্মেইর-জেনারেল (Fermeir General) হইলেন। তাঁহার সময় ফরাসীদেশে যাহারা কমোনা ও ন্যায়-শাস্ত্র সংগ্রহ করিতেন তাঁহারাই এই নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহার খানিকটা ভালুক ইয়ারা করিয়া লইতেন এবং রাশসরকারের সহিত ছয়বৎসরের রাজস্ব ও বণিজ্যস্বত্ব আগাম দিবার বন্দোবস্ত করতেন। নির্দিষ্ট রাজস্বের উপর আরও কিছু মুদ্রা রাজ্য ও তাঁহার কর্মচারীবর্গকে উপহার দিতে হইত। যুব, জুয়াচুড়ী, জুলুম কার মররের নিত্য কর্ম ছিল। কলে দাঁড় প্রকার উপর বধেই অত্যাচার উৎপাদিত হইত। অত্যাচার-উৎপাদিত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য রাজস্বের অভিযোগ করলেও দাঁড় প্রকার বর্গ বিচার প্রাপ্ত হইত না, উপরন্তু 'ম দাঁড় রাজস্ব দাঁড় অসমর্থ হইলে তাহাদিগকে বিশেষ শাস্তি ভোগ করিতে হইত। ফরাসী দেশের উৎপাদিত প্রসা-সাধারণ এই প্রকারে বর্ষান্তিক যুগের চক্রে বোধিত। ইহাদের মধ্যে সং

ব্যক্তিও না ছিলেন তাহা নহে। লাভোরাসিয়ের জমীদারির ভার গ্রহণ করিয়া নিজের এলাকার মধ্যে সুশৃঙ্খলা ও সুবিচারের বন্দোবস্ত ও বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রণালী প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। ভিন্ন দেশ হইতে যমাদি পণ্ড আনয়ন করিয়া জমীদারির উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। এইরূপ সংকার্য্য ও দয়ালুতার পরিচয় দিয়াও তিনি উৎপীড়িত জন সাধারণের স্বার্থ রক্ষা হইতে অব্যাহতি পান নাই। স্থগিত কার্ধের ও পদের এমনই দুর্দমনীয় শক্তি ও বিরক্তি। তাঁহার অসাধারণ দেশহিতৈষিতা, অসামান্য বৈজ্ঞানিক প্রতিভা, পবিত্র চরিত্র প্রভৃতি সকল সদগুণই শেষের দিনে লোকে ভুলিয়াছিল। সে সময়ে “ফারমিয়ে” বলিয়াই সকলে তাঁহাকে মনে রাখিয়াছিল।

লাভোরাসিয়ের ভৌম দুই প্রকারে অভিবাহিত হইয়াছিল, প্রথম বিজ্ঞানের সেবা, দ্বিতীয় দেশের সেবা। তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের কার্য্য তিনি কেমন সমীচীনতার সহিত নির্ধারণ করিয়াছিলেন। দেশের নানাবিধ মঙ্গলময় কার্য্যে তিনি অগ্রণী ছিলেন, রাজকীয় বিবিধ কার্য্যে তিনি রাজকীয় শক্তির সহায়তা করিতেন। বিশেষতঃ রাজসরকারে বাকুদের কারখানায় তিনি একসময় অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তিনিও তৎসংক্রান্ত অগাধ জ্ঞান প্রস্তুত প্রণালীর উন্নতি করিয়া ছিলেন। যদি তিনি অনন্তমনে কেবল বিজ্ঞানের সেবা করিতে পারিতেন, তাঁহার সমগ্র শক্তি বিজ্ঞান চর্চায় নিয়োগ করিতেন তাহা হইলে তিনি রসায়ন-শাস্ত্রের আরও কতদূর উন্নতি করিতে পারিতেন কে বলিতে পারে। তবে, তাঁহাকে দারিদ্র্য ভীষণ পীড়নে চমকিত করিয়া তাঁহার স্বাধীন চিন্তার ব্যাঘাত করিতে পারে নাই। কিন্তু যখন তাঁহার চতুর্দিকে বিপদ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তখন তিনি ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্লব ও রাজনীতির কূটতর্কের কোলাহলময় কর্ম্মক্ষেত্রে হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞানপথের

শান্তিময় নির্জন কক্ষ-বক্ষে সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় লইবার একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শত্রুগণ তাঁহাকে সে শান্তি উপভোগ করিতে দেয় নাই। ওহো! মানুষের হিংসাপ্রবৃত্তি কি এতই প্রবল। কোন অবস্থাতেই শত্রুর ও নিম্নকের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই। এই রূপেই দশচক্রে ভগবান্ ভূত হন।

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে যে মাসে লাভোরাসিয়ে ও সাতটস জন “ফারমিয়ে জেনারল” রাজস্ব আদায় করিবার অজুগাতে রাজস্বারে অভিযুক্ত হন। লাভোরাসিয়ে যেসকল অপরাধের জন্য অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, তামাকে জল ও অগাধ অস্বাস্থ্যের পদার্থ মিশ্রিত করা তাহার অন্যতম। যে ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় ফ্রান্সে ঘেহ, মায়া, মমতার কোন অধিকার ছিল না, কেহ কাহারও মঙ্গল চেষ্টন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইত না, সে সময়ে তামাকে জল দেওয়াও যে একটা অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইবে তাহাতে বিচিত্র কি। আরও, দেখা যায়, জগতে অসং সংসর্গের ফল এইরূপই দাঁড়ায়। তাহাদের পাপের পরিমাণ, সমষ্টিতে এত অধিক হয় যে, সৎকেও আবরিত করিয়া ফেলে। পরে অসংসার সহিত সত্যের আত্মাহুতি হইয়া পাপের আবরণ ধ্বংস হইলে, সত্যের প্রকৃতির বিমল জ্যোতি আরও সমুজ্জ্বল হয়। বড়ই দুঃখের বিষয় যে বিপ্লব-কারিগণ নব্য রসায়নের জন্মদাতা এই পুতান্না মহা-পুরুষেরও প্রাণদণ্ড না করিয়া দাঙ হন নাই। বিচারপতি কফিনলের নিকট এই আটাইশ জন হতভাগ্য ব্যক্তির বিচার হইতেছিল। সেই সময়ে তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও দেশহিতকর কার্য্যের জন্য তাঁহার মৃত্যু ভিক্ষা করিয়া দেশের বহু গণ্যমান্য লোকের স্বাক্ষরিত একখানি আবেদন পত্র বিচারপতিকে প্রদান করা হয়। তাঁহার পক্ষের উকিল তাঁহার পক্ষ হইতে যে আবেদন পত্র উপস্থিত করিয়াছিলেন,

মে ১৯৭১

ভাষাতে লাভোরাসিয়ে তাঁহার আরও একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা (প্রাণিদেহের বর্ষ পরীক্ষা) শেষ করিবার জন্য সময় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিচার পতি ককিনাল করাসী রাজতন্ত্রে বৈজ্ঞানিকের কোনও প্রয়োজন দেখিলেন না। তিনি সে সমস্ত আবেদনপত্র ঠেলিয়া রাখিয়া পিশাচের জ্বর কর্কশ স্বরে বলিয়াছিলেন “করাসী সাধারণতঃ পণ্ডিত বা বৈজ্ঞানিকের কোন প্রয়োজন নাই, জ্বরের বিচার হইলেই বধেষ্ট হইল”। তিনি তাঁহার জ্বর আটাইশ জন হতভাগ্য ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে এতটাই ব্যস্ত হইয়াছিলেন যে, জ্বরির মন্তব্য পর্যন্ত লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এই মনবী ব্যক্তিকে গিলটিন নামক বধষত্রে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়া বাতকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। পরদিবস প্রাতে এই আটাইশজন বধ্যভূমিতে নীত হইলেন। লাভোরাসিয়ে তাঁহার খণ্ডরের মন্তক কর্তৃত্ব হইতে দেখিলেন। তাঁহার সকলেই এমন হৈর্ষ্য ও গাভীর্ষের সহিত নিজ নিজ দণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন যে উপস্থিত দর্শক মণ্ডলী তাহা দেখিয়া বিষয়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহাদের অস্তিরকালে কোন অপমানহতক বাক্য তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশলাভ করে নাই। আবার, ভবিষ্যৎবোর এমনই বিভ্রম্না যে, কয়েকঘণ্টা পরে, যখন এই বিচারপতি ককিনাল রাজদ্বারে অভিযুক্ত হন, তখন তাঁহার নিজকৃত ভ্রম অনুযায়ী জুরীর মন্তব্য না লইয়াই তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইয়াছিল। ধর্মের আইন বড় কড়া, উহা রাজা বাদসাহের বাতির রাখে না। “Every stroke shall be repaid” হুর্কলের প্রতি বত আঘাত করা যায়, প্রত্যেকটির প্রতিশোধ আছে। ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। পাপের প্রারম্ভিত, দুই দিন আগে হয়, পরে হয়, হইবেই। প্রাণদণ্ডের প্রতি উৎপীড়ন কলে “কারবিবেদের” প্রাণদণ্ড হইল, আবার কারবিবেদের

প্রতি অবিচার কলে বিচারপতির প্রাণদণ্ড হইল। হৃদয়গতি ধর্মের কি হৃদয়ের নিয়মেক ব্যবস্থা।

এইরূপে একজন বৎসর বয়সে আধুনিক রসায়নের জয়দাতা লাভোরাসিয়ে বাতকের হস্তে গিলটিন বধ-ষত্রে আত্মবলিদান করিলেন। তাঁহার নিঃস্বার্থ আত্ম-বলিদানে সমগ্র পৃথিবী চমকিত হইল। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে ইয়ুরোপের সুধী-সমাজ লজ্জিত, হুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নী, কাউন্ট রমকোর্ড নামক একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিককে বিবাহ করেন।

কর্মই মানুষের নিত্যজীবন—কর্মই মানুষকে অমরতা প্রদান করে। অষ্টাবিংশতি ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হইল বটে কিন্তু একমাত্র লাভোরাসিয়ে ব্যতীত আর কাহারও স্মৃতি আর ইহজগতে নাই। কিছুদিন পূর্বর রোবেল্লিয়ারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে করাসী দেশের জনসাধারণও নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিল। পঞ্চ বৎসর লাভোরাসিয়ের পুণ্য স্মৃতির সন্মান করিবার জন্য রাজসরকারের পক্ষ হইতে বিপুল আয়োজন সহকারে তাঁহার পারলৌকিক কার্য সম্পাদিত হইয়াছিল। মহাশয় লাভোরাসিয়ের নখর দেহের অবসান হইয়াছে, বটে কিন্তু তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিপ্রসূত কার্যাবলীর পুণ্যস্মৃতি আজও বিশ্বের বহু নরনারী সাদরে পূজা করিতেছে। যত দিন পৃথিবীতে “রাসায়নিক সাহিত্য” থাকিবে তত দিন তাঁহার পুণ্যস্মৃতি থাকিবেই থাকিবে।

পাঠক, পরিশেষে, আমরা বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের কর্মময় জীবনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া মহাপুরুষ-চরিত্র কথনের পূণ্য উপার্জন করিয়া ধন্য হইলাম এবং সাধক কবির উপদেশ কথার প্রতিধ্বনি করিয়া আশ্রয়ও এই মহাবাক্য বলিব —

“মহাজানী মহাজন

যে পথে ক’রে গমন

হ’য়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়।

সেই পথ লক্ষ্য করে বীর কীর্তি ধ্বজা-ধরে  
আমরাও হবো বরশীর।”

“কর্ম জীবনের মত

কর্ম সাধনার মত

কর্ম বেদ, কর্ম তত্ত্ব

পুণ্যতীর্থ কর্মক্ষেত্র,

এ মহা সাধন ক্ষেত্র

পরাণ সঁপিবে।”

শ্রীমলিনীকান্ত বসু।

## বালচরিত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

### চতুর্থ অঙ্ক

দামোদরের প্রবেশ

দামো। তাই ত, গোপালনারায়ণ দেখছি সর্পরাজ  
কালিরকে দেখে আমারই পেছনে পেছনে আসছে। মত্ত  
চকোর-শাবকের নয়নের তার কি স্তম্ভর তাদের নয়ন !  
কি মনোহর তাদের উন্নত শ্বন ! কি উজ্জ্বল তাদের অধ-  
রোষ্ঠের কান্তি ! সকলেই ভীত-চিন্তে ও স্থলিত-পদে  
অগ্রসর হচ্ছে। না জানি আমার কি হয় এই ভয়ে বাক্য-  
ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না, কবরী-শোভন মালাগুলি শিথিল হ’য়ে  
গেছে ; আর তাদের পারের ওড়নাও এলোথেলো হয়ে  
থলে পড়ছে।

গোপলাঙ্গণের প্রবেশ

সকলে। প্রভু, প্রভু, এই যমুনা-হ্রদে যাবেন না,  
যাবেন না। এখানে বড় বড় সাপ আছে।

দামো। তোমরা বিষয় হ’রো না, চেরে দেখ আমি  
কি করি।

তোমরা সকলেই শঙ্কিত হ’য়ে কোমল-মধুর ও প্রিয়  
বাক্যে আমাকে বারণ কচ্ছ, কিন্তু যে যমুনা-হ্রদ গভীর,

মিছনীর ও সাগর ভূমি, যেখানে একটি পক্ষী উড়ে না, বাবা  
উরগকুলের আবাস, দুই থেকে বার জল দেখেই করীসমূহ  
ভীত হ’য়ে পলায়ন করে, আমি সেই জলাশয়ে প্রবেশ করে  
সলিল-রাশি বিক্ষোভিত করব, আর কালিন্দী-বাসাহু রাগী  
মহাবল কালির নাগকে ধ্বংস করব।

সকলে। প্রভু সতর্কণ, প্রভু দামোদরকে নিবারণ  
করুন, নিবারণ করুন।

সতর্কণের প্রবেশ

সত। দামোদরের প্রতি তোমাদের অসীম অনুরাগ,  
তাই তোমরা ভীত ও বিষয় হচ্ছ ; কিন্তু চেরে দেখ—

বার মুখনির্গত, অমঙ্গলকর বিবানল-শিখা দ্বারা সমগ্র  
চক্রবাল কপিণ বর্ণ ধারণ করেছে সেই প্রচণ্ড কালির নাগও  
শঙ্কিত হ’য়ে প্রবল-বেগে ধাবমান শ্রীকৃষ্ণকে দেখে চক্র-  
চিহ্নিত বীর মত্তক আনত কচ্ছে।

সকলে। একি ! প্রভু দামোদরও (?) যে দেখছি সে  
রকমের।

দামো। লোকহিতের জন্য এই নাগকে নীচই বন্দী-  
ভূত কস্তে হবে। [হ্রদে প্রবেশ।

সকলে। হায় ! হায় ! ধুম উঠলো যে !

দামো। অহো ! হ্রদটি কি গভীর।

কালির নাগের বিব-ধূমে যমুনা এখন কৃষ্ণ-লোহিত  
ও বিধামি-পূর্ণ হ’য়ে আছে ; আমি ইহার জলরাশিকে  
কুণ্ডিত কৃষ্ণ পটবাসের মত, আর তরঙ্গগুলিকে গলিত  
ইন্দ্রনীলের মত করে দেব।

[প্রস্থান।

বৃদ্ধ গোপালকের প্রবেশ

বৃদ্ধ গোপালক। হা প্রভু, গোপকতাদের এত ব্যয়ণ  
সত্ত্বেও তুমি যমুনা-হ্রদে প্রবেশ করে। এত চূর্ণাচল  
করে। না প্রভু। ব্যাঘ্র, বরাহ এবং হস্তী প্রভৃতি জন্তুগণ  
এ হ্রদের জল পান করা যাত্রাই হ্রদের ভীরে পড়ে মরে  
যায়, এও কি তুমি জান না, প্রভু ? এখন কি করি ? তাই

শেখ ১০২১

কুন্তলাশ গাছটার আরোহণ করে দেখি প্রভু কি করেন। হায়! হায়! ধুম উঠলো যে!

সম্বর্ষণ। ওগো, ঘোষ-সুন্দরীরা, ঐ দেখ ঐ দেখ—

দামোদর নাগটাকে ধরে যমুনা-হ্রদের সমগ্র সলিল তলদেশ পর্যন্ত বিস্তারিত করে তার বিস্তীর্ণ নীল ফণার উপর দাঁড়িয়ে আছে। কাল মেঘে ঈশ্রকে যেমন সুন্দর দেখায় দামোদরকেও তেমনই সুন্দর দেখাচ্ছে।

বুদ্ধ গোপালক। হী—হী; ধন্য প্রভু! ধন্য!

কালিয়কে লইয়া দামোদরের এবেশ

দামোদর। বেশ বুদ্ধ করেছে কালিয়। এখন আমি তাকে দমন করে তার বিষ-পরিব্যাধি ফণার উপর দাঁড়িয়ে লীলাভরে রাসকেলি করব। এই মহানাগের বিপুল ফণা আমার এক পায়ের শোভা বর্জন করবে, আর আমার এক বাহু চঞ্চল ভাবে হেলে ছুঁলে পতাকা হবে।

সকলে। আশ্চর্য্য! প্রভু, আশ্চর্য্য! কালিয়-নাগের পাঁচটা ফণার উপরে দাঁড়িয়েই প্রভু দামোদর রাসকেলি কচ্ছেন।

দামো। আচ্ছা, আমিও এই সুযোগে ফুল তুলে নেই না কেন?

কালিয়। সুবিস্তৃত ভুবন যেরূপ লোকালোক পরিত ছায়া পরিবেষ্টিত, মহাদেবের ধ্বংস রূপে ব্যবহৃত বায়ুকী যে রূপ মহাসমুদ্রে বন্দর পর্য্যন্তকে বেঁটন করেছিল, ঈশ্রহস্তী ঐরাবতের শুণ্ডের তার সুবলিত ও সুদৃঢ় আমার এই দেহ দ্বারা সেইরূপে বেঁটন করে মুহূর্ত্ত মধ্যে আমিও তোমাকে ত্রিধর্মাধিবাসে প্রেরণ করব।

বুদ্ধ গোপালক। হায়! প্রভু, দেখুন! দেখুন! যমুনা-হ্রদ বেন মহানাগের আকার ধারণ করে উখিত হয়েছে, আর প্রভু দামোদর কুন্তল-চরণ-পাতে তার মস্তক দলিত করে পুষ্প চরন কচ্ছে। ধন্য প্রভু, ধন্য। নাচ, নাচ; আশ্বাসন কর আমিও তোমার সহায় হব। কিন্তু প্রভু আমার বে বড় ভয় হচ্ছে। বাই, সমস্ত ব্যাপার মন্দগোপকে জানাই গিয়ে।

[ প্রস্থান।

দামোদর। যে পাপাণ্ড কালিয় ভেলোপেরে স্তীত হয়ে দৃঢ়ভাবে বাস ত্যাগ কচ্ছে, তার ফণাসমূহ সুবিস্তৃত, এবং যে দুই সর্প যমুনা-হ্রদবাসী মীন-মকরদিগকে বিধ্বস্ত করেছে, বল-প্রয়োগ করে আমি এখনই সেই সর্পাধমকে যমুনা হ'তে স্থলভাগে নিক্ষেপ করব।

কালিয়। রোষ-বশে আমার দেহ হ'তে যে বিষ-ধুম উখিত হচ্ছে, সেই ধুমই সমগ্র পৃথিবীকে দগ্ধ কর্তে সমর্থ; আমি এখন শিবার-শিখা দ্বারা তোমাকে ভষ্ম করব। মরুদগণ ও লোকপালগণ তোমাকে রক্ষা করুন।

দামো। কালিয়, যদি তোমার শক্তি থাকে তা' হ'লে আমার একটিমাত্র বাহকে দগ্ধ কর দেখি।

কালিয়। হা! হা! হা! সপ্ত কুল-পর্য্যন্ত-সমবিস্তৃত চতুঃ-সাগরাস্তা সমগ্র মেদিনীকে দগ্ধ করব, তোমার একটি ভূজ ত অতি ভূচ্ছ। একটু স্থির হও এখনই তোমাকে ভষ্ম করছি।

( বিধাঘ্ন উল্লীষণ )

দামো। বেশ! তোমার যা শক্তি ছিল তা, ত দেখালে।

কালিয়। ভগবান নারায়ণ, প্রসন্ন হ'ন, প্রসন্ন হ'ন।

দামো। কালিয়, এই শক্তি নিয়েই তোমার এত গর্ব!

কালিয়। ভগবান, প্রসন্ন হ'ন।

হে সুরেশ, আপনি শক্তি-বলে গোবর্জন ধারণ কন্তে পারেন, আপনার বাহু মন্দর তুল্য শারবান। যে বাহকে ত্রিভুবনের সমগ্র লোক আশ্রয় করে রয়েছে সেই সুবর্ষ্য বাহকে দগ্ধ করার শক্তি আমি কোথায় পাইব?

ভগবান, অজানতাবশতঃ আমি আপনার গৌরব লঙ্ঘন করেছি, এখন সপরিবারে আপনার শরণ নিলেম।

দামো। কালিয়, তুমি এই যমুনা-হ্রদে প্রবেশ করেছিলে কেন?

কালিয়। ভগবান, আপনার বিশিষ্ট বাহন গরুড়ের ভয়ে আমি যমুনার প্রবেশ করেছি। এখন প্রসন্ন হ'য়ে শরণাগতকে গরুড় হ'তে অভয় দান করুন।

দামো। আচ্ছা কালিয়, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হবে।

তোমার শিরে আমার পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়েছে।  
পঙ্কড় এই চিহ্ন দেখে তোমাকে অভয় দান করবে।

কালিয়। প্রভু, অঙ্গুষ্ঠীত হলেম।

দামো। এখন যমুনার বাও।

কালিয়। যে আত্মা, ভগবান নাগায়ণ।

দামো। আত্মা, কালিয়, একবার এদিকে এস ত।

কালিয়। ভগবান, শরণাগত উপস্থিত।

দামো। আজ থেকে গো-ব্রাহ্মণাদি সমস্ত প্রজাবর্গের  
বাতে আর প্রমাদ না যাতে তাই কস্তে হবে।

কালিয়। ভগবান, এই যমুনার জল আমার বিধে  
দূষিত হয়েছে। স্তুতরাং সমস্ত বিষ সংহরণ করে আমি  
এখনই এই যমুনা পরিত্যাগ করে চলে যাব।

দামো। বেশ, তা, হ'লে জ্বাম চলে যাও।

কালিয়। যে আত্মা, ভগবান নাগায়ণ।

[ পরিজনদের সহিত প্রস্থান।

দামো। যাই, আমিও যমুনা-হ্রদ হ'তে যে সকল  
পুষ্প চয়ন করেছি সেগুলি গোপকুমারীদিগকে দেই  
গিয়ে।

সকলে। এই যে! প্রভু আমাদের হৃদয়ে আনন্দ  
সঞ্চার ক'রে অকৃত শরীরে এদিক পানেই আসছে।  
প্রভুর জয়।

সক। বড় সৌভাগ্য, তোমা হতে গো-ব্রাহ্মণাদির  
হিত সম্পন্ন হল।

দামো। তোমরা সকলে এই ফুলগুলি গ্রহণ কর।

সকলে। প্রভু, এই ফুল চয়ন করা দূরে থাক পূর্বে  
কেহ কখনও স্পর্শ কতেও পারে নি; এমনকি এই সকল  
পুষ্প চন্দ্রাদিত্য-কিরণেও বর্ধিত হয় নি। নিতে  
আমাদের তর হয়, প্রভু।

দামো। নিরীহ গোপালনাগণ পূর্বে তরের বিশিষ্ট  
কারণ দেখেছে বলে এখনও ভ্রাসিত হচ্ছে। স্তম্ভভীষণ,  
আয়ত্তর নাই। আমার করস্পর্শে সমস্ত দোষ কেটে  
গিয়েছে—নির্ভয়ে গ্রহণ কর।

সকলে। যে আত্মা, প্রভু।

ভট্টের প্রবেশ

ভট্ট। ওহে গোপালক, নন্দগোপের পুত্র গেল  
কোথায়?

গোপালক। কালিয় মহানাগকে দমন করে প্রভু  
গোপকন্তা পরিবৃত্ত হয়ে এখানেই আছেন।

ভট্ট। ( অগ্রসর হইয়া ) নন্দগোপ-পুত্র, অঙ্গুষ্ঠার্থ  
নামক মহারাজ উগ্রসেনের পুত্র রাজা কংস তোমাকে  
আদেশ করেছেন--

দামো। কি আদেশ করেছে, বল।

ভট্ট। যথুগার ধর্ম্মহ মহোৎসব হবে। সেই  
মহোৎসবে আয়োদ-প্রমোদ করার জন্য পরিজনদের  
সঙ্গে তোমাকে যেতে আদেশ করেছে।

দামো। ( সর্কর্ষণের প্রতি ) আর্ধ্য, এ যে দেবচক্রের  
কাল উপস্থিত হল দেখছি।

সক। চল শীঘ্রই আমরা সেখানে যাই।

দামো। হাঁ, সর্বাগ্রে ইহাই কর্তব্য।

পূর্বকৃত অহঙ্কারের জন্য পশুরাজ বৈরূপ হস্তীকে  
বিনাশ করে, আমিও সেরূপ অস্ত্র কংসকে গীড়ন করে  
বিনাশ করব। তার রক্ত-মুক্ত মস্তকচূত হবে, কেশজাল  
ছড়িয়ে পড়বে। গলার হার, কেশুর ও লঘুত্ব ছিন্নভিন্ন  
হবে।

[ সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

রাজার প্রবেশ

রাজা। বিপুল-বিজয়, মহাবীর্যবান দামোদর  
বলরামের সঙ্গে ত্রুবধানে বাস কচ্ছে। দামোদরকে  
এখানে এনে মন্ত্রণার সঙ্গে বাহুবল নিযুক্ত করে  
কান্দুক সাহায্যে আজ আমি বধ করব।

ঋষসেন, ঋষসেন।



ভট্টের প্রবেশ

ভট্ট। মহারাজের জয়।

রাজা। ক্রমশেন, নন্দগোপ-পুত্র এসেছে ?

ভট্ট। মহারাজ, সমস্ত নিবেদন করছি, শুভুন। গোপ-জন দ্বারা পরিবৃত্ত হ'য়ে সর্দর্ভণের সঙ্গে দামোদর মথুরায় এসেই এক রজকের বাড়ী থেকে অনেক পোষাক-পরিচ্ছদ জোর করে কেড়ে নেয়। এই সংবাদ শুনে মন্ত্রী (মহামাত্র) মশায় তাকে বধ করার জন্য উৎপলাপীড় নামক গন্ধ হস্তী প্রেরণ করেন। সেই ভীষণ হস্তীও দামোদরকে ভীষণবেগে আক্রমণ করেছিল, কিন্তু বালক দামোদর সহসা সমবেত গোপগণের মধ্যে একটা ভীষণ হস্তী তাকে আক্রমণ করছে দেখে সবলে পর্ত্তকায় সেই গজেরের দাঁত ধরে তখনই তাকে বিনাশ করে !

রাজা। কি! হাতীটাকেই বধ করে! আবার গিয়ে সব কথা জেনে আস।

ভট্ট। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[ প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ।

মহারাজের জয়।

মহারাজ, উৎসবোপলক্ষে রাজমহাপথ ধ্বজপতাকা ও মালা দ্বারা শোভিত এবং অগুরু-ধূপে সুবাসিত করা হয়েছে। নন্দগোপের পুত্র সেই মহাপথ দিয়ে বরাবর এসে পথ-পার্শ্ববর্তী রাজ-গৃহ-দ্বারে উপস্থিত হ'ল। তখন গন্ধ-পেটিকা হস্তে কুঁজী মদনিকা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল; ত্রিকাক্ষ অরুণি তার পেটিকা থেকে চন্দন গ্রহণ করে নিজের গায়ে মাখতে লাগল; পরে—শুনে আশ্চর্য্য হবেন, মহারাজ—নিজের হাতখানি কুঁজীর গায়ে বুলিয়ে দিয়ে তখনই তার কুঁজ দূর করে দিল। তারপরে মালাকারের দোকান থেকে মালা নিয়ে গলায় পরে আয়ুধাগারের দিকে চলে গেল।

রাজা। বাও, বাও, শীঘ্র বাও, আরো না জানি কি কাণ্ড করেছে, শীঘ্র গিয়ে জেনে আস।

ভট্ট। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[ প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ।

মহারাজের জয়। নন্দগোপ-পুত্র প্রথম বধন আয়ুধাগারে প্রবেশ কর্তে উদ্ভত হ'য়েছিল তখন রক্ষক সিংহবল তাকে বাধা দিয়েছিল, কিন্তু সেই বাধার কোন ফল হয় নি, কারণ সিংহবল নন্দ-নন্দন কর্তৃক কর্ণমূলে আহত হয়ে তখনই প্রাণত্যাগ করে। তাতেও সন্তুষ্ট না হ'য়ে নন্দমুখ আয়ুধাগার হ'তে একটি বহু এনে তাহা দ্বারা রক্ষককে দ্বিধা করে সত্যগৃহাভিমুখে প্রস্থান করেছে।

মহারাজ, নন্দ-নন্দনের বেশ বড়ই বিচিত্র। তার গলায় মালা, মাগায় শিখি-পুচ্ছ, অঙ্গে বিবিধ ভূষণ ও পরিধানে পীত বসন; তার দেহকান্তি জলভরা মেঘের জায়। তার রোম-পরিবৃত্ত বিশাল নেত্র দেখে মনে হয় যেন বলরামের সঙ্গে দ্বিতীয় রুতান্তের জায় নন্দমুখ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছে।

রাজা। আমার হৃদয় যেন উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠল। যাও, পূর্বে যে কর্তব্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে তদনুসারে চাগুর ও মুটিককে নিয়ে এস, আর বৃষ্টি-কুমারগণকে বুদ্ধ-সজ্জা কর্তে বল।

ভট্ট। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[ প্রস্থান।

রাজা। বাই আমিও প্রাসাদশিখরে আরোহণ করে চাগুর ও মুটিকের সঙ্গে নন্দ-মুখের মত বুদ্ধ দেখি গে।

( প্রাসাদ-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ) মধুরিকা, দরজা খুলে দাও।

প্রতীহারী। যে আজ্ঞা, প্রভু।

[ রাজার প্রবেশ ও উপবেশন।

চাগুর ও মুটিকের প্রবেশ

চাগুর। আজ বুদ্ধ-সজ্জা করে এসেছি, বলহুগু মস্ত হস্তীর জায় রক্তভূমিতে বালক দামোদরকে দ্বিধা করব।

মুটিক। আমার নাম রুই মুটিক। আমার হাতের মুটি

লোহার স্তার। বস্ত্র বেরূপ গিরিশূন্য নিপাতিত করে  
আমিও আজ সেরূপ বলরামকে নিপাতিত করব।

ভট। এই যে মহারাজ। তোমরা এদিকে এস।

উভয়ে। (অগ্রসর হইয়া) প্রভুর নর।

রাজা। চাপুর, মুষ্টিক, প্রাণপণে চেষ্টা করে আজ  
আমার ঋণ শোধ কতে হবে।

উভয়ে। মহারাজ, বলছি শুধুন—করণ-সন্ধা-বন্ধ  
প্রভৃতি কৌশল প্রয়োগ করে নিশ্চয়ই কার্য্য সফল করব।  
আপনি দেখতে থাকুন।

রাজা। হাঁ, তাই করবে। এবসেন, গোপের ছেলে  
ছুটোকে এ বেলা নিয়ে এস।

ভট। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[ প্রস্থান।

এবসেনের সহিত দামোদর ও সর্দারের প্রবেশ

দামো। আর্ঘ্য, জন্মান্তরে অম্বর-মেহধারী পাপিষ্ঠ  
কংসকে যদি বৃদ্ধে আজ নিপাতিত করে পরিকর্ষণ  
কতে না পারি তবে মন্ত্যে আমার জন্ম বিফল মনে  
করব; আর ঘোষ-পল্লীতে যে সকল কার্য্যাত্মক  
করেছি আজ এই নগরে সেগুলি আমার সন্তোষ  
সিধান কতে পারবে না।

সর্দার। আজ রক্তভূমিতে প্রবেশ করে লোহার  
স্তার দৃঢ়-মুষ্টি রুট মুষ্টিককে মুঠ্যাঘাতে বধ করব, এবং  
বন্ধার স্তার প্রচণ্ড মুষ্টি ধারণ করে লঙ্ঘিত মেঘমালার  
স্তার অন্তরীকে বিচরণ করব।

ভট। এই যে মহারাজ,—তোমরা এদিকে এস।

উভয়ে। এঃ! কার মহারাজ ?

ভট। সকল জগতের মহারাজ; আর আমাদের  
মহারাজ।

দামো। কিন্তু, আজ থেকে আর জগতের মহারাজ  
থাকবে না।

ভট। মহারাজের নর। এরাই সেই দুই ভাই।

রাজা। (ঘেঁষিয়া) এই সেই দামোদর। অহো,

কি সুন্দর আকৃতি! মদমত্ত গজের স্তার কেমন বীর-  
বিলাস-গমন-ভঙ্গী! ইহার বর্ণ ভ্রাম, বন্ধ ও বাহু দৃঢ়,  
বক্ষ স্থল ও প্রশস্ত। পূর্বে ইহার কার্য্যাবলী শুনেছি মাত্র  
—কিন্তু এখন দেখছি এই বালক সত্যই লোকজয়ের  
পরিবর্তন সিধান কতে সমর্থ।

আর পূর্বে মাত্র যার নাম শুনেছি—ললিতগম্ভীরাকৃতি  
এইটিই ইহার অগল বলরাম।

ইহার মুষ্টিও শরীর স্তার সুন্দর; চক্ষু নবীন কমলের  
স্তার আয়ত, পরিধানে উদার নীলসমন, বাহু রক্ত  
পরিষের স্তার সুগোল ও দীর্ঘ, এবং গলদেশে খেতোৎপল-  
দলের মালা—বিচিত্র ও চকল।

দামো। আর্ঘ্য, এরা দুজনই আমাদের সঙ্গে যুদ্ধার্থ  
সজ্জিত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

সর্দ। হাঁ, তাই হবে।

রাজা। এবসেন, বৃদ্ধ আরম্ভ করে দাও

ভট। যে আজ্ঞা মহারাজ।

( মালা নিক্ষেপ )

মল্লগণ। অঙ্গ, যুদ্ধপটহ বাজাও।

চাপুর। দামোদর এঃ, আজ আমার দুই বাহু  
যারা তোমার জীবন শেষ করব।

দামো। এই যে আমি এসেছি, আমার গতি-বোধ  
কর দেখি।

মুষ্টিক। ওহে রাম, আজ আমার মুষ্টি প্রহারে  
তোমার নিষ্পেষিত দেহ হ'তে রুধির ও মজ্জা বিগলিত  
হবে।

সর্দ। হে মুষ্টিক, আজ তোমাকে বর্মের নিকট  
নিবেদন করব।

( সকলের বৃদ্ধ )

দামো। (চাপুরকে বধ করিয়া) হুট ভগ্নাঙ্গি হ'য়ে  
প্রাণ পরিত্যাগ করেছে।

সর্দ। আমিও হুটকে বধ করেছি।

দামো। এখন কংসাস্ত্রকে বশালয়ে প্রেরণ কহে হবে।

(প্রাসাদে আরোহণ করিয়া কংসের কেবাকর্ষণ ও কুতলে নিক্ষেপ)

চুরায়া কংসের এখন এই দশা! কুট্টের লোহিত বদন বিভীর্ণ, চক্ষু-ভারক্য পরিবৃত্ত, স্বক, কণ্ঠ, কটি, জাম্বু, কন, উরু, ও জম্বা ভগ্ন, হার ছিন্ন, কেশ্বর ও লম্বহস্তে কুপতিত। বজ্রভগ্ন-শিখর পর্বতের স্তার ছুই অনুর এখন-ধরাশায়ী।

নেপথ্যে

হার, মহারাজ! হার, মহারাজ!

পুনরায় নেপথ্যে

ওহে ব্রহ্মবোধগণ, ওহে অনারুটি, শিবে, হৃদিক, পৃথুক, সোমদত্ত, অক্রুর প্রভৃতি বোদ্ধাগণ, প্রভুর অণ পরিশোধের সময় উপস্থিত হয়েছে, তোমরা সত্বর এস।

দামো। আর্ধ্য, সৈন্তগণকে নিবারণ করুন।

সক। এই আমি বাধা দিচ্ছি—

বোদ্ধাগণ ভীমনাদে বিচরণ কহে, তুরঙ্গ, হস্তী ও রথসমূহ সবেগে অগ্রসর হচ্ছে, খড়্গা, প্রাস, শক্তি, অটি, কুন্ত প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র সকলের অভ্যাজন করণ-ছটার চক্ষু বললে বাড়ে—পবন-বেগ-বিকীর্ণ ফেনজাল ও উর্ধ্বনম্রুল বিপুল সাগরের স্তার এই সৈন্ত-শ্রেণীকে আমি বাছ-বলেই বিকোষিত করব।

বহুদেবের প্রবেশ

বহু। ওহে মধুরাবাসিগণ, এ অসম সাহস নিফল। তোমরা কি জান না যে, এই জ্যেষ্ঠ বালক রোহিণীর গর্ভজাত কিত্ত আমারই পুত্র, আর এইটি দেবকী-নন্দন। আক্রোশ পরিত্যাগ কর, এক্ষেত্রে অস্ত্র-প্রয়োগ করেও ফল নাই, কারণ কংস বিনাশের জন্ত বিষ্ণু স্বয়ং এখানে অবতীর্ণ হয়েছেন।

সক। (দেখিয়া) পিতঃ, পিতঃ, সতর্কণ আপনাকে অভিযান কহে।

দামো। তাত, দামোদর আপনাকে অভিযান কহে।

বহু। তোমরা অক্ষয়বিজয়ী হও। আজ আমি সংপূত্র লাভের কল পেলাম।

উভয়ে। আমরা অজুগৃহীত হলেম।

বহু। কে আছ এখানে?

ভটের প্রবেশ

ভট। আর্ধ্যপুত্রের জয়।

বহু। শবগুলি সরিয়ে ফেল।

ভট। যে আজ্ঞা, আর্ধ্যপুত্র।

গোপালকগণ। হী হী—এখন এই রাজ্য গোপালক-গণের হল।

বহু। কে আছ এখানে?

ভট। আর্ধ্যপুত্রের জয়।

বহু। যাও, দামোদরের আদেশ ক্রমে অনারুটিকে বল উগ্রসেনকে শৃঙ্খল মুক্ত করে ও স্নান করিয়ে শীত নিয়ে আনুক।

ভট। যে আজ্ঞা, আর্ধ্যপুত্র।

[ প্রস্থান।

বহু। একি! দেবতূর্য্য সকল নিনাদিত হচ্ছে, পুষ্প-বৃষ্টি হচ্ছে—আর প্রায় সকল দেবতাই কংস-হৃদনের পূজার জন্ত সমাগত হয়েছে।

নেপথ্যে

চিচি কনক-খচিত-হর্যামালা-শোভিত, এবং সুবিভীর্ণ রাজভবন আপগ-শ্রেণী ও পুরবার সমন্বিত এই মধুরাপুরীকে কমলায়তাক, ত্রৈলোক্য-বিজয়ী, সুর-শ্রেষ্ঠ শ্রীমান ত্রিদশৈক্সাধিপতি পালন করুন।

বহু। ওহে মধুরাবাসী জনগণ, তোমরা সকলে শ্রবণ কর—দৈত্যোজ-পুরের অর্গলোৎপাটনে সমর্থ, সমস্ত কজিরের পরাভব-বিধানকর্ম বহুদেব-পুত্র বাহুদেবের প্রসাদে উগ্রসেন পুনরায় দ্বাভ্যে প্রতিষ্ঠিত

হলেন; এবং তোমরা সকলে এখন তাঁহারই শাসনকাল  
বলিয়া জানিবে।

সকলে। তা'হ'লে এখন বৃষ্টি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হল।

বসু। মহারাজকে সংবাদ দাও।

ভট্ট। যে আজ্ঞা, আর্ধ্যপুত্র।

| প্রস্থান।

উগ্রসেনের প্রবেশ

উগ্র। বিষ্ণুর অঙ্গুগ্রহে যেরূপ শতজুতুর ক্রেশ দূর  
হয়েছিল সেইরূপ কেশিন্দনের প্রসাদে আমার চির  
কারাবাস-ক্রেশ দূর হল।

ভগবানের প্রসাদে বাসনার্ণব হতে উত্তীর্ণ হলাম।

নারদের প্রবেশ

নারদ। কংসাসুর নিহত হয়েছে তাই দেবগণের  
আদেশ ক্রমে বিষ্ণুর পূজা করবার জন্য দেবলোক  
থেকে গন্ধর্ব ও অঙ্গরাগণের সঙ্গে এখানে এসেছি।

দামো। এ যে দেবর্ষি নারদ। দেবর্ষি, আসুন,  
আসুন। এই অর্ঘ্য ও পাত্ত গ্রহণ করুন।

নারদ। সমস্তই গ্রহণ ক'ছি। গন্ধর্ব ও অঙ্গরাগণ  
গান ক'চ্ছে।

নারায়ণ, তোমাকে নমস্কার; দেবগণও তোমাকে  
নমস্কার ক'চ্ছে। আর এই অসুর-নাশে সমগ্র মহী  
নিরাপদ হ'ল।

দামো। দেবর্ষি, আমি তুষ্ট হলাম। আমি আপ-  
নার আর কি প্রিয় কার্য্য করতে পারি।

নারদ। যদি বিষ্ণু আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন  
তা'হ'লেই আমার সকল শ্রম সার্থক। দেবগণের সহিত  
আমি এখন দেবলোকে ফিরে বাছি।

দামো। আচ্ছা আসুন, আবার যেন দেখা পাই।

নারদ। যে আজ্ঞা, ভগবান নারায়ণ।

[ প্রস্থান।

( ভরতবাক্য )

যে মহী আসাগরবিন্দুত, বিদ্যাপর্যন্ত যার কুন্তল

বরূপ আমাদের রাজ্যসংহ একচ্ছত্র অধিপতি রূপে সেই  
মহীমণ্ডলকে শাসন করুন।

শিববস্ত্র

শ্রীশঙ্করব্রহ্ম ভট্টাচার্য্য।

## কবিকল্পন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ

অমর কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কথা বঙ্গবাসী  
অবিদিত নহেন। বিখ্যাত চণ্ডীকাব্যের সহিত তাঁহার  
নাম সুবর্ণস্থানে ঝড়িত রহিয়াছে। চণ্ডীভক্ত বাঙ্গালী  
ভক্তিবিগলিত চিত্তে অগ্রে সেই অমর কবির উল্লেখে  
প্রণতঃ না হইয়া তাঁহার নাম গ্রহণ করেন না। কাব্যে  
জাতীয় চরিত্রের বিকাশ হয়। মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য  
তৎকালীন বঙ্গ সমাজের একখানা নিখুঁত চিত্র।  
প্রভুত্বের বজ্র ভূমি হইতে অতিকষ্টে ইতিহাসের অনেক  
রক্ত উদ্ধার হইয়াছে। আমরা চেষ্টা করিলে চণ্ডীকাব্যের  
মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য প্রাপ্ত হইব। কবি সমাজের  
লোক; তাঁহার নিকট সমাজের আচার ব্যবহার জানিতে  
পারিব ইহা আমাদের দুরাশা নহে। আর একটি সূত্রের  
বিষয়, মুকুন্দরাম দরিদ্র লোক; এজন্য সমাজের সাধারণ  
লোকের সঙ্গে তাঁহার মেশামিশ ছিল। সুতরাং আমরা  
তাঁহার নিকট দরিদ্র বাঙ্গালা পল্লীর সাধারণের অবস্থা  
জানিতে পারিব। যিনি লক্ষ্মীর ক্রোড়ে বসিয়া বীণাপাণির  
সেবা করেন তাঁহার কাব্যে অসার বৌদ্ধৈশ্বর্যের  
বর্ণনা স্থান পাইয়া থাকে। এমন কবির নিকট ব্যাধ-  
পরিবারের চিত্র পাওয়া অসম্ভব। দরিদ্র মুকুন্দরাম  
ব্যাধগৃহে গিয়া তাহাদের অভাব সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া-  
ছেন। ব্যাধ নিতম্বিনীপণ বধন বাসি মাংসের পসরা  
লইয়া পল্লীতে বাহির হইয়াছে, নিরাহ কবি তখন গিন্ন

শেখ ১০২১

পিছু গিয়া তাহাদের অবস্থা লক্ষ্য করিয়াছেন। ছাপ-  
রক্ষণী খুলনার দুঃখে কবি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ  
গিয়াছেন। সহস্রভূতীশীল কবি একান্ত খুলনা-চরিত্র  
বর্ণনা করিতে পারিয়াছেন। পল্লীবাসী দরিদ্র কবির  
নিকট এই চিত্র মূলত। পল্লীগ্রামের পট-চিত্রকরের  
নিকট হরগোষ্ঠী বিবাহের পট পাইব কিন্তু নাগরিক  
কোন আলোকচিত্রব্যবসায়ীর নিকট উহা পাইব না।  
কবি যে আবহবৈশিষ্ট্যের মধ্যে বাস করেন তাহার ভাব  
কাব্যে সংক্রান্ত হয়। বাহা হউক আমরা কবির  
আবির্ভাব কাল আলোচনা করিয়া তাঁহার সময়ের  
সমাজচিত্র দর্শন করিব।

বর্তমান জেলার অন্তঃপাতী সেলিমাবাদ থানার  
অধীন দামুদ্রা গ্রামে মুহম্মদরায়ের জন্ম। কবিকল্পন  
ইহার কাব্যশাস্ত্রের উপাধি। সেলিমাবাদে গোপীনাথ  
নিয়োগী মহাশয়ের তালুকভাগত মুহম্মদরায়ের একখণ্ড  
পৈত্রিক বাসভূমি ছিল। সে সময় দেশ মুসলমানের  
অধীন। সম্রাটগণ দিল্লীর সুরম্য হাফেজ মনানন্দে সময়  
কাটাইতেন। বঙ্গবাসীর দুঃখের আর্দ্রনাভ তাঁহাদের  
কর্ণে পৌঁছিত না। বিশেষতঃ এই কালে হিন্দুর অধ-  
বাস্তব্যের একান্ত অভাব ছিল। গুরুতর করতারে  
প্রজা সর্বস্বান্ত হইত। সম্রাটের উদ্দেশ্য অনেক সময়  
তাল হইলেও অর্থগুরু রাজকর্মচারীর বেচ্ছাচারিতার  
ক্রোড়ে প্রজার সুখশান্তি তুণের স্রাব ভাসিয়া বাইত।  
সম্রাটগণ সমস্ত রাজ্য জরিপ করিয়া উহার জমাবন্দী  
করেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য, প্রজারা নিজ নিজ দেয় কর  
জানিতে পারিলে নীচমন্য রাজভৃত্যগণের অত্যাচারপথ  
রুদ্ধ হইবে। কিন্তু সর্গদেস্ত কলগ্রহ হইত না।  
মুহম্মদরায় স্পষ্ট লিখিয়াছেন—

মাগে কোণে দিয়া দড়া পনের কাঠার কুড়া  
নাই শুনে প্রজার পোহারি।  
সরকার হইল কাল খিল ভূমি লিখে নাল  
বিনা উপকারে যায় ধুতি।

পোকার হইল বম টাকার আড়াই আন্ড কম  
পাই লভ্য লির প্রতিদিন।

ডিহিদার অবোধ খোজ কড়ি দিলে নাহি রোজ  
ধাত্ত গরু কেহ নাহি কিনে।

বর্ণনার শেষ চরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় সেকালে  
টাকার খুব অভাব ছিল। এসময় রাজভৃত্যগণ অত্যাচারের  
অবতার ছিল। আমাদের নিরীহ কবির সুখশান্তি এক  
নীচমন্যের ক্রোধবহুিতে পুড়িয়া গিয়াছিল। সে ডিহিদার  
মাঘদ সরিফ মুহম্মদরায় মাঘদ সরিফের অত্যাচারে মর্মে  
অর্ধে পৌঁড়িত হইয়া পৈতৃক বাসভূমি পরিত্যাগ পূর্বক  
মেদিনীপুর জেলার বাটাল থানার অধীন আড়রা গ্রামে  
পলায়ন করেন। এই পলায়ন সময়ে মুহম্মদরায় একক  
ছিলেন না। তাঁহার সঙ্গে স্ত্রীপুত্রাদি সহ একটি ক্ষুদ্র পরিবার  
ছিল। কপর্দকহীন পলায়নপর পথিকের বিপদের  
কথা চিন্তা করিলে কা'র না হৃদয় ব্যথিত হয়! পলায়ন-  
পথে দুঃখহারিণী চণ্ডী মুহম্মদরায়কে চণ্ডীকাব্য লিখিতে  
আদেশ করেন। কবি তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কাল  
আড়রার ভূস্বামী বীরমাধবের পুত্র রাজা রঘুনাথের  
আশ্রয়ে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। গ্রন্থোৎপত্তির  
ভনিতায় কবি লিখিয়াছেন—

ধন্য রাজা মানসিংহ বিহুপদাযুজে ভূদ  
গৌড়-বঙ্গ-উৎকল অধিপ।  
অধর্মী রাজার কালে প্রজার পাপের কলে  
হিলাৎ পায় মাঘদ সরিফ।

গ্রন্থ সমাপ্ত হইলে গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ উহাতে  
যোগ করিয়া গ্রন্থপ্রচার হইত, ইহা প্রাচীন গ্রন্থাবলীর  
বিশেষ লক্ষণ। কবির ভনিতাদৃষ্টে বুঝা যায়, রাজা  
মানসিংহের শাসন সময়ে তাঁহার গ্রন্থের প্রচার হয়।  
মানসিংহের বঙ্গশাসনকাল ১৫৮৯ খৃঃ—১৬০০ খৃঃ  
পর্যন্ত। কবি তাঁহার গ্রন্থপ্রচার অন্যতর আদেশ  
প্রাপ্তির সময় নির্ধারণ করিয়াছেন,

শকে রসরসে বেদ লশাক গণিতা।  
সেই কালে দিলা গীত হরের বনিতা।

রস—শূদ্র, হাত, করুণাদি ১ ; বেদ—৪ ; শশাঙ্ক—১। অঙ্কের বাষাংগতি নিবন্ধন ১৪২১ শকাব্দ। সুতরাং বুঝা যায় ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে কবি দামুড়া ত্যাগ করেন। এই পলায়নের অনুমান ১২১৩ বঙ্গাব্দ পর, অর্থাৎ ১৫৮২ কি ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে মানসিংহের শাসনকালে কাব্য প্রচারিত হয়। কেহ কেহ রস শব্দে কটু তিক্তা দি ছয় রস ধরিয়া উক্ত শ্লোক হইতে ১৪৬৬ শকাব্দ বিজ্ঞাপিত হইতেছে ব্যাখ্যা করেন। এই মতান্তরসারে গ্রন্থপ্রচারকালে বঙ্গ মানসিংহের শাসনকর্ত্ত্বক অসম্ভব হইয়া পড়ে। প্রথম প্রকার মতের অনুকূলে আরও বুক্তি এই যে, কবি মুকুন্দরাম রাজা রঘুনাথের আশ্রয়ে থাকিয়া কাব্য লিখেন; সেই রঘুনাথের রাজত্বকাল ১৫৭০—১৬০০ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং রঘুনাথের সময়ে গ্রন্থ রচিত হইলে তখন বঙ্গ মানসিংহের শাসন কাল ছিল এ বিষয়ে আপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং আমরা মোটামুটি দেখি যে, কবিকঙ্কন-চণ্ডী বোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে রচিত হইয়াছিল। তখন যোগল সম্রাট আকবরের শাসনকাল। পাঠানগৌরবরবির অন্ত-গমনের পর আকবরের সময় হিন্দুর ভাগ্যাকাশে কণেকের জন্ম সুখতার উদ্ভিত হইয়াছিল।

যে বঙ্গদেশ চৈতন্য প্রভুর প্রেম বন্ধার ডুবডুব, সেই বঙ্গে প্রভুর প্রস্থানের পর শাক্ত ও বৈষ্ণব অনতিবিলম্বে কেন শক্তিপূজার প্রচার হইল তাহা চিন্তার বিষয়। আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রভুর তিরোভাবে পর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বাঁহারা মুখপাত্র ছিলেন তাঁহার বিলাসী হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রভুর সময় সমাজের একদল লোক নিজেদের প্রাচীন ধর্মমত রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ বঁধ করিতেছিল। যখন বৈষ্ণবের সর্কারঃ-প্রনারী প্রেমস্রোত রুদ্ধ হইল তখন সমাজে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হইতে লাগিল। ফলকথা বৈষ্ণবের মধ্যে নৈতিক চরিত্রবান নারকের অভাব

হওয়াতে শাক্ত বৈষ্ণবের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে শাক্তগণের জয় হইতে লাগিল। শাক্তগণ হরিসংসীর্ভনের পার্শ্বেই ত্রীমন্তের মশানের গান গাইতে আরম্ভ করিল। সময় বুঝিয়া অনেক কবি চণ্ডীগানের জয়পতাকা হস্তে আসরে নামিলেন। তদ্ব্যতীত কবিকঙ্কনের পতাকাই সকলের শীর্ষে স্থান পাইয়াছিল।

মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের তিনটি ভাগ। প্রথম ভাগে পৌরাণিক দেবতাপ্রণের উপাখ্যান গ্রন্থ পরিচয় বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় ভাগে কালকেতু ব্যাধের বিবরণ।

ষটনাটি এই যে, একদিন ইন্দ্রপুত্র নীলাশ্বর পিতার জন্ম শিবপূজার ফুল সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দৈবাৎ তাঁহার আদৃত পুষ্প হইতে একটি কীট বাহির হইয়া শিবের ললাটদেশে দংশন করে। এই অপরাধে শিব নীলাশ্বরকে মর্ত্যে জন্ম গ্রহণ করিবার জন্ম অভির্শাপ দেন। নীলাশ্বর কালকেতু ব্যাধ, এবং তৎপত্নী জারা ফুল্লরা রূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত কালকেতু ব্যাধের অত্যাচারে বনের পশু অস্থির হইয়া চণ্ডীর শরণাপন্ন হয়। দেবী প্রথমে সুবর্ণ-গোমিকা রূপে কালকেতুকে দেখা দেন ও পরে স্বরূপ প্রদর্শন করেন। কালকেতু দেবীর পরিচয় পাইয়া তাঁহার সেবাস্রুত গ্রহণ করিলে দেবীর বরে তাঁহার দারিদ্র্য ঘুচিল। কিছুদিন পর ভাড়ুদত্ত নামক এক ভণ্ডের প্ররোচনায় কলিঙ্গাধিপতি কালকেতুর সহিত যুদ্ধে প্রযুক্ত হন। যুদ্ধে কালকেতু পরাস্ত ও বন্দী হইল। বন্দী কালকেতু কারাগারে দেবীর জব পাঠ করে। দেবী কালকেতুর জবে তুষ্ট হইয়া তাঁহার মুক্তির জন্য কলিঙ্গাধিপতির প্রতি আদেশ করেন। কালকেতু মুক্ত হইল। যুদ্ধে বৃত সৈন্তগণ পুনর্জীবন লাভ করিল। কলিঙ্গরাজ দেবীর যাহাওয়া দেখিয়া নিজে চণ্ডীপূজা গ্রহণ করিলেন। পৃথিবীতে চণ্ডীপূজার প্রচার হইল। এই সময় কালকেতু ও ফুল্লরা শাপমুক্ত হইয়া বর্ণে চলিয়া গেল।

ভূতীয় ভাগে ধনপতি সওদাগরের বিবরণ—পূর্বের  
অপর্যায় রত্নমালা ভালভঙ্গ-দোষে মর্ত্যে লক্ষপতি সওদাগরের  
গৃহে কতারণে ভ্রমগ্রহণ করেন। পিতা তাঁহার  
দাম্য ধূমনা রাখেন। একদিন উজানী নগরের ধনপতি  
সওদাগর পারাবত জীড়ার সময় ঘটনাক্রমে ধূমনার  
রূপরাশি দর্শন করিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে অভিলাষ  
করেন। এই অভিলাষ পূরণের ভিত্তি ধনপতি প্রথম  
পত্নী লহনাকে অনেক শোকব্যাক্যে আশ্রয় করিলেন।  
লহনা অগত্যা পতির পত্নাত্তর গ্রহণে অহুমতি দিলেন।  
ধনপতি সওদাগর ধূমনাকে বিবাহ করিবার অনতিকাল  
পরেই রাজ্যদেশে গোড়ে গমন করিলেন। সওদাগর  
সপত্নী লহনার উপর ধূমনার রক্ষাব্যবস্থার ভার দিয়া  
গেলেন। লহনা প্রথম প্রথম ধূমনাকে খুব ভাল  
বাসিতেন কিন্তু শেষে দুর্জলা দাসীর বহনায় ধূমনাকে  
বিপদে ফেলিলেন। দুর্জলা দাসীর পরামর্শে লহনা  
এক জাল পত্র দেখাইয়া ধূমনাকে বলে যে, তুমি অস্ত  
হইতে খুণ্ডাবস্ত্র পরিয়া বনে বনে ছাগ চরাইবে ও রাত্রে  
টেকিশালে নিদ্রা বাইবে। তোমার প্রতি সওদাগরের  
এই আদেশ। ধূমনা লহনার চাতুরী বুঝিতে পারিয়াও  
নীচবে এই আদেশ বহন করিলেন। ধূমনা বনে বনে  
ছাগ চরাইতেছেন এমন সময় পঞ্চকন্যা তাঁহাকে  
চণ্ডীপূজা শিখাইয়া বান। এই দিন ধূমনা “সরুশী”  
ছাগলটি হারাইয়া লহনার ভয়ে আর বাড়ী গেল না।  
এই দিন রাত্রেই প্রবাসী ধনপতি ধূমনাকে স্বপ্নে দেখেন ;  
তাই তিনি বাড়ী আসেন। ধূমনার জীবহুত্তির যৌবন-  
জালে প্রবাসাগত ধনপতি বদ্ধ হইয়া পড়িলেন। স্বামী-  
সোহাগিনী কিন্তু লহনার অভ্যাচারের কোন প্রতিকার  
করিলেন না। কিছুদিন পর সওদাগর বাণিজ্যার্থ  
সিংহল যাত্রা করিলেন যাত্রার সময় ধূমনা পতির  
স্বজনকামনার চণ্ডীপূজা করিতেছিলেন ; ধনপতি  
“জাকিনী” দেবতা বলিয়া চণ্ডীর ঘট পদপ্রহারে  
ভয় করিয়া সিংহলে চলিয়া বান। বলা বাহুল্য, ধনপতি  
একজন গোড়া শৈব।

সাধু চণ্ডীর ঘটে পদাবত করিয়াছেন তাই  
চণ্ডী তাঁহাকে বিপদে ফেলিলেন। তাঁহার ছয় ডিঙ্গা  
সমুদ্রে ডুবিয়া গেল। একমাত্র সপ্তম ডিঙ্গা মধুকর  
লইয়া সাধু সিংহলে পৌঁছিলেন। সওদাগর সিংহল গমন  
সময় কালীদহে কমলে অপূর্ণ কামিনী মূর্ত্তি দেখিয়া  
গিয়া সিংহল-রাজ্যের নিকট এই অলৌকিক কাহিনী  
ব্যক্ত করেন, এবং সিংহলেশ্বরকে কমলে কামিনী  
দেখাইতে প্রতিক্ষিত হন। কিন্তু দৈবতাড়িত ধনপতি  
সিংহলেশ্বরকে কমলে কামিনী দেখাইতে না পারিয়া  
কারারুদ্ধ হন। সাধুর সিংহল গমনের পর ধূমনা  
শ্রীমন্ত নামক এক পুত্র প্রসব করেন। এই পুত্র  
বঙ্গপ্রান্ত হইয়া পিতার উদ্দেশে সিংহল যাত্রা করেন।  
ইহিও পথে বহু বিপদে পতিত হন ও কালীদহে কমলে  
কামিনী মূর্ত্তি দেখিয়া সিংহলের রাজ্যের নিকট তাহা  
প্রকাশ করেন। রাজা কোতুহলাবিষ্ট হইয়া দ্বিতীয়  
বার—কমলে কামিনী দর্শনার্থ কালীদহে গমন করেন,  
কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। একান্ত তিনি ক্রুদ্ধ  
হইয়া শ্রীমন্তের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। বধ্য-  
ভূমিতে শ্রীমন্ত চৌত্রিশ অক্ষর চণ্ডীর স্তোত্র পাঠ করিলেন।  
তাহাতে দেবী সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীমন্তকে কোলে লইয়া  
বসিলেন। রাজত্বভাগ্য রাজ্যের নিকট এই সংবাদ  
বহন করিল। রাজা চণ্ডীর মহিমা স্বয়ংদ্রব্য করিতে  
পারিয়া ধনপতি সওদাগর ও শ্রীমন্তকে মুক্ত করিয়া  
দিলেন। শ্রীমন্ত সিংহল রাজনন্দিনী সুলীলার পাণিগ্রহণ  
করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। দেশে আসিয়া  
শ্রীমন্ত দেশের রাজা বিক্রমকেশরীকে কমলে কামিনী  
দেখাইয়া তাঁহার কন্যা জয়াবতীকে বিবাহ করেন। ক্রমে  
দেশে চণ্ডীপূজা প্রচলিত হইল, এবং শাপলষ্ট জনগণ  
স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

দেখা যায়, কবি ছই খানা চিত্রে সমাজের দুইটি অবস্থা  
প্রদর্শন করিয়াছেন। কালকেতুর  
সমাজ চিত্র প্রদর্শনে বিবরণে কবি দ্বিতীয় পরিবারের  
কবির কৃতিত্ব অবস্থা দেখাইয়া পাঠককে কাঁদাইয়া  
ছেন। ভেয়েতার খুঁটিতে স্থাপিত



তালপত্রের ছাউনিবিশিষ্ট ঘর, ছিন্ন পরিবেশ, কদম  
আহার—তাঁহাও সকল দিন মিলে না—সমাজ-বাসীর  
এই এক অবস্থা; অপর দিকে মধ্য শ্রেণীর একটি  
বণিকের চিত্র। বিলাস বাসনের নিত্য নুতন ঘট,  
সন্ধ্যা-সকালে পারাবতের খেলা, চলিবার সময় আগে  
পাছে পাইক পেয়ালা, কিছুরই অভাব নাই। কবি  
বুঝিয়াছিলেন যে, সমাজে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকের  
সংখ্যা অধিক, ইহাদের অনস্থাই সমাজের প্রকৃত অবস্থা।  
ধনী লোক অতি অল্প, বিশেষতঃ ভগবান তাঁহাদের হৃদয়ে  
ভক্ত মহাত্মভূতি দেন নাই। ধনীর আনন্দধ্বনির মধ্যে  
দরিদ্রের দুঃখের উচ্ছ্বাস ডুবিয়া যায়, কেহ তৎপ্রতি  
শ্রুতিপাত করে না। তৎকালীন বঙ্গসমাজের ধনিগণ  
স্বার্থান্বেষী ও অত্যাচারপ্রিয় ছিলেন। তাঁহাদের উচ্ছ্বল  
বাসনা-প্রোতে কত দরিদ্রমুণ্ড বৃদ্ধচ্যুত হইয়াছে তাহার  
সংখ্যা নাই। বাহা হউক, আমরা অতঃপর সমাজের  
আচারব্যবহাগাদি বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

সেকালের লোক ডাইনি, ভূত, প্রেত প্রভৃতির  
দৃষ্টি হইতে সন্তানগণকে রক্ষা  
ডাইনি, ভূত, প্রেত করিবার জন্য ভূতুড়ে ওঝার আশ্রয়  
প্রভৃতির ভয় গ্রহণ করিত। শ্রীমন্দের জন্ম সময়  
ব্রাহ্মণী বেশে চণ্ডী খুল্লনাকে দেখা  
দেন। দেবীর জল পড়া পান করিলে পর শ্রীমন্ড প্রসূত  
হয়। খুল্লনা প্রসব-বেদনার কাতর হইয়া দেবীকে  
বলিতেছেন—

“রূপা করি ঠাকুরাণী      যে জান ঔষধ পানি  
খুল্লনার রাখহ জীবন।”

এই বর্ণনা হইতে বুঝা যায় সেকালের সমাজে ঝাড়া,  
জুঁকা প্রভৃতির প্রতি লোকের খুব বিশ্বাস ছিল। কাল-  
কেতুর জন্ম সময় নিদ্রা প্রসববেদনার কাতর হইয়া  
স্বামীকে বলিতেছেন—

খুঁজিয়া মগরে জানী      করহ ঔষধ পানি  
নিদ্রার রাখহ জীবন।

অভিমত্নিত জলপান করিলে প্রসবে বিলম্ব হইত না।  
বাহা হউক, সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে  
বিশ্বাসই যুক্তির      সঙ্গে সমাজে মেয়ে ডাক্তারের সংখ্যা  
জনক      বৃদ্ধি হইতেছে। ফলে, ওঝা  
মহাশয়গণ অন্তোপায় হইয়া  
বাবসান্তর গ্রহণ করিতেছেন। সেকালে কুলাজনাগণ  
জাতকের মঙ্গলকামনায় অনেকগুলি অনুষ্ঠান করিতেন।  
শ্রীমন্দের জন্মের পর পুরমহিলাগণ নিয়মিত সাবধানতা  
অবলম্বন করেন—

হরষিতে গুয়াদানী যায় দ্রুতপদ  
দুয়ারে বান্ধিল জাল বেত্র উপানদ ॥  
কাড়িয়া চালের খড় আলিল আউড়ি।  
ঘারেতে স্থাপিলা বগী, স্থাপিলা গোমুড়ি ॥

কালকেতুর জন্মের পরও সূতিকাগৃহঘারে গোমুণ্ড  
স্থাপিত হইয়াছিল। সন্তানের মঙ্গলকামনায় অপত্য-  
বৎসলা পুরমহিলাগণ বগী দেবীর  
পূজা করিতেন। শ্রীমন্ড ও কালকেতু  
উভয়েরই জন্মের একবিংশ দিবসে  
বগী পূজা হইয়াছিল। এই পূজার পুরোহিত আমাদের  
খুঁজি-পুথি-বারী পট্টবস্ত্র পরিহিত তট্টাচার্য্য মহাশয় নহেন।  
ভূতুড়ে ওঝা মহাশয়ই পুরোহিতের আসন অলঙ্কৃত  
করিতেন। বগী কে লৌকিক দেবতা ইহা হইতে তাহার  
অনুমান করা বাতুলতা নহে।

আনরূপ ব্যাধি সূত দিবসে দিবসে।  
বগী পূজা একুইশা কৈল এক বাসে ॥  
পূজা করি সোমাই ওঝা দিলা বর দান।  
দক্ষিণে বোড়াক দিল বায়ে চোলকান ॥

( বোড়াক ও চোলকান যুগ জাতার দুই শ্রেণীর  
সুত্রপ্রাণী )

মধ্যবিত্ত বণিক হইতে নিঃস্ব ব্যাধ পর্য্যন্ত সকলেই  
সন্তানের নামকরণ, কণ্ঠবেদাদি  
নামকরণ      ক্রিয়া সম্পাদন করিত। কালকেতু



ও শ্রীমন্ত উভয়ের বর্ষ মাসে নাম করা হইয়াছিল। এই সমস্ত ক্রিয়া পুরোহিত মহাশয় দ্বারা সম্পাদিত হইত।

কবিকল্পন চণ্ডীতে আমরা কালকেতু, ধনপতি সওদাগর ও শ্রীমন্ত এই তিন জনের তিনটি বিবাহ বিবাহ দেখিতে পাই। ইহা হইতে তৎকালীন দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও ধনী লোকের বিবাহের আচারব্যবহারাদি জানিতে পারি। অবস্থার তারতম্য অনুসারে ব্যয়ের তারতম্য ঘটিলেও প্রত্যেক বিবাহেই শাস্ত্রীয় বিধি ব্যবস্থা যথারীতি প্রতিপালিত হইয়াছিল। দরিদ্র কালকেতুর বিবাহে ব্যয়ব্যসনের উচ্ছৃঙ্খলতা নাই। ধনপতি সওদাগরের বিবাহে অধিবাসের রাজনিক ত্র্যেবর তালিকা দেখিলে মনে হয় বণিক জাতির অবস্থা ও ক্রটি উভয়ই উন্নত। রাজকুমারী স্মৃশীলার বিবাহে অধিবাসের ধুমধাম নাই। শ্রীমন্তের বিবাহে যৌতুকমাত্রা অধিক। নিম্ন বর্ণনায় তাহার আভাস আছে।

সিংহলরাজ রথ, ঘোড়া, গজ, দোলা কলধৈতি কণ্ঠমালা  
দিয়া জামাতার কৈল মান।

সে কালে বিবাহে জ্রীলোকগণ নানা প্রকার  
অনুষ্ঠান করিতেন। কালকেতুর  
বিবাহে জ্রী আচার বিবাহে জ্রী আচারের প্রাচুর্য্য নাই।

ব্যাধরমণীগণ বিবাহে মঙ্গল সঙ্গীত  
গাইয়াছিল। ধনপতির বিবাহে জ্রী আচার অত্যন্ত  
অধিক। প্রত্যেক অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য স্বামীকে জ্রীর বশীভূত  
করা। রুচা রমণীগণ স্বর্ণকালের জুতা বাধীনতা  
লাভ করিয়া বাসরঘরে তাহাদের জীড়াপুত্তলী বহ-  
রস্বতিকে বস যাতনা দেয়, তাহা ভুক্তভোগী পাঠক অবগত  
আছেন। এই জ্রী আচারে সকল সময় শীলতার মাত্রা  
স্বক্ষিত হইত না। কণিক বাধীনতার পরিণামে একরূপ  
উচ্ছৃঙ্খলতা অবশ্যতাবী। ষাণ্ডী ঠাকুরাণী জামাতা  
বাবাজিকে বীর হুহিতার বশীভূত করিবার অভিপ্রায়ে

বে সমস্ত অনুষ্ঠান করিতেন অবশ্য উহাতে শীলতার  
মাত্রা লজ্জিত হইত না। ধনপতির বিবাহে রজাবতীর  
বহ জ্রী আচার মধ্যে একটি উল্লেখ করা গেল।

আনিগ আয়োর স্ত্রী নাটাই সহিত।

সাতফের তেরাইলা করিয়া বেটিত।

সেই স্ত্রী বান্ধি রাখে ধূমনা অকলে।

গালি দিলে সাধু যেন মুখ নাহি তোলে।

শ্রীমন্তের বিবাহে কোন জ্রী আচারের উল্লেখ দেখা যায়  
না।

তারতবর্ষ ভাস্করাচাৰ্য্য, বরাহমিহির ও ধনা-শীলা-  
বতীর জন্মভূমি। এদেশে যে জ্যোতি-  
জ্যোতিষের বৈদ্য আদর থাকিবে তাহাতে নুতনত্ব  
আদর নাই। আমরা যে সময়ের আলোচনা  
করিতেছি সে সময়ও জ্যোতিষের  
আদর অত্যন্ত অধিক ছিল। ধনপতির বিবাহের  
দিননির্ণয় সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন—

এহ বিপ্র আনি ঘরে লগন বিচার করে  
জয়ধ্বনি বনিতা বদনে।

কামতিধি ত্রয়োদশী রোহিণী সহিত শশী  
শুভযোগ বর্ণিজ করণ।

লগনে আছেয়ে জীব তাহাতে পরম শিব  
সায় দেয় সেইত গগনে।

কালকেতুর বিবাহে কস্তার পিতা সঞ্জয়কেতু ভাল দিন  
দেখিয়া পরে কস্তাবিবাহে সম্মতি প্রদান করিয়াছিল।

ত্রয়োদশী রবিবার নকত্র রেবতী

বিবাহে সঞ্জয়কেতু দিলা অনুমতি।

পাঠক চিন্তা করিয়া দেখিবেন—যুগ্মা যুগ্মের কল্যাণে  
বর্তমান কালের ন্যায় ঘরে ঘরে পঞ্জিকার প্রচুর প্রচার না  
থাকিলেও সেকালে সামান্য কিরাত-গৃহে পর্য্যন্ত  
জ্যোতিষের কেমন প্রচার।

অল্পদিন পূর্বেও আমাদের দেশে বিবাহে  
কস্তাপক্ষীর লোকেরা বরকে হস্তগত করিয়া

বর ও কস্তার পক্ষের বরযাত্রীর অবস্থা প্রভৃৎ হইতে  
দাঙ্গা আত্মরক্ষা করিবার জন্য ষণ্ড-

বুদ্ধে প্ররক্ত হইতেন। কিন্তু সভ্যতা

বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত কুপ্রথা সমাজ হইতে দূর  
হইয়াছে। ধনপতি সওদাগরের বিবাহে বরযাত্রীদল যখন  
উজানী নগরী প্রবেশ করে তখন ধনপতি সওদাগরের  
পুত্র সদল বলে তাহাদের সম্মুখীন হইয়া বরকে হস্তগত  
করিতে চেষ্টা করেন। কবি সেই বর্ণনায় লিখিয়াছেন,

“তুই দলে মিলামিলা গলাগল চুলাচুল

বরযাত্রী দেউড়ি না ছাড়ে।

ধুলাতে ঢেলাতে বৃষ্টি মেলিতে না পারে বৃষ্টি—

তুই দলে খুনাখুনি পাড়ে ॥

এইকালে বাংলার নারী সমাজে একটা ঘণিত প্রথা

প্রচলিত ছিল। রমণীগণ পতি-

স্বামী বশীকরণ সোহাগিনী হইবার জন্য বীভৎস

প্রযুক্তির তাড়নায় নানাপ্রকার

বশীকরণের ঔষধ ব্যবহার করিতেন। ধনপতি সওদা-  
গরের বিবাহ-রাত্রিতেই খুলনার মঙ্গল কামনার রত্নাবতী  
নানাপ্রকার স্বামী-বশীকরণ ঔষধ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।  
রূপহীনা লহনা স্বামী-বশীকরণ জন্য লীলাবতী ব্রাহ্মণীর  
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বশীকরণবিজ্ঞানিণী লীলা-  
বতী লহনাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, আমার নিকট  
বশীকরণের ভাল ভাল ঔষধ আছে—

ঔষধের গুণে স্বামী বোল শুনে

যেন পিঞ্জরের গুয়া।

নিজা গেলে স্বামী চিবাইয়া আমি

মুখে তুলি দেই গুয়া ॥

ঔষধের বশে প্রকার বিশেষে

স্বামী ধুলা কাড়ে মুখে

গেলে পিতৃ বাস করে উপবাস

বাবত ঘোরে না দেখে ॥

চণ্ডীকাব্যে দেখা যায় নিরলিখিত জিনিসগুলি বিভিন্ন

প্রণালীতে ব্যবহার করিলে স্বামী

স্বামী বশীকরণের বশীভূত হয়। উল্লঙ্ঘন অবস্থার মুক্ত  
ঔষধ তালিকা কুন্তলে সংগৃহীত শ্রমশান অঙ্গার,

সাপের আঠুলী, অর্থের যোড়পত্র,

কালবিড়াল, গুণ্ডকের তৈল, শূকর ও শূকনের হাড়,  
নেটেলের মুণ্ড, শ্রমশানের তিল ফুল, বেত কাকের রক্ত,  
কুকুরের পিত্ত, কচ্ছপের নখ, কুস্তীরের দাঁত, গোবিকার  
আঁত, বাহুরের পাখা, সজ্জার কাঁটা, শব্দের মূখ, হৃদিকের  
মাথা, বাটা মহিষের নাকের দড়ী ইত্যাদি। এই সমস্ত  
জিনিস বিবিধ ঘণিত কৌশলে ব্যবহৃত হইত।

লহনা স্বামী বশ করার জন্য অনেক ঔষধ করিয়া-  
ছিল কিন্তু তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। গোড়-প্রত্যাগত  
সওদাগর খুলনার রূপ-গুণে তাহার বশীভূত হইয়া  
পড়েন। লহনা প্রতিবোগিতায় পরাস্ত হইয়া স্বীয় ভুল  
বুঝিলেন। লহনা আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—

যৌবন পরম ধন যৌবনে পতির মন

যৌবনের নিছনী ঔষধ।

যৌবন মোহন কাঁদ ঔষধ বালির বাঁধ

মুড়া ভাল যৌবন বিহনে ॥

“গুণ দ্বারা স্বামীকে বশ করিবে” এই সঙ্গপদেশ ফুলবুড়ি  
কোন্দল-প্রিয়া রমণীর নিকট “বান টোনা দ্বারা স্বামী  
বশ করিবে” এই অর্থ প্রসব করিল। ইহা আমাদের  
জাতীয় চরিত্রের বিশেষ কলঙ্ক। উড়িয়াগণ  
পর্ধ্যন্ত আমাদেরকে “সাধন তখন নাহি জানেন  
বান্ধালিনী জানে টোনা” এই বলিয়া উসহাস করে।  
সাপত্তা কলহ হইতে প্রেমের অনুরোধের এই সমস্ত  
বৈজ্ঞানিক ঔষধ আবিষ্কার হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।  
হৃদিনী খুলনাকে পতি-দেবতা বশ করিবার জন্য  
কখনও জৈব চেষ্টা করিতে দেখি নাই। সম্ভবতঃ দরিদ্র  
পরিবারে তখনও এই সমুদয় মূল্যবান ঔষধ প্রচারিত  
হয় নাই। মধ্যবিভের ঘরেই বাবতীর গোলযোগ।  
আমাদের কবিকল্পন বহানরের ঘরেও মূল্য প্রতীক্ষা

বিভ্রাণ ছিলেন। তিনি বশীকরণ ঔষধ প্রসঙ্গের শেষ ভাগে লিখিয়াছেন—

ঔষধ প্রসঙ্গে মুকুন্দ বিশারদ।

বুড়াকে না করে বশ মোহন ঔষধ ॥

এই স্বামী বশীকরণ চেষ্টা যে বর্তমান মহিলা সমাজে নাই, তাহা বলিতে পারি না। তবে উহা বোড়শ শতাব্দীর স্বামী বশীকরণের জ্ঞান বীভৎসতা পূর্ণ নহে। সে দিন [?] কপালকুণ্ডলা নন্দিনী শ্রামার জন্ত মধ্য রজনীতে আলুলায়িত কুন্তলে ঔষধ সংগ্রহ করিতে বাইরা নবকুমারের বিষদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিলেন।

সেকালে, বল সমাজে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল।

ধনপতি সওদাগরের দুই বিবাহ।

বহু বিবাহ ও পিতার সুপুত্র শ্রীমন্ত দুই বিবাহ  
সাপত্ন্য বিবাহ করিয়াছিলেন, অস্তুর কথা কি?

কবি মুকুন্দরাম স্বয়ং দুইটি বিবাহ করিয়াছিলেন তাঁহার লিখিত নিম্ন ভনিতা হইতে তাহা বুঝা যায়—

এক জন সহিলে কোন্দল হয় দূর।

বিশেষ জানেন তাহা চক্রবর্তী ঠাকুর ॥

বশীকরণ-বিজ্ঞানিণী লীলাবতী কুলীন-পত্নী। তাঁহার স্বামীর সাতটি বিবাহ।

লীলাবতী লহনাকে বলিতেছেন—

অল্প বয়স আমার প্রবেশ

ছয় সতীনের ঘরে।

এই বহু বিবাহের যুগে সংসার বড় অশান্তিপূর্ণ ছিল। দরিদ্রগণ বহুবিবাহের লক্ষ্যপাতী ছিল না। চণ্ডী কালকেতুকে প্রভাবিত করিবার জন্ত স্বীয় রূপ-ভাল বিস্তার করিলেও কালকেতু ব্যাধের চরিত্রে যে দেব-বাহিত নৈতিক বল দেখা গিয়াছিল ধনপতি সওদাগরের চরিত্রে তাহার কণিকামাত্রও ছিল না। পায়ারত জীড়ার সময় খুলনার একটি বিলোল চাহনিতে ধনপতি সওদাগরের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল।

নৈতিক চরিত্র দুর্বল হইলে স্বাস্থ্যের এমন অবস্থা পদে পদে সংঘটিত হয়। গোড়-প্রবাসী ধনপতির প্রতি চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ মধ্যে তাঁহার চরিত্রের দুর্বলতার চণ্ডী কটাক্ষপাত করিয়াছেন—

পরশ্বীতে লুকু হইয়া পাসরিলে নিজ জায়া

সুখে আছ গড়ুড় নগরে।

\* \* \* \* \*

পাশে দুই জায়া কান্দে কেশ পাশ নাহি বাসে

দেখিয়াছি আর সদাগর ॥

কুটনী দাসী বাংলার সোনার সংসারে আশান-বহি

জালিয়া দেয়। একরূপ এক দাসীর

কুটনী দাসী মন্ত্রণায় রাণী কৈকেয়ী অযোধ্যা-রাজ-

সংসারে বিষম বিবেচ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত

করিয়াছিলেন যখন সোনার অযোধ্যা আশানে পরিণত হইয়াছিল। সাপত্ন্য কলহ অবশ্যস্তাবী হইলেও প্রথম প্রথম খুলনা ও লহনার মধ্যে তাহা ছিল না। ইহার চরিত্র-গৌরবে ধনপতির গৃহে যুগল মণিদীপের জ্বল শোভা পাইতেছিল। এসময় অভাগিনী দুর্বলার দুর্বলি জন্মিল। সে মনে মনে ভাবিল—

যেই ঘরে হু' সতীনে না হয় কোন্দল।

সে ঘরে যে দাসী থাকে সে বড় পাগল ॥

একেরে করিয়া নিন্দা যাব অল্প স্থানে।

সে ধনী বাসিবে মোরে প্রাণের সমান ॥

কুটনী দাসীর মন্ত্রণায় সরলা খুলনাকে প্রাণান্ত দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছিল। কুন্তল-কোমলা পৌরাদী-খুলনার চৈত্র-রোজ-পরিমল মুখচ্ছবি দর্শন করিলে, সেই স্বভাব-সরলার উদ্দেশে চরিত্রহীন কৃষকের ভৎসনা প্রবণ করিলে, সেই লক্ষপতি-দুহিতা ধনপতি-বনিতার পরি-ধানে ছিন্ন মলিন বস্ত্র দর্শন করিলে, তাজের মেঘভরা আকাশতলে সিক্ত-বসনা খুলনার অবস্থা চিন্তা করিলে না কাঁদিয়া থাকিতে পারা যায় না। দুর্বলা দাসী খুলনার অদৃষ্ট আকাশে ধ্বংসে ভুল্য। অসুস্থতায়

করিলে বঙ্গ-পরিবারে আজও উৎসব বিষবরী দেখিতে পাইবেন।

সে কালের গ্রীলোকদের মধ্যে কেহ কেহ লেখাপড়া জানিতেন। লীলা-ঠাকুরাণী আল পত্র-গ্রীষ্মিকা খানার লেখিকা। লহনা ঐ পত্র খুলনার নিকট উপস্থিত করিল। তিনি বলিলেন—

“তুন দিদি সাধুর অক্ষর তিহু ডন্দ।

কেবা পাতি লিখে য়োরে করিয়া প্রবন্ধ।”

যিনি লিপি বিচার করিতে জানেন তিনি যে একটু ভাল লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন এই অনুমান অমূলক নহে।

আমরা যে সময়ের সামাজিক গ্রীলোকের স্বামীভক্তি অবস্থা আলোচনা করিতেছি সে ও সতীত্ব সময় বঙ্গনারী স্বামীর চিত্তার সহান্তে জীবনাহতি দিতেন।

কুলরা, খুলনা ইহার। বাঙ্গালীর গৃহলক্ষ্মী। বঙ্গনারী ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি। স্বামীর সুখবিধান-চেঁটা বঙ্গ-বহিলায় চির-সত্যাব। কালকেতু কলিঙ্গরাজের হস্তে বন্দী হইলে কুলরা কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়াছিলেন। খুলনা পতির সৎস্বামীত্বের ৩৩ প্রাণপণে সন্তুষ্ট। পুতচরিত্রা খুলনা সতীত্বের পরীক্ষা দিবার ৩৩ অনলে প্রবেশ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। হিতাধিপন খুলনাকে অগ্নি পরীক্ষা দিতে নিবেদন করিলে,

খুলনা বলেন যদি না বাই অনলে।

অতাপির কলঙ্ক রহিবে দুই কুলে।

হুংখের বিষয়, পরবর্তী কালে নারীগণের স্বামীভক্তি করিয়া গিয়াছিল। অরদ্যবঙ্গলে দাম্পত্যসুখবিক্রান্ত নারীগণ স্ব স্ব পতিবিন্দ্য করিতে কিছুমাত্র বিধা বোধ করেন নাই। কিন্তু কবিকঙ্কনচৌধুরী দেখা যার দাম্পত্য-সুখ-বিবর্তিতা কামিনীগণ একে অত্যন্তে প্রবোধ দিয়া বলিতেছেন—

যে হোক সে হোক নারীর স্বামী ত ভূষণ।

পতি সেবা কর লবে যেন নারায়ণ।

দুই এক জন রমণীকে পতির নিন্দা করিতে দেখা গিয়াছিল, কিন্তু তাহা পতির অথবা অত্যাচারের ফল। দশম-বর্জিত-বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা হুংখ করিয়া বলিতেছেন—

দড় ব্যজন আমি সই যেই দিন রাতি।

স্বামীরে পিড়ার বাড়ি কোনে বসি কান্দি।

অনর্থক উৎপীড়নে ভক্তি নষ্ট হইবে ইহা অসম্ভব নহে।

এই সময় বাঙ্গারের কড়ির প্রচলন ছিল। জিনিষপত্র মূল্যে বিক্রয় হইত। বস্ত্র, বাস,

বাঙ্গার দর দুই, দ্বিত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া বাইত। সে কালে পণ্যার্থীকে

শুভ্রহস্তে মলিনযুগে গৃহে প্রত্যাঘর্ষন করিতে হইত না। চরুকলার বেসাতির বৃহৎ ফন্দির একাংশে লিখিত আছে—

চতুরা সাধুরাদাসী আট কাহনেতে-ধাসী

তৈল সেব দরে দশ বুড়ি।

অত্যাচ না থাকিলে মানুষ স্বতঃই বিলাস-ব্যসনে লিপ্ত হইয়া পড়ে। সে কালের গৃহস্থগণ

পাশাকীড়া ষোড়শোপচারে আকর্ষণ ভোজন করিয়া বজ্রবাক্ষের সহিত পাশা খেলার

সময় কাটাইতেন। প্রকৃতির আহুত্রে ছেলে বলিয়াই বাঙ্গালীর এত অধঃপতন। পাশা খেলার প্রাচুর্যের

প্রমাণাভাব নাই। ধনপতি সওদাগরের বিবাহে পাশা খেলার সুখাম। গোড়-প্রত্যাগত ধনপতি

সওদাগর পাঠশালা গৃহে বসিয়া বজ্রগণের সহিত পাশা খেলিতেছিলেন, এমন সময় পুরোহিত ঠাকুর

তথায় গিয়া সওদাগরকে তাঁহার পিতৃস্নান অসমাপ্ত রহিয়াছে একথা স্বরণ করাইয়া দেন। সে কালে পুর-

বহিলাগণ পর্য্যন্ত সুযোগ পাইলে পাশা খেলার বৌগ দিতেন।

চরুকলতা বাহুবের মনে অনেক কুসংস্কার বহুল করিয়া দেন। আলোচ্য সময়

হাঁচি-টিকটিকির ভয় বঙ্গ সমাজে অনেক কুসংস্কার প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। কোন

কার্যে বিফল-মনোরথ হইলে দৈবের দোষাই দিতে বাঙ্গালী  
তির অভ্যস্ত। ইতি টিকিটের ভয়ে বাঙ্গালী অতির  
কেবল বাঙ্গালী কেন? বাঙ্গালীর দেবতাগণ পর্যন্ত  
উক্ত প্রকার ভয় হইতে মুক্ত নহেন। ইন্দুপুত্র নীলাধর  
শহর পূজার ফুল ভোলার তার পাটবার সময় টিকিটিক  
তাঁহার ভাবী অমঙ্গল নুচনা করিয়াছিল।

পান নিতে নীলাধর ঘোড় কৈল কর।

ডাকিল শকুনি তার মাথার উপর।

কোম্পা-রব নীলাধর তুলিল প্রবেশে।

দৈবদোষে তাহা না তুলিল অস্ত ভনে।

বুকে হস্ত দিয়া নিবেদয়ে নীলাধর।

বাধা পড়িল গোলাই মাথার উপর।

অভিশপ্তা রক্তমালা বিলাপ করিতেছেন—

কেমন দারুন বেলা আইছে তাওব শালা

ইতি জেসী না মানিয়া বাধ।

বিধাতা দড়িল যোরে কিরিয়া না গেছ ঘরে

জীবনে রহিল বড় সাধ।

ধনপতির সিংহল যাত্রার সময় কাক শুকনা ডালে  
বসিয়া ডাকিয়া তাঁহার ভাবী বিপদের নুচনা করিয়া-  
ছিল। সংসার রিষ্টে লড় বাঙ্গালী তাকমুখে পর্যন্ত  
বকীর জীবনের শুভাশুভ বার্তা। তনিয়া আনন্দে  
উৎফুল্ল ও ভয়ে ভীত হইতেন। কলিত কোতিবের  
প্রতি ঈর্ষ্য তাক্তি ধারা ভাষীর উন্নতির পথ অন্ধকার-  
ময় হইয়া পড়ে।

পূর্বকালে বাঙ্গালীগণ সাগর অভিক্রম করিয়া

বাণিজ্যার্থ সিংহল দ্বীপে পর্যন্ত

বাণিজ্য ও

গমন করিতেন। আমদানী রপ্তানী

সকল যাত্রা

উভয় প্রকারে বাণিজ্য চলিত।

ধনপতি সঙ্গার এ দেশের ভাল

ভাল জিনিষ সিংহল-বাঙ্গীর মিকট বিক্রয় করিতেন

এবং তাঁহার বিনিময়ে উদ্দেশ্যে পণ্যব্যাধি গ্রহণ  
করিতেন। ধনপতির মধুকর ডিলা বর্তমান বৈজ্ঞানিক  
যুগের বাণিজ্য জাহাজ হইতে নিকটে ছিল বলিয়া  
মনে হয় না। অধ্যবসায়ী ধনপতি পথে বহু কষ্ট পাইয়াও  
সিংহল-গমন সম্বল ত্যাগ করেন নাই।

সে কালে সকালে বৈকালে বড় লোকের চতীমণ্ডপে

কিংবা বৃক্ষতলার গুরুমহাশয় ছাত্রগণকে

শিক্ষা পাঠ দিতেন। আমাদের শ্রীমন্ত সওদাগর

উক্তদ্বিধ এক পাঠশালার ছাত্র। বর্তমান

কালের তার সেকালের পাঠশালার ইতিহাস জুগোলাদির

পাঠ হইত কি না সন্দেহ। প্রথমে বর্ণপরিচয় ও

অষ্টাদশবিধ কলা শিক্ষা দেওয়া হইত। অতঃপর নীতিশাস্ত্র,

দর্শনশাস্ত্র ও কাব্যাদি শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। উজানী

নব্বয়ের অশীতিপর বৃদ্ধ জনাধীন ঠাকুর গুরু মহাশয়ের

আগনে বসিয়া শ্রীমন্তকে এই সমস্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন।

মুকুন্দরামের চতী কাব্যে এমন কতগুলি শব্দ দেখা

যায় বাহা আমাদের বঙ্গ ভাষার

ভাষার মূলমানী আদিম সম্পত্তি নহে। উহার

প্রভাব বঙ্গভাষার রাজ্যে ঔপনিবেশিক

সম্রাট। বৃষ্টিও বরষা ডিহিয়ার,

চেড়ি, সরকার, আউরাল, দোয়া, নফর, গোদার,

ভেজাল, মজব, খামা, বাগুব, মুনসী, সেরানা, লফর,

সদাগর ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়।

কবিকল্পন মুকুন্দরামের চতীকাব্যের পশ্চাত্তাপে

খোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদের ইতিহাস আত্মগোপন

করিয়া আছে। আলোচনা করিলে কাব্যে কিরূপে

ইতিহাসের প্রভাব বিবৃত হয় তাহা বিশেষ রূপে বুঝিতে

পারিবেন।

ঐতিহাসিক দে।

## শূন্যপুরাণ

( ১৩২১ আশ্বিনের 'সাহিত্য' হইতে সংকলিত )

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্ভবে রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণের পুণ্ডিতন পুথি মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার সহিত একটি পবেষণাপূর্ণ ভূমিকা সংযুক্ত করিয়া প্রোফা-বিভাবহার্যব ঐযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বুঝাইয়াছেন—শূন্য-পুরাণোক্ত “ধর্ম পূজা” প্রাচীন বাঙ্গালার “বৌদ্ধ পূজা”। পশ্চিম বঙ্গে এখনও এই ধর্মপূজা প্রচলিত আছে।

এই সিদ্ধান্ত বঙ্গীয় মহাশয়ের কপোল-কল্পিত বলিয়া বোধ হয় না। অনেক দিন পূর্বে মহাশয়োপাধ্যায় পণ্ডিতবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইহার অবতারণা করেন; এবং তাঁহারই প্রাশংসনীয় উদ্ভবে পশ্চিম বঙ্গে “ধর্মপূজা” আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই সময় হইতে এই সিদ্ধান্তটি বহু গ্রন্থে ও প্রবন্ধে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়া, রামাই পণ্ডিতের নাম, ধর্মপূজার নাম, শূন্যপুরাণের নাম বাঙ্গালী স্মৃতিসমাজে সুপরিচিত করিয়া তুলিয়াছে।

শূন্যপুরাণ বাঙ্গালী ভাষায় রচিত পাঁচালী প্রবন্ধ। এক সময়ে মনসার ভাসানের জায় শূন্যপুরাণের পাঁচালীও বহু স্থানে বহুভাবে রচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে রামাই পণ্ডিতের পাঁচালী মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার প্রধান কথা “ধর্মপূজার” কথা, কিন্তু “ধর্মপূজা” কাহার পূজা, বঙ্গীয় মহাশয় বাধীন তাহা তাহার তথ্যসম্বন্ধানের প্রয়োজন বীকার করিতে পারেন না। কারণ, শাস্ত্রী মহাশয় পূর্বেই তাহার বীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। তথাপি কতকগুলি কারণে শাস্ত্রী মহাশয়ের বীমাংসাকে শেব বীমাংসা বলিয়া বীকার না করিয়া, এই প্রশ্ন পুনরায় উত্থাপিত করা বাইতে পারে। শূন্যপুরাণের ভূমিকার (১/০ পৃষ্ঠায়) বঙ্গীয় মহাশয় বাঙ্গালিদিগ রায়ের ধর্মপূজা পদ্ধতি হইতে পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া, প্রশ্নটির পুনরাবগমের অবসর দিয়া রাখিয়াছেন। সে পংক্তিটি এই—

“ধাং ধীং ধং বলি চরণে পড়িল।”

এই লোকের “ধাং-ধীং-ধং” অর্থহীন। বঙ্গীয় মহাশয় ইহার ব্যাখ্যা করেন নাই। ইহা অপপাঠ বলিয়াই প্রতিপাত হয়। প্রকৃত পাঠ

“ধাং ধীং ধুং”।

তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে, “ধর্মপূজা” কাহার পূজা, তাহার স্থান লাভ করা সম্ভব হইত। সে পথে অগ্রসর না হইয়া, বঙ্গীয় মহাশয় লিখিয়াছেন,—“স্মৃতিপুস্তকে একটি নিজস্ব আছে, তাহা ধর্মমঙ্গল ছাড়া আর কোথাও পাইতেছি না।—তাহা উলুক ও বঙ্গুকা নদী। রামাই পণ্ডিত এ দুটিকে কোথা ওইতে বাহির করিলেন, তাহা অনুসন্ধান।” লিখন ভঙ্গীতে বোধ হয় বঙ্গীয় মহাশয় যেন গ্রন্থ খুঁজিতে বাকী রাখেন নাই। সুতরাং তিনি যখন খুঁজিয়া পান নাই, তখন আর খুঁজিয়া পরিশ্রান্ত হইবার প্রয়োজন কি? যে কারণেই হউক, অনুসন্ধান কার্য এই পর্যন্ত শেষ হইয়া রহিয়াছে,—অগত্যা উলুক ও বঙ্গুকা নদী রামাই পণ্ডিতের নিজস্ব বলিয়াই পরিচিত হইয়াছে। “বঙ্গুকা নদী” এই পাঠটি প্রকৃত পাঠ কি না, তাহাতে কিছু সন্দেহ থাকিলেও, উলুক সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। তাহা শূন্যপুরাণে অনেক বার উল্লিখিত হইয়াছে। শূন্যপুরাণের বর্ণনা অনুসারে উলুকের সংখ্যা নিত্যই পক্ষে পাঁচ। বধা,—

“চৌক জুগ বই পরতু তুলিলেন হাই।

উর্ক নিখাসে জনমিলেন পক্ষ উলুকাট।”

উলুকের এইরূপ বিষয়কর উৎপত্তি বিবরণ শূন্যপুরাণের প্রকৃতি নির্ণয়ের পক্ষে অল্পকূল। প্রকৃত হাই হইতে উদ্ধৃত উলুক কে, তাহা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বে “প্রকৃত” কে, তাহা জিজ্ঞাসা করা স্বাভাবিক। বঙ্গীয় মহাশয় তাহার আলোচনা না করিয়া বুঝাইয়াছেন,—উলুক ধর্ম; তাহার পূজাই “ধর্মপূজা”। সুতরাং উলুক কে, তাহাই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিতে হয়।

শূন্যপুরাণে তাহার পরিচয় থাকিলেও, তাহা প্রকৃত। তবে তাহা সূত্রান্ত। বঙ্গীয় মহাশয় তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত

করেন নাট। তন্মধ্যে “ধর্মপূজার” কথা আছে; তন্মধ্যে উল্লিখিত নহে। তন্মধ্যে উল্লিখিত ধর্ম—তাঁহার নামান্তর নন্দী। তিনি মহাদেবের বাহন। তাঁহার পূজা “ধর্মপূজা” নামে পরিচিত;—তাহা শৈবতন্ত্রের অন্তর্গত। “লিঙ্গার্চন তন্ত্রে” এই “ধর্মপূজার” বিস্তৃত বিবরণ উল্লিখিত আছে। “ধর্মপূজার” মন্ত্রোচ্চার এইরূপ—

প্রথমঃ পূর্বমুখ্যাস্থা দাস্তং বীজং ততঃ প্রোক্ষ্যে।

বলবীজযুতং কৃথা চতুর্ভূতং ততঃ কুরু ॥

ধর্মশব্দং চতুর্ভূতং বহুভাষা ততঃ পরং।

এবা সপ্তাকরী বিভা চতুর্বর্ণকলপ্রদা ॥

প্রণব—ওঁ। দাস্ত-বীজ—ব্। বল-বীজ—ব্।

চতু—ং। চতুর্ভূত ধর্মশব্দ—ধর্ম্যায়। বহুভাষা—বাহা।

অতএব ধর্মপূজার সপ্তাকর মন্ত্র—ওঁ এং ধর্ম্যায় বাহা।

এই মন্ত্রে বীজ এং,—ইহার শক্তি বাহা। সুতরাং অজ্ঞানস মন্ত্র দীর্ঘতর সমাবৃত্ত এং জীং জং। শিব-লিঙ্গার্চনের পূর্বেই তাহার আধার দেবতা ধর্মের পূজা করিতে হইবে বলিয়া, লিঙ্গার্চন তন্ত্রে (২৫৭) উপদেশ আছে। যথা—

প্রথমঃ পরমেশানি ধর্মং সম্পূজা সমুত্তরং।

ততস্ত পরমেশানি পার্শ্বি লিঙ্গপূজনং ॥

এই পূজা যদি “বৌদ্ধপূজা” হয়, তবে শিবলিঙ্গপূজক যাত্রাই বৌদ্ধ। লিঙ্গার্চন তন্ত্র এরূপ মীমাংসার পক্ষ-সমর্থন করে না। পূর্ব পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ সকল বজ্রেই লিঙ্গার্চন তন্ত্র বর্তমান আছে। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি কর্তৃক তাহা পরীক্ষিত হইয়াছে। যথাকালে পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবার আশা আছে।

শূকপুরাণের শূকবাদ লিঙ্গার্চন তন্ত্রের দ্বিতীয় পটলের প্রথম শ্লোক হইতেই সূচিত হইয়াছে। প্রথম পটলে মহাদেব লিঙ্গার্চনের প্রয়োজন ও প্রশংসা বিজ্ঞাপিত করিলে, দ্বিতীয় পটলের প্রথম শ্লোকেই দেবী আপত্তি জুলিয়া বলিয়াছেন,—শিবের আবার পূজা কি? শিব শূকতপ,—শিব ইজিয়রহিত,—শিব ক্রিয়ানুত,—তাঁহার আবার পূজা কি?

ইজিয়রহিতো দেব শূকরূপঃ শিবঃ সদা,

শিবত্ব করণং নাস্তি কিং তত পূজনং ততঃ ॥

দেবীর এই প্রশ্নে সকল তন্ত্র প্রতিপাদ শূকবাহাই সূচিত হইয়াছে। শক্তিপূজ শিব শব্দরূপ—শূকরূপ। তাহার

পূজা চলিতে পারে না। প্রত্যুত্তরে মহাদেব তাহা মানিয়া লইয়া বলিয়াছেন,—

শক্তিং বন্য মহেশানি প্রোক্তং তত নিশ্চিতম্।

কিন্তু শিবশক্তি সমাধায়ে উত্তরের যে একতা অর্থে, তাহার জ্ঞানই জ্ঞান। শিবলিঙ্গে তাহা প্রাণ হওয়া যায় বলিয়া তাহার পূজা আবশ্যক। এই তব বুঝাইতে গিয়া, মহাদেব বলিয়াছেন,—শিবের সেই শক্তিরূপিনী কামিনী ব্রহ্ম,—তাহারই নামান্তর ধর্ম-নন্দি-উল্লিখিত। শক্তি নিজেই এই রহস্য মহেশ্বরকে জানাইয়া দিয়া বলিয়া-ছিলেন—

“ব্রহ্মরূপং সমাহার উল্লিখিতং মহেশ্বরং।”

শিবলিঙ্গার্চনের অঙ্গীকৃত উল্লিখিত পূজা বা ধর্মপূজা, জ্ঞানিক পূজা। দ্বিতীয় পটলে উল্লিখিত শব্দের ব্যাখ্যাত উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাতেও সেই কথা বুঝিতে পারা যায়। যথা,—

উকারক মহাদেবী লুকারং কামিনী প্রোভো।

লকারং পৃথিবী দেব বিজ্ঞং যং গুণসাগরং।

ককারক মহাদেব সদাত উগ্রোভো জনা।

তত্তত্তেজস্বিনী যা তু পৃথীধারণ কারণং।

অতএব মহেশান্ নারা উল্লিখিত যোগদ্বক ॥

লিঙ্গার্চন তন্ত্রের তৃতীয় পটলে উল্লিখিত পূজার বা ধর্ম পূজার বিস্তৃত বিবরণ উল্লিখিত আছে। তন্মধ্যে ধ্যান এইরূপে উল্লিখিত,—

ধ্যানং শূণু বরারোহে। সাক্ষাদনন্দরূপিণং।

কোটিচন্দ্রপ্রভাকারং শ্বেতসিংহাসনস্থিতম্।

চতুর্ভূজং মহাবাহুং পদ্মেন্দ্রং মনোহরং।

আজ্ঞাঙ্কলম্বিনীমালা-লুদার পরিশোভিতম্।

গদাতরঙ্গ-কপূর-গুণাধর-বভ্রুভিতম্।

হস্তবদ্ধং কটাকং তু ভুবনত্রয়মোহনং।

উল্লিখিত তাবদেব সাক্ষাদর্শ স্বরূপিণং ॥

ইহার সহিত শূন্যপুরাণের “দ্বন্দ্ব-বুদ্ধি”র এবং “দ্বন্দ্ব-সিংহাসনের” সামঞ্জস্য আছে। সুতরাং শূন্যপুরাণোক্ত “ধর্মপূজাকে” প্রাচীন বাঙ্গালার “বৌদ্ধপূজা” বনে করিয়া, এই সিদ্ধান্তকে একটি নবাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রচার করা চলে কি না, তাহাতে বভ্রুভিতম্। সংশয় উপস্থিত হয়।

শ্রীমতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।

## ভাটিয়াল গান ।

( ১ )

গাভু গাম্‌ছা তৈলের বাটী রে,  
তৈলের বাটী রে সাথে ।

মান করিতে এলেম একা,  
পদ্মা নদী যাটে ॥  
আমি কি করি ? (১)

আগে যদি ভানিগো আমি,  
মাধব রাজা গো যাটে ।  
আগে পাছে দাসী লইয়া  
চলুতম স্নানের যাটে ॥  
আমি কি করি ? (২)

এক ডুব ছুইয় ডুবরে  
তিন ডুবের গো কালে ।  
কোথা খেইকা মাধব রাজা  
কেশে ধইরা তোলে ॥  
আমি কি করি ? (৩)

বাটখুট মাধব রাজা গো  
মুখে চম্পা গো দাড়ী ।  
কমলার কেশে ধইরা

নদী দিল পাড়ী ॥  
আমি কি করি ? (৪)

জাল বাঁধি জালুয়া ভাইরে,  
জালের কোনারে ব্যাকা ।  
তোমার জালেনি উইঠাছেয়ে,  
নারীর হাতের মাথা ।  
আমি কি করি ? (৫)

হাল বাও হালুয়া ভাইরে,  
হাতের সোনার রে লড়ী ।  
এইপথে নি দেখ্‌ছ বাইতে  
আমার কমলা সুনন্দী ॥  
আমি কি করি ? (৬)

আগের নার কাযুর কুমুর রে  
পাছের নার রে বাড়ি ।  
বীরে স্নেহে বাইও নৌকা,  
আমি পতির কান্দন শুনি ॥  
আমি কি করি ? (৭)

কেন্দো না কেন্দো না পতি রে,  
আমার মারা রে ছার ।  
বাল্ল ভইরা খুইছি টাকা  
আরেক বিয়া কর ॥  
আমি কি করি ? (৮)

আম ধরে ধোবা ধোবা রে  
ভেড়ুল রে ব্যাকা ।  
আপন পতি বৈদেশ হইল,  
আর না হইল দেখা ॥  
আমি কি করি ? (৯)

[খেইকা—হইতে । বাটখুট—বৈটে । জালুয়া—জালে ।  
হালুয়া—চাবী । লড়ী—ছড়ি, পাচনী । নার—নৌকার ।  
বীরেন্দ্ৰ—আন্তে ২ । বাইও—বাহিও । ছার—পরি-  
ত্যাগ কর । বৈদেশ—বিদেশী, পর ।]

স্বামীপদপ্রাপ্তবিচ্যুতা অপহৃত্য সরলা অবলা রমণীর  
কি স্বর্ণলপনী করুণ বিলাপ ।

(১) রমণী পদ্মানদীতে একাকী স্বামি কহিতে আসি-



রাছে; সঙ্গে স্নানের উপকরণ, গামছা, তৈলের বাটী, এবং প্রত্যাবর্তন কালীন জল নিবার উদ্দেশ্যে হয়ত গাড়ু।

(২) 'আগে পাছে দাসী, কথার বুঝা যায় রমণী ধনার গৃহিণী। একা আসিয়া যে নেহায়েৎ অববেচনার কাজ করিয়াছে, তাহার জন্ত এখন সে অনুতপ্ত। মাখম রাজা নাকি মগ জাতীয়।

(৩) কখন, কি ভাবে, কে তাহাকে হরণ করিল তাহার সুস্পষ্ট বিলাপোক্তি।

(৪) এখনও রমণীর আশার আলো নিভে নাই; হয়ত স্বামী সামান্য স্ত্রী অবলম্বন করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে পারে তাই অপহারকের সঠিক স্বরূপ বর্ণনা করতঃ নাম সহ কি ভাবে কোন্ পথে গেল তাহা নির্দেশ করিল।

(৫) এদিকে রমণীর গৃহে প্রত্যাগমনের সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেলে তাহাকে খোঁজ করা স্বাভাবিক। ঘাটে তৈলের বাটী, গাড়ু, প্রস্তুত পড়িয়া রহিয়াছিল। নিশ্চয়; তদুপে স্বামীর চিত্তবিভ্রম ঘটা অনিবার্য। তাই হতাশ প্রেমিক সম্মুখে বাহা পায় তাহাই আকুড়াইয়া ধড়ে। প্রতিকূল অনুরূপ চিন্তালোড়িত হতাশ চিত্তে হয়ত মনে হইল, না জানি স্বীকে কুমীরে নিয়াছে। তাই ভ্লে-দ্বিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া চলিল।

(৬) আবার হয়ত মনে হইল, না কুমীরে নাও বা মিটে পারে, তাই নদীতীরবর্তী চাষীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল।

(৭) চলতি নৌকার দাঁড়ের ঝগ ঝগ শব্দ হইতেছে। আর গানবাদ্যও নৌকার চলিতেছে; এমন সময় হয়ত স্বামী খোজ করিতে করিতে বাইরা মাখম রাজার নৌকার নিকটবর্তী হইয়াছে। এত শব্দের ভিতর দিয়াও স্বামীর বিলাপ উৎকণ্ঠিতর প্রবণোন্মুখ কর্ণকূহরে প্রবেশ করিতেছে। রমণী দেখিল, আর বিলনের সভাবনা নাই। হয়ত পতির রোমন্থনই তাহাকে কতক আশঙ্ক করিতেছে।

(৮) যখন দেখিল উদ্ধারের আশা সূর্য পরাহত, তখন সাধ্বী বুক বাধিয়া স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া সাধনা ছলে বাস্তবিত্ত চাঁকা দ্বারা পুনঃ দ্বার পরিগ্রহ করতঃ সংসারযাত্রা নির্বাহার্থ উপদেশ দিতেছে।

(৯) তারপর আশার ক্ষীণরশ্মি একেবারে নিবিয়া গেল। আহা, সাধ্বীর কি মর্ষস্তদ তপ্তহাস!

"আপন পতি বৈদেশ হইল

আর না হইল দেখা।

আমি কি করি?"

রজনী ভোর হয় হয়, এমন সময়ে যখন বিহগ কুল থাকিয়া থাকিয়া ডাকিয়া রজনীঃ নিস্তরুতা ভঙ্গ করিয়া দেয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে শুষুপ্ততম মানবমণ্ডলীর তদ্বাখ্যের শিথিল করিয়া ফেলে, এমন সময়ে বিবাহাঙ্গি উতকণ্ঠোপলক্ষে জল আনিতে যাত্রা করিয়া সম্মিলিত রমণীস্বন্দ যখন হঠাৎ বামাকণ্ঠে গাহিয়া উঠে, তখন সেই করুণ সঙ্গীতধ্বনি পবনহিল্লোলে দুলিতে দুলিতে হৃদয়তন্ত্রীতে এধনি করিয়া আঘাত করে যে, তাহা বর্ণনাতীত। প্রকৃত চিত্রটী যেন মানসপটে সম্যক প্রতিফলিত হইয়া পড়ে। গায়িকারা চলিয়া যায়, আবার গায়িতে গায়িতে ফিরিয়া আসে—প্রথমে, আশা ও নৈরাশ্রের তুল্য সংঘর্ষ, তৎপরে কেবলই বুকভরা হা-হতাশ।

( ২ )

মন আমার, নিশা ধোর।

হরিনাম কৃষ্ণনামে রে,

হয় না কেন তোর নিশি ভোর ?

(ওরে) ভালের নিশা, গা... তি...

কোন্ নিশা তোর রে "যল বুড়ি"

(ওরে) যখন নিশার পরধ হ'বে রে,

একেবারে দিশাহারা হবে তোর।

(অ তুমি) দিনে কর তাণ্ডা বাজি রে,

বারে ঐ মাম জগ না ভোর।

( ৯ ভূই ) কখন লইবি শ্রীগুরুর নাম রে,

একটুক অবসর দেখি না তোরে ।

শুনে, মনে মইজে তোরে,

করছে রে বাজী তোরে ।

( ৯ ভূই ) আপন ধরে কুড়াল মেয়ে রে,

শেষে আমারে বানালি চোর ॥

ভাণ্ডাবাজী—বৈবয়িক কার্যে নানারূপ চেষ্টা ।

বাজীভোর—বিভোর, বেহঁস ।

বানালি চোর—চোর রূপে পরিগণিত করিল ।

হৃদয় ! তুমি প্রতিনিয়ত ভগবানের নামে মত্ত থাক না কেন ? তুমি কামিনীকাকনের মোহে মজিয়া গুরুদত্ত নাম স্মরণ করিতে একটুকুও অবসর পাও না । বৈবয়িক কর্মে ও মায়ামোহাদিতে তুমি দিবারাজি বিভোর রহিয়াছ এবং পরকালের পথে কণ্টক রোপণ করিয়া আমাকে উহার নান্দমস্তুর ভাগী করিতেছ ।

( ৩ )

কোথা ছিলো ওহে গৌর—

(তোমার) চিন্তে পারি না ।

তুমি যে ভাবেতে ব্রজে ছিলে

তোমার সে ভাব দেখি না ॥

ছিলো হে রাখালের সখা,

অনেক দিনের পরে দেখা,

দুখনয় ঝাঁকা,

তোমার চিহ্ন আছে নয়ন দুটী,

তোমার ভুলতে পারি না ॥

শিরে নাই মোহন চূড়া,

গলে নাই বনফুলের মালা,

করে নাই বাণী,

তুমি কটিতে কৌপীন পরিলা,

তোমার ভজী বুঝি না ॥

তুমি ছিলো মূল বিবাদী,

রাই হইল দরখাতের বাদী,

এই মোকদ্দমা,

আমি গরমিয়াদী হইয়া থাকি

রাইয়ের প্রেমে ও জেলখানা ॥

কোথা ছিলো ওহে গৌর

চিন্তে পারি না ॥

ভগবৎ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজের ভাবে দেখিতে চায় । তাই গৌরাক্ষকে দেখিয়া বালভেছে তোমার ব্রজের সেই সখ্যভাব কই ? সেই চূড়া বাণী ও বনফুলের মালা কই ? তুমি যে কৌপীন পরিধান করিয়াছ, ইহা তোমার আবার কিরূপ ভাব ? তুমি যে বেশই ধারণ কর না কেন, ঐ যে তোমারে বাক্য নয়ন দুটীই তোমার চিহ্ন । এসো প্রভো, তোমার সেই যুগল রূপে প্রতিনিয়ত আমার এ হৃদয়মন্দিরে বিরাজ কর ।

( ৪ )

ত্রিভঙ্গ বস্ত্রমরূপ, কই, বিশাখা,

আনু গো তারে ।

অহরহ প্রাণ কেমন করে,

তুষের অনলে মত দহে অন্তরে,

আমার জলে গেলে দ্বিগুণ জলে,

কি দিলে নিবাব তারে ?

অস্ত্র দিবস অবশেষ কালে,

আচম্বিতে শ্রামের বাণী

জয় রাধে বলে,

আমি রব শুনিয়ে চমকে উঠলাম,

গেলাম না কুটিলার ডরে ।

মইজাছি এ তিন রসে,

তিন ভাবে তিন দিগে টানে

পাইনা গো দিশে,

আমি স্থির হইয়ে রব কিসে,

দিশা পাই না কই তোমারে ॥

(আমি) কইতে নারি সইতে গো নারি,

বোবার স্বপনের মত

শুঝি গো নারি,

আমার এ বৌবন বার বিকলে,

বুক ফেটে বার তারি গো তরে ॥

কুকপ্রেমপাগলিনী রাধা কুকবিরহে ব্যাকুলা হইয়া  
কুকসন্দর্শনের ঐকান্তিকী আকাজক। জানাইয়া প্রিয়সখী  
বিশাখার নিকট ছবরের তীব্রজালা প্রকাশ করিতেছে।  
একদিকে প্রাণের কেমন আকুল তিয়াসা আবার অপর-  
দিকে লাঞ্ছনাগজনাশয়।

( ৫ )

চলগুরু, দুজন বাই পায়ে

আমার একা যেতে ভয় করে ॥

পার যাটেতে মালা ছয় জনা,

সদী বিনে তারা আমার

পার ক'রে দেয় না,

মারি বলে দেই পার করে,

মারার যে নিবেধ করে ॥

আমার দেহ ছিল যে অশানের সমান,

গুরু তুমি মন্ত্র দিয়ে কর'লা ফুল বাগান,

আমার সে বাগানে ফুল ফুটেছে,

গোসাই অধরচাঁদ বিরাজ করে ॥

বড় রিপূর আবর্তনে পড়িয়া মন বিপথগামী হইতেছে  
তাই বলি, ওহে গুরু তুমি আলিয়া আমার সহায়  
হও। আমার এই অশানসমূহ অমৃতের দেহে তুমিই বীজ  
বপন করিয়া বাগান সাজাইয়াছ, এবং সেই বাগানে এখন  
ফুল ফুটিয়াছে ও তোমার বাসস্থানোপযোগী হইয়াছে।

( ৬ )

জাউলার মাথার জালের বোকা গো,

আমার মাথার গো ডালি।

কেমনে বাইব আমি গো,

হলক জাউলার বাড়ী ?

আমার নসিবে ছিল।

বাইটকামারি হলক জাউলা রে,

বোয়ালমারি রে নাও।

তোমারি দেইবাছ রে আমার

হলক জাউলার নাও ॥

আমার নসিবে ছিল।

সাত ভাইএর বইন্ আমি রে

পরম। হুন্দরী।

বড় বউয়ে দিল ডালি রে আমার

জামুরা ভাতারী ॥

আমার নসিবে ছিল।

ফুল তুলিতে গেলাম আমি গো

ফুল বাগিচার মাঝে।

সেখানে টলিল নসিব রে

হলক জাউলার সাথে ॥

আমার নসিবে ছিল।

বাইটকা মারি—বাইটকা (খল্লা) মৎস্ত যে ধরে।  
বোয়াল মারি রে নাও—বোয়াল ধরিবার নৌকা বিশেষ।  
বাইন্—ভগ্ন। ডালি রে—জলাঞ্জলী।

রমণী সাত ভাইয়ের বোন্, তার পরম হুন্দরী। গ্রহের  
ফেরে হলক জেলের প্রেমে মজিল; তারপর বড়বোঁয়ের  
চক্রান্তে ভ্রাতৃগৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া এখন অল্পভগ্ন  
চিত্তে হলক জেলের সন্ধানে ফিরিতেছে আর অদৃষ্টকে  
ধিকার দিতেছে।

( ক্রমশঃ )

শ্রীগোপীনাথ দত্ত।

\* বাইটকামারি ও বোয়ালমারি করিমপুর জেলার  
হুইটি স্থানের নামও আছে বলিয়া গোপীনাথ বাবুর  
প্রদত্ত এই হুইটী অর্থ সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। এই  
হুইটি শব্দে কি বোঝাইতেছে তাহা নিয়ে আরও অল্পসন্ধানের  
অবসর ও আবশ্যকতা আছে বলিয়া বোধ হয়।—প্র, স।

১৬৪। যদি থাকে বজুর মন  
গাও্ সাতারতে কত কণ।

১৬৫। কুইড়ারে উড়া বাছ,  
মইলেও না এক গাছ।  
উড়া—তুচ্ছ আগাছা।  
মইলে—মরিলে।

১৬৬। দেখে দেইখা ছোট,  
বাইরে করুছে খাট।  
বাইরে—বাহুরোপে।

১৬৭। ছেলে নষ্ট চাটে—  
বউ নষ্ট খাটে।

১৬৮। ঘোরে কিরে আওয়ারীল্যা  
তার নাম দাওয়ারীল্যা।

১৬৯। হরিণ ও বল  
পটল ও তোল।

১৭০। কি জন্ম কীলে,  
বউ জন্ম শীলে।  
শীলে—বাটনাবাটার।

১৭১। যারে দেখতে নারি,  
তার চলন ব্যাক।

১৭২। আয় কি হলো?  
বেল তলা বার।

১৭৩। আর রাজ্যে বায়ুন নাই  
কানী ঠাকুর চিড়া খাও।

১৭৪। কামে হর ভোজনে কারী,  
ভায় বাস ঠাকুর বাড়ী।

১৭৫। কামে হর ভোজনে কারী,  
তার নাম অধিকারী।  
কারী—গ্রহুর পরিচাপ।

১৭৬। ভালা পা খায়ে পড়ে।

১৭৭। কিসের মধ্যে কি,  
পাকড়াতে বি।

১৭৮। যদি পড়ে প্রেমের দার,  
দাউনা মগির চাবা বার।  
দাউনা—দক্ষরোগবিশিষ্ট।  
চাবা—চর্খিত পাম।

১৭৯। সাত দিনের বাসী বার,  
সাজ দেইখা উকাল বার।  
উকাল-বার—বহনোত্রেক হর।  
সাজ—টাক।

১৮০। টাকা, টাকা, টাকা,  
গোপাল হইল গোপলা জোঠা,  
মঙলা হইল কাকা।  
হার রে! আবার টাকা।\*

\* গোপাল ও মঙ্গল নামে দুই ভাই ছিল। গোপাল  
চিরদিনই পরিশ্রমী, আর মঙ্গল নেহাত কুড়ে—কেবলই  
মুড়িয়া খেলিয়া কাল কাটাইত। উত্তর ভ্রাতৃ পৃথক  
হইয়া গেলে পরিশ্রম ও নিত্যব্যয়িতা বারা গোপাল নিজের  
অবস্থা বড়ই বদল করিয়া তুলিল—গ্রামে তাহার নাম  
ডাক পড়িল, গ্রামের ছেলেরাও তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও  
ভয়ের চক্ষে দেখিত, কিন্তু নিঃস্ব মঙ্গলকে কেহই বড় লক্ষ্য  
করিত না—তাহাকে দেখিলে ছেলেরাও ‘ঐ মঙলা’ বার  
বলিয়া পরস্পর আলাপন করিয়া আশোদ পাইত। ঘটনা-  
চক্রে উখান-পতনের নিরবাসারে গোপালের অবস্থা  
খারাপ হইয়া পড়িল, পক্ষান্তরে মঙ্গলের সাম্প্রতিক অবস্থার  
ক্রমোন্নতি হইল। একদিন গোপাল ছেলেরের কাছ দিয়া  
বাইতেছে, তখন জনৈক বালক বলিয়া উঠিল ‘ওরে, ঐ  
দেখ গোপলা জোঠা বার।’ এমন সময়ে ঐ পথ দিয়াই  
মঙ্গলও আনিতেছিল, তখন ছেলেরা তাহাকে দেখিতে  
পাইয়া আকস্মিক বোঁড়িয়া গিয়া—‘কাকা মশার, কোথা-  
হ’তে আনিলেন’ বালরা তাহাকে সম্মান দেখাইল। এই  
ঘটনাত্তে গোপাল বড়ই বর্ধাবত হইয়া আক্ষেপে উচ্চ  
শোক আশ্রয় করিয়াছিল।

- ১৮১। নঠা কাঠালের আঠা বেশী।  
 ১৮২। নিষ্ঠুর্য্য নাইনবের  
 ভিন গুণ্যা জালা।  
 ১৮৩। \* নাই চাম,  
 রাধাকৃষ্ণ নাম।  
 ১৮৪। আউড়া নগে  
 মুন্সইয়ের মুগৈয়।  
 ১৮৫। কালা পোলায় মাখ  
 গঙ্গলোচন।  
 ১৮৬। অতি বড় সুবতীর নাহি মিলে বর,  
 অতি বড় গুণবতীর নাহি মিলে বর।  
 ১৮৭। যার কি তার জামাই  
 পাড়াপরসীর কাম কামাই।  
 ১৮৮। আপনা শাশুরী সেলাম পার না,  
 নানী শাশুরী পিড়া ব্যার।  
 ১৮৯। কাচারী বা কই  
 কান মলে বা কই।  
 ১৯০। দিন ব্যয় এ্যামে ভ্যাগে,  
 রাইত ব্যয় কোদাল কামে।  
 ১৯১। আগে ব্যয় না রাগে ব্যাগে,  
 শেষে ব্যয় সবার আগে।  
 ১৯২। দিনে থাকে রাঢ়ে বসে,  
 রাইতে আসে কিবা বসে।  
 রাইতে—রাজিতে।  
 ১৯৩। অসতীর বড় গলা,  
 শুভতে কান কালাপালা।  
 ১৯৪। এক নানী শাশুরী কর  
 আরেক নানি শাশুরী  
 সমান হইয়া বর।  
 ১৯৫। এক ব্যয় পাইলে,  
 ব্যয় ব্যয় পরবে।  
 ১৯৬। আগে গেলে বাঘে ব্যয়,  
 শেষে গেলে পোনার পার।  
 ১৯৭। মাছের নিষ্ঠা পোয়া,  
 ইষ্টের নিষ্ঠা যোয়া।  
 নিষ্ঠা—নিরুষ্ঠ।  
 ইষ্টের—আত্মায়ের।  
 যোয়া—মোয়া।  
 ১৯৮। ছাল নাই কুস্তার  
 বাঘা নাম।  
 ১৯৯। জ্বরেতে ডড়াই না,  
 কাপানিরেই ডড়।  
 ২০০। যাবিন হয় তরতে,  
 গাছে ওঠে মরতে।  
 ২০১। কস্তার ইচ্ছায় কীর্তন।  
 নাড়াবনে গৈয়।  
 গৈয়-গড়াগড়ি  
 ২০২। জোবার নাইয়া,  
 বেজোবার মরে বাইয়া।  
 জোবার—সুবিধামতে।  
 নাইয়া—নোকাতালক।  
 বাইয়া—বাইয়া।  
 ২০৩। পাইছৎ একটা ছুতা,  
 ভাতারে মারছে শুতা।  
 ছুতা—অজুহাত।  
 ২০৪। পেটে নাই গাদি,  
 ভাতে পড়ে লাডি।  
 গাদি—বারগা।  
 লাডি—আগুনলা বা ইষ্টের বিটা।  
 ২০৫। ধরি বাছ, না ছুই পানি।  
 ২০৬। আবি যে ভাবিরে তাই,  
 তুনি বাধবা কার নায়।  
 নায়—কোঁকায়।

- ২০৭। জপতপ ভাইরে।  
বোঝা যাবার কালে।
- ২০৮। জাত কাকের ছাও,  
বাসায় করে রাও।  
ছাও—বাছা।  
রাও—রব।
- ২০৯। ফোটা করে ফাটি করে  
ঘেটি করে কাইৎ।  
দিনে করে সাধুগিরি  
চুরি করে রাইৎ।  
ঘেটি—ঘাড়।  
কাইৎ—হেলান।  
রাইৎ—রাত্রিতে।
- ২১০। রাত্রিতে সয়,  
বাড়িতে সয় না।
- ২১১। জন্ম গেল কর্ম কর্তে।  
ছই আট্ট গেল সেলাষ কর্তে।  
আট্ট—হাঁট্ট।
- ২১২। নসিবেয় এমনি খেলা,  
বারে কই ভাই, সে কম শালা।
- ২১৩। গৃহস্থে কম দোয়াশীলা,  
পাড়া পড়নী কম বছর বিয়ানা।  
দোয়াশীলা—ছইবৎসর অল্প  
যে গাভী বিয়ান।
- ২১৪। ছই নায় ছই পাও।  
\* \* \* এই বাও।
- ২১৫। ছই নায় পাও দিলে,  
ঝপ কইরা পড়বা জলে।
- ২১৬। বনের বত খুটী নাটী  
এরই নাম ছুটি বটী।
- ২১৭। ধান খাটতে বাড় সয়,  
চুল বাধতে হান।  
ধানখাটনী আর চুল বাধে না।
- ২১৮। শাখার কন্ কন্,  
টাকার কন্ কন্,  
লেখাপড়া ঠনঠন,  
২১৯। কালা জগতের আলা,  
ধলা ধুতুরা ফুল,  
তারে না খোঁও পাণ্ডের কুল।  
না—নিয়া।
- ২২০। খাইতে দাইতে খলবল,  
দিন দিন যায় \* \* তল।
- ২২১। যার পোলায় যত পায়,  
তার পোলায় তত চায়।
- ২২২। খাইতে খাইতে গলা বলে,  
হাটতে হাটতে নালা বলে।  
বলে—রুজিপাশ্ত হয়।
- ২২৩। এত টাকাই ঋণ,  
আর এক পরসার থি কিন।  
কিন—ক্রয় কর।
- ২২৪। যদি পড়ে সময়ের ফের,  
ওল্টা হয় ছুতি আধসের।
- ২২৫। যার গলায় বা সে বলে বাচম।  
যার হাটুতে বা সে বলে মরুম।
- ২২৬। পীরিতের পেত্নী।
- ২২৭। পরের পুত্রে পুত্রবতী,  
লোকে বলে ভাগ্যবতী।
- ২২৮। অদেঠের কিল  
পুতেও কিলার।  
অদেঠ—অদুঠ।  
পুতে—পুত্র।
- ২২৯। খাড়ে নাই লম,  
পুথি পড়নের সম।
- ২৩০। নাক নাই বাগী  
বেসর পড়ে।
- ২৩১। ঘোটে নাই বাজা,  
ভাইতে পড়েন পাছা।

- ২০২। বস কর,  
তত নয়।
- ২০৩। আপনা তাপের আকাল নাই,  
আবার পরশাব।  
আকাল—অন্ত
- ২০৪। বাজার পোয় কি  
সাধেই আছাড় খায় ?
- ২০৫। সাধ করে ত লক্ষ্মীন্দরই বিয়াই,  
কেবল \* \* \* শুল দেয় না।
- ২০৬। পীরিত কর কুরীত কর  
কেবল মনঃকষ্ট।  
বোন্দা কর হৈয়া কর  
কেবল টাকার নষ্ট।  
বোন্দা—বজ্রত।  
হৈয়া—সই।
- ২০৭। সাজাইলে গোলাইলে  
বান্দীর পোলাও রাজা সাজে।
- ২০৮। আগে দেয় না একটু ছুধ,  
শেষে দেয় গাই বাছুর।
- ২০৯। খোলার খোলাও গেল,  
লোটের খোলাও গেল।
- ২১০। বস দেখে কালা কালা  
সবই বেন বাপের শালা।
- ২১১। এক জোরারে কি  
জার যায়।
- ২১২। করেদির আবার  
ব্যস্তাখানা।
- ২১৩। বাঘ বুড়া হইলেও  
খাপ চুলে না।
- ২১৪। যে রাড়ের আছে মা,  
তারে ডাক্তে হয় মা।
- ২১৫। আপনা দোষের আকাল নাই,  
পরের দোষে খুরি।
- ২১৬। কান কাটা বিড়াল।
- ২১৭। ঘর থাক্তে  
বাবুই ভিজে।
- ২১৮। খুটার জোড়ে  
ঘেরা কৌদে।
- ২১৯। নাস্তের খোল চুলা বুদ্ধি।
- ২২০। কানা,  
মনে মনেই জানা।
- ২২১। সে গাধার সে জল খায়,  
আগে আউল্যার।  
আউল্যার—আলোড়ন করে।
- ২২২। কর্তার পাদে গন্ধ নাই।
- ২২৩। রাজার খায় কি ? দি,  
দি না থাকলে।—আতুলই চাটে।
- ২২৪। পেটে পেটে বুদ্ধি।
- ২২৫। আগে কয় রাধা কৃষ্ণ,  
বিড়ালে ধরলে ট্যাও ট্যাও।
- ২২৬। লোক যেন পোক।
- ২২৭। সাধ কইরা কানা সাজা,  
আর সাধা লক্ষী পায় তৈলা।
- ২২৮। কি খাইতে কি নাই,  
বেহুন খাইতে কাল নাই।  
বেহুন—ব্যগ্নন।
- ২২৯। বুলবুলি লো সই,  
পরন কথা কই।  
আজ খাইলা আমার বাড়ী,  
কাইল খাইবা কই ?
- ২৩০। রামাধোপা শ্রীমা ধোপা,  
সকল বেটারই এক চোপা।
- ২৩১। ফুটাত ফুটা,  
বাইর বাড়ী পা ফুটা।  
পা—গিয়া।  
বাইর—বাহির।

কোটরাতে নিব ধার : ভাদ্রবেক গাবুরয়াপ : (১) যুবক যুগী : তুম : যুবক যোগিনী আম :  
 ডালিয়া দিবেক নিয়া শাল : জে থাকে (২) করিমু ব্যবহার :  
 যবে মিন আদি করি : নাহি এ (২) দেশান্তরি : সেবিবাম রাত্রি দিনে : ঠির ঠির নাহি মনে :  
 না আইসএ প্রদেশী যুগীয়া : অদীনেতে পালিমু তোমারে :  
 আর দেশে যায় যোগী : ঘরে ঘরে যায় মাগি : কাটিমু যে চিনন স্মৃত : দেখিবা যে আদভুত :  
 প্রাণ লৈয়া জাঅ পলাইয়া : অপনি বানবা দিয়া ধুতি :  
 আমি তোকে কহি দড় : আমার বচন ধর : তোরে লৈয়া বাহমু হাতে : পথে বাহ রহ যে (২) বাটে :  
 চল বাটে আমার আলএ : বেচিয়া আসিমু শীঘ্রগত :  
 এখানে থাকহ জবে : কোন জনে দেখে তবে : তবেত সমাজে যাইবা : মধুভাণ্ড (৩) আগে পাইবা :  
 বুলি খাঁতা লইবেক কাড়ি : কথা কৈবা দুই হস্ত নাড়ি : কথা কৈবা দুই হস্ত নাড়ি :  
 আঁচলে চাকিয়া নিমু : মণ্ডবেত গাসা মমু : জাত গোত্র সব পাইবা : বানন্দে বসিয়া খাইবা :  
 খাল ভ'র দিমু দুগ্ধ ভাত : দুয়ে বাইব খাতা আর বুলী :  
 নিতি নিরামিখ খাই : ত্রক্ষানি আচার মুহ : শীঘ্রগতি চল যাই : নিয়রে আমার ঠাই :  
 চল যাই আমার বাসাত : ঘরে মুদ্রা আছে লক্ষকুটী :  
 কহিলাম তোমারে তবে : পাইলে মিনের হাতে : জীবন সাফল্য হৈব : সদাএ তোমার দেখা পাইব :  
 প্রাণ লৈব জানিঅ প্রদেশী : সাথে আসি খাঅ মধুভাত :  
 চল তুমি আমার বাড়ী : পালিমু যে যত্ন করি : প্রতিনিতে সেবিব : খাটেত বসাইয়া খুইব :  
 যেন তুমি হৈলা গৃহবাসী : দুইজনে খাইমু এক সাত :  
 আবলে কহিএ তোকে : কেবা জানি তোমা দেখে :  
 উঠ যোগী চল জাট কাটে :  
 আগে আগে হাট তুমি : পাছে পাছে যাই আমি :  
 যত কথা কৈমু ভাটে ভাটে :  
 যুবক যুবকির কথা : হেট কেনে কর মাথা :  
 হাসিয়া না চায় কেনে মুখ :  
 গুনিয়াছি ইতিআগ : বএসে নাহিক দোষ :  
 পাপ নাহি না ভাবির ছক :  
 যোগীর যবে যোগী যাইবা : অজ্ঞান স্থিতি পাইবা :  
 কার কিছু না হইব ভএ :  
 তুমি আমি জাতগন : হৈলাম আদি উপাসন :  
 দোর নাহি গুন মশামত্র :

## খপছন্দ পয়ার

হাসিয়া বলিল তবে কতি জে গোকাঁহি ।  
 ভালকথা যোগিনী গুনিল তোর ঠাই ।  
 মাগিয়া খাই যোগী আমি জামি প্রতিদেশ ।  
 এমত দেশেত কেহ না করে প্রবেশ ।

- (১) কপালে বাহা থাকে ।  
 (২) পণে পসরা বহিয়া তুমি রাজ্যের ই দাঁড়াইয়া থাকিও, হাটের গোপমালা আর তোমার যাইতে হইবে না, আমিই তথায় বাইয়া ধুতি বেচিয়া আসিব ।  
 (৩) মধুভাণ্ড ? তাদ্রিক চক্রে মত্তের ব্যবহার খুবই হইত এবং সর্গাপেক্ষা সম্মাননীর জনকে সর্গ প্রথম বড় দিয়া অভ্যর্থনা করা হইত ।

(১) শান্তমতা ।

(২) সহ করে ।



গুনিয়া দেশের কথা বড় লাগে তএ ।  
 মাগিয়া খাইতে আইলাম জীবন সংশয় ।  
 কোম দেশে নাহি গুনি এমন প্রবাদ ।  
 কদলির রাকোত নিয়া ফুগী করে বদ ।  
 ভাল কথা রাউলানি (১) কহি (বে) অধন ।  
 মিনেরে দেখিতে যোর হইয়াছে মন ।  
 সরল বচন কহ রাউলের ঝিই ।  
 কিরূপে দেখিযু মুই জৈবর মিনাই ।  
 কিরূপে বাইতে পারি মিননাথের পুরী ।  
 কেনতে আসিতে পারি আপনে সোখরী ।  
 কেননে পাইযু আমি মিনের দরশন ।  
 কহরে জুগিনী কৈন্তা বরুণ বচন ।  
 নাথের বচন গুনি ফুগীর ঝিয়াই ।  
 আমি কহি গুন দেখা পাইবা মিনাই ।  
 পুরুষের গতি নাই পুরির ভিতর ।  
 নির্ভকি সকল জাইতে আদেশ রাজার ।  
 আর জন বাইতে নারে মিনের সাক্ষাতে ।  
 ছল করি বাইতে পারে তাহার সভাতে ।  
 আখার বাড়ীতে আইস আমি নিব তোরে ।  
 নাটোআর ভেসে চল নির্ভ করিবারে ।  
 নাটোয়ার সজি তোর করি দিব মিতা ।  
 মিনেরে দেখিবা তুমি নাটোয়ার ছোখা ।  
 নাথে বলে কহি গুন ফুগীর কুমার ।  
 তোমার ভোবনে আমি বাইতে না পারি ।  
 তোমার বাড়ীতে যদি আমারে দেখীলে ।  
 মোরে ভুলি খোটা দিব এত জুগী রাউলে ।  
 চল চল নাহি তুমি আপনার ঘরে ।  
 মোর বরে হৈবা তুমি পরম সোন্দর ।

(১) রাউলানি, রাউলের ঝি, যোগীর ঝি ইত্যাদি  
 সন্মানার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা হইতেই গৃহস্থ যোগী  
 দ্বন্দ্বকে রাউল বলিত বলিয়া বোধ হইতেছে। এক  
 লোকের গল্পরাটি ব্রাহ্মণদের রাউল উপাধি আছে।

আর এক বর দিলাম চলি আর বর ।  
 রত্নসব ভরিয়াছে তোমার ভাণ্ডার ।  
 সুবর্ণ রত্নত বসু ভরিয়াছে চাউলে ।  
 হাসিয়া বোলান (১) দেউক তত জুগী রাউলে ।  
 বর বর আর তুমি অষ্ট অলঙ্কার ।  
 এহারে পরিয়া চল ঘরে আপনার ।  
 তুলি হৈতে খসাইয়া দিল অষ্ট অলঙ্কার ।  
 এহারে পরিয়া নারি আনন্দ অপার ।  
 চল চল ফুগিনী ঘরেত চল এবে ।  
 নাথের বচন গুনি চলি যায় তবে ।  
 নাথেরে এড়িয়া বাইতে নাহি লয় মনে ।  
 ধীরে ধীরে যায় নারী অম্লভোগমনে ।  
 মন হৃক্ষে জল ভরি ধীরে ধীরে যায় ।  
 বাইতে নাহিক ইচ্ছা কিরি কিরি চায় ।  
 বাইতে নাথেরে এড়ি পাও নাহি চলে ।  
 কথকর গিয়া বাড়ী ভাঙ্গিলেক ছলে ।  
 বাড়ী ভাঙ্গি কান্দে নারী আসিলেক দাএয়া (২) ।  
 ফিরিয়া আইল কত্না যোগীর লাগিয়া ।  
 ভাঙ্গিল আমার বাড়ী যাইব কেনতে ।  
 কোথায় পাইব মুহু কলসি কিনিতে ।  
 ভাঙ্গিল কলসি মোর তোমার কারণে ।  
 তোমারে দেখিয়া মোর স্থির নহে প্রাণে ।  
 তাহাকে গুনিয়া নাথ হৈল মহারোষ ।  
 তুলি হতে খসাইয়া দিল সোনার কলস ।  
 চল চল যোগিনী চলিয়া যায় বর ।  
 আপনি ভাঙ্গিয়া বাড়ী পরেরে দেখায় ডর ।  
 মুখে লজ্জা নাই তোর কিরি আইস কেনে ।  
 তুমি যেই চায় সেই নাহি মোর মনে ।  
 আর আর বলি নাথে বলে মন মন ।  
 কান্দিয়া বিখল নারী কেমা নাই মন ।

(১) হরিবোল ? অর্থশ্রমি ?

(২) বাইয়া ।

কিরি কিরি আইসে আর কত ছর যার ।  
 কেকোরাইয়া কেকোরাইয়া কান্দে বাইতে না চার ॥  
 দেখিয়া কে জতীনাথে উপরে কাকরে ।  
 ও ভূবন সাকী করি যতী নাথে বলে ॥  
 সাকী হইও রবি শশী মোর দোষ নাই ।  
 কিরি ২ আইসে কেনে যুগীর ঝরাই ॥  
 সাকী হইও দেবদাস সাকী হইও তুমি ।  
 বৈরাগী হারিয়া পাও ভালিবাম আমি ॥  
 নিঠুর বচন শুনি যোগিনী চলিল ।  
 ততক্ষণে যতীনাথে আসন তুলিল ॥  
 মিনের পুরীতে বাইয়া হৈল উপস্থিত ।  
 গুরু গুরু বলি নাথে চলিল বরিত ॥  
 সিদ্ধা না দেখিয়া নারী তবে ঘরে গেল ।  
 ততক্ষণে গিয়া গোন্ধে পুরীতে মিলিল ॥  
 মিনের পুরীতে গিয়া হৈল উপস্থিত ।  
 রত্নময় পুরী খানি দেখিল ভণ্ডিত ॥  
 মনেত ভাবিয়া গোন্ধে সিকাত্তে দিল সান ।  
 চমকিত হৈল তবে মিননাথের প্রাণ ॥  
 পুরীর ভিতরে থাকি সিংহনাদ শুনি ।  
 ডাহিনে বামে চাহে নাথে নিজ মনে শুনি ॥  
 সিংহনাদ শুনি মিন হইলেক ভোল ।  
 ভাঙিআ নিবারে পারে মোদলা কমলা ॥  
 কৈ গেল কৈ গেল মোর মোদলা ছুরারি ।  
 আসিছে কেমন যোগী তারে আন ধরি ॥  
 মোর দেশে আসি বেটার এত গাবুরাল ।  
 দক্ষিণ পাটনে নিয়া তারে দেহ শাল ॥  
 রাজার আদেশ পাইয়া দারিএ তখন ।  
 হাতে অস্ত্র করি তবে আইল জনে জনে ॥  
 একে একে চাহে সবে রাজার উয়ারি ( ১ ) ।  
 অন্তর্ধান হৈয়া গোন্ধে বলে হরি হরি ॥

একে একে বিচারে কোঠের আসে পাশে ।  
 যুগেত কাপড় দিয়া গোন্ধ নাথে হাসে ॥  
 মহাভোলে পড়িয়াছে দৈব মিনাই ।  
 কিরূপে আনিমু যুই গুরুরে বুঝাই ॥  
 ভোলেত পড়িছে গুরু আপনা পাসরি ।  
 ভার্গ্যো না পাইল মোরে ষোলশত নারী ।  
 যদি সে পাইত মোরে ষোলশত নারী ।  
 কুলি খাতা আশার যে সবে নিত কাড়ি ॥  
 বুঝির সাগর নাথ বিচারে পণ্ডিত ।  
 মনেত ভাবিয়া নাথ স্থির কৈল চিত ॥  
 কিরূপে পারিমু যুই মিনেরে দেখিতে ।  
 নাটোয়ার ভেসে যাইমু গুরুর বিধিতে ॥  
 ই বুলিয়া যতীনাথে উঠিয়া আইল ।  
 বকুলের তলে বাইয়া পুনি দাড়াইল ॥  
 নন্দ মহানন্দ তারা ছুই ভাই ।  
 আনিয় নাটোয়া রূপে গুরুরে চেতাই ॥  
 বিশ্বকর্মার স্থানে গিয়া কহ মোর কাজ ।  
 গীত্র করি দেউক মোরে নাটোয়ার সাজ ॥  
 সুবর্ণ মৃদঙ্গ দেউক সুবর্ণের তাল ।  
 সুবস্ত্র ছিকল দেউক যেন লাগে ভাল ॥  
 গোন্ধের বচন নন্দে না করে অগ্রথা ।  
 কাটে চলি গেল বিশ্বকর্মা আছে যথা ॥  
 বিশ্বকর্মার শুনিলেক নাথের সংবাদ ।  
 ততক্ষণে গড়ি দিল না করিল ব্যাজ ॥  
 নানা বর্ণে গড়ি দিল রত্ন অলঙ্কার ।  
 নন্দের হাতেত দিল করিয়া বেবার ॥

বাহিরের কোন অংশকে উয়ারি বলিত । দেউরি শব্দটির  
 গঠনও উয়ারি শব্দেরই মত । উয়ারি পারস্ত বা আরব্য  
 ভাষা হইতে না আসিয়া থাকিলে ইহার একটা অর্থ  
 অনুভূত হইতেছে । ঢাকা নগরের পূর্ব ভাগকে  
 উয়ারি বলে । ইহা হইতে অনুমান করিতেছি যে  
 “উদয় দ্বার” শব্দটিই উয়ারি শব্দটির মূল ।

( ১ ) উয়ারি শব্দটি বিশেষ প্রাণধানের যোগ্য ।  
 বর্তমান প্রয়োগ হইতে বুঝা যাইতেছে যে রাজবাটির

নাথের হাতেত নিয়া দিল অলঙ্কার ।  
 একে একে পড়িলেক যত অলঙ্কার ॥  
 গলাতে দিলেক নিয়া সোল ছাঁড়হার ।  
 করত কঙ্কন দিল দেখিতে সুন্দর ॥  
 কপালে তিলক দিল নয়নে কাজল ।  
 শ্রবনে তুলিয়া দিল বিচিত্র কুণ্ডল ॥  
 গাএত কাচি দিল কমরে খিচনি (১) ।  
 করিল বিবিধ সাজ ভুবনমোহনৌ ॥  
 খাউক আমের কার্জ লোভে মুনগন ।  
 কটাক্ষে চাহিতে হরে জুগী দিগ্ধার মন ॥  
 সুবর্ণে রচিত বস্ত্র পড়িলেক টোব (২) ।  
 আছৌক আনের কার্জ দেবে করে লোভ ॥  
 নন্দে মৃদঙ্গ মৈলু করতাল মহানন্দ ।  
 আচর্য নাটোয়া হৈয়া চলে তিনজন ॥  
 মহানন্দ কান্দে মৃদঙ্গ তুলিয়া ।  
 আপনে নাটোয়া গোন্ধে ধাহেন চলিয়া ॥  
 সুভক্ষণ করিয়া কদলি দিল পাও ।  
 নাটোয়ার নগরে গিয়া তুলিলেক গাও ॥  
 যত সব নাটকের নাটোয়া সুন্দরী ।  
 নাটোয়া সবে মিলি কাট আনিল ধরি ॥  
 এহি রূপ নাটোয়া যদি মিনেরে দেখাই ।  
 সকল দিনের ফল একদিনে পাই ॥  
 ই বলিয়া নাটোয়া সব একত্রে মিলিল ।  
 নাটোয়ারে আগে করি তথনি চলিল ॥  
 দ্বারে আসি মিলিয়া মাদলে দিল হাত ।  
 দুই কর্ণ পাতি শুনে রাজা মিননাথ ॥

(১) কোমরবন্ধের পরিবর্তে এই সুন্দর শব্দটির  
 বহুল প্রচার বাহনীর ।

(২) তৌসু । সমস্ত ভূমিতে কিকিরের স্থান । যথা—  
 “সে হাসিলে গালে টোব পড়ে ।” “পাথরে লাগিয়া  
 খটখাতে টোব পড়িয়াছে ।”

দারিএ নাটোয়া দেখি পাড়ি গেল ভুলে ।  
 এমন নাটোয়া না দেখেছি কোন কালে ॥  
 এমন নাটোয়া যদি মিনএ দেখিল ।  
 মোজলা তেজসে তাহারে যদি পাইল ॥  
 মহাদেবী স্তানে আমি কহিতে জুআএ ।  
 যেই যতে নাটোয়া সবে দেখা নাহি পাইএ ॥  
 দারিএ কহিল গিয়া মোজলার ঠাই ।  
 একখানি কথা আমি কহিবারে চাই ॥  
 কোথা হনে আসিয়াছে নাটোয়া সুন্দরী ।  
 সর্জক সুন্দরী সে যে রূপে বিস্তারী ॥  
 আর যত নাটোয়া দেখেছি বার বার ।  
 এমত সুন্দরী নারী না দেখেছি আর ॥  
 ভূমি সব নহে তার দাসী সমস্তুল ।  
 তব শ্রিত্যানে নাহি ... .. ॥  
 দারির বচন শুনি দেবী আইল ধাইয়া ।  
 নাটোয়া সুন্দরী তবে দেখিলেক যাইয়া ॥  
 নাটোয়ার রূপ দেখি মহাদেবীর ডর ।  
 মনেত ভাবিয়া হুক করিল প্রচার ॥  
 কথা হতে আসিয়াছ কি নাম তোমার ।  
 কাহার নাটোয়া তুমি কহ তব সার ॥  
 তবে সে যে বোলে আমি ইজের নাটোয়া ।  
 নাম মোর মূলচনা নিখোদিল তুয়া ॥  
 প্রিথিবী ভ্রমিয়া আমি আইলাম এখানে ।  
 নৃত্য গীত করি আমি রাজার সাক্ষাতে ॥  
 [নৃত্য গীত করিল] আমি শিবের সভাতে ।  
 অনেক প্রসাদ পাইল বহু মূল্য তাতে ॥  
 আর নাট টেকল আমি ব্রহ্মার সভাতে ।  
 পুণ্যবর.....বিদিত ॥  
 তথ্যে শুনিলাম আমি মিন মহা দাতা ।  
 তে কারণে আসিয়াছি শুন মোর কথা ॥  
 নাটোয়ার কথা শুনি মঙ্গলা চিন্তিত ।  
 এ নাটোয়া নাছে যদি মিনের বিধিত ॥

# প্রতিভা

৪র্থ বর্ষ

মাঘ ১৩২১

১০ম সংখ্যা

## পূর্ববঙ্গের স্বভাবকবি— গোবিন্দ দাস \*

“কত রত্ন বিলুপ্তি পদ-তলে  
কত কাচ শিরের বিভূষণ রে।  
কত ভূমি-আসন-যোগ্য জন  
উটলে করিছে দিন যাপন রে।”

সভাবশতক।

পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকার নিকটে ভাওয়াল পরগণা অবস্থিত। নিবিড়গজারিবনসম্বল, শ্রামলধাতু-কেন্দ্রবলরিত, নানাবিহঙ্গমুখরিত, স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র-নিরীক্ষণীয় ভাওয়াল প্রদেশ স্বভাব-শোভার মীলাভূমি এবং শ্রুতিবির যোগ্য্য প্রস্তুতি।—(“Meet a nurse for a Poetic child”).

কবি গোবিন্দ দাসের লেখনী নিরন্তর ইহার মহিম্য-গানে নিরোজিত, “ভাওয়াল তাঁহার অস্থিমজ্জা ভাওয়াল তাঁহার প্রাণ।” ভাওয়াল জমিদারের আবাস-স্থল জয়দেবপুরে যে ক্ষুদ্র নদী ‘চিলাই’ ধরবেগে বহিয়া বাইতেছে, উহার প্রতিবিম্ব কবি-হৃদয়ের স্নেহবনতায়

\* ঢাকা সাহিত্য পরিষদের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে প্রণীত, ৭ বাণ, ১৩২১ বাদশ।

অভিষিক্ত। কবির অমর তুলিকার উদ্ভাসিত ভাওয়ালের  
দিব্য কাণ্ডি দেবপুরীর মত চিত্ত-বিনোদ করিতেছে—

“দিগ দিগন্ত আছে ব্যাপি  
উর্ধ্বে উঠছে আকাশ ছাপি

হাওয়ার হাজার গজার বনের সবুজ শোভারানি।

সিদ্ধি যেন শ্রাম তরঙ্গে—

ধেলুছে বনের অঙ্গে অঙ্গে

শীত-বসন্তে সমান ফোটে ফেন-পুষ্প হাসি।

বনভরা সব যত টিলা—

মাধার আছে আকাশ মিলা

মরকত মন্দিরের মত শোভা পরকাশি।

ঝাঁকে ঝাঁকে মেলে পাখা

উড়ছে মাঝের খেত পতাকা

বৈশাখ মাসে বকের শোভা দিগ্‌দিগন্তে ভাসি।

শুকনা বিলে শুকনা খালে

বনবরাহ পালে পালে

খুঁজছে শালুক পদ্মপালে সলিল-পিপাসী।

বৈশাখে চাতকের ডাকে

নবীন জলদ ধমকে থাকে

বন-বালা পুঞ্জছে দিয়ে ‘তাটি’ ফুলের রাশি।

বর্ষাকালে ‘বেলাই’ বিলে

শাগলা শালুক দুন্দী মিলে

কমল-বনে হুটে উঠে কমলার সে হাসি।

ভারতী কি মেহের ভরে  
বীণা রেখে কবির করে  
পদ-সরে হ'য়ে আছেন পদ্মবনবাসী।  
ওগো শ্রামা বনভূমি  
বিপুলা বিশালা ভূমি  
কবিতা কল্পনা মোর তোব চিরদাসী।  
আমি বা বুঝিব কি মা  
তোর ও শ্রাম মহিমা  
তথাপি সেবিব তোরে, চির অভিলাষী  
আমি তাইতে হেথা আসি।" (১)

কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস জীবিত আছেন। জীবিত কবির জীবনী লেখা রীতিবিরুদ্ধ হইলেও আমরা তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদান করিব, কারণ তাঁহার দারিদ্র্য নিপীড়িত জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি না জানিলে তাঁহার কবিতার উদ্দেশ্য সব সময় পরিষ্কার রূপে হৃদয়ঙ্গম হয় না। যে ভাওয়াল-জননী এই স্বভাব-লালিত কবি-পুস্তটিকে জোড়ে ধারণ করিয়া বস্তু হইয়াছেন, প্রসঙ্গক্রমে তাহার দুই চারিটা কথাও উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন হইবে।

(ক) সংক্ষিপ্ত জীবনী।

১২৬১ সালে ৪ঠা মাঘ কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস জয়দেবপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পাঁচ বৎসর বয়সে পিতৃ বিয়োগ হয়। পরিবারে তখন তাঁহার অতি স্তবির পিতামহ, পিতামহী, মাতা ও স্তিকাগারস্থ কনিষ্ঠ সহোদর। এই দুর্বহাঙ্গ শিশু তাইটি হৃদ্যভাবে জীবন বাঁচার উপক্রম হইলে বদান্তবর ভাওয়ালরাজ কালী নারায়ণ রায় বাহাদুর-দুকের মূল্য বাবদ ৪৭ মাসিক বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দেন, এবং কিছুদিন পর এই বৃত্তির পরিবর্তে কতক ভূমি প্রদান করেন।

গোবিন্দ দাস মহাশয়ের পিতার জাতিসম্পর্কে এক অশুভ্রম ভ্রান্ত ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার বাড়ী কবির

পিতৃভ্রাতার অদূরেই অবস্থিত ছিল। অনেক সময় গোবিন্দ দাস তাঁহার জ্যেষ্ঠা মহাশয়ের বাড়ীতেই থাকিতেন, এবং উক্ত জ্যেষ্ঠা মহাশয়ের শ্রালক মন্দরাম ঘোষের নিকট প্রথম বর্ণপরিচয় আরম্ভ করেন। ভাওয়ালরাজ-দুহিতা শ্রীমুক্তা রূপাময়ী দেবীকে তখন কালীচরণ মিত্র নামে এক ব্যক্তি লেখাপড়া শিখাইতেন। অল্পদিন পরই রূপাময়ী দেবীর সহিত মিত্র মহাশয়ের নিকট কবি লেখাপড়া শিখিতে লাগিলেন। সময় সময় রূপাময়ী দেবী জ্যেষ্ঠা ভগিনীর জায় কবিকে হাতে ধরিয়া লেখাইতেন। পরিণত বয়সে কবি সেই স্মৃতি মধুর কবিতায় দেহবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন—

"আজিও কি আছে মনে তোল নি ভগিনি।

দুই জনে এক সাপে, সিঁখেছি কলার পাতে

হাতে ধরি শিখায়েছ আদরে আপনি।

কেবল তোমার মেহে, আজো পাঁপ আছে দেহে

রূপাময়ি, করুণার ভূমি নিখারিনী"।

প্রেম ও ফুল, ১০৭ পৃঃ।

এইরূপে রাজবাড়ী অল্পদিন লেখা পড়া করিয়া জয়দেবপুর বাজারে মঙ্গল পালের দোকানে এক সরকারের নিকট গোবিন্দ দাস প্রথম গণিত ইত্যাদি শিক্ষা করেন।

রাজকুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়ের বখন লেখাপড়া শিখিবার সময় হইল, তখন রাজা কালীনারায়ণ জয়দেবপুরে একটা মাইনর স্কুল স্থাপন করিলেন। কবির গুরুপুত্র এবং রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণের মধ্যম বাহুল ৬ প্যারীমোহন গোবাসী রাজমাতা শ্রীমুক্তা সত্যভামা দেবীকে অহুরোধ করিয়া গোবিন্দ দাস মহাশয়কে সেই স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। রাজমাতা দয়াপরবশ হইয়া কবির পুস্তকাদি কিনিয়া দিলেন। এইরূপে রাজবাড়ীতে থাকিয়া রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণের সহিত তিনি একত্র লেখা পড়া শিখিতে লাগিলেন, ও বধানময়ে "হাজরুতি" প্রবীণা উত্তীর্ণ হইলেন।

(২) নব্যভারত, ১৩১৬ সন, বৈশাখ সংখ্যা, ৭পৃঃ।

রাজা কালীনারায়ণ “ভাওয়াল প্রজা হিতৈষী দত্তা” নামে এক সমিতি স্থাপন করিয়া প্রচার অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। ঐ সভায় গোবিন্দ দাস মহাশয় একদিন একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করিলেন। তাহা এতই মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল যে রাজা বাহাদুর সম্বন্ধে হইয়া ঢাকা নর্দালস্থলে পড়িবার জন্য কবিকে মাসিক ৫৯ রুপি নির্দেশ করিয়া দেন। তদনুসারে গোবিন্দ দাস ঢাকা নর্দাল স্থলে ২ বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া তৃতীয় বৎসর ছুটিতে বাড়ী আসিয়া আবার পড়িতে গেলেন না। এখানেই তাঁহার নর্দাল স্থলের পড়া পরিসমাপ্ত হইল।

তৎপর ভাওয়াল ব্রাহ্মণগ্রামে নব প্রতিষ্ঠিত মাইনর স্থলে প্রায় একবৎসর কাল হেডপন্ডিতী করিয়া, ঢাকায় তৎকালে নবস্থাপিত মেডিকাল স্থলে পড়িতে আসেন। রাণী সত্যভামা দেবী তাঁহার ব্যয় বহন করিতেন। কিন্তু এখানেও ২ বৎসরের অধিক পাঠ করা হয় নাই। স্থল ছাড়িয়া আবার বাড়ী গিয়া বসিলেন। কিছু দিন পর তিনি রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণের আইভেট্ট সেক্রেটারীর কার্য প্রাপ্ত হন।

এই কর্মে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, গোবিন্দ দাস, নানা কারণে তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তখন ভাওয়ালে ছুড়িক। অনশনে শীর্ণ, সহায়-সম্পদ-হীন গোবিন্দ দাস ১২৮৬ সনের পৌষ মাসে প্রথম ময়মনসিংহে গমন করেন। তখন রেলপথ হয় নাই, হাঁটিয়া চতুর্দ্ব দিগে ময়মনসিংহে পৌঁছিয়াছিলেন। সেখানে অকৃত্রিম স্নেহ, উদার-হৃদয়, দেবেন্দ্র কিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তিনি কিয়দিন বিশ্রাম করিলেন। তখন ময়মনসিংহে “সারস্বত উৎসব” হইতেছিল। সেই উপলক্ষে গোবিন্দ দাস একটা কবিতা পাঠ করেন এবং তাহা স্থানীয় পত্রিকা “ভারতমিহিরে” প্রকাশিত হয়। সে সময় শ্রবণ চূর্ণাপুরের মহারাজ কমলকঙ্ক সিংহের বয় ৩ উত্তোগে “আর্য্য প্রবীণ” ও “কৌমুদী” নামে দুই খানি মাসিক

পত্রিকা বাহির হইত। “ভারতমিহিরে” কবিতা পাঠ করিয়া মহারাজ কমলকঙ্ক সিংহ কবিকে শ্রবণে লইয়া যান এবং রাজাক্ষির পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু শ্রবণের জল বায়ু অসহ্য হওয়ায় মুক্তাগাছার অমৃতম্ভ্রমিদার ৮ কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরীর নিকট কার্য প্রাপ্ত হন। ইঁহার সহিত একদা “ভৈরব” ভ্রমণ কালে কবির প্রসিদ্ধ “বরষার বিল” লিখিত হইয়াছিল। আমরা যথাস্থানে তাহার আলোচনা করিব।

অনন্তর কেশব বাবুর কার্য্য হইতে ছুটি লইয়া জয়দেবপুর আসেন এবং কিছুদিন ময়মনসিংহের এক এণ্টান্স্ স্থলে দ্বিতীয় পণ্ডিতের কার্য্য প্রাপ্ত হন। ঐ পদ উঠিয়া গেলে “আত্মোৎসর্গ”-প্রণেতা ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট যোগেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানভূষণের প্রতিষ্ঠিত “সাহিত্য সমিতির” লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হইয়া কিয়ৎকাল তথায় অতিবাহিত করেন। পরে সেরপুরের বিজ্ঞানসাহী জমিদার হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের অধীনে ময়মনসিংহ টাউনে ‘চাক্রবর্তী’ ও “চাক্র প্রেসের” ম্যানেজার হন। তৎপর উক্ত চৌধুরী মহাশয় কবির গুণে আকৃষ্ট হইয়া কবিকে নিজ সন্নিধানে আইভেট্ট সেক্রেটারী স্বরূপে রাখেন। এখানে তিনি প্রায় ৮৯ বৎসর চাকুরী করিয়াছিলেন। গোবিন্দ দাসের অনেক কবিতা সেরপুরে লিখিত হইয়াছিল।

১২৯২ সনে তাঁহার প্রথম পত্নী সারদামুন্দরীর লোকান্তর হয়। এই উপলক্ষে কবির বিদীর্ণ হৃদয়ে শোকোচ্ছ্বাসময়ী কবিতাগুলি বঙ্গ সাহিত্যে অমূল্য রত্ন। আমরা পরে তাহার আলোচনা করিব।

বিদেশে চাকুরী করিলেও কবি মধ্যে মধ্যে স্বীয় জন্ম-ভূমি জয়দেবপুর আসিতেন এবং রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। এই সময় কবির “প্রেম ও ফুল,” “কুসুম” (১২৯৬ সাল) প্রকাশিত হইয়াছিল। রাজা বাহাদুর তাহা পাঠ করিয়া এত প্রীত হইয়াছিলেন যে, রাজ-সরকার হইতে কবির দ্বিতীয় পরিণয়ের ৩ বর বাড়ী প্রদত্ত করিয়া দিবার ব্যয় দিতে প্রতিকৃত হন।

কিন্তু হঠাৎ এক দৈব দুর্ঘটনার কবির প্রতি রাজার রোষান্বিত প্রদীপ্ত হইয়া উঠে।——“নবযুগ” নামে একখানি সাপ্তাহিক কাগজ তখন কলিকাতা হইতে বাহির হইত। সেই পত্রিকার রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণের বিরুদ্ধে অতি তীব্রভাবে একটি প্রবন্ধ বাহির হয় এবং সর্বপ্রধান কর্মচারী ৬কালীপ্রসন্ন ঘোষের প্রতিও সামান্য কটাক্ষ থাকে। ইহাই রাজার রোষের কারণ হইল, এবং গোবিন্দদাস মহাশয়কে এই প্রবন্ধের লেখক সম্বন্ধে রাজা এত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন যে, সেই বৃহত্তে এবং সেই ট্রেনেই গোবিন্দ দাস মহাশয়কে চির দিনের জন্য জয়দেবপুর ছাড়িয়া বাইতে আদেশ করিলেন। ১৯২৮ সনের ফাল্গুন মাসে এই নির্দারণ আদেশবাণী অমুসারে রাজগৃহে প্রতিপালিত কবি প্রিয় জগদ্বিহী হইতে নির্কাসিত হইলেন। বস্তুতঃ গোবিন্দ দাস সেই প্রবন্ধ লেখেন নাই, ইহা তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া রাজার নিকট বলিলেও কিছুতেই রাজার বিবেকের ও কোপের শান্তি হইল না। এই সময়কার কবিতাগুলি একরূপ হৃদয়-বিদারক শোকপূর্ণ যে, তাহা যিনি পড়িয়াছেন তিনিই অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারেন নাই।

সেরপুতের চাকুরী ছাড়িয়া কবি কিছুদিন নব্যভারত প্রেসের ম্যানেজার হইয়াছিলেন। তৎপর জমিদারী কার্যের চেষ্টায় কবীজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট শ্রীযুক্ত অক্ষর কুমার বড়াল মহাশয়ের সুপারিস সহ প্রার্থী হন এবং রবিবাবুও কাজ দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। এমন সময় যুক্তাগাছার মহারাজ স্বর্ধাকান্তের ঠেটে একটি নারৈবী লইয়া গোবিন্দ দাস মহাশয় পূর্বপরিচিত বহুবল্লভসম্পন্ন ময়মনসিংহে চলিয়া আসেন। এ কার্যে ৬ বৎসর ছিলেন। নারৈবী কার্যে প্রজাপীড়ন করিতে হয়, একতর ইহা আর তাঁহার ভাল লাগিল না। চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া দয়ানীল বহাদুরর রাজ্য ভগৎকিশোর আচার্য্যের শরণাগত হইলেন। তিনি তদবধি গোবিন্দ দাস মহাশয়কে মাসিক ২০১ সাহায্য করিতেছেন।

ভাওয়ালের মৃত কুমার বাহাদুরজয় (রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রাঘের পুত্রগণ) ভাওয়ালের কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া পুনরায় তাঁহাকে স্বদেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন এবং ৩ জনে মাসিক ৮১ করিয়া ২৪১ করিয়া বৃত্তি দিতেন। এক্ষণে তাঁহাদের লোকান্তর হইবার পর মাত্র বড় কুমারের পত্নী শ্রীযুক্তা সরস্বতী দেবী মহোদয়া পতিপ্রদত্ত মাসিক বৃত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। এই সম্বন্ধে মহিলার নিকট বলীয় সাহিত্য পরিষদের শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রপ্রমুখ মাতৃগণ্য সভ্যবৃন্দ কবি গোবিন্দ দাসের বাসস্থান নির্মাণ ও স্বচ্ছলতা বিধায়ক মাসিক বৃত্তি নির্দেশ করিয়া দিতে এক আবেদন-পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন; তাহার ফল কি হইয়াছে জানি না।

উপরে যে সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইল তাহাতে বৈচিত্র্য কিছুই নাই। এত বাঙ্গালী জীবনই সচরাচর বিশেষতঃ বিহীন, তাহাতে দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে ভগ্নপঞ্জর কবির জীবনে আর বৈচিত্র্য কি থাকিতে পারে? তবে গ্রীক কবি থিওক্রাইটাসের (Theocritus) কথা সত্য হইলে বলিতে হইবে, বস্তুতঃই “দারিদ্র্য কবিত্বের প্রসূতি।”

(খ) কবিতার আলোচনা।

বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের নিকট ১৩২০ সনের ৩রা পৌষ তারিখে কবি গোবিন্দ দাস একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহার কবিতার মূল মন্ত্র ও আদর্শ লিখিত ছিল—“আমি কবিতার স্বর্ণের নবীনচন্দ্র সেনের কবিতা বড় ভালবাসিতাম, এখনও বাসি। তাঁহার কবিতাই আমার আদর্শ ছিল। তাঁহার কবিতার কলকৌশলের কায়দা, কৃতি-কসরৎ, তেমন না থাকিলেও, সরল ভাবের ও তরল ভাষার তাহা বস্তুতঃ উৎসাহিত আনন্দ-উৎস। টানিয়া থিচিয়া, জোর জবরদস্তি করিয়া, টীকা টীপনি দিয়া মিওরাইয়া উহার রস বাহির করিতে হয় না, অথবা আঁধার ঘরে হাতরাইয়া উহার উদ্দেশ্য

উদ্ধার করিতে হয় না। তাঁহার কবিতা কুহেলিকার  
বা আবছারার আচ্ছন্ন হইয়া কোন ভৌতিক ভীতি  
প্রদর্শন করে না; কাটখোটার মত কটমটেও নহে।  
নিশ্চিন্তে, নির্বিক্রে সে মাধুর্য উপভোগ করা যায়।  
একজন নবীন বাবুর সেই সরল সরস কবিতা শৈশব  
জীবনেই আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল।” গোবিন্দ  
দাসের পাঠকমাত্রই জানেন, কবি এই মহৎ আদর্শ  
হইতে বিচ্যুত হন নাই। তাঁহার কবিতা স্বচ্ছ,  
প্রসাদগুণসম্পন্ন, শুদ্ধ কাঠে অধির মত অনায়াসে  
পাঠকের হৃদয়কে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলে, খোলা মাঠে  
একখানি ফুলের বাগানের মত স্নিগ্ধনির্মল সৌরভে  
চিত্তকে পুলকিত করিয়া তোলে। চন্দ্রকের গন্ধের  
মত, চন্দ্রিকার সুবাসের মত, বোবনের সৌন্দর্যের মত,  
রমণীর কমলীয়তার মত সর্বদা সর্বত্র এ গুণ গোবিন্দ  
দাসের কবিতায় বিরাজ করিতেছে। হুটী একটা  
উদাহরণই যথেষ্ট হইবে—

“বরষার বিল,

এমন পবিত্র স্থান, বাতাসে জুড়ায় প্রাণ

অজানা অবশে করে হৃদয় শিথিল;

পানি, জল, বাস, গাছে, কত কি মাধুরী আছে

ভুলাইছে একেবারে ভুবন নিখিল।

ডাকে জলচর পাখী, দামদলে থাকি থাকি

এত কি ললিতে গায় বসন্তে কোকিল?

হুণীল লহরী তুলি, নাচাইছে হুলি হুলি

সন্ধ্যার শীতল এই মলয় অনিল

মুচন সলিলে ভরা বরষার বিল।

সন্ধ্যার ললাটে হাসে অর্ধ চন্দ্র এক

রঙেত সলিলে ভাসে শশী সহস্রেক

বাসের ছায়ার, গায়, কুহুদী হারিয়ে যায়—

সাঁতারিয়া শশী বেন খুঁজিছে অনেক।

কি সুন্দর মুকোচুরি, জানে এ কুহুদী ছুঁরী—

লগে লগে থেকে ধরা দেয় না বারেক।

শু’য়ে থাকে সন্ধ্যারেতে, কোহুদী কুহুদ পাতে—

ঝোপে কাপে ধানক্ষেতে ঠিক নাই এক

এ সামান্য বিছানার, ও কম কিরণকার

নয়ন ভুলিয়া থাকে দেখিলে বারেক—

দেখি নি এমন শোভা—দেখেছি অনেক।

গোবিন্দ দাস খাঁটি বাঙ্গালী কবি। তিনি সংকৃত কি  
ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি,  
গোবিন্দ দাস আধুনিক ভাবে ধরিতে গেলে বিদ্বান  
নহেন। নব্বাল স্কুলের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী তাঁহার  
বিভার পত্রিসমাণ্ড। কিন্তু তাহার সরল তরল ভাষায়  
উৎসের নিকট তেমন বাগ্মিতা পরাভূত—

“পরশুরামের শোণিত তর্পণের” সেই ভীষণ অভিনয়-  
ভয়ে বেন সমস্ত প্রকৃতি জড়সড় হইয়া আছে—

“অদূরে হিমালয় ভারতপ্রাচীর,

অনন্ত আয়ত ব্রহ্মি গভীর,

চেয়ে আছে বেন তুলি উর্দ্ধে শির,

সভয়ে ভূধররাজ!

পারে না চাহিতে নিরে ধরাতলে

পঞ্চরক্ত হ্রদ গর্জিয়া উছলে

সফেন তরল ছুটে মহাবলে

ভীষণ ব্যাপার আজ।

প্রচণ্ড অলস হাদশ মিহির

মহা জ্যোতির্গর বিরাত শরীর

অজলি পুরিয়ে লইয়া ক্রধির

দাঁড়ারে হ্রদের তীরে

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মূলে ধৃত উপবীত—

ডাকিছে গভীরে পৃথিবী তত্ত্বিত

শত মেঘমঞ্জে নভঃ বিকম্পিত

সমীর বহিছে ধীরে।”

আমাদের মনে হয় কালিদাসের “নিরুপা বৃক্ষং নিম্বত,  
দ্বিরেকম্, বৃকাতুলং শান্তমুপপ্রচারম্ কাননম্” এর ২৭শ



আর একবার এমনই বিরাট গভীর ভাব দেখিয়াছিলাম।

কেহ কি সহজে বিশ্বাস করিবেন যে, যে লেখনী এই গভীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল, তাহাই চতুর্থীর চারু চন্দ্র দর্শনে বদ গৃহের নিভৃত কোণে বালিকা বঙ্গবধুর মধুর চিত্র অনারাগে ফুটাইয়া তুলিয়াছে?

“চতুর্থীর চারু চন্দ্র শারদ আকাশে,  
অনন্ত অসীম নীলে একা একা হাসে  
গৃহকোণে বঙ্গবধু, লুকাইয়া হাসে মুছ  
ঈষৎ ঘোমটা বেন খুলিছে বাতাসে।  
সে পবিত্র দেবদেহ, পারে না দেখিতে কেহ  
অমিন্দ্য অতুল তরু চাকা নীল বাসে।  
কোটে না মুখের কথা, মৌনময়ী সরলতা  
কিরণ প্রতিমাখানি করে না সম্ভাবে।  
আগনি আগন প্রাণে, কেবলি হাসিতে জানে  
হাসির সরল শিশু একা একা হাসে  
চতুর্থীর চারু চন্দ্র শারদ আকাশে।”

প্রেম ও ফুল-নষ্টচন্দ্র—১১০ পৃঃ।

ঈশ্বর গুপ্তের পরবর্তী বাঙ্গালী কবিগণের রচনাতে অস্বাভাবিক পরিমাণে যুরোপীয় শিক্ষা বা সভ্যতার ছায়া পড়িয়াছে। অবশ্যই তাহাতে বাঙ্গালী ভাবের সাহিত্য-সম্পদ, ভাব-সম্পদ উন্নত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু গোবিন্দ দাস বাঙ্গালী গৃহের খাঁটি চিত্র, বাঙ্গালী জীবনের অনাবিল আমল-উজ্জ্বল, শোকহঃ, আধুনিক কবিদিগের মধ্যে যেসকল অবিমিশ্র ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, এমন বোধ হয় আর কেহ পারেন নাই—শিশু ‘ভোলাকে’ লক্ষ্য করিয়া কবি “দ্বিখিল্লরী বীর” (‘বৈজয়ন্তী ১৫ পৃঃ’) লিখিয়াছেন—

“এ নহে, মাদির শা, এ নহে জলিগ খাঁ  
এ নহে তৈমুরলঙ্গ চীন তাতারীর,  
আগে নি হিমাত্রি লংঘি, নাহি সৈন্ত নাহি সঙ্গ  
নাহি হাতে তরবার, নাহি ধনুতীর

পথে পথে হাহাকারে, আসে নি কাঁদারে কারে

আসে নাই দেশে দেশে বহা’য়ে রুধির,  
আসিয়াছে পুষ্পরঞ্জে, সুস্বের স্বর্ণপথে  
উড়িয়ে কনকরেণু কিরণে মিহির  
একাকী এসেছে ভোলা, মমতার হাত খোলা  
করুণা গলিয়ে পড়ে আঁধারনীলে নীর।  
এ দেশে এসেছে এক দ্বিখিল্লরী বীর।  
বিজয়-লাবণ্য তার, স্নেহ দয়া মমতার  
পরভূত সর্বভূত এই পৃথিবীর  
সে যাহার ধরে গলে, হিমাত্রি হ’লেও গলে  
বহে নেত্রে শতধারা স্নেহা জাহ্নবীর।  
ও ক্ষুদ্র হাসির চোটে, সাগর ফোঁপারে ওঠে  
শিহরে নারীর বুক, শুনে ঝরে ক্ষীর।  
কে জানে কিসের মোহ, নাহি বুদ্ধ নাহি জোহ  
আত্মসমর্পণে সবে আনন্দে অধীর।  
এ দেশে এসেছে এক দ্বিখিল্লরী বীর।

... ..

সে জানে না জাতিভেদ মানে না কোরাণ বেদ  
মানে না আচারধর্ম মুনি-মৌলবীর।

... ..

সে এক সম্রাট প্রভু, সে নহে অধীন কছু  
সে করে চরণে চূর্ণ রীতি পৃথিবীর।”

এক বারেরই বলিয়া রাখা ভাল যে, গোবিন্দ দাস স্বচ্ছ কবি বার্ণসের (Burns) মত বস্তুতাত্ত্বিক (Realistic) কবি। বার্ণসের মতই রমণী-জাতিকে তিনি শ্রেষ্ঠাঙ্গন দিয়াছেন এবং অন্ততঃ প্রেমবিষয়ক কবিতায় “ফুল রেণু” বার্ণসের মতই (Sensuous) বা ইন্ড্রিয়লালাস-পূর্ণ। বার্ণসের সেই গান

“Green grow the rashes O  
Green grow the rashes O  
The sweetest hour that e’er I spent  
Was spent among the lasses O”

পড়িতে পড়িতে, গোবিন্দ দাসের কবিতা “আমার  
ভালবাসা” ( “কল্পরী” ২২ পৃঃ ) মনে পড়িবে—

“আমি ভারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ,

অমৃত সকলি তার মিলন বিরহ !

বুঝি না আধ্যাত্মিকতা

দেহ ছাড়া প্রেমকথা

কোথায় স্থাপিয়ে মূল

ফোটে প্রেমপদ্মফুল ?

আকাশকুসুম সে যে কল্পনা কলহ

...

ভোমাদের রীতি নীতি

বুঝি না পবিত্র শ্রীতি

ভোমরা কি পৃথিবীর নরলোক নহ ?

আমি ভাই ভালবাসি অস্থিমাংস সহ ।”

বার্ণস্ প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,

“Her 'prentice hand she tried on man

And then she made the lasses, O”.

গোবিন্দ দাসের প্রকৃতির অধীশ্বরী রমণী। রমণীই  
বিধাতার হৃষ্টির কেন্দ্রস্থান। রমণী সৌন্দর্যের রাণী,  
পঞ্চভূত তাহারই সেবার লজ্জা লাগানিভ, তাহারই  
সেবাশ্রমাদে ধন্য, তাহারই চারিদিকে পদ্মদলের মত  
বিশ্ব যেন ফুটিয়া রহিয়াছে। কবি স্বভাবসিদ্ধ মধুর  
সরল ভাবায় “শাওন মাসের” কথা গাহিতেছেন—

“শাওন মাসের লালছা সন্ধ্যার কালছা আকাশখান

নীল সমুদ্রে লোহিত সাগর ডাকছে যেন বান ।

বাহির বাড়ীর উঠানেতে শ্রামল বাঘের দল

নৃতন জলে কছে যেন টলমল টলমল ।

শিতকোলে চন্দ্রমুখী বেড়িয়ে বেড়ায় তার

কল কল কল জোয়ারের জল নাচে রাঙ্গা পার ।

কীরোর সিঁদু হ’তে ইন্দু লইয়ে ইন্দ্রিয়া

উজলি দিক্ অগ্নিসিঁহে ঠিক আঁবার যেন ফিরা ।

সারাদি পায়ে উড়িছে চুল—পাগলা পূবাল বার

অকল চকল হ’য়ে খেলছে হুজনার ।

আমের ডালে চাটক ডাকে খাতক কোথা তার

শাওন মাসে বিদেশ করে, এমন পাতক কার ?

...

ধাক্ বিদেশে, বার কি এসে ? মিলন অন্তঃপুরে

প্রেমের এমন দীঘল হস্ত স্বর্গ মর্ত্য পুড়ে ।”

—নব্যভারত, ১৩১৭ সাল, শ্রাবণ সংখ্যা ২৪৬ পৃঃ ।

গোবিন্দ দাসের কবিতাগুলিকে মিল্লিখিত করে  
শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে—

(১) প্রেম-সঙ্গীত (২) শোক-সঙ্গীত (৩) বাল্য  
কবিতা (satires) এবং (৪) দেশশ্রীতির কবিতা (৫)  
সমাজবিষয়ক কবিতা ।

আমরা ইহার প্রত্যেক বিভাগের সংক্ষিপ্ত আলোচনা  
করিতেছি। কিন্তু এই সমুদায় কবিতারই ভাব সরল ও  
প্রাঞ্জল এবং ভাষা নৃত্যশীল গিরিনদীর মত স্নেহ, অনাবিল।

( ১ )

প্রেম কবিতার প্রধান পুস্তক “ফুলরেণু” সমেট(sonnet)  
বা চতুর্দশপদী কবিতায় লিখিত। কালিদাসের  
‘উমার’ মত ভগবান্ যেন প্রেমিকের প্রিয়পাত্রীকে  
জগতের সর্বসৌন্দর্য্য দিয়া নির্মাণ করিয়াছেন,

“সি নির্মিতা বিশ্বস্থলা প্রবরা

দেকহ সৌন্দর্য্যাদিদৃশ্যেব ॥”

আমাদের কবি গাহিতেছেন—

“বচনে অমৃত তব, অমৃত নয়নে

স্বর্গীয় অমৃত গন্ধে দেহ সুবাসিত,

সকল ইন্দ্রিয় আক একত্রিত ক’রে

নয়নে করিব ভোগ ক’রো না বঞ্চিত ।

শ্রবণ, দর্শন, ভ্রাণ, স্পর্শ, আশ্বাসন

এস দেবি স্বর্গে, মর্ত্যে করি হুই জন ।”

আবার, মৃত পত্নী ‘সারদার’ প্রেম যেন জগৎব্যাপ্ত  
হইয়া রহিয়াছে। সারা বিশ্ব তাহারই স্বত্বাধীন পরি-  
পূর্ণ হইয়া আছে—

“না-না-না সে দেবরাণী দেবদেশে গিয়া  
 আনিও সারদা বুঝি তোলে নি আমার  
 শত চক্রে শত মেহে দেখিছে চাহিয়া,  
 বর্গমন্ডব্যাপী তার দীর্ঘ পিণ্ডাসার  
 তাহারি মনভাষা ঠাঠা ঠাঠা চাওয়া,  
 নিশির শিশিরভরা তাহারি নয়ন,  
 তাহারি সজাঙ্গ আধি দিনে নিবে যাওয়া  
 তারি মান—নব ঘন চুরি করে মন।

এত প্রেম, এত দয়া আর আছে কার  
সারা রাত ভেগে থাকে শিয়রে আমার।

ইংরেজ কবি চার্লস্‌ উলফ (Charles Wolfe)

এমনই শোকবুধ চিত্তে গাছিয়াছিলেন—

"I do not think where'er thou art  
Thou hast forgotten me ;  
And I perhaps may soothe this heart  
In thinking too of thee."

কিন্তু কোন্ কবিতাটিতে বেশী সৌন্দর্য্য ছুটিয়া উঠি-  
 য়াছে, পাঠক স্বয়ং তাহার বিচার করিবেন। কোথাও বা  
 কবি সৌন্দর্য্যহুটির জগুই সৌন্দর্য্য কবিতানিবন্ধ  
 করিয়াছেন।

“আমি হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না অভিমানে,

নীল নীরদের অঁচল পেতে

শশাঙ্ক শেখর আঁধার রেতে

ভীষ উগ্র তীক্ষ্ণ তড়িৎ চাউনি ধরশান !

অচঞ্চল পদ্ম ফোটা.

পছন্দ নয় আমার ওটা,

বর্ষে যখন, হর্ষে তখন আমার ভাসে প্রাণ  
আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না অভিমান।

‘বেজমতী’ ১১ পৃঃ।

আপনারা নিজালা করিবেন, ইহার মর্যাদা (moral) কি ? উত্তরে বলিব, মরণে যে অশ্রু মূখখানি কুটিয়া উঠে তাহার মর্যাদা কি ? কালনে যে কুসুম হাসে, তাহারই বা মর্যাদা কি ? টেনীসনের কথা(Tennyson) বলিতে হইলে

"So, Lady Flora, take my lay,  
 And if you find no moral there,  
 Go, look in any glass and say,  
 What moral is in being fair.

Oh, to what uses shall we put  
The wild weed flower that simply  
blows ?

And is there any moral shut  
Within the bosom of the rose ?”

( २ )

শোক-সঙ্গীতের প্রথান কবিতা “শ্রাশানে  
সম্ভাবণ”। ইহা “প্রেম ও কুলের” অন্তর্গত। উহা  
১২২৪ সনের ফাল্গুনে প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত  
হইয়াছিল। কবির প্রথম পত্নী সারদামুন্দরীর মৃত্যু  
এক ভয়ানক শোকাবহ ঘটনা। ক্ষেত্রবিন্দ দাস মরম-  
সিংহ প্রবাসে ছিলেন। পত্নীর পীড়ার সংবাদ পাইয়া  
অন্তব্যস্ত হইয়া জয়দেবপুরে চলিয়া আসেন, কিন্তু শেষ  
দেখা হইল শ্রাশানের চিতা-অগ্নির মধ্যে। সেই শোকের  
উচ্ছ্বাস বঙ্গ সাহিত্যে করুণার এক শুভ্র প্রজ্জ্বলন—

“সারদা ! এসেছি আমি দেশে পো চাহিয়া,  
আজি কত দিন পরে, কিরিয়া এসেছি ঘরে,  
এই যে নিকটে ডাকি আমি দাঁড়াইয়া  
ওঠ ওঠ আর কেন, শশান শয্যার হেন  
অবতনে ছাই ভস্মে আচ ঘুমাইয়া ?  
সরলা ! আমারি লাগি, নিশিদিন আগি আগি  
আছ ঘূমে অচেতন জান হারাইয়া  
অবতনে ছাই ভস্মে শশানে শুইয়া ।

...                      ...                      ...                      ...

ওঠ ভগ্নি, ওঠ ভাই, ওঠ জায়া, ঘরে বাই  
লহ জননীর যন্ত্রে পিতার আদরে !

সকলের মেহনতির, উছলিরা উঠে ইশু  
তোমার অন্তঃকরণ প্রেমময় করে।  
ভূমি বিনা কেবা আছে, বাইব কাহার কাছে  
প্রিয়তা দেখিছি সব দেশ-দেশান্তরে।

সংসারে বনভা নাই, আছে ভয় আছে ছাই  
আছে রাক্ষসের রাণ্যে ঘৃণা পরস্পরে  
নাই অশ্রু দীন-হুঃখী শোকাক্তের তরে।

অথবা—

আহা গেল সে কোথায় ?

এই যে আছিল বৃকে, হাসি মাখা সোনারূখে

এই যে এখনো তার দাগ দেখা যায় !

... ..

দেখি যেন কাছে কাছে, সে বৃষ্টি এখনো আছে  
নয়নে নয়নে যেন ভাসিয়া বেড়ায়।

... ..

মলয় বাতাসে আসে, চাঁদের কিরণ ভাসে

ফুলের সুরভি খাসে বৃকে আসে যায়

হার ! গেল সে কোথায় ?

—“স্মৃতি-দলীত”।

( ৩ )

ব্যঙ্গ কবিতা ভাষায় এক অপূর্ণ অন্তর। ইহার ইংরাজী নাম স্যাটায়ার (Satire)। বিখ্যাত সমালোচক গোল্ডউইন স্মিথ (Goldwin Smith) বলিয়াছেন—“ব্যঙ্গ রচনা বা স্যাটায়ার ( Satire ) তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যখন লেখক পাপ ও অজ্ঞানের প্রতি বিবদিত্ত বাণ নিক্ষেপ করেন ; দ্বিতীয়তঃ যখন মানব জাতির প্রতি পরিপূর্ণ ঘৃণায় তাহার সমালোচনা করেন ; এবং তৃতীয়তঃ যখন তালি মুখে মানুষের ক্রটি বা ভুলত্রুটি দেখাইয়া বিক্রম করিয়া থাকেন। প্রথম শ্রেণীর উদাহরণ ল্যাটিন কবি জুভেনাল (Juvenal), দ্বিতীয় শ্রেণীর সুইফট (Dean Swift), এবং তৃতীয় শ্রেণীর ল্যাটিন কবি হরেস (Horace)। \*

গোবিন্দ দাসের নিকট পাপের, অজ্ঞাতারের, অবিচারের, ব্যভিচারের প্রশ্রয় নাই। তিনি তাহা কেবল হাসিয়া উড়াইয়া দিতে প্রস্তুত নহেন। বিজ্ঞপেই হউক, রূপকেই হউক, পাপী তাহার তীক্ষ্ণ বিবদিত্ত বাণে আকুলিত। ল্যাটিন কবি জুভেনালের মত তাহার কবিতা-গুলির রচনা-চাতুর্ঘ্যে বা শিল্পকলায় তেমন মনোহারী না হইলেও উহার ভাব ও প্রকৃতি অসম্বল নহে। উক্ত পদ্যরচকের নিকট হীনবীৰ্য্যসম কৃতাজলি ধনপক্ষিতের পক্ষপাতী স্বজাতির প্রতি কি বিবরণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে দেখুন—

“বাল্যলী মানুষ যদি প্রেত করে কর ?

হেন ঘোর মিথ্যাভাবী

অনুগ্রহ অভিলাষী

জগতে ধর্মীর দাস আর কেহ নয়।

হ’তে তার রূপা-পাত্র

কি শিক্ষক কিবা ছাত্র

উকীল ডাক্তার আদি সম্পাদকের,

যারা বড় মাতৃগণ্য

দেশের উদ্ধার লক্ষ

“বঙ্গের উজ্জল আশা” যাহাদেরে কর :

যত তার অবিচার

যত তার ব্যভিচার

যত তার ভয়ঙ্কর কার্য্য পাপময়

is Juvenal. Of cynical satire, springing from bitter contempt of humanity, the type is Swift's Gulliver, while its quintessence is embodied in his two lines on the Day of Judgment. Of Epicurean satire, flowing from a contempt of humanity which is not bitter and lightly playing with the weakness and vanity of mankind, Horace is the classical example.”--Goldwin Smith.

\* “There are three kinds of Satire corresponding to as many different views of humanity and life ; the Stoical, the Cynical, and the Epicurean. Of stoical Satire, with its strenuous hatred of vice and wrong, the type

মহি ১৩৫১

জানিয়া নাহিক জানে

কুনিয়া শোনে না কানে

তাহার প্রশংসা গানে করে জয় জয়

এমন সাতসহীন

ভীক কাপুরুষ ক্ষীণ

বলিতে উচিত কথা সংকচিত হয়,

পাপেরেও বলে পুণ্য

তেন মনুষ্যভরণ্য

এমন করিয়া করে বিবেক বিক্রয়।

এ নীচ নিরয়গামী

সদা ধুলা করি আমি—

দেখিলে এদের মুগ্ধ মহাপাপ হয়।

বাজানী মাহুয যদি পোত কারে কয়?

—“চন্দন—৩৩ পৃঃ”।

কমিদরের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইয়া কবি, সীম  
লাভ হইতে নিরাসিত হইয়াছিলেন। ক্ষমাণ কবি  
সাহেব (H. N. S. S.) বলিয়াছেন “কবিদিগকে দাঁড়াইও না  
তোমার কল্যাণ হইবে না”। সেট অবিচারের প্রতি-  
শোধ নিবার জন্য কবি ১২৯৯ সনে “মবের মূলুক” লিখিয়া-  
ছিলেন। তাহা জাদাঘতের আদেশে ক্ষমা লাভ হইয়া  
হয় না। যদিও উহা আগাগোড়া অতি ভীত জনাপনাদ,  
তথাপি কবিত্ব হিসাবে স্থানে স্থানে তাহার উজ্জল রত্ন-  
রাশি উহাতে নিহিত ছিল। ঐ পুস্তিকা সম্বন্ধে  
আমরা ইহার অধিক আর কিছু বলিতে পারি না।

( ৪ )

তার পর দেশ-প্ৰীতির কবিতাগুলি। অমানিশার  
ক্ষমতার পর উহার আলোকের জ্বালা, বর্ষাকালের  
নিবন্ধ মেঘকালিমার অবসানে প্রফুল্ল শরদ সূর্য্যের জ্বালা,  
কিশানী বিলোপী, বন-মুখী-সুরভি বসন্ত বায়ু-হিম্মতের  
জ্বালা, দীর্ঘ দুর্দিনে, কংস-রাজ্যে অবিচার অত্যাচারের  
বিস্ময়কর পূর্ণ হইলে “পারজাণার হা মাধুনাং বিনাশায়

চ তুচ্ছতাং’ যখন ভগবান্ বাপিরমুগে অবতীর্ণ হইলেন—

কবি “জন্মাষ্টমীতে” তাহার বিবাদ চিত্র দিয়াছেন—

“অরাজক মথুরায় নানা উপদ্রব,

যাতক উদ্যোগে ব্যস্ত পৌরজন সব।

চৌধা হত্যা দম্ভাবলি নানা অত্যাচার,

জায়ের শাদনদণ্ড দেশে নাহি আর।

স্বৈচ্ছাচার ব্যাতিচার কদাচার কত—

একাচারে অত্যাচারে পঞ্চাচারে রত,

অনাসক্ত অবসন্ন অভিশপ্ত জাতি

মোহগন্ত হ্রিয়মন্ত মন্ত আশ্রয়ভাষী।

চারিদিক অন্ধকার : আশার আলোক

নিগারে ফেলিছে যেন দুঃখ রোগ শোক,

বহু অশ্রু শিশ্নবের প্রাবনের মত

উড়িছে পাপের ঝড়ে জনপদ কত

কড়মড় গর্জে এক দৈব অসন্তোষ

বিকাসি অসন্ত দণ্ড বিধাতার বোম;

নন্দদেব দৈবকৌব চরণে শৃঙ্খল

বৈকুণ্ঠে সে শ্রীকৃষ্ণের বোধে কণ্ঠতল।

... ..

বাজিল সে পাঞ্চজন্ম মাঠে: মাঠে:

বিমল বৈকুণ্ঠ বোম কাঁপাটয়া আই।

খুলিল আগেক নীলে বর্গের অর্গল

হাসিল আলোক নীলে নীল নভতল।

দেবতা নন্দনে বর্ষে চন্দন কুসুম

বৃন্দাবনে নন্দালয়ে আনন্দের ধুম।

নারদ পারদ বেশ শারদ বীণার

ব্যাপিয়া ভূতল বোম হরিনার গায়।

পুলকিত ভারতের পুণ্য তপোবন

ঋষিবর্গ অর্পে অর্থ “নমো নারায়ণ”,

আজিও সে ঘরে ঘরে অষ্টমী উৎসব

জনমিলা জগন্নাথ জয় জয় রব।

নব্য ভারত, ১৩১৮, ভাদ্রপদ আশ্বিন সংখ্যা।

প্রথম কংগ্রেসের সময় মিঃ এ. ও. হিউম (Mr. A. O. Hume) ভারতীয় উদ্বোধন করে একটি ইংরাজী কবিতা লিখিয়াছিলেন—

Sons of Ind, why sit you idle  
Wait ye for some Deva's aid  
Buckle to; be up and doing  
Nations by themselves are made." ইত্যাদি।

তখন গোবিন্দ দাস ময়মনসিংহে। তিনি তাহার অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাহা পড়িলে অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না। সত্যই যে জলজ দেশপ্রীতির অঙ্গলি লইয়া কবি স্বর্গাদপি পরীয়সী জন্মভূমির চরণোপাঙ্গে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহা পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন—

“অলস হইয়া বসি ভারত সন্তান !

সাহায্য করিছ ভিক্ষা কোন্ দেশতার ?

উঠ ঘরা, সাধ কার্যা, করহ উত্থান !

সংগঠিত হয় জাতি যত্রে আপনার।

ইত্যাদি।

ইহা ছাড়া বঙ্গ বিভাগের সময় অমিয়না নাথার “বদেহ”, “ভাড়াবর বন”, “স্বাধীনতা” প্রভৃতি গুটি কত কবিতা গোবিন্দ দাস লিখিয়াছেন। আমি সত্যে তাহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছি মাত্র আপনাতা ইচ্ছা হইলে তৎকালীন “নব্যভারত” তাহা পাঠ করিবেন। বিশেষতঃ “বদেহ” নামক কবিতায় সার ওয়াল্টার স্কটের (Sir Walter Scott) প্রণীত ‘লেডি অব দি লেকে’ (Lady of the Lake) ‘রডারিক ডু’র (Roderick Dhu) খেদোক্তির স্থায় অনেক কথা আপনাদের হৃদয়গাহী হইতে পারে।

( ৫ )

সামাজিক কবিতা গোবিন্দ দাসের বেশী নাই। উহাও মধ্যে “বাকু আমার বিয়া” শীর্ষক যে কবিতা আমাদের পত্রিকা ‘প্রান্তর’ \* প্রথম প্রকাশিত হইয়া-

\* প্রান্তর—১৩১৮। প্রাবণ সংখ্যা ১৮৪ পৃঃ।

ছিল তাহাই শ্রেষ্ঠ উহা বঙ্গবঙ্গ গ্রহণের তীব্র সমালোচনা। মেহলতার বহু পূর্বে মেহমতী কত পিতার কতাদায় কেশে কাতর হইয়া বলিতেছে—

“বাবা! থাকুক আমার বিয়া—

চাইনে আমি এন্. এ. বি.এ. কিন্তে হয় বা টাকা দিয়ে

ভাগল গরুর মত যাদের ছেলো হাতে গিয়া ;

সোণার চেইন্ সোণার দড়ি গরু যাদের গলার পরি

অমন পুত্র কিন্বে নাকো কাণাকড়ি দিয়া।

... ..

থাকুক আমার বিয়া—

চাইনা তত্ত দেশহিতৈষী, ওরাই রক্ত শোষে বেশী

কাপায়ার বাহুড়ের মত বাতাস দিয়া দিয়া

দিক সে ওদের উচ্চ শিক্ষা, দিক ওদের বদেলী দীক্ষা

কিনে হরণে এ পরীক্ষা পুত্রর আয়া নিয়া ?

... ..

থাকুক আমার বিয়া—

বেশে কোলে কাছে বুকে, পালন করে কত দুখে

আজো তোমার মেহ-দয়ায় রয়েছে বাঁচিয়া

সেই তোমারে চিব দুখে ফেলবে মেগো পাশাপাশি বুকে

সে পুত্রকে পতি বলে পূজব জুটাইয়া ?

স্বগা নাই কি নারীর মনে, দিদি নাই নারীর পথে ?

সংঘমে তার সমে ডরায় সরে দাঁড়ায় গিয়া ?

... ..

থাকুক আমার বিয়া—

কার্পেটার, নাইটোপিন, ডোরা, মিটন মিটার হবো ঘোর

থাকব বাবা দীনের সেবার জীবন সমর্পিয়া,

দেশের হবে সুখসুখিয়া, বজ্রভেদে হবে সিধা

নারীর গৌরব বৃদ্ধি হবে, পুত্র গৌরব গিয়া

বাহা পুরুষ, অশ্রীম কর চরণ-দুলি দিয়া ॥

(গ) গোবিন্দ দাসের ছন্দ

গোবিন্দ দাসের ছন্দ প্রধানতঃ একটি, দীর্ঘ ত্রিপদী।

আমরা যত দূর জানি, এই ছন্দের প্রবর্তক কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৎপূর্বে কোন বাঙ্গালী কবি উহা ব্যবহার করিয়াছেন  
বলিয়া আমরা অবগত নহি।

“থারেক এখনো কি রে দেখিবি না চাহিয়া

উন্নত গগনোপরে,

ব্রহ্মাণ্ড উজ্জল করে

“উঠেছে মক্ষত্র কত নব জ্যোতি ধরিত্রা”

প্রকৃত মধুসূদনী কবিতাগুলি দীর্ঘ ত্রিপদীচ্ছন্দে  
লিখিত হইয়াছিল। গোবিন্দ দাস ইহা বাতীত চতুর্দশ  
পদী কবিতাবলি লিখিয়াছেন। তাহা শেকসপিয়ারের  
(Shakespeare) সনেটের (Sonnet) মত প্রায়ই  
প্রমোদিত। কিন্তু হৃদয়ের আবেগ কথার ফুটাইতে, মনের  
গভীর তরঙ্গায়িত বিকোচ তাহার প্রকাশ করিতে,  
স্রোতবর্ণের মনপ্রাপ মুগ্ধ করিতে, কখনো বা ভাবের  
অভিমব সুরার প্রচণ্ড উদ্গমনায় মত্ত করিতে, গোবিন্দ  
দাসের কবিতা দীর্ঘ ত্রিপদীচ্ছন্দেই দেহবদ্ধ করিয়া  
অবতীর্ণ হয়।

আমরা কবি গোবিন্দ দাসের আলোচনা শেষ করি-  
লাম। যদি এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধে কবির প্রতি কিঞ্চিৎ  
কুতূহলেরও উদ্রেক হইয়া থাকে, তবে আজিকার  
প্রত্যন্ত কাল বৃথা ব্যয়িত হয় নাই মনে করিব। ভাও-  
রালের এ বক্ত কুসুম প্রাঙ্গণের বিমল বিশাল  
উপবনে সবদে রক্ষিত প্রাঙ্গণের যোগ্য সন্মত নাই।

আমরা কেবল ইংরাজ কবি গ্রেয় (Gray) ভাবি বলিতে  
পারি—

“সাগর পরতে হার। পড়িয়া আঁধারে.

বিমল উজল শোভা কত মণি ধরে ;

কত ফুল ফুটি হার গোপনে গোপনে

বৃথায় বিতরে বাস বিজন বিগিনে”।

আজ কাল তথা-কথিত কবি-কোলাহলে বাঙ্গালার  
সাহিত্য-বন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। তার মধ্যে যদি  
খাঁটি স্রামার সন্নিহিত দৈবাৎ কণ-কুহরে প্রবিষ্ট হয় তবে  
আর আনন্দের সীমা থাকে না।

যেমন আখিন মাসে সাগরের কলকল হইতে স্রুত  
পল্লীপ্রান্তে ছিন্ন শুভ্রমেষবাহী উত্তর-বাহু পুকুরের কালো  
জল সাঁতার দিয়া, হিজোল বনে হাসির লহরী তুলিয়া,  
অপকু শালিশীর্ষ আনত করিয়া, আকিনার ডালিম  
জ্বলের ঈষৎকম্পিত রক্ত অধরে হাসি ফুটাইয়া ক্লান্ত  
কল শীতল করে, গোবিন্দ দাসের কবিতা তেমনই  
প্রাণ্যকুসুমের গন্ধ বহিয়া, পল্লীকুঞ্জের চিত্র আঁকিয়া,  
কগনপ্রাণী পাণিরায় মত খাঁটি বাঙ্গালার গান গাহিয়া  
আমাদের চিত্তরঞ্জন করে।

শ্রীকামিনীকুমার সেন।

## কর্ম ও চিন্তার স্বাধীনতা

কর্ম ও চিন্তা এই দুইটা পৃথক বস্তু। উভয়ের একত্র সমাবেশ প্রায়শঃ দেখা যায় না। বরঞ্চ একটি আরেকটির অন্তরায়। যিনি সদাই কর্মনিরত, তাঁহার চিন্তা করিবার অবসর কোথায়? এই সব কর্ম্মক্ষেত্রে কদাচিৎ চিন্তাশীল হইতে দেখা যায়। কর্ম ও চিন্তার মধ্যে যেমন, চিন্তার স্বাধীনতা ও কর্মের স্বাধীনতার মধ্যেও তেমন বিরোধ আছে। যে জাতিতে চিন্তার স্বাধীনতা বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয় সে জাতিতে প্রায়ই কর্মের স্বাধীনতার অভাব দেখা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইউরোপ ও ভারতের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতে বাহুবীর কর্ম প্রযুক্তিকে বৈষ্ণব সমাজ-নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, চিন্তা-প্রযুক্তিকে শ্রেয়স্কর করা হয় নাই। পাশ্চাত্য দেশে ঠিক ইহার বিপরীত। তথায় কর্মের স্বাধীনতা প্রচুর, কিন্তু চিন্তার স্বাধীনতা অল্প। স্বাধীনচিন্তকগণ (free thinker) সে দেশের সমাজে হয়; আর এদেশে, জৈনরাশিদ্ধে: প্রমাণাজবান\* বলিয়াও কপিল হিন্দু সমাজে পূজিত,— “সিদ্ধানাম কপিলো মুনিঃ।” গ্যালিলিও বধন বলিলেন যে, পৃথিবী স্থির নয়, চলিতেছে, তখন বাইবেলের অবমাননা করা হইল বলিয়া ধর্ম-যাজকেরা তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিল। হিন্দুদিগের কোন কোন ধর্ম-শাস্ত্রেও পৃথিবী স্থির, উহা হস্তীর ন্যূনতম স্থাপিত, এবং বিধ আধ্যাত্মিক উল্লেখ আছে। কিন্তু গ্যালিলিওর বহু পূর্বে আর্থাভট্ট বধন ভূত্ববৎ-তত্ত্ব আবিষ্কার করিলেন, তখন কেহ তাহাকে বরিয় কারাগারে নিক্ষেপ করিল না, বা শূলে চড়াইল না। \* কেহ যদি

ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, বীতশ্রীষ্টকে পরিভ্রাণা বলিয়া মানে, বাইবেলকে অশ্রুত বলিয়া বীকার করে তাহা হইলেনই যথেষ্ট। তাহার আহারবিহার কাঙ্ক্ষণ

আবিষ্কৃত ভূত্ববৎবাদ অস্বীকার করিয়াছিলেন। অধ্যাপক যোগেশ চন্দ্র রায় তদীয় ‘আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী’ নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, “বোধ হয় তৎকালে (অর্থাৎ আর্থাভট্টের পরবর্তী সময়ে) পৃথিবীর আবর্তন কেহই সাহস করিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেন না।” (৭৭ পৃঃ) কিন্তু এ সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। যে সাহস আর্থাভট্টের সময়ে ছিল, পরবর্তী কালে তাহার বিলোপ হওয়ার কারণ কি? সাহসের অভাবই যে ভূত্ববৎবাদ অস্বীকারের কারণ নহে, তাহা ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ সমান, উহা আধার-বিশেষের উপর রক্ষিত, ইত্যাদি পৌরাণিক মতের খণ্ডন করিতে ভাস্করাচার্য্য কিছুমাত্র বিধা বোধ করেন নাই। আমরা যোগেশ বাবুর গ্রন্থ হইতেই সেই অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। “ভাস্কর জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ‘যদি পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ সমান, তবে চরবর্তী উচ্চ প্রদেশে রবিকে গ্রহণ করিতে বাহুবে কিংবা দেবতার দেধেন না কেন? যদি বল, স্বর্গময় সুরের পর্ততই রাষ্ট্রের কারণ, তবে উহা তখন পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যে থাকে, অথচ দেখা যায় না কেন? পুরাণকারগণ বলেন যে, বেকপর্ন্ত পৃথিবীর উত্তর দিকে অবস্থিত, এবং স্বর্ষ্য তাহাকে প্রত্যহ প্রদক্ষিণ করিতেছে। যদি তাই হয়, তবে কিরূপে আমরা স্বর্ষ্যকে দক্ষিণ দিকে বাইতে দেখি?’ - পৌরাণিক মত যেন সিদ্ধ হইল না, তা বলিয়া পৃথিবী গোলাকার বলিব কেন? \* \* \* ভাস্কর বলিতেছেন,

‘সমো যতঃ স্তাৎ পরিধেঃ শতাংশঃ পৃথী চ পৃথী

নিভরাং তনীমান।

নয়ন্ত তৎপৃষ্ঠগতন্ত কৃত্বা সমেব তন্ত

প্রতিভাত্যতঃ সা।’

\* এ কথা এখানে উল্লেখ করা আবশ্যিক যে, উত্তর ভারতীয় সমাজ ও ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি আর্থাভট্টের



হিসাব উপরই সমস্ত আর হস্তক্ষেপ করিবে না, ইহাই ইউরোপের রীতি। আর, কেহ যদি সামাজিক আচার ব্যবহার মানিয়া চলে, তাহা হইলে সে যাহা কিছু বিশ্বাস করিতে পারে, তাহাতে তাহাকে কেহ কিছু বলিবে না ইহাই ভারতীয় সমাজের রীতি। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা এ কথা স্পষ্টীকৃত করিতে চেষ্টা করিব।

অর্থাৎ যেমন পরিধর শত ভাগ (ক্ষুদ্রাংশ) সমান বোধ হয়, এক বোধ হয় না, তেমনই এই পৃথিবী অত্যন্ত বৃহৎ এবং তাহার তুলনায় মানুষ অতিশয় ক্ষুদ্র বলিয়া পৃথিবীর বতটুকু এককালে দৃষ্টিগোচর হয় ততটুকু সমান বোধ হয়। এতদপেক্ষা “সুন্দর দৃষ্টান্ত বিরল” (৩৪০ পৃঃ)। অন্তর্যমি ভাস্করের এইরূপ আশ্চর্য্য শাস্ত্রমূলক স্বাধীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। “পুরাণে যে পৃথিবীর আধারপরম্পরা বর্ণিত আছে, তার কি? ভাস্কর বলিতেছেন,

‘মূর্ত্তো ধর্ত্তা চেদ্ ধরিত্রা। স্ততোহস্ত স্তস্তাপ্যন্তোহ  
স্তম্বমজ্ঞানবস্থা।

অন্তে কল্পা চেৎ স্বশাঃ কিমাত্তে কিং নো ভূমেঃ  
সাপ্ত মূর্ত্তেশ্চ মূর্ত্তিঃ॥’

অর্থাৎ, যদি এই পৃথিবীর কোন মূর্ত্তিবিশিষ্ট বস্তু বা প্রাণীকরণ আধার থাকিত, তাহা হইলে তাহার একটা আধার, সেই আধারের একটা আধার আবশ্যক হইত, সুতরাং এই অসুমানের অনবস্থা দোষ (যাহার শেষ নাই) হইতেছে। কল্পিত শেষ আধারটাই যদি স্বশাক্তিতে স্থির থাকিতে পারে তবে পৃথিবী পারিবে না কেন? না পারিবার কোন কারণ নাই, কারণ (পৌরাণিক মতে) পৃথিবী অষ্টকর্ত্তি শিবের এক মূর্ত্তি নহে কি? \* \* \* পৃথিবী যদি শূন্যেই অবস্থিত, তবে নীচে পড়িয়া যাইতেছে না কেন? উত্তরে বলিতেছেন, ‘পৃথিবীর আকর্ষণ-মাক্ষণিকতা’ শূন্য হইত শুরু বস্তু পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হয়। তখন আমরা মনে করি, যেন বস্তুটি পড়িতেছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা পৃথিবী কর্তৃক আকৃষ্ট হইতেছে।

কিছুদিন পূর্বে বিক্রমপুরের বঙ্গযোগিনী গ্রামে এক অসাধারণ প্রতিভাশালী নৈয়্যায়িক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অপরিচিত হইলেও, বাঙ্গালা দেশের নৈয়্যায়িকমণ্ডলীর নিকট তিনি সবিশেষ পরিচিত। তাঁহার নাম প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ন। তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে—কিন্তু সে বেশী দিনের কথা নয়। বিক্রমপুর চিরকাল ত্রায়-চর্চ্যার জন্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু তাঁহার মত তীক্ষ্ণধী নৈয়্যায়িক বিক্রমপুরেও ইদানীং বেশী জন্মগ্রহণ করে নাই। কিন্তু তাহার কুট তর্কজাল তাঁহার হৃদয়কে গুচ্ছ করিয়া লইয়াছিল। অবিশ্বাস (scepticism) তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। যৌবনে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন না; এবং প্রকাশ্যতঃ সে কথা প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না \* তিনি বলিতেন “যাহা দেখি না তাহার অস্তিত্বে পৃথিবীর চারদিকেই সমান আকাশ, উহা কোথায় পড়িবে? পৃথিবীর যেখানেই যিনি থাকুন, তিনি ইহাকে তলস্থ এবং আপনাকে উপরে স্থিত মনে করেন। পৃথিবীর ব্যাসের দুই প্রান্তে দুই মনুষ্য, নদীতীরে দণ্ডায়মান পুরুষ ও ছায়ায় ছায় অধঃশরদ্ধ থাকেন। আমরা এখানে যেমন দাঁড়াইয়া আছি, অধঃস্থিত মনুষ্যেরাও তেমনই অনাকৃণ্ণ ভাবে স্থির আছেন।” (৩৪২ পৃঃ) ভাস্করের ছায় তাহার পূর্ববর্ত্তীরাও এই সব বুদ্ধিপ্রয়োগ করিয়াছেন। এই সব পাঠ কারলে কি সাহসের অভাব হুঁচত হয়! ফলতঃ আর্থাভ্যুত্থের ভূত্মমণবাদ স্বীকার কাংবার কারণ ইহাই বলিতে হইবে যে, পরবর্ত্তী আচার্য্যো বুদ্ধি-প্রণালী অনুসরণ করিতে পারেন নাই। লক্ষ আর্থাভ্যুত্থের শিষ্য, কিন্তু তথাপি তিনি যাহা বুঝিয়াছেন তাহা স্বাধীন ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন,—শূন্য মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।—লেখক

\* বলা আবশ্যক যে, পরিণত বয়সে তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস পরিবর্তন হইয়াছিল। শেষ জীবনে তাঁহাকে কীর্ত্তন করিতে করিতে মুর্ছা যাইতে আমরা দেখিয়াছি।

বিশ্বাস করিতে পারি না। ঈশ্বরকে দেখি না, সুতরাং তিনি যে আছেন তাহাও বিশ্বাস করি না। কিন্তু স্বর্গকে প্রতিদিনই দেখি—অতএব ‘ভগবতে শ্রীস্বর্গায় নমঃ’। কিন্তু এই কারণে তিনি সমাজে নিন্দিত হন নাই। কেহ তাহাকে ‘একধরে’ করে নাই। কিন্তু তাহাকেও সামাজিক লাহনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। সে কখন? যখন ত্রিপুরারাজ ক্ষত্রিয়দের দাবী করিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট পাতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং ত্রিপুরা রাজবাটীতে জলগ্রহণ করিবার জন্ত তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তখন অনেকানেক পণ্ডিতেব সহিত তর্করত মহাশয়ও সে আমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছিলেন। যে দিন তিনি এত কার্য করিলেন, তাহার পরদিন তটতেট গিক্রমপুরে তাঁহার হুকু বহু হইল। তাহার সঙ্গ পাণ্ডিত্য, তাঁহার নিম্নলিখ চরিত্রে, তাঁহার শিশুভনোচিত সরলতা কিছুই তাঁহাকে সামাজিক নির্ধ্যাতনের হস্ত তটতে রক্ষা করিতে পারিল না। তিনি যে বিক্রমপুরের অসঙ্গান তাহা বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণ সমাজ ভুলিয়া গেল। যতদূর মনে পড়ে, পরিশেষে বোধ হয় তাহাকে এত অপরাধের জন্ত প্রারম্ভিক করিতে হইয়াছিল। সে বাহা হউক, এত ঘটনা হইতে দেখা গেল যে সামাজিক বিধি ভালই হউক আর মন্দই হউক—তাহা উল্লঙ্ঘন করিলে হিন্দুসমাজের নিকট ক্ষমা নাই। এবং যে কোনরূপ ধর্ম বিশ্বাস—ভালই হউক বা মন্দই হউক তাহা গোপন বা প্রচার করিলে হিন্দুসমাজের নিকট দণ্ড নাই। ইউরোপীয়েরা বলেন যে, ‘ইহা কপটতা ও কুসংস্কার। ধর্ম তোমাদের সমাজে কখনও সভ্য করিয়া দেখা দেয় নাই, সেই জন্তই যে বাহা ইচ্ছা বিশ্বাস করিয়া বা অবিশ্বাস করিয়া সারিয়া বাইতে পারে। তোমাদের সমাজ বহিরাচরণ নিয়া এতই ব্যস্ত যে ভিতরের জিনিষ খুঁজিয়া দেখেনা। তাহার ফলে কপটতাই প্রকাশ পাইয়া থাকে।’ চিন্তার স্বাধীনতা যে কি বস্তু তাহা তোমরা জানেনা, তাহাদের পক্ষে একপ বলাই

স্বাভাবিক। আমার ধর্মবিশ্বাসের জন্ত আমিই দাবী। আমি যদি অসত্যে বিশ্বাস করি, তবে আমিই তাহার ফল ভোগ করিব—সমাজ করিব না। সমাজের সহিত আমার কর্মের সম্পর্ক। সমাজ আমার কর্মের ফল ভোগ করে। সুতরাং সে আমার কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করুক—আমার বিশ্বাসের উপর, আমার চিন্তার উপর সে যেন হস্তক্ষেপ না করে। কারণ আমার বিশ্বাস বা মতামতের বিচার করিবার অধিকার সমাজের নাই। \* তাহাই হিন্দুদিগের কথা।

\* Cf. Lecky—“The man who with realising earnestness believes the doctrine of exclusive salvation, will habitually place the dogmatic above the moral element of religion, \* \* \* he will judge men mainly according to their opinions, and not according to their acts. \* \* \* On the other hand, men who have been deeply imbued with the spirit of earnest and impartial enquiry, will invariably come to value such a disposition more than any particular doctrines to which it may lead them; they will deny the necessity of correct opinions; they will place the moral far above the dogmatic side of their faith; \* \* \* they will value men according to their acts, and not at all according to their opinions. The first of these tendencies is essentially Roman Catholic. The second is essentially rationalistic. —Rationalism in Europe vol. II P. 89, 90. (The italics are ours.) লেঙ্কি এখানে কেবল রোমানক্যাথলিকদিগকেই নির্দেশ করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে এ বিষয়ে সকল খৃষ্টানই সমান দাবী। প্রোটেষ্ট্যান্টরাও রোমান ক্যাথলিকদিগের জার exclusive salvationএ বিশ্বাসী। দাবী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, ‘New Testament’এ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনও বিজ্ঞান বা শিল্পের প্রশংসা নাই। কিন্তু এমন বিজ্ঞান বা শিল্প নেই, বাহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোরণ বা হিবিশের গহবাক্য দ্বারা অনুমোদিত এবং উৎসাহিত নহে।

বর্ষ ১৯৭১

যাহা হউক, কোন্টা ভাল কোন্টা মন্দ তাহা বলা স্পষ্টতঃ আমাদের উদ্দেশ্য নহে। উত্তর আদর্শ যে পৃথক তাহা বুঝানই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। অনেকের এই পার্থক্যবোধই নাই। সেই জন্যই এই গ্রন্থের অবতারণা। অনেকে মনে করেন যে, সকল বিষয়েই যখন ইউরোপীয়দিগের স্বাধীনতা দেখা যায়, তখন তাহাদের চিন্তার স্বাধীনতাই বা থাকিবে না কেন? কিন্তু ইহা ভ্রম। আবার অনেকে মনে করেন যে, সকল বিষয়েই যখন হিন্দুদিগের স্বাধীনতার অভাব দেখা যায়, তখন চিন্তার স্বাধীনতাই বা তাহাদের থাকিবে কেন? ইহাও ভ্রম। অল্পদিন হয়, মাজাজ হাইকোর্টের এক প্রসিদ্ধ বিচারপতি,—জটিস শঙ্করান মায়ার—হিন্দু সমাজ ও ধর্মের প্রতি এক তীব্র আক্রমণ করিয়াছিলেন। অতি কঠোর ভাষায় হিন্দুধর্মকে গালাগালি দিয়াছিলেন। অত্যন্ত কথার মধ্যে তিনি এ কথাও বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের কখনও চিন্তার স্বাধীনতা ছিল না। বড়-দর্শনের বেশে চিন্তার স্বাধীনতা ছিল না, এ কথা একজন শিক্ষিত এবং শিক্ষিতাভিমानी ব্যক্তি বলিতে পারে, তাহা ধারণা করাও সহজ নহে। কিন্তু বিবেচনামূলক অঙ্গ করিয়া কেলে, বিচারপতিকে আচ্ছন্ন করে। স্পষ্টই দেখা যায় যে, তিনি বিবেচনামূলক চিন্তা ও ধর্মের স্বাধীনতা এ উত্তরের পার্থক্য বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

ইউরোপের সর্বপ্রধান মনীষিগণ, ইউরোপের ভলটেরার ভারউইন বুকনার, ক্লারারন, ভিক্টর হগেনকুল বর্তমান কালে ক্রান্তানী দ্বারা কটুভাবে এবং অভিশপ্ত \* \* \* ইউরোপে বা কিছু উন্নতি হয়েছে, তার প্রত্যেকটাই ঐ-ধর্মের বিপক্ষে—বিরোধ বাহ্য। আজ যদি ইউরোপে ক্রান্তানীর পক্ষি থাকত, তাহলে 'পার্টের' এবং 'ককে'র দ্বারা ইহা-মিসকলকে জীবন্তে পোড়াত; এবং তার-ইহা-মিসকলকে পুড়ে দিত। (প্রোচ ও পান্ডাত্য, চতুর্থ বর্ষ, ১৩০ পৃঃ)।

এই চিন্তার স্বাধীনতাই ভারতবর্ষের এত স্পষ্টতার ভেতর, এত বর্ণবিখারের বৈচিত্র্যের অন্ততম কারণ। “বেদাঃ বিভিন্নঃ স্তব্রো বিভিন্নঃ, নাসৌ দুর্নিবৃত্ত সত্যং ন তিন্নং।” তিনি যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন তিনি তাহাই প্রচারিত করিয়াছেন; কেহ তাহাতে বাধা দেয় নাই। এবং এই জন্যই ভারতে সাম্প্রদায়িক কলহ থাকিলেও নির্ধ্যাতন (persecution) অতি অল্পই ছিল। Inquisition ইউরোপেরই প্রতিষ্ঠান, ভারতের নহে। ভারতবাসীরা ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিয়া বান নাই। কিন্তু বিদেশীয় ঐতিহাসিকেরাও ভারতে বর্ণবিখারের অন্ত নির্ধ্যাতনের অভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন।\*

কোন বিশেষ সম্প্রদায়ই এক মাত্র মুক্তির অধিকারী, অপরে নয়,—এই মতবাদ (Doctrine of Exclusive salvation) ইউরোপেই স্পষ্টতঃ এবং ইউরোপের প্রবল পরধর্মবিষেধ ও তন্মুখিত নির্ধ্যাতনের ইহাই মূলভূত কারণ। † যে দেশে চিন্তার স্বাধীনতা নাই, সে দেশেই ঐক্য মতবাদ প্রতিষ্ঠান করিতে পারে, অতঃপারে না। ভারতবর্ষে কখনও তাহা পারে নাই। পরন্তু

• The wonder is that persecutions were so rare and that as a rule the various sects managed to live together in harmony, and in the enjoyment of fairly impartial official favour.—Vincent Smith's *Ancient India* P. 191.

† “If men believe with an intense and realising faith that their own view of a disputed question is true beyond all possibility of mistake, if they further believe that those who adopt other views will be doomed by the Almighty to an eternity of misery, which with the same moral disposition but with a different belief, they would have escaped, then men will sooner or later persecute to the full extent of their power.—Lecky, *Rationalism in Europe* vol II pp. 1-2.

ভারতে অধিকারভেদবাদেরই প্রভাব বৃষ্টিপোচর হয়।  
\* উহাই প্রাচীনকালে এ দেশে ধর্মবিষয়ের তীব্রতা  
কমাইয়া দিয়াছিল। ভারতের আশ্চর্য পরধর্মসহিষ্ণুতার  
মূলে উহাই যে বিশেষ ভাবে বর্তমান ভবিষ্যে সম্প্রদায়  
নাই। বাহ্য হউক, ভারতে অসাধারণ সম্প্রদায় বা মতবাদ  
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া ভারতবাসীর লক্ষিত হইবার  
কোন কারণ নাই।

এই দুই ভিন্ন আদর্শের অঙ্গুলীলনের ফলও ভিন্নরূপ  
হইয়াছে। ভারতবর্ষ চিন্তাবীরের এবং ইউরোপ  
কর্মবীরের লীলাভূমি হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক সামান্য  
কথারই ব্যতিচার আছে। ভারতবর্ষে চিন্তাবীরের  
আধিক্য বৃষ্টি হইলেও, সেখানে কর্মবীর একেবারেই  
অগ্রহণ করে নাই, এ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। শিল্পলিপি,  
ভাষ্যশাসন প্রভৃতি হইতে ভারতের ইতিহাস অল্পে অল্পে  
আবিষ্কৃত হইতেছে। বিদেশীয়েরাই সে কার্য সম্পাদন  
করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারাও সম্রাট সমুদ্রগুপ্তকে  
ভারতবর্ষীয় নেপোলিয়ান বলিয়া অভিহিত করিয়া  
থাকেন।† নেপোলিয়ানকে কর্মবীর বলিলে, সমুদ্র-  
গুপ্তকেও কর্মবীর বলিতে হইবে; তাহা না হইলে  
তুলনার সার্থকতা থাকে না। কিন্তু ভারতীয় নরপতি-  
বর্গের মধ্যে সমুদ্রগুপ্তকেই একমাত্র কর্মবীর বলিয়া মনে  
করিবার কোনই কারণ নাই। প্রাচীন ভারতে তত্ত্বল্য  
পন্থাক্রমশালী আরও অনেক দিগ্বিজয়ী নরপতির অত্যাশ্রয়  
পরিলক্ষিত হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, অশোক, বিতীর  
চন্দ্রগুপ্ত, হর্ষবর্দন, ধর্মপাল, রাজেন্দ্র চোল প্রভৃতির নাম  
সমুদ্রগুপ্তের সহিত একত্র উল্লেখ করিলে দোষ হয় না।  
এতদ্বিধা, বাহ্য পাহাড় কাটরা অলম্বার গুহা নির্মাণ  
করিয়াছিলেন, অতি হৃদয় কাঙ্ক্ষারসম্বিত হালেবিনের :

(Halibid)মন্দির গঠন করিয়াছিলেন,আহাণ নির্মাণ করিয়া  
সমুদ্র পার হইয়া বৃহত্তর ভারতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন,  
তাঁহারা কর্মবিমুখ ছিলেন, এ কথা বলাও সম্ভব হয় না।  
আজ ইউরোপ সমগ্র জগতের পণ্যসম্ভার বোণাইতেছে।  
এমন দিন ছিল যখন ভারতবর্ষই ঐ কার্য করিত।  
+ ভারতীয় মসলিন. ভারতীয় রঞ্জিতবস্ত্র পৃথিবীর  
সমস্ত পণ্যবোধিকার গৌরবের আসন গ্রহণ করিয়াছিল।  
মুত্তরাং এ কথা কেমন করিয়া বলা যায় যে  
ভারতবর্ষে কর্মবীর কখনও জন্মে নাই। পক্ষান্তরে,  
ইউরোপে কর্মবীরের আধিক্য বৃষ্টি হয় বলিয়া সে দেশে  
চিন্তাবীর একেবারেই জন্মে নাই, এরূপ সিদ্ধান্ত করাও  
অজ্ঞান। যে দেশে ক্যান্ট, হেগেলের মত দার্শনিক জন্ম  
গ্রহণ করিয়াছেন, 'চিন্তা-জগতে সে দেশের স্থান নাই, এ কথা  
বলাও নিতান্ত হুঃসাহসের কর্ম। আমাদের সেম্প  
অভিপ্রায় নহে। আমরা এই মাত্র বলিতে চাই যে,  
ভারতের বেটনী চিন্তাবীরের এবং ইউরোপের বেটনী  
কর্মবীরের আবির্ভাবের সহায়তা করে। সুকলা  
সুকলা বঙ্গভূমি কৃষিকার্যের উপযোগী। কিন্তু এ কথার  
এরূপ অর্থ না যে, রাজপুতানা বঙ্গদেশের মত সুকলা  
সুকলা নয় বলিয়া তথায় শস্ত একেবারেই জন্মে না।  
ইহার এই মাত্র অর্থ যে, এখানে বাহ্য অবস্থানকৃত,  
সেখানে তাহা আশ্রয়লাভ।

† Broadly speaking, there were three great discoveries in applied chemistry to which India owed her capture of the world-markets : (1) the preparation of fast dyes for textile fabrics by the treatment of natural dyes like manjistha with alum and other chemicals ; (2) the extraction of the principle of indigotin from the indigo plant by a process, which, however crude, is essentially an anticipation of modern chemical methods ; and (3) the tempering of steel in a manner worthy of advanced metallurgy, a process to which the mediaeval world owed its Damascus swords.—R. K. Mookerjee, quoted in Sarkar's "Positive Background of Hindu Sociology". (Panini Office) P. 79

\* India has always taught that Truth is absolute, but there are many ways of realising it.—Havell's *Ideals of Indian Art* p. 12.

† See Vincent Smith's *Ancient India*.

‡ Ferguson's *History of Indian Architecture* Vol. I. 148.

বর্ষ ১৯২১

ফরিস শকরান নারায় চিন্তার স্বাধীনতার অভাব ছিল বলিয়া ভারতের যে শিক্ষা করিয়াছেন, সে শিক্ষার যদি কোন উপযুক্ত পাত্র থাকে, তবে তাহা ইংলণ্ড। ইউরোপের আর কোন দেশেই এতদূর চিন্তার বৈজ্ঞানিক দেখা যায় না। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক ও সমালোচক টেইন (Taine) লিখিয়াছেন—

The English have moralists, psychologists, but no metaphysicians : if there is one—Hamilton, for instance, he is a sceptic in metaphysics, he has only read German philosophers to refute them ; he regards speculative philosophy as an extravagance of visionaries, and is compelled to ask his readers for the strangeness of his matter, when he tries to understand somewhat of Hegel's conceptions. The English, positive and practical men, excellent politicians, administrators, fighters and workers, are no more suited than the ancient Roman for abstractions of subtle dialectics and grand systems. —History of English Literature Vol II. pp. ?

তাৎপর্য—ইংলণ্ডে নীতিশাস্ত্রবিদ মনস্তত্ত্ববিদ, আছেন, কিন্তু দার্শনিক নাই। যদি কেহ থাকেন—যেমন হামিল্টন—তিনিও দর্শন শাস্ত্রে অবিশ্বাসী। তিনি জ্ঞান দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছেন,—তাহার প্রতিবাদ করিবার জন্য। দর্শন শাস্ত্রকে তিনি বাস্তবজ্ঞানহীন কল্পনামূলক লোকের উৎকট প্রচেষ্টা বলিয়া মনে করেন। তিনি যখন বেগেলের চিন্তা কথকিৎ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেখানে পাঠকবর্গের নিকট ( আগের ) এই বলিয়া কৈকিরৎ দিয়াছেন যে, তাঁহার বক্তব্য বিষয় কিছু অস্বাভাবিক। ইংরেজেরা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি সম্পন্ন কর্মজীবী লোক ; তাঁহার উৎকট রাসনৈতিক, রাজনৈতিক, বোদ্ধা, এবং কর্মী। স্বল্প ভর্তুকি এবং উন্নত চিন্তাশ্রমের দীর্ঘ সময় প্রয়োজনীয় করিবার প্রয়োজন। রোমানদেরও ছিল না, ইংরেজদেরও নাই।

একজন ইংরেজের সহিত কথোপকথন হলে টেইন জন ইয়ার্ট মিলের দার্শনিক মতের সমালোচনা করিয়াছেন। উক্ত সমালোচনার ভূমিকার সেই কল্পিত ইংরেজকে লক্ষ্য করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

You ( i. e. the English ) lack philosophy,— I mean what the Germans call metaphysicians. You have learned men, but no thinkers. Your God impedes you. He is the supreme Cause, and you dare not reason on causes, out of respect for him. Ibid pp. ?

তাৎপর্য—তোমাদের ( ইংরেজদের ) দর্শন শাস্ত্রের অভাব ( নীতিশাস্ত্র নয়, মনস্তত্ত্ব নয় )—জ্ঞানশ্রমের বাহ্যিক দর্শনশাস্ত্র বলে তাহারই অভাব। তোমাদের মধ্যে সুপণ্ডিত লোক আছেন, কিন্তু দার্শনিক নাই। তোমাদের ঈশ্বরই তোমাদিগকে বাধা দেয়। তিনি আদি কারণ ; সুতরাং তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য বিশ্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিচার করিতে সাহস কর না।

কয়েক বৎসর হইল এই ঢাকা নগরীতে ‘অভেদানন্দ খামা’ নামধারিণী এক মার্কিন রমণী বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ছিলেন। বক্তৃতায় তিনি অগৎকারণ ব্রহ্মকে It বলিয়াছিলেন। যিনি আদিকারণ, তাঁহাকে Heও বলা যায় না, Sheও বলা যায় না। তাহাতে সংকীর্ণতা আসে ; অনন্তত্ব ধর্ম হয়। তিনি যদি পুরুষ হন, তবে রমণী কি তাঁহার বাহিরে ? আর, তিনি যদি রমণী হন তবে পুরুষ কি তাঁহার বাহিরে ? তিনি নামরূপের অতীত। তবে শব্দ দ্বারা যদি তাহাকে বুঝাইতে হয়, তবে তাঁহাকে It বলাই সঙ্গত। ইহাই তাঁহার বুদ্ধি। এ বুদ্ধি এ দেশের লোকের নিকট কিছু নূতন নয়। বৈদান্তিকেরা চিরকাল এই জাতীয় অনেক কথা বলিয়া আসিয়াছেন। সেই সত্য একজন ইংরেজ পাত্রি হিসেবে। বক্তৃতাকে তিনি পাড়াটরা বলিলেন যে, বলা ঈশ্বর

নিন্দারূপ ঘোর পাতকের কার্য (blasphemy) করিয়াছেন। অতএব তাহাকে মরকে বাইতে হইবে। এখন দেখুন টেইন যে বলিয়াছিলেন যে দর্শনালেচনার জৈবরই ইংরাজদিগের প্রধান অন্তরায়, তাহা ঠিক কি না। ইহারা ভগবানকে It বলিলেই অস্থির হন, তাহারা জৈবর সম্বন্ধে বিচার বিতর্ক করিবেন কি রূপে। যদি কেহ করেন তবে তাহাকে সামাজিক নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়।

ইংলণ্ডে এ দিকে যে রূপ চিকার দৈন্য অপর দিকে সেইরূপ অপরিণাম কার্য্যাত্মক। কর্ম-ভগতে ইংরাজদিগের প্রতিবন্ধী ইউরোপেও নাই। কি করানী, কি জর্পণ, কেহই কর্মক্ষেত্রে ইংরেজদিগের সমকক্ষ নহে। কর্মের স্বাধীনতার প্রসারও ইংলণ্ডে অপেক্ষা আর কোথায়ও অধিক দৃষ্ট হয় না। এই স্বাধীনতা-প্রিয়তার জন্যই প্রতিবেশী কি করে, কোথায় যার ইত্যাদি বিষয়ে কোন প্রকার কৌতূহল প্রদর্শন ইংরাজদিগের নিকট নিতান্ত নিন্দনীয়। ইংরেজেরা অভিযয় মৌনী (taciturn), তাহারা কাহারও সহিত আলাপ পরিচয় করিতে ভাল বাসেন না, এই বলিয়া অনেকে তাহাদের নিন্দা করিয়া থাকেন বটে; কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতার একান্ত অহুসরণই যে ইহার কারণ, সকলে তাহা প্রমাণ করেন না। ব্যক্তিগত বিষয়ে কোন প্রকার অহুসন্ধান তাহারা তাহাদিগের কর্মের স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ বলিয়া বিবেচনা করেন। দুই ব্যক্তি একত্র এক গলিতে সারাজীবন বাস করিয়াও একে অন্দের নাম জানেন না, এরূপ ঘটনা ইংলণ্ডে বিরল নহে। বিলাত-প্রবাসী অনেক ভারতবাসীও ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন। রাত্রে ঘাটে দুই ব্যক্তির সাক্ষাৎ হটলে পরস্পরের নাম জিজ্ঞাসাও নিষিদ্ধই, কে কোথায় যায়, তাহাও 'জিজ্ঞাসা করা রীতি-বিরুদ্ধ। একবার একজন উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী জাহাজে ঢাকা যাইতেছিলেন। একজন ইংরেজও সহবাত্রী ছিলেন।

সে দিন ইংরেজ ভ্রমলোকটী বীর জাতীয় পদ্ধতি কিংব-পরিমাণে উন্নয়ন করিয়াছিলেন; ঐ বাঙ্গালী ভ্রমলোকের সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া বিবিধ বিষয়ে কতক মন খুলিয়া আলাপ করিয়াছিলেন। যখন বাঙ্গালী ভ্রমলোকটী মনে করিলেন যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনিও কি ঢাকা যাইতেছেন? উত্তরে ইংরেজটি বলিলেন, 'That's my business' 'সে আমার কাজ'; তাহা জানিবার ভূমি কে! যদি প্রয়োজন হইত, তবে ত আমিই তোমাকে বলিতাম। যখন বলি নাই, তখন তোমার জিজ্ঞাসা করা অত্যাচার হইয়াছে। আমার বলিবার বাধা থাকিতে পারে। যে কার্য্য আমি করিতে চাই না, তুমি প্রশ্ন করিয়া আমাকে সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইতেছ। তুমি আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ করিয়াছ।" ইহাই কি এই প্রকার অন্তর্নিহিত ভাব নহে? এই সঙ্গে আরেকটা দৃষ্টান্তও উল্লেখযোগ্য। একবার একজন উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী কলিকাতা যাইতেছিলেন। তিনি ব্রাহ্ম। সেই সময়ে তাহার বিবাহের কথাবার্তা চলিতেছিল। পরে জানা গিয়াছিল যে তিনি পাণ্ডী দেখিতে অথবা কোর্টশিপ করিতেই কলিকাতা যাইতে-ছিলেন। জাহাজে অনেক পরিচিত লোকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়, সকলেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল 'কোথায় যাইতেছেন?' 'কেন যাইতেছেন?' দেখা গেল যে তিনি শেখোক্ত প্রস্তাব উত্তর দিতে অনিচ্ছুক। উত্তরে তিনি সকলকেই বলিতেছিলেন যে, একটু বিশেষ প্রয়োজনে তিনি কলিকাতা যাইতেছেন। কিন্তু বহুবর্ণের কৌতূহল কি তাহাতে ধামে? তাহারা 'ফি প্রয়োজন' বলিয়া বারংবার পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি এই প্রকার প্রশ্নে বড়ই বিরক্ত হইতেছিলেন, কিন্তু তথাপি কেহই নিবৃত্ত হইলেন না। অবশেষে, তিনি যখন কিছুতেই উত্তর দিলেন না, তখন সকলেই 'লোকটা বড়ই অসামাজিক' এইরূপ মানসিক টিপ্পনি করিয়া নিরন্ত হইতে বাধ্য হইলেন। বিলাতেই



বর্ষ ১৩২১

বা এরূপ কেন আর এখানেই বা এরূপ কেন? সেখানে কর্মের স্বাধীনতার প্রতি একান্ত অস্বাভাবিক এবং এখানে তাহার অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। ভারতীয় প্রথার স্বপক্ষে যে কিছু বলিবার নাই, তাহা নহে। ভারতীয় সমাজে যে হস্ততা, যে অস্বাভাবিকতা বৃষ্টি হয়, তাহা অত্যন্ত হ্রাসিত। কাহারও পীড়া হইলে গ্রামসভা লোকে তাহার তত্ত্বাবধান লভ্য হয়। বিলাতে পীড়িতের বন্ধুবর্গ কার্ড রাখিয়া আসে। কাহার বাটীতে উৎসব হইলে সামাজিক লোকেরা অবাচিত ভাবে আসিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহায়তা করে। বিলাতে হোটেল নিয়ন্ত্রণ দেওয়া হয়। ফলতঃ ভারতে সমগ্র সমাজটাই যেন একটি বৃহৎ পরিবার। সম্পদে বিপদে একে অন্নের সাহায্য করাকে সকলেই প্রথম কর্তব্য বলিয়া মানে। কিন্তু যে উপকার করে সে আবার কিছু আদায়ও করে। সমাজের নিকট ব্যক্তির কিছু গোপনীয় থাকিতে পারে, সমাজের বার্ষিক ছাড়া ব্যক্তির কোন বার্ষিক থাকিতে পারে, ভারতীয় সমাজ তাহা স্বীকার করে না। এই জন্য বাহা সমাজের অনুমোদিত নয়, তাহা ব্যক্তির পক্ষে করা অসম্ভব। কাজেই ভারতে কর্মের স্বাধীনতা সূচীত হওয়া অবশ্যস্বাভাবিক কিন্তু ইংলেণ্ডে ব্যক্তিরই প্রাধান্য, বাস্তবিক ব্যক্তিগত সভ্যতার (individualism) চরমোৎকর্ষ ইংলেণ্ডেই বৃষ্টি হয়।\* অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামাজিক আচার হইতে সর্বত্র বিবিধাচারের পশ্চাতেও এই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের চেষ্টা নিহিত রহিয়াছে। কাহারও পকেটে হাত না

দেওয়া, কাহার চিঠি খুলিয়া না দেখা, কাহারও বিনামূল্যে গৃহে প্রবেশ না করা, কাহারও পরিচয় জিজ্ঞাসা না করা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচারের মূলেও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সুপরিচ্ছিন্ন; আবার ব্যবহার-ক্ষেত্রে চুক্তির প্রাধান্য, \* সম্পত্তি হস্তান্তরের অবাধ অধিকার, † চরমগত সম্পাদন ক্রমে উত্তরাধিকারের ধারা পরিবর্তন করিয়া দেওয়ার কথ্যতা প্রভৃতি সমস্তই ঐ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি অস্বাভাবিক ফল। এই দুই ভিন্ন আদর্শের মধ্যে কোনটা ভাল তাহা সবিচারে এখানে বিচার করা অসম্ভব। তবে এখানে এই মাত্র বক্তব্য যে, বাহা অন্নের নির্ধারিত নিয়মের চক্ষু মগ্ন করাকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া মানেন, তাহারা ইংলণ্ডের প্রথারই পক্ষপাতী হইবেন; এবং বাহারা সমাজের স্থায়িত্ব কামনা করেন এবং সমাজের স্থায়িত্ব না হইলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহারা ভারতীয় আদর্শের পক্ষপাতী

\* যেখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নাই সেখানে চুক্তির প্রাধান্য থাকিতে পারে না। বেহাম এই চুক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। "Individualistic reformers opposed anything which shook the obligations of contracts, or, what at bottom is the same thing, unlimited contractual freedom of individuals. It is no accident that Bentham very early in his career assailed the usury laws.—Dicey's Law and opinion P. 150. বলা বাহুল্য যে ব্যক্তিগত সভ্যতার উপাসকেরা, চুক্তির প্রভাবেই সামাজিক উন্নতির অত্যন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া মনে করেন। Sir Henry Maine বলিয়াছেন, "The progress of society is from status to contract." (Maine's Ancient Law.) আর কিছু দিন বাচিয়া থাকিলে তিনি বোধ হয় লিখিতেন, "The progress of society is from individualism to collectivism."

† এই সূত্রে ইহাও উল্লেখ করা বাইতে পারে যে, দায়তানে সম্পত্তি হস্তান্তরের কথ্যতা বর্জিত করা হইয়াছে

\* Individualism always found its natural home in England.—Dicey's Law and opinion in England P. 174. ভিত্তিবাদের (utilitarianism) প্রবর্তক বেহামই উনবিংশ শতাব্দীতে individualism এর প্রভাব বর্ধিত করিয়াছিলেন। "The aim of Benthamite reformers was, in short, to secure to every person as much liberty as is consistent with giving the same amount of liberty to every other citizen." Ibid P. 189.

হইবেন। সম্বন্ধবাদের (Collectivism) \* প্রাক্তর্জাবের সময় হইতে ইংলণ্ডেও এই মত অল্পে অল্পে প্রচার লাভ করিতেছে।

এই অপূর্ণ কর্মভংগের জাতির সংস্পর্শে আসিয়া ভারতীয় সমাজের যে পরিবর্তন হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। এই সংঘর্ষের ফলে এক হিসাবে যে আমাদের কর্মের স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সমাজের প্রভাব ধর্ম হইয়াছে। আজকাল অনেকে সমাজিক প্রথা উলঙ্ঘন করিয়া বলে যে, 'সমাজ পারে ত আমাকে শাসিত করুক।' এরূপ বলিবার কারণ এই যে তাহার জ্ঞানে যে সমাজের শাসনক্ষমতা দুর্বল হইয়াছে। সহরে ত উহা একেবারে লুপ্ত হইয়াছে বলিলেই চলে। গ্রামেও উহার আধিপত্য কমিয়াছে। গ্রামে দলাদলির

বলিয়া ঠেংরেজ ব্যবহারবিদেরা মিতাক্করা অপেক্ষা দায়-ভাগের অধিকতর গুণগুরুপাতী।

\* (Collectivism curtails as surely as individualism extends the area of contractual freedom. \* \* \* During the latter part of the nineteenth century, the tendency to curtail such freedom becomes clearly apparent. \* \* \* The Landlord and Tenant (Ireland) Act 1870, 33 & 34 Vict. c. 46 and still more the Land Law (Ireland) Act, 1881, 44 & 45. Vict. c. 49 are the negation of free trade in land, and make the rights of Irish landlords and of Irish tenants *dependent upon status, and not upon contract.* (The italics are ours)—Dicey's Law and opinion p. 263. ডাইসী (Dicey) নিজ গ্রন্থে নিম্নলিখিত অর্থে collectivism শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন—"By collectivism is here meant the school of opinion often termed (and generally by more or less hostile critics) socialism, which favours the intervention of the state, *even at some sacrifice of individual freedom*, for the purpose of conferring benefit upon the mass of the people. (The italics are ours)—*Ibid* p. 65.

হুটি হইয়াছে। তাহার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি সমাজ কর্তৃক নিগৃহীত হয় সেও নিজেকে লোক কোটাঁইতে পারে। সুতরাং সমাজের অঞ্চল শাসন এখন একপ্রকার অসম্ভব। কিন্তু ইহাকেও প্রকৃতপক্ষে কর্মের স্বাধীনতার বৃদ্ধি বলিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। কারণ একদিকে আমরা যেখন দেশীয় সমাজের বন্ধন ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছি, অপর দিকে আবার ইউরোপীয় রীতিনীতি, ইউরোপীয় আচার ব্যবহার, ইউরোপীয় আদবকায়দা নির্মিচায়ে গ্রহণ করিবার জন্য অতিমাত্র ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিতেছি। এক প্রভুর পরিবর্তে অপর প্রভুর প্রতিষ্ঠা করিতেছি মাত্র। যে সমাজ সম্রাট ইউরোপীয় সমাজের ভিত্তি প্রকল্পিত করিতেছে, ইউরোপীয় সামাজিক আদর্শ গ্রহণ করিলে, সেই নব সম্রাট, তাহাদের সমগ্র জটিলতা লইয়া যে একদিন আমাদের সম্মুখেও উপস্থিত হইবে, তাহা আমরা ভ্রমেও বিচার করিয়া দেখিতেছি না। বাস্তবিক, কি কর্মক্ষেত্রে, কি চিন্তাক্ষেত্রে, সর্বত্রই আমাদের মানসিক স্বাধীনতার অত্যন্তাভাব বৃষ্টি হয়। ইউরোপের চিন্তারাজ্যে আগষ্ট কম্‌টের যখন একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল, তখন অনেক শিক্ষিত ভারতবাসী 'পজিটিভিস্ট' হইয়াছিলেন। বর্তমান সময়ে বোধ হয় এই মতের গুরুপাতী একজনও এ দেশে নাই। কম্‌টের দার্শনিক মতের জাতি বুঝিয়াই যে এ দেশের শিক্ষিত সমাজ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা নহে। তাহা হইলে, স্বাধীন ভাবে তাঁহার মত খণ্ডনের প্রয়াস দেখিতে পাইতাম। অতএব বুঝিতে হইবে যে ইউরোপে তাঁহার প্রভাব কমিয়া গিয়াছে, এই জন্যই শিক্ষিত ভারতবাসীও তৎপ্রতি হতদর হইয়াছেন। এইরূপ ভ্রূরি ভ্রূরি ভূটাতের উল্লেখ করা বাইতে পারে। যাহা কিছু ইউরোপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহাই উৎকৃষ্ট, তাহাই গ্রহণীয়, এই ভাব শিক্ষিত সমাজের বন্ধাগত হইয়া পাকাইয়াছে। এবং ক্রমশঃ উহা সমগ্র সমাজে ছড়াইয়া পড়িতেছে। যাকে



মাস ১০২১

মানে প্রতিক্রিয়া হইরাছে বটে, কিন্তু তাহা দ্বারী হইবার লক্ষণ দেখা যায় নাই। বলা আবশ্যক যে, ইউরোপের নিকট ভারতবর্ষের কিছুই গ্রহণীয় নাই, আমরা এরূপ মত পোষণ করি না। আমাদের এইমাত্র বক্তব্য যে, ত্যাগ করি, আর গ্রহণই করি, কোন অবস্থাতেই আমাদের মানসিক স্বাধীনতা বিসর্জন দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু বিসর্জন যে দিরাছি, তদ্বিষয়ে কি কিছু সম্বন্ধ আছে? একজন চিত্রাঙ্গীল লেখক বলিয়াছেন যে, ইউরোপ আমাদের উপর এতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, আমাদের শব্দগুলিও ইউরোপীয় ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। \*

পরিশেষে কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, কর্ম ও চিন্তার স্বাধীনতা, এই উভয়ের মধ্যে কোনটী প্রেৰ্ত, তবে আমরা নিশ্চই শেষোক্তটীর নাম করিব। কারণ, চিন্তাই মানুষের বিশেষত্ব। উহাই মানুষকে ইতর প্রাণী হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। উহাই সভ্যতার মুহূর্ত্ত-বলি। যে সমাজে উহার অভাব, সে সমাজ সর্বপ্রকার বৈষয়িক সমৃদ্ধির কেন্দ্রস্থল হইলেও সভ্যতার নিরন্তর স্তরেই তাহার আগুন গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা এই বিষয়ে পুনরায় টেইনের মত উদ্ধার করিব—

\* With the Europeanization of our minds and modes of thinking, even our words have been perceptibly Europeanised—Bopin Chandra Pal's *Soul of India*, pp 145. Quoted by "Arthur Avelon" in his Introduction to the *Principles of Tantra* P. XV.

If some dweller in another planet were to come down here to ask us the nature of our race, we should have to shew him the five or six great ideas which we have formed of the mind and the world. That alone would give him the measure of our intelligence.—Taine's *History of English Literature*, vol II, P. 481.

তাৎপর্য—যদি অপর কোন গ্রহবাসী লোক আমাদের এই পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং আমাদের জাতীয় প্রকৃতি সম্পর্কে জানলাভ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তবে আমরা প্রকৃতি ও পরমেশ্বর সম্পর্কে যে পাঁচ ছয়টি মত বা তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছি, জ্ঞাহাকে আমাদের তাহাই দেখাইতে হইবে। কেবল ক্ষুদ্র তাহাই আমাদের মানন-প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিবে।

কঠিন সমাজ-নিগড়ে আবদ্ধ থাকিয়াও ভারতীয় কন্যাবীরা এইরূপ গোটা করেক তত্ত্ব লগৎ সম্বন্ধে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। \* তাহাই ভারতবর্ষকে চিরকাল অনরতা প্রদান করিবে।

ব্রীউপেন্সচন্দ্র গুহ।

\* (cf. Max Muller. If I were asked under what sky the human mind has most fully developed some of its choicest gifts, has most deeply pondered on the greatest problems of life, and has found solutions of some of them which well deserve the attention even of those who have studied Plato or Kant—I should point to India — *India : What can it teach us?* P. 6.

## চাউলের কথা

কথিত আছে পুরাকালে গাছে ধান ফলিত না, চাউলই ফলিত। ধনধান্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর শাপে চাউলের উপর সাতটা পর্দা জন্মিয়া ধান্যের উৎপত্তি হয়। মানব জাতির সৌভাগ্যক্রমে অভিসম্পাতের বাক্য বিন্যাসে বোধ হয় একটু কঁক ছিল, তাই ধানহইতে রন্ধন-যোগ্য চাউল প্রস্তুত করিতে সাতটা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হইলেও চাউলের পর্দা বা আবরণ যাত্র দুইটি; একটি ভূব, অপরটি চাউলের অঙ্গীভূত লাল অথবা সাদা বর্ণের পরদা। ধানে ভূব ভীর্ণ করিবার ক্রমতা মানবের পাকস্থলীতে নাই; গবাদি পশু পাকস্থলীতে সেই ক্রমতা আছে। তাই ভূব মানবের অথবা ইতর জন্তুর খাদ্য। ভূব ছাড়াইয়া লইলে চাউলের উপর যে দ্বিতীয় আবরণটি থাকে তাহা ধান্যের জাতিবিশেষে কোথাও লাল, কোথাও সাদা; এই আবরণের জন্তই কোনও চাউল লাল এবং কোনও চাউল সাদা হয়। ঢেঁকিতে অথবা উদ্বলনে চাউল ছাটিয়া লইলে ঐ পর্দাটি ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া যায়, ঐ গুঁড়ার চলিত নাম “কুঁড়া”।

**সিদ্ধ চাউল :**—ধান গরম তলে সিদ্ধ করতঃ শুকাইয়া তাহা হইতে যে চাউল প্রস্তুত হয়, তাহারই নাম সিদ্ধ চাউল। যদিও পৃথিবীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোকের এবং এশিয়ার অধিকাংশ লোকের প্রধান খাদ্য চাউল, তথাপি সিদ্ধ চাউল প্রস্তুত করিবার প্রণালীটি কিন্তু এক যাত্র ভারতবর্ষীয় আৰ্য্য জাতিরাই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, চীন, জাপান এমন কি ভারতবর্ষের আসাম, মণিপুর প্রভৃতি দেশের মঙ্গোলীয় জাতিদিগের মধ্যেও সিদ্ধ চাউল অপরিজাত। বাঙ্গালীদিগের চেষ্টায় আসামে ও মণিপুরে ক্রমে সিদ্ধ চাউলের প্রচলন হইতেছে, ধান সিদ্ধ করিলে চাউলের সারাংশ কিয়ৎ পরিমাণে জলের সহিত বাহির হইয়া যায়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা

গিয়াছে ঐ প্রক্রিয়া দ্বারা ( অর্থাৎ সিদ্ধ করিলে ) চাউলের স্নেহ ভাগের শতকরা ৫০ ভাগ, প্রোটিনের ৮ ভাগ, খেতসারের ৮ ভাগ ও লাবণিক পদার্থের প্রায় ১৭ ভাগ সিদ্ধজলের সহিত চলিয়া যায়।

### গমাদির রাসায়নিক বিশ্লেষণ।

( মাসজনক ) স্নেহ- স্নেহ লবণাদি জল খোস ও প্রোটিন্ দার পদার্থ আঁশ বাদে পদার্থ

গম—	১২.৪	৬৭.২	১.৪	১.৮	১৩.৬	২.৫
বব—	১১.১	৬৪.২	২.২	২.৭	১৩.৮	৫.৮
চাউল—	৭.২	৭৬.৫	০.২	১.০	১৩.১	০.৮

### ( সর্কাপেক্ষা কম )

একে ত চাউল গমাদি হইতে অপেক্ষাকৃত সারহীন এবং প্রায় সর্কাংশেই নিরুপ্ত। টেহা হইতেও যদি পূর্বের লিখিত হিসাবে সার পদার্থ চলিয়া যায়, তাহা হইলে কিরূপ ক্ষতি হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমের। তবে সিদ্ধ করিবার প্রক্রিয়ার অগ্নির উত্তাপে চাউলের রন্ধন পর্দাটি শক্ত হইয়া পড়ে, এবং শক্ত হইয়া পড়ে, বলিয়াই ছাটিবার সময় বেশী ভাঙিতে পারে না। সেই জন্ত আতপ চাউলের ন্যায় সিদ্ধ চাউলে তত কুঁড়া হয় না। সিদ্ধ চাউল অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

**আতপ চাউল :**—ধান রৌদ্রে শুকাইয়া ( অর্থাৎ আতপ ) চাউল প্রস্তুত করিলে চাউলের উপরের দ্বিতীয় রন্ধন পর্দাটি অত্যধিক পরিমাণে ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া যায়। তাই আতপ চাউলে অধিক কুঁড়া হয়। কুঁড়া বেশী হইলে চাউলের পরিমাণ কম হয়, এই ক্ষতি নিবারণ করার উদ্দেশ্যেই সিদ্ধ চাউল প্রস্তুতের প্রক্রিয়ার আবিষ্কার।

আতপ চাউল যদি কুঁড়া হুহু রাখিবার বীতি থাকিত তাহা হইলে সারবহার আতপ চাউল সিদ্ধ চাউল হইতে বহু উচ্চ আসন পাইত। বর্তমানে আমরা চাউলের কুঁড়াকে অতি হেয় বস্তু মনে করিয়া পাহারা, হাঁস, ঘোরণ প্রভৃতি পাখিকে খাইতে দেই, নিজের

মাস, ১৯২১

খাই না। মুলনাম চিকিৎসকেরা দৌর্য্যোগে ( বিশেষতঃ বস্ত্রের দৌর্য্যোগ ) চাউলের কুঁড়া অস্থ-  
পাস ও পথ্যরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। কুঁড়ার  
উপাধান :—

শ্বেত সার শতকরা ৪৫ ভাগ।

জল ,, ১১ ভাগ।

লবণাদি ,, ২ ভাগ।

স্নেহপদার্থ ,, ১৪ ভাগ।

প্রোটিন্ ,, ১০ ভাগ।

আঁশ ,, ৮ ভাগ।

মুতরাং কুঁড়া ছাড়িয়া দিলে আতপ চাউল একাত্তই  
হীন হইয়া পড়ে।

শুধু ইহাই নহে— আমরা সাধারণতঃ ভাতের  
ফেন ফেলিয়া দেই। ফেনের সহিতও সারবান পদার্থ  
বহু পরিমাণে চলিয়া যায়। কঠিন আবরণে আবৃত  
থাকে বলিয়া সিদ্ধ চাউলের ফেনে সারভাগ বেশী পরি-  
মাণে বাহির হইতে পারে না, তাই সিদ্ধ চাউলের  
ফেন জলবৎ পাতলা ও প্রায় স্বাদবিহীন হয়। কিন্তু  
ভাতোতেও প্রায় দুই আনা পরিমাণে শ্বেতসার ও  
আম্লজাতিক লবণাদি চলিয়া যায়। আতপ চাউলের  
আবরণ কোবল ও অনেকটা তাক্সা থাকার দরুণ  
ফেনে বহু পরিমাণে সার নির্গত হইয়া যায়। তাই  
আতপের ফেন পাচ ও স্নুমিষ্ট। কোনও কোনও স্থানে  
ভাতের ( বিশেষতঃ আতপ চাউলের ) ফেন শিশু-  
দিগকে খাইতে দেওয়া যায়। হোটেলওয়ালারা  
অনেক সময় ভাতের ফেন মিলাইয়া ভাতের পরিমাণ  
বাড়াইয়া লয়; ইহা অতি উৎকৃষ্ট প্রথা। ইহাতে “শাপে  
বর” হয়। ভাল জল অপেক্ষা ফেন বিশাল শতভাগে  
শ্রেষ্ঠ।

অতি প্রাচীন কালে আমাদের দেশেও কেবল মাত্র  
আতপ চাউলই প্রচলিত ছিল। চরক আদি চিকিৎসা  
গ্রন্থে সিদ্ধ চাউলের নামোল্লেখ নাই। সকল দেশের

লোকই প্রাচীনকাল অতি সম্বানের চক্ষে দেখিয়া  
থাকেন, অঁমরাও প্রাচীন জিনিষকে বিশেষ পবিত্র  
বলিয়া মনে করি। কুশাসন, আতপ চাউল, মধু, চন্দন,  
প্রকৃতি জিনিষ আমাদের চক্ষে যে পবিত্রতা লাভ  
করিয়াছে, আধুনিক আবিষ্কার নানাবিধ আগুন,  
সিদ্ধ চাউল, পরিষ্কৃত চিনি, ও আতর গোলাপ—শ্রেষ্ঠ  
হইলেও তেমন পবিত্রতা লাভ করিতে পারে নাই।  
হিন্দুমাত্রই আতপ চাউলকে অতিশয় শ্রদ্ধা চক্ষে  
দেখিয়া থাকেন। দেবতার ভোগে ও নৈবেদ্যে এক  
মাত্র আতপ ব্যতীত অন্য চাউলের ব্যবহার অশাস্ত্রীয়  
বলিয়া গণ্য হয়। বিধবা ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদিগের  
আহারের জন্য এক মাত্র আতপ চাউলই ব্যবহৃত হয়।  
এক ভাগ চাউল ৫ ভাগ জলের সহিত সিদ্ধ করিতে  
হইবে, ইহাই শাস্ত্রীয় বিধি। একভাগ চাউলে তিনভাগ  
ভাত হয়। শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে আমরা পাক করিয়া  
দেখিয়াছি তাহাতে—৫ ছটাক চাউলে ১৫ ছটাক ভাত ও  
প্রায় অর্ধসের ফেন হয়। প্রাচীনের প্রতি এই কটাক  
পাঠকগণ মার্জনা করিবেন, কিন্তু এত বেশী জল দিয়া  
পাক করিয়া হীন অল্পকে হীনতর করিবার উদ্দেশ্য আমরা  
বুঝিতে পারিলাম না। জাপানীরা চাউল জলে সিদ্ধ  
করে না, জলের উপরে সজ্জিত পায়ে চাউল রাখিয়া  
আমাদের দেশের পিঠক রন্ধন প্রণালীতে বাষ্পের উত্তাপে  
ভাত রাঁধিয়া লয়। এই উৎকৃষ্ট প্রণালীতে বিন্দুমাত্রও  
অপচয় হয় না।

কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমাদের দেশে হইতে ফেন  
ফেলিয়া দেওয়ার প্রথা উদ্ভিন্ন না যায়, এবং আমরা উৎকৃষ্ট-  
তর প্রণালীতে ভাত রাঁধিতে না আরম্ভ করি, ততদিন  
পর্য্যন্ত আমাদের সিদ্ধ চাউলই থাকিয়া উচিত।

উপর্যুক্ত পরি কয়েকবার কলিকাতার ও বাংলা দেশের  
নানা স্থানে আবিষ্কৃত হওয়াতে বেরী-বেরী (Beri-Beri)  
নামক রোগের নাম আজকাল অনেকেরই জানেন।  
বিশ বৎসর পূর্বের কথা বলিতেছি, মেডিক্যাল কলেজ

হাসপাতালে যে সকল বেরী বেরী রোগী আসিত, তাহারা সকলেই চীন। ঐ চীনারা শিদিরপুরের ডকে সূতারের কাজ করিত। চীনারা আমাদেরই মত ডা'ল ভাত খাইত। ঐ ডকে বহু সহস্র বাঙ্গালী কারিগর ও মজুরও কাজ করে। একই স্থানে বাস করিয়া ও প্রায় একই প্রকার খাদ্য খাইয়া কেবল মাত্র চীনরাই ঐ রোগে আক্রান্ত হইত (বাঙ্গালী উড়িয়া প্রভৃতি হইত না) ইহা চিকিৎসক সমাজের একটি সমস্তাবিশেষ ছিল। বেরী-বেরী রোগ জাপানে নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে ও মলয় উপদ্বীপে কুলীমজুরদিগের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল ছিল। মলয়ের কুলী-মজুরেরা কতক অন্নভোজী, কতক অন্নভোজী নহে। একবার তথাকার হাসপাতালের হিসাব খতিয়ান করিয়া দেখা গেল যে, ছয় লক্ষ অন্নভোজী কুলীমজুরের মধ্যে হইতে ৩০ বৎসরে দেড় লক্ষ বেরী বেরী রোগী আসিয়াছে; অপর প্রায় ছয় লক্ষ—যাহারা রুটি খাইত—তাহাদিগের মধ্যে হইতেও প্রায় দেড়লক্ষ রোগী আসিয়াছে, কিন্তু তাহারা বেরী-বেরীর জন্ত নহে। ছয় লক্ষ অন্নভোজীর মধ্যে প্রায় অর্ধেক চীন দেশীয়। অপর অর্ধেক জাপানী, তামিল প্রভৃতি জাতি। চীনারা কলের ছাটা আতপ চাউল খাইত; অপররা আতপ চাউল খাইত বটে, কিন্তু তাহা নিম্নেরা নিম্নের হাতে ঘরে প্রস্তুত করিয়া লইত। দেখা গেল যে, বেরী-বেরী রোগীর শত কড়া ১৭১০ জন কলের চাউল ভোজী চীন। চাউলের সহিত বেরী-বেরীর কোন গুঢ় সম্বন্ধ আছে। এরূপ সম্বন্ধে ডাক্তারেরা চাউল লইয়া নানাপ্রকার পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সালামগুরের (Salamgoor) পাগলা গারদে ফ্লেচার (Fletcher) সাহেব অর্ধেক লোককে কলের ছাটা চাউল ও অর্ধেক লোককে জন্ত চাউল খাওয়াইয়া দেখিতে পাইলেন যে, বেরী-বেরী কেবল কলের ছাটা চাউল ভোজীদিগের মধ্যেই হইতেছে। বাগদানের সহিত বেরী-বেরী রোগের কোনও সম্বন্ধ

আছে কি না তাহা দেখিবার জন্ত, লোকদিগকে পৃথক পৃথক স্থানে রাখিয়া, প্রত্যেক স্থানের অর্ধেক লোককে কলের ছাটা চাউল ও অর্ধেক লোককে অন্য চাউল খাওয়াইয়া দেখিলেন যে, যে স্থানেই থাকুক না কেন যাহারা কলের ছাটা চাউল খাইতেছে, বেরী বেরী কেবল তাহাদিগের মধ্যেই হইতেছে। কলের চাউল উঠাইয়া দিয়া ৬ মাস পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, একটা লোকেরও বেরী-বেরী রোগ হয় নাই। তৎপর কতকগুলি লোককে কিছুদিন কলের চাউল ও কিছুদিন অন্য চাউল খাওয়াইয়া দেখা গেল যে, তাহারা যখন অন্য চাউল খায় তখন বেশ সুস্থ থাকে, কিন্তু যখন কলের চাউল খায় তখনই তাহাদিগের মধ্যে বেরী-বেরী রোগ হইতে থাকে। কলের চাউলের কি দোষে ঐ রোগ উৎপাদনের সাহায্য করে, তাহার বিশেষ অনুসন্ধানের স্থিরীকৃত হইয়াছে যে কলের চাউল অত্যধিক পরিষ্কার বলিয়াই সারহীন হইয়া পড়ে, এবং তাহাতেই বেরী-বেরী রোগ জন্মে।

পূর্বে চাউলের যে রঞ্জিত আবরণের কথা বলা হইয়াছে, তাহারই গায়ে ও অব্যবহিত নীচে চাউলের বাবড়ীর লাবণিক পদার্থ, বিশেষতঃ ফসফরাস (Phosphorus) ও ভাইটেমিন (Vitamine) নামক বীজ্যবান পদার্থ, অবস্থিত। কুঁড়া ভাঙ্গিয়া দূরীভূত হইলে তৎসঙ্গে ফসফরাস ও ভাইটেমিন টুকুও চলিয়া যায়। শোম্যান (Shoman) সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে কিছু চাউলে ফসফরাসের পরিমাণ শতকড়া ৭৫.৪ ও রেডুগী (কলের) চাউলে তাহার অর্ধেকের অপেক্ষাও কম। কলের চাউল দেখিতে সুন্দর করিবার জন্ত বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে ঐ রঞ্জিত পদার্থী সম্পূর্ণরূপে উঠাইয়া ফেলা হয় তাহাতেই রেডুগী চাউল এরূপ হীনবীজ্য হয়। আমাদের দেশীয় আতপ চাউলে পরিত্যক্ত কুঁড়ার সহিত ফসফরাস ও ভাইটেমিন বহু পরিমাণে চলিয়া গেলেও একেবারে শেষ হইয়া থাকিতে পারে না। কারণ চোঁকর ছাটার

। বিশ পক্ষটি কিছুতেই একেবারে দূর হয় না।  
। হাঙ্গি আতপ চাউল সিদ্ধ চাউল অপেক্ষা এই অংশে  
দীন। আতপ চাউলে আর একটু দোষ আছে—প্রভত  
জ্বিয়া করে রাখিয়া দিলে তাহাতেও এক প্রকার  
Fungus জন্মে এবং বেটুকু কক্ষরাস ও তাইটেমিন  
লক্ষণটি থাকে Fungusএ সেইটুকুও খাইয়া ফেলে।  
দুৰ্গন্ধই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে পুরাতন আতপ চাউল  
জড়াইয়া ডেলা বাঁধিয়া যায়। Fungusএর উৎপত্তিই  
ইহার কারণ। আমাদের দেশে গৃহস্থের ঘরে আতপ  
চাউল সঙ্গে সঙ্গে থরচ হইয়া যায় বলিয়াই জমিতে  
পারে না, এবং সেই জন্যই Fungusএর উপদ্রব  
যুটিতে পারে না। নিরন্ত আতপ চাউল ব্যবহার  
করিয়াও আমাদিগের দেশের লোক যে বেরী-বেরী  
প্রভ হয় না, ইহাই তাহার কারণ। ঢেঁকীর সাহায্যে  
যদি আতপ চাউল ছাটা চাউলের ভাৱ পরিষ্কার  
চাউল প্রস্তুত করিতে পারিতাম তাহা হইলে বেরী বেরী  
আমাদের শিত্য সহচর হইত।

চাউলের সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য শেষ হইল।  
আমাদিগের মত এই যে (১) আমাদের পক্ষে সিদ্ধ  
চাউলই শ্রেষ্ঠ। (২) আতপ চাউল খাইতে হইলে  
কাঁচা বাওরা চাই। (৩) আতপ চাউলের মধ্যে  
যে চাউলে বত বেশী পক্ষা থাকিয়া বাইবে তাহাই তত  
উৎকৃষ্ট। (৪) কোনও চাউলেরই ফেন কেনিয়া  
দেওয়া উচিত নহে।

শ্রীভারকমাধ দেব।

## কবিতার কথা

( ঢাকা সাহিত্য পরিষদের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে  
পঠিত সভাপতির অভিভাষণ, ৭ই মার্চ, ১৩২১ )

আজকাল বঙ্গসাহিত্যে একটা গোল বাধিয়াছে। আমি  
ভাবার কথা বলিতেছি না, সাহিত্যেরই কথা বলিতেছি।  
এই সাহিত্য বিষয়ে, বিশেষতঃ গীতিকাব্য লইয়া, নানা-  
প্রকারের তর্কবিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কেহ  
বলেন, আধুনিক বঙ্গলা কবিতার প্রত্যক্ষ বাস্তবতার  
অভাব। আবার কেহ কেহ বলেন, ভাবুকতাই বহুব্য-  
ভাবনের সারাংশ। এই ভাবুকতা ছাড়িয়া দিলে কবিতা  
কুটিবে কি করিয়া? প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে ইংরাজী  
সাহিত্যে রীয়েলিজম্ ( Realism ) ও আইডিয়ালিজম্  
Idealism লইয়া যে তর্কবিতর্ক চলিত, ইহা কতকটা  
সেই প্রকারের তর্ক। ইংরাজী সাহিত্যে ইহার একটা  
মোটামুটি রকমের সীমাংসা হইয়া গিয়াছে। এই  
সীমাংসা ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'স্কাইলার্ক' (Skylark) এর  
শেষ দুইটি ছন্দে আছে।

Type of the wise who soar but never roam  
True to the kindred points of Heaven and  
Home।

অর্থাৎ সংসার ও পরমার্থ, প্রত্যক্ষরাজ্য ও ভাবরাজ্য—  
এই দু'য়ের প্রতিই লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

এই কি আমাদের কবিতার আদর্শ? একটু ভাবিয়া  
দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আমাদের প্রাণের নাকে  
ছুইটা ভাব সর্বদাই দেখা দেয়। একটা আমাদের  
মাটি আঁকড়াইয়া থাকিতে বলে, আর একটা আমাদের  
মাটি ছাড়াইয়া আকাশের দিকে তুলিয়া ধরে। এই  
সংসার ও পরমার্থ, ধরণী ও আকাশ, এই দুই লইয়াই  
আমাদের জীবন। ইহাদের কোনটাকেই আমরা  
একেবারে ছাড়িয়া দিতে পারি না। ছাড়িয়া দিলে,  
মহুব্যাজীবন বলিলে বাহা বুঝার তাহার অভাবানি হয়।

মহাব্যতীবন কি ? আমরা প্রতিদিন যেমন করিয়া জীবনযাপন করি তাহাই কি প্রকৃত জীবন ? আমরা সকলেই সকালে উঠিয়া যে বার কর্ণে নিযুক্ত হই, সমস্ত দিন কর্ম করিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসি এবং তৎপরে বিশ্রাম করি। বাহার কর্ম করিতে হয় না, সেও শয্যা হইতে উঠিয়া কোন রকমে গল্প করিয়া, তামাক টানিয়া দিনটা কাটাইয়া দেয়। কিন্তু ইহা আমাদের জীবনের বহিরাবরণ। ইহার আর একটি দিক আছে। তাহাকে জীবনের অন্তঃপ্রকৃতি বলা বাইতে পারে। যে সমস্ত দিন কর্ম করিয়া কাটায়, সেও মাঝে মাঝে, ভাবিতে ভাবিতে, তাহার কর্মের সার্থকতা যেখানে, সেই রাজ্যে গিয়া পৌঁছায়। যে সমস্ত দিন আগন্তে অভিবাহিত করে, সেও একেবারে অসার না হইলে, মাঝে মাঝে দুরাগত বংশীধ্বনি শুনিতে পায়, আর সেই বংশীরবে সে আর একটা রাজ্যে গিয়া উপনীত হয়। এই সব যুহুর্ন্তগুলি জীবনের অনন্তযুহুর্ন্ত। এই যুহুর্ন্তেই আমরা প্রকৃত জীবনযাপন করি, এবং আমাদের ও অপরের প্রতিদিনের জীবনযাপনের সার্থকতা বুঝিতে পারি। কৃষকের জীবন লইয়া সেই কবিতা লিখিতে পারে, যে কৃষকের জীবনের সার্থকতা বুঝিয়াছে। কেমন করিয়া কৃষক প্রাতে উঠিয়া পাতা ভাত খাইয়া লালল লইয়া মাঠে যায়, কেমন করিয়া সে চাষ করে, সে চাষ করিতে করিতে কি গান গায়, সে বাড়ী ফিরিয়া কেমন করিয়া বিশ্রাম করে, কি খায় কি পরে—এই সব খুব জাঁকাল রকমের ভাবায় বর্ণনা করিলেও কবিতা হয় না। কেবল একখানি ছন্দর আলোক-চিত্র হয়।

আজকালকার দিনের অনেক কৃষক-বিষয়ক কবিতা এই প্রকারের। এই সব কবিতার প্রত্যক্ষ-বাস্তবতা থাকিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত বস্তুত্বতা নাই ;—যাহা লইয়া কৃষকের জীবনের সার্থকতা, তাহার কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না। কৃষক বরুক আর নাই বরুক,

তাহার দৈনন্দিন বাহিরের জীবনের একটা অন্তঃপ্রকৃতি আছে। সেই অন্তঃপ্রকৃতির অন্তত্বতা যার নাই, সে কবিতা কৃষকের জীবনকে আপনায় করিয়া লইতে পারেনা। সে যাহা বুকে ও বাহা ধরে, তাহা বাহিরের খোদামাত্র। সেই খোদা লইয়া যাহা লেখা যায় তাহা কবিতা নয়। যে কবি সেই জীবনের অন্তঃপ্রকৃতির সন্ধান পাইয়া, সেই জীবনের ভিতর ও বাহির দুই দিককেই সম্পূর্ণ ভাবে আয়ত্ত করিয়া আপনায় করিয়া লইতে পারেন, তিনিই যথার্থ কৃষকের কবিতা লিখিতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ বার্গ্‌সের ‘প্লাউম্যানের’ (Ploughman) কথা বলা যায়। আধুনিক বাঙ্গলা কবিতার কান্নাধার বাবুর ‘পৰ্ণপুটে’ ‘কৃষকের ব্যথা’ নামক একটা কবিতা যথার্থ কৃষকের কবিতা—

ক্ষেতের কাজ করিতে গিয়ে উদাস হয়ে বাই।

কাজেতে আর নাইক মন, আরামে নুখ নাই।

তোমার সেই কাজল চোখ মনে যে উঠে জলি,  
ধানের চারা উপড়ে ফেলি আগাছা কাঁটা বলি’।

\* \* \* \*

শান্তিপুরে’, তোমার ডুরে’, এ বুকে চাপি ধরি,  
চোখের জলে বন্ধ ভাসে সেজেতে রহি পড়ি।

কৃষকের কবিতার বিষয় যাহা বলিলাম, সব কবিতার বিষয়েই তাহা খাটে। শুধু নায়ক-নায়িকার হাবভাব বর্ণনা করিলেই প্রেমের কবিতা হয় না। প্রেমের রাজ্যে যে না পৌঁছিতে পারে, তাহার পক্ষে প্রেমের কবিতা লেখা বিড়ম্বনামাত্র। আমাদের প্রত্যেক প্রত্যেকের, প্রত্যেক ভাবের, প্রত্যেক সম্বন্ধের একটা অন্তঃপ্রকৃতি আছে। সকল বহিরাবরণের মধ্যে এই অন্তঃপ্রকৃতির অঙ্গসন্ধানই মনোজীবন। সকলেই সেই একই অঙ্গসন্ধান করিতেছে। কেহ জানে করে, কেহ না বুঝিয়া করে। আমরা সকলেই সেই অন্তঃপ্রকৃতির—সেই প্রাণের খোঁজে ব্যস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াই। যাহাকে জীবনের অনন্তযুহুর্ন্ত বলিলাম, সেই অনন্ত

১৫ ১৯১১

দুহুর্থে সেই প্রাণেরই সাক্ষাৎলাভ হয়। আর সেই দুহুর্থেই আমাদের হৃদয়মন রসোচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া পড়ে। তখনই কবিতার সৃষ্টি হয়।

তবে কবিতার রাস্য কোথায়? আমি পণ্ডিত নহি, কথা নইয়া তর্ক করার অভ্যাস নাই। একটা উদাহরণ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। সে দিন হিমালয়ে যে ক্ষুদ্র 'দেখিলাম, তাহারি কথা' বলিব। ধরনী অনেক উঠিয়া আকাশের গায় চলিয়া পড়িয়াছে। আকাশ ধরণীর গায় মিলাইয়া গিয়াছে। এ মিলন অপূর্ণ, গভীর, অনন্ত! দেখিয়া দেখিয়া দেখিয়া আমার চোখে জল আসিল। মনে মনে নমস্কার করিলাম, বলিলাম, এই ত জীবন। এইখানে সংসার ও পরমার্থ, ধরনী ও আকাশ, দেহ ও আত্মা, বহিরাবরণ ও অন্তঃ-প্রকৃতি—মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। এই সেই মিলনভূমি, অপূর্ণ, অনন্ত! বুঝিলাম, বাহা আত্মা তাহাই দেহ, বাহা অনন্ত তাহাই সত্য, বাহা পরমার্থ তাহাই সংসার।

জীবন এই মহামিলনমন্দির। ইহাই কবিতার রাজ্য। এখানে শুধু সংসার নাই, শুধু পরমার্থও নাই। শুধু ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বাস্তবতা নাই, বস্তুহীন কল্পনাও নাই—বাহা আছে তাহাই জীবনের স্বরূপ! এই জীবন নইয়াই কবিতা! যে শুধু ছোঁবড়া খায় সে কখনও কলের স্বাদ পায় না। যে জীবনের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া অন্তঃপ্রকৃতির সন্ধান না পায়, সে কবিতার রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। আর যে ছোঁবড়া না ছাড়াইয়া কল খাইতে চায়, সেও কলের স্বাদ পায় না। সে জীবনের অন্তঃপ্রকৃতির একটা মনগড়া কল্পিতলোক স্বপ্নম করে মাত্র। শূন্য আকাশে যেমন গৃহ নির্মাণ করা যায় না, সেইরূপ এই কল্পিত-লোকে কবিতাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। এই কল্পিত-লোকের কোন সত্তা নাই। এ মিলনমন্দির সত্য। সত্যকে ছাড়িয়া দিলে কোন কবিতাই সম্ভব হয় না।

আমি ছ'একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া আমার কথাটি বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

কৃষ্ণপ্রসঙ্গে মজিয়া যখন রাধিকা কুলমানের কথা ভাবিয়া আকোপ করিতেছেন—

“অন্তর বাহিরে কুটু কুটু করে

শুধে দুখ দিল বিধি”—

কবি তখন একেবারে রাধিকার মনের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া সেই মহামিলনমন্দিরে প্রবেশ করিলেন—

“কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী।

শুধে দুখ দুটি ভাই।

শুখের লাগিয়ে যে করে পিরীতি

দুখ যায় তার ঠাঞি।”

আজকাল এরূপ কবিতা শুনিতে পাই না; আর কি শুনিতে পাইব না?

রাধিকার পূর্বরাগের কথা মনে করুন।

সই কে বা শুনাইল শ্রামনাম?

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,

আকুল করিল মোর প্রাণ।

না জানি কতক মধু, শ্রাম নামে আছে গো,

বদন ছাড়িতে নাহি পারে।

অপিতে অপিতে নাম, অবশ করিল গো,

কেমনে পাইব সই তারে।

এও সেই মহামিলনমন্দিরের গীতধ্বনি। বাঁহারা শুধু বাহিরের দিক্টা দেখেন, তাঁহারা হয় ত বলিবেন, “পূর্বরাগে আবার মিলন আসিল কোথা হইতে?” আমি যে মহামিলনের কথা বলিতেছি তাহাই সে জীবনের স্বরূপ,—পূর্বরাগ, মিলন, সজোগ, বিরহ ইত্যাদি সেই রূপেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সুতরাং পূর্ব-রাগের গীতই হউক, কি মিলন অথবা বিরহের গীতই হউক, জীবনের সকল গীতই সেই মহামিলনমন্দিরে নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে। বিনি বার্থ্য কবি, তিনি সেই মন্দিরে পৌঁছিয়া তাহারি গান বুলে করিয়া বহন



করিয়া আনেন। তাই আজ এত বৎসর পরেও এই  
কবিতাটি পড়িলেই মনে হয়—

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো  
আকুল করিল মোর প্রাণ।

চতুর্দশ যে সাধক ছিলেন। তিনি যে নামের মাহাত্ম্য  
বুঝিতেন। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে নায়ক-নায়িকার নাম  
লইয়া লিখিত দুইটি কবিতা আমার মনে পড়িতেছে।  
একটি এই—

তুনেছি শুনেছি কি নাম তাহার—

তুনেছি শুনেছি তাহা

নলিনী নলিনী নলিনী নলিনী

কেমন মধুর আশা!

নলিনী নলিনী বাজিছে শ্রবণে

বাজিছে প্রাণের গভীর ধাম,

কছু আনন্ডে উঠিতেছে মুখে

নলিনী নলিনী নলিনী নাম।

বালার খেলার সখীরা তাহারে

নলিনী বলিয়া ডাকে

স্বপ্নমেরা তায়, নলিনী নলিনী

নলিনী বলে গো তাকে!

নলিনীর মত হৃদয় তাহার

নলিনী বাহার নাম!

আর একটি এই,—

তালবেসে সাধি! নিতুতে যতনে

আমার নামটি লিখিয়ো তোমার

মনের মন্দিরে।

আমার পরাণে যে গান বাজিছে

তাহারি তালটি লিখিয়ো তোমার

চরণ-মন্দিরে।

বলা বাহুল্য, চতুর্দশের কবিতা যে রাক্ষসের, এ দুটি  
কবিতা সে রাক্ষসই নয়—সে মহাবিলম্বমন্দিরের অনেক  
দূরে।

প্রেমে ডগমগ-হৃদি রাধিকা নিজের অবস্থা নিজেই  
বুঝিতে পারিতেছে না। সে ভাবিতেছে তাহার কি  
হইল। সে যেন সংসারে থাকিয়াও সংসারে নাই। সে  
কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না, অথচ প্রেমের বে প্রভাব  
তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছে,—

সই! পিরীতি আখর তিন

জনম অবধি, ভাবি নিরবধি,

না জানিয়ে রাত দিন।

পিরীতি পিরীতি সব জনা কহে

পিরীতি কেমন রীত।

রসের স্বরূপ, পিরীতি মুরতি

কেবা করে পরতীত।

পিরীতি মন্তর, জপে যেই জন,

নাহিক তাহার মূল।

বজ্র পিরীতি আপনা বেচিহ্ন

নিছি দিহ্ন জাতিকুল।

সে রূপ সাগরে, নয়ন ডুবিল

সে শুণে বাহিল হিয়া।

সে সব চরিতে, ডুবল যে চিতে

নিবারিব কি না দিয়া।

থাইতে খেয়েছি, শুইতে শুয়েছি

আছিতে আছিগে ঘরে।

চতুর্দশ কহে ইদ্রিত পাইলে

অনল দিয়ে ছুরারে।

রাধিকার হৃদয়দর্শী চতুর্দশ, রাধিকার হৃদয়ের কথা  
সকলই জানেন। সংসারে থাকিয়াও সে সংসারের  
বহুদূরে তাহা তিনি জানেন। তাই তিনি হাসিয়া  
বলিলেন, “হী! আছয়ে ঘরে বটে, কিন্তু ইদ্রিত পাইলে  
অনল দিয়ে ছুরারে”। আর একটি কবিতাতে কবি  
বলিতেছেন, “তোমার এ রকম ত হবেই। তুমি যে

পিরীতি নগরে বসতি করছ

পরেছ পিরীতি বাস।”



তারপর মিলনের ও সম্ভোগের কথা। মিলনের  
মাকে রাধিকা বলিতেছে—

কভু না জানিহু, কভু না শুনিহু  
শ্রাম কাল কি গোরা!

এ ত শুধু বাহিরের সঙ্গীত নহে, এ যে অন্তর্দৃষ্টি পরিপূর্ণ।  
শ্রামের প্রেমে গঙ্গাদ-প্রাণ রাধিকা এ কোন শ্রামের  
অনুসন্ধান করিতেছে? চণ্ডীদাস জানে; রাধিকা না  
জানিলেও তাহার হৃদয় জানে। তাই সে মিলনের মধ্যেও  
গাহিয়া উঠিল

কভু না জানিহু, কভু না শুনিহু  
শ্রাম কাল কি গোরা।

প্রত্যেক মিলনের মধ্যেই একটা বিরহ প্রচ্ছন্ন থাকে।  
এ গান তাহারি প্রথম স্তর। এই বিরহ তারপর  
সম্ভোগে আরও সুন্দর ভাবে, গভীর ভাবে ফুটিয়া  
উঠিয়াছে—

এমন গিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।  
পরানে পরাণ বাধা আপনি আপনি।  
হুঁহ কোরে হুঁহ কঁাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।  
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া।

ইহার পরের অবস্থাই বিস্তাপতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত  
করিয়াছেন,—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিহু  
নয়ন না তিরোপিত ভেল  
সোই মধুর বোল শ্রবনহি শুনহু  
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।  
কত মধুবাধিনী রঙসে গোঁরাগিহু  
না বুঝিহু কৈছন কেলি।  
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখহু  
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি।

কেমন করিয়া নয়ন তিরোপিত হইবে, নয়ন যে  
অভূপ্য। কেমন করিয়া প্রাণ জুড়াইবে, প্রাণ যে  
জুড়াইবার নয়। আমরা যে ইন্দির দিয়া অভীজিরকে

ধরিতে চাই। তাই প্রত্যেক মিলনের মধ্যে মহামিলনের  
অনুসন্ধান করি, তাই সম্ভোগেও এক মহাবিরহের ছায়া  
পড়ে, তাই সম্ভোগ-মিলনের মধ্যেও নারিকা গাহিয়া  
উঠিল—

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখহু  
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি!

এই কবিতাগুলি রীয়েলিষ্টিকও ( Realistic ) নয়  
আইডীয়েলিষ্টিকও ( Idealistic ) নয়; আমি  
যে মহামিলনমন্দিরের কথা বলিয়াছি তাহারি  
ধ্বনি। এগুলি জীবনের কবিতা, ইহাতে জীবনের ধ্বনি  
পাওয়া যায়। তাই আমরা এ কবিতাগুলিকে  
কিছুতেই ভুলিতে পারি না।

ইহাই হিন্দুর আন্তরিক ভাব। ইহাই বাদ্যলীর  
কবিতার প্রাণ। বঙ্গসাহিত্যে—চণ্ডীদাস হইতে কৃষ্ণ-  
কমল গোস্বামী ও নিধুবাবু পর্যন্ত—এই কবিতার একটা  
অক্ষর ধারা দেখিতে পাওয়া যায়।

সে ধারা কোথায় লুকাইয়া গেল? আধুনিক বঙ্গ-  
সাহিত্যে তাহাকে খুঁজিয়া পাই না কেন? ইউরোপীয়  
সাহিত্যে মন ডুবাইয়া দিয়া আমরা কি শেষে বাদ্যলা  
কবিতার যে প্রাণ তাহাই হারাইয়া ফেলি? আমি  
বুঝিতে পারিতেছি, অনেকের এ কথা ভাল লাগিতেছে  
না। তাঁহারা হয় ত বলিবেন, কবিতা কি চিরকাল এক  
রকমেরই থাকিবে? আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে,  
নূতন নূতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে, জীবনের পরিসর  
বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং কবিতাকে সেই পুরাতন  
গভীর মধ্যে রাখিয়া দিলে কেমন করিয়া চলিবে? কিন্তু  
আমি ত কোনও গভীর কথা বলি নাই, আমি কবিতার  
রাজ্যের কথা বলিয়াছি, কাব্য-লোকের কথা বলিয়াছি।  
এই কাব্য-লোকের কোন সীমা নাই। এ রাজ্য অসীম,  
অনন্ত। জীবনের পরিসর যদি বাস্তবিকই বাড়িয়া থাকে,  
কবিতার বিষয়ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াছে, সে সম্বন্ধে  
কোন সন্দেহ নাই। ইব্‌সেন (Ibsen) হইতে “কাভা-

কাড়ি করিয়া কবিতার বিষয় সংগ্রহ করা সম্ভব হইতে পারে। নানা ফুলে মধুপায়ী ভ্রমরের মত মেটার্লিন্কের (Maeterlinck) পত্রে পত্রে মধু আহরণ করা চলিতে পারে। আমরা সে বিষয়-বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইয়া কবির নৈপুণ্যেরও যথেষ্ট প্রশংসা করিতে পারি। কিন্তু কবি যদি সেই কাব্যলোকে প্রবেশ করিতে না পারেন, তবে তাঁহার কবিতা বৃথা। একদিনে তাহা লোকের মন চমকাইয়া দিতে পারে, কিন্তু তাহা চিরদিনের জিনিস নহে। বিষয় যাহাই হউক না কেন, কবির অগুপ্তি থাকা চাই, সেই মহামিলনমন্দিরের সাধক হওয়া চাই। সে অন্তঃপ্রকৃতির সাক্ষাৎ দর্শন আবশ্যক। সে মন্দিরে যে সঙ্গীত-স্রোত চিরকাল প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে অবগাহন করা চাই—ভাসা চাই—ডুগা চাই! নতুবা দূরে দাঁড়াইয়া, বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, মনগড়া, কল্পিত ভাবরাশি খুব ওস্তাদী রকমের ছন্দে প্রকাশ করিলেও কবিতা হয় না।

বাল্য। কবিতায় সেই সরল সত্য প্রাণ আমরা হারাইতে বসিয়াছি বলিয়াই আমাদের কবিতার ভাব ও ধরণ ক্রমশঃ কিছুতকিমাকার হইয়া আসিতেছে। আজকালকার দিনে

এই হিয়া দগ্ধপি

পর্যাপ্ত পোড়নি

কি দিলে হইবে ভাল—

এই ভাবটি প্রকাশ করিতে হইলে নানারকম উপমার আবশ্যক হয়। ইহাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, ছানিয়া বুনিয়া, ফেনাইয়া ফেনাইয়া বলিতে হয়। তা' না হইলে নাকি কবিতা হয় না। আজকাল আমরা সবাই খেলোয়াড়। কবিতা লিখিতে গিয়া খেলিতে বসি। একটি ভাব কোন রকমে জোপাড় হইলেই তাহাতে ভাবার রং মাখাইতে বসি। এবং সেই রকিম-জিনিসটাকে লইয়া, বল খেলার মত তাহাকে আছড়াইয়া আছড়াইয়া খেলিতে থাকি। কবির মদ্য হইতে কোন ভাবই সহজে, সরল ভাবে, পাঠকের মনে আসে না। কবি যেন

তাহাকে তাঁহার মন হইতে নামাইয়া মাঠে ফেলিয়া তাহার সঙ্গে খেলা করেন, আর সেই অবসরে পাঠকেরা একটু একটু দেখিয়া লয়, আর কবির ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করে।

কিন্তু ইহা ত বাঙ্গলা কবিতার ধরণ নয়। যে পরিমাণে প্রাণের অভাব হয়, সেই পরিমাণেই ধরণের মাত্রা বাড়িয়া যায়। বাঙ্গলা কবিতার ঠিক সেই অবস্থা হইয়াছে। তাই আজকাল বাঙ্গলা কবিতাতে আন্তরিকতার এত অভাব ও ধরণের এত বাড়াবাড়ি।

সেই সোজা সরল ধরণের দুই একটি কবিতা মনে পড়িতেছে। চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ও অন্নান্ত বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতা ঐ ভাষায়ই লিখিত হইয়াছিল। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর কবিতায় অল্পপ্রাণের বাহুল্য থাকিলেও তাঁহার ভাব ও ধরণ অনেকটা সেই প্রকার সহজ, সরল, প্রাণময়—

কি হেরিব শ্যামরূপ নিরূপম

নয়ন ত মম মনোমত নয়।

বধন নয়নে নয়ন, মন সহ মন

হতেছিল সখিলন ;

নয়ন পলক দিলে, সেই স্মৃতির সময়।

ইহাতে খেলিবার চেষ্টা নাই,—ইহার গতি সরল। আবার দেখুন,—

মন যে আমার পড়েছে সই উভয় সঙ্কেটে।

এক কর্ণ বলে, আমি কৃষ্ণনাম শুনিব,

আর এক কর্ণ বলে, আমি বধির হয়ে র'ব।

এক নয়ন বলে, আমি কৃষ্ণরূপ দেখি,

আর এক নয়ন বলে, আমি মুদিত হয়ে থাকি।

এক করে সাধ করে, ধরে কৃষ্ণ করে,

আর এক করে, করে করে নিবেদন করে তারে।

এক পদে কৃষ্ণপদে বাইবারে চায়

আর এক পদে পদে পদে বারণ করে তার।

রাধিকা কৃষ্ণবিরহে অজ্ঞান। সখীরা তাহার কানে  
কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিল। অমনি রাধিকার কৃষ্ণমুগ্ধি।

বহুদিন পরে যোরে মনে করে

এসেছিল ঘরে বঁধু যে আমার।

আমি জান্লাম জান্লাম—

বঁধুর স্রীঅঙ্গের গন্ধে পশি নাসারন্ধ্রে

মৃতদেহে করলে জীবন সঞ্চার।

সখি। আমি ছিলাম অচেতনে,

ভাল, তোরা ত ছিলি চেতনে,

হায় হায়! যতনে রতনে, পেয়ে নিকেতনে,

কেন অযতনে হারালি আবার।

এইরূপ ভাষা এখন আর শুনিতে পাই না। নিধু-  
কাবুর “তোমারি তুলনা প্রাণ ভূমি এ মহীমণ্ডলে”, কিম্বা  
বিহারীলালের—

“নয়ন অমৃতরাশি প্রেয়সি আমার।

এইরূপ অনেক কবিতা বঙ্গভাষার আদরের সামগ্রী।

আজকালকার কবিতা পড়িলে মনে হয়, যেন  
আমাদের ভাব, ভাষা, ধরণ, সব বদলাইয়া গিয়াছে।  
এখন আমাদের ভাষা অল্প প্রকারের, আমরা প্রত্যেক  
কথাই এত ঘুরাইয়া বলি যে সাদাসিধে লোকে বুঝিতে  
পারে না। আমাদের ছন্দের এখন সাপের মতন  
বক্রগতি। তাঁর স্বকারে এত প্রকারের রাগরাগিনী-  
আলাপ থাকে যে, যাহার যথেষ্ট সুরবোধ আছে সে  
ভাব বেচারাকে একেবারেই আমল দেয় না, আর যে  
হতভাগ্যের যথেষ্ট সুরবোধ নাই সে অনেক চেষ্টা  
করিয়াও পড়িতেই পারে না।

আমাদের কবিতার এই শোচনীয় অবস্থার হয় ত  
স্বাভাবিক কারণ আছে। যাহারা সাহিত্যের ইতিহাসে  
সুপরিচিত তাঁহারা বলিতে পারেন। কিন্তু যথেষ্ট কারণ  
থাকুক আর নাই থাকুক, তাহাতে ত মন মানে না।  
প্রাণ যে চায় সেই বৈষ্ণব কবিদিগের সব-জুড়ান অধা-  
শ্রোত। মন যে চায় সেই বাঙ্গালীর কবিতা। বাঙ্গ-

লার মাটি, বাঙ্গলার জনকে সত্য করিতে হইলে বাঙ্গা-  
লীর কবিতাকে পুনর্জীবিত করিতেই হইবে। কবিতা  
লইয়া আর খেলাধুলা ভাল লাগে না। সংসারে খেলাঘরে  
খেলিতে খেলিতে যাহারা প্রাণের বস্তুর সাক্ষৎ পায়  
তাহারা বাস্তবিকই মন্য। কিন্তু যাহারা প্রাণের বস্তু  
লইয়া খেলা করিতে বসে তাহাদের মত হুঁজুগা আর  
কার? বঙ্গসাহিত্যের সেই হারাণ ধারাকে আবার  
খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সে মরে নাই, একেবারে  
বিলুপ্ত হয় নাই,—সরস্বতী নদীর মত বালুকারাশির  
মধ্য লুকাইয়া আছে। সেই বালি খুঁড়িয়া তাহাকে  
বাহির করিতে হইবে।

আমি পণ্ডিত নহি, দার্শনিকও নহি, কিন্তু আশৈশব  
সাহিত্যসেবার চেষ্টা করিয়াছি। ইউরোপীয় বড় বড়  
লেখকেরা আজকাল কি লেখেন, আমি হয় ত ভাল  
করিয়া জানি না। হয় ত আমার বুঝিবার ক্ষমতাই  
নাই। কিন্তু বাঙ্গলা কবিতার যথার্থ প্রাণ কি, তাহা  
আমি বুঝি ও কতকটা জানি। তাহারি গৌরবে  
আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমার হাতের  
কলম কেহ কাড়িয়া লয় নাই, সত্য। কিন্তু আমি ত  
সাধক নই, সাহিত্যমন্দিরপ্রাঙ্গণে সামান্য কিস্করমাত্র।  
সেই গৌরবকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার ক্ষমতা আমার নাই।  
যাহাদের আছে তাঁহাদের হুঁজুগা যে আমার অপেক্ষা  
অনেক বেশী।

আজ পরিণত বয়সে ও পারের কথাই বেশী মনে হয়।  
আমি মরিয়া ছাই হইব, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস,  
আমাদের কবিতামন্দিরে আমি যাহাকে বাঙ্গলা  
কবিতার প্রাণ বলিলাম, আবার তাহারই প্রতিষ্ঠা হইবে।  
আমি দেখিব না, কিন্তু সেই গৌরবের আভাস আমার  
প্রাণকে উজ্জ্বল করিয়া দিতেছে। আমি যেন চক্ষু  
সব স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। দূরগত সঙ্গীতের ন্যায়  
সেই মহামিলনমন্দিরের ধ্বনি আমার কানের ভিতর  
দিয়া প্রাণে প্রবেশ করিতেছে।

আবার সেই প্রাণের প্রতিষ্ঠা হইবে। সকল সাহিত্য  
সেই প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।

ঐচিন্তরঞ্জন দাশ।

## সভামঙ্গল \*

বাগত গরীয়ান্

বাগত যত বন্দনীয়

সজ্জন মহীয়ান্ ।

আজি এ পূজার যণপতলে

ঋষিক ! বাণী শোনাও সকলে,—

উদাত্ত সামে সভা-মঙ্গল

পূর্ণ করুক প্রাণ ;

বাগত আজি বন্দনীয়

সজ্জন মহীয়ান্ ।

এস 'মালধের' মহামালাকর ।

এস সাগরের কবি !

বজের হেম উদয়াধরে

চির ভাস্বর রবি ।

সিঙ্গুর কলকল্লোল গামে

অনৌঘের বাণী পশেছে কি প্রাণে ?

হেরিয়াছ বুঝি অনন্ত নীলে

চির বাহ্নিত ছবি ।

পুরবের নব বাণী-মন্দিরে

এস পুরবের কবি ।

এই নগরীর ধূলি-কণিকায়

সঞ্চিত কত কথা ।

এই তটিনীর বহু ধারায়

কল্লোলে কত গাথা ।

লুপ্ত স্মৃতিত গৌরব-শিখা

পরায়েছে ভালো হেব-ললাটিকা ;

আজিও বঙ্গ-বভব-লক্ষ্মী

এরি সম্বন্ধ-নতা ।

এই নগরীর নিচোলাকলে

সঞ্চিত কত কথা ।

ভাষা-জননীর চরণ-পদ্মে

এরি অঞ্জলি-ভার,

বোধনের নব ফুল পল্লবে

উজ্জল অনিবার ;—

'বক্তিম' যবে জাহ্নবী-তীরে

বোধন-শব্দ বাজাল গভীরে,

বিপুল ছন্দে বুড়ীগঙ্গার

উচ্ছলে স্রোতোধার,—

'কালীপ্রসন্ন' রচিত যতনে,

কনকাজলি ভার ।

নাই—নাই আর সে চিরসাধক,

বন্ধ সে বীণা আজ,—

যথিয়া উঠিছে কত ব্যথা আজি

মৌন হিয়ার মাঝ ;

বন্ধ-বাণীর সোনার দেউলে

এই নগরীর দৌপারতি জলে,

আজো ঝলমল দীপ্ত বিভার

এরি দেওয়া ঘণিসাজ ।

নাই—নাই শুধু সে মহাতাপস,

বন্ধ সে বীণা আজ ।

আজো শুনি কা'র বীণা-ঝঙ্কার,

কল্লোলময়ী ভাষা ?—

আজো 'গোবিন্দ' মোহন ছন্দে

গুঞ্জরে কত আশা :

পল্লীর শত স্বপনের ছায়া

মর্মে মর্মে রচে নব মায়া,

\* মুকবি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস ব্যারিষ্টার মহাশয়ের

সভাপতিত্বে সম্পন্ন ঢাকা সাহিত্য পরিষদের তৃতীয় বার্ষিক  
অধিবেশনে পঠিত, ৭ মার্চ, ১৩২১ বঙ্গাব্দ ।

হৃৎকম্পের শত কাহিনীতে

কত কাঁদা, কত হাসা।—

আজো শুনি তাঁর বীণা-বজ্রার,

কল্লোলময়ী তাবা।

এস গো বাণীর পূরমন্দিরে

হে সাধক! এস ছুটি,—

‘জননী বঙ্গ ভাষা’র চরণে

বিশ্ব পড়িছে লুটি’ ;—

‘রবির’ দীপ্ত মুকুট-বিভায়

নিখিল অর্থা রচে তাঁর পায় ;

জননীর চারু চরণ-সরোজে

মধুকর! এস ছুটি!

ভাষা-জননীর পূর্ব দেউলে

হে সাধক! এস ছুটি!

বাগত গরীয়ান্!

বাগত বত বন্দনীয়

সজ্জন মহীয়ান্।

আজি এ পূজার মণ্ডপতলে

ঋত্বিক! বাণী শোনাও সকলে,—

উদাত্ত সামে সভা-মঙ্গল

পূর্ণ করুক প্রাণ ;

বাগত আজি বন্দনীয়

সজ্জন মহীয়ান্।

শ্রীপরিমল কুমার ঘোষ।

## মহীপাল প্রসঙ্গ

(আলোচনা)

গত অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসী পত্রিকায় গত  
কার্তিকের প্রবাসীতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত

ভট্টশালী মহাশয়ের লিখিত ‘মহীপাল প্রসঙ্গ’ সম্বন্ধে  
কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলাম। তদুত্তরে গত মাঘ  
মাসের প্রবাসী পত্রিকায় নলিনী বাবু ঐ বিষয় বিস্তৃত  
ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি এতটা পরিশ্রম  
করিয়াছেন এতদূর তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

তাঁহার আলোচনার উত্তর দেওয়া নিতান্ত আবশ্যিক।  
প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় নলিনী বাবুর অনুরোধ সম্বোধ  
আলোচনার প্রথমে লাল পতাকা দেখাইয়াছেন, তাই  
প্রতিভা পত্রিকায় এই আলোচনা পাঠাইলাম। সাহিত্য  
পরিষদের পত্রিকা ব্যতীত অন্য পত্রিকায় এই তরু  
বিষয়ের আলোচনার জন্য এতটা স্থান দাবী করা যায়  
না।

নলিনী বাবুর দফাওয়ারী আপত্তিগুলির সম্বন্ধে  
আমার বক্তব্য একে একে নিয়ে নিবেদন করিলাম—

১। বাঘাউড়া লিপি।

এই লিপির লিখিত মহীপাল কে? নলিনী বাবুর  
মতে ইনি পালবংশীয় প্রথম মহীপাল। কিন্তু তাঁহার  
প্রমাণগুলি তত দ্ব্যতসহ নহে।

(১) ২য় বিগ্রহপাল কাষোজাধরজ গোড়পতি  
মহেন।

(২) বানগড় লিপি হইতে জানা যায় তিনি রাজ্য-  
ভ্রষ্ট হইয়া সৈন্তসামন্ত সহ পূর্বাঞ্চল ভ্রমণ করিয়াছিলেন।  
প্রোক্তটি এই—

(দেশে প্রাচি) প্রচুরপন্নসি স্বচ্ছমাণীয় ভোয়ং

স্বয়ং ভাষা তদন্ত মলয়োপত্যাকাচন্দনেবু।

কৃষ্ণা (সাম্রৈশ্বক্যমু জড়তাং; শীকরৈরভ্রতুল্যাঃ

প্রালেয়া (জ্যে: কটকমতভয়ং বস্ত সেনা গজেন্দ্রাঃ (১)॥ ১১

অর্থাৎ, তদীয় অভ্রতুল্যা সেনা-গজেন্দ্রগণ (প্রথমে)

জলপ্রচুর পূর্বাঞ্চলে স্বচ্ছ সলিল পান করিয়া তাহার পর

(তদন্ত) মলয়োপত্যাকার চন্দন বনে বধেচ্ছ বিচরণ

করিয়া, ঘনীভূত শীতল শীকরোৎক্ষেপে তরু সমূহের

(১) গোড়লেখমালা, বাগড় লিপি।

জড়তা সম্পাদন করিয়া, মালয়ের কটক দেশ উপভোগ করিয়াছিল।

এই প্রোকে পূর্বাঞ্চল এবং মলয় পর্বত অর্থাৎ নীল-গিরি পর্যন্ত দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করা বুঝায়। ঐ সমস্ত দেশ জয় করিলে তাহা না লিখা কি স্বাভাবিক বোধ হয়? ইহাতেই বুঝা যায় রাজ্য ব্রহ্ম হইয়াই বিগ্রহ পাল এই সমস্ত দেশ অল্পগত সৈন্তগণ সহ ভ্রমণ করিয়া-ছিলেন।

(৩) ১ম মহীপাল অনধিকারী কর্তৃক বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। পিতৃরাজ্য বলিলে সমস্ত রাজ্যটাই বুঝায় বটে, কিন্তু সমস্তটা বোধ হয় তিনি উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন না।

(৪) বাঘাউড়া লিপিতে এমন কোন ইঙ্গিত নাই, যদ্বারা বুঝা যায় যে, ২য় বিগ্রহপাল পূর্বদেশে যে যে স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন, মহীপালও সেই সমস্ত দেশ জয় করিয়াছিলেন।

(৫) কুম্ভার এই লিপি ১ম মহীপালের নহে। পূর্ববঙ্গে ভাওয়ালে শিশুপাল, সাতারে হরিশঙ্কর পাল, যশোপাল প্রভৃতি বহু পাল রাজ্য রাজত্ব করিয়াছেন, তজ্জন মহীপাল নামক একজনও ঐ অঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছেন, ধরিতে বাধা কি?

আমি জোর করিয়া কোন তথ্যই প্রচার করি নাই। বরেন্দ্র অল্পসন্ধান সমিতি রাজসাহী টাউনের ৭৮ ক্রোশ দূরে দেওপাড়া গ্রামে প্রত্যাশ্রমের বিগ্রহ মন্দিরের ক্ষণসাবশেষ এবং পঞ্চম সহর নামক দীঘি আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা অবশ্যই ইহা বিজয়সেনের কীর্তি বলিয়াই স্থির করিয়াছেন, কিন্তু আমি তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারি নাই। এই দুইটি চিহ্ন দ্বারা আমি প্রত্যাশ্রম নামক কোন রাজ্যের অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছি। এই চিহ্নকে একটা অকাটা বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক চিহ্ন বলা বাইতে পারে। প্রত্যাশ্রম একজন ছিলেন তাহা কুলগ্রহে জানা যায়। বরেন্দ্র পুর এবং অল্পশ্রুর

অস্তিত্বও জানা যায়। বিজয় সেন বরেন্দ্রে প্রাত্যহিক হইয়াছিলেন এই অল্পশ্রুর পরে। ১০৭২ খৃষ্টাব্দে বিজয় সেন দক্ষিণ বরেন্দ্রে রাজ্য হইয়া থাকিলে, প্রত্যাশ্রম বরেন্দ্রপুর এবং অল্পশ্রুর রাজত্ব ২৫ বৎসর হিসাবে ৭৫ বৎসর ধরিলে, আমরা ১০৭২—২৫=১০৪৭ খৃষ্টাব্দ পাইতেছি। এই সময় মহীপাল (১ম) যে গোড়ের রাজত্ব করিতেছিলেন, অথবা, বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছিলেন তাহা অনুমান করা যায়। এই ভিন্ন পুর রাজ্য বাগগড়, কাছোজারয়জ গোড়পতি প্রভৃতিতে লইয়া একটা ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করিতে পারা যায়। ১৩১৯ সালের ১লা ফাল্গুন তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় এ বিষয়ে কতক লিখিয়াছি এবং মিনাকপুরে উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে পূর্ব আলোচনা করিয়াছি।

বিজয় সেন প্রত্যাশ্রমের বিগ্রহ স্থাপনকর্তা নহেন। তিনি কেবল মান্দরনিষ্ঠাপকর্তা। তাঁহার লিপিতে ইহার প্রমাণ। বাণ রাজ্যের বাড়ী ও অনিরুদ্ধের অস্তিত্বও ইহার একটা প্রমাণ; সুতরাং ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই, এ কথা বলা চলে না, একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া আলোচনা করিলেই সমস্ত তথ্য স্পষ্ট বুঝা যায়।

২। সাগর দীঘি।

রাঢ় দেশের সাগর দীঘি যে কোন মহীপালের কীর্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল শকাব্দা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে, কিন্তু সে সন্দেহ মাত্র ৩০ বৎসর লইয়া; অর্থাৎ ৭১০ শক হইবে কি ৭৪০ শক হইবে এই সন্দেহ হয়। এই সন্দেহে একটা শিলালিপির প্রমাণ আমি নষ্ট করিতে বলিতে পারি না, বা শিলালিপি নষ্ট করিয়াও এই মহীপালকে পালবংশীয় ১ম মহীপাল বলিতেই হইবে এরূপ ভেদ করিতে পারি না। নিখিল বাধু এই পাঠে সন্দেহ করিতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া বিশেষ কোন কারণ ব্যতীত সকলেই সন্দেহ করিবে এমন কোন কথা নাই। কারণ “শাকে সপ্ত” এই দুই শব্দে কোনই সন্দেহ নাই। ৭০০ শক

বর্ষ ১০২১

হইলেই ১ম মহীপাল হইল না, কারণ তিনি দশম খৃষ্ট শতাব্দীর শেষে এবং একাদশ খৃষ্ট শতাব্দীর প্রথমে ছিলেন। নলিনী বাবু অবশ্যই নিরপেক্ষভাবে এ সমস্ত বিচার করিয়া দেখিবেন। কোন ধারণা লইয়া বিচার করিবেন না।

### ৩। দ্বিতীয় মহীপাল।

তাম্রশাসন ও সমসাময়িক গ্রন্থ এই দুইটির মধ্যে কোমটা বেশী প্রামাণিক? যদি একজন রাজা বা রাজপুত্রের কথা তাঁহার ভ্রাতৃপুত্রের তাম্রশাসনে একরূপ এবং সমসাময়িক সংস্কৃত কবির লিখিত কাব্যে একরূপ পাওয়া যায়, তবে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস-লেখক কোমটার কথা গ্রহণ করিবেন? তাম্রশাসনে আত্মপ্রশংসা বা অতিরঞ্জিত কথা থাকে সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া কি তাম্রশাসন ত্যাগ করা যায়? বিশেষতঃ, দ্বিতীয় মহীপালকে রাজা বলিতে ভ্রাতৃপুত্রের কি বাধা ছিল? তাম্রশাসনে আত্মপক্ষের নিন্দা না থাকিলেও প্রকারান্তরে এমন ভাবে সেই ঘটনা লিখা থাকে যে একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই সহজে ধরা যায়। মদনপালের তাম্রশাসন, বৈষ্ণবদেবের তাম্রশাসন তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। ইহাতে রামপালের বরেন্দ্র উদ্ধারের বৃত্তান্ত লিখিত আছে, কিন্তু কখন বরেন্দ্র হস্তচ্যুত হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট লিখিত নাই। একরূপ ভাবে লিখিত আছে যে, একটু চিন্তা করিলেই ধরা যায়।

রামচরিতে লিখিত আছে, ২য় মহীপাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। মদনপালের তাম্রশাসনে এ কথা লিখিতে কি বাধা ছিল? রামচরিতে শূরপালের রাজত্বের কথা লিখা নাই, মদনপালের তাম্রশাসনে তাহা আছে, এই মিথ্যাটুকু তাম্রশাসনে লিখিবার কারণ কি? তাম্রশাসনানুসারে স্পষ্টই বুঝা যায়, ২য় মহীপাল রাজা হন নাই, শূরপাল রাজা হইয়াছিলেন, তখনও দিব্যোক বরেন্দ্র জয় করে নাই। রামপালের রাজত্বকালে এই কথাটা ইচ্ছিতে লেখা আছে। নিজের পিতার উপর

কলঙ্ক না দিয়া জ্যেষ্ঠভাতের উপর তাহা চাপাইয়া দেওয়াই ত স্বাভাবিক। তাহা না করিয়া মদনপাল কেন পিতার স্বন্ধে দিব্যোকের বরেন্দ্রজয় আনিয়া ফেলিলেন? নিজপক্ষের লিখিত শাসনে তিনি এই মিথ্যা কথা লিখিলেন কেন? এই সমস্ত বিষয় অবশ্যই বিবেচনার যোগ্য। আশা করি নলিনী বাবু এ সমস্ত আলোচনা করিয়া দেখিবেন।

নলিনী বাবু লিখিয়াছেন—পূৰ্ণ পুরুষের (রায় মহাশয়ের [ অর্থাৎ আমার ] মতে) কুৎসাপূর্ণ মিথ্যা চরিত্র চিত্রণে কলঙ্কিত পুস্তক রচনা করিয়া যত্বশূন্য পুরুষের প্রসাদ লাভ করার চেষ্টা একটু অসঙ্গত মনে হয় না কি? এখানে নলিনী বাবু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, যুদ্ধটা সত্য, স্ত্রীরাও পরাজয়চাঁও সহ্য। পুত্রের রূপালাভের আশায় এই পরাজয়-ব্যাপার পিতার স্বন্ধ হইতে কেহ যদি জ্যেষ্ঠ ভাতের স্বন্ধে চাপায়, তবে তাহা কি বড়ই অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়? মদনপালের তাম্রশাসনের কথা নন্দী কবি জানিলে কখনই এরূপ লিখিতেন না। না জানাতেই এরূপ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

নলিনী বাবু লিখিয়াছেন, পালরাজগণের তালিকার ২য় মহীপালের নাম আছে। যে তালিকা রাম-চরিতের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহাতেই ২য় মহীপাল নাম থাকিবে, আর যে তালিকা তাম্রশাসন অনুসারে লিখিত তাহাতে ২য় মহীপালের নাম থাকিতে পারে না। ২য় মহীপালের নাম পালরাজগণের তালিকার বাদ দেওয়া চলে না, এ কথা আমি কোথাও লিখি নাই। নলিনী বাবু আমার স্বন্ধে অনর্থক এই দোষ চাপাইয়াছেন।

আমি লিখিয়াছি—“মহীপাল রাজা না হইলে তাঁহার নাম তাম্রশাসনে বংশতালিকায় লিখিত হইয়াছে কেন?” নলিনী বাবু তাড়াতাড়ি বুঝিতে গিয়া বংশতালিকা হলে রাজগণের তালিকা বুঝিয়াছেন।

সে দোষ আমার নহে। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে তিনি আমার “এ রকম” কেন, কোন রকম “গৌড়ামি” বা যুক্তিশূন্য মতবাদ দেখিতে পাইতেন না।

নলিনী বাবুর কথা মত তাত্ত্বশাসন অবিখ্যাস করিলে ইতিহাসের উপকরণ কোথায় পাইব? নিজের গরজ মত একখানা অবিখ্যাস, একখানা বিশ্বাস করিলে প্রকৃত ইতিহাসের উদ্ধার হয় কি? তিনি হয়ত রামচরিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, আমি তাহা না করিয়া তাত্ত্বশাসন বিশ্বাস করিয়াছি। এ স্থলে কোনটা প্রকৃত বিশ্বাসযোগ্য তাহার বিচার অবশ্যই হইতে পারে। যে যে কারণে আমি রামচরিতের কথা বিশ্বাস করিতে পারি নাই, তাহা ‘গৃহস্থ’ পত্রিকায় লিখিয়াছি। আশা করি নলিনী বাবু সেগুলি স্মৃষ্টি হারা খণ্ডন করিবেন। তিনি নিরপেক্ষ বিচারে খণ্ডন করিতে পারিলে আমি তাহা অবনতমস্তকে মানিয়া লইব, কারণ আমি গৌড়া নহি। প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করাই আমার ব্রত। আমার পৃথিবীর পুরাতত্ত্বই তাহার প্রমাণ।

নলিনী বাবু রামচরিতকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিয়াছেন; তাই তিনি শুরপালের তাত্ত্বশাসনখানি তাঁহাদের রাজ্যচ্যুতির পরের লিখিত, বলিয়াছেন। মদনপালের তাত্ত্বশাসনখানি বুঝিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, শুরপালের রাজত্বকালে দিব্যোক বরেন্দ্র জয় করিতে পারে নাই। বৈষ্ণবদেবের তাত্ত্বশাসনেও স্পষ্টই বুঝা যায় রামপালের সময় দিব্যোক বরেন্দ্র জয় করিয়াছিল, আবার রামপালই তাহা উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই দুইখানা তাত্ত্বশাসন অবিখ্যাস করিয়া রামচরিতকে বিশ্বাস করিতে বলিলে তাহার কারণ বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। আশা করি নলিনী বাবু সে চেষ্টা করিবেন, কারণ ঐতিহাসিক তথ্য মত নির্দোষ হয় তাহাই প্রার্থনীয়।

নলিনী বাবু লিখিয়াছেন—“রামপালেও দিব্যোর সঙ্গে যুদ্ধ হয় নাই, কারণ মদনপালের শাসনের ১৬ শ্লোকে লিখিত আছে যে, দিব্য-প্রজার পক্ষভুক্ত লোক সবুহ আসিয়া রামপালকে আক্রমণ করিয়াছিল।” এ বড় আশ্চর্য কথা! দিব্য যুদ্ধ করিল না, তাহার পক্ষভুক্ত লোকে যুদ্ধ করিল, অতএব সে যুদ্ধ দিব্যোর করা হইল না! ভ্রম্ণণ সম্রাট স্বয়ং যুদ্ধ ক্ষেত্রে আছেন, কৃষিয়ার জয় যুদ্ধ ক্ষেত্রে নাই, তবে কি এ যুদ্ধ কৃষিয়ার জয় করিতেছেন না, কৃষিয়ার প্রজাবর্গ করিতেছেন? আমি নলিনী বাবুর এই কথার তাৎপর্য বুঝিতে পারি নাই। ১৬ শ্লোক ও বৈষ্ণবদেবের তাত্ত্বশাসনের ৪র্থ শ্লোক মিলাইয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, দিব্যোর সঙ্গে যুদ্ধে রামপাল জনকভূম হারাণ, পরে ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বধ করতঃ উদ্ধার করেন।

ভোজবর্ষার তাত্ত্বশাসনে লিখিত জাতবর্ষার দিব্যোর ভুক্ত নিন্দা কোন সময়ের কথা? দিব্য যদি বরেন্দ্র জয় করিয়াই লইল, তবে আর জাতবর্ষার দিব্যোর ভুক্তের নিন্দা করিলেন কেমন করিয়া? রামপালকে তিনি সাহায্য করেন নাই, তাহা রামচরিত পাঠে জানা যায়। সূতরাং শুরপালের রাজত্বকালে দিব্যোক আক্রমণ করিয়াছিল, সেই সময় জাতবর্ষার বাহুবলেই দিব্যোক রক্তকার্ষ্য হইতে পারে নাই। মদন পালের তাত্ত্বশাসন ভোজবর্ষার তাত্ত্বশাসন, রামচরিত একত্র করিয়া এই কথা বুঝা যায় না কি?

ভোজবর্ষার তাত্ত্বশাসনের ২৪ শ্লোকের অর্থ এই—  
“হা ধিক! কঠোর বিধ! অস্ত্র ভূবন বারশূন্য হইয়াছে! রাক্ষসকুলের উৎপাতবিধাতা (অলঙ্ঘ্যধিপ) রাম পুনরায় উপস্থিত হইয়াছেন কি? (এই) শঙ্কাকুল অবস্থাব (অয়ং) ভোজবর্ষদেব কুশলী হউন।” “এই শঙ্কায় সময় অলঙ্ঘ্যধিপ (রাম) জয়যুক্ত হউন” এই অর্থ নলিনী বাবু পাইলেন কোথায়? “রাক্ষসকুলের-উৎপাত বিধাতা রাম” এই উক্তিভেদে রাক্ষসকুল কোন কুলকে



বুঝাইতেছে ? ভোজবর্মার নিজের কুলকে বুঝাইতে না কি ? রামের পুনরাগমনে ভোজবর্মী শঙ্কাকুল হইয়াছিলেন, সুতরাং ইহাতে রামপালের কথা কিছুই নাই। ভোজবর্মীর প্রবল শত্রুকে উদ্দেশ্য করিয়াই এই কথা বলা হইয়াছে। রামপাল ভোজবর্মীর পূর্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন। রামচরিতের বর্মরাজা শ্রীমলবর্মী হইতে পারেন, হরিবর্মীও হইতে পারেন। নলিনীবাবু ভোজবর্মীর সময়টা একটু বিচার করিয়া দেখিলে ভাল হয়।

দেবোৎক বয়েসে জয় করিয়াছিল বটে, কিন্তু ভাতুপুত্র ভীমকে রাজা করিয়াছিল, নিজে রাজা হয় নাই।

৪। বিলাসপুর।

আমি লিখিয়াছিলাম, বিলাসপুর গঙ্গাতীরে হইবে। সন্তোষ আজাই নদীতীরে, সুতরাং তাহা বিলাসপুর হইতে পারে না। নলিনীবাবু তত্বতরে লিখিয়াছেন— “স ধনু ভাগীরথীপথপ্রবর্তমান” কথাটা বাঁধি গৎ। নলিনী বাবুর লিখিত মত হুঁতাপ্রকমে নহে, সৌভাগ্যক্রমেই আমি ইহা লক্ষ্য করিয়াছি এবং দেখিয়াছি বর্মপাল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক পাল রাজার রাজধানী গঙ্গাতীরে ছিল। বর্মপালের রাজধানী পাটনায়, দেবপাল ও নারায়ণপালের রাজধানী মুঙ্গেরে, ১ম মহীপালের রাজধানী বিলাসপুরে এবং যদনপালের রাজধানী রামাবতীতে ছিল। এ সমস্ত স্থানই গঙ্গাতীরে, সুতরাং ইহাকেই বাঁধি গৎ বলিব কিরূপে ? ইহা তো প্রকৃত কথা।

ঐবিনোদবিহারী রায়।

## আবুল মুজফর রচিত কবিতা ও ইটা রাজবংশ

( ঢাকা সাহিত্য পরিষদে পঠিত )

( প্রথমার্দ্ধ )

আবুল মুজফর চৌধুরী দক্ষিণ গ্রীহটের শেষ হিন্দু নৃপতি রাজা সুবিদনারায়ণের প্রপৌত্র। পাঠানদিগের আক্রমণে রাজা নিহত এবং চারি রাজপুত্র মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইলে পর ইহাদের মধ্যে একজন হাজি ধী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মুজফরের পিতা আব্দুল মজিদ এই হাজি ধীর পুত্র।

১৭০৯ খৃষ্টাব্দে মুজফরের পুত্র আবুল হেকিম প্রাপ্ত-বয়স্ক ছিলেন, এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। উক্ত সনে আবুল মুজফরের ভাতুপুত্র আবুল ফজল, পুত্র আবুল হেকিম এবং আবুল ফজলের পুত্র মাহাম্মদ নওয়াজ চৌধুরী নব-গঠিত সমসেরনগর পরগণার চৌধুরী পদ লাভ করেন।\* এই ঘটনা হইতে আবুল মুজফর চৌধুরীর সময়ের আভাস পাওয়া যায়।

আবুল মুজফর একজন পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারীরূপে সাধারণ্যে পরিচিত; কিন্তু তিনি পারস্তভাষাবিশ্নরূপেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আমরা এ স্থলে তদ্রচিত একটি কবিতার উল্লেখ করিব। দীর্ঘকালব্যাপী অহু-সন্ধানের ফলে নিজ পূর্বপুরুষগণ সম্বন্ধে তিনি যে সকল তথ্য অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তৎসমুদয়ই তিনি আলোচ্য কবিতায় নিবদ্ধ করিয়াছেন।

এই প্রাচীন গ্রাম্য কবিতা দক্ষিণ গ্রীহটে সুপরিচিত। লোক মুখে কয়েক পুরুষ বাবৎ গীত হওয়ার স্থানে স্থানে ইহার পাঠ-বিকৃতি ঘটিয়াছে, কিন্তু কবিতার ভাব সর্বত্রই একরূপ। এই কবিতার মধ্যে গ্রীহটের ইতিহাসের বহু

\* এতৎসংশ্লিষ্ট সনদের বঙ্গভাষাভাষ্য গ্রীহটের ইতিহাস গ্রন্থের ১৮৬ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে।

অজ্ঞাত-পূর্ব ঘটনার সমাবেশ রহিয়াছে। বিগত ১০।১২ বৎসর মধ্যে শ্রীহট্ট হইতে যে সকল ভাষা প্রচারিত হইয়াছে তৎসমুদয়ের সহিত এই কবিতার বিষয়গণের বহুস্থলে গুরুতর অনৈক্য দৃষ্ট হইবে। সুতরাং সত্য-নির্ধারণ করে কবিতাটি অতীব মূল্যবান।

আমরা কবিতায় অনুলিপি, মর্শ ও আধুনিক মত-বাদের মর্শ উত্থাপন পূর্বক সত্য নির্ধারণ করে পরিশেষে আলোচনার প্রস্তুত হইব।

### (ক) আবুল মুজফ্ফর রচিত কবিতার অনুলিপি

- বাচ্য গত্র জজুর্কেদ কর সাধা নিজ—১  
কনৌজ হনে আসিলেক নিষিপতি দ্বিজ—২  
অগ্নিহজ্রি মহাশয় নাম নিষিপতি—৩  
মুখ ঘারে অগ্নি আনি দিলেক আহতি—৪  
পূর্বদেশ শ্রীহটে, এক দেশ ইটা—৫  
ভোমিউড়া এওলাতালি বাকিলেক ভিটা—৬  
ভিটা বাকিয়া ভাটে ধর দিলা সূত্র—৭  
দৈববলে হইল তান ভোধর নামে পুত্র—৮  
ভোধর ভাটের বংশের নাহি অন্ত—৯  
বার বংশে পুরিয়াছে পৃথিবী পর্যন্ত—১০  
কতেক বান প্রহন্তে গেলা, কতেক কাশীবাসী  
—১১  
কতেক গৃহস্থ হইলা, কতেক সরাসী—১২  
ভোধরের ঘরে প্রধান তৃতীয় তনয়—১৩  
ডাকর, পুঙ্কর, প্রভাকর মহাশয়—১৪  
প্রভাকরের পুত্র হইলা কেশব সৌন্দর্য—১৫  
কেশবের তনয় হইলা কামদেব সৌন্দর্য—১৬  
কামদেবের পুত্র হইলা সুভরাজ খান—১৭  
সাহার প্রতিষ্ঠা হইল গৌড় বিভবান—১৮  
সাত লক্ষ শ্রীহট্টের বড় সিকদার—১৯  
হুই ডাকাতি মারি করিলা সংহার—২০

ভাঙ্গুনারায়ণের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ মল্লম—২১

ভাঙ্গুনারায়ণের পুত্র সুবুদ্ধি নারায়ণ—২২

সিন্ধু বুদ্ধি তথাপিও নানা গুণবন্ত—২৩

বিবাহ করিলা ভাটে পঞ্চ ব্রাহ্মণ—২৪

সর্ব প্রধান জএ বা কয়লাসুন্দরী—২৫

দুই পক্ষে জন্মিলেক বিশেষ সন্ততি—২৬

তিন জন পুত্র বিনা হইলা অপুত্রিনি—২৭

দুই পক্ষে চারি পুত্র হইলা প্রধান—২৮

জামাল খা, কামাল খা পণ্ডিত সুনন—২৯

হাজি খা, ইছা খা আদি বিদ্বান—৩০

রাম লক্ষণ দুই পুত্র ব্রাহ্মণ প্রধান—৩১

মহত্ব বংশেতে কত জন্মিতে লাগিলা—৩২

লেখিত না পারি কত জন্মি জন্মি মৈলা—৩৩

এক পক্ষে এক কন্যা নাম রত্নাবতী—৩৪

রঘুদেব ভাটে আদি তাহান সন্ততি—৩৫

দিলিপের বাদসা আছিল কাছির—৩৬

তার মর্শে পৃথিবীতে ঐরি নাহি স্থির—৩৭

তাহান ভ্রাতা ছিল খাজা উচমান—৩৮

বলবন্ত বুদ্ধিমন্ত লোহানি পাঠান—৩৯

আবুল মহজিরের সূত ছএ সহদর—৪০

প্রধান হইল কাছিম মনসুর মুজফ্ফর—৪১

আমন্দে আসিলেক কত সব প্রজা—৪২

তৃতীয় পুরুষ পর কন্যা সন্তান হইলা—৪৩

কত দিনে আবুল মনসুর বৈকুণ্ঠেতে গেলা—৪৪

সপ্ত দ্বিপ পৃথিবী জুড়ি ভৌমিকল্প হইলা—৪৫

কহে মুজফ্ফর তন সর্বজন—৪৬

নিষিপতির সন্তানের হইবে বিদ্বান—৪৭

মাস, ১৯৭১

( পূর্ব নকল লেখকের ) সাক্ষর শ্রীসর্দানন্দ দেব

সাক্ষিন পং ইটা মোড়ে ভোমিউড়া

( বর্তমান ) নকল লেখক—শ্রীসদানন্দ চক্রবর্তী

ভরফদার

শ্রীযুক্ত আবদুল করিম চৌধুরী দেওয়ান সাহেব প্রদত্ত।

তপছিল—১

নিধিপতি ভট্ট—১

ভোধর ভট্ট—১

প্রভাকর ভট্ট—১

কেশব সিকদার—১

কামদেব সিকদার—১

সুভদ্রা খান—১

ভানুনারায়ণ ভট্ট—১

উহান দুই পুত্র—

শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ ভট্ট

সুবুদ্ধি নারায়ণ রাজা—১

৮

কবিতার মন্দ্র ও আধুনিক মতবাদ—

শ্রীহট্ট হইতে ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায়, আধুনিক মতবাদগুলি, বিগত ১০।১২ বৎসর মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছে। প্রথমে বিশ্বকোষ ও বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ত্রাঙ্কণ কাণ্ড গ্রন্থে সাম্প্রদায়িক সমাজের প্রাচীন ইতিহাস এবং উক্ত সমাজের প্রখ্যাতনামা রাজা সুবিদনারায়ণের বংশ-বিবরণী সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। অতঃপর শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থে প্রথমোক্ত দুইখানা গ্রন্থের বিবরণগুলি দুই একটি সমরোপযোগী পরিবর্তন ব্যতীত যথাযথ ভাবে গৃহীত হইয়াছে।

যে সকল আধুনিক অমুদ্রিত ও অজ্ঞাত কুল-গ্রন্থের সাহায্যে রাজা সুবিদের পরিবার এবং মৃত-কল্পে সাম্প্রদায়িকগণের পুরাতন ইতিহাস গঠনের

চেষ্টা হইয়াছে তন্মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য—

( ১ ) ত্রিপুরার রাজপণ্ডিত পঞ্চকণ্ঠ লাউতা নিবাসী ৮ হরিশ্চন্দ্র বাহাদুরের প্রবন্ধে তদীয় জামাতা ইটা বড়-কাপন নিবাসী ৮ শ্রামশূন্দর ভট্টাচার্য্য বৈদিকসংবাদিনী নামক কুলগ্রন্থ রচনা করেন। এ পর্যন্ত ত্রাঙ্কণ-কাণ্ড ও শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে এই গ্রন্থের কয়েকটি পৃষ্ঠা মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মূল গ্রন্থের অন্তিম সন্ধকে অনেকে সন্দিহান আছেন। মুদ্রিত অংশে অধুনা-মুদ্রণ দুইখানা তাম্রশাসনের পাঠ দৃষ্ট হয়। প্রথম শাসনে ৬৪১ খৃঃ অব্দে ত্রিপুরারাজ আদি-ধর্ম্মফা অকুণ্ঠিত যজ্ঞ ও বাৎস্ত গোত্রীয় আনন্দ প্রভৃতি পঞ্চ মৈথিল বিগ্রকে পঞ্চকণ্ঠ দান বিবরণ, এবং দ্বিতীয় শাসনে ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা-রাজ স্বধর্ম্মকাম মুকুলে অবস্থিত চক্রসিংহ ত্রিপুরের অরণ্য, নিধিপতি নামক জনৈক বাৎস্ত গোত্রীয় মৈথিল বিগ্রকে দান করার বিবরণ দান পাইয়াছে।

এই সকল বিবরণ সম্পর্কে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত লেখক বলেন—

“দানপত্রগুলি বহু পূর্বেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। বিবরণটা প্রসিদ্ধ, অনেকেই জ্ঞাত ছিলেন, এবং তাহাই অবলম্বনে সাম্প্রদায়িক ত্রাঙ্কণবংশীয় এক ব্যক্তি ( ৮ শ্রামশূন্দর ভট্টাচার্য্য ) ইদানীং বৈদিক সংবাদিনী রচনা করিয়া বতটা কিংবদন্তীর সহায়তায় পাবেন, ততটা ইতিহাসরূপে নিবদ্ধ করিয়াছেন \* \* বঙ্গ হইয়াছিল ইহা ঠিক ; কিন্তু কি জন্ত হইয়াছিল, এতকাল পরে অরণ্য না হওয়াতে অশ্রু হ্রানের তাদৃশ ঘটনার ছাড়াপাত হওয়া অস্বাভাবিক নহে।” শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ, ১ম খণ্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা।

( ২ ) ৮ কালীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত প্রোতশ্রদ্ধ বিধি নামক গ্রন্থের শ্রীহট্টে বৈদিকনির্ণয়শীর্ষক অধ্যায়। এই গ্রন্থ ১০১৭-বাংলা ১লা পৌষ ৮ কালীধামে মুদ্রিত হয়।

੨੮੮-੨੮੯ ਗ੍ਰੰਥ।

“নিজেদের শাস্ত্রীয় ব্যাপার ও সম্বন্ধাদি বিষয়ে কোনও রূপ অন্তর্বিধা ভোগ করিতে না হয়, এই অভি-  
প্রায়ে বৎসাদি পঞ্চগোত্রীয়গণ মিথিলা হইতে কাত্যায়ন,  
কাজ্ঞপ, যৌদগ্গলা, নব্বকৌশিক ও গৌতম গোত্রীয়  
অসমাজস্ব ৫টি ব্রাহ্মণ সহ পঞ্চধণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন।”

কণৌজ নিবাসী নিধিপতি, শ্রীহট্টের নিধিপতি-বাংলা-  
গণের আদিপুরুষ। তাঁহার পুত্র ভূধর। ভূধরের  
বংশ বহুবিকৃত। ভাস্কর, পুস্কর ও প্রভাকর, তাঁহার  
পুত্রগণের মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ। প্রভাকরের পুত্র  
কেশব, পৌত্র কামদেব এবং প্রপৌত্র সুভরাজ। সকলেই  
“শিকদার” পদবী লাভ করেন। সুভরাজ “সাতলক্ষ  
শ্রীহট্টের বড় শিকদার” মধ্যে বিশেষ পরাক্রান্ত হন।  
তিনি পাঠান রাজত্বের সম্মানিত “খান” উপাধি লাভ  
করেন এবং কবির কথায়—“বাহার প্রতিষ্টা হইল পৌড়  
বিজয়ান।” নিয়ে কবির বর্ণনা হইতে সুভরাজের বংশ  
পত্রিকা উদ্ধার করা হইল—

৬৪১) খুজোদে ত্রিপুরারাজ আদিধর্ম্মক। ভাঙ্গুগাছ  
পরগণার অন্তর্গত মঙ্গলপুর গ্রামে বৎস, বাৎস্র, ভগ্নহাজ,  
কৃষ্ণাত্রেয় ও পরাশর গোত্রীয় পঞ্চ মৈথিল শিপের  
সাহায্যে শাকুনিক ও অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।  
ইঁহার একত্র দান স্বরূপ গ্রাণ্ড যে ভূখণ্ডে উপনিবিষ্ট হন  
উহা পঞ্চখণ্ড নামে অভিহিত হয়। দ্বীপুত্রাদি আনয়নের  
কল্প ১ বৎসর পরে তাঁহার। স্বদেশে গমন করেন।  
প্রত্যাবর্তন কালে ক্রিয়াকাণ্ডের সুবিধার কল্প তাঁহার।  
কাত্যায়ন, কাশ্যপ, মোদগুলা, স্বর্ণকৌমিক ও গৌতম  
গোত্রীয় ৫টি ব্রাহ্মণ পরিবার পঞ্চখণ্ডে আনয়ন করেন।  
মুক্তিত কাত্যায়ন-বংশবিবরণীর মধ্যে ৬৪০ খৃঃ অব্দের  
উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ সনে কাত্যায়ন বংশের আগমন  
ঘটে। এইরূপে ৬৪১-৬৪০ খৃঃ অব্দ মধ্যে মৈথিল বৈদিক  
১০ গোত্রীয় সাম্প্রদায়িক সমাজ ত্রিহট্টে সংস্থাপিত হয়।

```

    graph TD
      A[মিথিপতি] --> B[৪ পুরুষ]
      B --> C[সুভরাজ খান]
      C --> D[ভাঙ্গুনারায়ণ]
      D --> E[ঐক্য]
      D --> F[সুবুদ্ধি নারায়ণ]
      F --- G["(ইঁদার ও কানীর  
মধ্যে ২টা সন্তান  
সন্তানবতী ছিলেন)"]
      E --- H[জামাল বী, কামাল বী]
      F --- I[হাজি বী, ইছা বী]
      H --- J[রায়, লক্ষণ প্রতিম দুইটি  
হিন্দুধর্মাবলম্বী পুত্র]
      I --- K[কত্থা রত্নাবতী, বাহার  
বংশে রঘুদেব ভট্ট প্রজ্জতি  
অন্য গ্রাণ করেন।]
  
```

বাং, ১৩২১

**প্রচলিত মতবাদ—**

(১) জাতীয় ইতিহাস—নিধিপতি হইতে সুভরাজ সপ্তম পুরুষের ব্যক্তি।

সুভরাজ দিল্লীর হইতে “ধান” উপাধি প্রাপ্ত হন। সুভরাজের পুত্র ভাসুনারায়ণ। ভাসুনারায়ণের জ্যেষ্ঠ-পুত্র সুবিদনারায়ণ। হুমায়ুন ও সের সাহের বিরোধ কালে সুবিদ রাজত্ব করেন। ভাসুনারায়ণ হইতে ভাসুগাহ পরগণার নাম প্রচলিত হয়।—১৮৬ পৃষ্ঠা।

জাতিভ্রষ্ট রাজপুত্রগণের মুসলমান নাম জামাল খাঁ, কামাল খাঁ, হাজি খাঁ ও ইছা খাঁ। ইঁহার চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হইয়া নবাব কর্তৃক ভূম্যধিকারী পদে নিযুক্ত হন। সুবিদের পলায়িত পুত্ররয় ভাসুনারায়ণ, ব্রহ্মনারায়ণ এবং ধর্মনারায়ণও স্বল্পে থাকিয়া শেষে চৌধুরী উপাধি লাভ করেন। ইঁহার বধাক্রমে ভাসুগাহ, বরমচাল এবং ছয়টিড়িতে বসবাস করেন।—২২০ পৃষ্ঠা।

**(২) শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—**

নিধিপতি ইটায় এক ক্ষুদ্র রাজ্যের পত্তন করিয়া ভূমিউড়া-এওলাতলী গ্রামে নিজ রাজধানী স্থাপন করেন। সুভরাজ নিধিপতি হইতে ৯ম পুরুষের ব্যক্তি। সুভরাজ খাঁর পুত্র ভাসুনারায়ণ ত্রিপুরা-রাজ্যের বিজোহী সামন্ত চন্দ্রসিংহকে পরাজিত করার ত্রিপুরা হইতে রাজ্য উপাধি প্রাপ্ত হন।

**গ। ৩২-৩৫ পংক্তি—**

এই বহৎ বংশে বহু সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ করে। রাজকন্যা রত্নাবতীর বংশে রঘুদেব ভট্ট প্রভৃতি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

**১। জাতীয় ইতিহাস—**

সুবিদনারায়ণ সমাজপতি ছিলেন ( ১৮৬পৃঃ )। তাঁহার সহিত ভূমিসংক্রান্ত বিরোধের ফলে বৎস, ককাত্যের এবং ভরখাল গোত্রীয় বিগ্রগণ ইটা রাজ্য হইতে বিতাড়িত হন। অনাধ্যে কেহ কেহ রাজার মৃত্যুর

পরে ইটা অঞ্চলে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন ( ২২পৃঃ ) রাজা সুবিদ “ধর্মপাল বংশী” জনৈক মহীপাল হইতে মহারাজ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র এবং রত্নাবতী প্রভৃতি তিনটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে ( ৮৭ পৃঃ )। প্রতিগ্রাহী আনন্দের সন্তান ছিলেন বলিয়া রাজা সুবিদ ঋজু রত্নাবতীর বিবাহে কোশল অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভামাতা কাভ্যায়ন গোত্রীয় রঘুপতি ব্রহ্মবরূপ ভূমিউড়া গ্রাম প্রাপ্ত হন, কিন্তু রাজার কোশল ব্যর্থ হইল। ভামাতার ভ্রাতা ১৭ বর্ষীয় রঘুনাথ এই বিবাহে কুল-গৌরব ধ্বংস হওয়ার দেশ-ত্যাগী হইয়া নবদ্বীপ গমন করেন।

**২। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—**

রাজা সুবিদের সহিত সামাজিক বিরোধে পরাজিত হইয়া ব্রাহ্মণগণ ইটা রাজ্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। রঘুপতিমৌক্য বরূপ পাচগাউ, ভূমিউড়া, শ্রীপাড়া, সুরানন্দ এবং পশ্চিমভাগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

**ঘ। ৩৭-৩৯ পংক্তি—**

দিল্লীর জাহাঙ্গীরের ভয়ে শত্রুগণ স্থির থাকিতে সমর্থ হইত না। তিনি বলবন্ত বুদ্ধিমন্ত লোহানী পাঠান ভ্রাতা খজাউচমানকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

**১। জাতীয় ইতিহাস—**

খজাউচমান মুরশিদাবাদের নবাবের সেনাপতি ছিলেন। তিনি নবাব-তময়ের নিমিত্ত রাজকন্যা ভাসু-বতীকে লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া রাজা সুবিদ নারায়ণের রাজ্য আক্রমণ করেন।

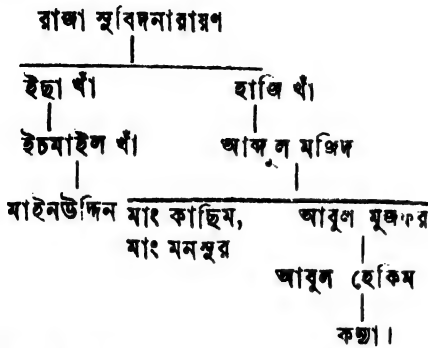
সের সাহ ও হুমায়ুনের বিরোধকালে রাজা সুবিদ প্রাজড় হইয়াছিলেন।

**২। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—**

১৫৪৮ খৃঃ অব্দে সের সাহ কর্তৃক লোহী খাঁর হস্তে খোয়াজ ওসমান নিহত হন। রাজা সুবিদের পুত্রগণ দিল্লী গমন পূর্বক মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হন।

উ। ৪০-৪৭ পংক্তি—

কবির বর্ণনা হইতে ইছা খাঁ ও হাজি খাঁর সংক্ষিপ্ত  
বংশ পত্রিকা প্রদত্ত হইল—



১। জাতীয় ইতিহাস—

সুবিদের রাজ্য-ভ্রষ্ট ইসলামধর্মীচারি পুত্র চৌধুরী  
উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ভূম্যধিকারী পদে নিযুক্ত হন।  
সুবিদের পলায়িত পুত্রত্রয়ও স্বার্থে থাকিয়া শেষে  
চৌধুরী উপাধি লাভ করেন। (৩য় অংশ, ২২৩ পৃষ্ঠা)।

২। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—

ইচমাইল ইছা খাঁর বৃদ্ধপ্রপৌত্র। আবুল মজিদ  
হাজি খাঁর বৃদ্ধপ্রপৌত্র। হাজি খাঁ ও ইছা খাঁ উভয়ের  
পরেই ৩ পুরুষ অজ্ঞাত।

চ। ৪৪-৪৯ পংক্তি—

উপসংহার

কহে মুজফর সুন সর্কজন

নিধিপতির সন্তানের হইবে বিড়খন

পার্শ্বে ভকছিল ও সাক্ষর

১। জাতীয় ইতিহাস—নীরব।

২। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—

মুজফর চৌধুরীর জীবনকালে তাঁহার ভূসম্পত্তি বহুল  
পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। তিনি ও তাঁহার জাতি  
আবুল ফজল চৌধুরী জিপুরা জুরনগরের কেন্দ্রাই  
গ্রামের পূর্ব অধিবাসী রাজাগ্রাম নামক জনৈক কৰ্ম-  
চারীকে হৃত নিযুক্ত করিয়া দিল্লী প্রেরণ করেন।

কবিতার প্রামাণিকতা—ইটার হুমুট রাজ-

পরিবারের ভাগ্য বিপর্যয়-কাহিনী শ্রীহট্টে সুপরিচিত।  
মুজফর এই পরিবারেই প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বে প্রাচুর্য  
হইয়াছিলেন। তদ্রচিত বংশবিবরণীমূলক স্মৃতি  
দক্ষিণ শ্রীহট্টে লোকমুখে অজ্ঞাপি রক্ষিত হইতেছে।  
কবিতার প্রদত্ত বিবরণ রূত্রিমতাপূর্ণ হইলে কবিতাজি  
কালের কঠোর আক্রমণ হইতে এইরূপে দীর্ঘকাল  
আত্মরক্ষা করিতে পারিত কি না সন্দেহের বিষয়।

ষষ্ঠীয়তঃ, আলোচ্য কবিতাব অমূল্যপি মুজফরের  
বর্তমান বংশধরগণের নিকট হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে।  
সাধারণতঃ অমূল্যত পরিবারে বংশবিবরণী রক্ষিত হয়  
না। এইরূপ স্থলে বংশবিবরণী বলিতে কয়েকটি  
অসংলগ্ন জনশ্রুতি এবং দুই চারিটি ব্যক্তির নাম ব্যতীত  
বিশেষ কিছু উদ্ধার করা একান্ত দুর্লভ ব্যাপার; কিন্তু  
মুজফর যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন উহা একটি  
প্রাকৃতিক মুসলমান ভূম্যধিকারী বংশ। সাধারণ  
বিশিষ্ট পরিবার হইতেও এই বংশের একটুই বিশেষত্ব  
আছে। ইঁহার দক্ষিণ শ্রীহট্টের শেখ হিন্দু নৃপতি,  
সমাজপতি রাজা সুবিদনারায়ণের সন্তান। সমাজে  
অজ্ঞাপি ইঁহার হিন্দুমুসলমান সকলেরই শ্রদ্ধা সমভাবে  
আকর্ষণ করিয়া আসিতেছেন। এইরূপ পরিবারে বংশ-  
পত্রিকা সর্বত্র রক্ষিত হওয়া একান্ত স্বাভাবিক, সুতরাং  
নিজ বংশীয়গণের নাম ও বিবরণী সংগ্রহ কালে মুজফরের  
পক্ষে তাঁহার পারিবারিক লিখিত-বিবরণী প্রকৃতির  
সাহায্য লাভ করা দুর্লভ ছিল না; বিশেষতঃ মুজফর  
নিজ অব্যবহিত পূর্ববর্তী কয়েক পুরুষ সম্বন্ধে যতদূর  
আভিজ্ঞ ছিলেন, তির সমাজকৃত্ত আধুনিক কালের  
বংশাবলী প্রণেতৃগণের পক্ষে ততদূর অভিজ্ঞ হওয়া  
সম্ভবপর নহে; সুতরাং মুজফর প্রদত্ত নামের গোষ্ঠাপর্বা  
ইটা দেওয়ান বংশীয়গণের জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্র,  
সনন্দ, কাবিন্‌নামা প্রভৃতি হইতে সমর্থিত হইবে।

তৃতীয়তঃ মুজফর প্রদত্ত বিবরণীর নামগুলি পর পর

বেঙ্গলে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার প্রণেতা মহাশয় আফজল চৌধুরী (ওরফে গাবরু মিঞা) রচিত পারদ্রুত ভাষায় লিখিত বংশ বিবরণী গ্রন্থও তাহার সম্পূর্ণ সমর্থন করে। মহাশয় আফজল চৌধুরী ১৭২৫ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ এবং ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। সুতরাং ১৮৭৫ খৃঃ অব্দের পূর্বেই মহাশয় আফজল চৌধুরী যে নিজ বংশবিবরণী গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়াছেন ইহা সুনিশ্চিত। ইটার দেওয়ান সাহেবগণের নিকট রক্ষিত উক্ত গ্রন্থ অবলম্বনেই ইতঃপূর্বে “প্রতিভা” [মাঘ ১৩২০] পত্রিকার রাজা সুবিদ্যনারায়ণের এক্ষণে সজ্জিত বংশ-পত্রিকা মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে প্রকাশিত বংশপত্রিকা হইতে অন্যান্য ২০ বৎসর পূর্বের এই শ্রেষ্ঠ বংশপত্রিকাও মুজফর প্রদত্ত বিবরণীর সমর্থন করিতেছে।

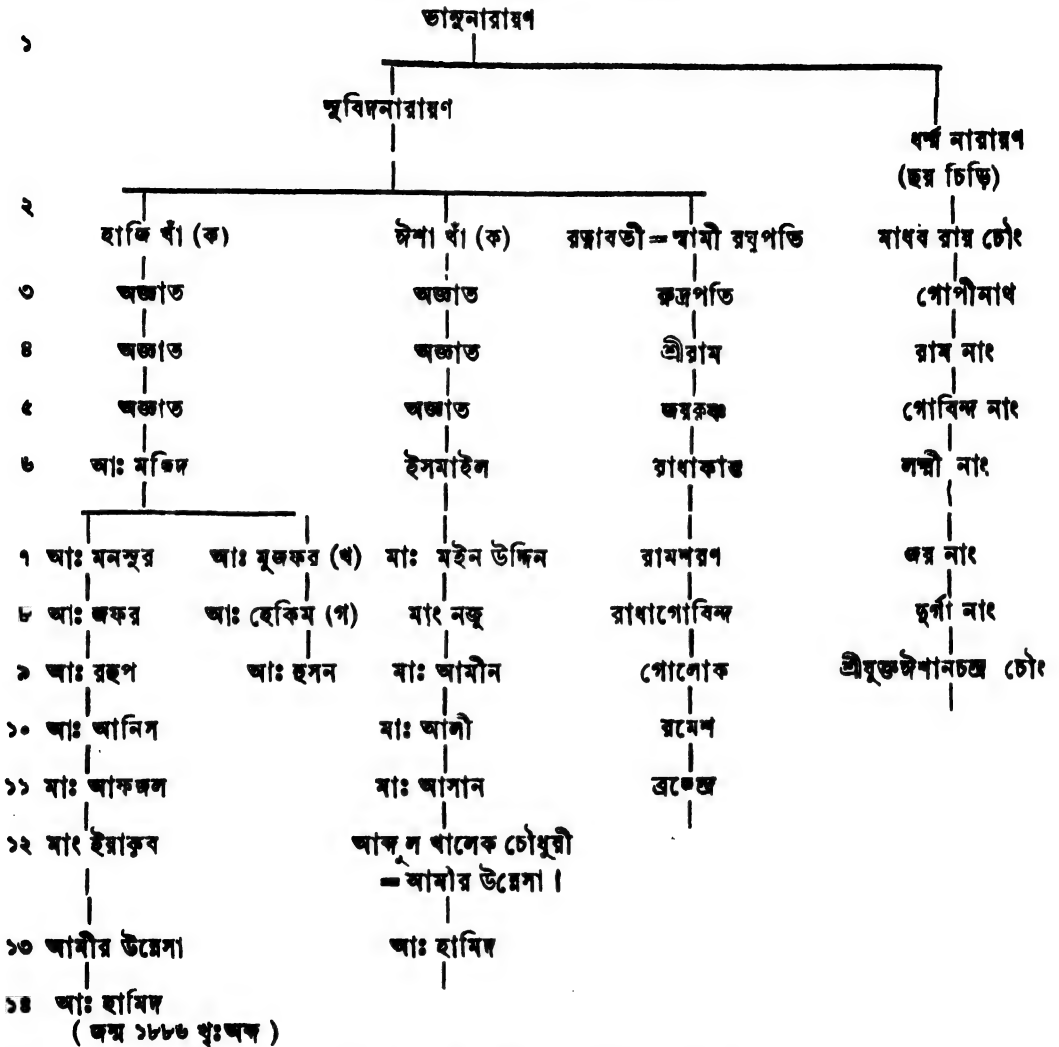
চতুর্থতঃ কোনও সম্ভ্রান্ত প্রাচীন পরিবারে বংশ-বিবরণী সম্বন্ধে উক্ত পরিবারভূক্ত ব্যক্তিগণের সাক্ষ্য, ভিন্ন স্থান বা সমাজভূক্ত ব্যক্তিবিশেষের সংগৃহীত কাহিনী হইতে অধিকতর দৃষ্ট্যবান। এমত অবস্থায় রাজবংশীয় খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের সাক্ষ্য উপেক্ষণীয় নহে। অজস্রদ্বন্দ্ব কাব্যে ব্যাপ্ত অবস্থায় আমরা রাজবংশীয় শ্রীযুক্ত আব্দুল খালেক চৌধুরী এবং তাহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম চৌধুরী দেওয়ান সাহেবগণের সহিত কবিতায় বর্ণিত এবং অপরাপর তথ্যের যে আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে মুজফর প্রদত্ত বিবরণীর প্রামাণিকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছি। বিগত কয়েক বৎসর মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় যে কয়েকখানা রাজবংশাবলী প্রচারিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের কৃত্রিমতা প্রদর্শন করিবার পক্ষে উক্ত দেওয়ান গৃহে রক্ষিত লিখিত প্রমাণাবলী এবং তদ্বংশীয় ব্যক্তিগণের সাক্ষ্যই পর্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে; যাহা হউক আমরা অন্তর্বিধ প্রমাণও উল্লেখ করিতেছি।

পঞ্চম বক্তব্য এই যে, জাতীয় ইতিহাস ‘এবং’ শ্রীহট্টের

ইতিবৃত্ত, গ্রন্থে প্রদত্ত আধুনিক বংশপত্রিকাগুলি যে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই প্রণীত হইয়াছে \* এইরূপ সংস্কার এমটু অনুধাবন পূর্বক উক্ত গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে পাঠকের মনে সত্যই বদ্ধমূল হইবে। ‘শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত’ গ্রন্থে রাজপুত্র হাজি খাঁ এবং জৈশা খাঁ উভয়ের পরেই “৩ পুরুষ অজ্ঞাত” রূপে দেখান হইয়াছে; অতঃপর হাজিখাঁর বংশে মজিদ ও তৎপুত্র মুজফরের নাম এবং জৈশাখাঁর বংশে ইচমাইল ও তৎপুত্র মইনউদ্দিন প্রভৃতির নাম প্রদত্ত হইয়াছে। মুজফর নিজকে মজিদের পুত্র এবং হাজিখাঁর পৌত্ররূপে প্রচার করিয়াছেন। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে প্রদত্ত বিবরণ প্রকৃত হইলে বলিতে হইবে যে, আবুল ফজল এবং মুজফরের বর্তমান বংশধরগণ, মুজফরের পিতামহের নাম জানিতে পারেন নাই, এমন কি মুজফরও নিজ পিতামহের প্রকৃত নাম অবগত ছিলেন না; অথবা তিনি এ সম্বন্ধে অপ্রকৃত কিস্তি রাখিয়া গিয়াছেন, এবং ইটাবানী জনসাধারণও ৫৬ পুরুষ বাবৎ মুজফরের অপ্রকৃত বিবরণই সত্য বলিয়া লোক মুখে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, আধুনিক বংশ পত্রিকা প্রচারকগণের নিকট হইতে যে সকল উপাদান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তৎসমুদয়ের সাহায্যেই তাহাদের প্রচারিত বংশ-পত্রিকার কৃত্রিমতা এবং মুজফর প্রদত্ত বিবরণের প্রামাণিকতা প্রতিপন্ন হয়। ‘শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত’ গ্রন্থের ১৬৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে যে, রাজপুত্র হাজি খাঁর বংশধর মুজফর এবং তৎপুত্র হেকিমের অধীন রাজারাম নামক জনৈক কর্মচারী, রাজকন্ডা রত্নাবতীর বংশধর জয়কৃষ্ণ তর্কবাগীশের নিকট হইতে শক্তিমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিবিধ দলিলপত্র হইতেও প্রমাণিত হয় যে,

\* শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রণেতা আধুনিক রাজবংশাবলী প্রচারকগণের অন্ততমরূপে বরমচালবাসী শ্রীযুক্ত হারকানাথ চৌধুরীর নাম ও উল্লেখ করিয়াছেন।

রাজার নাম, আব্দুল হেকিম চৌধুরীর মৃত্যুর পরে তাঁহার আব্দুল হেকিম উত্তরেবই সর্বাধিক। মিরে বিধবা পত্নী নগিনা বিবির অধীনে সরকারের কার্যে প্রথম সংক্ষিপ্ত বংশ-পত্রিকা হইতে তাহাদের পরম্পর নিযুক্ত ছিলেন; সুতরাং রাজারাজ্য অরক্ষণ এবং সম্পর্ক প্রদর্শিত হইবে—



উপরি-উক্ত বংশ-পত্রিকা বধো রাজপুত্র হাজি বাঁ ও প্রথম বিবরণী হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকল দৈশা বাঁর দুইটা শাখার বংশপত্রিকা, ঐহটের রাজকন্যা রত্নাবতীর বংশপত্রিকা, দাতার ইতিহাস, ওরতাপ, ১৯০৭ষ্ঠা হইতে পরিবারের দুইটি বিন্দুশাখার ৯ হইতে ১১ পুরুষ মাত্র এবং ধর্মনারায়ণের বংশপত্রিকা ঐযুক্ত দৈশানচন্দ্র চৌধুরী এবং মুসলমান দুইটি শাখার ১০ হইতে ১৪ পুরুষ



বাক্য

চলিতেছে! এতদ্ব্যতীত অসংখ্যক এবং আকুল হেঁকিম  
কল্পে বক্তব্য এই যে, অসংখ্যক রাজা সুবিদ হইতে পঞ্চম  
পুরুষের ব্যক্তি, পঞ্চদশের হেঁকিম ৮ম পুরুষের ব্যক্তি;  
অর্থাৎ একই বংশীয় সমসাময়িক হেঁকিম ও অসংখ্যক  
মধ্যে, ৩ তিন পুরুষ বাবধান! অতিরিক্ত “অজ্ঞাত”  
তিন পুরুষ সংযোগ করা হইয়াছে বলিয়াই সম্ভবতঃ  
এক বংশীয় সমসাময়িক দুই ব্যক্তির মধ্যে এক অসং-  
ভাবিক অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এমতাবস্থায়  
মুক্তকর নিজকে যে সুবিদ হইতে ৪র্থ পুরুষের ব্যক্তিরূপে  
প্রকাশ করিয়াছেন উহাই সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইবে।  
দুইটি মুসলমান রাজপুত্রের পরে তদ্বংশীয়গণের অজ্ঞাত  
সারে কৃত্রিম উপায়ে রাজার সময় দীর্ঘ এবং রাজ-  
কামাত। রত্নপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা রূপে শিরোমণি রত্ন-  
নাথের অবতারণা করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু হিন্দু  
শাখাধরেও তজপ ও পুরুষ বোজনা না করাতে এইরূপ  
চেষ্টা। ব্যর্থ এবং মুক্তকর প্রদত্ত বিবরণীর প্রামাণিকতা  
পরিষ্কৃত হইয়াছে।

আমরা অন্তঃপর কবিতায় বর্ণিত ঘটনাবলীর আলো-  
চনার প্রবৃত্তি হইব।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ।

(ক) ১৬২৮ খৃঃ অব্দে হাজি বাঁ এবং জৈশা বাঁ ‘চৌধুরী’  
পদ লাভ করেন। ১৭০৯ খৃঃ অব্দে আকুল হেঁকিম  
চৌধুরী। পদ লাভ করেন।

তুমি

[ প্রকাশিতব্য গীতিকাব্য ‘মর্গ’ হইতে ]

তুমি,

ছাড়িয়া গিয়াছ যোরে?  
আমার জনম-সাধনা-কুঞ্জে  
কুল নিখিল-কুসুম-পুঞ্জে  
নয়নে আঁকিয়া তোমার মুরতি  
আকুল নয়নলোরে

জনম জনম জনমাস্তর  
বসি একাসনে সারা অন্তর  
সঁপিয়া তোমারে, টেনেছি তোমারে  
বাঁধিয়া প্রাণের ডোরে।

তুমি,

ছাড়িয়া গিয়াছ যোরে?  
এসেছিলে তুমি হেন মনে লর,  
দিয়াছিলে বর, শান্তি, অন্তর,  
কুসুম-নুপুর-ঝড়া কুল-কুল  
এখনো পড়িয়া দোরে;

সুখ দিবালোক নিভায়ে আমার  
গিয়াছ কোথায়, আসিবে না আর?  
পাপল করিয়া দিবে না আমার  
এ দুখ-রজনী তোরে?

তুমি,

ছাড়িয়া গিয়াছ যোরে?  
শ্রীচূর্ণাধোহন কুশারী

- ২৬২। হইল গোলা দিলাম মাটি,  
কিসের ডাইলের কান্দাকাটি।
- ২৬৩। পঞ্চাশ হাত কাপড়েও মাইয়ার কান্দে কাছা।
- ২৬৪। ভিকার চাউল  
কাড়া আর আকাড়া।
- ২৬৫। উপুকাইয়া কাকড়া।
- ২৬৬। বার পেটে ছাও হয়,  
তারে আবার ছোট কয়।
- ২৬৭। লেখা পড়া ছালি ভূরা  
কপালের নাম গোড়া,  
চণ্ডীচরণ ষেষ্টা টোকায়  
রামায় দোরায় ঘোড়া। \*
- ছালিভূরা—ছাই তম্ব।  
ষেষ্টা—ঘুঁটে।

- ২৬৮। উনাভাতে দুনা বল,  
অতি ভাতে রসাতল।  
দুনা—ঘিঙণ।
- ২৬৯। তিরিমরে শিরী চড়ে  
নয় নাগের ঘরে ভোকার পড়ে।  
তিরি—দ্রী। শিরী—দ্রী।  
চড়ে—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

আসিল। সারাদিন রাত্রি রামচরণ ভয়ে ভয়ে কাটাইল। পরদিন চণ্ডীচরণ ঘুঁটে কুড়াইতে গিয়াছে, এমন সময় রাজবাটী হইতে লোক আসিয়া রামচরণকে খোঁজ করিল দেখিয়া ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। কিন্তু যখন সে জানিতে পারিল যে রাণী ভাল হইয়াছেন, রাজা তাহাকে পুরস্কার দিবেন, তখন তার আনন্দ দেখে কে ? রাজবাটীতে উপনীত হইলে পর রাজা তাহাকে প্রশংসা পূর্বক পুরস্কার দিতে চাহিয়া বলিলেন ‘তুমি ইচ্ছামত পুরস্কার চাহিতে পার।’ তখন রামচরণ বলিল ‘ঐ যে আঙাবলে বড় কাল ঘোড়াটা আছে উহা আমাকে দিন।’ আসিবার সময় ঐ কাল ঘোড়াটা বড় তার মনে লাগিয়াছিল। রাজা তাহাই করিলেন। রামচরণ বড়ই খুসী, তার ইচ্ছা ঘোড়া ছুটাইয়া একবার দাদার কাছে যায়, কিন্তু সে যে কখনও ঘোড়ায় উঠে নাই। চাকরকে বলিয়া তাহার সাহায্যে ঘোড়ায় চড়িলে। সে তখন বলিল ‘আমাকে বাঁধিয়া দেও, দেখিও যেন পড়িয়া না যাই।’ চাকর তাহাই করিয়া দিলে অশ্বগুঠে কশাঘাত করাতেই ঘোড়া ছুটিয়া চলিল—রামচরণ কোনওরূপে ঘোড়ায় পিঠে রহিল। মাঠে পৌছিতেই দূর হইতে চণ্ডীচরণ ইহা দেখিতে পাইয়া ভাবিল ‘কি সর্বনাশ। এ যে দেখিতেছি রাজার ঘোড়া ! দেখ, বোকার কাণ্ড—রাজা জানিলে আর রক্ষা নাই।’ তাই দেখিতে দেখিতে বলিতে লাগিল ‘আরে, রামা একি ?’ তখন আজ্ঞাদে আটখানা রামচরণ ঐ কথা বলিয়াছিল।

\* চণ্ডীচরণ ও রামচরণ দুই ভাই। জ্যেষ্ঠ চণ্ডীচরণ আয়ুর্বেদ পড়িয়া কবিরাজী করিত, আর কনিষ্ঠ রামচরণ ছিল নিরক্ষর,—দাদার গলগ্রহ। পূর্বে মাঠে কবিরাজ মহাশয়েরা ঘুটে সংগ্রহ করিয়া ঔষধাদি জাল দিতেন তাই চণ্ডীচরণ মাঠে গিয়াছে,—মূর্খ রামচরণ বাড়ী বসিয়া। এদিকে রাজবাড়ীতে রাণীর অসুখ; চণ্ডীচরণের নিমিত্ত পাইক আসিয়া হাজির। রামচরণ ভাবিল, দাদা ত বাড়ী নাই, আচ্ছা, আমিই যাই না কেন ? সুযোগে একবার রাজবাড়ীটা দেখিয়া আসিতে পারিব। সাহসে ভর করিয়া সাজিয়া গুজিয়া রামচরণ দাদার ঔষধের পুঁটলি হইতে নানাপ্রকার পোটা কয়েক বড়ী সঙ্গে লইল। রামচরণ রাণীর মহলে উপস্থিত হইয়া ভানপূর্বক দাদার ভায় শিরাতে হাত দিয়া কিছুকণ চোক বুজিয়া ভাবিল, ‘এক্ষণ কি করি ?’ তারপর বলিল ‘রোগ বড়ই শক্ত, কিন্তু এই আমি ঔষধ দিয়া যাইতেছি ইহাতেই রোগ সারিবে’। এই বলিয়া সব করটা বড়ী হইতেই কিছু কিছু করিয়া লইয়া একত্র করিয়া খাওয়াইয়া দিয়া বাটী চলিয়া

- ২৭০। স্নানর মুখের জয়,  
চিরকালই হয়।  
শেষ ঘরে হয় মাইয়া,  
যি পড়ে ছিকা বাইয়া বাইয়া ॥  
ছিকা—শিকা।
- ২৭১। বনের বাঘে খায় না,  
ঘনের বাঘে খায়।  
২৬৪। যদিন থাকে হেইয়ে মৃত,  
তদিন কেবল মা'র পুত।  
হেইয়ে—শয্যায়।  
মৃত—মৃত্যোগ।
- ২৭২। কয়জন বড় না,  
সয়জন বড়।  
২৬৫। ভানুরে যে পুরুষ  
ঠমকেই বুঝা যায়।
- ২৭৩। কি করলাম যে ভাই,  
রামায়ণ গাইয়া;  
২৬৬। টাকা দিয়া কিতা আমলাম  
জুইড়া রইল ঘর।  
আমার পুত্র আমার ক্ষেত্রে  
আমিই হইলাম পর ॥  
কিতা—কিনিয়া।  
জুইড়া—জুড়িয়া।
- ২৭৪। জুয়ানে জুয়ানে কথা প্রতি কথার হাস,  
বুড়ায় বুড়ায় কথা প্রতি কথার কাশ।  
২৬৭। যি মাইয়া বউর শিক্কা,  
বউ মারলে নাই রক্কা।  
মাইয়া—মারিয়া।
- ২৭৫। অকালে বাড়ে সকালে মরুতে।  
২৭৬। অদৃষ্টে আছে বিয়া  
কান্দলে হইব কি ?  
২৬৮। কিবা মাইয়ার মাইয়া,  
রূপে পড়ে বাইয়া।
- ২৭৭। হীরার ভিতর কীরের ছুরি।  
২৭৮। পেটের ভিতর বিবের হাড়ি,  
কথা কয়, হাসে।  
কথা দিয়া কথা নেয়,  
পর্যাণে মারে শেষে ॥
- ২৭৯। হুট মাইনুঘের মিষ্টি কথা,  
ঘনাইয়া বসে কাছে।  
কথা দিয়া কথা নিয়া  
পর্যাণে বধে শেষে ॥
- ২৮০। মাথাও নাই,  
ব্যথাও নাই।  
২৮১। কাইন্দা মোকদ্দমা জিত।  
কাইন্দা—কাঁদিয়া।
- ২৮২। ভাগের মার গলা পায় না।  
২৮৩। শেষ ঘরে হয় পুত,  
সংসারে লাগে মৃত।  
২৮২। সাপের ভেচুকা বাতায় চিনে।  
বাতায়—বেদিয়ায়।
- ২৮০। বার হয় বন্ধা,  
তার নাই রন্ধা।  
২৮১। কামের নামে যোগ্যতা নাই,  
\* ভরা রাগ।  
যোগ্যতা—কমতা।
- ২৮২। সন্দে বাইয়ে বারে ধরে,  
ভিলে ভিলে আলাইয়া মারে।  
সন্দে—সন্দেহ।  
বাইয়ে—বাহুরোপে।
- ২৮৩। আতের স্বভাব স্বগী বাই,

- এ রোগে আর অমুদ নাই ।  
বাই—বারু ।
- ২৯৪ । ধারার নাড়া টানে,  
গোদে সাত পুরুষ টানে ।
- ২৯৫ । গারেন, পাও কি ?  
ঠেক্ছি আর করি কি ?
- ২৯৬ । নামে ডাকে গুরু বশায়,  
শির লেজুর জ্ঞান নাই ।  
লেজুর—লেজ ।
- ২৯৭ । মাল্লব যদি নদীতে পড়ে,  
খ্যাড় কুটা আইকড়া ধরে ।  
খ্যাড়—খড় ।
- ২৯৮ । ধার মা, ছোর না. করে পুজি পাটা ।  
তার কপালে যারি কাটা ।  
কাটা—কাটা ।
- ২৯৯ । দেশের ফকির সেকের মত ।
- ৩০০ । বাড়ীর গরু—কোনার বাস ধার না ।  
কোলা—মাঠ ।
- ৩০১ । যার হয় না নয় এ,  
তার হয় না নরই এ ।
- ৩০২ । চুন খাইয়া মুখ তাংলে, দই দেখতে ডর করে ।
- ৩০৩ । সাপ স্বপন পনা,  
যে না কর সে এক জনা ।  
পনা—বৎস্তশাবক ।
- ৩০৪ । জানুবাড়া পুতি  
কামের নামে দেখা নাই  
বুজির ওতাঙতি ।  
পুতি—খুলতাত ( সাদর বচনে ) ।
- ৩০৫ । তেলা মাধার তেল দিতে  
সকলেই চায় ।  
রুক মাধা দেখলে পরে  
পলাইয়া যায় ॥
- ৩০৬ । জন্ম কাটাইলাম হোগলাকান্দি, পথ চিন্লাম না ।
- ৩০৭ । কানের লগে খোজ নাই, চিলের পাছে দৌড় ।
- ৩০৮ । মাইয়া বাচলে জামাইর আদর ।
- ৩০৯ । ছেঁচে ইন্দুর ভালে মাধা,  
তয় না ছাড়ে বড়াই কথা ।  
তয়—তবুও ।
- ৩১০ । এক কাঠি বাজে না ।
- ৩১১ । বেহায়াবশে জন্ম নিয়া  
লাজ খাইছে ভাতে দিয়া ।
- ৩১২ । আহাৰ নিজা মৈথুন তয়,  
যত বাড়ায় ততই হয় ।
- ৩১৩ । খাইতে ভাল চাউল ভাল,  
দেখতে ভাল মুরি,  
রসিক ভাল এক ছেলের মা,  
দেখতে ভাল ছুরি ।  
মুরি—মুড়ি । ছুরি—ছুঁড়ী ।
- ৩১৪ । ধার দায় করে বড়াই,  
সে কুটুমি কাজ নাই ।
- ৩১৫ । এক কড়ার মুরাদ নাই,  
ভাত মারার গোসাই ।  
মুরাদ—সম্পত্তি ।
- ৩১৬ । পরেরটা পাইয়া, উকাল করে খাইয়া ।  
উকাল—বয়স ।
- ৩১৭ । প্যাদার আবার স্বত্তর বাড়ী ।
- ৩১৮ । ভাগেরটা খাই বা না খাই,  
খুতাইয়া ফেলাই ।
- ৩১৯ । মধ্যে থাকতে গালী, পারে গেলে মাকী ।
- ৩২০ । কথার যত হাটিবাটা ।  
\* \* পরিপাটি
- ৩২১ । কলিকান্ধ্য গোলাপান,  
বাগেরে কর তারুক আন ।  
গোলাপান—ছেলেপেলে ।

- ৩২২। লাভ নাই বানিজ্যে কেচকেচি সার  
৩২৩। যেমন দেবা, তেমনি দেবী।  
৩২৪। কাচা তেতুলের অঞ্চল,  
নীতকালের কঞ্চল।  
৩২৫। কাচা তেতুল যেমন তেমন,  
পুরান তেতুল বিকারে।  
৩২৬। মাউগ নাই বেটা খণ্ডরবাড়ী যায়।  
৩২৭। বিয়ার লগে দেখা নাই,  
ছেইলার খারু গড়ায়।  
খারু—পার মল।  
৩২৮। চোরের মন ক্রিরাই ক্ষেতে।  
৩২৯। দিয়া ধন বোঝে মন,  
কাইড়া নিতে কতক্ষণ।  
৩৩০। গুণের আর সীমা নাই,  
ওরে আমার ভাইয়া কানাই।  
৩৩১। আকালে কি না খায়,  
পাগলে কি না গায়।  
৩৩২। চোরা খুইয়া নিচোরা বাক্কে,  
চোরা নাচে সভার পাঁকে।  
৩৩৩। আপনে বাচলে পুণের নাম।  
৩৩৪। পাগলামীতে গোমর নাই,  
চলার বাড়ি সার।  
৩৩৫। আগে গেলেও নির্কণ্ডা।  
পাছে গেলেও নির্কণ্ডা।  
৩৩৬। অমিয়া বার, ঘরে বইয়া ভের,  
যদি কর্ত্তে পার।  
বইয়া—বসিয়া।  
৩৩৭। বরজামাইয়ের অনেক দোষ,  
সদাই মনে তার আপশোষ।  
গুঞ্জির নামের লেশ নাই,  
লোকে বলে ফলনীর জামাই।  
৩৩৮। পাগলের গোবধে আনন্দ।

- ৩৩৯। কই বা রাজা ভোজ,  
আর কই গনারাম ভেলী।  
৩৪০। বিশ্বামিত্রও ঋষি,  
আর পুদির মায়ও পিসি।  
৩৪১। অথোধ্যার ঘু,  
আর সুন্দরবনের ঘু।  
৩৪২। হাতী ঘোড়া যায় তল,  
মেড়ার বলে কত জল।  
৩৪৩। কইলে মায় মাইর খায়,  
না কইলে বাপে উচ্ছিষ্ট খায়।  
৩৪৪। কাকের বেলা কাকী,  
কাম ফুরাইলে পাকী।  
৩৪৫। গোরাঙ্গের দুই বাধনায় গোরাঙ্গেরই।  
বাধনায়—ব্যাখ্যান (প্রশংসা) করে।  
৩৪৬। যে যায় লক্ষ্য সেই হয় রাক্ষস।  
৩৪৭। ধান ছড়াইলে কাকের আকাল।  
আকাল—অভাব।  
৩৪৮। সারা ঘরে নাই বত,  
কান বেচারে তত।  
কানবেচার—কুত্র বেড়াবিশেষ।  
৩৪৯। যারে না দেখছি সে বড় সুন্দরী,  
আর যার কথা না শুনি  
সে বড় কথরী।  
কথরী—বক্তা।  
৩৫০। বিজ্ঞার তলীতলী বর্ষা।  
৩৫১। চাচা, আপন পরাণ বাচা।  
৩৫২। নুন খাই যার, গুণ পাই তার।  
৩৫৩। সন্ন্যাসী ত চোর না, দৈবে ঘটায়।  
৩৫৪। সকল পথ লড়াগড়ি,  
খেওরা ঘাটে গড়াগড়ি।  
৩৫৫। ইতিপিত্তি পুইড়া দিছে লাউ গাছের গোড়ে।  
৩৫৬। ভাল ত ভাল, বাড়ী পোড়া ভাল।

# প্রতিভা

৪র্থ বর্ষ

ফাল্গুন ১৩২১

১১শ সংখ্যা

## উদাত্ত স্বর, টোন্ বা Accent.

ইংরেজী শব্দ শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন তাহার উদাত্ত স্বর টোন্ বা Accentগুলিও শুদ্ধরূপে শিখিতে হয়, প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ অভ্যাস করিতেও তদীয় উদাত্ত স্বর টোন্ বা Accent শিখিতে হইত। উদাত্ত স্বর টোন্ বা Accent এর দূর প্রভাব ছিল বলিয়াই. প্রাচীনতম সংস্কৃত ব্যাকরণ পাণিনিতে স্বর সংক্রান্ত ৩২৮টি সূত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং অধ্যাপক ম্যাকডনেল্ প্রমুখ মনীষিগণ সংস্কৃতভাষার উদাত্ত স্বর টোন্ বা Accentএর অস্তিত্বকে, উহা যে কদাপি কথিত ভাষা ছিল তাহার অন্ততম প্রকৃষ্টপ্রমাণ স্বরূপে পরিগণিত করিয়াছেন। হুংখের বিষয় এই যে, অজ্ঞাত উদাত্ত গুণগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভূতপূর্ব প্রভাবশালী উদাত্ত স্বর টোন্ বা Accent বঙ্গভাষা-ভাবী জনতা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। কথিত ভাষার উদাত্ত স্বর টোন্ বা Accent এর প্রতি লক্ষ্য রাখা দূরের কথা, প্রচলিত কলাপ মুদ্রবোধ প্রভৃতি সংস্কৃত ব্যাকরণে স্বরপ্রকরণষটিত কোনও কথাই পরিলক্ষিত হয় না। স্বরের অনুশীলন হইতে এত দূরে আমরা সরিয়া পড়িয়াছি যে, স্বর প্রকরণ বলিয়া যে একটা কথা আছে, তাহা আধুনিক কোন সংস্কৃত ব্যাকরণেও স্থান পাইবে না। দিল্লীপের

রাজ্যে “অতো তদ্ব্যবস্থা” লি, কিন্তু বঙ্গীয় সংস্কৃত সাহিত্যে স্বরবিবরণী বিজ্ঞা পুস্তকহা হইয়াও থাকিতে পারিবে না। স্বর-প্রকরণ যেন তদ্ব্যবস্থা অপেক্ষাও ঘোরতর পাপ। গতানুগতিক ভায়ে টীকাকার বঙ্গ-কুলভিলক পুরুষোত্তমদেবও স্বকীয় ভাষাবৃত্তি হইতে পাণিনি স্বরসূত্রগুলিকে নিষ্কাশিত করিয়াছেন। বঙ্গদেশ অপেক্ষা বোম্বাই বারাগসী প্রভৃতি অঞ্চলে সংস্কৃত চর্চার গাঢ়তা ও বিশালতা অধিকতর, ইহা অনেকেই স্বীকার করিবেন। বঙ্গদেশের এই অপ-বাদের কারণ কি, তাহা অন্বেষ্টব্য বটে। একটা কথা কিন্তু ঐক্য সত্য যে, তৎতদ্ অঞ্চলে মূল পানিনি ব্যাকরণেরই অধ্যয়ন অধ্যাপনা হইয়া থাকে, এবং সংস্কৃতশব্দের প্রকৃত উদাত্ত স্বর টোন্ বা Accent যথাসম্ভব রক্ষিত হইয়া থাকে।

অনেক বঙ্গীয় লেখক ই জে উ ডি ও, জ ব, ন ন র ব শ ব স ইহাদের মধ্যগত হ্রস্ব দীর্ঘ, বর্গীয় অঃহ, মূর্দ্ধন্ত দন্ত্য, বর্গীয় অঃহ, তালব্য মূর্দ্ধন্ত দন্ত্যকে অভিন্ন ভাবে উচ্চারিত ও লিখিত দেখিতে ইচ্ছুক। বঙ্গভাষার হু’টী, হু’টী উ, হু’টী ঞ, হু’টী জ, হু’টী ন, হু’টী ব, [ - ] শ না থাকিয়া একটা ইকার (?) একটা উকার (?) একটা ঞকার (?) একটা জকার (?) একটা ন কার (?) একটা বকার (?) ও একটা শকার (?) থাকুক, ইহাও অনেকের আকাঙ্ক্ষিত

কাল ১০২১

বটে। এমতাবস্থায় বঙ্গদেশে উদাত্ত স্বর টোন্ বা Accentএর অধ্যয়ন-অধ্যাপনার চেষ্টা করিয়া আগন্তুক একটা বৈষম্যের আনয়ন করা যে অবৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে ইহা বিশ্বাসের বিষয় নহে।

প্রচলিত বাঙ্গলা ব্যাকরণসমূহে অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঌ এ ঐ ও ঔ এই কয়েকটি অক্ষর স্বরবর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। স্বরবর্ণের এই গণপাঠ বা তালিকাতে স্বরবর্ণগুলির হ্রস্বদীর্ঘভেদ মাত্র দেখান হইয়াছে। প্রত্যন্তভেদ দেখান হয় নাই। সুতরাং এই গণপাঠ অসঙ্গত নহে। স্বরবর্ণের গণপাঠে, হয় হ্রস্ব-দীর্ঘপ্রত্যন্ত \* এই ভেদত্রয় দেখান উচিত, নতুবা মাহেশ সূত্রের মত অ ই উ ঋ ঌ এ ঐ ও ঔ এইরূপ উল্লেখ করা উচিত।

আ ঈ উ ঋ এ ঐ ও ঔ ইহাদের প্রত্যেকের উচ্চারণে হ্রস্ব স্বর উচ্চারণ অপেক্ষা দ্বিগুণ সময় লাগে বলিয়া ইহারা দীর্ঘ নামে পরিচিত। এরূপ, আ° ঈ° উ° ইত্যাদির প্রত্যেকের উচ্চারণে হ্রস্ব অপেক্ষা ত্রিগুণ সময়ের আবশ্যকতা হয় বলিয়া ইহাদিগকে প্রত্যন্ত স্বর কহে। প্রত্যেকটি বাঙ্গল বর্ণের উচ্চারণে যে সময়টুকুর প্রয়োজন হয় সে সময়কে অর্দ্ধমাত্রা কহে। অর্থাৎ, মনে করুন, হ্রস্ব অ ই উ ঋ ইহাদের প্রত্যেকের উচ্চারণে এক এক সেকেন্ড সময় লাগে। তাহা হইলে, আ ঈ উ ঋ এ ঐ ও ঔ কারের উচ্চারণে দুই দুই সেকেন্ড লাগিবে, এবং আ° ঈ° উ° ঋ° এ° ঐ° ও° ঔ° † ইহাদের প্রত্যেকের উচ্চারণে তিন তিন সেকেন্ডের প্রয়োজন হইবে। একই স্বরবর্ণ হ্রস্বদীর্ঘ প্রত্যন্ত এই তিন রকমে উচ্চারিত হইতে পারে। তাহা

\* অমাত্রাবরো হ্রস্বঃ। মাত্রা চ। গুরু বহুঃ প্রতি শাখ্য ১।৫৪-৫৫। বিত্তাবান্ দীর্ঘঃ। প্রত্যন্তঃ। ঐ ৫৭-৫৮। ব্যাকরণ অর্দ্ধমাত্রা ঐ ৫৯।

† কোন দীর্ঘ স্বরের পরে ৩ লিখিয়া উহারই প্রত্যন্ত স্বর নির্দেশ করা যায়।

উ-উ-উ° ‡ এই কুকটধ্বনিতে স্পষ্ট উচ্চারিত হইতে পাওয়া যায় ††।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, একই স্বরবর্ণের উচ্চারণে এক সেকেন্ড দুই সেকেন্ড ও তিন সেকেন্ড সময় লাগিতে পারে, এবং ঐ সময়ের দীর্ঘতার তারতম্য অনুসারে ঐ স্বরবর্ণ হ্রস্ব দীর্ঘ ও প্রত্যন্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এইরূপ ভেদ স্বরবর্ণের উচ্চারণ সময়ের বিশালতার (amplitude) উপরে নির্ভর করিয়া থাকে। উচ্চারণসময়ের বিশালতার তারতম্য অনুসারে নিম্ন-লিখিত হ্রস্ব দীর্ঘ প্রত্যন্ত প্রত্যেকের উচ্চারণগাভীর্ষ্য অনুসারে উদাত্ত অমুদাত্ত স্বরিত ভেদে তিন তিন প্রকারের ভেদ আছে। অকারের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ, ইকারের উচ্চারণ স্থান তালু, ঋকারের উচ্চারণ স্থান মূর্ধা, এইরূপে এক একটা স্বরবর্ণ বাগ্-যন্ত্রের এক একটা স্থান হইতে উচ্চারিত হয়। কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি স্থান উচ্চ অধঃ ও মধ্যভেদে তিন ভাগে বিভক্ত। স্বরবর্ণের যেরূপ উচ্চারণে উচ্চারণ স্থানের উর্দ্ধভাগ আক্রান্ত হয় সেই উচ্চারণকে উদাত্ত উচ্চারণ (Full Accent), যেরূপ উচ্চারণে উচ্চারণস্থানের অধো-ভাগে আক্রান্ত হয় তাহাকে অমুদাত্ত উচ্চারণ (No Accent) এবং যে উচ্চারণে উচ্চারণস্থানের মধ্যভাগ আক্রান্ত হয় তাহাকে স্বরিত উচ্চারণ (Half Accent) কহে।

স্বরিত স্বরের উচ্চারণে উহার আভ্যংশ উদাত্ত ও শেষাংশ অমুদাত্ত বলিয়া স্বরিত স্বরকে অর্দ্ধোদাত্ত বলা যায়। সুতরাং উদাত্ত দ্বিবিধ, পূর্ণোদাত্ত (বা উদাত্ত) এবং অর্দ্ধোদাত্ত। অর্দ্ধোদাত্তই হউক, আর পূর্ণোদাত্তই হউক, একটা শব্দে সাধারণতঃ একটা মাত্র স্বর উদাত্ত থাকে; অর্থাৎ ইংরেজী শব্দের মত সংস্কৃত

‡ কংস-দে-সাবু, তোর-নিতে আসছে-কক্ষ অব-তার।

†† উকালোজ্ হ্রস্বদীর্ঘ প্রত্যন্তঃ।

শব্দের একটি মাত্র স্বরবর্ণে উদাত্ত বা Accent পড়ে। অল্প স্বরবর্ণ অল্পদাত্ত হয় না। সমাসে এই উদাত্ত টোন্ টা সাধারণতঃ অস্ত্যস্বরের উপরে পড়ে। কিন্তু বহুব্রীহি সমাসে পূৰ্বপদের উদাত্ত টোন্ ই বজ্রায় থাকে\*। এমনও হইতে পারে যে, শব্দটির মধ্যে কোন অক্ষরে টোন্ ই দেওয়া হইল না, তখন শব্দটির প্রত্যেকটির অক্ষরের গাভীর্ষ্য এক রকমেরই গুণিতে পাওয়া যায় বলিয়া এইরূপ উচ্চারণকে একশ্রুতি উচ্চারণ কহে। কোনও দূরস্থিত ব্যক্তিকে সঙ্ঘোষন করিতে এই উচ্চারণ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়†।

ইংরেজী ভাষার দ্ব্যয়, সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় দ্ব্যক্ষর ( Dissyllabic ) ত্র্যক্ষর ( TriSyllabic ) প্রভৃতি কোন কোন শব্দের উদাত্তের (Accentএর) অবস্থান অল্পসারে শব্দটির অর্থের বৈষম্য ঘটয়া থাকে। যেমন ‘ইন্দ্র শত্রু’ এই সমাসটিতে দুইটি শব্দ আছে—‘ইন্দ্র’ এবং ‘শত্রু’। বেদে শত্রু শব্দের অর্থ ‘শাতয়িতা’ ‘শময়িতা’ বা ‘প্রশমনকারী’ ছিল। পরে সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় উহা ‘অরি’ অর্থে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, এবং বহুব্রীহি ও তৎপুরুষ সমাস নির্মিংশেবে ‘ইন্দ্রশত্রু’ শব্দদ্বারা বৃত্তাস্তুরকে বুঝাইয়াছে। কিন্তু, বৈদিক ‘শাতয়িতা’ অর্থ ধরিলে, বহুব্রীহি ও তৎপুরুষে বিপরীত অর্থের প্রতীতি হয়, এবং উদাত্ত উচ্চারণের বৈষম্য ঘটে হয়। ‘ইন্দ্রশত্রু’ শব্দের বহুব্রীহি সমাসের অর্থ—‘ইন্দ্রই’ হইয়াছে দমনকারী যাহার এমন বৃত্তাস্তুর; তৎপুরুষ সমাসে ঐ শব্দেরই অর্থ—‘ইন্দ্রের শাতয়িতা বা দমনকারী বৃত্তাস্তুর। আবার ‘ইন্দ্রশত্রু’ শব্দটিকে বহুব্রীহি সমাস বলিয়া গণ্য করিলে এই শব্দের উদাত্ত-স্বর (Accent) আন্ত অক্ষর ইকারে পড়িবে এবং তৎপুরুষ বলিলে উদাত্ত উচ্চারণ অস্ত্যস্বর উকারের হইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ‘ইন্দ্রশত্রু’ এই একটি মাত্র বাক্যের উচ্চারণ ভেদে দুইটি বিপরীত অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে। বহুব্রীহি অর্থ—‘ইন্দ্র তোমাকে বধ করুন এবং তৎপুরুষ পক্ষে অর্থ ‘তুমি ইন্দ্রকে বধ কর’ (!)।

এইরূপ প্রবাদ আছে যে, একদা কোনও ঋষিক পুরোহিত ‘ইন্দ্রশত্রু বর্জ্জব’ এই মন্ত্রের উচ্চারণ কালে কালে ইকারের উদাত্ত উচ্চারণ না করিয়া অথচ উকারের উদাত্ত উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞমানের বিশেষ অনিষ্ট ঘটাইয়াছিলেন। তাই স্বর ও বর্ণের যথার্থ উচ্চারণের আবশ্যিকতা সম্বন্ধে ভগবান্ ভাষাকার বলিয়াছেন,—

দুঃ শব্দঃ স্বরতো বর্ণতো বা

মিথ্যাঃ প্রযুক্তো ন তদ্ব্যমাহ।

স বাগবজ্জো যজ্ঞমানং হিনন্তি

যথেষ্টশত্রুঃ স্বরতোহপরাধাৎ ॥

অর্থাৎ কোনও শব্দকে স্বরচুটে বা বর্ণচুটে করিয়া উচ্চারণ করিলে, মনে করিতে হইবে যে, ঐ শব্দের প্রয়োগ ব্যর্থ হইল। উহা অভিপ্রেত অর্থের প্রতীতি জন্মাইতে কেবল অসমর্থ হইল এমন নহে। পরন্তু ‘ইন্দ্র শত্রু’ শব্দের আন্ত অক্ষরের উদাত্ত উচ্চারণ না করিয়া অস্ত্য অক্ষরের উদাত্ত উচ্চারণ করিবার অপরাধে যজ্ঞ-মানের যেক্ষণ মহৎ অনিষ্ট হইয়াছিল, এইরূপ প্রত্যেক অপপ্রযুক্ত স্বরই বাথজ্ঞ হইয়া যজ্ঞমানের ঘোর অনিষ্টের কারণ হইয়া থাকে।

বাঙ্গলা ভাষায় একশ্রুতি ‘বাজা’ শব্দের অর্থ ‘বাস্তবজ্ঞ’ এবং অন্তোদাত্ত ‘বাজা’ \* শব্দের অর্থ ‘বজ্রা’। কোনও দোকানের কপালে লেখা ছিল, “এই দোকানে বাজা মেরামত হয়”, তাহা দেখিয়া কোনও পণিক ‘বাজা’ শব্দকে অন্তোদাত্ত পাঠ করিয়া বিবম লাহনা ভোগ করিয়াছিলেন।

সংস্কৃতমাতৃক বঙ্গভাষাতেও শব্দের উদাত্তের স্থান

\* পূর্ববদে প্রচলিত।

\* পাণিনিঃ ৬।১।২২৩, ৬।১।২৫৮। ৬।২।১।

† যেমন, আগচ্ছ, ভো যাপযক।



কাভুন ১৯২১

তেদে অর্থে বৈলক্ষ্য্য হইয়া থাকে। বক্তাব্যভেদে উদাস্ত টোন্ বে মেহাৎ অকিকিংকর পদার্থ নহে, তাহা নিম্নলিখিত শব্দবিধুনসমূহে প্রতীয়মান হইবে।

নিম্নলিখিত শব্দকর শব্দবিধুনসমূহের প্রথম শব্দটির একশ্রুতি ও দ্বিতীয়টির উচ্চারণ উদাস্ত। \*

খাল ( hide ) খাল ( canal )

বুড়ি ( kite ) বুড়ি ( I wandar )

খানা ( dish ) খানা ( why don't you eat ? )

চড়া ( island ) চড়া ( চড়াই পাখী, খাপর যার, বা তীক্ষ্ণ। যথা চড়া কথ, চড়া মেজাজ, চড়া আওয়াজ ইত্যাদি )।

চাই ( মন্তব্য পরিবার কাদ বিশেষ ) চাই ( do you want ? )

চিনি ( sugar ) চিনি ( I know )

ছাড়া ( except, তা'ছাড়া ) ছাড়া ( get rid of )

জান ( know ) জান ( life )

জানা ( to know ) জানা ( why don't you go ? )

তার ( wire ) তার ( his )

তারা ( star ) তারা ( they )

তোলা ( tola ) তোলা ( to life )

দাড়ি ( oarsman ) দাড়ি ( beard )

পানি ( hand ) পানি ( water )

পালা ( tame ) এক পালা ( one course )

নাম ( Name ) নাম ( get down )

যার ( Scum ) যার ( beat )

বুড়ি ( the terminus ) বুড়ি ( common Indian Biscuit )

রবে ( at the sound ) রবে ( will stay on )

লাগা ( to stick ) লাগা ( to be at )

বলা ( to say ) বলা ( Name of বলাই )

বান ( flood ) বান ( tie down )

বামন ( dwarf ) বামন ( a, Brahmin )

বার ( week day ) বার ( to turn out, বারি করা )

বাগি ( the name of a station ) বাগি ( barley )

শরা ( a cup ) শরা ( remove )

শব ( dead body ) শব ( all )

শালা ( house ) শালা ( a term of abuse )

শোনা ( heard ) শোনা ( why don't you lie down )

সর ( Seam ) সর ( move down )

সবে ( just now ) সবে ( all )

নিম্নলিখিত ত্রাকর শব্দগুলির মধ্যোদাস্ত অবস্থায় এক রূপ অর্থ, একশ্রুতি অবস্থায় অত্র অর্থ—

আমরা ( we ) আমরা ( a kind of fruit )

পড়িয়া ( reading, wearing ) পড়িয়া ( falling )

গড়ান ( to build ) গড়ান ( to roll )

কুমার ( potter ) কুমার ( a bachelor )

নিম্নলিখিত কথাগুলির আদ্যোদাস্ত অবস্থায় একরূপ অর্থ, এবং একশ্রুতি ও অন্ত্যোদাস্ত অবস্থায় অত্ররূপ অর্থ—

ডাইন ( right ) ডাইন ( a false friend )

গায় না ( does not sing ) গায় না ( not in the body )

আয় না ( why don't you come ) আয়না ( looking glass )

মায়না ( Salary ) মায় না ( not the mother )

উপর্যুক্ত উদাহরণগুলিতে দেখা যে, হ্রস্ব স্বরের উচ্চারণও উদাস্ত হইতে পারে, এবং দীর্ঘস্বরের উচ্চারণও উদাস্ত হইতে পারে।

মধ্যোদাস্ত উর্নান ( hearth, to melt ) ও জানালা ( window ) শব্দে দীর্ঘ উদাস্ত বটে। কিন্তু, ভিজা গ্রাহক, প্রতিদিন, সকল, জনরব, ও শ্রবণ শব্দে হ্রস্ব স্বরই উদাস্ত।

অকারান্ত বাদলা শব্দের অধ্য অকার প্রায়ই উদাস্ত

\* মুদ্রণ সৌকর্য্যার্থ উদাস্ত Accentক ( ' ) দ্বারা দেখান হইবে।

(accented) হয় না। ফলে ঐ অস্ত্র অকারটি আদৌ উচ্চারিত হয় না, শব্দটি হলন্ত শব্দের জায় উচ্চারিত হয়। যথা,

সুখ, সুখ, পান, দান, হাম, শ্রাম, বাম, নাম, পার্ক, ত্যাগ, রাগ, দার, জ'প ইত্যাদি।

বাঙ্গলায় ও সংস্কৃতে উভয়ত্রেই নিম্নলিখিত শব্দগুলি অস্ত্রোদাত্ত—

বুধ, জ'ন, অ'র, গ্র'হ, হ'য়, ম'য়, বে'দ, ম'ত্র, যা'ম, ধা'রা, পা'দ, ক'ল্প, গু'প্ত, বু'দ্ধ, দ'ত্ত, ক'ঠা, ও'ষ্ঠা, ব'ন্দা, শ'স্ত্র, অ'জ, ব'জ, কু'শ, কা'শ, না'থ, তি'ল, কা'ল, ব'ক, হ'রিণ, গ্রা'ম, কু'ন্তিকা, শ'রীর, জ'দয়।

বাঙ্গলায় ও সংস্কৃতে উভয়ত্রেই নিম্নলিখিত শব্দগুলি মধ্যোদাত্ত—

সা'গর, কন্স'ক, ককু'ট, ললা'ট, কপো'ল, মল'য়, পা'দপ, আ'তপ, অ'মৃত, শৈবা'ল, অজ'র, অম'র, অ'মৃত, সুর'ধ, কুলা'য়।

বাঙ্গলায় ও সংস্কৃতে নিম্নলিখিত শব্দগুলি অস্ত্রোদাত্ত :—

অ'ষা' মাতা' ম'ষা' অ'ম্বরধা', রা'জকুমারী' অ'ম্লেবা' ধনিষ্ঠা'

বহুস্থলে উপর্যুক্ত উদাত্ত টোন্ শব্দের এক অক্ষরে না পড়িয়া বস্তুর সুবিধামুসারে বিকল্পে অস্ত্র অক্ষরেও পড়িয়া থাকে। যথা,

ই'কু ই'কু, ক'লা ক'লা, উ'মা, উ'মা, কা'ঠা কা'ঠা, উ'দক, উ'দক, গা'জারি গা'জারি, উ'র্ষর উ'র্ষর, ব'লীব'দ, ব'লীব'দ, ক'ল্যাণ ক'ল্যাণ, কো'লাহল কো'লাহল, সু'ধ সু'ধ।

ত্রীদেবেশ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

## চন্দ্রকান্ত প্রসঙ্গ

‘শিক্ষা’ ও তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা

মহাত্মা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কর্মজীবনের অর্দ্ধাংশ সেরপুরে ও অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ কলিকাতা নগরীতে অতিবাহিত হয়। তিনি স্বদেশে সেরপুরে থাকিয়া যতদিন স্বাধীনভাবে অধ্যাপনা করিয়াছেন, ততদিন কেবল অধ্যাপনা দ্বারা উপযুক্ত শিষ্যগণের বিভাবুদ্ধির যাক্সনা কার্যোই সম্পূর্ণ ব্যাপ্ত ছিলেন না। ৪০।৫০টি ছাত্রকে প্রত্যহ নিয়মিতরূপে বিজ্ঞাদান করিয়াও দিবারাত্র আহ্বারের পর বিশ্রাম অবকাশে স্বাধীন চিন্তা দ্বারা সংসারের বহুবিধ জটিল সমস্যার মীমাংসা করিতে চেষ্টা পাইতেন। তাহার প্রতিভা সর্বতোমুখী গতি অবলম্বন করিয়া আমাদের জন্ত অনেক অমূল্য বস্তু সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

তর্কালঙ্কার মহাশয় সেরপুরে অবস্থিতি কালে অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সে সকল গ্রন্থ সংস্কৃত বিজ্ঞানরত্নাশোরের এক একটি কোহিনূর তুল্য। তাহার সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের নাম আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এই সকল গ্রন্থের বিবরণ আমরা যথাস্থানে বিবৃত করিবার চেষ্টা পাইব। কিন্তু যে সময়ে বাঙ্গলার দুই চারিজন সংস্কৃত পণ্ডিত বাতীত বাঙ্গলা ভাষায় আলোচনা, শুধু আলোচনা নহে বর্তমান যুগের কঠিনতর সমস্যার সুমীমাংসাকল্পে বাঙ্গলা ভাষায় মৌলিক প্রবন্ধ বা গ্রন্থরচনা অসম্ভব পণ্ডিতের নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বা অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইবার কথা, আমরা দেখিতে পাই, ঠিক সেই সময়েই ভাষা জননীর সুযোগ্য সন্তান তর্কালঙ্কার মহাশয়ের স্বদেশ স্বজাতি ও স্বকীয় সমাজের মঙ্গলময়ী শিক্ষাবিধিগণী চিন্তা, বঙ্গভাষায় সাহায্যে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

আজি যে বঙ্গভাষা-জননীর বহুমুখিতাকিরীটপ্রভায় সমগ্র সভ্য জগৎ আলোকিত ও চমৎকৃত, বাহার অনিন্দ্যসুন্দর ত্রীপাদপদ্মবন্দনা করিয়া থাওয়া হইবার আগ্রহ, বর্তমান সময়ে সকল শ্রেণীর শিক্ষিত দেশবাসীর একান্ত প্রাণের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখনকার দিনে ঠিক এমনটী ছিল না। সংস্কৃত পণ্ডিতদিগের মধ্যে বিভাসাগর মহাশয়, রামগতি ঞায়রত্ন, ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রভৃতি কয়েকজন মাত্র বাঙ্গলা ভাষায় প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি লিখিতেন। আমরা বাহা শুনিতে পাই তাহাতে মনে হয় পুরোঁকৃত সংস্কৃত পণ্ডিতদিগের বঙ্গভাষার আলোচনার প্রতি সাধারণ সংস্কৃত পণ্ডিতগণের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। তর্কালঙ্কার মহাশয় চিরকাল স্বাধীনতার পক্ষপাতী, নিজের বিবেক ও শক্তির উপর তাঁহার যথেষ্ট নির্ভর ছিল, সুতরাং তিনি তাঁহার স্বাধীনচিন্তালব্ধ, শিক্ষাবিষয়ক মতামত প্রথমতঃ স্থানীয় সংবাদ-পত্র “চারুবার্তায়” প্রবন্ধ আকারে প্রকাশ করেন। তাঁহার সেই সকল প্রবন্ধ “শিক্ষা” নামক গ্রন্থরূপে ১৮০৪ শকাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।

আমরা তাঁহার রচিত ‘শিক্ষা’ নামক সুচিন্তিত প্রবন্ধ বা গ্রন্থের কতকটা পরিচয় আমাদের প্রিয় পাঠকগণের সমীপে উপস্থাপিত করিব। আমরা বলিয়াছি, তর্কালঙ্কার মহাশয়ের শিক্ষা নামক বাঙ্গলা পুস্তকখানি ১৮০৪ শকে ( ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ) প্রথম মুদ্রিত হয়, তৎপর ইহার কোনও সংস্করণ হয় নাই। এই পুস্তকখানি তৎকালের শিক্ষিত সমাজে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল বলিয়া আমরা জামি, এমন কি প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হইবারও কথা হইয়াছিল। কিন্তু জনশ্রুতি এইরূপ যে তৎকালে বাঙ্গলা ভাষার বর্ণাবলী ইংরাজী অক্ষরে পরিবর্তিত করিবার একটি প্রস্তাব কোনও খ্যাতনামা ভারতবাসী কর্তৃক উপস্থাপিত হইয়াছিল। সেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোনও উক্তি শিক্ষা

নামক গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে বলিয়া নাকি বইখানি পাঠ্যতালিকাতুচ্ছ হইতে পারে নাই; কারণ তখনকার দিনে সেই প্রস্তাবকারী মহাশয়ের প্রতিপত্তি প্রায় সর্বতোমুখী ছিল। সে বাহা হউক, তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পুস্তকখানি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু, বর্তমান গৌহাটী কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বনমালি বেদান্ততীর্থ এম, এ মহাশয় আমাদের নিকট গল্প করিয়াছেন, তাঁহার বধন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েন, তখন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই মহাশয় প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি একদিন কথাপ্রসঙ্গে ক্লাসে বলিয়াছিলেন—বিভাসাগর মহাশয়ের মত আরও একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাঙ্গলা লিখিতে পারিতেন; তাঁহার নাম চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইনি ইদানীং নিজের অতুল প্রতিভা সংস্কৃত লিখিয়া একরূপ নষ্ট করিতেছেন (?) বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের শিক্ষানামক পুস্তকখানি “বেইন” ( Bain ) এবং “স্পেন্সারের” ( Spencer ) পুস্তকের সমকক্ষ”। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের মত নিরপেক্ষ সুশিক্ষিত সুসমালোচকের মতামত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মতামত বলিয়াই আমরা গ্রহণ করিতে পারি। আজি যদি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ‘শিক্ষা’ পুস্তকখানি সর্বসাধারণের মধ্যে অজুলীলিত হইবার সুবিধা থাকিত তবে বোধহয় আমাদের গকেও তাঁহার পুস্তকের কথা এত করিয়া বলিতে হইত না। বাঙ্গালার পাঠকমণ্ডলী তাঁহার ওজস্বিনী ভাষার বিস্তারে এবং উন্নত ভাবসমূহের বিশ্লেষণ-বিশ্লেষ্যে একান্ত মুগ্ধ হইতেন সন্দেহ নাই।

তর্কালঙ্কার মহাশয় ‘শিক্ষা’ নামক গ্রন্থে তাঁহার বঙ্গব্য বিষয়গুলি চটী পরিচ্ছেদে বিবৃত করিয়াছেন। শিক্ষার বিজ্ঞাপন শুভে তাঁহার নিজের উক্তি—“শিক্ষা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইহাতে শিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে

প্রস্তাব; ছাত্র-জীবন, ব্যায়াম, এবং জীশিক্ষা সংক্ষেপে সমালোচিত হইয়াছে। ছাত্রমণ্ডলকে ভারতীয় শিক্ষা বিবরণী নীতির আভাস প্রদান করা, শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্য।” ইত্যাদি।

প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে চতুর্থ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত শিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে প্রস্তাবই চলিয়াছে, এই সুবিস্তৃত সমালোচনা অশেষ পাণ্ডিত্য ও বহুদর্শিতার ফল, তর্কালঙ্কার মহাশয় যেরূপ তেজস্বিতার সহিত এই চারিটা পরিচ্ছেদে তাঁহার নিজের মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন; যেরূপ ধীরতা ও বিচারের সাহায্যে নব্যশিক্ষিত, ইংরাজী শিক্ষার একনিষ্ঠ ভক্তদিগের যুক্তি-তর্কের খণ্ডন ও স্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, কেবল মাত্র ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী সভ্যতার সেবা ও অন্ধ অনুকরণে ভবিষ্যতে ভারতের শোচনীয় পরিণামের আলেখ্য যেরূপ নিপুণতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন, এবং শিক্ষা ও সভ্যতা প্রভৃতির ক্রম পরিবর্তন ও তাহার নিদান অনুসন্ধান করিলে দেশ ও বিদেশের ক্রমাগত ইতিহাসের ধারা প্রভৃতির আলোচনায় যেরূপ অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষেই বিস্ময়াবহ। একজন সংস্কৃত শিক্ষিত পণ্ডিত দেশের মর্মান্বসন্ধান করিবার জন্য এত পরিশ্রম করিতে পারেন বলিয়া হয়তঃ ইতঃপূর্বে কেহ ধারণাই করিতে পারেন নাই।

তর্কালঙ্কার মহাশয় দেখাইয়াছেন, দেশ সমাজ জাতি ও ব্যক্তির আচার ব্যবহার রীতিনীতি প্রভৃতি রুচি ও সংস্কার বিজাতীয় শিক্ষার বাহুল্যে নূতন রকম হইয়া দাঁড়াইতেছে। এই শিক্ষার সংস্কার একান্ত আবশ্যিক। দেশের জাতীয় ভাব রক্ষা করিবার জন্য বাহারা বদ্ধ পরিকর—তাঁহাদের প্রতি জাতীয় শিক্ষা অর্থাৎ সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারের উপদেশ তর্কালঙ্কার মহাশয় এমন সুন্দর যুক্তি ও তেজস্বিনী ভাবায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তাহা পড়িতে পড়িতে হৃদয়ে বিদ্যুৎ ও নয়নে অশ্রু আবির্ভূত হয়।

তর্কালঙ্কার মহাশয় জাতীয় শিক্ষার উপসংহারে বলিতেছেন—

“যে শিক্ষা এত উপাদেয় ও প্রয়োজনীয় তাহার প্রতি আদর ও যত্ন সমাজের অবশ্য কর্তব্য। তব্বিয়ে উদাসীন্মহাপাপ। এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। বর্তমান কালে ভারতে সমাজ এই মহাপাপে অত্যন্ত কলুষিত, অধুনা রাজার অঙ্গুগ্রহে ভারত-সমাজের যে কিছু শিক্ষা লাভ হয়। প্রজার কল্যাণ সাধন রাজার অবশ্য কর্তব্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজা স্বকর্তব্য পালন করেন বলিয়া কি প্রজা স্বকল্যাণ সাধনে উদাসীন থাকিবে? প্রজার কল্যাণ সাধন জন্য প্রজারই দৈনন্দিক যত্ন ও আয়াস স্বীকার করা ত্রায়সঙ্গত। ত্রায়পরায়ণ ইংরেজ স্বকর্তব্য বুঝিয়াছেন, এবং তৎপথে অগ্রসর হইয়াছেন, সুখের বিষয়। তাই বলিয়া প্রজার উদাসীন্ম শোভা পাইবে কেন? রাজার ত্রায় প্রজাকেও স্বকর্তব্য বুঝিতে ও তৎপথে অগ্রসর হইতে হইবে। প্রজার উদাসীন্ম থাকিলে কেবল রাজার যত্নে অভিলষিত ফললাভের সম্ভাবনা অল্প। যে প্রজা স্বকল্যাণ সাধনে উদাসীন, সে প্রকারান্তরে রাজার সদৃশি-প্রায়শ্চিত্তের প্রতিকূল। তাহার প্রতি দণ্ডপ্রয়োগ, সমাজের মঙ্গলকর। পরপিণ্ডোপজীবীর দৈনন্দিক উন্নতি যেমন অসম্ভব, পরদত্তশিক্ষাপ্রাপ্তবীর মানসিক উন্নতি তেমন অসম্ভব। প্রার্থনীয় রাজাঙ্গুগ্রহ ভারতের অবস্থ-লব্ধ হইয়াছে, এখন রাজাঙ্গুগ্রহ ও প্রজার যত্ন মিলিত হইলে সুচলিত ‘মণিকাঞ্চনযোগ’ সম্পন্ন হইবে। আজি এত দিন পরে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইবার আভাস পাওয়া যাইতেছে, তাঁহার সিদ্ধান্ত সুদীর্ঘ ৩০ বৎসর পরে ভারতের রাজাপ্রজা অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এ কথাও তিনি মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন যে ইংরাজী শিক্ষার নিকট ভারতবর্ষ অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। সুধু তাহাই নহে, ইংরাজ জাতির বিভ্রান্তরাগ ও গুণগ্রাহিতার মহিমা তিনি

কাঙ্ক্ষন ১০২১

শত যুগে কীর্তন করিয়াছেন, বিজ্ঞপ্তপ্রায় সংস্কৃত বিজ্ঞার বিজ্ঞার ও প্রচারকল্পে ‘সার্ উইলিয়ম্ জোনস্’ প্রকৃতি মনসীদিগের যত্নে ‘এসিয়াটিক সোসাইটীর’ সংস্থাপনা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট রাজপক্ষের অতি বড় মহনীয় কীর্তি বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল।

সে বাহা হউক, ইংরাজী শিক্ষার গুণকীর্তন করিলেও তাহার অপরিহার্য্য দোষগুলি প্রদর্শন করিতে তিনি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। তৎকালে ইংরাজী শিক্ষা প্রাপ্ত উচ্ছৃঙ্খল নব্য-সম্প্রদায়ের প্রতি তর্কালঙ্কার মহাশয় যে তীব্র কষাঘাত করিয়াছেন এবং যে সকল আক্ষেপপূর্ণ বাক্যাবলী প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার বিশেষ সংসাহস ও স্বাধীনতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্ময় পরিচ্ছদের উপসংহারে তিনি বাহা লিখিয়াছেন আমরা অবিকল তাহাই উদ্ধৃত করিল্যাম, ভাল মন্দ পাঠকগণ বিচার করিবেন—“হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ, ব্রহ্মদেশ হইতে সিঙ্ঘনদের পবিত্র-সলিল-বোত পঞ্জাব প্রদেশ পর্যন্ত ভারতবর্ষে উচ্চারিত “উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা, উনবিংশ শতাব্দীর উন্নতি” এই শব্দ ঋতিগোচর হয়। কিন্তু কি যে সেই সভ্যতা, কিরূপ যে সেই উন্নতি, ভবিষ্যে কেহই দুই দশ কাল চিন্তা করিবার আবশ্যক বোধ করেন না। সকলেই গতানুগতিক ভাবে উনবিংশ শতাব্দীর উন্নতির পক্ষপাতী। এই উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা ও উন্নতি ভারত সমাজের অস্থিমজ্জা পর্যন্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। স্বাধীনতার নামে যথেষ্টাচারের অনিবার্য্য ঘোরতর অত্যাচার চলিতেছে। আমরা স্বাধীনতার অভিমানে বন্ধঃ স্কীত করি, কিন্তু স্বাধীন চিন্তা করিতে জানি না, কেবল গডলিকা-প্রবাহে গা ঢালিয়া দিই। এই কি উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা? এই কি উনবিংশ শতাব্দীর উন্নতি। মিলের দর্শনের কৃপায় নিরীশ্বরবাদ সমাজের প্রধান আলোচ্য বিষয় অথবা সিদ্ধান্ত হইয়া দাঁড়াইতেছে। বিনি নিরীশ্বরবাদের

পক্ষপাতী নহেন, অনেকের মতে তিনি অশিক্ষিত। কপিলেব নিরীশ্বরবাদ প্রাচীন; তাহা সমাজের অনিষ্টকারী হয় নাই, কিন্তু মিলের নিরীশ্বরবাদ সমাজে কি ভয়ানক আন্দোলনই তুলিয়াছে, কি শোচনীয় বিপর্য্যই আনয়ন করিয়াছে। \* \* \* ভারতবর্ষ পৃথিবীর ধর্মোপদেষ্টা। পৃথিবীতে যে সকল ধর্মমত প্রচলিত বা বিলুপ্ত, ভারতবর্ষ তৎসমস্তের উৎস, একথা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। যে ভারতবর্ষ পৃথিবীর ধর্মোপদেষ্টা। অনেকের মতে সেই ভারতবর্ষ আজ কি না ধর্মবিষয়ে বিওড়োর পার্কারের শিষ্য ও মিলের অন্তর্বাসী। বিওড়োর পার্কারের আত্ম-প্রত্যয় ও মিলের নিরীশ্বরবাদ ইংরাজী ছাত্রগণের পক্ষে নূতন জিনিষ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু সংস্কৃতাদ্যাদিগের পক্ষে উহা বহুতর প্রাচীন। উহা ভারতবর্ষের সম্বন্ধে নূতন নয়। ফলতঃ ধর্মবিষয়ে ভারতবর্ষের প্রাধান্য সার্বজনীন হইলেও নব্য-সম্প্রদায়ের অঙ্গুগ্রহে ভারতবর্ষ আজ তজ্জগৎ মিলের ঘারে মুষ্টিভিক্ষার্থ দণ্ডায়মান। এই কি উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা ও উন্নতি? ইংরাজী শিক্ষা যে সকল অনিষ্ট সাধন করিতেছে অস্ত্রাশ্রয় বিষয়ে কালে তাহার প্রতীকার হইলেও ধর্ম-বিপ্লবের প্রতিকার সম্ভবপর কি না, তাহা বুদ্ধিমানদিগের চিন্তনীয়। \* \* \* পরিবর্তন-প্রিয়তা সমাজের ছুরপণের রোগ হইয়া দাঁড়া ইয়াছে, নব্য-সমাজ সকল বিষয়েই পরিবর্তন করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু কীদৃশ পরিবর্তন সমাজের মঙ্গলকর, তাহা নির্ধারণ করিতে অক্ষম। অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন যে, হিন্দুদিগের সমস্তই কুসংস্কারময় উহা রহিত করিতে হইবে; আর ইংরাজের সমস্তই মার্কিত ও নির্দোষ, উহা প্রবর্তিত করিতে হইবে। কি ভয়ানক সংস্কার! তাঁহাদের মতে হিন্দুজাতি একটী জাতি বলিয়াই গণ্য নয়, তাঁহারা বিবেচনা করেন উহাদের নিজের বলিবার কিছু নাই। ইহারা এককালে হিন্দুসমাজের

আচার ব্যবহার রীতিনীতির ব্লোংপাটন করিতে পারিলে আপনাকে চরিতার্থ বোধ করেন। কিছুদিন হইল দেশীয় বর্ণমালার পরিবর্তে ইংরাজী বর্ণমালার প্রচলন প্রস্তাব উপস্থিত হয়, সম্প্রতি উহা কিয়ৎ পরিমাণে কার্য্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে। ইংরাজ এ প্রস্তাব করিলে আমাদের কিছুমাত্র বিশ্বয়ের বিষয় বা বলিবার ছিল না; কিন্তু ছঃণের বিষয় যে অনেক উন্নত-মনা মহাত্মাও দেশীয় বর্ণমালার নাস্তি আবশ্যক মনে করেন। অতঃপর ইংরেজী অক্ষরে সংস্কৃত পুস্তক লিখিত হইবে। কি নূতন অভূতপূর্ব দৃশ্য! \* \* \* আমাদের কৃতবিজ্ঞগণ দেশের এই মহোপকার সাধন করিতে বহুপরিশ্রম করিয়াছেন, ইহা দেখিয়াও কি বলিব যে, ইংরেজী শিক্ষা আমাদের নিরবচ্ছিন্ন শ্রেয়স্করী। ইংরেজী শিক্ষা-প্রভাবে অনেক উন্নতমনা শিক্ষিত ব্যক্তি আপনার গৃহলক্ষ্মীকে বধেচ্ছ বিচরণ করিতে দিয়া উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা ও উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন। ভাবিতে ছঃষ হয় যে, সমাজ যাদৃশ ভয়ানকরূপে আন্দোলিত হইতেছে, কি যে ইহার পরিণাম দাঁড়াইবে, তাহা অনাগত কালের কুন্ধিনিবিষ্ট। আমাদের কৃতবিজ্ঞগণ শর্ম্মা স্থানে স্কোয়ার, সাটী স্থানে গাউন, ও যজ্ঞোপবীতচ্ছেদন উন্নতির লক্ষণ বলিয়া মনে করেন, আবার যুরোপের দিকে নেত্রপাত কর অস্তরূপ চিত্র দৃষ্ট হইবে, তথায় স্কোয়ারের পরিবর্তে শর্ম্মা ও ভট্ট, মেক্সমূলারের পরিবর্তে মোক্ষমূলর, জর্জগির পরিবর্তে শর্ম্মাগ্যদেশ, গাউনের পরিবর্তে সাটী, শব-সমাধির পরিবর্তে শবদাহ প্রভৃতি প্রচলিত হইতেছে। এখন ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমরা কোন্টি উন্নতির লক্ষণ বলিয়া বুঝিব? বাবু নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় যজ্ঞোপবীত ছেদন করিয়া দেশে উন্নতির চঃম সোপানে আরোহণ করিলেন, কুসংস্কারের হস্ত হইতে পরিশুদ্ধ হইলেন, বাৎসর্য্য একশেষ হইল। আবার শুনিলাম, তিনি ইংলণ্ডে মহাত্মা গোল্ডউইকার কর্তৃক ভগ্নিমিত্ত ভৎসিত হইলেন। এখন কোন্টি উন্নতির লক্ষণ বলিয়া জানিব? বিধাতার এ বিকল্পনা কেন? কৃতবিজ্ঞগণের এ চপলতা কেন? কি বলিব।

“পীত্বা মোহময়ীঃ প্রমোদ যদিরা মুদত্তভূতং জগৎ” ? আমাদের সমাজের তাই ঘটিয়াছে, কেন এরূপ হইতেছে তদ্বিষয়ে কেহ চিন্তা করিতে চাহেন না, এ যোগের কি কোন ঔষধ নাই ?”

কি মর্ম্মভেদী আক্ষেপ, কি প্রাণল্পর্শী আশ্রয়হীনতা। প্রিয় পাঠক, এই সঙ্গে একবার তাহা স্রোতস্তীর তরঙ্গ-চঞ্চল গতিটার প্রতিও দৃষ্টিপাত করিবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে তর্কালঙ্কার মহাশয় ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষার উপযোগিতা ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন, তাহার মতে ইংরাজী শিক্ষা ইংরাজেরই পক্ষে জ্ঞান ও জাতীয় ভাবের পরিপোষক। ভারত-বাসীর পক্ষে ইংরাজী শিক্ষা দ্বারা জ্ঞানসঞ্চয় সুলভ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা তাহাদের জাতীয় ভাবের পরিপুষ্টি হইতে পারে না। জাতীয় ভাবের পরিপুষ্টিকল্পে দেশীয় বিদ্যালয়সমূহে ইংরাজী উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত উচ্চ শিক্ষা যাঃতে অধিক পরিমাণে প্রবর্তিত হয় দেশভিত্তিকীর্ণের তাহা অবশ্যকর্তব্য। তাহার মতে জাতীয় আচারব্যবহার ও রীতিনীতি প্রকৃতপক্ষে জাতীয় ভাবের প্রধান অঙ্গ। এই সকল আচারব্যবহারাদির উপদেশ কেবল সংস্কৃত ভাষাতেই নিবদ্ধ, সুতরাং ইংরাজী উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃত উচ্চ শিক্ষার সংমিশ্রণ ব্যতীত জাতীয় আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি শিক্ষা হইতেই পারে না, তাহা না হইলে জাতীয়তাপ্রাভও আকাশ কুসুমবৎ অলৌক হইয়া পড়ে। এই সকল কথা অতি সুন্দর বুদ্ধি দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। অবশ্য সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি তর্কালঙ্কার মহাশয় অমুরাগ বংশোদ্ভূত; তাহা হইলেও, সংস্কৃত উচ্চ শিক্ষার আবশ্যকতা এখনকার দিনে বোধ হয় অস্বীকৃত হইতে পারিতেছে না। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে সংক্ষেপেই তাহার ‘শিক্ষার’ কিয়দংশের আলোচনা করিলাম, বাক্যান্তরে ইহার অপর অংশের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

( ক্রমশঃ )

শ্রীকালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী।

## ডালিম ফুল

আমার প্রিয়র হাদিবাখা রাজা : 'টী টো'  
দেখছি আজ ওই ডালিম ফুলে,  
উদাস পাগল মনটা রে। ছোট্ট রে ওরে ছোট্ট  
এবার ঠাই পাবি অকুল-কুলে !

ভ্রামল পাতার আড়ালে রে দেখ রে দেখ চেয়ে  
অলক-ঢাকা সেই অধরখানি,—  
তেমনি মধুর সুধা নিয়ে সুবাসময়ী মেয়ে  
লুকিয়ে কোথ' আচে বৌমটা টা'ন' !

এমন সুযোগ হবে না রে ওরে আমার মন,  
ওরে আমার আপনা-হারা সাথী,  
হাজার যুগের পরে আজি মিলন খতুন  
আকুল তুষা রাখবি বুকে গাঁথি' ?

আজকে সকল ভাল করে করুতে হবে সব  
সরিরে দে রে সকল ব্যবধান ;—  
প্রিয়র অধর-সুধা পিয়ে ঘুচবে হা হা ওব  
ডালিম ফুল দিবে নুতন প্রাণ !

শ্রীভীষেন্দ্রকুমার দত্ত ।

## অন্ধ্রশাসন কালে দেশের অবস্থা

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার  
এম্ এ, পি, আর, এস, মহাশয় অন্ধ্র নৃপতিগণের কাল-  
নির্ণয় সম্বন্ধে ১৩২০ সনের জ্যেষ্ঠ সংখ্যা প্রতিভা  
পত্রিকায় এক গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।  
ইহাতে তিনি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে,  
অন্ধ্রগণ যখন দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন রাজ্য আরম্ভ করেন  
তখন হইতে তাঁহাদের রাজত্বের  
অন্ধ্রশাসনকাল শেষকাল পর্যন্ত রাজত্ব-পরিমাণ  
৪৫৭ বৎসর ; এবং যখন তাঁহারা  
মগধ বিজয় করেন তখন হইতে তাঁহাদের রাজত্বের  
শেষকাল পর্যন্ত রাজত্বকালের পরিমাণ প্রায় ৩০০ বৎসর ;  
সুতরাং অন্ধ্রগণের কাল ইহা পুরাণে যে অসামঞ্জস্য  
আপাতত লক্ষিত হয় বাস্তবিক তাহা অসামঞ্জস্য নহে।  
ডাক্তার ভাণ্ডারকরের মতে অন্ধ্রগণ খৃঃ পূঃ ৭২  
হইতে ২১৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন, সুতরাং তিনি  
ইহাদের রাজত্ব কালের পরিমাণ মাত্র ৩০০ বৎসর বলিয়া  
নির্দেশ করিয়াছেন। অধ্যাপক মজুমদার দেখাইয়াছেন  
যে, পুরাণের উক্ত অগ্রাহ্য করিয়া ডাক্তার ভাণ্ডারকর  
মহাশয়ের এই মতবাদ আমরা গ্রহণ করিতে পারি  
না।

আমরা অশোকের অন্ধ্রশাসন হইতে দেখিতে  
পাই যে, খৃঃ পূঃ ২৫৬ অব্দে অন্ধ্রগণ মহারাজ  
অশোকের অধীনতা স্বীকার করিতেন। পরে মৌর্যবংশের  
পতন হইলে, অর্থাৎ ১৮৪ খৃঃ পূর্বে অস্তান্ত  
সামন্ত রাজ্যের দ্বারা অন্ধ্রগণও অন্ধ্রনরপতি সিমুকের  
অধীনে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। সেই সময়ে,  
অর্থাৎ ১৮৪ খৃঃ পূর্বে সুল-বংশের প্রতিষ্ঠা হয়।  
পরিশেষে সুল ও কাথবংশের পতন হইলে, অর্থাৎ  
সুল-বংশের প্রতিষ্ঠার ১৫৭ বৎসর পরে, অর্থাৎ, খৃঃ  
পূঃ ২৭ অব্দে, অন্ধ্র বা সাতবাহন-বংশীয় জৈমিক



নরপতি শেখ কাথগাজকে নিহত করিয়া মগধ অধিকার করেন, এবং খৃষ্টীয় ২৩৬ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব অগাহত রাখেন। আমরা এই সময়ে দক্ষিণ ভারতের অবস্থা পর্যালোচনা করিব। অধ্যাপক মজুমদার ভারতের তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার সুলিখিত প্রবন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নাই; সুতরাং, আশা করি, এই ক্ষেত্রে আমার এই সামান্য চেষ্টা খুষ্টতা বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

অন্ধ্র, সাতবাহন ও শালিবাহন নামত্রয় অস্তিত্ব। অন্ধ্র-রাজগণের প্রাচীনতম মুদ্রায় 'সাত' নামের উল্লেখ আছে। বিশেষতঃ, একটি তামিল কবিতায় মগধরাজ সাতকর্ণির নাম দেখিতে পাওয়া যায়, \* এবং অনেক অন্ধ্রনৃপতিই সাতকর্ণি এই রাজনৈতিক অবস্থা উপনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সুতরাং শালিবাহন কোন রাজার নাম নহে, ইহা একটি রাজবংশের নাম। অধ্যাপক মজুমদারও তদীয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

হেমচন্দ্র তদীয় দেকীকোষ গ্রন্থে শালিবাহন, সালন, হাল, কুন্তল এই চারি নামে মাত্র একজন নরপতিকে নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইতে পারে না; কারণ উভয়েই শালিবাহন-বংশীয় হইলেও স্বেযুক্ত দুই রাজাই দুই বিভিন্ন নরপতির বংশধর। আবার তিনি তদীয় প্রাকৃত ব্যাকরণে শালিবাহন শব্দটি সাতবাহনের অপভ্রংশ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

বর্তমান সময়ে শকাব্দকে শালিবাহন-প্রবর্তিত অন্ধ্র বলিয়া অনেকে মনে করেন! কোন সময় হইতে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে বলা কঠিন, কিন্তু ভূমিদান সম্পর্কীয় যাবতীয় তাম্রশাসনেই একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই অন্ধ্রকে শক-নৃপকাল (শক-রাজগণের প্রবর্তিত

অন্ধ্র) বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, এবং বাদামিতে প্রাপ্ত একটি লিপিবলি (inscription) এই অন্ধ্র শক-রাজের রাজ্যাভিষেক হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া দেখা যায়। কালক্রমে সংক্ষিপ্ত হইয়া 'শক'-নৃপকাল 'শকে' (শক সংবৎসর) পরিণত হইয়াছে। এবং একটা অন্ধ্র হইলেই যেমন ইহাকে কোনও সুবিখ্যাত রাজার নামের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হয় সেইরূপ শালিবাহনকেও একজন বিখ্যাত রাজা মনে করিয়া ইহাকেই শকাব্দের প্রতিষ্ঠাতা স্থির করিয়া লওয়া হইয়াছে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার ১০২০ বঙ্গাব্দের আখিন-কার্ত্তিক সংখ্যা প্রতিভা পত্রিকায় (২৪০ পৃষ্ঠা) 'শক ক্ষত্রপ চট্টন' সম্বন্ধে যে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি কতিপয় শিলালিপির বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে দেখা যায় যে, শকক্ষত্রপ ক্রুজ-দমন ৫২ শকাব্দে, বা ১৩০ খৃঃ অব্দে রাজত্ব করিতেন। তিনি শক-ক্ষত্রপ চট্টনের পৌত্র। চট্টন ৭৮ খৃঃ অব্দে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন (প্রতিভা ২৪২ পৃঃ)। তিনিই মালবীয় শকরাজগণের আদিপুরুষ, এবং তিনিই ৭৮ খৃঃ অব্দে উজ্জয়িনী অধিকার করিয়াছিলেন। সুতরাং মনে করিলে অসঙ্গত হইবে না যে, তাঁহার বংশীয়গণ ৭৮ খৃঃ অব্দের এই অরণীয় ঘটনা হইতে যে অন্ধ্র গণনা করিতেন তাহাই শকাব্দ।\* বিশেষতঃ বাদামিতে প্রাপ্ত লিপিবলির সহিতও এই মতের সামঞ্জস্য হইতেছে।

শালিবাহন সম্বন্ধে অনেক জনশ্রুতি আছে। ডাক্তার ভাণ্ডারকর সে সকল জনশ্রুতি তৎকৃত দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে নিবদ্ধ করিয়াছেন। এক জনশ্রুতি মতে

\* ১৩১১ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা "নারায়ণ" পত্রিকায় অধ্যাপক মজুমদার শকাব্দ সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য পূর্ণ এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এ সম্বন্ধে অনেক বাদামুবাদ আছে; বাহ্যিক ভয়ে লিপিত হইল না।

\* তিনসেট শ্বিথের ভারতের ইতিহাস, ১২০ পৃঃ পাদটীকা।



শালিবাহন এক অনুচ্চ ব্রাহ্মণ-কণ্ঠ্য গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মানবরূপধারী শেখনাগ ইঁহার পিতা। তিনি উজ্জয়িনীপতি বিজয়াদিত্যের বিনাশ সাধন করেন। ভাণ্ডারকর এই জনশ্রুতির ঐতিহাসিক তথ্য নির্ধারণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই শালিবাহন অন্ধুরাজ পুলোমারী। এই পুলোমারীই শকগণ হইতে দেশ রক্ষা করিয়াছিলেন। + তিনি পুলোমারীই হউন বা অন্য কেহ হউন ইহাতে ঐতিহাসিক সত্যের কিছু ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এই জনশ্রুতি হইতে আমরা মাত্র এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি যে, অন্ধুরাজগণ উজ্জয়িনী-রাজ্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

পুলোমারী ক্রতুদমনের কন্যা দক্ষমিত্রাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ক্রতুদমন মালব-শাখার শক-করুপগণের স্থাপয়িতা চট্টনের পৌত্র। ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। ক্রতুদমন জামাতার বিরুদ্ধে অভিযান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই সত্য, কিন্তু স্বীয় তনয়ার প্রতি রূপাপরবশ হইয়া পুলোমারীর রাজ্যের ধ্বংস সাধন করেন নাই (ভিনসেন্ট স্মিথ, ২০০ পৃষ্ঠা)।

সাহিত্যেও শালিবাহনের জনশ্রুতি স্থান পাইয়াছে।

দণ্ডী তাঁহার কাব্যদর্শে পৈশাচিক  
বৃহৎকথা ও প্রাকৃতে লিখিত বৃহৎকথার উল্লেখ  
সাতবাহন করিয়াছেন। কথাসরিৎসাগর গেতা  
সোমদেব এবং বৃহৎকথানামক  
অন্য আর একখানি গ্রন্থের প্রণয়নকর্তা কেমেত্র উভয়েই  
তাঁহাদের গ্রন্থ-নিবন্ধ গল্পাবলীর অন্তর্গত পৈশাচিক ভাষায়  
লিখিত বৃহৎকথার লেখক গুণাঢ্যের নিকট গণী। কথিত

+ আমরা জানি গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি মালবদেশ জয় করিয়াছিলেন (সম্ভবতঃ ২৬ খৃঃ)। ২য় পুলোমারী গৌতমীপুত্রের পুত্র ও অব্যবহিত পরবর্তী। পুলোমারী ক্রতুদমন কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, ফলে অনেক দেশ তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছিল। পুলোমারীর পরবর্তী যজ্ঞশ্রী নই রাজ্যের অনেক অংশ উদ্ধার করেন (ভিনসেন্ট স্মিথ, ১৯৯-২০১ পৃঃ)।

আছে, তিনি কিছুকাল ‘সাতবাহনের’ মন্ত্রী ছিলেন এবং কাণভূতি নামক জনৈক পিশাচ প্রথমতঃ তাঁহাকে এই সকল গল্প বলিয়াছিল। গুণাঢ্য গল্পগুলি রক্তে লিখিয়া ‘সাতবাহনকে’ প্রদান করেন। কিন্তু রক্তলিখিত পিশাচের গল্প রাজা গ্রহণ করিলেন না। ইহাতে গুণাঢ্য দুঃখিত হইয়া গল্পগুলি পুড়িয়া ফেলিলেন। ভাগ্যক্রমে সপ্তম গল্পের মধ্যে মাত্র একখণ্ড রক্ষা পাইল। পরিশেষে ‘সাতবাহন’ এই সকল গল্পের মনোহারিত্ব অবগত হইয়া গুণাঢ্যের সম্মতিক্রমে তদীয় জনৈক শিষ্য হইতে সপ্তম খণ্ড প্রাপ্ত হন।

বাণভট্ট তদীয় হর্ষচরিতের উপোদ্বাভে সপ্তমতী গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। কাব্যপ্রকাশ প্রকৃতি গ্রন্থেও সপ্তমতীর শ্লোকের উল্লেখ আছে। বলিতে কি সপ্তমতীর শ্লোকেই গ্রন্থকারের নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়— ইঁহার নাম ‘হাল’। সাধারণ কথায় তাঁহাকে শালিবাহন বলা হয়। অন্ধুবংশে হাল নামক একজন রাজা ছিলেন। সুতরাং সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, হয়ত তিনিই এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, নতুবা কেহ তাঁহারই নামে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়া দিয়াছে।

কাত্তলের প্রণয়ন বাপারেও একটা জনশ্রুতি আছে। রাণী স্নান করিতে করিতে হাল নৃপতিকে বলিয়াছিলেন “মাতং দেখি”। রাজা সত্য সত্যই মৌদিক লইয়া আসিলেন। নরপতির অজ্ঞানতার ফলে কাত্তলের প্রণয়ন হইল।

উল্লিখিত জনশ্রুতি হইতে এই ঐতিহাসিক সত্য গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, অন্ধুপুত্রের রাজত্ব কালে সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, এবং তাঁহাদিগেরই রাজত্ব সময়ে পৈশাচী বা কথিত মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় সর্বপ্রথম গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল।

বাৎসায়নের কামনুজ্ঞেও শালিবাহনের নামের উল্লেখ দেখা যায়। কুন্তল সাতকর্ণি মহাদেবী বল্লাবতীকে কোনও প্রেমকেলির উপলক্ষে কাঁচি দ্বারা হত্যা

করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত গ্রন্থে লিখিত রহিয়াছে।

অন্ধ্র গণের শাসন-কালে আমরা সাহিত্যের যে অবস্থা দেখিতে পাই তাহা শিলালিপি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ প্রমাণ-মূলক নহে—কিন্তু রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক কিংবা ধর্মবিষয়ক অবস্থা তৎকালীন শিলালিপি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ প্রমাণমূলক, সুতরাং ইতিহাসের দিক হইতে ইহাদের মূলা যথেষ্ট। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যের যে অবস্থা সমগ্র ভারতেরও ঠিক সেই অবস্থা, তবে শিলালিপি প্রভৃতি দ্বারা দক্ষিণ ভারতের অবস্থা সম্যক সমর্থিত হয়, কিন্তু উত্তর ভারতে তাহা হয় না, এইমাত্র প্রভেদ।

এই সময়ে দক্ষিণ ভারতে বৌদ্ধধর্মের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।

মহাভোক (রাজা), মহারথি (সামন্ত বৌদ্ধধর্মের অবস্থা রাজা), নৈগম (বণিক), স্বর্নকার,

বর্জক (সুত্রধার), ধাতুকশ্রেণী (ধাতুব্যবসায়ী), গাঙ্কিক (ঔষধ ব্যবসায়ী), ও গৃহস্থগণ অর্থব্যয় করিয়া শিলাগাত্রে বৌদ্ধগণের জন্য গুহা-মন্দিরাদি খুদিয়া দিতেন। অন্ধ্র রাজ্যের প্রথম ভাগে (খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে) বাকটিয়ান, শক ও পঞ্জাবগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে ভারতেই বসতি স্থাপন করিয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। শিলাগাত্রে খোদিত গুহা-মন্দিরাদির প্রাচীর-পৃষ্ঠে বহু অর্ধদাতা ধ্বন (বাকটিয়ান), শক প্রভৃতির নাম উৎকীর্ণ রহিয়াছে। ইহাই তাঁহাদের ধর্মাস্তর গ্রহণের উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এই সকল পরীত-গুহার চৈত্য-মন্দির প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হইত, এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের বাসোপযোগী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠরীও নির্মিত হইত।

বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বৎসর ধরিয়া সমগ্র দাক্ষিণাত্যে পরিভ্রমণ করিতেন এবং বর্ষার চারি মাস এই সকল মন্দিরাদিতে বিশ্রাম করিতেন। ভিক্ষুগণ সমুদ্রপথেও ভারতের বাহিরে গমন করিতেন, সুতরাং শিলাগাত্র-খোদিত তাঁহাদের বাসোপযোগী গুহা-মন্দিরাদি কল্প

প্রদেশের প্রান্তবর্তী প্রণালী সমূহের উপকূলে নির্মিত হইত। লোকে ইহাদিগকে ধর্মশালা বা বিশ্রামশালা বলিত। চিপলু, মহাড় এবং কুডেম নামক স্থানে অজ্ঞাপি একশ ধর্মশালা বর্তমান রহিয়াছে।

সেই সময়ে এক এক ব্যবসায়ী এক এক সমিতি (guild) গঠন করিত, এবং ধনিগণ ধর্মকার্যের জন্য সেই সকল সমিতিতে অর্থ গচ্ছিত রাখিতেন। কেহ ধাতুকশ্রেণী-সমিতিতে, কেহ তত্ত্বাব-সমিতিতে কেহ বা তৈলব্যবসায়ীর সমিতিতে অর্থদান করিয়া রাখিতেন, গচ্ছিত অর্থের সুদ দ্বারা ভিক্ষুগণের জন্য বস্ত্র ও অন্নাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রীত হইত। প্রাচীন মাসে (বঙ্গ সময়ে) ভিক্ষুগণ নুতন পরিচ্ছদ গ্রহণ করিতেন, তত্ত্বাব সমিতি হইতে তখন তাঁহাদের পরিচ্ছদের ব্যয় নির্বাহ হইত।

কাঠিয়ারগার শাখার শাক্তরূপগণের আদিপুরুষ মহাপনের জামাতা উসবদাত বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের জন্য একটি চৈত্য (cave temple) শিলাগাত্রে খোদিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি গোবর্দ্ধন নগরের (নাসিক) তত্ত্বাব সমিতির হস্তে দুই সহস্র কার্ষাপণ গচ্ছিত রাখিয়া এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, এই অর্থের বার্ষিক সুদ (১০০ কার্ষাপণ) দ্বারা বঙ্গ সময়ে (বর্ষাকালে) তাঁহার খোদিত চৈত্যমন্দিরে যে ২০ জন ভিক্ষু থাকিবেন তাঁহাদের নুতন পরিচ্ছদের ব্যয় নির্বাহ হইবে। যাহাতে এই কার্যের ব্যতিক্রম না ঘটে তজ্জন্ত গোবর্দ্ধন নগরের নিগম সভায় (town corporation) উসবদাতের এই নির্দেশ লিপিবদ্ধ ছিল, এবং তৎকৃত গুহামন্দিরের প্রাচীর-পাত্রেও তাঁহার অভিশ্রয় ও দানের মর্ম উৎকীর্ণ করিয়া রাখা হইয়াছিল। উসবদাত অপর এক সমিতিতে এক সহস্র কার্ষাপণ গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। এই অর্থের বার্ষিক সুদ (৭৫ কার্ষাপণ) হইতে ভিক্ষুগণের অন্নাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যয় নির্বাহ হইত। নাসিকের

কালীন ১৩২১

শিলালিপি সমূহ হইতে এই সকল তথ্য অবগত হওয়া গিয়াছে।

কারলীর গুহা চৈতোর শিলা-লিপি হইতে জানা যায় যে, উসবদাত বাজুরকের চৈতাবাসী (cave-monastery) ভিক্ষুগণের ভরণপোষণের জন্য কর্তৃক গ্রামটি দান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত উসবদাতের অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান-কার্যের শিলালিপিও বর্তমান আছে।

উসবদাতের পত্নী দক্ষমিত্রাও বে তাঁহার স্বামীর ভায় ভিক্ষুগণের বাসের ও অন্ন-বস্ত্র সংস্থানের জন্য অর্থদান করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণমূলক শিলালিপিরও অভাব নাই।

গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির মাতা (গৌতমী) পুলোমায়ীর রাজত্বের উনবিংশ বৎসরে নাসিকের প্রান্তবর্তী পর্তে একটি গুহা-মন্দির তজ্জায়নীর সম্প্রদায়ের ভিক্ষুগণের বাসের জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই শিলালিপিতে গৌতমীকে মহারাজ-মাতা ও মহারাজ-মাতামহী বলা হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্মের ভায় তৎকালে হিন্দুধর্মের অবস্থাও হীন ছিল না। নাসিকের একটি গুহা-মন্দিরের

হিন্দুধর্মের অবস্থা শিলালিপি হইতে জানা যায় যে,

গোবর্দ্ধন জেলায় দানশাল উসবদাত কর্তৃক এই গুহা-মন্দির খোদিত হইয়াছে। উসবদাত দেবতা-ব্রাহ্মণকে ৩০০০০ ধেনু ও ১৬টি গ্রাম দান করিয়াছিলেন, এবং বারাণসী নদীতে স্নানের ঘাট নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি প্রতিবৎসর লক্ষ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতেন, এবং সোমনাথের আট জন দরিদ্র ব্রাহ্মণের বিবাহের ব্যয় বহন করিয়াছিলেন। উসবদাত ভারুকছে (বরোচ) বিপ্রাঙ্গার স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং বাগান প্রস্তুত, কুপ ও পুষ্করী খনন, নদীতে খেয়ার নৌকা প্রতিষ্ঠা, পথিকের জলপানের জন্য স্থানে স্থানে জলের নালিকা প্রভৃতি বহু লোকহিতকর কার্যের অগ্রষ্ঠান

করিয়াছিলেন। নাসিকের আর একটি শিলা-লিপি হইতে এই সকল তথ্য অবগত হওয়া গিয়াছে। নহ-পনের বৎস গোত্রীয় ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী অথম একটি পুষ্করী খনন ও একটি বিস্তৃত গৃহ (hall) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। জুরারের শিলালিপি হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়।

নাসিকের প্রান্তবর্তী গুহা-গাত্রে খোদিত শিলা-লিপিতে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির এক বিশেষ বর্ণনা দৃষ্ট হয়—গৌতমীপুত্র একচ্ছত্র রাজা (King of Kings) অসিক, অশ্বক, মূলক, সৌরাষ্ট্র, কুক্ষর, অপরাধ, অম্বুপ, বিদভ এবং অকরাবর্তী প্রদেশের অধিপতি এবং বিদ্যা, মলয়, মহেন্দ্র প্রভৃতি পর্তের অধীশ্বর। অসংখ্য রাজা তাঁহার চরণ পূজা করিতেন, এবং তদীয় অশ্বগজ প্রভৃতি তিন সমুদ্রের জল পান করিত। এই সকল বর্ণনা হইতে গৌতমীপুত্রের রাজ্যের বিস্তৃতি ও তাঁহার জ্ঞাতাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি প্রজাগণের সুখ দুঃখকে নিজের সুখ দুঃখ বলিয়া মনে করিতেন, এবং কর্তব্য, ঐহিক উন্নতি ও স্ব-কাম (desire) সিদ্ধির জন্য সমভাবে চেষ্টা করিতেন। গৌতমীপুত্র বিস্তার আহার, সংলোকের আশ্রয়, কীর্তির আবাস, শিষ্টাচারের নিয়ম ও ব্রাহ্মণপালক ছিলেন। নৈপুণ্যে, শরচ্চালনার ও বীরত্বে অক্ষরাজ গৌতমীপুত্র অদ্বিতীয় ছিলেন। এবং ব্রাহ্মণ জাতির প্রসার ও বর্ণধর্মের রক্ষাকল্পে ব্রাহ্মণ-গণকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। বীরকর্মে তিনি রাম, কেশব, অজু ন ও ভীমসেনের সমকক্ষ ছিলেন, এবং তাঁহার বীরত্ব নভাগ, নহব, জন্মেন্দ্র, সগর, যযাতি, রাম ও অশ্বরীষ অপেক্ষা হীন ছিল না। তিনি শক ও পল্লবগণকে ধ্বংস করিয়া সাতবাহন বংশের গৌরব পুনঃ প্রাতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই শিলালিপির শেষ পংক্তিতে লিখিত আছে যে, গৌতমীপুত্র গুহা-মন্দিরাদির রক্ষা-কল্পে একখানি গ্রাম দান করিয়া-ছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বর্ণাশ্রম ধর্মের রক্ষাকর্তা হইলেও গৌতমীপুত্র বৌদ্ধগণকে নির্ধাতন

করিতেন না, বরং তাহাদিগকে প্রীতির চক্ষেই দর্শন করিতেন। নাসিক-গুহা-গাঙ্গে আর একটি শিলা-লিপিতে লিখিত আছে যে, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের সাহায্য-কল্পে গৌতমীপুত্র ২০০ 'নিবরতন' পরিমিত ভূমি দান করিয়াছেন। এই শিলালিপি হইতে বুঝা যায় যে, এটি গোবর্দ্ধনের শাসনকর্তা বিষ্ণুপালিতের নিকট ধনকটকরাজ গৌতমীপুত্রের আদেশ লিপি। ইহা হইতে আরও জানা যায় যে, ধনকটক গৌতমী-পুত্রের রাজধানী ছিল। এক্রপ আর একটি লিপিতে দৃষ্ট হয় যে, গৌতমীপুত্রের মহিবীও ১০০ নিবরতন পরিমিত ভূমি বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের সাহায্য-কল্পে দান করিয়াছেন।

নাসিক-গুহা-গাঙ্গে পুলোমায়ীর শিলা-লিপিও দৃষ্ট হয়। তাঁহার একটি আদেশ লিপি গোবর্দ্ধনের শাসনকর্তা সর্গাকদলনের নামে শিলাগাঙ্গে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এই উৎকীর্ণ আদেশ-লিপির মর্ম্ম এই যে, গৌতমীপুত্রের দত্ত গ্রাম ভজায়নীয়গণের ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট নহে বলিয়া তিনি তাহাদিগকে আর একটি গ্রাম দান করিলেন।

সাধারণ ব্যক্তিবর্গও বৌদ্ধভিক্ষুগণের সাহায্য-কল্পে ভূমি দান করিতেন। এইরূপ শিলালিপিও নাসিকে বিদ্যমান আছে, এবং এই সকল শিলালিপিতে অন্ধ্ররাজ পুলোমায়ীর নাম দৃষ্ট হয়।

কোলাপুরে বৌদ্ধ স্তূপ হইতে যে সকল প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের গাঙ্গে অন্ধ্রবংশীয় রাজগণের নাম পাওয়া যায়, এবং গৌতমীপুত্র ও পুলোমায়ী ব্যতীত সিম্বুক, কুম্ভ প্রভৃতি বহুরাজ্যের নামও শিলালিপি প্রভৃতিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পেরিপ্লাস (Periplus) গ্রন্থে \* কুমারিকা অন্তর্গত

\* গ্রন্থের নাম পেরিপ্লাস অব দি এরিথ্রিয়ান সি (The Periplus of the Erythrean sea). লোহিত সাগরের প্রণালীর নাম এরিথ্রিয়া। আফ্রিকার উপকূল

পার্কভী দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পেরিপ্লাস ১ম খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল, সুতরাং এই সময়ের পূর্বেই আর্ঘ্য-দেবদেবীর পূজা দক্ষিণভারতের সুদূর প্রান্তেও প্রসার লাভ করিয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এই সকল লিপিমূলক নিদর্শন হইতে জানা যায় যে, অন্ধ্রগণের সময়ে ধর্ম্মধেব ছিল না, রাজগণ সমভাবে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মকে শ্রদ্ধা করিতেন, এবং এই দুই ধর্ম্মই পাশা-পাশি থাকিয়া শ্রীশ্রদ্ধি লাভ করিতেছিল।

পূর্বেই লিখিত হইয়াছে যে, তখন দক্ষিণ ভারতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ীর ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতি সমিতি ছিল। এই সকল সমিতি বা ব্যাঙ্ক প্রথা। ভিত্তে ধর্ম্ম কার্য্যের জন্য অর্থ গচ্ছিত থাকিত, এবং বার্ষিক সুদ দ্বারা সেই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইত। বংশ-পরম্পরা-ক্রমে এই সকল সমিতি সুদ আদায় করিত, সুতরাং এই সকল প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি যে সুদৃঢ় ছিল, এবং ইহাদের কার্য্যপ্রণালী যে সুন্দররূপে চলিত ইহা বলাই বাহুল্য।

গ্রাম্য সমিতি এবং ব্যবসায়ী-সমিতিগুলি দেশের শাসন-প্রণালীর যে অঙ্গ বিশেষ ছিল তাহাতেও সন্দেহ নাই। উপবন্ধান্তের নাসিক শিলালিপিতে নিগম সভার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল নিগম সভা (town corporation) বর্ত্তমান মিউনিসিপাল শাসন-সমিতির অমুরূপ ছিল। সুতরাং ভারতে যে অতি প্রাচীনকালেও স্বায়ত্ত শাসন প্রচলিত ছিল তাহা আর বিশেষ করিয়া কথাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

ভাগ হইতে ভারতের পশ্চিম উপকূল, গিহেল ও পূর্ব উপকূল ভাগের মধ্যবর্তী সাগরকে এরিথ্রিয়ান সি (Erythrean sea) বলা হইত। পেরিপ্লাস গ্রন্থের (Periplus) লেখক জনৈক গ্রীক বণিক। তিনি এই পুস্তকে এই সকল উপকূল ভাগের তৎকালীন বাণিজ্য-কেন্দ্র সমূহের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

কালীন ১০২১

পূর্বে বার্ষিক স্রদের যে হার লিখিত হইয়াছে ( ১০০০ কার্ষাপণের বার্ষিক স্রদ ৫০ বা ৭৫ কার্ষাপণ ) তাহাতে দেখা যায় যে, শতকরা বার্ষিক স্রদের হার তখন ৫ ও ৭ ½ কার্ষাপণের মধ্যে ছিল। সুতরাং ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, সাধারণতঃ ৫ ও ৭ ½ কার্ষাপণের মধ্যেই স্রদের হার সীমাবদ্ধ ছিল। যদি ধরা যায় যে, দেশের অশান্তি বা অরাজকতার উপর স্রদের হার নির্ভর করে, এবং দেশের শাসন যত উৎকৃষ্ট হয়, স্রদের হারও তত কম হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, রাজনৈতিক অশান্তির মধ্যেও তখন দেশের শাসনের বন্দোবস্ত ছিল। এবং যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, তখন দেশ সুন্দররূপে শাসিত হইত তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, স্থানীয় শাসন-সমিতির গঠন-প্রণালী ও শাসন-নীতি উৎকৃষ্ট ছিল বলিয়াই রাজবংশের পরিবর্তনের সময়ও দেশে শাসন-বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে আমরা বুঝিতেছি যে, মিউনিসিপাল স্বায়ত্ত শাসন এবং ব্যাক প্রথা ভারতবর্ষে নূতন নহে। এই সকল প্রতিষ্ঠান বহুপূর্বে হইতেই ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিল।

এই সময়ে অর্ধবাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য ভারতে যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছিল। পাশ্চাত্য অর্ধবাণিজ্য ও দেশ হইতে অর্ধববান ভারুৎক্ষে বহির্বাণিজ্য ও অন্তান্ত বন্দরে আগমন করিত এই কথা পেরিপ্লাসে (Periplus) লিখিত আছে। অর্ধব পোতে আনীত পণ্যাদি পারশেবে বরোচ ( ভারুকছ ) হইতে বিভিন্ন মগরে নীত হইত। সেইরূপ ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে মসলিন, তুলা, বহুমূল্য প্রস্তর প্রভৃতিও বরোচে আনীত হইত, এবং সেখান হইতে অর্ধবপোত বোণাই হইয়া সেই সকল পণ্য বিদেশে প্রেরিত হইত। পেরিপ্লাসে (Periplus) ভারতের মালাবার ও করমণ্ডল উপকূলে বহু বন্দরের উল্লেখ আছে।

কারলী-চৈত্যের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, গোয়ার নিকটবর্তী বৈজয়ন্তী-বাসী জনৈক সমৃদ্ধ শ্রেষ্ঠী এই চৈত্য নির্মাণের বিপুল ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। কঙ্কণ-প্রদেশে কাণেড়ীতে এই প্রকার বিপুল দানের বহু বিবরণ শিলালিপিতে উৎকর্ণ রহিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তৎকালে বণিক সম্প্রদায় বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। পেরিপ্লাস প্রণেতা ও টলেমি ( The author of the Periplus and Ptolemy ) খৃষ্টীয় ১ম ও ২য় শতাব্দীর লোক, উভয়েই এই বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতেছেন।

সেই সময়ে বাস্পরথের আবিষ্কার হয় নাই বলিয়া বিভিন্ন প্রদেশে গমনাগমনের বাধা গমনাগমনের ছিল একরূপ মনে করা সঙ্গত নহে। উপায় যে সকল লোক ধর্মার্থ অর্থ বিতরণ করিয়া গিয়াছেন চৈত্য-মন্দিরাদির গাত্রে উৎকর্ণ শিলালিপি পাঠে তাহাদের নাম অবগত হওয়া যায়। বৈজয়ন্তীবাসী শ্রেষ্ঠীর নাম কারলী চৈত্যের প্রাচীর-গাত্রে উৎকর্ণ আছে। নাসিকের জনৈক বণিকের নাম বিদিসার জুপ-গাত্রে খোদিত রহিয়াছে। ভারুকছ ও কলাণবাসী কতিপয় ব্যক্তির নাম জুনার শিলা-লিপিতে উৎকর্ণ দৃষ্ট হয় উত্তর ভারতবাসী বহু অর্থদাতার নাম নাসিকের পর্বত-গাত্রে উৎকর্ণ রহিয়াছে। সেইরূপ দক্ষিণ ভারতের অনেক ধনী ব্যক্তির নাম উত্তর ভারতের গুহা-মন্দিরাদির গাত্রে খোদিত আছে। বাহুৎ জুপে নাসিকনিবাসী ধানগণের অর্থদানের বিবরণ উৎকর্ণ দৃষ্ট হয়। \*

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে এবং বিভিন্ন স্থান সমূহে সদাগরদ্বারা গমনাগমনের উপায় না থাকিলে এক দেশের লোক অপরিজ্ঞাত প্রদেশে ধর্ম কার্যের জন্ত অর্থ দান করিত না একরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে।

শ্রীশঙ্করবল্লভ চৌধুরী।

\* বাহুৎ জলপুর ও এলাহাবাদের মধ্যস্থলে অবস্থিত।

## ৮ কৈলাসচন্দ্র সিংহ

বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে প্রবীণ প্রত্নতত্ত্ববিদ ও সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ৮কৈলাসচন্দ্র সিংহ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় অপরিচিত নহেন। উপস্থিত প্রবন্ধে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদর্শিত হইল।

পাঠান শাসনকালে দক্ষিণ রাঢ়ীয় চৌলসমাজের সিংহ বংশীয় লালা রঘুপ্রসাদ সিংহ সপ্তগ্রামে কাননগুই দপ্তরে কার্য্য করিতেন। যোগল পাঠানের বিরোধারম্ভে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার পুত্র লাল চণ্ডীপ্রসাদ সিংহ নিরাশ্রয় অবস্থায় চন্দ্রদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৫০৫ বকে (১৫৮০ খৃষ্টাব্দে) ভীষণ জলপ্লাবনে চন্দ্রদ্বীপ প্লাবিত হয়। নদীর জল ২৫।৩০ হস্ত উচ্চ হইয়া মহুঘের গৃহাদি ভাসাইয়া নেয়। সেই জলপ্লাবনে প্রায় দুই লক্ষ মানব কালকবলিত হয়। ভগবৎ রূপায় এই শোচনীয় ঘটনা হইতে রক্ষা পাইয়া চণ্ডীপ্রসাদের পুত্র লাল সুন্দররাম সিংহ জিলা ত্রিপুরার অন্তর্গত কালীকচ্ছ গ্রামে উপনীত হন। সরাইল পরগণার তদানীন্তন জমিদার মহাশয়ের রূপায় কিঞ্চিৎ ভূমি প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে বাসভবন নির্মাণ করেন। ৩২৯ বৎসর গত হইল, তাঁহার বংশধরগণ অজ্ঞাপি সেইস্থানে বাস করিতেছেন।

লালা রঘুপ্রসাদের ১২শ উত্তরপুরুষ ৮সোণারাম সিংহ দ্বায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র ৮গোলোকচন্দ্র সিংহ রায় ত্রিপুরাধিপতির রাজস্বসচীব ছিলেন। তৎকালে রায় মহাশয়ের সুখ্যাতি জনসমাজে পরিব্যাপ্ত ছিল। যদিও তিনি রাজস্ব-বিভাগের কর্ম্মচারী, তথাপি স্বীয় বুদ্ধিচাতুর্য্যে কি সামরিক, কি শাসন, কি মন্ত্রণা প্রায় সমুদয় বিভাগেরই পরিচালক ছিলেন। ৮গোলোকচন্দ্র সিংহ রায় মহাশয়ই আমাদের কৈলাসবাবুর পিতৃদেব। রায় মহাশয়ের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ শরচ্চন্দ্র, কনিষ্ঠ কৈলাসচন্দ্র। শরচ্চন্দ্র শৈশবেই কালগ্রাসে পতিত হয়। জ্যেষ্ঠপুত্রের মৃত্যুতে

জনকজননী শোকাবুল হইয়া দ্বিতীয় পুত্রের লাভাকাঙ্ক্ষায় শ্রীশ্রী ৮গগজ্ঞননীর সেবা করিতে থাকেন। এক্ষণে সাত বৎসর অতিবাহিত হইলে তাঁহাদের দ্বিতীয় পুত্র কৈলাসচন্দ্র ১২৫৮ বঙ্গাব্দের ১৮ই আষাঢ় অপরাহ্নে জন্মগ্রহণ করেন। সে দিবস রথযাত্রা ছিল।

পিতামাতার একমাত্র পুত্র বলিয়া কৈলাসচন্দ্রের আদরের সীমা ছিল না। যখন তিনি দেড় বৎসর বয়স্ক তখন তাঁহার পিতৃদেব সপরিবারে ৮কালীধাম যাত্রা করেন। সুতরাং তিনি অতি শৈশবেই শ্রীশ্রীবিষ্মনাথ দর্শন করিতে পারিয়াছিলেন। ৫ম বৎসর বয়সে কৈলাস বাবুর বিজ্ঞানভূষণ হয়। তৎকালে কুমিল্লার জিলা স্কুল ব্যতীত ত্রিপুরা জিলায় অত্র কোন উচ্চ ইংরেজী বিভাগলয় ছিল না। ১২৬৩ বঙ্গাব্দে কালীকচ্ছ গ্রামে সাধক ৮বাবু আনন্দচন্দ্র নন্দী (আনন্দ স্বামী), ৮গোলোকচন্দ্র সিংহ ও অজ্ঞাত কয়েকজনের উদ্যোগে একটি ইংরেজী বিভাগলয় স্থাপিত হয়। এই বিভাগলয়েই তাঁহার প্রথম বিভাগশিক্ষা আরম্ভ হয়। কৈলাসবাবুর বাল্যসহচরদিগের মধ্যে দার্শনিক পণ্ডিত বাবু বিজয়দাস দত্ত এম, এ, এবং ৮গগগ-চন্দ্র চক্রবর্তী \* অত্যন্তম। তাঁহার তিনজনে একত্র বাল্যক্রীড়া করিতেন। প্রতিবেশীর বাড়ী হইতে অর্থ ধরিয়া আনিয়া দৌড়াইতেন। কালে কৈলাসচন্দ্র অর্থচালনে বিশেষ পটু হইয়াছিলেন। কালীকচ্ছ স্কুল খোলার কিছুদিন পরেই ভীষণ সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সিপাহীরা উত্তরাভিমুখে যাত্রা করার সংবাদ গ্রামে প্রচারিত হইলে গ্রামবাসিগণ নিতান্ত ভয়ভর হইয়া পড়ে। লুটপাটের ভয়ই বিশেষ প্রবল হইল। কৈলাসচন্দ্র তখন বালক। তিনি সহচরগণকে লইয়া গুপ্তসুকাবশে অথচ শক্তিত মনে মাঠে যাইয়া বন্ধারোহণে দূরবর্তী স্থানসমূহ নিরীক্ষণ করিতেন। বিদ্রোহ নিবারিত হইল—দেশে শান্তি আসিল। তখন লোকে নিশ্চিন্ত মনে সিপাহী বিদ্রোহের নানারূপ গল্প শুদ্ধব করিত। কৈলাসচন্দ্র

জানুয়ারী ১৯৭১

সে সকল গল্প নিবিষ্ট মনে শুনিতেন এবং বাগ্মশূলত কল্পনার বিস্তারিত দর্শন করিয়া ক্রমে ভীত, ক্রমে বিমিত ক্রমে আমোদিত হইতেন।

মূল খেলার ২১০ বৎসর পরই মূলটি তাদিয়া যায়। সুতরাং কৈলাসবাবুকে গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া অল্প বয়সেই স্থানান্তরে গিয়া পড়িতে হইয়াছিল। তিনি যখন অষ্টম বৎসরে পদার্পণ করেন তখন পরিবারের প্রিয়জনকে ছাড়িয়া ব্রাহ্মণবাড়ীয়া পড়িতে গমন করেন। সেখানে দেড় বৎসর অধ্যয়নের পর অবশেষে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কুমিল্লা জিলা স্কুলে প্রেরিত হন। কিন্তু অধিক দিন পড়িতে পারিলেন না। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি টাইফয়েডে জরে আক্রান্ত হন। সেই জ্বর হইতে মুক্তি লাভ করিয়া প্রায় দেড় বৎসর পলীহা জরে অশেষ যত্ন লাভ করেন। উৎকট রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া পুনর্বার বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে বাইবেন, এমন সময় তাঁহার পিতৃদেব (বাং ১২৭০, ১ আষাঢ়) স্বর্গারোহণ করেন। তখন তিনি এটেন্ট স্কুলের ৪র্থ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। এখানেই পিতৃহীন কৈলাসচন্দ্রের বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত হয়। তিনি যখন দ্বাদশ বৎসরে পদার্পণ করেন, তখন তাঁহার খুল্লতা ভ্রাতা ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ত্রিযুক্ত বাবু প্রকাশচন্দ্র সিংহ বি. এ. জারবাগীশ জন্মগ্রহণ করেন। কৈলাসচন্দ্রের সোদর ছিল না। সুতরাং প্রকাশ বাবুর প্রতিই তাঁহার সোদর বোধ জন্মিয়াছিল। কৈলাসবাবু আজীবন সোদর-প্রতিম প্রকাশবাবুকে আন্তরিক ভালবাসিয়া গিয়াছেন এবং প্রকাশ বাবু ও তাঁহাকে অগ্রজ জ্ঞানে ভক্তি করিয়াছেন।

১৩ বৎসর বয়ঃক্রমে কৈলাসচন্দ্র দারপরিগ্রহ করেন। ১৫ বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। তাঁহার অপর ভ্রাতা ছিল না, একমাত্র অল্প বয়সেই তিনি একটি সংসার পরিচালনের ভার প্রাপ্ত হইলেন। ৬ গোলোকচন্দ্র সিংহ রায় মহাশয় জীবনে অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন

সত্য, কিন্তু তিনি কিছুই সঞ্চয় করিয়া বাইতে পারেন নাই। নানা প্রকারে সদহুতানে অর্থরানি মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়াছিলেন। সুতরাং কৈলাস বাবুকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া ত্রিপুর রাঙ্গসরকারে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। ঘটনা-চক্রের আবর্তে পড়িয়া যদিও তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তথাপি বিদ্যার্জনের পিপাসা পরিহার করিতে পারিলেন না। সরকারী কার্যের অবকাশে তিনি অবিশ্রান্ত অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিতেন। কোন নূতন গ্রন্থ পাইলেই সকল কার্য তুলিয়া গ্রন্থপাঠে রত থাকিতেন। যখন কোন নূতন গ্রন্থ না পাইতেন, তখন কালীরামের মহাভারত ও কোর্টবাসের রামায়ণ বন্ধে ধারণ করিয়া শয্যাশায়ী হইতেন। এক্ষণে রামায়ণ মহাভারত তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়াছিল। এই দুই গ্রন্থের জ্ঞান তাঁহার আর একখানা গ্রন্থ নিভাপাঠ্য ছিল—নাম “দুর্গাভক্তি চিহ্নমাণি” (?)। এই গ্রন্থ এক্ষণে হস্তাপ্য। সর্বদা অধ্যয়নে রত থাকিতে কৈলাসচন্দ্রের হৃদয়ে গ্রন্থরচনার বাসনা জাগরিত হয়। তৎকালে ঢাকা নগরী হইতে “হিন্দুহিতৈষিনী” নামক একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত। ১৭১৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কৈলাসচন্দ্র মধ্যে মধ্যে সেই পত্রিকার কিছু কিছু লিখিতেন। সম্পাদক আগ্রহের সহিত তাহা প্রকাশ করিতেন। তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ হিন্দুহিতৈষিনীতে “প্রেরিত পত্র” নামে মুদ্রিত হয়। সেই হইতেই কৈলাস বাবু বঙ্গীয় পাঠকসমাজে লেখক বলিয়া পরিচিত হইবার আশা হৃদয়ে পোষণ করেন। ১৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি একখানি উপখ্যান গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু পাণ্ডুলিপি বিনষ্ট হইয়া যাওয়াতে তাহা আর মুদ্রিত হইতে পারিল না। বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি আগড়তলা পরিত্যাগ করেন। এই ব্যাপার অতি বিষয়কর এবং ত্রিপুরা ইতিহাসের সহিত সংশ্লিষ্ট এ জন্ত এস্থলে ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিবৃত হইতেছে।

ত্রিপুরাধিপতি স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর



তিনটি নাবালক পুত্র রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলে পর মহারাজের কনিষ্ঠ সহোদর স্বর্গীয় বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর ত্রিপুরার রাজযুক্ত মন্তকে ধারণ করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ১২ই মার্চ মহারাজের অভিনেত্রী সঙ্গীয়া সম্পাদিত হয়। মহারাজা জৈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের স্বর্গী রাহণের অত্যন্তকাল পরই তাহার জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ কুমার পরলোকগমন করেন। ত্রিপুরাবাসী সর্বসাধারণের এরূপ বিশ্বাস ছিল যে, মহারাজা জৈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের একমাত্র জীবিত পুত্র কুমার নবদীপচন্দ্র বাহাদুরই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন। কিন্তু মহারাজা ৮বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর ১২৭৭ বঙ্গাব্দে ১৬ই ভাদ্র স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার রাধাকিশোরকে সুবরাজ্যপদে বরণ করেন। এরূপ কুমার নবদীপচন্দ্রের ভবিষ্যৎ আশা ও স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়া গেল। মধ্যমকুমার নবদীপচন্দ্র ১২৮১ ত্রিপুরাব্দে আঘাত মাসে স্বীয় জননীসহ কুমিল্লা নগরীতে উপনীত হইলেন। এই ঘটনায় বিংশতি বর্ষীয় যুবক কৈলাসচন্দ্রের প্রাণে নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছিল। তিনি মনের ক্ষোভে স্বীয়কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পথিমধ্যে কুমার বাহাদুরের সঙ্গে মিলিত হইলেন এবং ত্রিটিশ আদালতে বিচার প্রার্থী হইলেন। মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের বিরুদ্ধে কেহই প্রকাশ্যে যোগদান করিতে সাহসী হইলেন না। সুতরাং কৈলাস বাবুকেই সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইয়াছিল তাঁহার অপর সহকারী কেহই ছিল না। যোকদ্দমা পরিচালন অর্থসাপেক্ষ। নিরাশ্রয় রাজকুমার কোথায় অর্থ পাইবেন? কৈলাস বাবু মুর্শিদাবাদে গমনপূর্বক জনৈক মাবোরারীকে অর্থপ্রদানে স্বীকৃত করান। যোকদ্দমা নিম্পত্তি হইলে ত্রিপুরা রাজলক্ষ্মী মহারাজা ৮ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরকে বরণ করিলেন। কুমার শ্রীযুক্ত নবদীপচন্দ্র দেব বর্মান বাহাদুর সামান্ত বৃত্তিপ্রাপ্ত হইলেন। যোকদ্দমার পরিণামফল আবাদের আলোচ্য

বিষয় নহে। কিন্তু বিংশতি বর্ষীয় যুবক কৈলাসচন্দ্র এই ঘটনায় জড়িত হইয়া যেমন নির্ভীকতা, কার্য্য-তৎপরতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে ভূভিত হইতে হয়, এবং শতমুখে তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকায় না। বাস্তবিক কি স্বপ্নের কি বিপ্লবের ব্যারিষ্টারগণ তাঁহার প্রতিভায় আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন। কুমার বাহাদুরের পক্ষে প্রধান ব্যারিষ্টার মিঃ মনট্রো তাঁহাকে বিলাতে যাইয়া ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিতে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন। কৈলাসচন্দ্র সেই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া মাঝে মাঝে বিলাত গমনে সক্ষম করিতেন। কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা সফল হয় নাই।

কৈলাস বাবু বাল্যকাল হইতে সাহিত্যে অস্বস্ত ছিলেন। যোকদ্দমায় জড়িত থাকিয়াও তিনি সাহিত্য-সেবায় বিরত হন নাই। যোকদ্দমায় উভয় পক্ষ হইতে ত্রিপুরা রাজ্যের বহুল পুস্তক দলিলপত্র প্রকাশ পাইয়াছিল। সে সকল উপকরণ অবলম্বনে কৈলাস বাবু “ত্রিপুর ইতিবৃত্ত” নামক একখানা ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। ইহাই বঙ্গভাষা সর্বপ্রথম জিলার ইতিহাস। তৎকালীন সোমপ্রকাশ, সাধারণী, অমৃতবাজার প্রভৃতি সাময়িক পত্রে ইহার ভূয়সী প্রশংসা বাহির হইয়াছিল। অমৃতবাজার সম্পাদক মহাত্মা ৮ শিশিরকুমার ঘোষ এই পুস্তিকার যে সমালোচনা করিয়াছিলেন তদ্বারা নবীন লেখক বিশেষ রূপে উৎসাহিত হইয়াছিলেন। প্রাকৃতিক যোকদ্দমা পরিচালন সময়ে কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব জজ ৮ শঙ্কুনাথ পণ্ডিত মহাশয়ের পুত্র, হাইকোর্টের উকিল ৮ পণ্ডিত প্রাণনাথ সরস্বতীর সহিত কৈলাস বাবুর পরিচয় স্থাপিত হয়। সরস্বতী মহাশয় ত্রিপুরা ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া গ্রন্থকর্তাকে সমধিক উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের প্রণালীশিক্ষা দিয়া ছিলেন। তৎকাল তাঁহার নিকট কৈলাসবাবু চিরদিন কৃতজ্ঞ ছিলেন।



চাষন : ৩২১

ত্রিপুরা ইতিবৃত্ত প্রকাশের পর গ্রন্থকার ফরাসী বীরললনা জোরানের জীবন চরিত বঙ্গীয় পাঠ-কসমাজে উপস্থিত করেন। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইংরেজী ও বাংলা পত্রিকার সম্পাদকগণ গ্রন্থকর্তাকে বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। কলিকাতা গেজেট, বোম্বে গেজেট, কলিকাতা রিভিউ প্রভৃতি ইংরেজী পত্রিকায় ইহার ভাষা সম্পর্কে অতি সুন্দর প্রশংসাত্মক মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে ইহার ভাষা অতি প্রাজ্ঞ, অতি মধুর ও মনঃপ্রাণযুক্তকরী।

জোরান চরিত প্রণয়ন করিয়া কৈলাস বাবু ভারত পুরাতত্ত্বসম্মানে মনোনীত করেন। প্রথমই সাহিত্য সম্রাট ৮ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে মণিপুর বিবরণ শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন অতঃপর তিনি গৃহে বসিয়া পুরাতত্ত্বমূলক প্রবন্ধ রচনা করিতে থাকেন। কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিত হইলে পরে “হিউয়েনসাঙের” বাংলা ভ্রমণশীর্ষক প্রবন্ধ সুবিখ্যাত “ভারতী” পত্রিকার সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করেন। সম্পাদক প্রাপ্তিমাত্রই ইহা পত্রিকায় মুদ্রিত করেন। ইহাতে উৎসাহিত হইয়াই তিনি ভারতী পত্রিকায় নিয়মিত লিখিতে থাকেন। কয়েক মাস গত হইলে প্রকাশ্য সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের আহ্বানমতে কৈলাস বাবু পল্লী চাড়িয়া কলিকাতায় গমন করেন। পথিমধ্যে তিনি ঢাকা নগরীতে উপনীত হইলে, বান্ধব-সম্পাদক রায়বাহাদুর ৮ কালীপ্রসন্ন বাবুর সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হয়। সম্পাদকের ঐকান্তিক অনুরোধে ঢাকা বসিয়াই “দিনাজপুর তত্ত্বলিপি” শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহাকে প্রদান করেন। তৎপর কলিকাতা আসিয়া শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র বাবু ও কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। কলিকাতা গমনের তিন মাস পরে জ্যোতিরিন্দ্র বাবু কৈলাস বাবুকে তাঁহাদের উদ্ভিষ্মাস্থিত জমিদারীর শাসনভার প্রদান করিয়া কটক জিলার

অন্তর্গত “অরুছিলি” নামক স্থানে প্রেরণ করেন। তিনি তথায় বাইয়া “উদ্ভিষ্মা বাত্রা” শীর্ষক প্রবন্ধ ভারতীতে প্রকাশ করেন। ইহার পর তাঁহার “উদ্ভিষ্মার ইতিহাস” শীর্ষক প্রবন্ধ ভারতীতে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। জমিদারীর শাসনকার্য্য সুচারু রূপে নির্বাহ করিয়াও কৈলাস বাবু ভারতী ও বান্ধব পত্রিকায় নিয়মিত লেখকের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি কলিকাতা নগরীতে প্রত্যাগমন করেন। সেই সময় কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্র ঠাকুর আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকপদে ও কৈলাস বাবু সহকারী সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। এক সময়ে সাহিত্য-চার্য্য ৮ অক্ষয়কুমার দত্ত উক্ত সহকারী সম্পাদকের কার্য্য নির্বাহ করিয়াছিলেন। আদি ব্রাহ্ম সমাজের একাধি লাইব্রেরীর একটি সামান্য পুস্তকও তাঁহার অনধীত ছিল না। তিনি সমস্ত গ্রন্থই মনোনীত সহকারে পাঠ করিতেন। মহর্ষি ৮ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৈলাস বাবুর প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে ‘পুরাতত্ত্বদর্শী’ নামে অভিহিত করিতেন।

আদি ব্রাহ্মসমাজে অবস্থানকালে কৈলাসচন্দ্র গ্রন্থরচনায় মনোনীত করেন। তৎকালে এ দেশে গীতার বহল প্রচার ছিল না। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর বর্ণের লোক ইচ্ছাসত্ত্বেও গীতাপাঠের সুযোগ প্রাপ্ত হইতেন না। কৈলাস বাবু দেশের লোকের সেই অভাব বৃদ্ধিতে পারিলেন, এবং গীতার বঙ্গানুবাদ প্রকাশে উদ্যোগী হইলেন। ভগবৎসংস্করণ অল্পদিনের মধ্যেই শঙ্করভাষ্য, আনন্দগিরি, শ্রীধরস্বামীকৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ শ্রীমদ্ভাগবতগীতার এক উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রচার করেন। তদ্ব্যতীত কৈলাস বাবু যে এক সুচিন্তা সারগর্ভ ভূমিকা লিখিয়াছেন। গীতার এই অভিনব সংস্করণের ভূমিকা পাঠ করিয়াই দেশের বহল লোক গীতাগ্রন্থে প্রদীপিত হইয়াছিলেন। “বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ” প্রণেতা শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র রায় প্রবন্ধ-

লেখককে বলিয়াছেন;—তৎকালে কৈলাস বার দীতায় যুবকগণের বেকরূপ উপকার সংসাধিত হইয়াছিল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

ইহার কিছুকাল পর কৈলাসবাবু তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ “দাক্ষিণ্য” নামক পুস্তিকায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ইতিহাস প্রদান করেন। এই গ্রন্থে তিনি বৌদ্ধদিগের অনেক কীর্তিকলাপ কীর্তন করেন এবং অধ্যায়ে ভগবান বুদ্ধদেবের জীবনচিত্র অঙ্কিত করেন। অনন্তর কৈলাসচন্দ্রের মোহমুগ্ধার, হস্তামলক, পরাশর সংহিতা ও সেনরাজগণ গ্রন্থ প্রচারিত হয়।

অন্তঃপর কৈলাসবাবু বাঙ্গালার বিখ্যাত সাধকগণের সঙ্গীতমালা সংগ্রহ করিয়া ‘সাধক সঙ্গীত’ (১ম ও ২য় খণ্ড) নামক এক বিরাট গ্রন্থ প্রকাশ করেন। দেশময় একটি ভ্রম প্রচলিত ছিল যে, “রামপ্রসাদ সঙ্গীত” সমস্তই পশ্চিম বঙ্গবাসী সুপ্রসিদ্ধ রামপ্রসাদ সেনের বিরচিত। \* কিন্তু তিনি বিশেষ ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন, রাম প্রসাদী সঙ্গীতগুলি সাধক রামপ্রসাদ সেন, সাধক রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, কবিওয়ালা রামপ্রসাদ ও অজ্ঞাত ব্যক্তির রচিত সঙ্গীতে সংমিশ্রিত। গ্রন্থের (৫৯ পৃষ্ঠা ব্যাপী) অবতরণিকায় বহু প্রয়োজনীয় নূতন বিষয়ের সমাবেশ রহিয়াছে।

বদেশ-প্রাণ কৈলাসচন্দ্র অবতরণিকায় এক স্থলে লিখিয়াছেন;—“পুণ্যভূমি ভারত অস্ত্র বিষয়ে দরিদ্র হইলেও তাহার একটা গৌরবের জিনিস আছে। তাহার ক্ষুদ্র কুটীরে, তাহার বনপ্রান্তরে, তাহার গ্রামে নগরে, যেখানে যাও সেখানেই স্বর্গীয় পারমার্থিক সঙ্গীত শ্রবণ করিতে পারিবে। ভারত একদিকে যেমন রম্য কানন অস্ত্র দিকে সাধনার মনোহর তপোবন। এই রম্য কাননে, এই তপোবনে, কত কবির, কত সাধকের জীবন স্রোত নীরবে মিশিয়াছে কে বলিতে পারে?”

\* ‘প্রতিভা’ “বিজ্ঞ রামপ্রসাদ” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কৈলাসচন্দ্র অবতরণিকা মধ্যে চৌনিসপুর স্থিত শ্রীশ্রীকালীবাটীর সাধক রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর ও কুমারহট্টের সুপ্রসিদ্ধ সাধক রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জনর সঙ্গীতমালা সমালোচনা দ্বারা উভয়ের সাধন রাজ্যের বিভিন্ন স্তর নির্দেশ করিয়াছেন। কৈলাসবাবু গুরুতর পরিশ্রমের পর সাধক সঙ্গীত প্রণয়নে কৃতকার্য হন। এই সফলতাই, তাঁহাকে ভবিষ্যতে দুরূহ কার্যসম্পাদনে প্রণোদিত করিয়াছিল।

সহকারী সম্পাদকের কার্য্য সুন্দররূপে নির্বাহ করিয়া কৈলাসচন্দ্র পুনরায় জমীদারী সংক্রান্ত কার্য্যে নিয়োজিত হইলেন। \* এরূপে প্রায় ১০ বৎসর সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া তিনি ৪০ বৎসর বয়সে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে আসিবার পূর্বে কৈলাসবাবু এক বিরাট ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। “তিনি সঙ্কল্প করিলেন বাঙ্গলায় একখানা সর্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস লিখিতে হইবে। অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া উপকরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়, ঘটনার প্রতিঘাতে এই কার্য্যটা তিনি সম্পন্ন করিয়া পাইয়া হইত পারেন নাই। উপক্রমণিকাখানা মাত্র লেখা এবং মুদ্রিত হইয়াছিল। দপ্তরীর গৃহদাহের সঙ্গে সঙ্গে তাহাও

শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলেন;—এই সময় তিনি সহকারী সম্পাদকপদে নিযুক্ত থাকেন। তবে তৎসময় “ঠাকুর বাড়ীর” জমীদারী সংক্রান্ত ব্যাপারে কোনরূপ গোল উপস্থিত হওয়া, কৈলাসবাবু সময় সময় জমীদারী কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেম মাত্র। জমীদারী কার্য্যে কৈলাসবাবুর প্রতিভা লক্ষ্য করিয়াই “ঠাকুর বাড়ীর” কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে এই কার্য্যে সময় সময় সাহায্য করিতে নিয়োজিত করেন।—কিন্তু লেখক কৈলাসবাবুর নিকট শ্রুত হইয়াছিলেন যে, সেই সময় তিনি কলিকাতা অবস্থান করিয়াই ঠাকুর বাড়ীর জমীদারীকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেম। তখন, সহকারী সম্পাদকের কার্য্য অপর এক ব্যক্তির হস্তে অর্পিত হয়।

ফাল্গুন ১৩২১

লোপ হইয়া যায়। কেবল একখানি কপি মাত্র অবশিষ্ট থাকে। উপক্রমণিকাখানাই ৩০০ পৃষ্ঠার অধিক। ইহাতে এত বিষয় আছে যে, বঙ্গদেশে কি ইংরাজী কি বাঙ্গালার এমন কোন ইতিহাস আজ পর্যন্ত বাহির হয় নাই বাহা হইতে এই সকল জানা যাইতে পারে। কিরূপ ইতিহাস লিখিবেন তাহার নমুনা স্বরূপ ‘সেন-রাজগণ’ নামক একটি অধ্যায় ১২৯১ সনের ভারতীতে প্রকাশ করিয়া কবিকুলভূষণ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে উপহার প্রদান করেন। তাহার উপহার এক অংশে লিখিয়াছিলেন।—

‘যে দিবস স্বর্গাদপি গরীয়সী জনভূমির ইতিহাস সম্পূর্ণ করিয়া আপনার করকমলে সমর্পণ করিতে করিতে পারিব সেই দিবস আমার মহাপূজা শেষ হইবে। অল্প প্রথম অর্থ্যপ্রদান করিতেছি, গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ করুন।’ কিন্তু বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই কার্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। দৈবদুর্বিপাকে এই সময় তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বাড়ী আসিয়াই সাধারণের মঙ্গলজনক অল্প এক গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করেন।”\*

ত্রিশ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা ভাষার পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে একজনকার মত আলোচনা ছিল না। রজনী বাবু ও প্রফুল্ল বাবুর ২১১ খানা গ্রন্থমাত্র প্রচারিত হইয়াছিল। কৈলাসবাবু সেই সময় ভারতী, বাঙ্গাব, নব্যভারত, তত্ত্ববোধিনী, সাহিত্য প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত রূপে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিতেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তিনি “দক্ষমাশ” শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্গীয় পাঠককে অবগত করেন যে, গ্রীক বীর আলেকজেন্ডারের ভারত আক্রমণ কালেও পুণ্যভূমি ভারতে তেজস্বী ও আত্মত্যাগী ঋষি বিরল ছিলেন না। কৈলাস বাবুর প্রবন্ধাবলীতে বঙ্গভাষার কিরূপ উপকার সাধিত হইয়াছে তাহা বঙ্গীয় সাহি-

ত্যিকগণের নিকট অবিস্মৃত নহে। ডাক্তার ৮ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার “রীজ এন্ড রাইয়ত” (“Reis & Rayyut”) পত্রিকায় ও ৮ নং রজনী বাবু সেন তাঁহার মিরর (Mirror) পত্রিকায় তৎকালে কৈলাস বাবুকে “মৌলিক প্রত্নতত্ত্ব বিদ” বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ প্রবন্ধই বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে। তৎসমুদয় একত্র হইলে গ্রন্থিত এক সুবৃহৎ গ্রন্থে পরিণত হইবে। আমরা তাঁহার প্রবন্ধ সংগ্রহে নিযুক্ত আছি।

ত্রিপুরা প্রত্যাবর্তনের পর কৈলাস বাবু “রাজমালা” বা ত্রিপুরার ইতিহাস প্রণয়ন করেন। ইহা তাঁহার অল্পয় কীর্ত্তি। ত্রিপুরা অতি প্রাচীন রাজ্য। ত্রিপুর রাজ্যের ধারাবাহিক ইতিহাস ছিল না। থাকিলেও তাহা জনসাধারণের গোচর হইত না। কৈলাস বাবু রাজমালা প্রণয়ন করিয়া, বঙ্গীয় সাহিত্য ভাণ্ডারে একটি প্রাচীন রাজ্যের সুবৃহৎ ইতিহাস রাখিয়া বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। এই গ্রন্থ সম্পর্কে কলিকাতা গেজেট বলিতেছেন—

It contains a mass of interesting information and is a valuable contribution to the historical literature of Bengal.

(Calcutta Gazette, June 30, 1897).

সাহিত্য ক্ষেত্রে কৈলাস বাবু কিরূপে তাঁহার জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন তাহা এই প্রবন্ধে সংক্ষেপতা আলোচিত হইল। এখন আমরা তাঁহার শেষ জীবনের দুই একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

৫০ বৎসর পর্যন্ত কৈলাসবাবুর কোন ধর্ম্মই বড় আস্থা ছিল না। তিনি ত্রায় পথে জীবনযাপন করাই প্রকৃত ধর্ম্মাচরণ মনে করিতেন। তাঁহার কোন কোন প্রবন্ধে দৃষ্ট হয়, তিনি কোলাচারী সাধকদিগকে তাত্ত্বিক মাতাল বলিয়া তীব্র উপহাস করিয়াছেন। তিনি কখন বেদান্ত চর্চ্চার অভিনিবিষ্ট হইতেন, কখন বা ব্রহ্মোপাসনার নিরত থাকিতেন, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মই তিনি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। “রাজমালা” প্রকা-

শেষ পর কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইলে, গ্রন্থকার শ্রামাবিষয়ক সঙ্গীত চর্চায় প্রবৃত্ত হইলেন। তখন হইতেই তিনি একনিষ্ঠ শক্তির উপাসক হইলেন। কুলগুরুর নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া ত্রীশ্রী ৮ শ্রামার অর্চনা করিতে থাকেন। কুলগুরুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণের পরও কৈলাসচন্দ্রের পরিভূষি হইল না। প্রথম বয়সে তিনি গুরুর প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারেন না কিন্তু পরিশেষে জদয়ঙ্গম করেন মহাপুরুষের কৃপা ব্যতীত আধ্যাত্মিক জগতে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। সে সময় তিনি সদগুরু লাভেচ্ছায় আকুলপ্রাণে হরিদ্বার, প্রয়াগ, কাশী, গয়া, কাশাখা প্রভৃতি স্থানে কতবার যে ছুটাছুটি করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। অবশেষে তিনি কোন এক মহাপুরুষের কৃপালাভ করিয়া চিন্তে শান্তি আনয়ন করেন। অধ্যাত্মিক জগতে অবস্থান করিয়াও কৈলাসচন্দ্র সাহিত্য সেবার বিরত হন নাই। এ সময় তিনি, ভারতীর চরণে “কাকালৈর গীত” (সাধক সঙ্গীত পরিশিষ্ট বা ৪র্থ ভাগ), ও “কাকালগীতা” নামক দুইটি পুস্তক উৎসর্গ করেন।

কাকালৈর গীত বা সাধক সঙ্গীত পরিশিষ্ট কৈলাসচন্দ্রের স্বরচিত শ্রামাবিষয়ক সঙ্গীতে পরিপূর্ণ। এই সঙ্গীত গ্রন্থে বিশেষত্ব আছে। সঙ্গীতগুলি উদার ভাবে পরিপূর্ণ। দশমহাবিদ্যা ও দশাবতার অভিন্নভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে—ইহাতে কৈলাসচন্দ্র ১৪৫টি সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। সঙ্গীতগুলি ভক্তির উৎস। তিনি মা-হারী হইয়া কাকালৈর মত মা-মা বলিয়া কাদিয়া আকুল হইতেন। তিনি একস্থানে গাহিয়াছেন—

“হয়েছে আমার মাগো ধূলা খেলা অবসান।

তব দরশন বিনে হয়েছে আকুল প্রাণ॥”

কাকাল গীতা অতি উপাদেয় ক্ষুদ্র পুস্তিকা। ভুলসী-দাস, কবির ও বীরাবাইর ধূরাবলীর জায় কোন গ্রন্থই বঙ্গভাষায় ছিল না। কৈলাস বাবুর কাকাল গীতা দ্বারা

বঙ্গভাষায় সেই অভাৱ দূরীভূত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া চিন্তাশীল সমালোচক ৮ চন্দ্রনাথ বসু এম. এ, বি. এল. মহাশয় লিখিয়াছেন, “কাকালগীতা অতি ক্ষুদ্র পুস্তক কিন্তু অতি গুরুতর কথায় পরিপূর্ণ। সকল কথাই অমূল্য। জীবন উন্নত ও পবিত্র করিতে হইলে এই সকল কথা জপমালায় স্বরূপ হৃদয়ে রক্ষা করা একান্ত কর্তব্য। যেকোন সহজ ও সরল ছন্দে কবিতাটি গিথিত হইয়াছে তাহাতে এগুলি বিনা আয়াসে কণ্ঠস্থ হইয়া পড়িবে। এ সব কথা কণ্ঠস্থ থাকাই উচিত। কণ্ঠস্থ হইলে এই সকল কথা হৃদয় হইয়া যাইবে। হৃদয় সংস্কৃত হয়। সেই রূপ হইলেই কাকালগীতার সুন্দর কাজ হইবে।”

কৈলাস বাবু শেষ জীবনে ধর্মচর্চায়ই অধিক সময় অতিবাহিত করিতেন। কিন্তু তথাপি মাতৃভাষার সেবার একেবারে বিরত ছিলেন না। তিনি রুগ্ন শয্যায় শায়িত থাকিয়াও লেখনী সঞ্চালন করিতেন। সময় সময় ঢাকা রিভিউ, সাহিত্য, সৌরভ প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় কিছু কিছু পুরাতত্ত্বমূলক প্রবন্ধ লিখিতেন। যখন দারুণ রোগে ক্রিষ্ট হইয়া পড়িলেন, অপরের সাহায্য ব্যতীত শয্যা হইতে উঠিতে অসমর্থ হইলেন, তখনও তিনি গ্রন্থালোচনায় ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার বন্ধুগণ এ সময় তাঁহাকে গ্রন্থপাঠ হইতে নিবারণ করিতেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই তাঁহার চির অভ্যস্ত গ্রন্থপাঠে বিরত হইতে পারিতেন না। তিনি যখন যে পুস্তক দোখতে পাইতেন তখনই তাহা পড়িবার জন্ত লালায়িত হইয়া পড়িতেন। তাহার শয্যাপ্রার্থে শুপাকারে গ্রন্থরাশি, মাসিক পত্রিকা ও সাপ্তাহিক পত্র সমূহ সর্বদাই রক্ষিত থাকিত। পুস্তক পাঠের সময় তিনি যেন সমস্ত রোগ-যাতনা বিস্মৃত হইয়া যাইতেন। কৈলাস বাবু আজীবন একরূপে দিবসের অধিকাংশ সময়ই বিজ্ঞাচর্চায় অতিবাহিত করিতেন। তিনি কোন রজনীতেই পার্ধ্যমানে লেখনী ধারণ কিংবা

ফাল্গুন ১৩২১

পুস্তক অধ্যয়ন করিতেন না। বাঙ্গলা সাধকগণের জীবন-চরিত সঙ্কলনের জন্ত তাঁহার তীব্র বাসনা জন্মিয়াছিল। ইহার ফলে তিনি সৌরভ পত্রিকায় সাধক ৮ ভূবনচন্দ্র রায় ও কালীঘাট মহানির্দোষ মঠ হইতে প্রচারিত ত্রীশ্রীনিত্যার্থ পত্রিকায় সাধক ত্রীযুক্ত রামলাল দত্ত মহাশয়ের জীবনী লিখেন। \* বাত্‌ভাষার পাদপাশে রামলাল বাবুর জীবনীই কৈলাস চন্দ্রের শেষ আর্থ্য। বিগত আশ্বিন মাসে উহা মুদ্রিত হয়। কৈলাস চন্দ্র সংস্কৃত স্তোত্রের মত বাঙ্গলা কবিতায় কতকগুলি স্তব লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি এইসকল স্তব “ত্রীশ্রীনিত্যার্থ” পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়া ছিলেন। দুঃখের বিষয় তিনি উহার মুদ্রাঙ্কন দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। কৈলাস বাবু সাধক সঙ্গীত তৃতীয় ভাগ সংগ্রহ করিয়া বঙ্গবর ত্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ সেন বি, এল মহাশয়ের নিকট রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি অর্থাভাব প্রযুক্তই তাহা মুদ্রিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। আমরা আশা করি কৈলাস বাবুর পুত্রস্বয় ত্রীযুক্ত জ্যোতীশচন্দ্র সিংহ ও ত্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ “সাধক সঙ্গীত তৃতীয় ভাগ” মুদ্রিত করিয়া বঙ্গবাসীর প্রীতিভাজন হইবেন।

কৈলাস বাবুর আর্থিক অবস্থা কোন দিনই বড় ঝড়ল ছিল না। তথাপি তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর কতিপয় মাস পূর্বে, তিনি তাঁহার লাইব্রেরীর প্রায় অধিকাংশ মূল্যবান ইংরেজী গ্রন্থ কলিকাতা সাহিত্য পারিষদে স্বতঃপ্রস্তুত হইয়া দান করিয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্যসেবক উপযুক্ত স্থানেই তাঁহার উপযুক্ত গ্রন্থরাজি দান করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম।

\* বঙ্গবাসীর সুপরিচিত, “বারে বারে ষত দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা। সকলই সে দয়া তব কেনেছি মা দুঃখহরা”, সঙ্গীত রামলালবাবুর বিরচিত।

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, কৈলাসবাবু চিরদিনই নির্ভীক ও স্বাধীনতাব্রি ছিলেন। তিনি আর্থিক বশতঃ সময় সময় অপবের চাকুরী গ্রহণ করিতেন বটে কিন্তু ইহা তাঁহার নিকট অসহ্য বোধ হইত। সে জন্ত তাঁহাকে বহুবার পদত্যাগ করিতে হইয়াছে। কিরূপে পরের অধীনে চাকুরী না করিয়া সঙ্গের বাত্‌য়া নির্দোহ করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে কৈলাস বাবু বত্রিশ বৎসর পূর্বে “স্বাধীন-জীবিকা” শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রদান করেন। বক্তব্যঃ তিনি অপরের চাকুরী করা গৌরবের বিষয় মনে করিতেন না। কৈলাস বাবু জননী জন্মভূমির প্রতি যে কিরূপ অহুরক্ত ছিলেন তাহা তাঁহার যে কোন প্রবন্ধ পাঠেই প্রতীয়মান হয়।

এখন আমরা কৈলাসচন্দ্রের শেষ ঘটনা বিবৃত করিয়া পাঠকগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিব। বিগত ১৩২১ বঙ্গাব্দের ২৪ পৌষ শুক্রবার রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় কৈলাসচন্দ্র নির্ভীক ও প্রশান্ত চিত্তে ইহাধা পরিত্যাগ করেন। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বেই তাঁহার অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। বঙ্গগণ তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করেন। মৃত্যুর অর্ধঘণ্টা পূর্বে তিনি বলিতে থাকেন, “তোমরা দেখিতে পাইতেছ না আমার গুরুদেব—আমার মা ৮শ্রামা যে আমার নিকট দাঁড়াইয়া আছেন।” তাঁহার পরিবারবর্গ তখনই তাঁহার আসন্ন কাল উপস্থিত বিবেচনা করিলেন। কতক্ষণ পর তিনি সুস্থ মনে ও সদাঙ্গা মা মা বলিতে বলিতে অমরধামে ত্রীশ্রী ৮ শ্রামার কোলে চলিয়া গেলেন। কয়েক বৎসর অতীত হইল তাঁহার গুরুদেব “দেহরক্ষা” করিয়া স্বর্গলোকে অবস্থান করিতেছেন। পূজাপাদ ৮ মহাপুরুষ কৈলাসচন্দ্রকে একদিন বলিয়া-ছিলেন, যে “শেষকালে আমার দেখা পাইবে। ঘটনা ও তাহাই ঘটিল। কৈলাসচন্দ্র অন্তিম সময় তাঁহার পরম দয়াল ভগবান ত্রীশ্রী ৮ গুরুদেবের দর্শনলাভ

করিলেন। হিন্দু পক্ষে—ভক্তের পক্ষে—ততোধিক  
আর কি আনন্দ হইতে পারে? কৈলাসচন্দ্র যেমনই  
বহাগুরুবের কপার লজ্জা আকুল হইরাছিলেন, তেমনই  
অন্তিম কালে তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে হাতে লইয়া  
ত্রিদিব-দ্বারে লইয়া গেলেন।

আমরা কৈলাসচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী শেষ করিলাম।  
কৈলাস বাবুর জীবনী আলোচনা প্রয়োজনীয় না  
আছে। তিনি উচ্চ বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত না  
হইয়াও আত্মজীবন বিদ্যাচর্চায় তৎপর থাকিয়া এবং  
মাতৃভাষার সেবা করিয়া যে, দেশের কল্যাণসাধনে  
প্রসিক্ত হইরাছেন, ইহা আমাদের জানিবার বিষয়  
বটে। তাঁহার জীবনচরিত আলোচনার অনেক সুবন্ধ  
হয় ত কল্পক্ষেত্রে আশায় উৎফুল্ল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে  
পারিবেন।

কৈলাসচন্দ্রের মৃত্যুতে মাতৃভাষা যে একটি সুসন্ধান  
হরাইলেন তাহার স্থান কতদিনে পূর্ণ হইবে কে বলিতে  
পারে? ভক্ত কৈলাসচন্দ্রের প্রশান্ত মূর্তি মর্ত্যধাম  
হইতে অব্যুত হইরাছে সত্য, কিন্তু তাঁহার পারমার্থিক  
সত্তা ভ্রাতৃগণের হৃদয়পটে বেদীপ্যমান রহিয়াছে। \*

শ্রীমণীন্দ্রকিশোর সেন।

\* ইতঃপূর্বে কৈলাসবাবুর এক সংক্ষিপ্ত জীবনী  
সৌরভ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদার নাথ মজুমদার মহাশয়ের  
নিকট প্রেরিত হইয়াছে। স্থানীয় কয়েকজন সাহিত্যিক  
বহোদয়ের অনুরোধে, উপস্থিত প্রবন্ধে কৈলাসবাবুর  
জীবনী কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইল। পূর্বে  
প্রবন্ধে যে সকল ভ্রম-প্রমাদ ছিল তাহা এখন সংশোধিত  
হইল।—লেখক

## খঞ্জন

বার চলন সুন্দর—ক্রান্ত এবং নৃত্যশীল—আমরা  
তাঁহাকে খঞ্জনের চলনের সহিত উপমা দিয়া থাকি।  
খঞ্জন নৃত্যের জন্যই বিশেষ ভাবে আমাদের নিকট পরি-  
চিত। খঞ্জন সংস্কৃত শব্দে খঞ্জরাট নামেও কথিত।

খঞ্জন জাতীয় নানা শ্রেণীর পাখী দেখিতে পাওয়া  
যায়; কিন্তু সকলই আমাদের দেশে খঞ্জন নামে পরিচিত  
নহে।

খঞ্জন একহারা ছিপছিপে লম্বা চেহারা বিশিষ্ট।  
ইহার ৭—৯ ইঞ্চির বেশী লম্বা হয় না। খঞ্জন বড়ই  
চঞ্চল পাখী। ইহার ৭—৮ ইঞ্চি পদক্ষেপে চলিয়া যায়  
যে তখন তাহারের পা দুইটা যেন লম্বাই হয় না।  
ইহাদের পা অত্যন্ত সরু, ককাত, এবং প্রায় ৩ ইঞ্চি লম্বা;  
প্রতি পায়ে চারিটা আঙ্গুল। নখ ক্ষুদ্র ও তীক্ষ্ণ। পায়ের  
তলা কোমল এবং ঈষৎ চেন্দা। এজন্য ইহার সামান্য  
কাদার উপরেও অনায়াসে দাঁড়াইতে সমর্থ হয়। খঞ্জনের  
সর্বাঙ্গ সাদা। খুব ধবধবে সাদা নয়। ডানা দুটা  
বৃষব। তাহার মধ্যে মধ্যে ঈষৎ কালো রেখা টানা  
আছে। মস্তকের পশ্চাদিক ঘনকৃষ্ণ। ঠোঁটের নিম্নভাগ  
সাদা। গলায় ঘনকৃষ্ণ পালকরাঙ্গি এমন সুন্দর ভাবে  
সাজানো যে তাহা দেখিয়া আমাদের দেশে একটা প্রবা-  
দেরই সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

প্রবাদটা এই—খঞ্জন এক সময় ব্রাহ্মণের ছেলে  
ছিল। সে মার নিকট খাবার চাহিয়া কাদিত,  
মা রোজই বলিতেন, “ঠাকুরের খাওয়া না হইলে কি  
খাইতে আছে?” বালক মার কথায় বড় কষ্টে ক্ষুধা  
দমন করিত; অবশেষে একদিন ক্ষুধার তাড়নায়  
সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া সকল পোলযোগের আধার  
‘শালগ্রাম’ ঠাকুরটিকেই গিলিয়া ফেলিল। ঠাকুরও  
বালকের গলায় গিয়া আটকাইয়া রহিলেন। এমন সময়  
তাঁহার মা আসিয়া সমুদয় বিষয় জাঃ হইয়া বালককে

কাভন ১৯৭১

কৃত পাণের জন্ত বাধী হইতে অভিপাণ প্রদান করিলেন।  
বালক তৎক্ষণাৎ পাখী হইয়া আকাশে উড়িয়া গেল—  
শালগ্রাম তাহার গলার আটকাইয়াই রহিলেন। বিব-  
পানে নীলকণ্ঠ মহাদেবের মত ঠাকুর ভঞ্জে খঞ্জনও  
কককণ্ঠ হইয়া রহিল। শালগ্রাম গলার থাকায়  
খঞ্জনের সৌন্দর্য্য অনেক বাড়িয়াছে।

খঞ্জনের ঠোট প্রায় ২ ইঞ্চি লম্বা, সরু, এবং তীক্ষ্ণাগ্র।  
ভানা হালকা ও মজবুত। সন্ধ্যারে পাখার ঝাপটা  
ঝারিয়া পাখা শুটাইয়া ইহার উড়িয়া যায়। খঞ্জন খুব  
জ্রুত উড়িতে পারে। ইহাদের পুচ্ছ লম্বা এবং অত্যন্ত  
সুন্দর। চলিবার সময় নৃত্যশীল খঞ্জনের মাথা হইতে  
পুচ্ছ পর্য্যন্ত সর্ব্বালয়ই স্থলিতে থাকে। খঞ্জনের চক্ষু দুটি  
অতি ক্ষুদ্র, উজ্জল কাল, অতিশয় মনোরম এবং সর্ব্বদা  
অতিমাত্রায় চঞ্চল। চক্ষুর চারিদিকে পাতলা কাল  
রঙের একটা সরু বেটনীর। বেটনীর নীচে মেটে রঙের  
একখানি খুব পাতলা পরদা। ‘খঞ্জন-নয়না’ রমণীগণ  
সুন্দরীগণের অগ্রগণ্য বলিয়া অগুণ্ডত: কবি-প্রসিদ্ধি আছে।

খঞ্জন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ খাইয়া জীবন ধারণ  
করে। জলাশয়ের সিকতাময় ভূমির ধারেই অনেক  
সময় খঞ্জন বিচরণ করিয়া থাকে এবং আহারের সন্ধান  
লয়। খঞ্জন অত্যন্ত ভীষণভাবে উদ্ভীষমান ক্ষুদ্র পতঙ্গ  
ধরিয়া ভক্ষণ করে। শিকার ধরিবার সময় ইহার প্রায়ই  
লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় না। এবং যথেষ্ট তৎপরতার সহিত শূন্যে  
ধাকিয়াই একটা পতঙ্গকে গলাধঃকরণ করিয়া পর  
বৃহত্তেই গতি পরিবর্তন করত: অপর পতঙ্গের উপর  
পতিত হয়। মাঠে, ভলের ধারে, উঠানের পার্শ্বে বা  
গোবর-পাদার কিনারায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোক ধরিবার জন্য  
খঞ্জন জ্রুত পদসঞ্চালনে বোঁড়াদোড়ি করিয়া থাকে।

খঞ্জন সাধারণত: নিরবধেরই অধিবাসী। আমরা  
ঝার বাস খঞ্জন দেখিতে পাই না। শারদীয়া পূজা উপ-  
লক্ষে নাকি ইহার আামাদের দেশে প্রভাগমন করে।  
বিজয়া দশমীদিনে খঞ্জন দর্শনের বিজয়কল আছে,এরূপ

প্রবাদ বঙ্গপন্নীতে এখনও বর্তমান রহিয়াছে। বিভিন্ন  
দিকে খঞ্জন দর্শন করিলে বিভিন্ন ফল লাভ হয়। বঙ্গ-  
পন্নীর বৃদ্ধা মহিলাগণও এই অত্যাশঙ্কক জ্যোতিষ শাস্ত্রটি  
অবগত আছেন। তবে শিক্ষিত সমাজ অন্যান্য  
কুসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে একটা পাখীর অতবড় কর্তৃত্বও  
মানিয়া পইতে অস্বীকার করিয়াছেন। এই জন্যই  
পঞ্জিকাভারগণও জ্যোতিষের এই অনাবশ্যক (?) শ্লোকটি  
গ্রহণ করেন নাই। আমরা আবশ্যক বোধে এ স্থলে  
তাহার উল্লেখ করিব।—

বিতংক্রান্ত কার্য্যসিদ্ধিরতুলা শক্রে হতাশেভয়ং  
যাম্যামগ্নিভয়ং সুরদ্বিমিকলিলাভঃসমুদ্রালয়ে।  
বায়ব্যাং বরবজ্রগন্ধ সলিলং দিব্যাকনাচোত্তরে—  
ঐশান্যাং মরণংক্রবং নিগদিতং দিগ্লক্ষণংখঞ্জনে।  
অর্থাৎ—উর্দ্ধদিকে খঞ্জন দেখিলে বিত্তলাভ, পূর্বাধিকে  
কার্য্যসিদ্ধি, অগ্নিকোণে ভয়, দক্ষিণ দিকে অগ্নিভয়,  
নৈঋতে কলহ, পশ্চিমে লাভ, বায়ু কোণে উত্তম বজ্র গন্ধ  
ইত্যাদি লাভ, উত্তরে উত্তম পন্নী লাভ এবং ঈশান  
কোণে মৃত্যু হয়।

কেহ কেহ বিজয়া দশমী হইতে লক্ষী পূর্ণিমা, কেহ  
বা দশদিন পর্য্যন্ত উক্ত বিধান মানিয়া থাকেন।

খঞ্জন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপের মধ্যে—অত্যন্ত নিরালায়  
খড় কুটা ঘরা বাসা তৈয়ার করে। কখন কখন নিবিড়  
ঝোপ মধ্যে কোনও গাছের শিকড়ের বেটনীর মধ্যে  
গুহা শেওলা, পালক, ক্ষুদ্র ভূগুণও দিয়া বাসা নির্মাণ  
করিয়া লয় এবং তাহাতে ৩৪টি ডিম্ব প্রসব করে। কেহ  
কেহ বলেন খঞ্জন বৎসরে ৩৪ বার ডিম্ব প্রসব করিয়া  
থাকে, কিন্তু আমি বিশেষ অঙ্গসন্ধানও তেমন প্রমাণ  
পাই নাই। খঞ্জন কাস্তিক অগ্রহারণ বাসে একবার এবং  
বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে একবার ডিম্ব প্রসব করে। ডিম-  
গুলি ছোট কুলের মত। খঞ্জন কয়েক দিন পর্য্যন্ত  
ডিম্বের উপর কোমল পালক বা তুলা, হতা বা তেমন  
কোনও পদার্থ ঢাকা দিয়া তাহার উপরে বসে পড়িয়া



ডিম্বে তা দেয়। সাপ, বেজী, কাক প্রভৃতি ইহার বাসার লক্ষ্যন পাইলে শাবকগুলি আর ভগতে বাহির হইবার অবসর পায় না।

প্রবাদ, বর্ষাগমে খঞ্জন পালকপরিবর্তন করে।

খঞ্জন বিহিন্মুরে অল্পজ্ঞ রাগিণীতে গান গায়। উষা সন্ধ্যাগমে উঠানেও খঞ্জনের আগমন হয়, এবং উঠানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকাকণ্ডলি ধরিয়া আহার করে এবং মিষ্টমুরে গান করিয়া থাকে। তখনও গৃহস্থের নিজামত-বিজড়িত নয়নে উষা-সন্ধ্যা-সন্দর্শের সৌভাগ্য খটিয়া উঠে না। তখন উঠানের কোণায় দাঁড়াইয়া খঞ্জনী বাজাইয়া মাসকীর্তনের \* বাবাজী গান গায়—

“উঠ উঠ—

রাধেজী গো খঞ্জনে আনিয়া বেড়াই”

ঐপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

## কুলের মাগনের ছড়া

যখন শস্ত-শ্রামলা বঙ্গপন্নীর প্রান্তরে প্রান্তরে সরলপ্রাণ রাখাল বালকগণ কুবকের প্রধান সখল গোসকল নিয়া, সরল ভাবায় রচিত গ্রাম্য গান সকল গাহিয়া বেড়াইত, বেই সময় গোসকল হিন্দুর অত্যন্ত মনোবলিয়া পূজিত হইত ; হিন্দুগণ গোছুরে জল না দিয়া, গোকে খাও না দিয়া, জলগ্রহণ করিত না ; সেই সময় গোর মজলের জন্ত নানাবিধ পুভার বিধান ছিল। তাহার এক প্রকার পুভার জন্ত গৌরমাসের প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে রাখাল বালকগণ দলে দলে বাহির হইয়া একপ্রকারের “ছড়া” গান করিয়া বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করিত। সেই ভিক্ষালব্ধ চাউল ও পরশা দ্বারা

পৌষ সংক্রান্তির দিন, মাঠে গোসকলের মজলের জন্ত পূজা দিত। পূজান্তে সেই পুভার প্রসাদ পরম আচ্ছাদ সহকারে সকলে গ্রহণ করিত। আজও বঙ্গের অনেক পল্লীতে সেই সকল প্রাচীন রীতি-নীতির খানিকটা বিদ্যমান আছে। এইগুলি আমাদের সামাজিক ইতিহাসে স্থান পাইবার উপযুক্ত। আবহমানকাল যাবৎ নিরন্তর কুবকগণ সেই প্রাচীন রীতি-নীতির বাস্তব্য-টুকু রক্ষা করিয়া আসিতেছে ; চুঃখের বিষয়, আমরা তাহা দেখিয়াও দেখিতেছি না। কয়জন শিক্ষিত লোক এই নিরন্তর কুবককুলের এই উৎসবে যোগদান করিয়া তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন ? এই আড়ম্বরহীন গ্রাম্য পূজাও যে আমাদের প্রাচীন সমাজের একটি নিখুঁত চিত্র। বাড়ুক সে কথা। এই ক্ষুদ্র লেখক প্রাচীন গান সংগ্ৰহ করিতে বাইরা ইহার দুই চারিটি ছড়া সংগ্ৰহ করিয়াছে। কোন্ সময়ে কে ইহাদের রচনা করিয়াছে তাহা স্থির করা কঠিন। তবে ভাষা দৃষ্টে ইহা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। এই দেশে এইগুলিকে “কুলের মাগন” বলিয়া থাকে। ঢাকা জিলার উত্তর পশ্চিম অংশে ইহার বহুল প্রচলিত। গোসকলকে বাঘের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্ত এই পূজা বা সিন্নি দেওয়া হইয়া থাকে। হিন্দু ও মুসলমান দুই সমাজেই ইহার প্রচলন আছে। হিন্দুগণ বাঘের মুক্তি

বিরা—২৪ গণ্ডা ; কোন স্থানে ৩২ গণ্ডা।

গুরা—সুপারি।

না—নিবেদ্যার্ক নহে। ৮ বর্গীয় কবি দিল্লেরজলাল রায় মহাশয় “ভুইত না মাগো তাহের দেশ” এরোপ করিয়াছেন।

নি—কি।

গোট—সকল।

বাধান—গোচারণ ছুঁমি।

পুদির ভাই—পালি—দেশজ ভাষা।

\* “মাসকীর্তন” সম্বন্ধে বারাসতের আলোচনার আকাক্ষা রহিল—লেখক।



কাহিনী ১০২১

প্রভুত করিয়া পূজা দিয়া থাকেন। মুসলমানগণ বাঘের উদ্দেশে পূজা দিয়া থাকেন। কুবক শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যেই এই প্রকার আধিক্য দেখা যায়।

( ১ )

বড় বাড়ীর বড় ঘর ঘন বাঁশের কুয়া।  
বাইর কইরা দে বিরা পান বাটা ভরা গুয়া।  
বাটা ভরা গুয়া না রে পাঁচ পীরে খায়।  
পাঁচ পীরে বাইরা না রে গোয়ালবাড়ী যায়।  
গোয়াল-কি, গোয়াল-কি, দৈ নি আছে ঘরে।  
গোট গরু খাখানে গেছে, দৈ নাই আমার ঘরে।  
খাক খাক গোয়ালের কি তোর নি লাগাল পাই।  
এমন কইরা দিবে গাইল ঠাকুর কানাই।  
ঘারে মরব গোয়াল রে খাখানে মরব গাট।  
অম্বানু পাখারে মরব রাখাল পুঞ্জির ভাই।

এই ছড়াটিতে আমরা “কুলের মাগনের” বিষয়ের কতকটা আভাস পাইয়াছি। ছড়াটিতে মুসলমানের পাঁচ পীর এক বড় বাড়ীতে বাইরা পান খাইয়া কোনও গোয়াল বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দধি চাহিয়াছেন। গোয়ালিনী দধি না দেওয়ার পাঁচ পীর অসন্তুষ্ট হইয়া ঠাকুর কানাইর সহযোগিতায় গোয়ালিনীকে অভিশাপ দিয়া গিয়াছেন। ইহা স্বারা গরুবাছুরের ও নিজেদের অনিষ্ট হইবে বলা হইয়াছে। ইহাতে অনুমিত হয় যে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই গরু-বাছুরের হিতার্থ ভিক্ষা করিয়া পূজা করিত। ভিক্ষা করাটা বোধ করি পূজার একটা অঙ্গ। সেই জন্যই আজ পর্যন্তও ভিক্ষা করার প্রথা বর্তমান রহিয়াছে।

( ২ )

আইলাম রে অরণে, লক্ষীবিবির চরণে।  
লক্ষী বিবি দিল বর, চাইল কড়ি বাইর কর।  
চাইল দিয়া না দেয় কড়ি, বার মাস তার লড়িপড়ি।  
লড়িপড়ি ভায় রে, সোনা বাক্সা খায় রে।  
সোনার হালুকা বাঁশ, আগ ছয়রে মুইলাম হাঁস।

হাঁস ফালাইয়া দিলাম লড়, পায়রা পাইলাম বজ্রিশ জোড়।  
পায়রার নাম ডাকুয়া, বাঘমারার খায় গুয়া।  
গুয়া খায় আর কড়মড়ায়, ছুই দাঁত তার ফরফরায়।  
ছুই দাঁত না রে ছুই মূলা, ধান বাইর কর চাইর কুলা।  
ধান নয় রে টাকা-কড়ি, পাইলে সে নড়ি।  
এক টাকা পাব রে, বাইণা বাড়ী বাব রে।  
বাইণা বাড়ী গুঘুরের বাসা, লবণ বিকায় পরসা পরসা।  
হিয় রে, হিয় রে, চারিটা পরসা দিয় রে।\*

এই ছড়াটিতে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু দেখিতে পাইলাম না। যাহারা ভিক্ষা করে তাহাদের ভিক্ষা প্রাপ্তির পক্ষে দুই চারিটা কথা আছে। এইটা বোধ করি শুধু এই জন্তই রচিত হইয়াছে।

( ৩ )

হটু রে বাঁশ পাতা, মিঞা সায়বের সাত বেটা।  
সাত বেটা না সদাগর, সোনার টুপি মাধার ধর।  
ভিক দেও পলানের বেটি, চইলা যাই আরেক বাড়ী।  
আরেক বাড়ী মথুরার কুল, হাইটা বাই সমুদ্র।  
হাতে বইটা খাটে নাও, সমুদ্র পার হৈয়া বাও।  
সমুদ্রে বিকিল কাঁটা, এই বাড়ীর বুড়ির গলায়  
সোনার পাটা।†  
হিয় রে, হিয় রে, চারিটা পরসা দিয় রে।

\* অরণে—অরণ্যে।

বাইর—বাহির।

লড়িপড়ি—বিপদ।

হালুকা—নরম।

লড়—লোড়।

জোড়—দুটোতে একজোড়।

কড়মড়ায়—কটমট শব্দ করে।

ফরফরায়—আড়ম্বর দেখান।

† হটুয়ে—অর্ধশত। ভিক—ভিক্ষা। পলান—মুসলমানদের উপাধি, হিন্দুদের মধ্যেও আছে; পাটা—অলঙ্কার বিশেষ।

এইটো ভিকার সহায়তা করিতেছে। গৃহস্থকে একটু  
বড় বানাইয়া ভিকারনায়েই বর্ণনা করিয়া থাকে।

( ৪ )

আইল রে সোনার ঠাকুর আইল আর একবার।  
হস্তী বোড়া লইয়া দরিয়া হৈল পার।  
গার হইয়া দরিয়া অরণে করল থানা।  
নল খাগড় ভাজিয়া সাকাইল পাটের বেনা  
পাটের বেনা পাটের বেনা পাটের কি বা দোষ।  
কুচ-বরণ কত্যা, চাঁদ-বরণ মুখ।  
তাই দেখাইয়া সোনা রায় গাও হেলাইয়াছে।  
দেবপুরীর চারি কত্যা বাও দিতেছে।  
হাউলার দিব হাল লড়ি গোয়ালে রে দিব গাই।  
নিধনের ধন দিব তার ত সীমা নাই ॥ \*

এটা দ্বারা বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারা যায় না।  
তবে এই প্রকার অল্পমিত হয় যে, কোনও কবিতার চক  
রাখাল বালকদিগকে এই কবিতাটি রচনা করিয়া  
দিয়াছেন। কি উদ্দেশ্যে রচিত হইল তাহা কবিতা  
পাঠে বিশেষ কিছু বুঝা যায় না।

( ৫ )

ছিকা লড়ে ছিকা লড়ে বরবরাইয়া টাকা পড়ে।  
একটা টাকা পাইলাম রে বাইণা বাড়ী গেলাম রে।  
বাইণা বাড়ী ঘুরে বাসা হুন খার মালসা মালসা।  
সেই হুন কিনিয়া খায়।  
সবে বাঘের বয়ান গায়।  
বাঘায় গেল লাগালপুর,  
কিনা আনল চাম্পাকুল।  
চাম্পাকুল মত মান।

\* দরিয়া—সরু। অরণে—অরণ্যে। বেনা—কতক-  
গুলি পাট একত্র পাকাইয়া বেণীর মত করা হয়।  
কুচ—এক প্রকার লাল গোটা। বাও—বাডাস।  
হাউলা—কৃষক।

হাউলা গিন্নী কর দান  
দান না পরসা কড়ি।  
তাই পাইলে সে মোরা লড়ি।  
লড়িগড়ি শ্রামরে,  
সোনার বাক্সা খাম রে।  
সোনার হালুকা বাশ।  
তুই ছুরে তুইটা হাঁস  
হাঁস দেখেখা দিলাম লড়।  
পায়রা পাইলাম বজ্রিশ জোড়।  
পায়রার নাম ডাকসুরা।  
বাঘমারারা খায় গুরা।  
গুরা খাইতে কিনা গুণ  
পান্ডা ভাতে ছটাক হুন।  
ছটাক হুন না ছলবলা।  
তুই দাঁত তার খলখলা।  
তুই দাঁত না তুই মূলা  
ধান বাইর কর চাইর কুলা  
বে দিবে কুলার আগে  
তারে খাবে বনের বাঘে। †

পূর্বোক্তগুলির মত এটিও ভিকার লগ্নই রচিত  
হইয়াছে। তবে বাঘ মারার কথায় বুঝাইতেছে যে  
নিজেদের পালিত পশু বাঘের হাত হইতে রক্ষা করি-  
বার লগ্ন বাঘমারারা গুরা খায় উল্লেখ করা হইয়াছে।  
যে ব্যক্তি কুলার আগে (অর্থাৎ অন্ন) ভিক্ষা দিবে  
তাহাকে বাঘে খাবে। জীলোকগণ সরলগণ রাখাল  
বালকদের এইসকল তানলয়রূপ ছড়া গান শুনিয়া  
বাস্তবিকই ধানচাউল বেশী দিয়া থাকেন।

শ্রীমহিবচন নন্দী।

† মালসা—এক প্রকার মাটির বাসন বিশেষ। বয়ান  
—গীত, বাক্য।

## ভৌঁওরের শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরী দেবী

ভৌঁওরের ভুবনেশ্বরী দেবীর কথা বহুদিন পূর্বেই শুনিয়াছিলাম, মূর্তিখানি দেখিবার ইচ্ছা অনেক দিন হইতেই ছিল, এতদিন তাহা ঘটিল উঠে নাই। যে বরেন্দ্র ভূমির পল্লীতে পল্লীতে দেব-মন্দিরের ও দেবমূর্তির খসোসাশেষ আকণ্ঠ দেখা যায়, সেই বরেন্দ্র ভূমির ৩৪ স্থানে বিষ্ণুমূর্তিকে ও এক স্থানে বুদ্ধমূর্তিকে কালী বলিয়া পূজা করিতে আমি নিজে দেখিয়াছি। স্মরণ্য ভুবনেশ্বরীর কথা শুনিয়া সময় সময় মনে হইত যে, এ স্থানেও বোধ হয় শক্তি মূর্তির পরিবর্তে বিষ্ণু মূর্তিই দেখিতে পাইব।

গত ২৩শে জানুয়ারী তারিখে আমরা সন্ধ্যার সময় ভৌঁওরে পহঁছিলাম। রাত্রিতেই শ্রীমূর্তি দেখিবার জন্য আমাদের অতিশয় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা ঘটিল না। আশ্বমুদ্রিগের তাম্র অতি নিকটস্থ ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্দির, স্মরণ্য প্রাতে উঠিয়াই শ্রীমূর্তি দেখিব ইহাই স্থির করিয়া রাখিলাম।

পরদিন প্রাত্যবে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া মন্দিরের নিকট বাইরা দেখি, মন্দির-প্রাঙ্গণ অঙ্গুলে পরিপূর্ণ, মন্দিরের খিলান ভয় ও পতনোন্মুখ। বা যে কবে এই মন্দিরে সমাহিতা হইবেন তাহার স্থিরতা নাই। পূর্বেই শুনিয়াছিলাম, দেবী খুব আগ্রতা; স্মরণ্য অস্বাভাবিক অবস্থায় মন্দিরে প্রবেশ করিতে সাহস হইল না, এবং চেষ্টা করিয়াও বাহির হইতে মূর্তিখানি ভাল করিয়া দেখিতে পারিলাম না। স্থানীয় হিন্দুদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াও মূর্তি সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারি নাই। ইহারা শ্রীমূর্তির নিকট বাইতে ভয় পায়। কতকগুলি পরে জান করিয়া মূর্তি দর্শন করিতে গেলাম। মন্দির-দ্বার মন্দিরভগ্ন ইটকে ও অঙ্গুলি-পরিপূর্ণ ছিল। আমাদের লোকেরা এই সব পরিষ্কার

করিয়া দিলে ভিতরে বাইরা দেখি, শ্রীমূর্তির শ্রীমন্দের অধিকাংশ স্থানই একখানি কাপড়ে আবৃত রহিয়াছে। পূর্বে যারের প্রত্যহ পূজা হইত, এখন এই বরেন্দ্র ভূমিতে পূজক ব্রাহ্মণের অভাবে যারের পূজা বৎসরের মধ্যে একবার দেওয়াও কঠিন হইয়াছে। এই ভৌঁওরের অন্তিমিকট দেবগ্রাম, বামনপাড়া, লক্ষ্মিহার প্রভৃতি গ্রামে বহু ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। এখন এখানে ২৩ বর ব্যতীত আর ব্রাহ্মণ নাই। ব্রাহ্মণ-বাসের স্থিতি-চিহ্ন বন্ধে লইয়া এই সব গ্রাম শূন্য হইয়াছে। দেবগ্রাম বামনপাড়া কালের প্রভাবে এখন সাঁওতাল পাড়ায় পরিণত হইয়াছে। গত চৈত্র মাসে বান-ব্রতের সময় এই শ্রীমূর্তির পূজা হইয়াছিল। এখানকার পূজার প্রথা অনুসারে সেই সময় পূজক ব্রাহ্মণ এই কাপড়খানি দ্বারা শ্রীমূর্তির সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। আমি নিজে এই কাপড় সরাইবার অধিকারী নহি, সঙ্গে হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ ছিল, কি জানি কেন তাহাদিগকেও শ্রীমূর্তি স্পর্শ করিতে দিতে ইচ্ছা হইল না। সৌভাগ্য-ক্রমে একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের সংবাদ পাওয়া গেল। তিনি আমাদের কথা শুনিয়া জান করিয়া আসিয়া কাপড়খানি সরাইয়া মূর্তিখানি দেখার সুবিধা করিয়া দিলেন।

আমি নানাস্থানে পাষণময়ী বহু প্রাচীন শক্তি মূর্তি দেখিয়াছি, কিন্তু এমন প্রসন্নবদনা হস্তমুখী শাস্তিমূর্তি আর দেখিয়াছি এমন মনে হয় না। প্রথম দর্শনে যারের হাতে ত্রিশূল দেখিয়া আতঙ্ক উপস্থিত উপস্থিত হয়, পরক্ষণেই অন্তর্যার হস্তময়ী মুখ দেখিলে তৎক্ষণেই আতঙ্ক অজহিত হয়। এই কথা কেহ বিশ্বাস করিবেন কি না জানি না। আমি ভক্ত নহি, তথাপি শ্রীমূর্তির প্রথম দর্শনে আমার মনে এই ভাবেরই উদয় হইয়াছিল।

মূর্তিখানি উচ্চতায় প্রায় ২২ হাত, প্রস্থ প্রায় ১ হাত ৮

মূর্তির উপরের চালিখানি ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। এখানে প্রবাদ এই যে, দেবীর মস্তকে মাণিক্য ছিল। সেই মাণিক্যখানি খুলিয়া লইবার জন্য শ্রীমূর্তির এই চর্চনা হইয়াছে। ইহা কালাপাহাড় বা তৎপরবর্তী কোন ছোট কালাপাহাড়ের কার্য বলিয়া মনে হয়।

শ্রীমূর্তি চতুর্ভুজা ত্রিনেত্রা দণ্ডায়মান। বামদিকের নীচের হস্তে একটি মঙ্গল-ঘট, উপরের হস্তে করমালা। দক্ষিণ দিকের উপরের হস্তে ত্রিশূল, আর নীচের হস্তে মা আমার অভয় মুদ্রা দেখাইয়া জনগণকে অভয় দিতেছেন। মস্তকের কেশদার ঘোঁপার আকারে উপরি উপরি দুই থাকে বাঁধা। গলায় হাশা ও মালা। কর্ণে কড়ি, হাতে তার বলয় ইত্যাদি অলঙ্কার। নাভির উপরে পদক। পঃণে কাপড় পদ পর্যন্ত পড়িয়াছে। পরণও নুতন ধরণে। বক্ষ উন্মুক্ত, কাঁচুলি নাই, পায়ে নুপুর ও অশ্রু অলঙ্কার আছে। বামদিকে একটি উলঙ্গ নর বায়ের হস্তধৃত মঙ্গল-ঘটের নীচে এক হাত তুলিয়া দণ্ডায়মান। দক্ষিণ দিকে একটি প্রকাণ্ড শিবা, সন্নিকটে সাধক যুক্তকরে একনিষ্ঠ ভাবে অর্ঙ্গোপবেশনে ধ্যানে মগ্ন। সাধক সাধনার উপযুক্ত স্থানই নির্বাচন করিয়াছেন। মা এক হস্তে ত্রিশূল ধারণ করিয়া সাধকের বিভীষিকা দূর করিতেছেন, অপর হস্তে সাধককে অভয় দিতেছেন। একটি স্বতন্ত্র প্রস্তরের পদ্মাসনের উপরে মূর্তিখানি অবস্থিত রহিয়াছে। মন্দির মধ্যে ৩৪টী বড় বড় শিবলিঙ্গ রহিয়াছে, একখানিরও গৌরীপাট নাই।

কলিকাতার আর্টষ্টুডিও কর্তৃক প্রকাশিত দশমহা-বিজ্ঞার ছবিতে শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরী দেবীর যে মূর্তি দেখিয়াছি, সেই মূর্তির সহিত এই মূর্তির কোনই সাদৃশ্য নাই। অতিজঙ্গমের নিকট তুলিয়াছিলাম, দশমহাবিজ্ঞার ধ্যানের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আর্টষ্টুডিওর ছবি প্রস্তুত হইয়াছিল। যে ব্রাহ্মণগণ পুরুষাত্মকভাবে এই মূর্তির পূজক ছিলেন বলিয়া এখানে প্রকাশ, তাঁহাদিগের

বংশ এখন আর নির্বংশ। দুই একটি বালক ভিন্ন কেহ নাই। ইহার বারোজন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। সেই গ্রামে রাঢ়ী শ্রেণীর একজন ব্রাহ্মণ আছেন, ইনি একজন তান্ত্রিক বলিয়া এখানে খ্যাত। তিনি অনেক দিন এখানে পূজাও করিয়াছেন। তাঁহাকে আনাইয়া আমি এই মূর্তির ধ্যান ও পূজার মন্ত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, যে মন্ত্রে এবং যে ধ্যানে ইহার পূজা হয় এই মূর্তির সহিত সেই ধ্যানের বা মন্ত্রের কোনই সামঞ্জস্য নাই।

মন্দিরের বাহিরে কয়েকখানি ভগ্ন বিষ্ণুমূর্তির অংশ ও ৩৪ খানি বড় বড় কৃষ্ণপ্রস্তরের চৌকাট পড়িয়া রহিয়াছে। আর আছে একটি খেত প্রস্তরের প্রকাণ্ড উদ্ভল। প্রবাদ যে ইহাতে শিবের তাল ঘোটা হইত।

মন্দিরটীর বয়স একশত বৎসরের কম বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গেল। কিন্তু শ্রীমূর্তিখানি অতি প্রাচীন মূর্তি। মূর্তিখানি নিকটেই বোধ হয় কোন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই মন্দির ভগ্ন হইয়া গেলে বহুকাল পরে বর্তমান মন্দিরে মূর্তিখানি আনীত হইয়াছে। শ্রীমূর্তির পূজার ব্যয়নির্বাহকল্পে আমদার-প্রদত্ত বার্ষিক প্রায় ৫০/- আয়ের জায়গির জমি এখনও রহিয়াছে। এই মহালের তহশীলদার শ্রীযুক্ত জগৎচন্দ্র সিংহ রায়ের যত্নে এখনও বৎসরে একবার মায় পূজা হয়।

এই ভৌগর গ্রামখানি অতি বৃহৎ। থাক ব্যাপে দেখিয়াছি, ইহার পরিমাণ প্রায় ৪০০০/ বিঘা। বর্তমানে ইহা কুমারগঞ্জ থানার অধীনে। গ্রামের পূর্ব সীমানার আজেয়ী নদী প্রবাহিতা, দক্ষিণে নদীতুল্যা দিস নগরের খাড়ী। এই খাড়ীতে পূর্বে মোকা চলিত। গ্রামের মধ্য দিয়া পূর্ব পশ্চিমে আর একটি ছোট খাড়ী রহিয়াছে। গ্রামখানি পুরাকালে কতদূর সমৃদ্ধিশালী ছিল, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে লিখিয়া বুকান সম্ভবপর নহে। গ্রামের প্রতি পল্লী ইষ্টক ও স্তূপে পরিপূর্ণ, গ্রামের

কাল্পনিক ১০২১

পঞ্চাশি কোন কালে ইষ্টক দ্বারা বাধান ছিল। বরেন্দ্র ভূমির অনেক স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছি। পুষ্করিণীস্থল বহু গ্রাম দেখিয়াছি, কিন্তু শ্রেণীবদ্ধভাবে এত পুষ্করিণীর সমাবেশ কোনও গ্রামে দেখি নাই। গ্রামের প্রাচীনত্ব আরও প্রমাণ এই যে, এই পুষ্করিণীগুলির মধ্যে অনেকগুলি ভরাট হইয়া আবাদ হইতেছে। লাল মাটির দেশে, বিশেষতঃ যে স্থানে পলি পড়িবার সম্ভাবনা নাই সেই দেশে, একটি পুষ্করিণী ভরাট হইয়া জমি হইতে কত দীর্ঘ কালের আবশ্যক, সকলেই সহজে বুঝিতে পারেন।

গ্রামের মধ্যস্থল দিয়া পূর্বপশ্চিমে প্রায় ১০ হাত প্রস্থ ও প্রায় ৪ হাত উচ্চ একটি রাজপথ ছিল। অনেক স্থানে পথটা এখনও বর্তমান রহিয়াছে। আর রহিয়াছে পরিখাবেষ্টিত বহু ছোট ও বড় বাড়ীর চিহ্ন। পরিখাবেষ্টিত এত বাড়ী বোগীর ঘোপার নিকটবর্তী আমইর গ্রাম ভিন্ন আর কোথাও দেখি নাই। আত্রৈয়ী নদীর পূর্ব পারে ভোঁওর হইতে এক ক্রোশ মধ্যে মহিপুর নামে গ্রাম মহাপালের স্মৃতি বহন করিতেছে। যে নদীর এক পারে মহাপালের প্রতিষ্ঠিত মহিপুর, মহিমগর, মহিগড়োয়, সেই নদীর অপর পারে এই ভোঁওর। ভ্রামরি নামে কোন দেবী আছেন কি না জানি না। এই ভ্রামরি নাম হইতে এই ভোমর, বা ভোঁওর নামের উৎপত্তি হইয়াছে, অথবা ভূবনেশ্বরী নাম হইতেই ভোঁওর 'বা' ভোঁওর নামের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহার বিচার ঐতিহাসিকগণই করিবেন।

বর্তমানে গ্রামের অধিবাসীগণের মধ্যে মুসলমানই বেশী। ভৎব্যতীত কয়েক বর কর্মকার সাহিব ও বৈরাগী আছে। ইহার ৩৪ পুরুষের বাসিন্দা। এতব্যতীত বহু সীতাল এই স্থানে বসত করিতেছে।

একদিন যে স্থানের প্রতি পল্লীতে দেবালয় হইতে প্রত্যহ সন্ধ্যার পবিত্র শব্দবস্তীর ধ্বনি উথিত হইত, এখন সেই স্থানেই সেই সন্ধ্যার সীতালগণের নাদোলের ধ্বনি উথিত হয়। বিনি অন্ধকারের পর

আলো ও আলোর পর অন্ধকার আনেন, তাঁহার বিচারে না কি ইহা নূতন নয়। তাঁহার না কি ইহাই নিয়ম।

শ্রীদেবেন্দ্রগতি রায়।

## আসিবে \*

ঘোরে

ছাড়িলে কি দোষে কহ।

ভূমি যে আমার কালালের ধন;

পুঞ্জিবে তোমাতে কে আর এমন ?

সাধিবে তোমাতে আমার মতন

কে বা এত অহরহ ?

কাদিবে কে আর এত আঁখিধলে ?—

ডাকিবে এমন 'এসো' 'এসো' বলে ?

দহিবে এমন পলে পলে পলে

বিরহেতে হুঃসহ ?

ভেবে গো না পাই পরাণের সাধী !

বিকলে কেমনে মালা গাঁথি 'গাঁথি'

কাটিব দীর্ঘ এ জীবন রাত

সহি আজি এ বিরহ !

করি নাই দোষ মনে জানি ঠিক,

চেয়ে আছি আভো আঁখি অনিষিধ,—

আসিবে আবার উজলিয়া দিক

পাখী ত ভূমি নহ।

শ্রীদুর্গামোহন কুমারি।

এখানে দেখিয়া তোলে পড়িবেক মিন।  
 একে দেখে বোলনত আমার সতীন।  
 হের গো নাটুয়া ভোবারে আমি বলি।  
 বাটাভরি ধন দিব তুমি বার চলি।  
 প্রসাদ দিবাম আমি বসন ভূষণ।  
 এখা হইতে ভালি তুমি করহ গমন।  
 তোমাকে যে বলি তুমি বুখা পাটেবরী।  
 বিনে নাট গীতে দান লইতে না পারি।  
 শুনিয়া আইল এখা মিন বড় দাতা।  
 নাট গীতে.....কথা।  
 ইজের নাটোরা আমি ধনের নাই অস্ত।  
 কি করিব ধন আমি হই কীর্তিবস্ত।  
 বিনে দরশনে আমি ঈশ্বর মিনাই।  
 .....করি আমি ধরে চলি বাই।  
 ক্রোধ হইয়া মোললাএ দিলেক উত্তর।  
 থেকা মারিয়া করিব তোরে পুরির অন্তর।  
 মোললা বলিল যদি এতেক বচন।  
 জর জর করিয়া বলিল সর্বজন।  
 কেহ কেহ হাতে ধরে কেহ ঠেলা মারে।  
 ততক্ষণে মিল তারে পুরীর অন্তরে।  
 বতীনাথে বলে দারী তুমি মোর ভাই।  
 আনুকার নাট গীতে যত ধন পাই।  
 তাহার অর্ধেক ধন তোরে দিব আমি।  
 মীন দরশন করি যদি দেও তুমি।  
 বারি বলে আমি নাহি চাই তোমার ধন।  
 মোললার প্রসাদে নাহি দরিদ্র জীবন।  
 ছাড়হ প্রলাপ কথা তুমি বার চলি।  
 সইচ্চাএ না গেলে খাইবা নড় বাড়ি।  
 ক্রোধ হইয়া বতীনাথে বলিল বচন।  
 এবঠ অনক নাহি দেখি কদাচন।  
 গাহনা গাহিয়া নামা দেশেতে বেড়াই।  
 এমন অধাৰ্শিক দেশে করু নাই বাই।

মিনের সন্তাতে আইলাম নাট করিবার।  
 ঢেকা বারি কৈল মোরে পুরীর বাহির।  
 ক্রোধ হইয়া বতীনাথে মাল দিল সান।  
 শুন শুন মিননাথ হইয়া সাবধান।

## দীর্ঘছন্দ নাচাড়ি

দিলাম যুদ্ধে হাত : শুন গুরু মিননাথ :  
 অএ বাপু কর অবধান।  
 পড়িলা কদলির তোলে : রহিলা কামিনীর কোলে :  
 হাড়াইলা জ্ঞান আর ধ্যান।  
 বানলে কহেহ কথা : কেনে গুরু রৈলা এখা :  
 অএ বাপু চিননি আমারে।  
 তুমি গুরু বৈচাঙ্গ্যর : বরনের নাহিডর :  
 পারনি যে চেলা চিনিবার।  
 সিব' পুত্র হই আমি : গুরু মিননাথ তুমি :  
 আমি ফিরে তোমারে বুঝাই।  
 তিন দিন আউ আড়ে : বাইবা বধের কাছে :  
 অঁকারে ধরে আছ বসি।  
 রাজরাজেশ্বর তুমি : কড়ার ভিকারি আমি :  
 নবদণ্ড ছত্র ধরি মাথে।  
 রাজ্যস্থখ হবিলগ : আপনা করিলা নাশ :  
 ডুবিয়া রহিলা মিন নাথে।  
 না বুঝ দেশের বোল : নারীরসে হৈলা ভোল :  
 মিরবধি কর কেলি কলা।  
 তোমার নাহি বিচার : রাজ্য হৈল ছারখার :  
 বিব'রিয়া ধরেতে রহিলা।  
 তিনশুম মহাদেবা : তুমি কৈলা তাম সেবা :  
 সব সুগী পৃথিবীতে লই।  
 কদলির হৈলা রাজা : জিকুবনে বড় ভেলা :  
 নান বশ তোমার কিছু নাহি।  
 তোমার নাহা শুনি : আইলএ যে গাইল শুনি :  
 দরশন করিতে তোমারে।

তোমার সভাতে আসি : নাট করি দেখ বসি :  
 প্রসাদ পাইলে বাটম্বু ঘরে :  
 কীৰ্ত্তি করি সৰ্বদেখ : দেখহ আমার তেজ :  
 তোমার সভার সম নাই ।  
 হৈমের নাটোয়া ঘরে : অপমান পাইয়া ফিরে :  
 হইব কেনে তোমার বড়াই ।  
 বড় দাতা তুমি মিনে : আইসে গাইম গুনিনে :  
 কলঙ্ক করিয়া বাটম্বু ঘরে ।  
 বাহা রাজা মিন নাথ : আইল তোমার সভাত :  
 না পারিল নিত্য করিবার ।  
 এমত মাদলে কহে : ছন্দে বন্দে নাথে বাহে (১) :  
 সৰ্ব্বজনে হৈল আনন্দিত ।  
 পুরীমধ্যে বতজন : সব হৈল একমন :  
 সব আইল দেখিতে বরিত ।  
 গুনিয়া মাদলের ধ্বনি : মিন পুলকিত পুনি :  
 নাটোয়া আসিছে কোনজন ।  
 চিনিতে না পারি তারে : মাদলেত কিবা বোলে :  
 "শুনিবার বলে সৰ্ব্বজন ।  
 নিবেদন পুনি পুনি : মাদলেত কিবা গুনি :  
 নাটোয়ার চার দরশন ।  
 কহলা মোকলাএ কহে : শোন রাজা মহাশহে :  
 নাটোয়া আন এই তিন জন ।

### খপছন্দ

গুনিয়া মাদলের ধ্বনি ঈশ্বর বিনাই ।  
 আম আন নাটোয়ারে দেখিবারে চাই ।  
 কৈ গেলা কৈ গেলা মোর মোকলা ছারী ।  
 নাটোয়া কেবত তারে আম গিয়া ধরি ।  
 রাজার মনের কথা দ্বারিএ আনিয়া ।  
 রাজার সাক্ষাতে দ্বারি দিলেক আনিয়া ।

(১) বাগার ।

গোকর্নাথ গেল যদি মিন আছে যথা ।  
 রাজার সাক্ষাতে গিয়া নামাইল নাথ ।  
 গুরুয়ে দেখিয়া নাথে কৈল নমস্কার ।  
 আশুবাড়ি গুরু মিনে করএ হুকার ।  
 প্রণাম করিয়া নাথে তালে দিল হাত ।  
 রোমাকিত হৈয়া বৈসে রাজা মিন নাথ ।  
 টিম্ টিম্ করিয়া দক্ষিণে দিল সান ।  
 অস্ত্রেত সঙ্করিল যেন কহে কৈল পাম ।  
 বাম হাতে বস্তিনাথে মাদলে দিল ষাত ।  
 সৰ্ব্বপুত্রী মোহিত করিল গোকর্নাথ ।  
 নন্দ মহানন্দ দুই চেলার পুরে তাল ।  
 কহকে কহকে ভাল উঠে শব্দতাল ।  
 নাচে ভাল গোকর্নাথ আলগ উপর ।  
 মৃত্তিকাএ নাছোর পাণ্ড দেখিতে স্তম্ভর ।  
 নাচতি যে গোকর্নাথে মাদলের তালে ।  
 গুনিতে স্তম্ভর বোলে বাগরের রোলে ।  
 হাতের ঠমকে নাচে গায় নাহি লড়ে ।  
 আপনি ডুবায়েল তরা গুরু আপনারে ।  
 অবধান কর গুরু নোয়াইবাম নাথ ।  
 মুখের উত্তর নাহি মাদলে কহে কথা ।  
 গোকর্নাতে নাচতি ছুপরে রুহু রুহু ।  
 দেখিতে দেখিতে মিন পুলকিত তহু ।  
 মিনের সভাতে নাহি পুরুষের গতি ।  
 কদলি সহিতে আছে যেন নিশাপতি ।  
 মিন নাথে বলে মোর বত আছে সখি ।  
 এখন নাটোয়া আমি কহু নাহি দেখি ।  
 নাটোয়ার রূপ দেখে জগত মোহনি ।  
 মধুর বচনে মিনে পুছে পুনি পুনি ।  
 তুমি হেন স্তম্ভরী নাহিক ততোবন ।  
 নিরাস্তর নাটবিষ্ঠি কর কি কারণ ।  
 প্রথম বহেল তোমার মতন যৌবন ।  
 হেন বৈসে দ্বারী নাই কিনের কারণ ।

সকলের রস ভূমি নহে সতত্বর।  
 নাচিয়া গাইয়া খাঅ কিসের অস্তর।  
 নাচিয়া গাইয়া খাঅ কেমন পৌরুষ।  
 নাটোয়া হইয়া থাক ভূমি সত্যর বশ।  
 যাকপাটেশ্বরী হইতে তোমার উচিত।  
 নাটগীত এড় ভূমি বড়ই কুর্জিত।  
 মোর ঘরে থাক ভূমি হইয়া পাটেশ্বরী।  
 মোদলা কমলা সম তোমারে আদরি।  
 ইরূপ যৌবন তোমার না কর নিকল।  
 আমাকে ভজিয়া রূপ করহ সাফল।  
 আমি হেন রাজা নাই গুনের সাগর।  
 বোলশ কদলির মাঝে আমি সে নাগর।  
 বোলশত নারী লৈয়া আপনার গুণে।  
 তোমারে পালিব আমি আপনার মনে।  
 হাসিয়া বলিল তবে যতি যে গোকর্পী।  
 মাদলের সানে কহে গুরুরে বুঝাই।  
 কার্যসাধ কার্যসাধ (১) মাদলে সে বলে।  
 সর্কধন হাড়াইলা কামিনীর কোলে।  
 গুরু হইয়া না বুঝিলা আপনার বোল।  
 কার্যসাধ কৈলা গুরু সুখাংহিলা খোল।  
 অভয়ার ঘর ঘর অভয় ভাণ্ডার।  
 তাহাতে নাদিলা গুরু চৈতন্তভাণ্ডার।  
 অভয়ার ভাণ্ড নিল নির্ভয় ভরিয়া।  
 বুধাঘর খানি ভূমি আছয়ে জুড়িয়া। (২)

(১) কায়ের সিদ্ধতা সম্পাদন কর; শব্দটি মাদ-  
 লের ধ্বনির অঙ্ককরণ কিং গুঢ় অর্থ বুজ।

(২) এই চারিছত্রে কঠিন আব্যাখ্যম ভয়ের ইঙ্গিত  
 করা হইয়াছে। দেহ ভগবানের গৃহ এবং অভয়প্রদ  
 আনের ভাণ্ডার। অতীঃ যন্ত্রের সাধকগণ সেই ভাণ্ডার  
 ঐখণ্ডে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছেন। কিন্তু জ্ঞানধন সংগ্রহ  
 করার পরিবর্তে ভূমি সেই ভাণ্ডারকে কাম সেবা দ্বারা  
 একেবারে খালি করিয়া ফেলিতেছে এবং শূন্য ঘর ধ্বংস  
 লইয়া বসিয়া আছে।

নাচরে যে গোকর্নাথ বুজ করি ভর।  
 মাটিতে না লাগে পার দেখিতে স্তম্বর।  
 মাদলে কহেস্ত কথা শুন মিন রাএ।  
 মাটির মাদলে কেনে মোরে গুরু কহে।  
 নাট কর নাটোয়া ভূমি ভাল বাহ ছলে।  
 তোমার মাদলে কেনে গুরু গুরু বলে।  
 একশিয়া আছে মোর যতি যে গোকর্পী।  
 আর শিবা আছে মোর গাবুর সিদ্ধাই।  
 দুই শিবা আছে মোর আমি জানি ভাল।  
 ভূমি কেন গুরু হেন মোরে বল ছলে।  
 বুড়া দেখি ভূমি মোরে গুরু হেন বলি।  
 এমত বলিয়া মোরে যাইতে চাহ ছিলি।  
 বুড়া নহে দেখ মোরে তরুণা সে লাগে।  
 শতক তরুণা আমি নহে মোর আগে।  
 বুঝিবা বুড়ায় ভেসে ধরিমু বঁে বলে।  
 দুই কুচ মর্জিয়া তুলিয়া লৈমু কোলে।  
 মিনের পুরীতে আসি যাইতে চার ছলে।  
 না বুঝ আমার গুণ ধরিমু যে বলে।  
 কাচুলি ফারিয়া তোর খসাইমু কবরি।  
 আমার বাড়ীতে আসি যাইতে নারে কিরি  
 আঁচল ধরিয়া নিমু মিনাইর পুরী।  
 তবে সে জানিবা ভূমি বিছের গাবুরালি।  
 গোকর্পী বলিল তবে বুকে মারি যাত।  
 না বল না বল বাপু গুরু মিননাথ।  
 (মোর) স্বামী গোকর্নাথে মোরে কৈল বিহা।  
 বিহা করি নাথে মোরে গেলেন ছাড়িয়া।  
 বিহা করি এড় মোরে না করিল ঘর।  
 তাহার উদ্দেশে আমি ভ্রমি দেশান্তর।  
 শুনিয়াছি তান গুরু ভূমি মচ্যান্দর।  
 হেম বাক্য বল ভূমি কিসের অস্তর।  
 জিহ্বাতে কামড় মারি মাথা কৈল হেট।  
 না চিনিয়া পাপ কৈল বচন একট।



কহ কহ মায় মোর গোন্ধ কোন ঠাই।  
 কথাতে আছরে পুত্র দরশন নাই।  
 জন্মিনাথে বলে বাপু চিন বা না চিন।  
 যুই যদি ডাকম গোন্ধ আসিব অধন।  
 নাছএ বে গোন্ধনাথে মিনের দিকে চাই।  
 হাতে সান দিয়া বলে গুরুরে বুঝাই।  
 মাদলে কএত কথা শুন মিননাথ।  
 নানা ছলে বাএ নাথে মাদলে দিয়া হাত।  
 চিন যদি চিন নাথ না চিন বে নাহি।  
 হেন বিষয় হৈল জৈব মিনাই।  
 জানিলায় গুরুদেব নিজ মনে ভাসি।  
 সকল হারাইলা গুরু কদলিতে আসি।  
 তা তুমিয়া বুঝি করে কদলির সনে।  
 নির্ভকি না হএ এহি গোন্ধ লয় মনে।  
 মায় করি আসিয়াছে যতী বে গোন্ধাই।  
 ইহারে রাখিলে এতু লৈ আইব ছলাই।  
 যতেক কদলি কহে এক বে হইয়া।  
 নাটোয়া বিদায় কর প্রসাদ যে দিয়া।  
 কমলার বলে তৈন নাটোয়া সুন্দরী।  
 নাটভঙ্গ করি বাজ আপনার পুরী।  
 যতিনাথে বলে তুমি মূৰ্খ (১) পাটেবরী।  
 অধ্য (২) ভালে নাট ভঙ্গ করিতে না পারি।  
 নাচন্তি গোন্ধনাথে মাদলে দিয়া হাত।  
 শিষ্যপুত্র চিন বাপু রাজা মিন নাথ।  
 মিননাথে বলে যদি আমার গোন্ধাই।  
 সৈন্ধে (৩) ভর করি নাচ দেখিবারে চাই।  
 মিনের তুমিয়া হেন বরুণ বচন।  
 আলগ আসনে নাচ করে ততক্ষণ।  
 দেখিয়া বে মিননাথে চিনে বা না চিনে।  
 মোর গোন্ধ হৈলে জলে নাচহ অধমে।

(১) মুখ্য, প্রধান।

(২) অর্ক, এই পদটি হইতেই শেষে আধ, আধা আসিয়াছে।

(৩) শূভে। ঐ ঠিক শুভ এরমত করিয়া পুথিতে লেখা হইয়াছে। দশম একাদশ শতাব্দীর খোদিত লিপিতে দ্বিঘণ এর এই রূপই দেখা যায়। আর, একশত বৎসর পূর্বেও এই রূপই প্রচলিত ছিল। কাজেই দেখা বাইতেছে যে প্রায় ১০ শতাব্দী ব্যাপিয়া ঐ এর রূপের বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই।

জলেত রাখিয়া ধাল নাচ কর তুমি।  
 তবে এ সে গোন্ধ নহন (৪) জানিলাম আমি।  
 মিনের বচন শুনি গোন্ধে ততক্ষণ।  
 জলের উপরে নাচে যেমন খজন।  
 এবে সে জানিল পুত্র তুমি সে গোন্ধাই।  
 পড়েছি কামিনীর হাতে কেমনে ছাড়াই।  
 না কর না কর পুত্র আমার জর্জন।  
 পক্ষাতে সাধিষু কাঁয়। বেই লয় মন।  
 জন্মিনাথে বলে বাপু ভাবে দেয় মন।  
 তোমার দাড়কা (৫) কাটি করিয়া বস্তন।  
 মায়াবদ্ধ হৈয়া গুরু হারাইলা জান।  
 শরীর খাইলা এতু হারাইলা প্রাণ।  
 কড়ার তিখারী ছত্রধর হইয়া গেল।  
 যোলশত যুবতী লৈয়া হইলা পাগল।  
 মাগিয়া খাইব যুগী ঘরে ঘরে গিয়া।  
 আপনি করিলা নষ্ট আপনার কায়া।  
 আপনি ডুবিল। গুরু আপনা পাসরি।  
 তোমার সকল বস্ত নারী লয় হরি।  
 ডুবিল তোমার নোকা কাছি গেল ছিড়ি।  
 বালুচড়ে ঠেকে গুরু বাহ গজগড়ি। (৬)  
 হরের বচন তোমার মনে নাই ভাএ। (৭)  
 যতেক সম্পদ তোমার তুলি দিলা নায়ে।  
 যোলশ রমণী লৈয়া কর রস কেলি।  
 আপনার তত্তজ্ঞান মনে চাহ বলি।  
 প্রদীপ নিবিলে গুরু কি করিবে তেলে।  
 আইল বন্দিয়া কিবা ফল আগে জল গেলে। (৮)  
 মূল কাটা গেলে গুরু না জিয়রে গাছ।  
 বিনি জলে কথাতে শুনিছ জিয়ে বাছ।  
 শিকর কাটিলে গাছ ততক্ষণে মরে।  
 বিনি জলে নাহি জিয়ে জলের বাছ মরে।  
 চলিতে খেলিতে গুরু নাহিক শক্তি।  
 বার খান যুক্ত থুইয়া করিছ বসতি।

(৪) হও কিনা হও! তারী অদ্বুত প্রয়োগ।

(৫) গ্রহি? দড়ি শব্দ হইতে।

(৬) ভাড়াভাড়ি। দরবারি।

(৭) ঠিক ভাবে; ভাব হইতে আসিয়াছে।

(৮) এই দুই লাইন প্রায় অবিকল ভাবে তবানী দাসের ময়নাষতীর গানে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৩৫৭। স্বর পোড়া আলো দান।

৩৫৮। মূল দেবতার পূজা নাই  
সুবচনীর কুৎসৃতানী।

৩৫৯। ভাত নাই স্বরে,  
ছান্দুম ছান্দুম করে।  
ছান্দুম—ব্যজন।

৩৬০। জয় কালে ক্ষয় নাই,  
মরণকালে অব্যয় নাই।

৩৬১। শরীরের নাম মশর,  
বা সওয়ার তাই সর।

৩৬২। বরের পিসি কন্যার মাসী।

৩৬৩। কতগুণা আইল গেল,  
বাকী রইছে ধনা।

৩৬৪। কাপড়ের দাগ যায় ধুইলে,  
মনের দাগ যায় মইলে।

মইলে—মরিলে।

৩৬৫। ভানুরের নাম কে না জানে,  
কেবল লাঞ্জে কর না।

৩৬৬। মিথ্যাকথার হারি,  
ঘোরে বাড়ী বাড়ী।  
হারি—হাঁড়ি।

৩৬৭। পুছদে এক থালে খায় নব্বই জন,  
আনুছদে নয় থালে ও খায় না নয় জন।

৩৬৮। বুড়ার পো কান্দ কেন ?  
বইয়া বইয়া আর কার \* \* ,

৩৬৯। এক কান কাটা যায় গ্রামের বাইর দিয়া,  
দুই কান কাটা যায় সত্যার মাঝ দিয়া।

৩৭০। আগে গরু অব্যয় খায় না,  
মরণ কালে জিহ্বা মেলে।

৩৭১। খায় না,  
কেবল নাকের তলে গোজে।

৩৭২। আপনা পোলা, পতের ধন,  
কে দেখে কম।

৩৭৩। যে খাইছে তারে খাওয়া,  
যে না খাইছে তারে খোওয়া।

৩৭৪। যেম্নি বাপ, তেম্নি বেটা।

৩৭৫। গোবরে পদ্মকুল।

৩৭৬। পোলা কি ? যেন আটালে,  
বুড়া হইছে যেন বাতালে।

৩৭৭। তর মনা ত বাচব না রে,  
লেখতে পড়তে কইবি ভুই,  
বাড় মুচরাইয়া খাব মুই।

খেলাইব বেড়াইব দিব ফাল,  
বাইচ্যা থাকব চিরকাল।\*

মুই—আমি। বাইচ্যা—বাঁচিয়া।

ফাল—লক্ষ।

\*এক বাপের এক ছেলে—নাম ছিল তার মনোমোহন,  
ডাকিত তারে 'মনা'। মনার লেখাপড়ার সম্পূর্ণ শৈথিল্য।  
এ দিকে বাপমার তাড়না ও গুরুমহাশয়ের বেজাবাত  
মনার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। একটা মাঠ পার হইয়া  
মনাকে পাঠশালার বাইতে হইত। সেই মাঠের মধ্যে  
একটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ছিল; সকলেই উহাকে বলিত  
'ভুতুরে গাছ'। রাত্রিতে ভয়ে কেহই ও পথে বাইতে  
স্বীকার করিত না। এক দিন খাওয়া দাওয়া করিয়া  
মনা স্থলে বাইবার জন্য বাহির হইল, কিন্তু স্থলে না  
যাইয়া একটা রাত সেই বৃক্ষে উঠিয়া বসিয়া  
রহিল। সন্ধ্যা হইতে বাকী নাই, তবু মনা বাড়ী  
আসিল না দেখিয়া তাহার বাপ অধীর হইয়া উঠিল।  
মনার বাপ গুরুমহাশয়ের নিকট বাইয়া বখন শুনি,  
মনা আজ স্থলে আসে নাই, সে আরও অধীর  
হইল। তাই ভাবিতে ভাবিতে বখন ঐ গাছটার পাশ  
দিয়া চলিয়াছে তখন মনা হাঁড়ির ভিতর মুখ

৩৭৮। গাই বাছুরে ভাব থাকলে  
হৃদয়ের ভাবনা কি ?

৩৭৯। পড় ত পড়,  
নয় খাচা আলাইর কর।  
নয়—নতুবা।  
আলাইর—খালি।

৩৮০। মাস নষ্ট কইরা খই,  
হৃদ নষ্ট কইরা দই।

৩৮১। স্নতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

৩৮২। বড় নাম যার,  
\* ফাটে তার।

৩৮৩। ভাল না বাস।  
আমার মাধাই বাস।

৩৮৪। কইলে অন্নিক না কইলে বেলিক।

৩৮৫। লাই কুড়ার পাতে ভাত।  
লাই—প্রশ্রয়প্রাপ্ত।

৩৮৬। পেটে দুধা দুধে লাজ,  
সে কুটুম মাই কাজ।

৩৮৭। পাতের ভাতে পালে কুকুর,  
কুকুর উঠে কান্ধের উপর।

৩৮৮। আর শাল \* বয়।

৩৮৯। বিবকোট, ভূমি কেন ছোট ?  
আমার মুখখান এটু খোট।  
এটু—একটু।

৩৯০। যার \* বত ও, সে-ই করে তত খুশু।

৩৯১। আগে সংবাদ পাছে লাজ,  
এমন কর্ণের নাই কাজ।

৩৯২। দেখা দেখি সেকা নাচে।

৩৯৩। আধা লেখার তন ধোপাও ভাল।

৩৯৪। তগু চুকা কালু দুধ, তারে খার নিকোঁধ।  
চুকা—অন্ন।  
কালু—ঠাণ্ডা

৩৯৫। শেষ যার বেশ তার।

৩৯৬। হাটের আগ দরবারের পাছ।

৩৯৭। আপনা হাত জগন্নাথ।

৩৯৮। সুন্দর মাউগে দাদারেও শোভে।  
দাদা—পিতামহ।

৩৯৯। কাম কর যত পার,  
ভাত খাও ত আমারে যার।

৪০০। বেরি গাবর তেজিগাপুর।

৪০১। বাইজার কাছে কইতা চুরি।

৪০২। খান্দি,  
তার আবার মান কি ?  
খানদি—বেশা।

৪০৩। মাগাগ পালে বিয়াইল গাই,  
সে সম্পর্কে মায়াত ভাই।

৪০৪। মোটে শনির পাণ্ডা।

৪০৫। এমন কুটুম কই বা পাই  
কাটাখান খুইরা ল্যাআখান খাই।

৪০৬। বিয়া বাকী যদি লেখাপড়া তদিন।

৪০৭। আপনের বেলু লীলাখেলা,  
যত দোষ মাইনুয়ের বেলা।

৪০৮। হাকিমও কাচারীর তন লাম্বল  
আমারও মুখ ছটল।  
তন (ধল)—হইতে।

রাখিয়া ঐ শ্লোক আওড়াইতেই মনার বাপের বড় ভয়  
হইল। সন্ধ্যার আধারে গাছের পাতার আড়ালে  
মনাকে দেখিতে পার নাই—ভীত ভাবে সে বলিল  
'আনি মার তাহাকে কুলে পাঠাব না।' এই বলিয়া  
বাঁটা আনিল। পেছনে পেছনে মনাও অলক্ষ্য পথে  
বাঁটা আনিলে তার বাপ বা হারানিধিকে পাইয়া বড়  
খুশী হইয়া পুষ্য কুলে বাইতে নিবেদন করিয়া দিল।

৪০৯। মরুম বইলা করুম না, জীলে খাইযু কি ?

মরুম—মৃত্যু হইবে।

জীলে—জীবিত থাকিলে।

৪১০। বাপ বয়সে ঘোড়া নাই,

\* তরা লাগাম।

৪১১। রাজার অক্যে রাণী,

কানার অক্যে কানী।

অক্যে—হকে।

৪১২। ঘুমটার ভিতর খেমটা নাচ।

৪১৩। না পাইছি নাই

কুচকুচি ত নাই।

৪১৪। বুদ্ধিমানের \*

কাটা খাওয়ার সময়।

৪১৫। ছুটেয়ে দেও বড় পিড়ি।

৪১৬। লেবু কচলাইলে হয় তিতা,

তাল বসলে পঙ্কের খটা।

৪১৭। নীচ যদি উচ্চ ভাসে, অসুখি উড়ার হেসে।

৪১৮। বলদে চিনে সাবু আর বেচু।

৪১৯। কথাখান মন্দ নয়,

শুনলেই পারে অর হয়।

৪২০। মাছ খায়েন না, ঘেন বিড়াল তপসী।

৪২১। অসুখি রাজা মরণে পৃথিবী হইছে হান,

যুগে খাইয়া ফেলছে পূর্ণিমার চান।

চান—চাঁদ।

৪২২। যে ছাও উড়ে বাসারই উড়ে।

৪২৩। ডুব দিয়া জল খায়,

একাদশীর বাপেও আনে না।

৪২৪। বক 'আর ছক' তুমি কানে দিছি তুলা।

যার আর ধর তুমি পিঠে বাঁধছি তুলা।

৪২৫। চাউলেই যত আউল।

৪২৬। বাগীরা দেয় জোতা পায়,

ভাত বেছন পইচ্যা যায়।

পইচ্যা—পচিয়া।

৪২৭। হাগার নামে বাঘের ডর নাই।

৪২৮। বইতে পারলেই শুইতে জাগ।

বইতে—বসিতে। জাগা—জাগা (হান)।

৪২৯। চোরে চোরে মৌসাত ভাই।

মৌসাত—মোসাত্ত।

৪৩০। মাইগ্যা আইনা বিলাইয়া খায়।

হাতে হাতে বর্ণে যায়।

৪৩১। যে জীবের ল্যাজ নাই।

তার উপকার করতে নাই।

৪৩২। মৃত্তে মৃত্তে ফেনাইয়া বাঘ।

৪৩৩। বোকারাম।

৪৩৪। হাতী যদি লোদে পড়ে,

চামচাড়ার তার \* \*

৪৩৫। চোরার পো চোরা। কিছু কইলাম না।

কইলাও না, বাকীও খুইলা না।

৪৩৬। শিং মাছ কিন্যা, এখন খাইলেও জাত যায়,

ফেললেও পরস। যায়।

৪৩৭। দিনে বাস্তি যায় ঘরে,

তার ভিটায় ঘুণু চরে।

৪৩৮। সমুখ দিয়া মশা বাইতেও নয় না,

পাছ দিয়া হাতী গেলেও চায় না।

৪৩৯। করলা, খুইলেও যায় না ময়লা।

৪৪০। করলার ঘনিতে কাজ কর্ণে,

ময়লা আচ আছেই আছে।

৪৪১। আইতে ভাল। বাইতে ভাল,

তার নাম বীমাওয়ারা।

৪৪২। কইছিল। ত এই ই,

মুখের সে ভদ্রখান কই ?

৪৪৩। বড় কইরা পাত পাতলে হবে কি ?

দেয়ইয়ার ওজন আছে।

- ৪৪৪। প্যাঁটার মায় আর প্যাঁটা বিয়ার না,  
গইড়া নিতে হয়।
- ৪৪৫। প্যারান চোরে করে চুরি,  
মা'গ থুইয়া নেয় থুড়ী।
- ৪৪৬। হাচই নাকি বউরে মারে,  
পামছার বারি দিয়া তামসা করে।  
হাচই—সত্যই।
- ৪৪৭। মাকে যেন ছুধ গলে।
- ৪৪৮। গোড়া কাইটো আগার জল।
- ৪৪৯। ছাই ফেলতে ডাকার কুলার আদর।
- ৪৫০। চিনা বামনের পৈতারা দরকার কি ?
- ৪৫১। মাকড় মারলে ধোকর হয়,  
চুকটুকি মারলে গোবধ হয়।
- ৪৫২। ঘরপোড়া গরু সিন্দুইয়া মেঘ দেখলে ভয় পায়।
- ৪৫৩। লম্বা লগ্গী কাট। \*
- ৪৫৪। চ্যাং উজার ব্যাং উজার,  
খলসা পুটি ধুকড়ার।
- ৪৫৫। যে মাহটা পলার,  
সেইটা বড় বড়।
- ৪৫৬। সন্ন্যাসীরে যদি অলস্মীরে পায়,  
ঝুঝাকাধা নিজে লাইখ্যায়।

- ৪৫৭। টাকার নাও পাহাড় দিয়া চলে।
- ৪৫৮। ভাত না পায়,  
পিঠা পায়স খায়।
- ৪৫৯। বিক্রমপুরের এলি গুণ  
একই গাছে পানশপারী  
একই গাছে চূণ।
- ৪৬০। কাচা বাশে যুগে ধম্মে,  
রক্ষা নাই তার কোন কালে।
- ৪৬১। আঠর নাই নৌকার  
ঠাঠর বেঙ্গী।
- ৪৬২। আকাঠার নায়ের তিনটা গলই।
- ৪৬৩। ছিনালের বড় গলা  
ভন্ডে কান ঝালাপালা।  
ছিনালের—কুলটার।
- ৪৬৪। কুইড়া মাছুষ শয়তানের হাড়ি।
- ৪৬৫। এক পরসার প্রস্তাব,  
আবার দালান বালাখান।
- ৪৬৬। আলুগা বেতের বাক  
লড়ে চড়ে, ধর না।  
ধর—ধসে।

- ৪৬৭। পালে গ বাড়ী হাতাসা,  
একখান একখান বাতাসা ;  
এক বার চাইলাম দিল না,  
আবার চাইলাম দিল না,  
আমরা অত ছোচা না।  
হাতাসা—সপ্তায়ত।
- ৪৬৮। এক মুখ ভরণ ঝার সোনা দিয়াও,  
পাচ মুখ ভরে না ছালি দিয়াও।  
ছালি—ছাই।

- ৪৬৯। চোরের সাক্ষী পাইট কাটা

- ৪৭০। বান্দইরাকে হরি,  
এমন কথার বালাই লইয়  
গলার দড়ী দিয়া মারি।

\* এক চাষা এক জ্যোতিষীকে জিজ্ঞাসা করিল 'ঠাকুর এবার জল হবে কেমন ?' জ্যোতিষী অন্নান বদনে উত্তর করিল 'লম্বা লগ্গী কাট'। চাষা বাটী আসিয়া জল হইবে মনে করিয়া লম্বা একটা লগ্গী কাটিল, কিন্তু সে বৎসর আর জল হইল না। ইতিমধ্যে জ্যোতিষী ঠাকুরের লাগাল পাইয়া চাষা বলিল, 'কি ঠাকুর ! এবার ত জল হইল না—তোমার কথা মিথ্যা।' জ্যোতিষী বলিল, 'কিসে ? আমি কি বলিয়াছিলাম ?' চাষার বাক্য শুনিয়া জ্যোতিষী রাগিয়া বলিল, "আমার কথা মিথ্যা রে বোকা ? আমি যে লম্বা লগ্গী কাটিয়া বাট করিতে বলিয়াছিলাম।"

# ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ

## নিয়মাবলী

১। সভার নাম ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ। নানা উপায়ে বাগ্ম্য ভাষা ও সাহিত্যের অমূল্যগন ও

উন্নতির জন্ত প্রযত্নই এই সভার উদ্দেশ্য।

সভার নাম ও রাজনীতি, সমাজ-সংস্কার বা ধর্ম-  
উদ্দেশ্য সংস্কার বিষয়ে এই পরিষৎ কোনও  
প্রকারে লিপ্ত থাকিবেন না।

২। পরিষদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত “প্রতিভা”  
নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার করা হইবে।

সভার অধিবেশনে প্রবন্ধাদি পাঠ  
সভার কার্য ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা হইবে এবং  
বক্তৃতা ও বাগ্ম্য সর্বপ্রকার  
সাহিত্য বিষয়ে নানারূপ গবেষণা ও মতামতের চেষ্টা  
করা যাইবে। পরিষদের কার্যবিবরণ উক্ত “প্রতিভা”  
পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

৩। পরিষদের অধিবেশন সন্ধ্যা ৮-৯ সময়খণ্ডে রোড  
স্থিত পরিষদের কার্যালয়ে অথবা প্রয়োজনানুসারে  
অন্যত্রও হইতে পারিবে। প্রতি  
পরিষদের মাসের প্রথম সপ্তাহের শনিবারে  
অধিবেশন কিম্বা আবশ্যক হইলে অল্প দিনেও  
অপরাহ্নে সম্পাদকের আহ্বানে  
পরিষদের সাধারণ অধিবেশন হইবে। বিশেষ প্রয়োজন  
উপস্থিত হইলে, অথবা অন্ততঃ সাতজন সভ্য হেতু নির্দেশ  
পূর্বক পত্র দ্বারা অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে সম্পাদক যে  
কোনও উপযুক্ত দিনে বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান  
করিবেন। নয় জন সভ্য উপস্থিত হইলেই পরিষদের  
কার্য আরম্ভ হইবে।

৪। পরিষদের সাধারণ অধিবেশনের কার্য নিম্ন-  
লিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইবে। সভাপতি পরিষদের  
কার্যাবস্তার অমুমতি প্রদান করিলে  
অধিবেশনের ক্রমান্বয়ে পূর্ব অধিবেশনের কার্য-  
কার্য-প্রণালী বিবরণ পাঠ ও অমুমোদন, সভ্য-  
নির্বাচন এবং সভার বিজ্ঞাপিত  
কার্য ও নির্ধারিত প্রবন্ধ পাঠ হইবে। অনাবশ্যক

বোধ করিলে এই সকল কার্যের যে কোনও অংশ  
পরিত্যক্ত হইতে পারিবে।

৫। কোনও বিষয়ের বিচার বা আলোচনার সময়ে  
কেউ সভ্য সেই বিষয় সম্বন্ধে একবার এবং প্রস্তাবক  
দ্বিত্ববারের অধিক বক্তৃতা প্রকাশ  
আলোচনার ক্ষেত্রে পারিবেন না; তবে অধি-  
পদ্ধতি কাংশ সভ্যের মত বা সভাপতির  
অমুমতি পাইলে এই নিয়মের ব্যতি-  
ক্রম হইতে পারিবে।

৬। বিশিষ্ট সদস্য আজীবন সদস্য, সহায়ক সদস্য, ও  
সাধারণ সদস্য এই চারি প্রকার সদস্য লইয়া ঢাকা সাহিত্য-  
পরিষৎ গঠিত হইবে। বাগ্ম্য সাহিত্যমুরাগী ব্যক্তি-  
মাত্রই পরিষদের “সাধারণ সভা”, খ্যাতনামা  
লেখকগণ “বিশিষ্ট সভা”, ও অর্থ সাহায্য ভিন্ন অন্য উপায়ে  
পরিষদের উপকারকম ব্যক্তিগণ  
সভ্য নির্বাচনের “সহায়ক সভা” নির্বাচিত হইতে  
নিয়ম পারিবেন। সাধারণ, বিশিষ্ট, বা  
সহায়ক সভ্যরূপে গণ্য হইতে হইলে

পরিষদের অধিবেশনে একজন সভ্য কর্তৃক তাঁহার নির্বাচন  
প্রস্তাবিত, অপর সভ্য কর্তৃক সমর্থিত এবং সভ্য কর্তৃক  
অমুমোদিত হওয়া আবশ্যক হইবে। আবশ্যক হইলে  
সভার অমুমোদন “ব্যানট” দ্বারা নির্ধারিত হইবে। বিশিষ্ট  
সভ্যের নির্বাচন পরিষদের সভ্যগণের ত্রিচতুর্থাংশের  
সম্মতিক্রমে হইবে। বিশিষ্ট সভ্যের সংখ্যা ছয় জনের  
অধিক হইবে না। সহায়ক সদস্যের সংখ্যা ১০ জনের  
অধিক হইবে না এবং তাহারা এক বৎসরের জন্ত নির্বা-  
চিত হইবেন। তৎপরে তাহারা পুনর্নির্বাচিত হইতে  
পারিবেন।

পরিষদের উন্নতিকল্পে যিনি সাধারণ ভাবে  
এককালে অল্প ১০০ টাকা  
আজীবন সভ্য প্রদান করিবেন তিনি আজীবন-  
কাল পরিষদের সভ্যরূপে গণ্য  
হইবেন; কিন্তু বিশেষ কার্যের জন্ত পরিষদের স্থাপিত

যতদূর কোনও ভাবেই এইরূপ এককালীন দানে কেহ উক্ত সভাপদের অধিকারী হইতে পারিবেন না।

৭। সাধারণ সভাপদের প্রবেশিকা। ১০ আট আনা ও মাসিক অন্তঃ ১০ চারি আনা। অগ্রিম দিতে হইবে। প্রত্যেক সভ্য

সভ্যের কর্তব্য ও পরিষদ প্রকাশিত পত্রিকা অধিকার একখণ্ড বিনামূল্যে প্রাপ্ত

হইবেন; পত্রিকার পুরাতন

সংখ্যার প্রয়োজন হইলে তাঁহার উৎসর্গে প্রতি সংখ্যা অর্জ্বল্যে ক্রয় করিতে পারিবেন; সম্পাদকের নিকট

প্রশ্ন করিয়া সভ্যের অবস্থা, বিধি-ব্যবস্থা ও অন্তর্ভুক্ত সংবাদ জানিতে পারিবেন; এবং সভ্যের কার্যালয়ে উপস্থিত হইয়া সম্পাদকের সম্মতিক্রমে হিসাব ও প্রমোদি দেখিতে পারিবেন।

কোনও সভ্যের দেয় টাকা চারি মাস কাল অদত্ত থাকিলে তিনি সভ্যের সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন; এবং কার্যানির্বাহক সমিতির কোনও সভ্যের টাকা তিনি মাস কাল বাকী থাকিলে তিনি সমিতির সভাপদ হইতে অপমৃত হইবেন ও তাঁহার পরিবর্তে কার্যানির্বাহক সমিতি অপর একজন সভ্য মনোনীত করিতে পারিবেন।

৮। ছাত্রগণের মধ্যে যাহারা প্রবেশিকা বা তত্ত্বাল্য পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা করিলে পরিষদের “ছাত্র সভ্য” রূপে গণ্য হইতে পারিবেন।

“ছাত্র সভ্য” গণকে প্রবেশিকা ১০ চারি আনা এবং মাসিক অন্তঃ ১০ দুই আনা টাকা দিতে হইবে।

“ছাত্র সভ্য” গণ “প্রতিভা” বিনামূল্যে পাইবেন;

পরিষদের অধিবেশনে প্রবন্ধাদি

ছাত্র সভ্য পাঠ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা

এবং পরিষদের কার্যানির্বাহক

সমিতির নির্দেশ অনুসারে, পরিষদের বিজ্ঞাপিত উদ্দেশ্য

সাধনার্থে কোনও কার্যে নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

এতদ্বির “ছাত্র সভ্যগণের” পরিষদ সম্পর্কে অন্য কোনও কর্তব্য বা অধিকার থাকিবে না।

৯। নূতন সভাপদ নির্বাচনের পর হইতে সভ্যের সকল অধিকার প্রাপ্ত নূতন সভ্য হইবেন এবং উক্ত সময়ের পরবর্তী মাসের সংখ্যা হইতে পত্রিকা পাইবেন।

১০। পরিষদ, ইচ্ছানুযায়ী, এক বা একাধিক ব্যক্তিকে পরিপোষক মনোনীত করিতে পারিবেন।

১১। (ক) পরিষদের কার্যানির্বাহার্থে প্রতি বৎসরান্তে বার্ষিক অধিবেশনে সভ্যগণ হইতে নিয়মিত কৰ্ম্ম-ব্যয়গণ তৎপরবর্তী বৎসরের পরিষদের কৰ্ম্মাধ্যক্ষ

জন্ত নিযুক্ত হইবেন। কোনও কৰ্ম্মাধ্যক্ষ বা কার্যানির্বাহক সমিতির সভ্যের পদ কৰ্ম্মের মধ্যে শূন্য হইলে পরবর্তী মাসিক অধিবেশনে ঐ পদ পূরণ করিতে হইবে।

কৰ্ম্মাধ্যক্ষগণের তালিকা:—

সভাপতি	...	...	...	১ জন
সহকারী সভাপতি	...	...	...	৫ „
সম্পাদক	...	...	...	১ „
সহকারী সম্পাদক	...	...	...	৪ „
পত্রিকা সম্পাদক	...	...	...	১ „
ধনরক্ষক	...	...	...	১ „
ছাত্রসভাপদের পরিদর্শক	...	...	...	১ „
কার্যানির্বাহক সমিতির সভ্য	...	...	...	১০ „
আয়ব্যয় পরীক্ষক	...	...	...	২ „

(খ) আয়ব্যয়পরীক্ষক ত্রি পরিষদের সকল কৰ্ম্ম-ব্যয়ই কার্যানির্বাহক সমিতির সভ্যরূপে গণ্য হইবেন।

(গ) পরিষদের সভাপতি প্রভৃতি সকল কৰ্ম্মাধ্যক্ষ-গণ কার্যানির্বাহক সমিতির সেই সেই পদে নিযুক্ত থাকিবেন। কোনও অধিবেশনে সভাপতি বা সম্পাদক

অনুপস্থিত হইলে সেই দিবসের জন্ম উপস্থিত অন্য কোনও  
সভ্য তাঁহাদের কার্য সম্পাদনের জন্ম মনোনীত হইল।

১৩। কোনও বিষয়ের মত গ্রহণ কালে  
সভাপতি দুই পক্ষের সভ্যসংখ্যা সমান হইলে  
অধিকার সভাপতির একটি অতিরিক্ত মত দিবার  
ক্ষমতা থাকিবে।

১৪। সম্পাদক, কার্যানির্বাহক সমিতির মত  
অনুসারে, পরিষদের পক্ষে পত্রাদি প্রেরণ,  
সম্পাদকের অধিবেশনের সময় নির্ধারণ ও জ্ঞাপন,  
কর্তব্য ও আয় সংগ্রহ, আবশ্যিক ব্যয় নিষ্পাদন ও  
অধিকার অন্য উপস্থিত কার্য সম্পাদন করিবেন।  
কার্যানির্বাহক সমিতির নির্দেশানুযায়ী  
নিয়মিত ব্যয় ব্যতীত সম্পাদক পাঁচ টাকা পর্যন্ত ব্যয়  
নিজে করিতে পারিবেন, এবং অনিবার্য কারণে সমিতির  
মত না লইয়া আবশ্যিক কর্ম সম্পাদন করিতে  
পারিবেন; কিন্তু পরে উক্ত ব্যয় ও কর্ম কার্যানির্বাহক  
সমিতির দ্বারা অনুমোদিত করা হইবে। পরিষদের  
নিমিত্ত অভিপ্রেত অর্থাদি সম্পাদকের নামে প্রেরণ  
করিতে হইবে।

সম্পাদক, প্রত্যেক অধিবেশনের সময় নির্ধারণ পূর্বক  
সহরের সভ্যগণকে অন্ততঃ দুই দিন ও মফঃস্বলের সভ্য-  
গণকে অন্ততঃ চারিদিন পূর্বে জ্ঞাপন করিবেন; প্রতি  
মাসে পরিষদের আয়ব্যয়বিবরণী প্রস্তুত করিয়া কার্যা-  
নির্বাহক সমিতিতে অর্পণ করিবেন। বাৎসরিক আয়-  
ব্যয় তালিকা, কার্যানির্বাহক সমিতির সভাপতির ও  
নিজের স্বাক্ষর এবং আয়ব্যয়পরীক্ষকদিগের স্বাক্ষর সহ,  
চৈত্রমাসের সাধারণ অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন;  
সেই সঙ্গে উক্ত সমিতির অনুমোদিত বার্ষিক কার্য-  
বিবরণীও দিবেন।

১৫। পরিষদের প্রাপ্ত অর্থ সমস্তই ধনরক্ষকের  
নিকট পরিবেশিত হইবে।  
ধনরক্ষকের দ্বারক প্রচারাৎ ১০০ একশত টাকা

কর্তব্য ও উত্তর হইলে তাহা তিনি নিজ নামে  
অধিকার বেঙ্গল ব্যাঙ্কের টাকা সাধারণ জমা  
রাখিবেন।

পরিষদের সম্পাদকের স্বাক্ষরিত নির্দেশপত্র  
(পট্টাচার) ভিন্ন ধনরক্ষক কাহাকেও কিছু দিবেন না  
এবং কোনরূপ ব্যয় করিবেন না।

১৬। আয়ব্যয়পরীক্ষক মহাশয়দের প্রতি চারি মাস  
অন্তর এবং প্রতি বৎসরের শেষে আয়-  
ব্যয় বিবরণী পরিদর্শন করিয়া তৎসম্বন্ধে  
পরীক্ষকের মন্তব্য লিখিয়া দিবেন; প্রথমোক্ত মন্তব্য  
কর্তব্য ও কার্যানির্বাহক সমিতিতে এবং শেষোক্তটি  
অধিকার বার্ষিক অধিবেশনে আয়ব্যয়ের হিসাব  
সহ উপস্থাপিত করা হইবে।

১৭। পরিষদের সমস্ত কর্ম কার্যানির্বাহক সমিতির  
নির্দেশ ও কর্তৃত্ব সম্পাদিত হইবে। প্রতিমাসে অন্ততঃ  
একবার উক্ত সমিতির অধিবেশন হইবে।  
কার্য নির্বাহক সম্পাদক আবশ্যিক মনে করিলে অথবা  
হক সমিতির উক্ত সমিতির দুইজন মাত্র সভ্য হেতু-  
কর্তব্য ও নির্দেশ পূর্বক পত্র দ্বারা প্রার্থনা করিলে  
অধিকার ইহার অতিরিক্ত অধিবেশনও হইতে  
পারিবে। পাঁচজন সভ্য উপস্থিত হইলেই  
সমিতির কার্য্যারম্ভ হইবে।

১৮। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্ম পরিবৎ সময়ে  
সময়ে অস্থায়ী শাখা সমিতি গঠন করিতে  
শাখা সমিতির পারিবেন অথবা ব্যক্তিবিশেষের উপর  
নিয়ম। কোনও কার্য সাধনের ভার অর্পণ করিতে  
পারিবেন। শাখা সমিতির কর্মচারিবর্গ  
পরিষদের অধিবেশনে নিযুক্ত হইবেন এবং উহার কার্য-  
কল ও কার্যবিবরণ উক্ত শাখা সমিতির অনুমোদনের  
পর, উহার সম্পাদক প্রতি তিনমাস অন্তর পরিষদের  
অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন।



# ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ

সন ১৩২০ (চতুর্থ বর্ষ)

## পরিপোষকগণ

মবাব খাজে সার সলিমুল্লা বাহাদুর (ঢাকা)  
মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীন্দ্রনাথ রায় (নাটোর)  
" " গিরিজানাথ রায় (দীনাজপুর)  
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী (সংগ্রাম)

## আজীবন সভ্যগণ

মহারাজ শ্রীযুক্ত মনোজ্ঞচন্দ্র নন্দী (কালীয়া বাজার)  
শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ বি এল (মালদহ)  
" মহেন্দ্রলাল রায় বি এল (ঢাকা)  
রাজর্ষি শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী (মুন্সীগাঁ)  
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় (ধানকোরা)  
" কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (মুরাপাড়া)  
(ভাওয়ালের পরলোকগত কুমার রবীন্দ্রনারায়ণ রায়ও  
পরিষদের আজীবন সভ্য ছিলেন।)

## কর্মস্বাধ্যক্ষগণ

সভাপতি—শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ গোস্বামী, এম্. এ, বিজ্ঞানুদ্বি।  
সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ভূপতিনাথ দাস, এম্. এ,  
বি, এস. সি, (লঙন)।  
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ,  
বিজ্ঞানরত্ন।  
" শরৎচন্দ্র ঘোষ বি, এল।  
" শ্রী বাহাদুর সৈয়দ আওলাদ হোসেন।  
সম্পাদক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ, এম্. এ, বি, এল।

সহ সম্পাদক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কিশোর রক্ষিত।

" রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্. এ, পি,  
আর এস।

" নৃপেন্দ্রকুমার দত্ত এম্. এ।

পত্রিকা সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার,  
এম্. এ, বি, এল,

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য্য, এম্. এ,

ধনরক্ষক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ছাত্রসভ্য পরিদর্শক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

আবুঝায় পরিক্ষক—শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্তী বি এল +  
আমাশঙ্কর দাস গুপ্ত বি এল।

কার্য্য নির্বাহক সমিতির নির্বাচিত সভ্য—

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা বি, এল।

" বিভূচরণ গুহ ঠাকুরতা।

অধ্যাপক—" ময়ধনাথ মুখোপাধ্যায় এম্. এ।

" ফণিভূষণ লাহিড়ী এম্. এ।

" কামিনীকুমার সেন এম্. এ, বি, এল।

" নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বি, এল।

" সত্যেন্দ্রকুমার সেন।

" অম্বকুলচন্দ্র সরকার এম্. এ, পি,

আর, এস, এফ, সি, এস।

" উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ, বি, এ, বি, টি।

" গোবিন্দচন্দ্র ভাওয়াল, বি, এল।

# ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ

## তৃতীয় সাংবৎসরিক কার্যবিবরণী

(সন ১৩২০)

### উপক্রমণিকা

ভগবানের অমুগ্রহে ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ তৃতীয় বর্ষ অতিক্রম করিয়া চতুর্থ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কেন্দ্রে স্থিতি করতঃ মাতৃভাষার সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করার প্রয়োজনীয়তা সকলেই এক্ষণে স্বীকার করেন। সেই প্রয়োজনের অমুরোধেই ১৩১৮ সনে কতিপয় মাতৃভাষানুরক্ত শিকিত ব্যক্তি দ্বারা ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ সংস্থাপিত হইয়াছিল। বিগত তিন বৎসর যাবৎ এই পরিষদ অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সহিত বহাশক্তি মাতৃভাষার সেবা করিয়া আসিতেছে। পরিষদের এই তিন বৎসরব্যাপী উন্নতির ফলে ঢাকাবাসীর সাহিত্যানুরক্তি বর্দ্ধি করিয়াপরিমাণেও বৃদ্ধিত হইয়া থাকে, যদি কোন নূতন কর্ম্মকে মাতৃভাষার পবিত্র মন্দিরে আকৃষ্ট করিয়া থাকে, তবেই মনে করিতে হইবে যে পরিষদের ক্ষুদ্র চেষ্টা একেবারে নিফল হয় নাই।

### সভ্য-সংখ্যা

দিন দিনই এই পরিষদের শ্রীবৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ৩১ জন সভ্য লইয়া এই সভা ১৩১৮ সনে প্রথম সংস্থাপিত হয়। ঐ সনের শেষ ভাগেই সভাসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৪২ জনে পরিণত হইয়াছিল। ১৩১৯ সনের সভ্য-সংখ্যা ৩৬০ জন; আলোচ্য বর্ষের (১৩২০) সংখ্যা ৪০২ জন বধা।—

আজীবন সভ্য.....৬	জন
সাধারণ সভ্য.....৩৭৫	”
ছাত্র সভ্য.....৪৭	”
পরিপোষক .....৪	”

মোট ৪০২ ”

### এতদ্ব্যতীত

সহরের সভ্য-সংখ্যা.....২৪২ জন
মফঃস্বলের সভ্য-সংখ্যা.....১৬০ জন

মোট ৪০২ জন

১৩১৯ সনের জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ সনেও মফঃস্বলস্থ সভ্যমণ্ডল

অনেকে আমাদের পত্রিকা গ্রহণ করতঃ পরিশেষে ভি. পি. ফেরৎ দিয়া আমাদের অত্যন্তরূপে কতিগ্রস্ত করিয়াছেন। বাহাতে পরিষৎকে এইরূপ কতিগ্রস্ত হইতে না হয় তজ্জন্ত আলোচ্য (১৩১০) বর্ষে কার্যনির্বাহক সমিতি এরূপ নির্ধারণ করেন যে প্রত্যেক তিনমাস অন্তর পত্রিকা ভি. পি. ডাকে পাঠাইয়া মফঃস্বলস্থ সভ্যগণের চাঁদা অগ্রিম আদায় করা হইবে। কিন্তু কর্মচারী পরিবর্তন ও তাঁহাদের অমুপস্থিতির দরুন সেই নির্ধারণ যথোপযুক্তরূপে কার্যে পরিণত হইতে পারে নাই। তবিশ্বাসে বাহাতে উহা কার্যে পরিণত হয় তজ্জন্ত বিশেষ চেষ্টা করা যাইবে। ১৩২১ সনের শেষ ভাগের চাঁদার সহিতই ১৩২২ সনের প্রথম তিন মাসের চাঁদা আদায়ের জন্ত পত্রিকা ভি. পি. ডাকে প্রেরিত হইবে। তরসা করি সহৃদয় সভ্যমহোদয়গণ পরিষদের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দেয় চাঁদা প্রেরণ করিতে পরাধ্য হইবেন না।

সহরস্থ সভ্যগণের চাঁদা গতবৎসর অপেক্ষা এ বৎসর অধিক আদায় হইয়াছে। ইহা নিতান্তই সুখের বিষয়। বাহাদের নিকট বাকী পড়িয়াছে, তরসা করি, তাঁহারা সহর তাহা প্রদান করিয়া আমাদের অমুগৃহীত করিবেন।

### আজীবন সভ্য।

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ পরিষদ ভাণ্ডারে এক কালীন ১০০ টাকা দান করিয়া আজীবন সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াছেনঃ—

- (১) রাজবি শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী (মুক্তাগাছা)
- (২) শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (মুরাপাড়া)

(৩) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় (খানিকোড়ী) :—  
এইরূপ উৎসাহ প্রদানের জন্য ঢাকা সাহিত্য পরিষদে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় গ্রহণ করিয়াছিলেন ;  
উক্ত মহোদয়গণকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। কিন্তু তিনি আলোচ্য বর্ষের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা মাত্র  
এতদ্বির নবাব খাজে সলিমুল্লাহ বাহাদুর পরিষদের পরিপোষকপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোক-  
গমনে পরিষদ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। পরিচালন ও প্রকাশিত করিবার কার্য বৃহত্তে গ্রহণ  
তাঁহার মত বদান্ত ও যোগ্যসাধী লোকের অভাব করেন। সত্যেন্দ্রবাবুর কর্তৃত্ব সময়েই শেষ ভাগে 'প্রতিভা'  
পরিষদের গুরুতর ক্ষতির কারণ হইয়াছে।

"প্রতিভা" নামক মাসিক পত্র পরিষদের মুখপত্র। নিরীহক সমিতি কয়েকখানা যুগ্মসংখ্যা প্রকাশিত করিতে  
ঢাকা সাহিত্য পরিষদের বিভিন্ন অধিবেশনে প্রণীত ও বাধ্য হন। আলোচ্য বর্ষের শেষভাগে 'প্রতিভা' পুনরায়  
অজ্ঞাত সারগর্ভ প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

### মাসিক অধিবেশন।

গতবর্ষে পরিষদের ১২টি অধিবেশন হইয়াছিল, যথা :—

তারিখ	প্রবন্ধের নাম	লেখকের নাম
২১শে বৈশাখ...	...শ্রীহট্টের ওসমান ও বঙ্গের ওসমান খাঁ...	...শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি এ বি টি।
২২শে জ্যৈষ্ঠ...	...বঙ্গ সাহিত্যে বিজ্ঞেন্দ্রলাল ...	...শ্রীযুক্ত মনমোহন দাস গুপ্ত এম এ, বি এল।
১৮ই শ্রাবণ...	...পাণ্ডিত্যজ্ঞিত দেশ কোথায় ...	... " আনন্দচন্দ্র সেন।
১লা ভাদ্র ...	...ত্রণবিজ্ঞান ও অস্ত্র-চিকিৎসা ...	... " কবিরাজ কেশবচন্দ্র দাস।
২১শে ভাদ্র...	...চৈতন্যচরিতামৃতের ভাষা...	...শ্রীযুক্ত গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য বি, এল।
৫ই আশ্বিন...	...(১) নাটকীয় সাহিত্য ও বাঙ্গালার নাটক...	... " কামিনীকুমার সেন এম, এ, বি এল
(দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন) (২) শক কল্পপট্টন ...	... " ...	... " রমেশচন্দ্র মজুমদার এম, এ, পি।
		আর এস।
১৫ই আশ্বিন ...	...(১) ধামরাইর পুরাকীর্তি ...	... " বীরেন্দ্রনাথ বসু।
	(২) ভারতীয় ব্রহ্মবিজ্ঞানের বিবর্তন...	... " গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী এম্ এ।
১৬ই কার্তিক...	...আনন্দী কবি...	... " অম্বিনী কুমার শর্মা।
২৭শে অগ্রহায়ণ ...	...গত ৪০ বৎসরের ঢাকা জিলার স্বাস্থ্যবিবরণী...	... " বিলাসচন্দ্র দাস।
৭ই মাঘ ...	...বঙ্গের রঘুনাথ শিরোমণি ও শ্রীহট্টের রঘুনাথ...	... " উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি, এ, বি, টি।
১৬ই ফাল্গুন ...	...রজন-শিল্পের ইতিহাস ...	...শ্রীযুক্ত অক্ষকুলচন্দ্র সরকার এম, এ, পি,
		আর, এস।
২১শে চৈত্র...	...অন্ধ রাজবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ...	... " রমেশচন্দ্র মজুমদার এম, এ পি,
		আর এস।

এতদ্বির ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে ১০ই অগ্রহায়ণ তারিখে ঢাকা বার এসোসিয়েশন গৃহে পরিষদের একটি অতিরিক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। পরিলোকগত মবাব খাঞ্জে সলিমুল্লাহ্‌রাজ্‌জি, সি, আই, ই মহাশয় উক্ত সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার সেন এম, এ বি, এল মহাশয় রবিবাবুর প্রতিভা সম্বন্ধে এক সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, এবং শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম, এ, পি, আর, এস, মহাশয় উক্ত কবির প্রতিভার বিশ্লেষণ করতঃ এক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

মাসিক অধিবেশনে প্রবন্ধপাঠ ব্যতীত বিবিধ পুরাতত্ত্ব বিষয়ক জব্য ও চিত্রাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত আমরাই ও সাতার অঞ্চলের অট্টালিকা প্রভৃতির ভগ্নাবশেষের আলোক-চিত্র, সেই অঞ্চলে প্রাপ্ত যুগাদি এবং দশাবতার প্রস্তর-ফলক প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

### আয়ব্যয়।

সহরস্র সভ্যগণের চাঁদা অপেক্ষাকৃত রীতিমত আদায় হওয়াতে গতবৎসর অপেক্ষা আলোচ্য বৎসর পরিষদের আয় অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে বলা :—

মোট আয়,	মোট খরচ,
১৩১৯ সনে...৬৬৩৮/৩ পাই	৬৫৮/২ পাই
১৩২০ " ...১২৬৬/৯ "	১১৪৩।০ আনা।

শ্রীযুক্ত শ্রামাশঙ্কর দাসগুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়র আয়ব্যয়ের হিসাব যত্নপূর্বক পরীক্ষা করিয়া দিয়া আমাদিগকে অঙ্গুগৃহীত করিয়াছেন।

### পুরাতত্ত্ব সমিতি।

প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ স্থানীয় ইতিহাস ও সাহিত্যের উদ্ধারের জন্য গতবৎসরে যে পুরাতত্ত্ব সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তাহার কার্য পূর্ণ বৎসরের জায় এ বৎসরও কৃতিত্বের সহিত পরিচালিত হইয়াছে।

কাণ্ডিয়াল ও সাতার অঞ্চল পরিদর্শন করতঃ ভ্রমতা স্থানীয় ইতিহাস উদ্ধারের জন্য পূর্ণ বৎসরের জায় এ বৎসরও শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসুঠাকুর যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং তৎসম্বন্ধে মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পাঠ করিয়াছেন। তাহা 'প্রতিভা' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের আলোচনার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তিনি শ্রুত কত্রেপ চট্টন ও অল্প রাজ-বংশের সময় নিরূপণে স্বীয় মৌলিকতা ও পাণ্ডিত্যের বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন এবং অপেক্ষাকৃত প্রাচীন পুরাণগুলির ঐতিহাসিকতা দৃঢ়রূপে প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ঐ দুই প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে ইহা বলাই বাহুল্য।

ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, ও বিক্রমপুর অঞ্চলে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র গুহ বি, এ, বি, টি, মহাশয় অনুসন্ধান-কার্যে লিপ্ত ছিলেন। তাহার ফলস্বরূপ "বজ্রের ত্রুণাধ শিরোমণি ও শ্রীহট্টের রত্নপুণ্ড" শীর্ষক মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। রত্ননাথ শিরোমণি সম্পর্কে এতদপেক্ষা বিস্তৃত ও মৌলিক তথ্যপূর্ণ আলোচনা ইতিপূর্বে যোহ হর আর প্রকাশিত হয় নাই।

শ্রীযুক্ত গুরুবন্ধু তট্টাচার্য্য বি, এ, বি, টি, মহাশয় ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট অঞ্চলে ভ্রতকথা, ছড়া ও পাঁচালী সংগ্রহ করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত মহাশয় মেয়েলী ছড়া ও ভাটিয়াল গান প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহার ও অজ্ঞাতের সংগৃহীত মেয়েলী ছড়াগুলি শ্রীযুক্ত বসুঠাকুর পুস্তকাকারে পরিষদের গ্রন্থাবলী ভুক্ত গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইবে।

জীব জগতের বৃত্তান্ত সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র তট্টাচার্য্য মহাশয় পূর্ণ পূর্ণ বৎসরের জায় এ বৎসরও পর্যবেক্ষণ ও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহার

“সারক পান্ডিত্য” বিবরণ বহু সাহিত্যে এক অভিনব সামগ্রীরূপে পরিগণিত হইবে সন্দেহ নাই।

পরিষদের প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহের মধ্যে প্রকাশযোগ্য গ্রন্থগুলি বাহাতে প্রকাশিত হইতে পারে তৎক্ষণাৎ আশোচ্য বর্ষে বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য্য এম, এ ও শ্রীযুক্ত অমিনাশচন্দ্র মজুমদার এম, এ বি এল ও অপরাপর মহোদয়গণ সেগুলি উপযুক্তরূপে সম্পাদন করার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের কার্য্য কতকদূর অগ্রসর হইয়াছে।

দশাবতার প্রস্তর ও অস্ত্রাস্ত্র পুরাকীর্ত্তির চিত্রাদি এ বৎসরও কিছু কিছু সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু অর্থাভাবে পূর্ববৎসরের ত্যায় এ বৎসর এ বিষয়ে বিশেষ সফলতা লাভ করিতে পারা যায় নাই।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র গুহ বি, এ, বি, টি ও শ্রীযুক্ত অখিনীকুমার শর্মা পূর্ববৎসরের প্রস্তরমূর্ত্তিগুলির চিত্র সম্বলিত তালিকা প্রস্তুত করিবার ভার গ্রহণ করিয়া ছিলেন। উপেন্দ্রবাবুর চেষ্টায় সেই কার্য্য অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। শ্রীযুক্ত তাঁহাদিগের বস্ত্রের কল সাধারণে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত অমিনাশচন্দ্র মজুমদার এম, এ, বি, এল মহাশয় কঙ্ক পূর্ববৎসরের ব্যবসায়ী ও শিল্পীগণের ব্যবহৃত

পারিতোষিক শব্দসমূহের তালিকা সংগ্রহের কার্য্যও পূর্ববৎ চলিতেছে। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র কুমার দত্ত এম, এ মহাশয় পূর্ববৎসরের হিন্দুধর্ম ও সমাজের ক্রমোন্নতির বিবরণ প্রকাশিত করিবার অল্প তথ্য সংগ্রহ করিতে ছিলেন। তাঁহার ঐ কার্য্য অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। শ্রীযুক্ত গুহ। পরিসমাপ্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বৈজ্ঞানিক বিভাগে শ্রীযুক্ত অম্বকুল চন্দ্র সরকার এম, এ, এক সিএস, কবিরাজ কেশবচন্দ্র দাস, ও বিলাস চন্দ্র দাসের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের গবেষণার ফল ‘প্রতিভা’ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। অম্বকুল বাবুর তদীয় “রজন-শিল্পের ইতিহাস” প্রবন্ধ প্রচুর গবেষণা ও পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

দার্শনিক বিভাগে শ্রীযুক্ত মনমথ নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয় কার্য্য করিতেছেন। তদ্রচিত বার্মেন্দ্র দর্শনের বিবরণের অবশিষ্টাংশ শ্রীযুক্ত প্রকাশিত হইবে। শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী এম, এ মহাশয়ের “ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যার বিবর্তন” শীর্ষক প্রবন্ধও এ বৎসরে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ

সম্পাদক।

# প্রতিভা

৪র্থ বর্ষ

চৈত্র ১৩২১

১২শ সংখ্যা

## চন্দ্রকান্ত প্রসঙ্গ

‘শিক্ষা’ ও তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা

(১)

বাঙ্গালা ভাষার উপাদান

যে বাঙ্গালা ভাষার ‘উপাদানগত তর্ক’ বর্তমান সময়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা প্রধান আলোচ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রায় বত্রিশ বৎসর পূর্বে ত্রাঙ্গণ পণ্ডিত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কাছে তাহা আলোচনার যোগ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল, এবং তৎকালেও বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতবহুল হওয়া উচিত কি না তাহা নিয়া বোধ হয় মতভেদ প্রচলিত ছিল। ‘শিক্ষা’র বিজ্ঞাপনে তর্কালঙ্কার মহাশয় লিখিয়াছেন—“এই পুস্তকে সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইচ্ছাপূর্বক এই রীতি অবলম্বন করিয়াছি, কারণ বঙ্গভাষা আজিও পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় নাই। এখনও ভাষান্তর হইতে উপাধান আহরণ করিয়া বঙ্গভাষার পরিপুষ্টি সাধন করিবার আবশ্যক আছে। চিন্তা করিলে প্রতীত হইবে, যদিও বাঙ্গালা একটি স্বতন্ত্র ভাষা তথাপি উহাতে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা হইতে এত শব্দ গৃহীত হইয়াছে যে, বর্তমান বঙ্গভাষাকে একপ্রকার সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষাযুক্ত বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। কোন কোন সংস্কৃত শব্দ অবিকল বা আংশিক বিকল হইয়া বঙ্গভাষার গৃহীত

হইয়াছে। কোন কোন শব্দ সংস্কৃত ভাষা হইতে প্রাকৃত ভাষায় নীত এবং প্রাকৃত ভাষার নিম্নমাত্রাধারে বোধোচিত বিকার প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ বিকৃত শব্দটা অবিকল বাঙ্গালা ভাষায় নীত হইয়াছে। কোন কোন শব্দ আবার সংস্কৃত ও প্রাকৃত হইতে নীত হইবার কালে রূপান্তর ধারণ করিয়াছে। কতিপয় উদাহরণ দ্বারা ইহার প্রমাণ করা বাইতেছে—

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
গৃহ	ঘর	গৃহ, ঘর
ত্বং	তুমং	তুমি
বধু	বহ	বধু, বউ
বার্হদশ	বারহ	বার
ত্রয়োদশ	তেরহ	তের
অষ্টাদশ	অষ্ঠারহ	আঠার
বিশদশ	বিশদ	বিশদশ, বিশদ
দ্বাদশ	দ্বাদ	দ্বাদ
হস্ত	হথ	হস্ত, হাত
হরিজ্ঞা	হলজা	হরিজ্ঞা, হলুদ
বৌবুল	বোবুল	বৌবল
দেবর	দি অর, দে অর	দেবর, দে অর
হৃদয়	হি অ অ	হৃদয়
পুরুষ	পুবিস	পুরুষ
মিত্রা	মিদা	মিত্রা

চৈত্র ১৩২১

বাহুল্য ভয়ে অশ্রদ্ধা নিদর্শন উদ্ভূত হইল না। যাহা উদ্ভূত হইয়াছে তদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে বাঙ্গালা ভাষার অধিকাংশ শব্দ সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষামূলক। প্রাকৃত আবার সংস্কৃতমূলক, অতএব সাক্ষাৎ বা পরস্পরা সংস্কৃত ভাষাই বাঙ্গালা ভাষার অধিকাংশ মূল হইতেছে। যখন বঙ্গভাষায় ভাষান্তর হইতে শব্দ গ্রহণের আবশ্যিকতা রহিয়াছে, তখন যতদূর সম্ভব সংস্কৃত ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করা অসঙ্গত বোধ হয় না। বর্তমান বঙ্গ ভাষায় প্রাকৃত ভাষার শব্দ গ্রহণ করা অসঙ্গত বিবেচনায় সেরীতি অবলম্বিত হয় নাই। জানি না, অবলম্বিত রীতি পাঠকদিগের কতদূর প্রীতিকর হইবে। বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি ও বর্তমানে গ্রহণীয় উপাদান সম্বন্ধে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মন্তব্য আমরা দীর্ঘকাল পরে আবার শিক্ষিত সমাজের নিকট উপস্থাপিত করিলাম।

**ছাত্র-জীবন**—‘শিক্ষা’র পঞ্চম পরিচ্ছেদটি ভারতীয় আৰ্য্য ছাত্র-জীবনের আদর্শ ও নিয়ম প্রণালীর আলোচনায় পরিপূর্ণ। তর্কালঙ্কার মহাশয় ভারতীয় ছাত্রজীবন সম্বন্ধে প্রথম আলোচনার আবশ্যিকতা প্রতিপাদন করিবার জন্য যে মন্তবাটী প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা পঞ্চম পরিচ্ছেদ হইতে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

“আমরা ভারতবাসী, ভারতীয় ছাত্রজীবন আমাদের প্রথম আলোচ্য, কারণ দেশান্তরীয় ছাত্র-জীবনের আলোচক ও নিয়ন্ত্রক অভাব নাই। ভারতীয় ছাত্র-জীবনের নিয়ন্ত্রণ ঘুরে থাকুক আলোচকও অতি বিরল। তাই আমরা ভারতীয় ছাত্র-জীবনের আলোচনা করিতে বাঞ্ছা। ভারতীয় ছাত্র-জীবনের আলোচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ আৰ্য্য ভারতের ছাত্র-জীবনের আলোচনা আবশ্যিক, যেহেতু অনেকের সংকার যে বর্তমান ভারতীয় ছাত্র-জীবন উন্নতির উচ্চতর সোপানে সমাক্রম, সুতরাং তাহার আলোচনাই আদৌ নিষ্ফল। আৰ্য্য ভারতের ছাত্র-

জীবনের স্থূল স্থূল বিষয়ের সমালোচনা করিলে তাহার দেখিতে পাঠিবেন যে, বর্তমান ও পূর্বতন ভারতীয় ছাত্র-জীবনে কত প্রভেদ।

আমরা বিজাতীয় বা বিদেশীয় বলিয়া কোনও উপাদেয় বিষয়ের বিবেচনা নহি, কিন্তু দেখিতে হইবে যে আমাদের যাহা ছিল, তাহা এবং যাহা বিজাতীয় ও বিদেশীয় তাহাতে কতদূর তারতম্য। এই পর্য্যন্ত সমালোচনা করিলে যেটি উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হইবে সেটি বিজাতীয় হউক বা বিদেশীয় হউক তাহা গ্রহণ করিতে আমাদের আপত্তি নাই।

আপাতমধুর ভিন্ন দেশীয় বা ভিন্ন জাতীয় ভাবের পরিগ্রহ ও পরিণাম, সমুৎকৃষ্ট দেশীয় ও জাতীয় ভাবের পরিচাণ আমাদের একান্ত অসহনীয়। তাই বলিতে-ছিলাম বর্তমান ভারতীয় ছাত্র-জীবন কিরূপ হওয়া উচিত তাহা নির্ধারণ পরিবার পূর্বে আৰ্য্য ভারতীয় ছাত্র-জীবন কিরূপ ছিল তাহা একবার সমালোচনা করিয়া দেখা আবশ্যিক।” ইতঃপর প্রাচীন আৰ্য্য ছাত্র-জীবনের নিয়ম-প্রণালী, সংযম, কঠোর ব্রত, ব্রহ্মচর্য্য, গুরুসেবা ও অধ্যয়ন প্রভৃতি বিষয় অতি বিশদ ভাবে বিবৃত করা হইয়াছে। সে কি সুন্দর ভাষা, কি বা সন্নিবেশ-শৃঙ্খলা, পড়িতে পড়িতে তৃপ্তি হয় না, আমার ইচ্ছা হইতেছে পুস্তকখানা আগাগোড়া উদ্ধৃত করিয়া আমার প্রিয় পাঠক ও ছাত্রগণকে উপহার দেই, কিন্তু স্থানান্তর!

তর্কালঙ্কার মহাশয় ছাত্রগণের ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন, আমাদেরও মনে হয় ব্রহ্মচর্য্য বা সংযম সর্বদেশের সকল ছাত্রের উন্নতির মূল। তাৎকালিক ছাত্রগণের বিলাস ব্যাসন ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া বিশেষতঃ শিক্ষা-সম্পাদক ও অভিভাবকগণের তত্ত্ববিষয়ে ঔদাসীন্য অস্বত্ব করিয়া তিনি যে আক্ষেপ করিয়াছেন তাহা প্রকৃত পক্ষেই মর্শ্বস্পর্শী। আজি এতদিন পরে শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষ শিক্ষা-

সংস্কার সম্বন্ধে যে সকল হেতুবাদে মনোযোগ প্রদান করিবার আবশ্যিকতা অনুভব করিয়া যথাসম্ভব প্রতীকার কার্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন, বত্রিশ বৎসর পূর্বে পল্লীর শান্ত শীতল ছায়াতলে নিকরবেগ, বিষয়-স্পৃহাশূন্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত তর্কালঙ্কার মহাশয় সেই সকল হেতুবাদ লক্ষ্য করিয়া তারতম্যে তাহার সংস্কার-প্রস্তাব শিক্ষিত সমাজের কর্ণগোচর করিয়াছিলেন। আমরা তাহার ‘শিক্ষা’ হইতে আরও একটি স্থান এই প্রসঙ্গেই উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। যদিও বর্তমান সময়ে এ সকল কথাই অনেক বার আলোচনা হইয়া গিয়াছে তথাপি “শ্রেয়সিকেন তপ্যতে” নীতির অনুসরণ করিতে বাধ্য হইলাম। এ সকল কথার আলোচনা দ্বারা যদি আমাদের একটি ছাত্রের জীবন স্রোতঃ পরিবর্তিত হয় তবে আমাদের সকল শ্রম সার্থক হইবে।

“ \* \* \* ইদানীন্তন ছাত্রদিগের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য আমরা কেবল তাঁহাদিগকে (ছাত্রদিগকে) দায়ী করিতেছি না, শিক্ষা-প্রণালীর দোষ ইহার নিদান। অভিভাবকগণ ও শিক্ষকগণ ছাত্রদিগের রাশি রাশি পুস্তক কণ্ঠস্থ হওয়াই শিক্ষার পরাকাষ্ঠা বিবেচনা করেন। শিক্ষা-বিধাতৃগণও এই মারাত্মক সংস্কারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান নাই। যাহাতে ছাত্রগণ মানুষ হইতে পারে তদ্বিষয়ের উপায় উদ্ভাবনের জন্য দুই দণ্ড চিন্তা করা কেহই আবশ্যক বোধ করে না। আর্ধ্য ভারতীয় ছাত্রগণ অধ্যয়নের পূর্বে হইতে (উপনীত হইয়া অবধি) ধর্ম-সাধন ও নীতি-শিক্ষায় নিযুক্ত হইতেন, সুতরাং তাঁহাদের অন্তঃকরণ অক্ষুণ্ণ, মার্জিত ও ধর্মভাবে পরিপূর্ণ ছিল। আর বর্তমান কালে—বর্তমান কালে উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার অনুরোধে ছাত্রদিগের ধর্ম-সাধনা বা নীতিশিক্ষা কুসংস্কার বলিয়া পরিণত। কি ভয়ানক কুসংস্কার! আজকাল

কোন কোন ছাত্র ইংরাজের দুই চারিখানা পুস্তক

মুগ্ধ করিয়া বা তাঁহাদের সহিত দুই চারিটি বাক্যালাপ করিয়া তাঁহারা স্বয়ং একটি গুরুচাৰ্য্য বা চাণক্য হইয়াছেন। তাঁহারা ভাবেন কুসংস্কারজাল সমূলে উচ্ছিন্ন করিবার জন্য ভারতে তাঁহাদের আবির্ভাব! আর্ধ্যদিগের ধর্ম ও আর্ধ্যদিগের নীতি সভ্যতার অননুমোদিত, উহা সভ্য মনুষ্যের পক্ষে নহে, এক ভয়ানক আত্মপক্ষা। তাঁহাদের মতে যে কিছু সভ্য যুরোপীয় শাস্ত্রে, যুরোপীয় ধর্মে—যুরোপীয় নীতিতে। ইহার প্রমাণ অন্বেষণের জন্য অধিক দূর যাইতে হইবে না। বৈদিক ব্রাহ্মধর্মের প্রামাণিকতার জন্য ইংরাজ দার্শনিক ও ধর্ম-প্রণেতাগণের হস্ত সকলের উপস্থাপিত হোমার সংশয় দূর করিবে। যাঁহাদের মতে যুরোপীয় শাস্ত্রাদিই সভ্যতার অননুমোদিত তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখুন যে উহার মূল কোথায়? নিরপেক্ষ যুরোপীয় পণ্ডিতগণ অগ্নান বদনে স্বীকার করেন যে, তাঁহাদের অনেক বিজ্ঞানতার মূল ভারতবর্ষে। ভারতীয় নীতি প্রভৃতি—প্রথমতঃ মিশরে তথা হইতে রোমে নীতি হয়, রোমরাজ্য ধ্বংসের পরে আরব হইতে অনেক বিষয় গ্রীসে নীত ও তথা হইতে ইহা যুরোপের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়। আরব যে এই সকল বিষয়ে ভারতের শিষ্য তাহা এক প্রকার সর্ববাদিসম্মত।

তবে অবস্থা ও উপযোগিতা অনুসারে উহা রূপান্তর হইয়াছে মাত্র। প্রিয় ছাত্রগণ, তোমরা রত্নাকরবাসী হইয়া রত্ন চিনিলাই না, তোমরা তোমাদের রত্ন অস্ত্রের রত্নে অনুরঞ্জিত না হইলে গ্রহণ করিতে চাও না, কিন্তু যুরোপের বিচক্ষণাগ্রগণ্য মহাস্বাগণ তোমাদের বাঁটি রত্ন অন্বেষণ করিবার জন্য কতই না পরিশ্রম করিতেছেন ইহাতেও কি তোমাদের চৈতন্য হইবে না?”

ইহার উপর চীকা অনাবশ্যক। তর্কালঙ্কার মহাশয় একস্থলে আমাদের ছাত্রগণকে তাত্‌কালিক মারাত্মক সভ্যতার হস্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্য ভক্ত্যার রামদাস সেনের নামে লিখিত শুই মোক্ষমূলরে



একখানা পত্রের কিয়দংশ অল্পবাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। বোক্ষমূল্য লিখিয়াছেন, “বদিও আমি ভারতবর্ষ কখন দেখি নাই, কিন্তু ভারতের সাহিত্য ও প্রাচীন গ্রন্থ অধ্যয়নে আমার সমস্ত জীবন অতিবাহিত করার আমি একরূপ ভারতের অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছি। আমার ইচ্ছা ভারতবাসী আপনাদের অতীত ইতিহাস ও সাহিত্যের গৌরব বুঝিতে পারিয়া জাতীয় ভাব পোষণ করেন।

তোমরা বর্ণভূমির সম্ভান, মহুর বংশধর, যুরোপে বাহা কিছু ভাল তাহা গ্রহণ কর, কিন্তু যুরোপীয় হঠতে চেষ্টা করিও না।”

একদিন প্রতিভাশালী সাহিত্যগুরু বল্লিম বাবুও তাঁহার অল্পলীনভাষে ইউরোপের বহিবিজ্ঞান মাত্রের অল্পসরণ করিবার উপদেশই আমাদিগকে দিয়াছিলেন।

মহাত্মা তর্কালঙ্কার মহাশয়ও তাঁহার এই গ্রন্থে আমাদিগকে সেই উপদেশই বার বার দিয়াছেন।

এইবার আমরা ‘শিক্ষার’ বর্ষ পরিচ্ছেদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব। বর্ষ পরিচ্ছেদে প্রাচীন আর্য্য রীতির ব্যত্যয় ও পাশ্চাত্য রীতির সম্যক প্রতিষ্ঠার তুলনার সমালোচনা করিয়া উভয়ের ভারতম্য প্রদর্শন করা হইয়াছে। ছাত্রগণ বর্তমান সভ্যতা-নীতির অল্পসরণে নিতাগ উদ্ধৃত ও শিক্ষকের প্রতি প্রজ্ঞাত্তিশ্রুত হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় মনে করেন, এবং ধর্মশিক্ষাপ্রসূত শিক্ষাব্যবহার দোষও ইহার আংশিক হেতু বলিয়া তাঁহার ধারণা। আগেকার ছাত্রগণ গুরুর আয়ত্ত ছিলেন, এখনকার ছাত্রগণ সম্পূর্ণ বিপরীত; বরং গুরুই ছাত্রগণের সম্পূর্ণ ঘূটার ভিতরে। তর্কালঙ্কার মহাশয় আরও বলেন যে, ছাত্রগণ যেমন শিক্ষকের প্রতি প্রজ্ঞাত্ত, গুরুগণও তেমনি ছাত্রগণের প্রতি তথাবিধ মেহশ্রুত হইয়া পড়িয়াছেন। এই সকল ভাববিপর্য্যয়ের পরিণাম যে কি হইবে

তাহা তিনি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইয়া শিহরিয়া ছিলেন। বদিও এসকল বিষয়ের আলোচনা ছাত্র বা শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতিকর হইবে না বলিয়াই তিনি জানিতেন, তথাপি সমাজের মঙ্গল কামনার তিনি নির্ভীক চিন্তে এসকল কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি নিজের দেশ, সমাজ, ধর্ম ও ছাত্রগণকে বড় ভাল বাসিতেন। সেই জন্যই তাঁহার এত প্রয়াস। এই কৈকিয়ৎটী তিনি নিজেই দিয়াছেন তাহা আমরা পরে উল্লেখ করিব। কিন্তু তিনি শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে অসম্যক ব্যবহার দর্শনে যে অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহাই আমরা সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি,— পাঠকগণ এই উদ্ধৃত অংশটুকু পাঠ করিলে দেখিবেন ইরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এদেশে সাধারণের নিকট বিজ্ঞা অপেক্ষা অর্থের সম্মান যেমন বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল এবং আজি পাশ্চাত্য দেশ সমূহের মত না হোক অন্ততঃ অনেকটা তাহারই আদর্শে ভারতবাসীর বৃত্তিসাংকর্য্য নিবন্ধন সমাজের মধ্যে যে একটা প্রবল সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে তাহার আভাস স্পষ্টদর্শী তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই, তাই তিনি অতি আক্ষেপ সহকারে বলিতেছেন,—

“বর্তমান ছাত্রদিগের শিক্ষকের প্রতি তথাবিধ অসম্মত ও উদ্ধৃত ব্যবহার স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দেয় যে, বর্তমান ভারতে বিজ্ঞার মূল্য বৎপরোনাস্তি হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে। পক্ষান্তরে অর্থের মূল্য অসম্মত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ছাত্র বিবেচনা করেন আমি যে উচ্চ মূল্যে শিক্ষা ক্রয় করিতেছি, তাহাতে শিক্ষকের আমার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, এবং আমি তাঁহার উপর যথেষ্ট প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে অধিকারী। তিনি মনে ভাবেন না যে, তিনি যে শিক্ষা প্রাপ্ত হন তাহার মূল্যের তুলনায় তাঁহার প্রদত্ত নিজের অতি বৎসামাত্র। ইহার পরেই উনবিংশ শতাব্দীর কথা আসিবে, কারণ যুক্তি

অবসর হইলে উহাই আজকাল অকাট্য প্রমাণ বলিয়া উপভুক্ত হয়। কিন্তু আমরা সাহস সহকারে বলিব, এক-বার নয় শতবার বলিব, যে সত্যতা ছাত্রের তথাপি ঐক্যত্ব অনুমোদন করে তাহা সত্যতা নহে, সত্যতার অপব্যবহার মাত্র।” \* \* \*

“যে ভারতে বিজ্ঞান অভাবে অভিজাত ব্যক্তি সমাজের নিয়ন্ত্রণে অধীন ও বিজ্ঞা প্রভাবে হীন কুলোৎপন্ন ব্যক্তিও অভিজাত শ্রেণীতে উন্নীত হইতেন যে ভারতের বিজ্ঞাবিষয়ি অনন্তসামান্য যশোরাশি জলনিধির উজ্জল তরঙ্গ-মালা লজ্বল করিয়া নানা দেশে পরিব্যাপ্ত—আজিও দেশান্তরিত খ্যাতনামা মনীষিগণ যে ভারতের সেকলে বিজ্ঞান মাধুর্য্যে পরিমুগ্ধ,—

“যোদ্ধাচানঃ স নো মহান্”—

যিনি বিজ্ঞান তিনিই আমাদের মহান্ এই উক্তির নীতি নূর্যে যে ভারতে অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া পরিগৃহীত, সেই ভারত আজ কি না বিজ্ঞান মূল্য বুদ্ধিতে পারে না, বিজ্ঞান আদর করিতে জানে না, বিজ্ঞানের পূজা করা নীচতা মনে করে, ইহা অপেক্ষা শোচনীয় আর কি হইতে পারে! \* \* \* ভাল, বাহার। গুরুত্বপূর্ণতাকে নীচতা জ্ঞান করেন তাঁহাদিগকেই জিজ্ঞাসা করি তাঁহার। উহাকে বিনয়, নম্রতা ও রূপজ্ঞতা প্রকৃতি শব্দে কেন নির্দেশ করেন না? উহাকে বিনয়াদ শব্দে অভিহিত করিয়া প্রাচীন ভারতীয়াদিগের সত্যতা বজায় রাখিতে বাহার। হৃদয়ে আঘাত পান, প্রত্যুত উপাদেয় বস্তুর জঘন্য আখ্যা প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে ঘোরতর অসত্য বলিয়া পরিভূষ্ট হন, তাঁহাদিগকে কি বলিব? তাঁহার। ভাবিয়া দেখেন না যে, ভারতীয় রক্তমাংসে তাঁহাদিগের শরীর, ভারতের গৌরবে তাঁহাদেরই গৌরব। এ যাত্রাঘক রোগের ঔষধ নাই, কেবল জাতীয় উচ্চশিক্ষার প্রবর্তনা ইহার একমাত্র প্রতিকার, জাতীয় বিজ্ঞান উচ্চ মূল্য হৃদয়ঙ্গম করা তাহার উপায়। অহো! ভারতীয় আর্ধ্যগণ যে অর্ধেক

কল্যাণকর্তা বলিয়া নির্দেশ করিতেন নোষ্ট্রের সহিত বাহার। উপমা, কণিক আশু উপকার বাহার। প্রয়োজন, বিজ্ঞা আজ সেই অর্ধের পদতলস্থ ধূলি বিলেহন করিতেছে, হার এ ছুঃখ কাহাকে বলিব? কে ইহার জন্য এক বিন্দু অশ্রু বিসর্জন করিতে প্রস্তুত হইবেন?”

আর কত উক্ত করিব? যে দিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই দেখিতে পাই সুন্দর যুক্তি ও চিত্তাঙ্গুর বাক্যাবলী সজ্জিত, কি সুন্দর নিরপেক্ষ স্বাধীন সমালোচনা। অবশ্য তর্কালঙ্কার মহাশয়ের উপস্থাপিত প্রস্তাব সর্বপ্রাণে সর্বসম্মত না হইতে পারে কিন্তু তথাপি তাঁহার উপন্যাস প্রস্তাবের সমর্থন শক্তি, দেশের একনিষ্ট কল্যাণ-কামনা, বিবেকানুবর্তিতা ও সুস্পষ্টবাদিতা শতকণ্ঠে প্রশংসার যোগ্য।

ছাত্রজীবনের আদর্শ—বর্তমান ছাত্র-জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে তিনি উপসংহারে যাহা বলিয়াছেন আমরা এ স্থানে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া অন্তকার প্রস্তাব পরিসমাপ্ত করিব।

“প্রিয়বস্তুর সৌন্দর্য্য-দ্রষ্টব্য এবং তদীয় গুণোৎকর্ষ সম্পাদন ও দোষোৎসারণের ইচ্ছা মানুষের স্বাভাবিক। এই জন্য বর্তমান ছাত্র-চারিত্রের সৌন্দর্য্য, গুণোৎকর্ষ ও নির্দোষতা সম্বন্ধে অস্তিত্বপণীয়। সুতরাং আর্ধ্য ভারতীয় ছাত্র-জীবন আদর্শ করিয়া বর্তমান ছাত্রজীবনের সংগঠন একান্ত বাঞ্ছনীয়। ‘আদর্শ করিয়া’ বলিতেছি যেহেতু দেশকাল পাত্রানুসারে নিয়মের অবশ্যজ্ঞাব পরিবর্তনের প্রতিকূলে বাগ্জাল বিজ্ঞান নিম্নল। ইদানীন্তন ছাত্রদিগকে পূর্বেই শিক্ষারূপে অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণের উপদেশ দিলে চালাবে কেন? বর্তমান শিক্ষক-মণ্ডলী অল্পোদ্যোগ্যোদ্যোগ্য ছাত্রদিগের উপর অসদত প্রভুত্ব বিস্তার করিবেন, এবং ছাত্রগণ আকৃষি ও উপমহ্যায় ন্যায় উপাধ্যায়ের কেদারধন বন্ধন ও গোরক্ষণ করিবে অধুনা এতাবশ্য অভিলষ কাব্যে পরিণত হইবার আশা অনায়াস। পক্ষান্তরে ইদানীন্তন ছাত্রদিগের বহুদ

জৈ ১৩২১

ব্যবহারও স্পৃহনীয় নহে। তাই বলিতেছিলাম আর্থ্য ভারতীয় ছাত্রজীবন আদর্শ করিয়া বর্তমান ছাত্রজীবনের সংগঠন হওয়া উচিত। ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে সময়োপযোগী বিষয়গুলি নির্বাচন করিয়া লইতে পারেন তথাপি সংক্ষেপে আবশ্যিকীয় কতিপয় বিষয় নির্দিষ্ট হইতেছে।

বর্তমান ছাত্রগণের গুরুায়ত্ততা একান্ত প্রাথমিক। তাঁহাদিগকে গুরু উল্লিষ্ট ভোজন, পাদ-প্রক্ষালন, স্নানাদি করিতে বলিতেছি না, তাঁহারা গুরুর সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হন ইহা ভূয়োভূয়ঃ বলিতেছি। গুরু সহিত একাসনে উপবেশন অসঙ্গত। নীচাসন নীচশয্যা ব্যবহার ছাত্রের কর্তব্য। গুরু নিন্দা বা পরীবারের সংজ্ঞা পর্য্যন্ত তাঁহার পরিহার্য। গুরুর সম্ভাষণাদি কালে প্রাচীন নিয়মাবলীর অনুসরণ অতীব উপাদেয়। গুরুর শুশ্রূষা সর্বথা বিধেয় : ফলতঃ বর্তমান ছাত্রগণ যতদূর সম্ভব গুরুায়ত্ত হন ইহা স্পৃহনীয়। আর্থ্য ভারতীয় ছাত্রদিগের ভোগ্য বস্তুর নিয়মাবলীর অধিকাংশ প্রতিপালন আবশ্যক। বর্তমান ছাত্রগণ হাবষায় ভক্ষণের উপদেশ শুনিলে হাস্য করিবেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের যথেষ্ট অভ্যবহার কোনও রূপে অনুমোদনীয় হইতে পারে না। মদ্য বা মাদক দ্রব্য ব্যবহার তাঁহাদের অবশ্য বর্জনীয়। উত্তেজক দ্রব্যের বহুলোপযোগও অসঙ্গত। পরিমিতাহার একান্ত আবশ্যক। অপরিমিতাহার অধ্যয়নের বিরোধী ও স্বাস্থ্যবিধির নিদান। ভোগ বিলাস স্পৃহা উন্নতন তাঁহাদের প্রেরকর ও অবশ্যাবলম্বনীয়। কারণ আওঁচস্কারক বিষয়ে মনের অভিনিবেশ হইলে কঠোর অধ্যয়নে মনঃসংযোগের শিথিলতা এবাং অপরিহার্য। ছাত্রগণ মনে রাখিবেন অধ্যয়ন ক্রীড়া-বিশেষ নহে

উহা কঠোর তপস্তা। তপস্য। যতাবতঃ ক্লেশজনক স্তবরাং তপস্যা ও সুখাভিলাষ ছায়া ও আতপের ন্যায় পরস্পরবিরোধী। \* \* \* ইত্যপার সংঘর্ষে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, এই উপদেশটি সংকৃত ভাষায় লিখিত বলিয়া উপেক্ষণীয় নহে। পৃথিবীর যে কোনও দূরদর্শী সত্য সমাজ এই উপদেশ প্রতিপালনের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা এই—

“কান্যেন হস্তে শাস্ত্রং কাব্যং গীতেন হস্ততে,  
গীতংচ জীবিলাসেন, জীবিলাসো বৃদ্ধশ্রম্য।”

ঐহার পর ব্রহ্মচর্যের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এই এক মাত্র ব্রহ্মচর্যের অভাব দেশের দক্ষবিধ অনিষ্টের মূল। যাহারা দেশের মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন তাঁহারা ছাত্র সম্প্রদায়ের ব্রহ্মচর্যের সুপ্রতিষ্ঠার যত্ন চেষ্টা করিলে ভাবী মঙ্গল নিশ্চিন্ত। আমরা ‘শিক্ষা’ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় ও তৎসম্বন্ধে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মতামত যথাশক্তি আপনাদের সমীপে উপস্থিত করিলাম, বারাতরে ‘শিক্ষা’র শেষ অংশ ব্যায়াম ও জীশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিব। প্রতিভা কোনও জাতি বা সম্প্রদায়ের নিত্য নিজস্ব নহে, উহা জন্ম ক্রম্যন্তর বা ইহ জন্মের কঠোর তপস্তাগত ফল। তর্কালঙ্কার মহাশয় অতুল প্রতিভা-লোকে যে সত্যের একান পাইয়াছিলেন তাহা তিনি সমস্ত পৃথিবীর সমুখে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, কালের তুল্যদণ্ডে সেই সকল সত্যের সার পরিমাণ ও মূল্য কতটুকু যে নির্দ্ধারিত হইবে তাহা মানুষ ব্যক্তির ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য।

( ক্রমশঃ )

শ্রীকালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্তদ্বীপী।

## একখানি প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্য ও তাহার কবি

আজ আমি যে পুঁথির বিষয়ে আলোচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছি তাহার নাম 'নৈষধ চরিত্র'; কবির নাম মধুসূদন বা মধুকণ্ঠীস। বর্তমান প্রেক্ষে কবির জীবনী সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব। প্রবন্ধান্তরে কাব্যের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া বারান্তরে প্রকাশের বাসনা রহিল।

কবিকে ভাল করিয়া না বুঝিলে কাব্য বুঝা যায় না। ছন্দের বিষয় এই যে, অশ্রুত ভারতীয় কবির জ্ঞান মধুসূদনের জীবনী সম্বন্ধেও অধিক কিছু জানিতে পারা যায় না। তাঁহার রচনা এবং জনশ্রুতি হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া যতটুকু সম্ভব আমরা কবির জীবনী ও বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে নৈষধ চরিত্রের সামান্য উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার নিকটে যে পুঁথি আছে তাহার নাম সম্ভবতঃ 'নল দময়ন্তী'। ইহা গৌরকিশোর ধর নামক জনৈক ব্যক্তির হস্তলিখিত পুঁথি। ১৭০১ শকে অর্থাৎ ১৮০২ খৃঃ অব্দে ইহা

লিখিত হইয়াছিল। আমাদের নিকট যে দুইখানা পুঁথি আছে, তাহার প্রথমখানার লিপিকার রামমোহন দীল। ১২১৫ সনের ৭ই চৈত্র উহার লেখা শেষ হইয়াছে। সুতরাং উহা ইংরেজি ১৮০৮ সনে লিখিত হইয়াছিল। অপর পুঁথিখানা রামপ্রসাদ দাস নামক জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক ১৮১৬ শকে বা ১৭৯৪ খৃঃ অব্দে লিখিত হইয়াছিল। সময় হিসাবে দীনেশ বাবুর পুঁথি হইতে আমাদের বিত্তীয় পুঁথি ১৫ বৎসর পূর্বে লিখিত হইয়াছে।

দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন—“কবি স্বীয় পরিচয় স্থলে বলিয়াছেন—

‘ব্রাহ্মণের দাস নাপিত কুলে ত উদ্ভব।

যাহার কবিত্ব কীর্ত্তি লোকেতে সম্ভব ॥

হস্তক্ষেপ করিতে প্রয়াস পাই নাই। সম্ভ্রান্ত কলিকাতা 'সাহিত্য পরিষদ' পত্রিকায় প্রকাশিত পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের লিখিত “পুঁথির কথা” প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আর নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকা সম্ভব বোধ হইতেছে না। উক্ত প্রবন্ধের উপসংহার ভাগে শ্রদ্ধাঙ্গদ শাস্ত্রী মহাশয় দেশবাসীকে, যেদ্রুপ ভাবে আহ্বান করিয়াছেন তাহাতে প্রাচীন পুঁথি সম্বন্ধে যাহারা একটু আলোচনা করিতে ভালবাসেন তাঁহারা নিশ্চয়ই এড়তা ছাড়িয়া কার্যক্ষেত্রে নামিয়া পড়িবেন। প্রাচীন কবিতা ও গান সংরক্ষণ এবং প্রাচীন প্রসিদ্ধ স্থান সমূহের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ এই দুই বিষয়ে আমার জ্ঞান সমূহের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ এই দুই বিষয়ে আমার জ্ঞান একজন পল্লীবাসী সামান্য ব্যক্তিও একটু একটু চেষ্টা করিতেছে; সুধী-সমাজে ইহার পরিচয় নিতান্ত গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু একান্ত ভয়ের সহিত এই কার্যে অগ্রসর হইতেছি। আশা করি ‘প্রতিভার’ সহায় পাঠক পাঠিকাগণ আমার দুইটা মার্জনা করিবেন।—লেখক।

\* বহু অনুসন্ধানের পর কয়েক মাস হইল 'নৈষধ চরিত্র' নামে একখানি পুঁথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উহার বিষয়ে 'প্রতিভা' পত্রিকায় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া তৎপ্রতি সুধী সমাজের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিব এমন একটা কল্পনা কতদিন যাবৎই আমার মনে জাগিয়াছে। এ বিষয়ে ঢাকা সাহিত্য পরিষদের দুই একজন সভ্য মহোদয়ের সহিতও আলাপ হইয়াছে। কিন্তু আত্ম-শক্তির উপর তাড়ুশী আস্থা নাই বলিয়াই এ বাবৎ উক্ত কার্যে

চৈত্র ১৩৭১

তাহার ভনয় বানীনাথ মহাশয় ।  
পৃথিবী তরিয়া যার কীর্তির বিজয় ॥  
তাহার ভনয় শিষ্য শ্রীমধুসূদন ।  
ভনিয়া প্রচুর কীর্তি উল্লাসত মন ॥

স্মরণ্য দেখা যাইতেছে কবির পিতামহও কাব্য  
লিখিয়া লক্ষ্যণা হইরাছিলেন । মধুসূদনের রচনা  
সরল ও হৃদয়গ্রাহী ; নাপিত কবি বড় একখানা কাব্য  
লিখিতে লেখনী গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কৃত-  
কার্য্যভার কেহ বিজ্ঞপ করিবার সুবিধা পাইবেন না—

( বলভাষা ও সাহিত্য, ২য় সংস্করণ ৪১ পৃষ্ঠা )

অনন্তর দীনেশবাবু কবির সত্যাব বর্ণনা সম্বন্ধে করেন  
লাইন উদ্ধৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন ; জীবনী সম্বন্ধে  
কিছু উল্লেখ করেন নাই ।

আমাদের প্রথম পুঁথির লিপিকারেব নিবাস ঢাকা-  
জেলার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অধীন পাঁচকুশি  
গ্রাম । দ্বিতীয় পুঁথির লিপিকারেব নিবাস উক্ত মহকুমার  
অন্তর্গত কাকন গ্রাম । প্রথম পুস্তকে কবির পরিচয়  
হলে এরূপ লিখা আছে—

‘শ্রীমধুসূদন কহে শুন দেবরাজ ।  
দেশ গ্রাম বঙ্গিলাম পুস্তকের মাঝ ॥  
তপে কাঠারব সহর দৌলতপুর ।  
পূর্বভাগে লৌহিত্য পশ্চিমে অন্তলপুর ॥  
লৌহিত্য পশ্চিমভাগে নানাধির গ্রাম ।  
এগার পুরুষ ভট্টাচার্য্য শিবরাম ॥  
স্বতি শায়ে পারগ ব্যাসের সম আভা ।  
পণ্ডিত মণ্ডলি হান শ্রীমন্ত যে সভা ॥  
তাহার পশ্চিম পথ ক্রোশেক প্রমাণ ।  
চেলান চৌখণ্ড ভূমি বিচিত্র নির্মাণ ॥  
তথা বৈসে মধুকর্ত্ত কবিষে পণ্ডিত ।  
উপনীত বৈভবভূতি আশ্রমে নাপিত ॥  
তাহান রচিত গীত নৈবধ চরিত্র ।  
তনিতে আনন্দ হয় অত্যন্ত বিচিত্র ॥’

দ্বিতীয় পুঁথিতে কবির পরিচয় এরূপ লিখিত আছে—

“ভণিত পুস্তক শ্রীমধুসূদন রাজ ।  
দেশগ্রাম বঙ্গিলাম পুস্তকের মাঝ ।  
তপে কাঠারব সহর দৌলতপুর ।  
পূর্বভাগে লৌহিত্য আশ্রম কতদূর ॥  
লৌহিত্য পশ্চিম তীরে নানাধির গ্রাম ।  
এগার পুরুষ ভট্টাচার্য্য শিবরাম ॥  
সর্বশাস্ত্র সমাক্রমি ব্যাস সম আভা  
পণ্ডিত মণ্ডলি হানে শ্রীকর্ত্তের সভা ॥  
তাহার পশ্চিম পথ ক্রোশেক প্রমাণ ।  
চেলান চৌখণ্ড হান বিচিত্র নির্মাণ ॥  
তথা বৈসে মধুকর্ত্ত কবিষে পণ্ডিত ।  
উপনীত বৈভবভূতি আশ্রমে নাপিত ॥  
তাহান রচিত গীত নৈবধ চরিত্র ।  
তনিতে সুশ্রাব্য বেন রামায়ন গীত ॥

ইহাতে নিশ্চতরূপে প্রতিপন্ন হয় যে, মধুসূদনের  
বাসভূমি ‘চেলান’ গ্রামে ছিল । ইনি ভিষগবৃত্তি অবলম্বন  
করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন । নানাধী গ্রাম  
নিবাসী পণ্ডিত শিবরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় বোধ হয়  
তাহার অধ্যাপক ছিলেন । তপে ‘কাঠারব’ বারা  
যোগল শাসনের একটা পরগণা স্থচিত হইরাছে ।  
বর্ত্তমান সময়ে নারায়ণগঞ্জ সুবডিভিসনের অনেক স্থান  
তপে কাঠারব পরগণার অন্তর্ভূত । সহর দৌলতপুর  
কোথায় ছিল এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত  
হইতে পারিনাই ।\*

বোধ হয় পূর্বাঞ্চলে নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্ত্তী  
কোনও স্থানে এই সহর বা রাজস্ব সংগ্রহের স্থান ছিল ।

\*স্ববর্ণ গ্রামের ইতিহাস লেখক শ্রীযুক্ত বরুণচন্দ্র রায়  
ও ঢাকা মিউজিয়ামের কিউরেটর ( curator ) শ্রীযুক্ত  
নলিনীকান্ত ভট্টাশালী M. A., মহাশয়কে এই বিষয়ে  
জিজ্ঞাসা করা হইরাছিল, তাহারা কোনও নিশ্চিত উত্তর  
দিতে পারেন নাই ।

‘মৌহিত্য’ ব্রহ্মপুত্রেরই অন্য নাম। বর্তমান সময়ে অট্টবী নাম উপলক্ষে লাললবঙ্গ নামক যে স্থানে দেশ বিদেশ হইতে তীর্থ-বাত্রীর সমাগম হয়, উহা ঐ মৌহিত্যের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। সুবিখ্যাত ব্রহ্মপুত্র-নদের এক শাখা এক সময়ে ঐ পথে প্রবাহিত হইত। অতীত উহা বঙ্গপরিষর ও শুষ্কপ্রায়। লাললবঙ্গ হইতে তিন চারি মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তীরে নানানী নামক গ্রাম। মধুসূদনের অধ্যাপক শিবরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার সুযোগ্য বংশধরগণ এখন ঐ স্থানের অল্প দক্ষিণে গঙ্গামীষাট নামক স্থানে বাস করিতেছেন। নানানী হইতে প্রায় দুই মাইল পশ্চিম দিকে চেলান গ্রাম এখনও বিজ্ঞান, কিন্তু দুঃখের বিষয় তথায় মধুসূদনের বাস্তুভিটার চিহ্নবাত্তও নাই।

মধুসূদন কোন সময়ে বিজ্ঞান ছিলেন তৎসম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। তিনি শিবরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সমসাময়িক ছিলেন। ভট্টাচার্য্য পরিবারের বংশতালিকা হইতে অনুমান করা যায় যে, তিনি প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন। এই হিসাবে মধুসূদন ২০০ বৎসর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলা বাইতে পারে। মধুসূদনের পাঁচ পুরুষ অষ্টম বংশধর দাণ্ডবৈভ্য প্রায় ১০০ বৎসর হইল কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। এই হিসাবেও মধুসূদনকে ২০০ বৎসরের পূর্ববর্তী বলা বাইতে পারে। তাঁহার বংশাবলী নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বাণীনাথ  
|  
মধুসূদন বা মধুকর্ক  
|  
ককির চাঁদ  
|  
অগস্ত্যরাম  
|  
সোনারাম

দাণ্ডবৈভ্য

( কত ) চক্কল

দাণ্ডবৈভ্যের তিনটা কন্যা ছিল, পুত্রসন্তান ছিল না। সুতরাং তাহার পর হইতেই মধুসূদনের বংশ লোপ হয়। কিন্তু আমাদের এ অকালে তাঁহার জাতিগণের বংশধর এখনও বিজ্ঞান আছেন। দাণ্ডবৈভ্যের দৌহিত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ এখনও জীবিত আছেন। মধুসূদনের পূর্বপুরুষ ও বংশধরগণ প্রায় সকলেই চিকিৎসক ছিলেন। সুতরাং দাণ্ডবৈভ্য মহাশয় এদেশে দাণ্ডবৈভ্য নামে পরিচিত ছিলেন। চেলান গ্রামে দাণ্ডবৈভ্যের বাস্তুভিটা এখনও বর্তমান আছে। সেখানে এখনও একজন ‘নাথ’ জাতীয় গৃহস্থ বাস করেন।

চেলানের নিকটবর্তী দেওয়ানবাগ নামক স্থান ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। কিছুদিন হইল ঢাকা বিভাগের সুযোগ্য সুল ইন্সপেক্টর মিঃ ষ্টেপলটন সাহেব মহোদয় ( Mr. Stapleton ) দেওয়ানবাগে জৈশাখী মসজিদ আলীর কয়েকটা কামান আবিষ্কার করিয়াছেন। দেওয়ানবাগে জৈশাখীর বংশধর মনোয়ার খাঁ রাজধানী ছিল। দাণ্ডবৈভ্যের পূর্ব পুরুষগণ মনোয়ার খাঁ ও তাঁহার বংশধরগণের গৃহ-চিকিৎসক ছিলেন। সম্রাট আরজেবের রাজত্ব সময়ে মনোয়ার খাঁ জীবিত ছিলেন। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যায় যে, নানানীর ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণের নিকট শিক্ষাজাত করিয়া এবং মুসলমান শাসনকর্তৃগণের নিকট সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াই মধুসূদন ও তৎসংশ্লিষ্টগণ অক্ষর-কীর্তি অর্জন করিয়া গিয়াছেন।

মধুসূদনের জীবনী সম্বন্ধে আমরা বতবুজ জানিতে পারিয়াছি তাহা প্রকাশ করিলাম। সহস্র পাঠকবর্গের নিকট একান্ত অনুরোধ এই যে, তাঁহারা এ বিষয়ে যদি আরও অধিক কিছু জানিয়া থাকেন, অথবা বর্তমান প্রবন্ধে কোন ভ্রমপ্রবাদ লক্ষিত হয় থাকে তাহা অনুগ্রহপূর্বক প্রকাশ করিবেন। কথিত আছে যে, মধুসূদন, তাঁহার পিতা অথবা পিতামহ ‘নৈবধ বিজয়’ ‘অগস্ত্য বিজয়’ ‘ব্রহ্মপুত্র বাহাদুর’ ও ‘নাথব সুনৌচনা

কাব্য' ইত্যাদি আরও কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করেন। সাহিত্যসেবী ব্যক্তিমাত্রেয় নিকটেই আমাদের এই বিনীত নিবেদন যে, ঐ সকল পুস্তক সম্বন্ধে কোনও সংবাদ প্রেরণ করিলে আমরা নিতান্ত বাঞ্ছিত হইব।

কবিরাজ শ্রীমদনমোহন শীল দাস  
কবিরঞ্জন।

## ৮লক্ষ্মীনারায়ণের ব্রত

কার্তিক মাসের সংক্রান্তি দিন যখন কার্তিকেয়ের পূজা হয় তখন ২১ ছড়া আমন ধান ( শাইল ধানও দেওয়া যায় ) আর পাঁচটা খুঁচিখুঁচি ( ছোট ঘট, ছিদ্রিঘটিও বন্দে ) কার্তিকেয়ের মূর্তির নিয়ে রাখিতে হয়। তাহার পর যে হাঁড়িতে উক্ত কার্তিকেয়ের পূজার অতপ চাউল দেওয়া হয় তাহা শূন্য করিয়া তাহাতে উক্ত ২১ ছড়া ধান ও পাঁচটি খুঁচিখুঁচি রাখিতে হয়। তৎপর অগ্রহায়ণ মাসের প্রত্যেক রবিবার ২১ গাছ দুর্লভ হাতে লইয়া, উক্ত পাত্রটির নিকট বসিয়া, ৮লক্ষ্মীনারায়ণ ব্রতের কথা কহিতে হয়। শেষে মাঘ মাসে বা বৈশাখ মাসে পূজা হইয়া থাকে। পূজার সময় পূর্বের সংগৃহীত ধান ও হাঁড়ির আবশ্যক হয়। ঢাকা জিলার উত্তর পশ্চিম অংশে এই পূজার খেলা প্রচলন।

### ব্রতের কথা

এক ভিক্ষুৎ পিরহ বামন আছিল। দুইটা মাইয়া খুইয়া বউটা মৈয়া গেল। মা মৈয়া যাওনে কত দুইটা করে কি ; ভিক্ষা শিক্ষা করিয়া আওলা খায় আলুনি খায় ঢগর ঢগর পানি খায়। কেচরা ফুল, কল্মি ফুল দিয়া ৮লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা করে। সেই কত দুইটার মধ্যে একটার নাম রমুনা, আর একটার নাম রমুনা। রমুনা বড়, রমুনা

ছোট। রমুনা যে, সে বড় আকর ( বোকা, বুদ্ধিশূন্য )। রমুনা যে, সে বড় চালাক। তারা বাপের কষ্ট দেখিয়া বড় দুঃখী ছিল। রমুনা রমুনারে কইল, “দিদি ল পরে নিলেও নিব, যমে নিলেও নিব। লও বাবার আধসের চাউলের খিত ( স্থিতি ) কৈরা খুইয়া বাই। রাজা যে সত্য করছে যার মুখ দেখবে তার নিকটেই কত দান করবে, লও বাবারে হেই খানে পাঠাই।” তখন তারা বাবারে কইল, “বাবা তুমি ফোটাফাটি কইরা রাজ-বাড়ী যাও না?” তখন ভিক্ষুৎ বামন কইল, “মাগো আমার তিন কাল গেছে আর এক কাল আছে আমি আর বিয়া করুম না।” মাইয়াক কথায় শেষে রাজবাড়ীতে যাইতে স্বীকৃত হইল। বামন রাজবাড়ী যাইয়া ভিক্ষা চাইল। ভাণ্ডারী ভিক্ষা আনবার জন্য রাজার কাছে গেল। রাজা মশয় ভাণ্ডারিগরে কইল, “বামনের বসবার দেগা।” তারপরে রাজা মশয় আইয়া কইল, “ভিক্ষুৎ বামন তুই বিয়া করস না? আমার মাইয়া বিয়া কর।” বামন কইল, “না আমি বিয়া করুম না; আমি বুড়া।” রাজা কইল, “না, তুই বুড়া না, পক্ষতের চূড়া। এ কথা কে শুনে কে জানে—তোর বিয়া করতাই হইব।” রাজার কথায় বামন বিয়া করল। বিয়া কইরা দুঃখের মধ্যে সুখ পাইল। তার সেয়ানা ( যুবতী ) মাইয়া দুইটার কথা একেবারে ভুলি গেল। মাইয়া দুইটার

আওলা খায় আলুনি খায়।

ঢগর ঢগর পানি খায়।

কেচরা ফুল কল্মি ফুল দিয়া পূজা করে তারপর ৮লক্ষ্মীনারায়ণ সেই বামনের বাড়ীর কথা স্মরণ করাইয়া দিল। তখন ভিক্ষুৎ বামন রাজার কাছে কইল, “আমার দুইটা মাইয়া খুইয়া আইছি আমি বাড়ী যাব।” রাজা মশয় কইল, “হাপ (সাপ) যথায় ছেঁড়ও তথায়।” বামন পাখী কইরা বাড়ী আইল। সঙ্গে অনেক লোক-জন আইল। দেখের লোকে বলতে লাগল, “রমুনা রমুনা ল তোর বাপ বিয়া কইরা বউ লইয়া



বাড়ীতে মাইবার লইছে।” তারা কইল, “অনেক দিন ধইরা বাবা বাড়াত খেনে গেছে, রাজা কি কইটাই মারল, না কি করল বুঝলাম না। বাবা আমাগ ফালাইয়া এক দিনও কোনখানে থাকে না; সেই বাবা ১২ বছর ধইরা রইছে—আমাগ কথা একবার মনেও করে না।” তারপর বাড়ী আইলে তারা বলল, “বাবা তুমি এতদিন ধইরা আমাগ ছাইড়া রইছ, আইজ একরাত্র বাড়ী থাক।” বামিন কইল, “মাগ, আমি সেই সময় ত কইছিলাম আর বিয়া ককম না।” কত্ভাগ কথা বামিন বাড়ী থাকি। রাজার বাড়ী খেনে যে লোকজন আইছে তার খাওয়ার যোগার করল। এদিকে লক্ষ্মীনারায়ণের ব্রতের ফলে রমুনা রমুনা একজনের পাতে ভাত দিতে একশ জনের পাতে পড়ত। এক জনের পাতে ডাইল দিতে একশ জনের পাতে ডাইল পড়ত। রাজার লোকজন বেশ পরিতুষ্ট হইয়া খাইয়া রাজবাড়ী চইলা গেল। রাজা মশয় বিজ্ঞাপ করল, “মাগুবজন, তোরা ভিক্ষুং বামনের বাড়ী কেমন খাইলি,” তারা কইল, “রাজা মশয় ডরাইয়াও কমু না, না ডড়াইয়াও কমু না। নিভয়ে নির্ভয়ে কমু; “তোমার রাজ-সরকারেও এত খাই নাই।” তারপর একমাসে কানাকানি, সাতমাসে জানাজানি। বামনের এত সুখ ছাওলা হইল। মাইয়া দুইটা ভাইডারে লইয়া পূজা করে। এখন হামুড়া হিচ্ছে (শিখছে) বেবাক (সকল) ফেইলা দেয়। কত্ভারা কইল, “ওগো সতাই ভাইয়েরে টান দেও, আমরা পূজার সকল কাম করমু।” “কি আমার বাপে পূজা করে কত হাতী দান করে, কত ঘোঁড়াদান করে। এগুলো কি লো, আঙলা খায় আলুন খায়, ঢগর ঢগর পানি খায়” রাজ-কত্ভা পোলারে মাইয়া ধইরা বাপের বাড়ী খবর দিল। সেইখান থিকা পাকা আইয়া পোলারে লইয়া গেল। ষায় কতদিন বামনের, আর ভাল লাগে না। নিত্যি ভিক্ষা করে। এইদিন বামিন পোলা আনবার গেল। রাজা কইল, “তর মাইয়া দুইটা বনে দে। তবে সে দুই পোলা

নিতে পারবি।” বামিন মাইয়াগ কাছে রাজার কথা কৈল। মাইয়ারা কৈল, “পরে নিলেও নিব বনে নিলেও নিব। ভাইয়েরে বাড়ী আন। আমাগ বনে দেও।”

তারপর বামিন পোলা বাড়ীতে আনল। বামিন মাইয়া দুইটারে কৈল, “মাগো ভোগ কি খাইবার মনে লয়।” তারা কৈল, “ভাল মাছের কোল খাই না, পিঠা পরমাণি কি তা জানি না।” বামিন ভিক্ষা করিয়া একটা বড় চিতল মাছ আনল। ধান শুকাইয়া পরমাণি করিল। সতাই দুই মাইয়ারে বিছানা কৈরা খোয়াইয়া খুল। মনে ভাবতে লাগল, “ভিক্ষুং বামিন বাড়ী আইতে আইতে তারাত উঠব অনে (উঠিবে)। উইঠা পোড়াটা দেও ছেচরাটা দেও এই কইবে। যেইর লাইগা এত কৈরা খাওয়াইলাম, এত কৈরা দিলাম, ছাইকপালীরা এত খাইলেনও উঠব অনে” কত্ভারা কৈল, “তুমি সতাই এত গাইল পার কে (কে=কেন)। যে পর্যন্তে আছি করমুই। শেবে তুমি যা মন লয় কইর।” তারপর ভিক্ষুং বামিন বাড়ী আইল। রমুনা বাপেরে সন্ধ্যা করবার লজ ছিপ কোষা দিল। সতাই দেইখা কচ, “কিলো, ছাইকপালীরা দেখি উঠছে।” বামিন কইল, “মা তোমরা শুইও না।” বামিন দুই কত্ভারে হাটুর উপর বসাইয়া আর না আর না করিয়া খাওয়াইল, কইল, “কাল মাসী পিসীর বাড়ী যাইও।” তারা কইল, বামু। “মার কালে আছিল না মাসী পিসী, সতাইর কালে দেখি মাসীপিসী।” তারপর রাইং থাকতে উঠল। বাপেরে ডাক দিল। “বাবা লও যাই মাসী পিসীর বাড়ী।” তারপর লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা না কইরাই ভাড়া ভাড়ি চলিয়া গেল। ইহাতে লক্ষ্মীনারায়ণ তাগরে অভিশাপ দিল। সেই শাপে তাগ এই হইল—যে কিনিস লইতে চায় তাই এক রকমে না এক রকমে নষ্ট হইয়া যায়। তারা পথে বাইতে নল ভাঙে জল খায়, খাগর ভাঙে শাস খায়। কত্ভা দুইটা বাবারে কইল, “আর ত হাটবার পারি না।” বামিন কইল, “ঐ যে ওয়া গাছ (সুপারি গাছ) দেখা যায় ঐ ভোগ মাসীর বাড়ী, ঐ যে



চৈত্র ১৩৭১

ভালগাছ দেখা যায় ঐ ভোগ পিসীর বাড়ী।” “আর বড় বেলা নাই আমাগ ঘুম আসে।” ইহা শুইনা ভিক্ষুৎ বামন সেই জমলে বইসা দুই হাটু পাইতা দিল তার মধ্যে কতারা ঘুাইল। বামন দুইটা ইটার ঢাকা ভাগ মাথার তলে দিয়া বাড়ী চইলা গেল। হাপে ( সাপে ) সোবার, বাঘে ডাকে, তা হইনা মাইরা দুইটার ঘুম ভাঙ্গল। রমুনা কইল, “উঠ ছে রে রমুন—দেখ ছে বাবারে সাপে ঝাইল না বাঘে ঝাইল।” রমুনা কইল, “হাপেও ঝায় নাই বাঘেও ঝায় নাই। বাবা সতাইর বুঝ আমাগ বনে দিছে।” রাইত পোয়াইল। আইলারা ( কৃষকগণ ) ধান কাটবার লইছে; মাইরা দুইটা কইল, “ভাই আমাগ ২১ ছড়া ধান দিবা।” এই কথা কইবার পর তাগ খেত (ক্ষেত্র) আঙনে পুইড়া গেল। তারা তাগরে মাইরা, ধইরা, কিলাইরা, শুতাইরা খেদাইরা দিল। একজন তেঁতুল পারবার লইছিল, তার কাছে গিয়া কইল, “ভাই আমাগ কয়েক ছড়া তেঁতুল দিবা? আমরা ৬লক্ষীনারায়ণের পূজা করমু।” এই কথা কইবার পর তার সকল তেঁতুল কাপারা কুনারা (মট) হইরা গেল। সেখানেও কিল শুতা ঝাইল। তার পর কুমার বাড়ী গিয়া এটা খুচিনুচি চাইল। কুমারের পুইন (পাভিল কলস যেখানে পোড়া দেয়) কুইট্যা গেল। কুমারও মাইরা ধইরা খেদাইরা দিল। তারপর গেল কেচরা ফুল ও কলমী ফুল তুলতে। যে ছিল আটু (হাটু) জলে সে গেল বুক জলে। যে ছিল বুক জলে সে গেল অথাই জলে (সাঁতার জলে)—অতিকষ্টে তুলল। ফুল তুলিলা ৬লক্ষীনারায়ণের পূজা করল। তারপর আইলার কাছে গেল। আইলারা কইল, “মা আইছ, ধন আইছ, বত পার হেত (ভত) নেও।” তারা কইল, “দিবার আইছি না; দিবার আইছি, কইল যে দিছ, তা (ভাষা) শোধ দিবার আইছি।” তারা একশ ছড়া ধান দিল। আইলারা সমস্ত ধান নিয়া ভিক্ষুৎ বামনের বাড়ী দিল। ভিক্ষুৎ বামন মনে মনে কইল—“আমার বে দুইটা বউনা (বত) মাইরা আছে তারা ৬লক্ষীনারায়ণের

পূজা করবার লইছে, এইতে (এইজন্য) এত ধান আমার বাড়ী আসছে।” তারপর তেঁতুল আলার কাছে গেল সেও কইল, “মা আইছ না ধন আইছ, বত পার হেত নেও।” তারা কইল, “নিতে আইছি না, দিতে আইছি, কইল যে দিছিল তা শোধ দিবার আইছি।” এই কইরা তারা কয়েক ছড়া নিল। সেই সমস্ত তেঁতুল নিয়া ভিক্ষুৎ বামনের বাড়ী দিয়া আইল। এইমত কুমার বাড়ীতেও গেল। একটা চাইরা শতটা খাটি পাইল। শেবে গেল কেচরা কলমী ফুল তুলতে। যে ছিল অথাই জলে সে আইল বুক জলে। যে ছিল বুক জলে সে আইল আটু জলে। তারা অনেক ফুল তুলল। সেইখানে দেখল কি মোহরের মাইট (মটক) আছে। তারা সেইটা লইয়া বাপের কাছে গেল। বলল কি—“বাবা আমাগ সোণার ৬লক্ষী-নারায়ণের মূর্তি বানাইরা দেও। সোনার খুচিনুচি বানাইরা দেও। একটা ভিন্ন কুইড়া (কুটীর) ঘর বানাইরা দেও। আমরা এইটাতে থাকমু।” তখন সতাই দেইখা কইল, “ও মা এই কিলো। এইগুলারে হাপেও ঝায় নাই, বাঘেও ঝায় নাই।” তখন তারা কইল, “কি সতাই বক কে (কেন)? আমরা থাকবারও আসি নাই, ঝাইবারও আসি নাই। বাবার কাছে দুইটা কথা কইবার আইছি।” তারপর তারা আবার বনে চইলা গেল। সেখানে গিয়া রাখাল পোলাপানেরে কইল, “আমরা একটা টাকা দিবনে আমাগ একটা কুইড়া ঘর বানাইরা দেও।” তারা দেখাদেখি ঘর বানাইরা দিল। কয়েকদিন গেলে পর তারা নল ভাঙ্গে জল ঝার, খাপর ভাঙ্গে শাস ঝার। ৬লক্ষীনারায়ণের পূজা করে। এই ভাবে তাগ দিন ঝার। ৬লক্ষীনারায়ণ মনে তাবল “আমি এই তাগরে কতদিন পহর (পাহাড়া) দিমু।” তখন এক দেশের একরাজারে শিকারের কথা শরণ করাইরা দিল। হেই (সেই) রাজার পাটরাঙ্গী ছিল সাত জন। তাগর আলার রাজা সব সময় অস্থির থাকত। রাজা কইলেন,

“সন্ধিকারী (বোধকরি মন্ত্রী) চল আবার শিকারে বাই।” সন্ধিকারী বিরা করে মাই। রাজার লগে শিকারে আইল। শিকারও হৈল না শুকারও হৈল না। এখন (এখন) তারা জল পিপাসায় প্রাণে মরে। রাজা মজের লোকজনরে কইল, “দেখ মাজুস জন, আমাগ হুইটা খোয়া নিয়া তোমরা দেখ কৈ জল আছে। আমরা হুই জন এই জাগার থাকি।” লোকজনে দেখল অনেক দূরে চিল কাউয়া উড়তেছে। হেখানে গিয়া দেখে যে সামনে দীঘি পাছে দীঘি, তার উপর হুই ঠাং (হুইপদ) খুইয়া সোনার ডাং (লাঠি) হাতে নিয়া ৬ লক্ষ্মীনারায়ণ বইসা আছেন। লোকজন চল আনতে হইছে এমন সময় ৬ লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুর বল্ল, “এই জাগার জল পাবি না।” লোকজন কইল, “আমাগ রাজা ও সন্ধিকারী জল পিপাসায় মরতেছে।” ঠাকুর কইল, “মরুক আর বাচুক তাতে আমার কি? ঐ যে দেখ হুইটা কড়া বইসা আছে বায়া মাথা চাওয়াচাওয়া (পরস্পরের মাথা হইতে উকুন আনা) করিতেছে তাগর কাছে বাও। তারা তোমাগ জল দিবে।” তারা কড়ার কাছে গেল। মাইয়ারা ভিজসা করল, “তোমরা আচরনী না অ-আচরনী (বাহাদের জল ব্যবহার করা যার তাহারা আচরনী, বাহাদের জল পান করা যার না তাহারা অ-আচরনী)।” তারা কইল, “আমরা আচরনী। যেয়েরা ২০ আড়াই হাত চুল মাইগা জল ভইরা দিল। ঐ জল রাজা খাইল, সন্ধিকারী খাইল, পাইক শাইক (সিপাহী) সকলে খাইল। যে জল গারু (কারি) সেই জল গারুই রইল। যে ভায়গার সেই জল গারু পড়ল সেখানে পুড়রনী হৈয়া গেল। রাজাও সন্ধিকারী কইল “ঐ মাজুসজন তোরা কি জানস।” তারা কইল, “আমরা কিছু জানি না। হুইটা কন্য়ার আমাগ জল দিছে।” রাজা সন্ধিকারী লোক জনের লগে সেই কন্য়ার কাছে গিয়া হাজির হইল। গিয়া দেখে তারা মাথা চাওয়াচাওয়ি করিতেছে। তারা (রাজা ও

সন্ধিকারী) তাগর চুল ধইরা কইল, “তোরা কুত না প্রেত?” তারা কইল, “আমরা কুতও না প্রেতও না।” ইয়া (ইহা) শুইনা (অর্থাৎ পরিচয় পাইয়া) রাজা ও সন্ধিকারী ভিজুৎ বামনরে হুই বাচী ভইয়া টাকা দিয়া রাজা বমুনারে, সন্ধিকারী বমুনারে বিয়া করল। কয়েক দিন পর বমুনার পোলাপান হইল। বমুনা বা কর্ত্ত সতীনগ জালায় তা সামাই (সামলান, ঠিক রাখা) হইত না। সন্ধিকারীর বউ (বমুনা) বা কর্ত্ত তা সামাই হইত। একদিন বমুনা ৬ লক্ষ্মী নারায়ণের পূজা করবার লাইগা পোলা সতীনগ কাছে খুইয়া পূজার বেবাক (সকল) আরোজন কইরা লইছে, এমন সময় সাত সতীনে বৃত্তি কইরা পোলা ছাইড়া দিল। পোলা পূজার জিনিস লওতও করতে লাগল। তখন বমুনা পোলারে মধম খামে (বয়ের মধ্যে একটি খামকে জ্রীলোকগণ সময় সময় পূজা দিয়া থাকেন। কোনও মাসলিক অমুঠানে সেই খামকে প্রণাম করিতে হয়, কোন স্থানে বাইতে হইলে সেই খামকে প্রণাম করারও প্রথা আছে) বাইকা পূজা করতে লাগল। রাজা আইসা দেখে রাগে লাধি দিয়া পূজার জিনিস সকল ফালাইয়া দিল। এর লাইগা ৬ লক্ষ্মীনারায়ণের কোপে রাজার সকল রাজ্যসম্পদ নষ্ট হইয়া গেল। রাজা সন্ধিকারীয়ে ভিজাস করল, “আমিও বোনা কড়া বিয়া করছি তুমিও বোনা কড়া বিয়া করছ, তবে আমার কেন এত দুখ তোমার কেন এত দুখ।” এই বইলা রাজা সন্ধিকারীকে কইল, “তুমি আমার বোনা জ্রী আর তার পোলাটারে কাট, আমি তাগর রক্ত দিয়া স্নান করবু।” এই হইনা সন্ধিকারী মহা বিপদে পড়ল। রাজা জ্রীয়ে ও পোলারে কাটবার অস্ত্র সন্ধিকারীর হাতে দিল। জ্রী কইল, “এখন বা রাজা বতিচ্ছর হইছে, পরে আপনোম করব। এখন বিলাই কুতা কাইটা তার রক্ত দিয়া রাজারে স্নান করাও।” সন্ধিকারী তাই করল। রাজা মনে করল—“তার জ্রী পূজা গেছে।” এই দিকে বহু কষ্টে

মে ১৯২১

রাজার জী তিচ্ছা কইরা খাইতে লাগল। একদিন তার গোলা দিয়া মাসীর সঙ্গে (যমুনার সঙ্গে) দেখা করল। মাসী তৈন্‌পোরে চিনতে পাইরা পরম বস্ত্র করতে লাগল। ৩৯শ্রীনারায়ণ ঠাকুর, পথে, ঘাটে, মাঠে রাজা যেখানেই যায়, তার নানা বিয় বিপদ ঘটাইতে লাগল প্রাণে মারল না।

রাজা তখন মনে মনে ভাবতে লাগল, “যে দিন আমি ৩৯শ্রীনারায়ণের পূজা নষ্ট করছি। সেই দিন খেইকা আমার কপাল ভাঙছে আমি আবার ঠাকুরের পূজা করবু।” এই বইলা যখন রাজার স্মৃতি হইল, তখন ঠাকুরের কোপ গেল। রাজারও জীপুত্রের কথা মনে হৈল। শেষে রাজা ভক্তিভরে ঠাকুরের পূজা কইরা হারিধন সকল পাইল।

অখন রাজা পূর্ব সম্পদ পাইয়া মহা ধুমধামে পূজা করল। দেখাদেখি দেশময় পূজা প্রচার হৈল। এই পূজার ফলে সন্তানাদির মঙ্গল ও লক্ষ্মীর রূপা হইয়া থাকে।

শ্রীমহিমচন্দ্র নন্দী।

## লক্ষ্মী-চরিত্র

(ঢাকা সাহিত্য পরিষদে পঠিত)

লক্ষ্মী হিন্দু জাতির সুখ-সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। একজ্ঞ লক্ষ্মীর রূপকল্পনার ঐশ্বর্যের অপূর্ণ সমাবেশ। তিনি গজতন্তু হেমকুন্তলিনিস্ত স্নিগ্ধ সলিলস্রোতা; সুপ্রফুল্ল কমল সকল তাঁহার হস্তে শোভা পায়; বহুবল্য রত্ন সকল তাঁহারই অধিকারে—ভড়েছু ঐশ্বর্যবান মানব সতত কমলার রূপা ভিখারী। বজ্র সমাবেশে ঐশ্বর্যবান লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইলেও বাঙ্গালীর চির অশান্তিময় জীবন মরুপথে একটি সুখশীতল পাহাশালা আছে। সেইপাহাশালার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মঙ্গল, হস্তের স্পর্শে বাঙ্গালী জীবন-সংগ্রামের সমস্ত আঘাতের কথা বিস্মৃত হইয়া অপূর্ণ

শান্তিমাগরে ডুবিয়া যায়। বঙ্গবাসী বিশ্ব খুঁজিয়া এ শান্তির উপমা পায় না। এত প্রেম—এত ভালবাসা—এত আত্মদান বাঙ্গলার কুটীরবাসিনী জননীগণ ব্যতীত আর কার হৃদয়ে সম্ভবে! একজ্ঞই বাঙ্গালী গৃহশান্তি-বিধায়িনী জননীগণকে ভক্তির চক্ষে দর্শন করেন। দিবা দ্বিপ্রহরে শ্রান্তদেহে গৃহপ্রত্যাগত বাঙ্গালী শ্রমজীবী যখন দেখে তাহার জ্ঞাত সুখান্ত অন্ন ব্যঞ্জন লইয়া এক দেবী পথ-পানে চাহিয়া আছেন, তখন তাহার সমস্ত অবসাদ বিদূরিত হইয়া যায়। রোগশয্যাশায়ী বাঙ্গালী যখন দেখেন, তাহার পার্শ্বস্থিত এক দরাময়ী দেবী অনন্য দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে, দৃষ্টিতে অনন্ত কল্যাণ-কামনার ভাব ব্যক্ত—দারিদ্র্যের ঘোর নিশেষণে আত্মহার্য বাঙ্গালী যখন বুঝেন তাঁহার চুঃখের সম-ভাগী বর্তমান আছে, তখন বাঙ্গালী সর্বমঙ্গলা জননী-জাতির প্রতি কৃতজ্ঞতার মন্তক নত করেন।

বঙ্গদেশে তথা ভারতে নারী জাতির প্রতি যত সম্মান জগতের আর কোথাও তেমন নাই। ভারতবাসী সেবার্থ্য ভালবাসেন, ও জীজাতির সম্মান আমেন একজ্ঞ ভারত-সন্তান সতী জননীগণের পবিত্র নাম অরণ্যস্তর প্রভাতে শয্যাভ্যাগ করেন। বঙ্গ দেশে এক প্রেণীর লোক আছে তাহারা অতীতকাল হইতে ধারে ধারে জীজাতির চরিত্র কর্তন করিয়া আসিতেছে। এই কর্তনের মধ্য দিয়া মহিলাগণ তাঁহাদের গার্হস্থ্য কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া লন। তাহারা যখন সুর তুলিয়া গান করিতে আরম্ভ করে, কুলবালাগণ হস্তের কার্য পরিত্যাগ করিয়া তখন বাঁশরীতানমুখ। হরিণীর ডায় নিষ্কল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকেন। এই গান “লক্ষ্মীচরিত্র গান” নামে খ্যাত। কখন কখন বৃদ্ধা পিতামহী নাতিনী দিগকে লইয়া সন্ধ্যায় সকালে এই গানের আলোচনা করিয়া থাকেন। যে রমণী সাধারণপদসেবিকা কমলার ডায় স্বীয় স্বামীর সেবা সম্পাদন করেন, জননী স্বয়ং তাঁহাকে নিজতুল্যা বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

আমরা প্রায় ১২৫ বৎসরের পূর্বে হস্তলিখিত একখানা “লক্ষ্মী-চরিত্র” পুথির আলোচনা সহকারে সমাজে লক্ষ্মী-চরিত্রের উপযোগিতা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব। এই পুস্তকখানা কখন রচিত হইয়াছে ঠিক জানা যায় না। কারণ উহাতে গ্রন্থ রচনার কাল ও গ্রন্থকারের পরিচায়ক কোন বর্ণনা দৃষ্ট হয় না। গ্রন্থশেষে লিপিকার “অথা দিষ্টং তথা লিখিতং” এই উক্তির পর—“নামাক্ষর শ্রীমদ শরণ সৰ্ব্বম্। ইতি সন ১২০৪” ইহা লিখিয়া স্বকীয় পরিচয় ও অঙ্গুলিপি কাল জ্ঞাপন করিয়াছেন।

নারায়ণ কোতুকভরে কমলার নিকট নারী জাতির চরিত্র জানিবার জন্য প্রশ্ন কর-  
গ্রন্থস্থচনা রাখেন সেই প্রস্তোভেরে লক্ষ্মী  
অচরিত্রা ও কুচরিত্রা উভয়বিধ  
নারীর স্বভাব নারায়ণের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জননীর প্রতি নারায়ণের প্রশ্নে গ্রন্থ স্থচিত এবং লক্ষ্মীর সুদীর্ঘ উত্তরে উহা পরিসমাপ্ত। কোন কোন গ্রন্থকার দুর্ভাগ্যের শাপে ইজের শ্রীলষ্ট হওয়ার বিবরণ বর্ণনা সহকারেও গ্রন্থ স্থচনা করিয়াছেন। আমাদের আলোচ্য লক্ষ্মী-চরিত্রের গ্রন্থকার নিম্ন ভণিতায় গ্রন্থ স্থচনা করিয়াছেন।

“মউর পুছ সিঙ্গাসনে রাছএ বসীয়া।  
নারী তরে পুছএ হরী কতুক করিয়া।  
কোন কোন ঘরে তুমি বেড়াও লম্বিয়া।  
কোন দোসে জাও তুমি পুরুষ ছাড়ীয়া।  
তাহার বীধান কিছু কহ মোর স্থানে।  
তোমার চরিত্র আমি শুনিব শ্রবনে।”

নারায়ণের প্রশ্ন শুনিয়া চকলা দেবী হাসিতে হাসিতে আগে পুরুষ-লক্ষণ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী বলিলেন, “অমর্দন, আমি কথিত দুর্ভাগ্য সম্বলিত

পুরুষকে পরিচ্যাপ করিয়া ভাগ্যবানকে আশ্রয় করি।  
যে পুরুষ—

“চিন্তাযুক্ত সর্লক্ষণ থাকএ বসীয়া।  
গাএ গাএ (১) ঘরীসন নিশিতে উঠিয়া।  
গাএ গাএ (২) ঘুশে জেবা গুরুর নিদ্রন।  
তাহাকে ছাড়িএ আমি শুন নারায়ণ।  
বাসি পুচ্প (৩) পৈরে জেবা উষাতে নিজা জাএ।  
ভগ্ন ঘাসনে বসি জেবা অঘ থাকএ।  
অঘ মারি হাড়ী (৪) জেবা করএ লক্ষন।  
তাহারে ছাড়িএ আমি শুন নারায়ণ।  
মায় সতমায় জেবা করে অনাদর।  
পুনি ২ ছাড়ি আমি শুন দামুদর।  
উঁচষ্ট ছুইয়া জেবা করএ ভোজন।  
স্নান করী তৈল মাখে তেলি সেই জন।  
অন্ধকারে ভোজন করে ত্রেন (৫) ছিড়ে নখে।  
আপনে কুভেস করি আবুলে ভূমী লেখে।  
আপনার যজ্ঞে জেবা আবুলে বাজাএ।  
সঙ্কিত তাহার ঘন সব হরি জাএ।  
পামর পুরুষ জেবা স্ত্রী সেবা করে।  
কোন দীন না জাই আমি সেই ছারের ঘরে।  
অতক্ষন ভক্ষন করে অগম্য গমন।  
বিবসন হইয়া জেবা করএ সন্ন।  
প্রদিপের তৈল মাখে তেলি সেই জন।  
তাহারে ছাড়িএ আমি শুন নারায়ণ।  
ভাল মন্দ না বাছিয়া ভোজন জেবা করে।  
সৈন্দাকালে জেই জন নিজা জায় ঘরে।

- (১) গাএ, গাএ—গাত্রে গাত্রে  
(২) গাএ, গাএ—গ্রামে গ্রামে  
(৩) পুচ্প—পুষ্প  
(৪) হারী—হাড়ি  
(৫) ত্রেন—ভূণ

চৈত্র ১৩৫১

(১) ভীতান্ধা নিভিতে বসী ভোজন কর এ ।

তাহারে ছাড়ি আমি তন দয়াবএ ।

আগনে তুলিয়া পুত প মালা গাঁথি পরে ।

সৈন্ধ্যাকালে প্রদীপ না দেখি আর ঘরে ।

আপনি পিসিয়া চন্দন পরে জেই জন ।

তাহারে ছাড়িএ আমি তন নারায়ণ ॥”

অতঃপর লক্ষী নারায়ণ সমীপে জীজ্ঞাতির স্মরণ  
বর্ণন করিলেন : এই বর্ণনা-প্রসঙ্গে লক্ষী সূচরিত্রা  
রমণীগণকে নিজের তুল্য। বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রশংসা  
করিয়াছেন ।

“নিজ স্বামী পরিচর্য্যে করে জেই জন ।

সেই নারী পতিব্রতা তন নারায়ণ ।

পতিব্রতা নারীর কথা তন নারায়ণ ।

সকল কহিব রাশি সংক্ষেপ করিয়া ॥

দেবতা সমান জানি করিয়া সেবন ।

পতি বীনে অস্ত্র তাব আর নাই বন ।

পো বেহু গৃহ জেবা পরিচর্য্যে করে ।

ঘন ধাত্রে পুজে পৌত্রে বর দিব তারে ॥

নিজ স্বামী পরিচর্য্যে করে জেই জন ।

তাহার সরিষে রাশি থাকি সর্সকণ ।

স্বামীর বচন জেবা পালে সর্সকণ ।

সেই নারী পতিব্রতা তন নারায়ণ :

দেবতা অধিক পূজা করে সত শুণ ।

দয়া করি স্বামীরে রাশিব সর্সকণ ।

নানা প্রকারে দেব পূজিব জেই বত ।

স্বামীকে সেবিব নারী একমন চিতে ।

বিবিধ প্রকারে দেব পূজিলে জেবা হএ ।

তাঁহা হতে অধিক কল স্বামিক সেবএ ।

স্বামী বিনে নারীর নাহিক দেবতা ।

স্বরণে তোমাতে আমি কহিছাম কথা ।

সর্সকণ হাতস্থে থাকে স্বামীর সংকে ।

কটাকৈ ইহং হস্ত থাকিবে নানা রঙ্গে ।

তাপ্যবতি স্বর্গগতী শেসব রমাণ ।

স্বামীর আজ্ঞাএ সর্গগতী স্বামী-পরায়ণি ।

চিকন দশন বার চিকন দুই তন ।

তাহারে প্রসন্ন হই তন নারায়ণ ।

হস্ত পদ্মসম দীপসমা জেই নারি ।

উদ্যাপনে তাবে ভক্তি তাহারে না ছাড়ি ।

নাতি গভির জার পঙ্কজে লচন ।

শ্রাম বর্ণ গাও বার বীর গমন ।

সর্সকণ থাকি আমি তাহার শরিরে ।

... ..

নিভ্য জেবা মান করে পবিত্র কলেবর ।

তাহার অদ্বৈতঃ আমি থাকি নিরন্তর ।

ভক্তি তাবে স্বামী সেবা ভোজন করাএ ।

প্রথা বৃদ্ধ হইয়া জেবা তোমার নাম লএ ।

এসব লক্ষন তবে যে নারীরে ধরে ।

সর্সকণ থাকি রাশি তাহার শরিরে ।

যে নারী স্বভাৱ্য পূণি স্বামী সেবা করে ।

সম্মুখ সাহসী সেবা নিরাতর করে ।

এমত লক্ষণ করএ জেই জন ।

সর্সকণ থাকি রাশি তাহার ভবন ॥”

অতঃপর স্মরণ। রমণীগণের স্বভাব বর্ণিত হইয়াছে ।  
এ স্থানে কেমন স্মন্দরভাবে সূচরিত্রার চরিত্র চিত্রিত  
হইয়াছে ।

পিজল খড়ম পায় (১) চিকুন রাতুলী ।

সেই নারি অলক্ষিতী স্নান চক্রপাণি ।

(১) ভীতান্ধা—ভিজা, অর্জ। এই শব্দটি ভিত্তিল শব্দ  
হইতে আগত—বলিয়া বনে হয়। “ভিত্তিল বসন তার  
সরসের নীরে ।” বাইকেল

(১) চলিবার সময় যে রমণীর পবিত্র সন্ধ্যা স্নান  
স্পর্শ করে না খড়মের তলার তার দ্বারা  
তাহাদের “খড়ম পাও” নারী বলে। বর্তমান সময়  
বিবাহের পাত্রী নির্বাচন সময় বরপক্ষ সাবধানতার  
সহিত এ বিষয় লক্ষ্য করিয়া থাকে ।

উচ্চ কপাল যার ... .. দুই সারি।  
 সরির অধিক জার সেই দুই নারী (২) ॥  
 পিঙ্গল লোচন যার ডাগর নয়ন।  
 সেই নারী অলক্ষিনী শুন নারায়ণ ॥  
 যেই নারী স্বামী যজ্ঞ ভ্রমে নিত নিত।  
 নিজ স্বামী তেজি জার নষ্ট হয় চিত্ত ॥  
 নানা যলকারে যজ্ঞ ভূষিত করিয়া।  
 পথে পথে ফিরে নারী নষ্ট চিত্ত হৈয়া ॥  
 স্বোয়ামী নিন্দা করে জেই পর লাগে ভাগ।  
 সে ছারের ঘরে আশ্রি না জাই কোন কাল ॥  
 স্বোয়ামী বাক্য অজ্ঞ স্থানে কহে জেই জন।  
 সেই নারি যলক্ষিনী শুন নারায়ণ ॥  
 স্বামীর বাক্য না পালএ সেই দুষ্ট গামী।  
 সে ছারের ঘরে কভো নাই জাই আশ্রি ॥  
 স্বামীকে পাড়এ গালি ঝুজনে দোশে।  
 তিল মাত্র না জাই আশ্রি সে নারীর পাশে।  
 সেই নারী সম পাপি ত্রিভুবনে নাই।  
 অলক্ষিন সে নারি কহি তোয়ার ঠাই ॥

লক্ষ্মীর চরিত্রের উল্লেখযোগ্য অংশ প্রদর্শিত হইল। বাংলার নানা স্থানে এই লক্ষ্মী-চরিত্র নানা ভাবে বচিত ও গীত হইয়া থাকে। যশোরের ডোমগণ যেন দেশে দেশে শীতলা মঙ্গল গাহিয়া বেড়ায়, ফরিদপুরের দরিদ্র মুসলমানগণ তন্ত্রপ বস্ত্রের বিভিন্ন জেলায় অতাপি লক্ষ্মীচরিত্র কীর্তন করিয়া থাকে। গায়ক পারিশ্রমিক স্বরূপ খাজদ্রব্য অথবা কোথাও দুই একটি পয়সা পাইয়া থাকে। এই স্বল্পভূট ভিখারীর দল দেশের যে মহা উপকার করিয়া আসিতেছে তদ্বিষয়ে কেহই চিন্তা করেন না। আমাদের দেশে সাধারণ জীশিকার নিমিত্ত কোন উচ্চ অঙ্গের ব্যবস্থা নাই। অথচ জীজাতির উপর আমাদের

গৃহস্থালীর সুখ শান্তি সম্বন্ধ নির্ভর করে। এট অবস্থায় আমাদের দেশের নবীনরা প্রায়ই ব্রহ্মদেব আদর্শে নিজ চরিত্র গঠন করিতে চেষ্টা করেন। লক্ষ্মী-চরিত্র-গায়ক ত্রিভুবন স্বীকৃতকৈ গৃহস্থালীর কলিকর্ষ চলাকেরা কপা বান্ধা ইত্যাদি বিষয়ে অনেক শিক্ষা দিয়া থাকে। লক্ষ্মীচরিত্রগায়কের বাক্যকে কলকামিনীরা দেবদূতের বাক্যের কান শ্রদ্ধার সতিত গ্রহণ করেন।

স্বামীসেবা মঙ্গল লক্ষ্মী-চরিত্রে যে মনোহর উপদেশ আছে তাহা পূর্ণের উল্লেখ করিয়াছি। এই লক্ষ্মী-চরিত্র-গায়কগণ সাধারণ ব্রাহ্মণিধি মঙ্গল অনেক কথা লক্ষ্মী-চরিত্রের সঙ্গে যোগ করিয়া সমাজে প্রচার করিত। নিয়ে আলোচ্য গ্রন্থ হইতে ঋজু বিচার সাধক মাত্র চারি পংক্তির উপদেশ উল্লেখ করিলাম—

“আর এ কথা শুন দিয়া মন।

যেই দিনে যেই দিব্য থাইতে নিবেদন ॥

প্রতিপদে কৃপাও না করএ ভোজন।

দ্বিতীয়াবে নিষে থাইতে নিবেদন।” ইত্যাদি

এই প্রকার ত্রিপি বিশেষে ঋজু বিচার ও অন্য বহু গাইষ্টা বিবি লক্ষ্মী-চরিত্রে স্থান পাইয়াছে।

লক্ষ্মী চরিত্রের উৎপত্তি মঙ্গল স্বরূপে স্বয়ংগত করিয়া কোন সময় নির্দেশ করা অসম্ভব। লক্ষ্মী-চরিত্রের সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা উৎপত্তি কাল তাহা আশাও করিতে পারি না; তবে রচনার প্রকৃতি বিবেচনা করিলে এই লক্ষ্মী-চরিত্রকে বঙ্গভাষার প্রথম যুগের (কেহ কেহ বলেন খৃঃ ৮০০—খৃঃ ১২০০) বলিয়া মনে হয়। যেদিন বাংলা সাহিত্যে বিদেশীয় ভাব প্রবেশ লাভ করে নাই সেদিনে বাঙ্গালী গৃহস্থালী কার্য্য মঙ্গল নিষে অজ্ঞতার কথা কবিতার আকারে প্রকাশ করিতেন। এই কবিতাগুলি সমাজের সকলেরই কর্ণধর থাকিত। খনার বচন, ডাকের বচন, লক্ষ্মীচরিত্র ইত্যাদির মূল বর্ণনীয় বিষয় এক, অর্থাৎ

(২) সম্ভবতঃ হস্তিনী নারীকে লক্ষ্য করিয়া একথা বর্ণিত হইবে।

উহাতে সমাজবাসীর অভিজ্ঞতার কথাই বর্ণিত হইয়াছে। ডাকের বচন ও লক্ষীচরিত্রের বর্ণনায় স্থলে স্থলে এমন সুন্দর মিল দৃষ্ট হয় যেন উভয় প্রকার “গাথা” একই ব্যক্তির উক্তি।

আমরা ডাকের বচন হইতে তিনটি অংশ উল্লেখ করিলাম। উহা হইতে লক্ষীচরিত্র ও ডাক বচনের প্রকৃতি স্পষ্ট হইবে।

( ১ )

ঘরে আখা বাইরে রাঁধে।  
অল্লকেশ ফুলাইয়া বাঁধে।  
ঘন ঘন চায় উলটি ঝাড়।  
ডাক বলে নারী ঘর উজাড়।

( ২ )

নিকট পুকুর দূরে যায়।  
পাখি দেখিলে আউড়ে চায়।  
পর সম্মুখে ঘাটে থিকে।  
ডাক বলে নারী ঘরে লা টিকে।

( ৩ )

সুশীলা শুদ্ধ বংশে উৎপত্তি।  
মিঠা বোল স্বামীতে ভক্তি।  
স্বোন্দ্রে (১) কাঁটা কুটার রাঁধে।  
খড় কাঠ বর্ষাকে বাঁধে।  
কাখে কলসী পানীকে ঝায়।  
হেট মুণ্ডে কাকহে। না চায়।  
বেন ঝায় তেল আইসে।  
ডাক বলে গৃহিণী সেই সে।

উল্লিখিত বর্ণনা হইতে লক্ষীচরিত্র ও ডাক বচনের সাদৃশ্য প্রমাণীকৃত হয়। ভাবাত্তাবিদ্গণের মত, “এই কবিতাগুলি প্রাথমিক অবস্থায় একরূপ ছিল না, যুগে যুগে সংস্কৃত হইয়া বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে।” এই উক্তি সত্য কি মিথ্যা সে বিষয়ের বিচার করা আমাদের ইচ্ছা ও শক্তির বাহির্ভূত। পক্ষার পুত সলিলে

(১) গ্রীষ্মকালে

অবগাহন করিয়া দেহমন নীতল করিব; উহার তরঙ্গ গণিয়া লাভ কি? \*

ত্রিচিন্তাহরণ দে।

## ভাস্কৃত পঞ্চরাত্র

### নাট্যালিখিত ব্যক্তিগণ

দুর্যোধন, হস্তিনার রাজা।  
ভীষ্ম, দুর্যোধনাদির পিতামহ।  
দ্রোণ, দুর্যোধনাদির অঙ্গশুর।  
কর্ণ, দুর্যোধনের সখা—অঙ্গদেশের রাজা।  
শকুনি, দুর্যোধনের মাতুল—পাক্ষার দেশের রাজা।  
বৃদ্ধ গোপালক, গো-রক্ষক।  
গোমিত্রক, অনৈক গোপাল।  
বিরাট দেশের রাজা।  
ভগবান, ব্রাহ্মণবেশী ধর্মপুত্র সুধিষ্ঠির।  
ভীষ্মসেন, ধর্মপুত্রের কনিষ্ঠ সহোদর (দ্বিতীয় পাণ্ডব)  
অর্জুন, ত্রৈ (তৃতীয় পাণ্ডব)  
বৃহন্নলা, নারীবৈশী অর্জুন।  
অভিমত্যা, অর্জুনের পুত্র।  
উত্তর, বিরাট-রাজ-কুমার।  
কাঙ্ক্ষীয়, দূত, সারথি, তট প্রকৃতি।

## পঞ্চরাত্র

### স্থাপনা

বান্যান্তে স্তম্ভধারের প্রবেশ

হুত্রে। যিনি কৃষ্ণবর্ণ, পৃথিবীতে যিনি অর্জুন ও ভীষ্মের দূত হয়েছিলেন, যিনি শকুনীধর পক্ষদের ঈশ্বর,

\* আলোচ্য পুথিখানি ঢাকা সাহিত্য পরিষদে সংগৃহীত হইয়াছে।—লেখক

যিনি বুদ্ধে শত্রুগণের অনভিগম্য, ভয়ঙ্কর, কিন্তু স্থির। যিনি প্রাশস্তকৰ্ণী, যিনি যজ্ঞে আবৃত হয়ে থাকেন, সেই বিরাট ঐক্য তোমাদিগকে পালন করুন। \*

( পরিত্রমণ করিয়া ) সমবেত আৰ্য্যগণকে একপাই বলব। একি। আমি একান্ত উৎসুক হয়ে বলতে বাচ্ছি সত্য, কিন্তু একটা শব্দ যেন শুনছি। তাইত, আচ্ছা দেখছি।

( নেপথ্যে ) আহা, এঃ যজ্ঞ কুরুপতির বিপুল সমুদ্রবই পরিচায়ক বটে!

হুত্র। হয়েছে, বুঝেছি;

কুরুরাজ হুর্ঘ্যোধন যজ্ঞ কচ্ছেন, এবং সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজগণ যজ্ঞ দেখবার জন্য পত্নীবর্গের সহিত প্রকুরচিতে এখানে সমাগত হয়েছেন। [ প্রস্থান।

### বিফলস্তক

তিন জন ব্রাহ্মণের প্রবেশ

সকলে। অহো! কুরুরাজের যজ্ঞের কি বিপুল সমারোহই হয়েছে!

প্রথম। চতুর্দিকে দ্বিজোচ্ছিষ্ট অন্ন, যেন সর্বত্র কাশ-কুসুম ফুটে আছে। ধূম-গন্ধে তরুণগণের কুসুম-গন্ধকে নষ্ট করে দিয়েছে। ব্যাঘ্রগণ পর্কত প্রদেশে যুগের ন্যায় বিচরণ কচ্ছে, এবং সিংহসমূহও হিংসা-পরাজ্ব্ব হয়েছেন। মহারাজ যজ্ঞে দীক্ষিত হয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে যেন সমস্ত জগৎও দীক্ষা প্রাপ্ত হয়েছে।

দ্বিতীয়। তুমি ঠিক বলেছ।

\* জ্যোঃ, পৃথিব্যর্জুন-ভীম-দুতো,  
যঃ কর্ণধারঃ শক্রনীশ্বরস্য।  
হুর্ঘ্যোধনো, ভীমবুধিধিরঃ স  
পারাদ্ বিরাজন্তরগোহভিমহ্যঃ।

অগ্নি দেবগণের মুখ স্বরূপ।\* তিনি হবি দ্বারা তৃপ্ত লাভ করেছেন। বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ ধনলাভে তৃপ্ত হয়েছেন, গোকুলের সহিত পক্ষিগণ তৃপ্তি লাভ করেছে, এবং সমাগত ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গও সন্তুষ্ট হয়েছেন। ফলকথা, সমগ্র জগৎ হুট করে মহারাজের গুণকীর্তন কচ্ছে, এবং এইরূপে তাঁহার সদৃশ্যাবলী + পৃথিবী অতিক্রম করে দেবালয়ে ( স্বর্গে ) পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

তৃতীয়। সমাগত ব্রাহ্মণগণ, দেখুন, দেখুন—

মহারাজের পট্টবেষ্টিত মন্তকে দ্বিজগণের স্থাপিত চরণ কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে! ইঁহারা সকলেই দ্বাধ্য ও সুবিখ্যাত এবং স্বাধ্যায়-শুরগণের অগ্রণী। বৃদ্ধকালে ইঁহাদের তপোনিষ্ঠা আরও বর্দ্ধিত হয়েছে। বৃদ্ধ গজ-গুলি যেমন বলবান হস্তীর স্বরূপে শুণ্ড স্থাপন করে অগ্রসর হয়, সেরূপ বর্ধাতিশয়ে দ্বিধি-চরণ বিপ্রগণ হস্ত দ্বারা শিষ্যের স্বরূপে জড়িয়ে ধরে অগ্রসর হচ্ছেন, আবার একটি যষ্টি ইঁহাদের তৃতীয় চরণের পংক্তি-স্থানীয় হয়েছে।

সকলে। ওহে যজ্ঞ-ব্রতী পুরোহিতগণ, মহারাজের যজ্ঞান্ত-রান না হলে আপনারা যজ্ঞায়ি পরিত্যাগ করে যাবেন না।

প্রথম। ষিক্, ষিক্, তুমি যে ব্রাহ্মণসুলভ চপলতা দেখালে দেখছি!

কনকময় এই সুন্দর যুগটি দেখে বোধ হচ্ছে যেন দেবী বহুবী একটি সুবর্ণময় ভূজ তুলে রেখেছেন। ষিক্ যেমন স্বীয় পার্শ্বে শূত্রের ঃ উপস্থিতি সহ্য কতে পারেন না, তদ্রূপ যজ্ঞবেদিকার অগ্নিও পার্শ্বে লৌকিকায়ি সহ্য কতে

\* মূলে “অমরোত্তমমুখঃ” পাঠ আছে। আমি ‘অমরোত্তমমুখঃ’ পাঠ ধরিয়া অনুবাদ করিয়াছি।

+ মূলে ‘তদৃশং’, পাঠ আছে, কিন্তু ‘তদৃশঃ’ পাঠ ধরিলেই অর্থপ্রতিপত্তি সহজ হয়।

‡ “পার্শ্বে ব্রহ্মণঃ ন সহতে”—ব্রহ্মণ শব্দ ঐতিহাসিকের পক্ষে এ স্থলে বড়ই মূল্যবান।



চৈত্র ১৩২১

পারে না। ঐ দেখ হরিত কুশে আশ্রিত থাকিতে বজ্র-বেদীর পৃষ্ঠদেশ সমধিক দক্ষ হতে পারে নাই। আর গজ যেমন প্রকুল পদ্মবনে ( সরোবরে ) প্রবেশ করে, এই ধ্বংসেইরূপ বজ্রগৃহের পুরোবর্তী গৃহে প্রবেশ কচ্ছে।

দ্বিতীয়। কুল কলঙ্কিত হলে জাতি যেমন জাতি-ভয়ে স্থানান্তরিত হয়, সেরূপ অগ্নিতাপে নিপীড়িত দ্বিগুণ অগ্নি-ভয়েই অগ্নিকে স্থানান্তরিত কচ্ছেন। \*

তৃতীয়। অপত্যনাশে শোকাক্তা নারী যেরূপ পুত্রের প্রতি লেহ বশঃ শোকানলে দগ্ধ হয়, সেরূপ স্নতপরিপূর্ণ (যজ্ঞীয়) ক্ষুদ্র শকটখানিতে জল সিক্তন করা সবেও সদ্য গৃহে (গেহ) আগুন ধরেছে বলে ভুলে যাচ্ছে।

প্রথম। ভূমি বেশ বলেছ—

শুষ্ক দণ্ড আশ্রয় করে অগ্নি বজ্রের জন্য ব্যবহৃত জ্বল্যোধনের এই ক্ষুদ্র শকটটি দক্ষ কণ্ঠে উদ্যত হয়েছে। কিন্তু নূতন ভূগেঢাকা রয়েছে বলে থেকে থেকে খসে পড়ে যাচ্ছে। ঐ দেখ, বায়ু-তাড়িত হয়ে শিখাবিস্তার পূর্বক ক্রমশঃ শকটের চক্র পর্যাস্ত এসে পৌঁছেছে। ঐ যে, দেখতে দেখতে, নেমীতে আগুন ধরে গেল, এবং মণ্ডলাকার অগ্নিরাশি স্থগীর ন্যায় গোলাকার হয়ে উঠল।

দ্বিতীয়। আর একটা ব্যাপার দেখ—

অগ্নিতাপে ভীত হয়ে বন্ধাকম্বলের কোটর থেকে এক সময়েই পাঁচটা সাপ মৃত ব্যক্তির দেহ হতে পাঁচটি ইন্দ্రిয়ের জায় বেরিয়ে গেল।

তৃতীয়। আবার এ দিকে চেয়ে দেখ—

বায়ুসহায় যজ্ঞাগ্নি-দক্ষ গাছটার কোটর থেকে পাখীগুলি উড়ে গেল, বোধ হল যেন ইহার শরীরের ভিতর থেকে প্রাণ বেরিয়ে গেল।

প্রথম। তোমাদের কথা বর্থাৎ বটে। আমার কিন্তু বোধ হচ্ছে দুবিত-চারিত্র একটা লোকের দোষে যেমন

সমস্ত বংশ নষ্ট হয়, তেমনি একটা মাত্র শুষ্ক বৃক্ষের জন্তও পুষ্পিত-পাদপ সমগ্র উপবন দগ্ধ হয়।

ঐ দেখ, বৃক্ষলতা ও গুল্ম পরিপূরিত সমগ্র উপবনটি ভোজ্য বস্তুর জায় নিঃশেষে ভক্ষণ ক'রে, আচমন করার জন্তই যেন অগ্নিদেব এখন কুশমাত্র অন্নসরণ করে নদীতে অবতারণা হয়েছেন।

দ্বিতীয়। ঐ দেখ, তরু-লম্বিত কুশ ও বৃকলের সাহায্যে অগ্নি বৃক্ষ থেকে বৃক্ষান্তরে গমন কচ্ছে, এবং পাকা ফলের জায় পোড়া কলাগুলি কলাগাছ থেকে নীচে পড়ছে। আবার ঐ দেখ, সম্মুখে তালগাছটার আগায় একটা প্রকাণ্ড মোচাক—অনেকক্ষণ ধরে গোড়া জলে জলে এখন মোচাকটা শুষ্ক মহাদেবের পরশুর জায় গাছটা পড়ে গেল।

তৃতীয়। বাঁচা গেল। সাধু ব্যক্তির রোষের জায় ভগবান হতাশন এখন প্রকাশ হয়েছেন।

বিভব ক্ষীণ হলে উন্নতমনা ব্যক্তির যেমন দানশক্তি কমে যায়, সেইরূপ ইক্ষন শেষ হয়ে যাওয়াতে অগ্নির হেজও কমে গিয়েছে।

প্রথম। অমিত ব্যয়ের ফলে দরিদ্র হয়ে লোক যেমন পরিশেষে স্বীয় পরিচ্ছদ বিক্রয় ক'রে জীবন ধারণ করে (খায়), তদ্রূপ হতাশনও এখন ক্ষক, ভাণ্ড, অরণী ও দণ্ড ভক্ষণ কচ্ছেন।

দ্বিতীয়। ঐ দেখ, বৃক্ষটার পত্র-বহল শাখাগুলি শূঁয়ে পড়ে নদীর জল স্পর্শ কচ্ছে, এবং বায়ুসঞ্চালনে পাতাগুলি আন্দোলিত হওয়াতে জল ছিটে উঠছে; বোধ হচ্ছে যেন দাবাগ্নি-পীড়িত পাদপ-সমূহের জীবন রক্ষার জন্ত বৃক্ষটি স্বীয় পর্ণরূপ হস্তে ইহাদের গায় জলসিক্তন কচ্ছে।

তৃতীয়। আচ্ছা এস, বাই আশ্রয়ও আচমন করি গিয়ে।

উভয়ে। হাঁ, এস।

\* “জাতি জাতিভয়াদব” পাঠ আছে। ‘জাতি-ভয়’ শব্দের গূঢ় অর্থ আছে—সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া গোলযোগ।

( সকলের আচমন )

প্রথম। ঐ যে, কুরুপতি হৃষ্যোধন এই দিকেই আসছেন। তাঁহার অগ্রে ভীষ্ম ও দ্রোণ এবং পশ্চাতে অশ্বাশ্ব কত্রিয় রাজগণ।

ইহারা সকলেই মহারাজ হৃষ্যোধনের সঙ্গে উপস্থিত প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত বিষয় সম্বন্ধে\* মধুর আলাপ কচ্ছেন। বলছেন, যজ্ঞ ক'রে সমগ্র পৃথিবী ভোজন করায়। পরাক্রমে পৃথিবী জয় কর, রোষ পরিত্যাগ কর, স্বজনকে স্নেহ কর; সুতরাং ইহাদের কথা শুনে মনে হয় যেন পোরবর্গ পাণ্ডবগণেরই পক্ষাবলম্বন করেছে।

এস যাই, আমরাও গিয়ে কুরুরাজকে অভিবাদন করি।

### প্রথম অঙ্ক

ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রবেশ

দ্রোণ। ধর্ম্মাচরণতৎপর হৃষ্যোধন আমার প্রতিই অনুরাগ প্রদর্শন কচ্ছেন—তা হবে, কারণ শিষ্যের দোষ বন্ধ বা মিত্রকে স্পর্শ করে না, আচার্য্যকেই আশ্রয় করে থাকে। গুরু হাতে বালককে একবার সমর্পণ করে দিলে মাতাপিতার আর কোনও অপরাধের (পাপের) ভয় থাকে না।

ভীষ্ম। এই যে হৃষ্যোধন এ দিকেই আসছে। এই হৃষ্যোধনই অর্ধ গ্রহণ ক'রে সুসমৃদ্ধ হয়েছিল, এবং রণপ্রিয় বলে বিস্তর অশ্বশের ভাগীও হয়েছিল; † কিন্তু এখন যজ্ঞ ক'রে পুণ্যলাভ করেছে, সুতরাং তাহার এই অতুল ঐশ্বর্য্য ও দেহকান্তি এখন আবার তাহার শোভাই বর্জন কচ্ছে।

হৃষ্যোধন, কর্ণ ও শকুনির প্রবেশ

হৃষ্যোধন। আমার আত্মা এখন সন্তোষ-ভূষ্ট, গুরুজন

\* মূলে 'আগত কথা' পাঠ আছে।

† 'অবশো নিপীতবান'—মূলে এই বাক্যটি আছে—ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনি যতদূর সম্ভব অবশ লাভ করেছিলেন।

পরিভূষ্ট, আমি এখন জগৎবাসীর বিশ্বাসের পাত্র, আমার অশ্ব দূর হয়েছে এবং ধার্ম্মিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নোকে বলে যুড়ার পর স্বর্গলাভ হয়; কিন্তু এটা মিথ্যা কথা, কারণ স্বর্গ পরোক্ষ বস্তু নহে—পুণ্যের ফলে পৃথিবীতেই স্বর্গলাভ হয়।

কর্ণ। গান্ধারী-তনয়, ত্রায়-পথে অর্জিত ধন দান ক'রে আপনি উপযুক্ত কার্য্যই করেছেন, কারণ—

কত্রিয়গণের সমৃদ্ধি বাণ-সাপেক্ষ। যে কত্রিয় পুত্রাদির জন্ত অর্থ সঞ্চয় করে সে স্বয়ং বঞ্চিত হয়। সুতরাং কত্রিয়ের পক্ষে, বিপ্রগণকে সমস্ত বিত্ত দান ক'রে, পুত্রেষু জন্ত ধনু মাত্র রেখে যাওয়াই উচিত।

শকুনি। অন্ধরাজ, তুমি গঙ্গা-তীরবাসী সুতরাং গঙ্গা-সংস্পর্শে তোমার সমস্ত পাপ ধৌত হয়েছে। এই বাক্য তোমার মুখেই শোভা পায় বটে।

কর্ণ। ইক্ষ্বাকু, শর্ঘ্যাত, যযাতি, রাম, মাদ্রাতা, নাত, অগ, নৃপ, অঙ্গরীষ প্রভৃতি রাজগণের অতুল রাজ-কোষ ছিল, বিস্তীর্ণ রাজ্য ছিল। এখন সেই রাজগণ নাই, তাহাদের ধন-ভাণ্ডারও নাই, এবং রাজ্যও নাই। কিন্তু ধর্ম্মকার্য্য (যজ্ঞ) করেছিলেন বলে এখনও তাঁদের নাম লুপ্ত হয় নাই।

সকলে। গান্ধারী-তনয়, যজ্ঞ সম্পন্ন করে আপনি মঙ্গল ও সমৃদ্ধি লাভ করেছেন।

হৃষ্যোধন। আমি অনুরাগীত হলেম। আচার্য্য, হৃষ্যোধন আপনাকে অভিবাদন কচ্ছে।

দ্রোণ। পুত্র, এস। কিন্তু প্রথমে আমাকে অভিবাদন কর। তোমার অন্তর।\*

হৃষ্যোধন। তবে কাকে প্রথমে অভিবাদন করব?

দ্রোণ। কেন, তুমি কি দেখছ না, সম্মুখে ভীষ্ম রয়েছেন। তিনি দেবতা ও বাহুব হতে জন্মলাভ করেছেন, তাঁহাকেই প্রথমে নমস্কার কর। তীয়কে

\* মূলে "অয়মক্রমঃ" এই পাঠ আছে—এটা অভিবাদনের ক্রম নহে। "অথ কঃ ক্রমঃ।"

চৈত্র ১৩২১

পরিত্যাগ ক'রে অস্ত্র ব্যক্তিকে প্রথম নমস্কার করে  
অস্ত্রায় হর।

ভীষ্ম। মহাশয়, একরূপ বলবেন না। অনেক বিষয়ে  
আমি আপনায় চেয়ে অপকৃষ্ট।

আমি মাতৃ-গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছি, আপনি স্বয়ম্ভু।  
আমার বৃত্তি বুদ্ধ—ইহা আপনার পক্ষে গর্হিত। আপনি  
বিদ্বা, আমি ক্ষত্রিয়ান্নজ। আপনি গুরু, আমি মাত্র  
আপনার শিষ্যবর্গের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

জ্যোৎস্না। হাঁ, মহাত্মারা নিজদের অপ্রশংসা ক'রে  
ধাকেন; ইহা কিন্তু ভাল নয়। পুত্র, এস, তা'হলে  
আমাকেই অগ্রে অভিবাদন কর।

দ্রুপদ্যো। আচার্য্য, দ্রুপদ্যোজন আপনাকে অভিবাদন  
কচ্ছে।

জ্যোৎস্না। পুত্র, এস। আলীকাদ করি, যেন একরূপে বক্ত  
ক'রে ক'রেই তুমি থির হও।

দ্রুপদ্যো। অল্পগৃহীত হলেম। পিতামহ, দ্রুপদ্যোজন  
আপনাকে অভিবাদন কচ্ছে।

ভীষ্ম। পৌত্র, এস। একরূপেই তোমার বুদ্ধিপ্রশমন  
হউক।

দ্রুপদ্যো। অল্পগৃহীত হলেম। মাতুল, দ্রুপদ্যোজন আপ-  
নাকে অভিবাদন কচ্ছে।

শকুনি। বৎস, দক্ষিণা দান করে একরূপে সমস্ত বক্ত  
নির্কিয়ে সম্পন্ন কর, এবং নৃপতিবৃন্দকে জয় ক'রে  
-জরাসন্ধের \* স্থার রাজস্থয়ে মিলিত কর।

জ্যোৎস্না। কি আশ্চর্য্য, শকুনির আলীকাদ-বাক্যেও  
দেখছি উত্তেজনা আছে। এই ক্ষত্রিয়-তনয় বিরোধ-  
প্রিয়ই বটে।

দ্রুপদ্যো। বয়স্য কর্ণ, গুরুজনকে প্রণাম করা হয়েছে,  
এখন বহুবর্গের সঙ্গে যথাক্রমে মিলন-সুখ উপভোগ কর।

কর্ণ। গাছারী-তনয়, যজ্ঞের নিয়ম পালন  
করার আপনার শরীর ক্লান্ত হয়েছে। তথাপি  
আপনার কর-বর্দন কচ্ছি। আশা করি, এখনও  
এই কর-বর্দন সহ্য করার মত বল আপনার আছে।  
কিন্তু বিশেষ বিবেচনা না ক'রে আমি আর কোনও  
প্রগল্ভ বাক্য উচ্চারণ করব না। কারণ, এখন রাজ-  
স্থিতি আপনার বীরগভীর বাক্য শুনে আমার ভয় হয়।

দ্রুপদ্যো। তুমি একরূপ ভাবেই ( বজ্রের স্থায় ) আমার  
সঙ্গে সর্বদা আলাপ ক'রো।

জ্যোৎস্না। পুত্র দ্রুপদ্যোজন, মহেঞ্জের প্রিয়সখা রাজা  
ভীষ্মক তোমার সম্বর্দ্ধনা কচ্ছেন।

দ্রুপদ্যো। আর্ঘ্য, আসুন। আপনাকে অভিবাদন  
কচ্ছি।

ভীষ্ম। পৌত্র দ্রুপদ্যোজন, দক্ষিণাপথের পরিষভুল্য  
রাজা ভূরিশ্রবা তোমাকে সম্বর্দ্ধনা কচ্ছেন।

দ্রুপদ্যো। আর্ঘ্য, আসুন।

জ্যোৎস্না। পুত্র দ্রুপদ্যোজন, বসুভক্ত তোমার বক্ত সম্বর্দ্ধনা  
করেছেন, এবং তোমাকে সম্বর্দ্ধনা করার জন্য অভিমুখ্যকে  
পাঠিয়ে দিয়েছেন।

শকুনি। পুত্র দ্রুপদ্যোজন, ইনি জরাসন্ধের পুত্র সহদেব—  
তোমাকে সম্বর্দ্ধনা কচ্ছেন।

দ্রুপদ্যো। বৎস, এস। পিতার স্থার পরাক্রমশালী  
হও।

সকলে। সমাগত রাজস্ববর্গ সকলেই মহারাজকে  
সম্বর্দ্ধনা কচ্ছেন।

দ্রুপদ্যো। অল্পগৃহীত হলেম। রাজগণ, আপনারা  
সকলেই সমাগত হয়েছেন, কিন্তু রাজা বিরাট ত আসেন  
নি।

শকুনি। আমি বিরাটের নিকট দূত পাঠিয়েছি।  
আমার মনে হয়, এঁরা পথে আছেন।

দ্রুপদ্যো। গুরুদেব, আপনি এই ধর্মকার্য্যে গুরু,  
অস্ত্রবিভাগও আমার গুরু, দক্ষিণা গ্রহণ করুন।

\* এ স্থলে পৌরাণিক কথার আভাস আছে।

জোণ। দক্ষিণা! বেশ! বেশ! প্রথম তোমার প্রম  
হ্রস্ব করাই; তারপর দক্ষিণা।

দ্ব্যর্থো। কি! আচার্য্য আমাকে বিগতপ্রম করাবেন!

(ক্রমশঃ)

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

## বসন্তের ডালি

### (১) মলয়

মুক্ত হয়ে গেল বীরে নিসর্গ-লক্ষীর  
দক্ষিণ ছয়ারশানি, গভীর তৃপ্তির  
নিবিড় নিশ্বাস হেন মৃদুল মলয়  
আকুল আবেগভরে নিখিল হৃদয়  
জাগাইয়ে মাতাইয়ে করিয়ে অধীর  
ছুটে এল—শিহরিল চির-বিরহীর  
তৃপ্ত অস্তর হার! এ কি প্রেমসৌর  
মধুময় মোহময় পরশ মদির  
অমৃত-প্রলেপ সম কায়মনপ্রাণে  
আলিঙ্গিছে বারংবার! কোথায় কে জানে  
ঘটেছে মিলন কার, সব আকাঙ্ক্ষার  
হয়ে গেছে সমাপন! তারি সমাচার  
মলয় এনেছে বহি' সম্বাপিত জনে  
আশ্বাসিতে শুধু আজি অজ্ঞাতে গোপনে।

### (২) মুকুল

রসালের রসটুকু শতমুখে আজ  
উষ্ণিরাছে উচ্ছ্বসিয়া বসুন্ধরা মাঝ  
অপূর্ণ শোভার গন্ধে, পীযুষ-মধুর  
মলয়-চূষনে বুকি! নবোঢ়া বধুর  
নিভৃত প্রাণের আশা-সাধ-আকিঞ্চন  
প্রেমময় দরিতের সোহাগে প্রথম  
বিকশি উঠিল বেন! অস্তরে বাহিরে  
উৎসবের আরোজন, নিকুঞ্জ কুটারে

আমরণ বসুধার! সৌরভ-সুধার  
মহামেলা নন্দনের, দিব্য উপহার  
দেব-বালা প্রকৃতির! নভ মধুকর  
মুগ্ধ-চিত্তে অমৃক্ষণ গুঞ্জন-মুখর  
প্রেম-সম্ভাবণ হেন! প্রতিদ্বন্দ্বী বার  
মুকুল অবনী-অঙ্কে লুকাইতে চায়!

### (৩) কোকিল

চূত মুকুলের গন্ধে হইয়ে ব্যাকুল  
কোকিল আসিল ধেরে মুখরি অভুল  
ধরণীর হৃদিখানি, উঠিল উৎপলি  
বিধের পিপাসা-সিদ্ধ মথিরা কেবলি  
অপূর্ণ সঙ্গীত এ কি! কত বিরহীর  
কত জনমের যেন গুপ্ত আধি-নীর  
অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা-সাধ ভালবাসা সনে  
অলক্ষ্যে অজ্ঞাতে কবে মিশিয়া গোপনে  
বসন্ত-সুহৃদ-কণ্ঠে মধু “কুহ” স্বরে  
হইল গো মুষ্টিমান! নিভৃত অস্তরে  
অতীতের কত কথা কত অভিভাব  
ক্ষেপে ক্ষেপে জাগি তাই করিছে উদাস  
কি-যেন-কি-চাই আজ। রাধিকা-রমণ  
আবার বাজার বুঝি মুরলী মোহন!

### (৪) কিশলয়

কোকিলের “কুহ” স্বরে তরু-লতিকার  
শিশির-বিশীর্ণ প্রাণে যৌবন-জোয়ার  
ফিরে এল অকস্মাৎ, উঠিল মুগ্ধরি  
গুঞ্জরি আশার সম শ্রামল লহরী  
প্রতি অঙ্গে অঙ্গে ছায়। রাধিতে চরণ  
মাধবী-বান্ধব স্নেহে কোমল আসন  
বিছাইয়ে দিল বেন! বাসর-শয়ন  
রচি হর্ষে বনদেবী করে আবাহন  
নবীন দম্পতিগণে! স্নিগ্ধ ছায়ার  
আজি শুধু মধুসংসার হিরার হিরার

বিচিত্র আবেশ-লাভে, মর্ষের সঙ্গীত  
পল্লবে পল্লবে যেন হয় গো বঙ্কিত  
মর্ষরিয়া তালে তালে! প্রেম-অমরার  
শিঞ্জনী-শিঞ্জিত একি পরি-বালিকার!

### ৫ কবি-কুঞ্জ

মলয় বুকুল পিক কিশলয় মিলি  
অজস্র আনন্দভরে একান্তে কেবলি  
রচিয়াছে কবি-কুঞ্জ, দিয়েছে সন্দেশ  
বসন্ত এসেছে ফিরে! করিয়া নিঃশেষ  
বিখের সৌন্দর্য্যরাশি মাধবী অশোক  
নিঃশব্দে উঠেছে ফুটি, গলি' চন্দ্রলোক  
দিকে দিকে শতধারে পড়িছে ঝরিয়া  
অমির-নিবিজ্ঞ করি! গেল কি খুলিয়া  
নন্দনের রুদ্ধদ্বার! সবি বৃথা হায়,—  
সার্থক সফল করি সকল শোভায়  
কে বাধিবে অরু আজি কবির বীণায়  
হাসি-মুখে বসি পাশে, বিশাল ধরায়  
কেহ নাই আপনার! শত্রু কুঞ্জধানি  
বহে শুধু অদৃষ্টের অভিলাপ-বাণী!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

## আবুল মুজফর রচিত কবিতা ও ইটা রাজবংশ

( দ্বিতীয়ার্দ্ধ ) \*

ইটা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নিধিপতির  
সময় নির্ধারণ—নিধিপতি ও সুবিদ, এবং সুবিদ ও  
তাহার-বর্তমান বংশধরগণ মধ্যে পুরুষ গণনা করিয়া  
তৎসাহায্যে নিধিপতির আনুমানিক সময় নির্ধারণ করা  
যাইতে পারে।

\* প্রথমার্দ্ধ প্রতিভা, মাঘ, ১৩২১, সাধ্যায় প্রকাশিত  
হইয়াছে।

মুজফর প্রদত্ত বর্ণনা অনুসারে নিধিপতি হইতে  
সুবিদ ৮ম পুরুষের ব্যক্তি। জাতীয় ইতিহাস গ্রন্থে ইহা  
হইতে ১ পুরুষ এবং শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত গ্রন্থে ২ পুরুষ  
অতিরিক্ত দেখান হইয়াছে। এইরূপ সময় হ্রদ্বির চেষ্টা  
“অজ্ঞাত তিনপুরুষ” আবিষ্কারের কায় প্রহেলিকাময়।

সুবিদ ও তাহার বর্তমান বংশধরগণ মধ্যে সময়ের  
ব্যবধান নিয়ে প্রদর্শিত হইল—

১। জাতীয় ইতিহাস ও শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত এই উভয়  
গ্রন্থ অনুসারেই সুবিদের কন্যাবংশে সুবিদ হইতে  
বর্তমানে ১১ পুরুষ চলিতেছে। শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য  
প্রমুখ পণ্ডিত ব্যক্তি এই বংশ-পরিচয়ের প্রতি বিশেষ  
আস্থাবান। অথচ সুবিদ ও তাহার বর্তমান বংশধরগণ  
মধ্যে ২ পুরুষ মাত্র ব্যবধান সত্ত্বেও তাহার রাজা সুবিদকে  
চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী এবং সেরশাহ ও বেহলুল লোদীর  
সমসাময়িকরূপে প্রচার করিতে কুণ্ঠিত নহেন। সাধারণ  
অশিক্ষিত লোক এইরূপ সময় নির্ধারণ করিলে আক্ষে-  
পের কোনও কারণ ঘটিত না।

২। সুবিদের পুত্রগণের পর তৎসংশ্লিষ্টগণের অজ্ঞাত-  
সারে ‘অজ্ঞাত তিনপুরুষ’ যোজনা ক্রমে রাজা সুবিদকে  
প্রাচীনতর কালবর্তী প্রমাণিত করার অসাধু চেষ্টা সন্দেহে  
ইতঃপূর্বেই বিবিধ যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। [ প্রতিভা,  
১৩২০ ] এই কৃত্রিমতা দূর করিলে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত হইতেও  
হাজিখার বংশে সুবিদ হইতে বর্তমান ১১শ পুরুষ এবং  
ঈশাখাঁর বংশে সুবিদ হইতে ১০ পুরুষ পাওয়া যায়। রাজা  
সুবিদের ইসলাম ধর্মী পুত্রগণের বিভিন্ন শাখার বংশ-পত্রিকা  
হইতেও প্রমাণিত হয় যে সুবিদ বর্তমানকাল হইতে  
১১পুরুষ পূর্ববর্তী ব্যক্তি এবং সুবিদ ও তাহার বর্তমান  
বংশধরগণ মধ্যে ২ পুরুষ মাত্র ব্যবধান।

৩। মুজফর প্রদত্ত বর্ণনায় রাজা সুবিদ হইতে তিনি  
৪র্থ পুরুষের ব্যক্তি। তাহার পর তৎসংশ্লিষ্ট আব্দুল  
হামিদ (জন্ম ১৮৮৬ খৃঃ অব্দ) মুজফর হইতে ৭ম  
পুরুষের ব্যক্তি। এই হিসাবেও সুবিদ হইতে বর্তমানে

১১ পুরুষ চলিতেছে, এবং ১৮৮৬ খৃঃ অব্দ হইতে ১০ পুরুষ বা ৩০০ বৎসর পূর্বেই সুবিদের আত্মমানিক জন্মকাল।

৪। মাং আকজল চৌধুরী (জন্ম ১৭৯৮ খৃঃ অব্দ) প্রদত্ত বর্ণনা অনুসারে তিনি সুবিদ হইতে ৮ম পুরুষের ব্যক্তি, সুতরাং ১৭৯৮ খৃঃ অব্দ হইতে ৭ পুরুষ বা ২১০ বৎসর পূর্বেই সুবিদের আত্মমানিক জন্মকাল।

বংশ-পত্রিকা লক্ষ উপরি উক্ত প্রমাণাবলীই সুবিদের আত্মমানিক সময় নির্ধারণকল্পে পর্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৫। নিম্নে সুবিদের সময় নির্ধারণকল্পে অপর কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইল—

রাজা সুবিদ বিদ্রোহী পাঠান দলপতি ওসমান কর্তৃক নিহত হন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা অনুসারে ১৬০৩ খৃঃ অব্দে ওসমান ভাওয়াল হইতে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রে অতিক্রম পূর্বক পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইসলাম খাঁর প্রেরিত সৈন্যগণ কর্তৃক ১৬১২ খৃষ্টাব্দে ওসমানের নিহত হইবার প্রমাণ সম্বলিত সনদের অমূল্যপি পরিশিষ্ট ভাগে প্রদত্ত হইল।

১৬০৩ হইতে ১৬১২ খৃঃ অব্দ মধ্যে সুবিদ নিহত হন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে ওসমানের কতিপয় বৎসর রাজত্ব করার প্রমাণ বিজ্ঞমান থাকিতে, তাহার ভাওয়াল হইতে পলায়নের অব্যবহিত পরে, অর্থাৎ ১৬০৪ খৃঃ অব্দে, সুবিদের মৃত্যুকাল নির্ধারণিত হইতে পারে।

মৃত্যুকালে সুবিদের আত্মমানিক বয়স বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তৎকালে তিনি বহু সন্তানের পিতা, এবং তৎপূর্বেই তাঁহার কস্তার বিবাহ পর্যন্ত সম্পন্ন হইয়াছে। ১৬০৪ খৃঃ অব্দে তাঁহার বয়স্ক্রম ৪০ বৎসর ধরিলে তাঁহার জন্মকাল আত্মমানিক ১৫৬৪ খৃঃ অব্দ।

এক্ষণে, নিধিপতি পরিণত বয়সে খ্রীহটে আগমন করেন, এবং নিধিপতি হইতে সুবিদ ৮ম পুরুষের ব্যক্তি, আর সুবিদের জন্মকাল আত্মমানিক ১৫৬৪ খৃঃ অব্দ ;

সুতরাং নিধিপতির খ্রীহটে আগমন কাল আত্মমানিক ১৩৮৪ খৃঃ অব্দ। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পাদে নিধিপতি খ্রীহটে আসিয়া থাকিবেন।

### সাম্প্রদায়িক সমাজ ও ইটা রাজবংশ—

মুজফরের বর্ণনা অনুসারে নিধিপতি নামক জনৈক কণৌজ নিবাসী ব্রাহ্মণ ইটা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পাদে নিধিপতি খ্রীহটে উপনিবিষ্ট হইবার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

আধুনিক মতবাদ অনুসারে ইটা রাজবংশের আদি-পুরুষ, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে খ্রীহটে আগত দশ গোত্রীয় সাম্প্রদায়িক সমাজের অগ্রতম প্রতিষ্ঠাতা, আনন্দ নামক জনৈক মৈথিল ব্রাহ্মণ। নিধিপতি আনন্দের (৭) প্রায় ৭ শত বৎসর পরে খ্রীহটে উপনিবিষ্ট হইয়া একটা পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে তৎবংশ খ্রীহটের সাম্প্রদায়িক সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে। ফলে আধুনিক কুল-গ্রন্থ নিধিপতির সহিত আনন্দের সম্পর্ক নির্ধারণ পূর্বক নিধিপতি বংশ ও সাম্প্রদায়িক সমাজ উভয়েরই কলাপ সাধন করিয়াছেন। এইরূপ মতবাদের অনুকূলে কোনও নিরপেক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না; সুতরাং মুজফরের বর্ণনার প্রতিকূল উক্তির প্রতি আস্থা স্থাপন করা যায় না।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, বাস্তবিকই খ্রীহটের দশ গোত্রীয় সাম্প্রদায়িক সমাজ প্রায় ১৩০০ বৎসরের প্রাচীন কি না। সুদূর সপ্তম শতাব্দীর বহু পরেও বহু পরিবার সাম্প্রদায়িক সমাজে প্রাণে হইবার একাধিক প্রমাণ পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও বহু পরিবার উক্ত সমাজে প্রবেশ লাভ করিবার প্রমাণ দৃষ্ট নহে।

এই উপলক্ষে বুরুজার বংশগোত্রীয় চৌধুরী ও ভট্টাচার্য্য এবং দত্তরালীর বংশগোত্রীয় মিশ্রগণের উল্লেখ করা বাইতে পারে। বুরুজা নিবাসী রামরত্ন ভট্টাচার্য্য প্রণীত খ্রীচৈতন্য রত্নাবলী গ্রন্থে ও 'জাতীয়

চৈত্র ১৩২১

ইতিহাসে' এই সমুদয় পরিবার খ্রীষ্টচন্দ্র বংশের দুই শাখারূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।\*

বর্তমানে বুরুজার বংশগণ সাম্প্রদায়িক সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত; কিন্তু দত্তরাজীর বংশগণ জাতীয় ইতিহাসে সাম্প্রদায়িক সমাজভুক্ত বলিয়া বর্ণিত হইলেও, তাঁহারা মধ্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণরূপে সাধারণ্যে পরিচিত। প্রকৃত পক্ষে চৈতন্যদেবের বংশীয় হইলে ইহারা কি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে সাম্প্রদায়িক সমাজে প্রবিষ্ট হন নাই? সাম্প্রদায়িক সমাজের একাধিক পরিবারে খোঁটা, পশ্চিমা, বিরিগাইয়া, ঠেকা প্রভৃতি নূতনব্রহ্মাণক ধাতিও উপরি উক্ত মতবাদের পোষকতা করিবে সন্দেহ নাই।

কেহ কেহ সাম্প্রদায়িক সমাজ মধ্যে কয়েকটি প্রাচীন মৈথিল আচারের প্রচলন স্থলীয় ৭ম শতাব্দীতে মৈথিল উপনিবেশের প্রমাণস্বরূপ বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রথমতঃ, মৈথিল ব্যবহার "মিতাকরা", সাম্প্রদায়িক সমাজে সমুদয় অতীতেও কমিনকালে প্রচলিত ছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, রঘুনন্দনের পূর্বকালে বঙ্গের সর্বত্র ও মিথিলায় স্থিতি-ব্যবহার যে সাদৃশ্য ছিল তাহা রঘুনন্দনের প্রভাবে বঙ্গদেশে বহুল পরিবর্তিত হইলেও বঙ্গের পূর্বসীমান্তে এহট্টে দীর্ঘকাল আপন বিশেষত্ব রক্ষা করিতে পারে। এমতাবস্থায় অধুনা বঙ্গদেশে লুপ্ত দুই একটি প্রাচীন ব্যবহার খ্রীহট্টে প্রচলন দেখিয়া সাম্প্রদায়িক সমাজের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই প্রমাণিত হয় না। দশ গোত্রীয় সাম্প্রদায়িক সমাজ মধ্যে অন্তর্কিরোধের ফলে কাভ্যায়নাদি পঞ্চ গোত্রীয়গণ কিছু কাল বাবৎ বৎসাদি পঞ্চ গোত্রীয়গণের প্রতি প্রতিগ্রাহী অপবাদে আরোপ

করিতেছেন। প্রতিগ্রাহী ৭ বলিয়া ৬৪০ খৃঃ অব্দ হইতে বাৎসগোত্রীয় নিধিপতি বংশীয়েরা ও বৎস ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাভ্রের ও পরাশর গোত্রীয়গণের পুংপুরুষগণ কাভ্যায়নাদি পঞ্চ গোত্রীয়গণ কর্তৃক রাজ্য স্রব্দের সময় পর্যন্ত সামাজিক আদানপ্রদানে বঞ্চিত ছিলেন, এবং স্রব্দনারায়ণের খঞ্জ কন্যাই সর্বপ্রথমে এই সামাজিক নিয়মের ব্যতিক্রমে কাভ্যায়ন রত্নপতির সহিত পরিণীতা হয়, এইরূপ উক্তি যে বিশ্বাসযোগ্য নহে তাহা আমরা অস্বীকার করিয়াছি। তর্কহুলে আনন্দ প্রতিগ্রাহী হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে খ্রীহট্টে উপনিবিষ্ট নিধিপতি-বাৎসগণের দ্বন্ধে এইরূপ অপবাদের আরোপ করা যায় না।

নিধিপতি বংশ ও খ্রীহট্টে পাঠান রাজত্ব—

আমরা আনুমানিক ১০০০ খৃঃ অব্দ নিধিপতির জন্মকালরূপে নির্দ্ধারিত করিয়াছি। নিধিপতির পুত্র ভূধর, এবং রাজ্য স্রব্দের পিতা ভানুনারায়ণ। ভূধর ও ভানুনারায়ণের মধ্যবর্তী "পুরুষগণের নাম সম্বন্ধে খ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ও জাতীয় ইতিহাস একমত হইতে পারেন নাই, সুতরাং নিধিপতিবংশীয়গণের বিবরণই নির্ভরযোগ্য। মুঞ্চকরের বর্ণনায় ভূধরের ভাস্কর, পুরুষ এবং প্রভাকর নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কেহ কেহ তিনটি নাম দেখিয়া, পিতাপুত্র সম্বন্ধ ছিল এই অনুমানে ১ পুরুষের পরিবর্তে তিন পুরুষ কল্পনা করিয়া থাকিবেন। প্রভাকরের পুত্র কেশব শিকদার নিধিপতির প্রপৌত্র। নিধিপতিবংশে কেশবই সর্বপ্রথম পাঠান রাজগণ প্রদত্ত শিকদার উপাধি প্রাপ্ত হন। কেশবের পুত্র কামদেব এবং পৌত্র শুভরাজও শিকদার উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। শুভরাজ শিকদার উপাধি অপেক্ষা অধিকতর সম্মানিত "ধান" উপাধি লাভ করেন। তৎকালে শিক-

\* মিশ্রগণ শাক্ত গুরু শিষ্য এবং বুরুজার সহিত ইহাদের নানাদোষ প্রথা প্রচলিত নাই, ইত্যাকার বিরুদ্ধ মতবাদও কেহ কেহ প্রচার করিয়া থাকেন।

৭ রাজার নিকট হইতে ভূমিদান গ্রহণে পাতিত্যা জন্মে কি না সন্দেহহীন।

\* প্রতিভা, ১৩২০, খ্রীহট্টের রঘুনাথ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

দায়গণের উচ্চ পদবী ছিল। কবিগ কথায় তৎকালে “সাত লক্ষ শ্রীহট্টের বড় শিকদার” নিযুক্ত থাকিতেন। শুভরাজ পরাক্রমশালী ব্যক্তি ছিলেন। গোড়ের পাঠান রাজধানীতে তাঁহার সম্মান লাভ সম্বন্ধে কবি মুজফর বলিতেছেন—‘বাহার প্রতিষ্ঠা ছিল গোড় বিজ্ঞমান’। তাঁহার কীর্তি, সুরাজ খাঁর দৌষি\* তাহার বসত ভূমি রাজধানী গ্রামে অত্যাধি বিজ্ঞমান আছে। ইনি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। নিম্নে নির্ধিপতি বংশীয়গণের আনুমানিক জন্মকাল নির্দ্ধারিত হইল—

নির্ধিপতির আগমন ও ভূত্বের সময়	সময়
	১৩৮৪ খৃঃ অক্ষ।
প্রভাকর ভাস্কর ও পুরুষের জন্ম	১৪১১ „
কেশব শিকদার	১৪৪৪ „
কামদেব „	১৪৭৪ „
শুভরাজ খান	১৫০৪ „
ভানুনারায়ণ	১৫৩৪ „
সুবিদনারায়ণ	১৫৬৪ „

নির্ধিপতিবংশীয়গণের মধ্যে শুভরাজ খানের পুত্র ভানুনারায়ণ পাঠান রাজগণ প্রদত্ত পৈত্রিক ‘খান’ উপাধি ধারণ না করিয়া ত্রিপুরা রাজ্যের সম্মানিত ‘নারায়ণ’ উপাধি সর্বপ্রথম ধারণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় তাঁহার জীবদ্দশাতেই বঙ্গে পাঠানগণের ভাগ্যবিশেষ্য ঘটবার আভাস পাওয়া যায়। এই সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমা দক্ষিণ শ্রীহট্টে বিস্তৃত হইয়া থাকিবে।

দক্ষিণ শ্রীহট্টের ভানুগাছ† অঞ্চলে ভানুনারায়ণ ত্রিপুরা-রাজ্যের পক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া বহু জনশ্রুতি প্রচলিত

\* এই দৌষি সাগর দৌষির উত্তরে। ইহারই তীরে বর্তমান রাজধানীর ধানী অবস্থিত। শুভরাজের প্রপ্রৌত্র জামাল খাঁর নামেও এই দৌষি পরিচিত হইয়া থাকে।

† কেহ কেহ ভানুনারায়ণের নামানুসারে ভানুগাছ নামের উৎপত্তি নির্দেশ করেন। চন্দ্রসিংহ ত্রিপুরের জ্যৈষ্ঠ ভানুজিৎ এবং ভানাই কুকীর নামানুসারে স্থানের নামকরণ সম্পর্কে ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। [‘চন্দ্রসিংহ ত্রিপুর’ প্রবন্ধ—প্রতিভা, মাঘ ১৩১২]

আছে। ভানুনারায়ণের পরে সুবিদও ত্রিপুরা রাজ্যের সাহায্যে রাজত্ব করেন। সুবিদের পরে দক্ষিণ শ্রীহট্টে ত্রিপুরার প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায় না। শুভরাজ এই অঞ্চলে ত্রিপুরার প্রাধান্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। এই সাময়িক প্রাধান্য বিদ্রোহী পাঠান দলপতি ওসমানের প্রভাবে তিরোহিত হইয়া যায়। ওসমান ১৬১২ খৃঃ অক্ষে ঢাকা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা ইসলাম খাঁর প্রেরিত সৈন্যগণ বর্জক নিহত হন, এবং তৎসঙ্গে পাঠান রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা অনুসারে ১৬০৩ খৃঃ অক্ষে ওসমান ভাওয়ালে পরাধিত হইয়া প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম পূর্বক পলায়ন করেন। এমত অবস্থায় বঙ্গে পাঠানগণের পরাভা (১৫৭৬ খৃঃ অক্ষ) ও ওসমানের পরাভব (১৬১২ খৃঃ অক্ষ) কালের মধ্যভাগে ভানুনারায়ণ প্রভাব বিস্তার করেন ও তৎপূর সুবিদ রাজত্ব করেন।

ভানুনারায়ণের পুত্রবর্গ—মুজফর শ্রীক্ষ নামে রাজা সুবিদের একটি মাত্র ভ্রাতার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ও জাতীয় ইতিহাস গ্রন্থে রূপচন্দ্র, বীরনারায়ণ, ধর্মনারায়ণ, ও ব্রহ্মনারায়ণ এই চারি ভ্রাতার নাম স্থান পাইয়াছে। চূর্তাগোর বিষয় এই যে, ইহাদের একটিও যে রাজভ্রাতা ছিলেন তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। পক্ষান্তরে ভূমিউড়া গ্রামের অন্তর্ভুক্ত শ্রীপাড়ার প্রতিষ্ঠাতারূপে শ্রীক্ষের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমে ধরা যাউক রূপচন্দ্রের কথা। রাজা সুবিদের হিন্দু শাখা সমূহ নির্ধিপতির সময় হইতে শ্রীহট্টের সাম্রাজ্যিক সমাজভুক্ত; কিন্তু বনভাগের চৌধুরীগণ (যাঁহারা সম্প্রতি রূপচন্দ্রের বংশধর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন) কখন কালেও সাম্রাজ্যিক সমাজভুক্ত ছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায় না। অতঃপর বীরনারায়ণের কথা। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে “সন ১০৬ বঙ্গাব্দের অব্যবহিত পরে” (অর্থাৎ ১৪৯৯ খৃঃ অক্ষের



চৈত্র ১৩২১

অব্যবহিত পরে) এমন রাজবংশীয় সক্তি শালামৎ নামক জনৈক ব্যক্তি দিল্লীর লোদী বংশীয় সম্রাট হইতে শ্রীহট্টে জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া পশ্চিমপাশায় বাস করেন এবং বীর নারায়ণের কণ্ঠকে বিবাহ করেন। ১৪২২ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ বর্তমান কাল হইতে ৪১৬ বৎসর পূর্বে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে বর্তমান হইতে ৯ পুরুষ পূর্ববর্তী পাত্রীর বিবাহ কাহিনী অতীব বিস্ময়কর বলিয়া বিবেচিত হইবে সন্দেহ নাই। পরিশেষে অপর দুই রাজভ্রাতা ধর্মনারায়ণ ও ব্রহ্মনারায়ণের কথা। আমরা ধর্মনারায়ণের বংশ-পত্রিকা তৎকালীয়গণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। নিয়ে উহা সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল—

- ১ ১৬১৮ ধর্মনারায়ণ (শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ও জাতীয় ইতিহাস অনুসারে রাজা সুবিদের ভ্রাতা।)
- ২ ১৬৪৮, মাধব রায় চৌধুরী (ইনি সর্বপ্রথম চৌধুরী পদ লাভ করেন।)
- ৩ ১৬৭৮ গোপীনাথ চৌধুরী
- ৪ ১৭০৮ রামনারায়ণ চৌধুরী
- ৫ ১৭৩৮ গোবিন্দনারায়ণ চৌধুরী
- ৬ ১৭৬৮ লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী
- ৭ ১৭৯৮ ভয়নারায়ণ চৌধুরী
- ৮ ১৮২৮ হর্গানারায়ণ চৌধুরী (জন্ম ১৮১৮ খৃঃ অব্দ।)
- ৯ ——— শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী জন্ম (১৮৬৫) খৃঃ অব্দ  
অপুত্রক।

বর্তমান হইতে ৯ পুরুষ পূর্ববর্তী ধর্মনারায়ণের আবির্ভাবের কাল বংশপত্রিকা হইতে আনুমানিক ১৬১৮ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং ব্রহ্মনারায়ণ তাহার ভ্রাতা হইলে ইহার পরেই দুই ভ্রাতা দুইটি পৃথক বংশ স্থাপন করিয়া থাকিবেন।

উভয় পরিবারের বাসভূমির মধ্যে ৫ ক্রোশের অধিক ব্যবধান নহে। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উভয় পরিবার মধ্যে এতাবৎ কাল জাতিভেদের পরিচয়, জন্ম-নাম জানা ছিল না। ফলে, বড়মচালের দৌহিত্রগণ ছয়-চিড়িতে এবং ছয়চিড়ির দৌহিত্রগণ বরমচালে বিবাহ করিয়া আসিতেছেন। এই দুইটি সম্মানিত পরিবারে নিকট জাতিভেদের পরিচয় থাকিলে ঈদৃশ বিবাহ নিশ্চয়ই অনুমোদিত হইত না। আমরা ইটার দেওয়ান সাহেব-গণের নিকট তাহাদের পরিবারের সহিত ছয়চিড়ি এবং বড়মচালের বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইয়াছি যে, রাজপুত্র হাজি খাঁ হইতে সপ্তম মাং আফজল চৌধুরী, এবং রাজপুত্র জৈনা খাঁ হইতে সপ্তম, মাং আহছাম চৌধুরী এই উভয়ের মৃত্যু সংবাদ ছয়চিড়িতে প্রচারিত হইল, তত্রত্য গুরু প্রসাদ চৌধুরী প্রভৃতি জাতির মরণ অশৌচের নিদর্শন স্বরূপ ব্যবহৃত মৃদ-ভাঙাদি বর্জন করেন, এবং ইহাদের সময় পর্য্যন্ত ছয়-চিড়ি হইতে মৃত্যু সংবাদ আসিলে দেওয়ান গৃহেও তরুণ অশৌচাদি আচরিত হইত। ইহার পর পুরুষে অর্থাৎ আব্দুল খালেক চৌধুরীর সময়ে সাত পুরুষ উত্তীর্ণ বলিয়া উক্ত সামাজিক প্রথা রহিত হয়। বড়মচালের চৌধুরীর সহিত দেওয়ান পরিবারের জাতিভেদের পরিচয় তাহারা জ্ঞাত আছেন, কিন্তু এই দুই পরিবারে উপরি উক্ত সামাজিক প্রথা প্রচলিত থাকিবার কিংবদন্তী পর্য্যন্ত নাই। মুজফর “রামলক্ষণ” প্রতিম যে দুই হিন্দু-রাজপুত্রের কথা বলিয়াছেন, ধর্মনারায়ণ ইহাদের অজ্ঞাতম হইবেন; আর ব্রহ্মনারায়ণ নিষিদ্ধি বংশীয় হইলেও দূর-বর্তী জাতি হইবেন। ইহারা পরস্পর সহোদর ভ্রাতা রূপে, অথবা ইহাদের কেহই সুবিদ নারায়ণের সহোদর ভ্রাতারূপে, গণ্য হইবেন না।

রাজা সুবিদনারায়ণ—(১) রাজার পারিবারিক জীবন—ইটা রাজ-সমাজ-পতি সুবিদ-নারায়ণের রত্নাবতী ব্যতীত অপর কোনও

কল্পার কথা মুখ্যকর উল্লেখ করেন নাই। এই কল্পা খল হওয়ার রাজাকে বহু অশান্তি ভোগ করিতে হয়। অবশেষে বহুকষ্টে বিড়িগ্রাম বাসী কাত্যায়ন গোত্রীয় রঘুপতি নামক জনৈক ব্রাহ্মণ-তনয়ের সহিত রত্নাবতীর বিবাহ হয়। কিছুকাল পূর্বে ত্রিযুক্ত অচ্যুত চরণ তঞ্চ-নিধি মহাশয় রঘুপতির রঘুনাথ নামক এক কনিষ্ঠ ভ্রাতার আধিকার করেন। আমরা এই রঘুনাথের নাম বিভিন্ন কাত্যায়ন বংশপত্রিকায় প্রাপ্ত হই না। অনেকে রঘুপতিকে গৃহকামাতারূপে অভিহিত করেন। এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, রাজার একাধিক উপযুক্ত পুত্র-সন্তান বর্তমানে তাঁহার কল্পা উত্তরাধিকারিণী হইতে পারেন না। বর্তমানে সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তির অঙ্গহীনা কল্পা বিবাহ করিয়া অনেক দরিদ্র যুবক জীবন ধারণের সুবিধা করিয়া থাকেন। যাহারা এইরূপ “অচল কল্পা” বিবাহ করিয়া থাকেন তাহাদের সকলেই গৃহকামাতা পদবাচ্য নহেন। আর এই বিবাহে রঘুপতি যে ভূমি-উড়া প্রভৃতি পঞ্চগ্রাম যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হন, এই উক্তির অসারতা সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ভূমিউড়া রাজার পিতৃপুরুষ ও জাতিবর্গের বাসস্থান, আর এই গ্রামেরই একাংশ বিজ্ঞাবিনোদবংশীয় রাজপুরুষের ব্রহ্মোত্তর স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এমত অবস্থায় রঘুপতিকে ভূমিউড়া গ্রামদানে নিষ্ঠাবান পরিবারে পুনঃ-দানদোষ সূচিত হয়। রাজকল্পার শাখার রাজা সুবিদ হইতে ৮৯ পুরুষ চলিতেছে।

(২) রাজার চরিত্র ও সামাজিক জীবন—সুবিদ-নারায়ণের রাজত্বের প্রারম্ভে ইটারাজ্য তাঁহার খাস তহশীলে ছিল না। ইটা জনপদে কয়েকটি ভূঁইয়া ছিল। ইহার

সামাজিক অথবা ভূমি সংক্রান্ত প্রকার নিকট হইতে বিরোধ ফলে ইটার বহু ব্রাহ্মণ রাজস্ব সংগ্রহ করিত দেশত্যাগী হইবার কাহিনী এবং ইচ্ছাক্রমে রাজ-প্রকৃত কি না?

কোষে রাজস্ব প্রদান করিত। রাজা নিজে

রাজস্ব সংগ্রহের মানস করিলে ভূঁইয়াদিগকে বিপদভাগ করিতে প্রবৃত্ত হয়। রাজা এই সময়ে একটা কোমল অবলম্বন করেন। তিনি ভূঁইয়াদিগকে সুরাজ বীর দীঘির উত্তর তীরে একস্থানে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া গৃহে অগ্নি সংযোগ করতঃ নিহত করেন। তদবধি এইস্থান শত্রুঘর্দন নামে অভিহিত হইতেছে। বর্তমানে ভূঁইয়া-দিগের অবস্থার পরিবর্তন ঘটয়াছে। মল্লসর নগরের দক্ষিণ পশ্চিমদিকে অবস্থিত লামুয়া নিবাসী শেখ দসরৎ উল্লা, আক্তার উদ্দিন প্রভৃতি এবং তারাপাশার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত মশাজান গ্রাম নিবাসী উকুমিঞা প্রভৃতি ভূঁইয়াদিগের বংশধররূপে ইটা অঞ্চলে পরিচিত।

(৩) ওসমান অভিযান—সুবিদনারায়ণ রাজত্বের প্রারম্ভে যে ভাবে শত্রুঘর্দন করেন নিয়তি তাহার ভাগ্যে সেইরূপ অপমৃত্যুই সাধিয়াছিলেন। ওসমান কাহিলী আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করিয়াছি।\* ওসমানের পরাক্রম স্বয়ং সম্রাট জাহাঙ্গীর মুক্তকণ্ঠে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রবল পাঠান সৈন্যগণের প্রতিরোধ করা রাজা সুবিদের সাধ্যাতিত ছিল। পূর্ব প্রবন্ধের পর যে সকল নূতন তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহার মর্ম্ম নিয়ে প্রদত্ত হইল।

সম্রাট আকবর পাঠান রাজশক্তি পরাভূত করিলেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত বিভিন্ন পাঠান দলপতি বঙ্গের সীমান্ত ভাগে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। ১৬০৩ খৃঃ অব্দে পাঠান দলপতির বঙ্গের পূর্বসীমান্তে আশ্রয় গ্রহণ সম্বন্ধে ইতঃপূর্বে আলোচিত হইয়াছে। অতঃপর ত্রিপুরা সীমান্তে অবস্থিত একটা ক্ষুদ্র রাজ্য অধিকার পূর্বক ত্রিহর্ষাগড়ে ওসমান শক্তিসঞ্চয় করিতে মনোনিবেশ করিলেন। স্থানীয় লোকের নিকট ত্রিহর্ষা “ছিড়ি-উজি” এবং ওসমান “খাজা উচমান” রূপে পরিচিত।

\* প্রতিভা, ভৈষ্ঠ ১০২০, “বঙ্গের ওসমান খাঁ” প্রবন্ধ।

(৪) সুবিদের মৃত্যু ও পাঠান প্রভাব—সুবিদনারায়ণের

রাজ্য অধিকৃত হইলে পর রাজা সুবিদের পরাভব- রাজধানী রাজনগর পরিত্যাগ কাগী ওসমান ১৫৪৮ খৃঃ পূর্বক উহার দক্ষিণ দিকে লক্ষে নিহত হন কি না? প্রায় দুই প্রহরের রাঙা ওসমান মুরসিদাবাদের দূরবর্তী ত্রীহুর্ধ্যগড়ে ওসমান নবাবের সেনাপতি হইতে নিজবাস পরিবর্তন করেন। পারেন কি না? অতঃপর তিনি এই দুর্গ অশ্রুত করিতে ব্যস্ত হইলেন। রাজা ওসমান কর্তৃক আত্মহানিক

১৬০৪ খৃঃ অর্ধে নিহত হইবার সময় তিনি বহু সন্তানের পিতা; ইহার পূর্বেই তাহার কতারা বিবাহ পর্য্যাপ্ত সম্পন্ন হইয়াছিল। তাহার এক পক্ষের দুই পুত্র আমাল খাঁ এবং কামাল খাঁ নামে এবং অপর পক্ষের দুই পুত্র হাজি খাঁ ও জৈশা খাঁ নামে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হন। “রায় নন্দন” প্রতিম অপর দুই পুত্র পলায়ন পূর্বক জাতি রক্ষায় মর্ষ হন। চারিটি মুসলমান রাজকুমার রাজনগরে অবস্থিতি করিতে থাকেন। অতঃপর ত্রীহুর্ধ্য দুর্গে ওসমান স্বাধীন পাঠান রাজ্যের স্থচনা করিলেন। ওসমান রাজনগর পরিত্যাগ কালে \* এই স্থানের ও রাজপুত্রগণের রক্ষাবেষ্টণের নিমিত্ত যে সকল পাঠান রাজনগরে স্থাপিত করেন, তাহাদের কয়েক জনের বংশ পাঠান টালা, ঝারপারা, ঝাকর, বোভিতপুর, কলিগাও এবং গহুমানপুর গ্রামে এখনও রহিয়াছে। মোগল রাজত্বে ইহারা ‘খুসবাস’ খ্যাতি লাভ করে এবং রাজপুত্রগণের উপর ইহাদের ভরণপোষণের ভার অর্পিত হয়।

\* ওসমান কর্তৃক কাটা মল্ল বা ভটর ঝাল খনন এবং ধর্মপ্রচার সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে। [প্রতিভা, ১৩২০, আমার রচিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।]

ভটর ঝাল নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় যে, বহু ব্রাহ্মণকে ঝাল খননে বাধ্য করা হইয়াছিল। ধর্মপ্রচার সম্বন্ধে নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে ধর্মপ্রচারও উল্লেখযোগ্য। বহু ঝালী এবং ভুখলা (চুলী) এই সময়ে মুসলমান

মোগল রাজত্ব এবং ইটারাজবংশীয়গণ—

১৬১২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিশ্বস্ত সুবাদার ইসলাম খাঁ কর্তৃক প্রেরিত সেনাপতি সুলতান খাঁ কর্তৃক ওসমান পরাজিত হইলে পর তাহার রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয়। দেশে শান্তি স্থাপিত হইলে একে একে অনেক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ও ভক্ত সন্তান স্বীয় আবাসভূমিতে ফিরিয়া আসিলেন।

রাজপুত্রগণ ইহার পরেও প্রায় ১৫ বৎসর কাল হীনাবস্থায় অতিবাহিত করেন। অবশেষে ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে তাহাদের অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটে। ১৬২৮ খৃঃ (অর্ধে ১০৩৫ সনে) তাহাদের পৈতৃক রাজ্যের একাংশ ইটা, ইন্দ্রেশ্বর, পালপুর, উয়াসা এই চারি জুয়ারে বিভক্ত করিয়া তাহাদের নিকট বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। মিরজা মহম্মদ তকী ও দেওয়ান ভাইয়া ঠেওরব দাসের আদেশে আমিনমুজা মহম্মদসরিপ হইতে তরপ মোকামে রূপ রায়, শিব রায়, রতি রায় ও ভবানন্দ রায় নামে রাজপুত্র-ধর্ম গ্রহণ করে। ভুখলা দিগের সামাজিক অবস্থা এবং ধর্ম পরিবর্তনে সমাজে ঘৃণা হওয়াতে ইহাদের কয়েকটি নেতা ওসমানের রূপায় সমাজে উচ্চ স্থান লাভ করিতে সমর্থ হয়।

লোকমুখে এবং প্রাচীন দলীল পত্রে ওসমানের পুত্র মমরোজ এবং তাহার ভ্রাতা আলীরও কয়েকটি কীর্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। যথা—

(১) মমরোজের জালাল ও কেল্লা—জালালটি পূর্বে একটি প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রপথ ছিল, এখনও স্থানে স্থানে ইহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা রাজনগরের অদূরবর্তী মল্ল নদীর বাম তীর হইতে ভানুগাছ পরগণার আদমপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কেল্লা আলিনগর চা বাগানের পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল। বর্তমানে স্থানটি জঙ্গলাকীর্ণ।

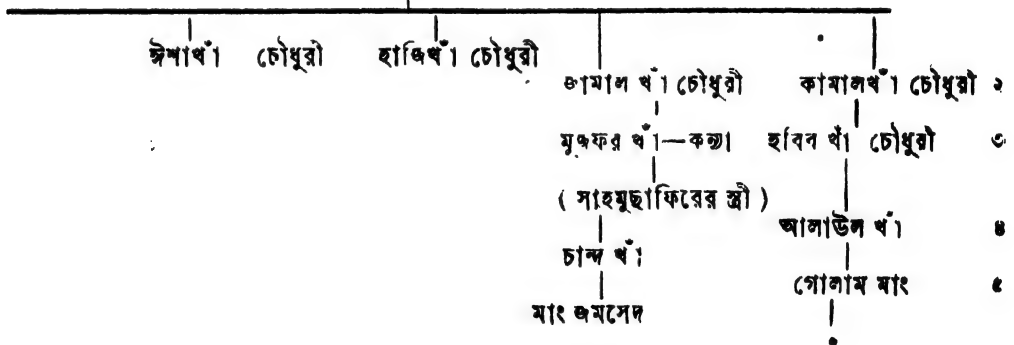
(২) অলি মহম্মদের কাটারা—মল্লর উত্তর তীরে কোণাগাউ গ্রামের একটি জঙ্গলাকীর্ণ স্থান বহুকাল ধাবৎ এই নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

গণের কুর্খচাৰী চারি রাজপুত্রের পক্ষে ১৩১৪ মিলান  
জমায় ৩৭৫টা মোলা বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন। এই বন্দোবস্ত  
সংক্রান্ত দলিল তজকিরাত চৌধুরাই নামে পরিচিত।  
রাজবংশীয় ইটার দেওয়ান গৃহে এই দলিল অজ্ঞাপি রক্ষিত  
আছে। কালের প্রভাবে দীর্ণ এবং স্থানে স্থানে পাঠের  
অবোধ্য হইলেও ইহা এখনও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই।  
এই সময় হইতে রাজবংশীয় ৪ বর চৌধুরী ( জমিদার )  
এবং কুর্খচাৰীগণের কাননগো ও পাটওয়ারী কার্য,  
তদবধি ইহাদের দস্তখৎ পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিয়াছে।

জাতীয় ইতিহাস ( ৩য় অংশ ২২৩ পৃঃ ) অনুসারে  
“সুবিদের রাজ্যপ্রাপ্তি বনবন্দী চারিপুত্র চৌধুরী উপাধি  
প্রাপ্ত হইয়া নবাব কর্তৃক ভূম্যধিকারী পদে নিযুক্ত হন”।  
সুতরাং এই মত অনুসারেও তজকিরাত বিবরণ সমর্থিত  
হয়।

জাতীয় ইতিহাস গ্রন্থে অতঃপর লিখিত হইয়াছে,

#### রাজাসুবিদনারায়ণ



ইংরেজ রাজত্বে রাজবংশীয়গণের অবস্থা—সুবিদ  
নারায়ণ ইটা জনপদের রাজা এবং সম্রাট ছিলেন।  
তাহার মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণবর্গ জাতিনাশ ভয়ে এবং  
ওসমানের অত্যাচারে দেশত্যাগী হইতে বাধ্য  
হন। রাজপুত্রগণের জাতি নষ্ট হয় এবং তাহারা  
একরূপ সর্বস্বান্ত হইয়া পড়েন। বোগল শাসন স্থাপিত  
হইবার ১২৬৯সর পরে তাহারা পৈতৃক রাজ্যের একাংশের

বন্দোবস্ত পাইয়াছিলেন। কিন্তু সকল শাখার পক্ষে দীর্ঘকাল  
সম্পত্তি ভোগ হইল না। নানা কারণে অনেক শাখা  
ক্রমে হীনবল হইয়া পড়ে। কবি ইহা লক্ষ্য করিয়া  
মনোদুঃখে লিখিয়াছেন—

“কহে মুজফর গুন সর্বজন,  
নিধিপতির সন্তানের হৈবে বিড়ম্বন ॥”  
মুজফরের কথা বহু পরিমাণে বাস্তব ঘটনায় পরিণত

\* ১৩২০ সনের প্রতিভার মন্তচিত্র প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

চৈত্র ১৩২১

হইয়াছে। বর্তমানে তাহাদের ভূসম্পত্তি নিলাম ধরিত্র  
হুজে কতিপয় বঙ্গীয় ভূস্বত্বিকারীর অধিকৃত। ইংরেজী  
ভাষার চর্চার অভাবে রাজসম্বন্ধিগণ মধ্যে কেহ উচ্চ  
রাজকার্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হন নাই। দেওয়ান  
আবদুল খালেক চৌধুরী সাহেবের শাখা মাত্র এই বংশের  
পূর্বে গৌরব এখনও কথঞ্চিৎ পরিমাণে রক্ষা করিয়া  
আসিতেছেন। ইহারা ইটা অঞ্চলে হিন্দু মুসলমান  
অধিবাসীবর্ণের মধ্যে এইরূপ অকৃত্রিম সম্ভাব, প্রীতি, ও  
সৌজন্তের সকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, তাবিলে  
বিস্মিত হইতে হয়। সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারসমূহের  
সহিত বিবাহোপলক্ষে সিউলী আদান প্রদান, শুভকর্ম  
উপলক্ষে যোগদান এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।  
কাহারও গৃহে কোনও শুভকর্ম উপস্থিত হইলে  
পান-মুপারী পরিপূর্ণ একটি থালা সহ “জানানী” লইয়া  
দেওয়ান গৃহে আগমনের প্রথা ইটা অঞ্চলে একটি  
নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সাধারণ লোকে অর্ধকুরি \*  
পান ও অর্ধ “বী” † মুপারী উপহার লইয়া আসিয়া  
থাকে। কেহই যথা আবশ্যক সাহায্য লাভে বঞ্চিত  
হয় না।

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র গুহ

### পরিশিষ্ট

১। নাসিরুদ্দিনের সনন্দ—

Seal—Abul Mujaffar Nooruddin Jahangir  
Badsha Gazi office of Md. Islam khan 1024 Hizri  
True copy of translation from Persian into  
English.

Superior government officials of the present  
and the future Chowdries and Kanangoes of  
Sircar, Sylhet be informed. It appears obvious  
that Nasiruddin Chowdry of Parganah Kani-  
haty is an agent of goverment and loyal to the  
throne and in the battle with Usman the rebel  
tried his best exerting himself to the best of  
his abilities and readily afforded all possible help  
and as-istance to the Goverment. So for the  
loyalty he showed the Goverment is pleased  
to grant as his subsistence allowance a plot of  
waste land 30 Kulbas (thals) rent-free from the  
villages of Matabpur and Paboi of the said  
Parganah from the next harvest season.

It is ordered that the land noted above  
should be made over to his possession and that  
no one should present any obstacle to this and  
this is to be treated as urgent.

21st Safar, 9th year of his Imperial Maje-  
sty's coronation.

\* ২২টা পান=১ হালা, ২০ হালা=১ কুরি, ২৫  
হালা=১ পাই, ৪ কুরি=১ পিত্রি,

† ১০টা মুপারী=১ ধা, ৩০ ধা=১ বী।

## ২। কুংবুল আউলিয়ার বংশপত্রিকা।

( ছৈয়দ খলিল উদ্দিনের এবং মহম্মদ আফজল চৌধুরীর পারশ্ব গ্রহ অবলম্বনে )

- ১ কুংবুল আউলিয়া ( ইনি রাজা সুবিদের স্ত্রুহু ছিলেন। ) মুড়ারবন্দ নামক স্থানে তাহার দরগা অবস্থিত। সাগরদাখির দক্ষিণ তীরে যে স্থানে তাহার সহিত রাজা সুবিদের মিলন হইত, একটি উচ্চ মাটির ঢাবী উক্ত মাজার স্থান নির্দেশ করিতেছে।
- ২ সৈয়দ সাহ ইলিয়াছ  
উঃ কাজি খন্দকার ( ইনি প্রতাবগড়ের জমসের কত্তা বিবাহ করেন )
- ৩ ছৈয়দ সাহ আলমাছ
- ৪ " " মুছাফির,  
( উঃ ছৈয়দ মনির। ইনি রাজপুত্র জামাল খাঁর কত্তা বিবাহ ক্রমে রাজখলা গ্রামে বাস স্থাপন করেন )
- ৫ " " আলী আজগর
- ৬ " " ফেরদাউছ ( মৃত্যু ১১৪০ পরগণাতি সনে, ৮ জমাদিছ ছানি।  
ইনি আবদুল হেকিমের কত্তা নজাই বিবিকে বিবাহ করেন )
- ৭ 

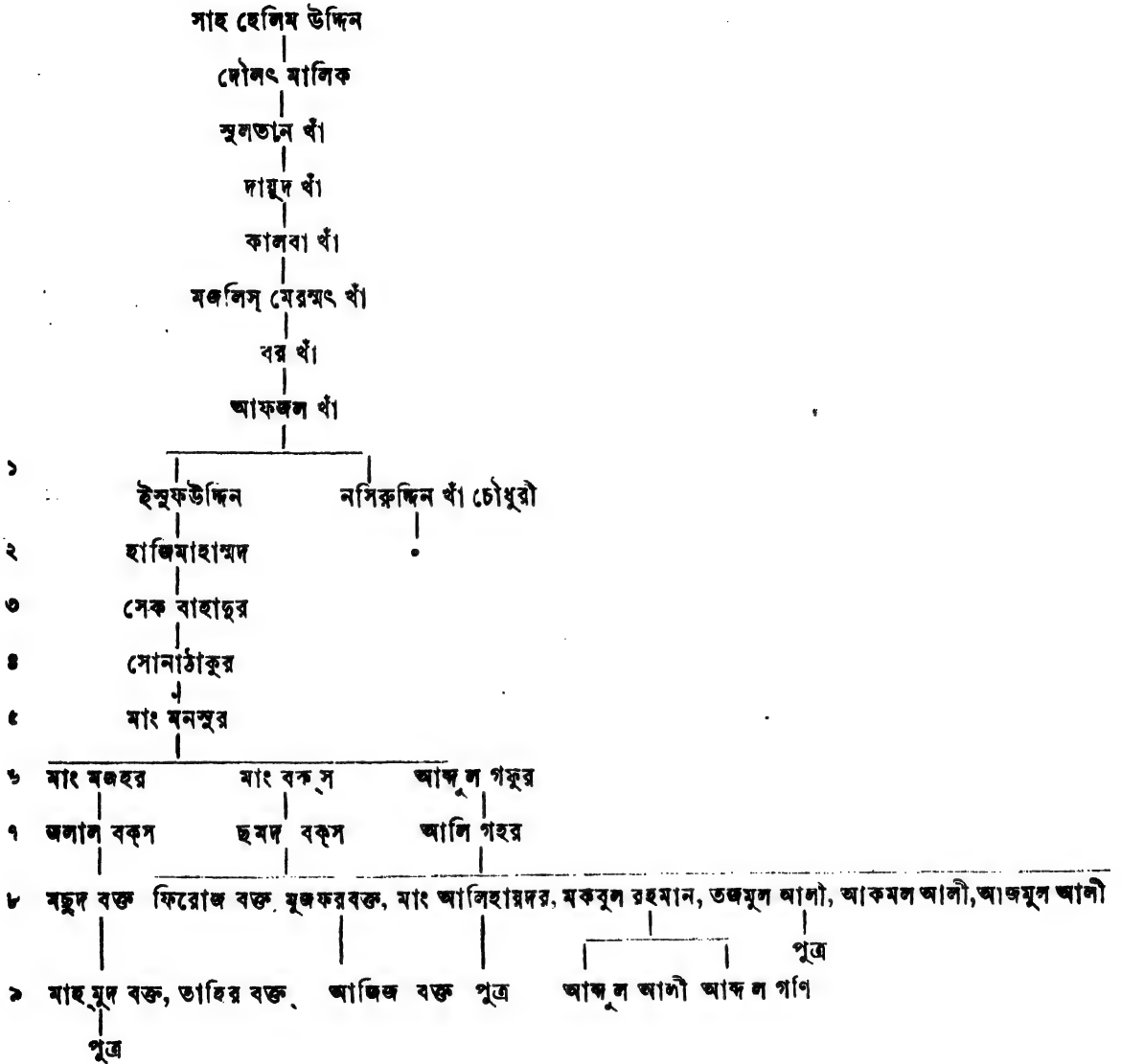
---

ছৈয়দ মাং বাকির

( ইহার মাজার সাগর দীঘির পশ্চিম তীরে। )

ছৈয়দ সাহ সমছউদ্দিন ( মৃত্যু ১১২৪ পরগণাতি সনের ওরা সফর। )
- ৮ ছৈয়দ সাহ আক্তার উদ্দিন ( উঃ জিতু মিঞা। ইনি  
মাং নওয়াজ চৌধুরীর কত্তা আয়না  
বিবিকে বিবাহ করেন। )
- ৯ " " ফরজন্দ আলী
- ১০ " " আকবর আলী হামিদা বাহু ( বামী মছদ আলী )  
( উঃ আলীজান মিঞা )
- ১১ ইছা গাভী
- ১২ ইব্রাহিম গাভী  
( জিনারপুর )

## ৩। নসিরুদ্দিন খাঁর বংশ পত্রিকা



## খেলা

( ষ্ট্যানলী হল্ প্রণীত গ্রন্থাবলম্বনে )

বালকগণ খেলাতে যে সময় অতিবাহিত করে, তাহা নিতান্ত অপব্যয়িত হয় বলিয়াই আমাদের দেশের অনেকের ধারণা। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বালকের ক্রীড়া তাহার চরিত্রের গঠনে সহায়তা করে। জাতীয় উন্নতি ও অবনতির সহিত ও খেলার অতি নিকট সম্পর্ক। ইংরাজদের মধ্যে একটা কথা আছে যে, ইংলণ্ডের ক্রীড়াক্ষেত্রেই ওয়াটালু-বিজয়ের বীজ উদ্ভূত হইয়াছিল। ইহা কিছুমাত্র কল্পিত বা অতিরঞ্জিত নহে।

বস্তুতঃ খেলাই মানুষের স্বভাব। ভূমিষ্ঠ হইয়াই শিশু খেলিতে থাকে। শিশুর খেলার কিছুমাত্র কৃত্রিমতা বা জটিলতা নাই। কেহ কেহ বলেন যে, শরীরকে ভবিষ্যৎ-কর্মো-পযোগী করিয়া লওয়াই শিশুর খেলার মূল উদ্দেশ্য, কিন্তু এই মত তাদৃশ সমীচীন বোধ হয় না। ক্রমবিকাশ-বাদিগণ বলেন যে, আমাদের শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি-যেমন পূর্ব-পুরুষগণের নিকট হইতে লব্ধ, সেইরূপ বংশানুক্রম হিসাবে তাহাদের কার্যকারিণী শক্তি ও মনোবৃত্তিও আমাদের দেহে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। শিশুগণ ক্রীড়াচ্ছলে এই বংশপরম্পরালব্ধ কর্ম-শক্তি ও মনোবৃত্তির পুনরভিনয় করিয়া থাকে মাত্র। ইহারা বলেন, যাহা জাতিহিসাবে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বা নুতন, শিশুর খেলাতে এমন কিছুই আভাস পাওয়া যায় না। পূর্বগামিগণ পুরুষপরম্পরাক্রমে যে ভাবে কাজ করিয়া গিয়াছেন, শিশুগণ খেলার সময়ে ঠিক সেই ভাব বা প্রণালীরই অনুকরণ বা অনুসরণ করিয়া থাকে ; এবং উহাদের স্বাভাবিক ক্রীড়া-পদ্ধতি বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাহাতে পূর্ব-পুরুষগণের কার্যপদ্ধতি ও মনোবৃত্তির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। ক্রমবিকাশ-বাদিগণ আরও বলেন যে, হঠাৎ এক দিনে মানুষের বাবতীয় কার্য-পদ্ধতির পরিবর্তন করিয়া দিলেও, শিশুর

খেলার মূল প্রকৃতির কিছু মাত্র পরিবর্তন হইবে না। সে ঠিক পূর্বের মতই খেলিতে থাকিবে। তবে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে বতই সে পারিপার্শ্বিক প্রভাবের অধীনে আসিবে, ততই তাহার খেলার প্রকৃতিও পরিবর্তিত হইবে।

পূর্বপুরুষগণের সমস্ত কার্যপদ্ধতি বা মনো-বৃত্তির পরিচয়ই যে শিশুক্রীড়াতে দেখা যায়, তাহা নহে। অনেকগুলি হয় ত অল্পরেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়—কতকগুলি হয়ত তাদৃশ পরিস্ফুট আকার ধারণ করিতে পারে না। এ বিষয়ে একটা বিশেষ ক্রম বা ধারা লক্ষিত হয়,—জাতির হিসাবে যাহা বয়স প্রাচীন, শিশু জীবনে তাহা তত প্রথমে অনুষ্ঠিত হয়।

পূর্ব-জন্মের স্মৃতিশক্তি অতিশয় প্রবল থাকে বলিয়াই বোধ হয়, শিশুগণ এত প্রাণমন খুলিয়া খেলিতে পারে। ইংরাজীতে একটা কথা আছে—Man is whole only when he plays—একমাত্র খেলাতেই মানুষের পূর্বের প্রকৃতি হয়। কথাটা খাটী সত্য। বাস্তবিক সেই খেলাই প্রকৃত খেলা বাহাতে শরীর ও মন যুগপৎ সমভাবে নিয়োজিত হয়। শুধু শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখিলে উহার মাংস বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এবং অতিরিক্ত ভাবে কেবল মাত্র মানসবৃত্তির অনুশীলন করিলে উহা ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই হিসাবে খেলাই শিশুর পক্ষে আদর্শ ব্যায়াম—ইহাতে শরীর ও মন যুগপৎ উভয়েরই উন্নতি সাধিত হয়।

প্রাচীন গ্রীসে যুগপৎ শারীরিক ও মানসিক শক্তির অনুশীলন করা হইত। সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর (Plato) মতে দুর্বলতা অসচ্চরিত্রতারই পরিচায়ক এবং অঙ্গবৈকল্য পূর্বজন্মানুষ্ঠিত পাপের ফল মাত্র। প্লেটো বলিতেন, এমন ভাবে শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা করা উচিত যে, তাহাতে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ উন্নতিই এককালে সাধিত হইতে পারে। কেন না সুস্থ ও সবল শরীরই উন্নত মনের আধার। গ্রীসের সর্বসাধারণের মধ্যে



চৈত্র ১৩২১

ক্রমে এই ধারণা এতই ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে উত্তর কালে গ্রীসে সুস্থ ও সবলকায় ব্যক্তিমাত্রই দার্শনিক আখ্যা প্রাপ্ত হইত। (Valere est philosophari—to be well and strong is to be a philosopher.) শারীরিক ও মানসিক শিক্ষার মধ্যে যে কিছুমাত্র পার্থক্য থাকিতে পারে, প্রাচীন গ্রীকগণ তাহা কল্পনায়ও ভাবিতে পারে নাই। একের অবহেলা করিয়াও অস্ত্রের উন্নতি করা সম্ভব ইহা তাহাদের নিকট নিতান্ত প্রহেলিকাব্যবোধ হইত। শারীরিক মাংসপেশীসমূহের সম্যক পরিচালনা দ্বারাই মস্তিষ্কেরও উন্নতি হইয়া থাকে, কোমলহস্তপদবিশিষ্ট ও অনবরতোপবেশনবশতঃ শুল্কায় রক্তশূন্য, সর্বদা অধায়ননিরত মানুষ প্রাচীন গ্রীকদিকের চক্ষে অত্যন্ত জ্ঞানোন্মাদ বলিয়াই বোধ হইত। নির্দোষ জীড়া নৈতিক শিক্ষালব্ধিবেশ। এখানে শুধু শারীরিক শক্তির চর্চা হয় না,—পরন্তু সংসাহস ও আত্মবিশ্বাস শক্তিরও উদযোজন হয়। নির্দোষ জীড়াতে জীবনের জটিলতাপূর্ণ পথ সরলীকৃত হয়, মনে উৎসাহ জন্মে, এবং দ্বিপ্রভা অথচ দৃঢ়তা সহকারে কার্য করিবার শক্তির বিকাশ হয়। ইহা আমাদের বিপদে হৈর্য্য প্রদান করে এবং আমাদের ব্যক্তিত্বের সম্যক প্রকাশে সহায়তা করিয়া থাকে। বাহ্যিক ভাল করে ও ভাল কাজ করিবার প্ররুতি ও ক্ষমতা প্রদান করে, গ্রীক দর্শন শাস্ত্রে তাহাই জ্ঞান নামে উক্ত হইয়াছে। জেনোফন (Xenophon) বলেন, যে ব্যক্তি সর্বদা আত্মোৎকর্ষ সাধনে সচেষ্ট, সেই সর্বোৎকৃষ্ট মানব, এবং যে বৃদ্ধিতে পারে যে, তাহার উন্নতি হইতেছে সেই সকলের অপেক্ষা সুখী। সোক্রেটিসের (Socrates) মতে জ্ঞানে ও কার্যশক্তিতে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। (Kennen und kunnen—to know and have the power to do). বক্তব্যঃ শারীরিক ও নৈতিক উন্নতি পরস্পর অবিতর্কিত।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বতঃ প্রণোদিত বাতাবিক

জীড়াই আমাদের বংশোদ্ভূত-প্রভাবের পূর্ণ প্রকাশক। শুধু তাহাই নহে। কর্মশক্তির দ্বারা আমরা যে বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকি, তাহারও মূল কারণ এই বংশোদ্ভূত প্রভাব। প্রাণীমাত্রই তদীয় অন্ন-প্রত্যাদির সম্যক ব্যবহার করিতে বাধ্য, নতুবা তাহার জীবনভিত্তি ও পরিণামে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। দুর্বলতার অপেক্ষা দুঃখপ্রদ আর কিছুই নাই। পক্ষান্তরে সুস্থ ও সবলকায় ব্যক্তি স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। উৎসাহশীল, কর্মক্ষম, ও সবলকায় হওয়া অপেক্ষা যুবকগণের প্রাণিতব্য আর কিছুই থাকিতে পারে না। মানুষের মূল প্রকৃতি ও অতীত ইতিহাস ক্রমে তাহাকে এমনই করিয়া গড়িয়াছে যে, এতদ্বারা তাহার শারীরিক ও মানসিক প্রবৃত্তিসমূহ যুগপৎ উদ্বেজিত হয়, শরীরের ধ্বংসপ্রাপ্ত পদার্থসমূহ অল্পজ্ঞান সহযোগে পুনর্গঠিত, বা অল্পবিধ উপায়ে শরীর হইতে নিষ্কাশিত হয় এবং সর্বপ্রকার অলসতা দূরীভূত হয়। খেলাতে আমাদের কর্মশক্তি ও ইঞ্জিনিয়ার নিয়ন্ত্রিত ও সুপথগামী হয় উপযুক্ত সময়ে চিন্তাশক্তির স্থিতিস্থাপকতা জন্মে। ইহাতে মানুষ সংযমপরায়ণ হয়, তাহার স্বাধীনতার বিকাশ ও হৃদয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার লীলা নিকেতন হয়।

শৈশব ও কৈশোরেই বংশোদ্ভূত-প্রভাবের আতিশয়া পরিলক্ষিত হয়। এই সময়েই আমাদের প্রত্যেকটি মাংসপেশী বংশোদ্ভূত প্রভাবে সজীবিত ও অল্পপ্রাণিত থাকে। ক্ষুদ্র শিশুর হস্তপদ সকালনের প্রকৃত মর্ষ আমরা বুঝিতে পারি না বটে, কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তৎসমূহের উদ্দেশ্য ক্রমশঃ স্পষ্টীকৃত হইতে থাকে, এবং বাস্তবস্থা ও কৈশোরে ইহা সুস্পষ্টীকৃত ধারণা করে। যে কার্য আমাদের এই বংশোদ্ভূত প্রভাবের বহু নিকটবর্তী ও অল্পকাল, তাহা আমাদের বিপক্ষে তত অধিক আনন্দ প্রদানে সমর্থ হয়। এই হিসাবে জীড়া হইতেই আমরা যথার্থ পূর্ণ সুখ প্রাপ্ত হই। পরিপ্রসব জনিত ক্লান্তি পূর্বপুরুষগণের সঙ্গেই অভ্যস্ত হইয়াছে,

খেলাতে তাহার যে ক্রমাবশেষ পরিলক্ষিত হয়, তাহা আমাদের আনন্দ বর্ধন করিয়াই থাকে। সে কালের প্রাণী খেলিত ও খেলিতে ভালবাসিত। তাহারই চিহ্ন আমরা দিগেতে বর্ত্তিরাছি। কেহ কেহ বলেন যে, ক্রমবিকাশ বা ক্রমাবনতি শুধ্রে খেলা কার্যে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু পুরুষপরম্পরাক্রমে মানুষের যৌবন-কালের স্থায়িত্ব যেমন ক্রমশঃ দীর্ঘতর হয়, মানুষের ক্রীড়াক্ষেত্রও তেমনই বিস্তৃততরই হইতে থাকে। এই হিসাবে মানুষের যৌবন ও ক্রীড়া একার্থবাচক। একমাত্র খেলিবার সময়েই মানুষ যুবক প্রাপ্ত হয়,—মাত্র তখনই আমরা প্রকৃত শিশু, যখন আমরা আত্মধারা হইয়া খেলাতে আমাদের সমস্ত মনপ্রাণ নিয়োগ করিয়া থাকি, এবং বাহার এরূপ খেলিবার শক্তি বা প্রবৃত্তি নাই সেই ব্যক্তিই প্রকৃত জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ।

পুরাকালে জীবন-ধারণের জন্য মানুষকে সর্বদাই নিজ বাহুবলের উপর নির্ভর করিতে হইত। শত্রুবিজয় ও পশু-হননের জন্য তাহাকে সর্বদাই গুরুভার দ্রব্য সজোরে ও লক্ষ্য সহকারে নিক্ষেপ করিতে হইত। যে আভি ইহা পারে নাই, তাহা ক্রমে ধরা-পৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তী যুগযুগে মানুষকে সর্বদাই দণ্ডহস্তে শিকারের পশ্চাদ্ধাবন করিতে হইত। পারি-পার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান সময়ে এই সকল কার্যের আবশ্যকতা অন্তর্হিত হইয়াছে বটে, কিন্তু পুরুষপরম্পরালঙ্ক ইল্লিরাদির সর্বাঙ্গীন ক্ষুর্তি-সাধনের জন্য তৎসমুদয়ের অল্পরূপ ব্যাপারের অনুশীলন অবশ্য প্রয়োজনীয়। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, আমরা আমাদের দৈহিক যন্ত্রাদি ও মনোভাব পূর্বপুরুষগণের নিকট প্রাপ্ত হইয়া থাকি এবং যে খেলা বা আমোদ আমাদের এই বংশপরম্পরালঙ্ক কর্ম-শক্তি বা মনোবৃত্তির বতর্টা অল্পরূপ, আমরা তাহা হইতে তত অধিক আনন্দলাভে সমর্থ হই। এই জন্যই

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে, এক এক প্রকার খেলা এক এক জাতির কাছে অধিকতর প্রিয় হয়।

সুতরাং, আমাদের উপযোগী খেলার বথার্থ প্রকৃতি নির্ণয় করিতে হইলে, শুধু ব্যক্তিগত খামখেয়ালির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ না রাখিয়া, বাহাতে জাতিগত বুল প্রকৃতি ও বংশপরম্পরালঙ্ক কার্যশক্তির সম্যক উদ্বোধ ও উৎকর্ষ সাধিত হয়, উহার ব্যবস্থাই সর্বাঙ্গে প্রয়োজন। ইহা নির্ণয় করা বিশেষ কঠিন কাজ নহে। শিশুদের স্বভাব প্রণোদিত ও অকর্ষিত খেলার প্রকৃতি পর্যালোচনা করিলেই আমরা ইহা জানিতে পারিব। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আমাদের বংশানুক্রম-প্রভাবের একটা বিশেষ ক্রম বা ধারা আছে। এই ধারানুসারে এক এক সময়ে এক এক ইন্দ্রিয়ের বিকাশবস্থা উপস্থিত হয়। ঠিক সেই সময়ে তাহার সম্যক পরিচালনা দ্বারা বত ফল বা উপকার পাওয়া যায়, উহার পূর্বে বা পরে তত পাওয়া যায় না। জিম্নাস্টিক দ্বারা কুসকূলের পরিণতি সাধিত হয় বটে, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বার বৎসর বয়সের পূর্বে জিম্নাস্টিক ব্যায়াম দ্বারা কুসকূল যন্ত্রের কিছুমাত্র উপকার সাধিত হয় না।

আজকাল প্রায় বাবতীয় খেলাকেই নিয়মের কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ করিবার একটা প্রবৃত্তি দেখা যায়। শিশু জীবনের ক্রমোন্নিবেশের পক্ষে ইহা মঙ্গলদায়ক নহে। সকল প্রকার ক্রীড়ার বাহা মুখ্য উদ্দেশ্য, সেই পূর্ণতা-বিকাশ কার্যে ইহা বিশেষ বাধা উৎপাদন করিয়া থাকে। শিশু জীবনের কর্মপ্রিয়তা ও আদিম মানুষের শ্রমশীলতা,—এতদ্বয়ের মধ্যে বিশেষ একটা সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়। আদিম মানুষ দীর্ঘকাল বাবৎ কোনও একটা নির্দিষ্ট কার্যে লাগিয়া থাকিতে পারে না। এক সময়ে হয় ত বিপুল অধাবসায় সহকারে কোনও কার্যে প্রবৃত্ত হইত, কিন্তু হয় ত কার্য সম্পন্ন হইবার পূর্বেই আলসো অভিজুত হইয়া পড়িত। সত্য ও অসত্য জাতির পার্থক্যই এই স্থানে। অসত্য জাতির নিকট সত্য সমাজের

চৈত্র ১৩২১

বৈচিত্র্যহীন জীবন নিত্যই দুর্ভাগ্য ও অসহ্য বোধ হয়। শিশুগণও ঠিক সেইরূপ দীর্ঘকাল একই কার্যে লিপ্ত থাকিতে পারে না—সে স্বাধীনতা উপভোগের জন্য শীঘ্রই লালায়িত হইয়া পড়ে। সুতরাং শিশুকীড়াকে কোনও প্রকার দৃঢ় নিয়মে আবদ্ধ করা কঠব্য নহে।

অল্প বয়সেই খেলা ও কর্মে কোনও রূপ পার্থক্য সাধন করাও উচিত নহে। খেলাচ্ছলেই বালকের শিক্ষারম্ভ হওয়া উচিত। আমোদহীন শিক্ষা নির্মূল্য-তার জননী। ব্রিণ্টন ( Brinton ) বলেন, আমাদের কার্যের মধ্যে যতটুকু খেলা আছে, সেই টুকুই মূল্যবান, এবং খেলারও সেইটুকুই মূল্যবান, তাহার মধ্যে যতটুকু কার্য আছে।\*

জনসন ( Johnson ) বলেন, খেলিবার সময়ে মানুষের যে একটা স্বাভাবিক উৎসাহ জন্মে, সেইরূপ উৎসাহ ব্যতিরেকে পৃথিবীতে কেহ কোনও মহৎ কার্য সম্পাদন করিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। বস্তুতঃ খেলা ও কর্ম এতদূত্বের মধ্যে প্রকৃতিগত কোনও পার্থক্য বিদ্যমান নাই। আমরা অনেক দুর্ভাগ্য কার্যও খেলাচ্ছলে অতি সহজে সম্পন্ন করিয়া থাকি। দৈনন্দিন আহাৰাদি কার্য সম্পাদনের জন্য যে পরিমাণে শক্তি (Energy) আবশ্যক, তদতিরিক্ত শক্তিই খেলা রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। এই হিসাবে যে সমস্ত বালকবালিকা সুবিধাসম্পন্ন মনপ্রাণ খুলিয়া খেলায় যোগ দিতে পারে না, তাহার কখনও শারীরিক ও মানসিক গুরুতর অনিষ্ট সাধন না করিয়া অধ্যয়নাদি কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে না। খেলা ও উৎসাহ এক ও অভিন্ন পদার্থ। পূর্ণ মাত্রায় উৎসাহ না থাকিলে প্রকৃত কঠব্যপ্রিয়তার উদ্বেগ হয় না।

আগ্রহ ও উৎসাহশূন্য কার্যে প্রবৃত্ত হইলে শীঘ্রই অবসাদ উপস্থিত হয়—আমাদের কর্ম-শক্তির হ্রাস হইতে

থাকে ও পদে পদে নানা প্রকার ভুলত্রাস্তির সম্ভাবনা ঘটে। উৎসাহ ব্যতিরেকে কোনও কার্যে শৃঙ্খলা রক্ষিত হইতে পারে না,—সহজেই বিরক্তির উদ্বেগ হয় ও মেজাজ খিটখিটে হয়। প্রত্যেক কার্যের প্রারম্ভ অনেকটা সহজ ও সরল, কিন্তু কার্যসম্পাদনে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই উহাতে জটিলতা ও বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইতে থাকে। এই সময়ের দূরীকরণেই আমাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশিত হয়—ইহাতেই মানুষ অপর মানুষ হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। এই অধ্যবসায় ও অভিনিবেশ শক্তির সৃষ্টি ও বিকাশ সাধন শিক্ষার অত্যন্তম মুখ্য উদ্দেশ্য। এই দুইটা গুণ হারাইলে জাতির ক্রমাবনতি অবশ্যস্বাবী। প্রকৃত খেলাতেই এই দুই শক্তির উদ্বেগ ও বিকাশ সাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং জাতীয় উন্নতির জন্য খেলা অবশ্য প্রয়োজনীয়। মনে রাখা উচিত, ইচ্ছা ও কার্যে প্রকৃতিগত কোনও পার্থক্য নাই—কার্য ইচ্ছা শক্তিরই বাহ্য প্রকাশ মাত্র। ( The purest thought is only action repressed. ) মানসিক শক্তির সম্যক বিকাশের জন্য পৈশিক শক্তির পরিচালনা আবশ্যক, এবং কর্ম-শক্তির বিকাশের জন্য ইচ্ছা-শক্তির বিকাশের প্রয়োজন।

গ্রস ( Gross ) বলেন, একমাএ খেলাতেই বালকের বালকত্ব ; যে বালক মনঃপ্রাণ খুলিয়া ঝুলিতে পারে না, বয়সে নবীন হইলেও, প্রকৃত পক্ষে সে জরাপ্রাপ্ত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে মানুষের খেলিবার প্রবৃত্তির হ্রাস হয়—এই জগৎই সে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাহার তাহা না হয়, পরিণত বয়সেও যাহার পূর্ণ মাত্রায় খেলিবার উৎসাহ থাকে, বয়সে প্রবীণ হইলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি যুবক। যতদিন আমাদের এই খেলিবার শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, ততদিন পর্যন্তই আমাদের ক্রমোন্নতি সম্ভবপর। এই যুবকত্বের বিকাশ ও উন্নতি সাধনই বাবতীয় শিক্ষা-লয়, ধর্মশিক্ষণ, ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাণ-কাঠী। এই যুবত্ব-বিকাশের পথ রুদ্ধ হইলেই জাতীয় জীবনের অধঃপতনের আরম্ভ হয়।

শ্রীমদ্বনাথ বসুসদায়।

\* The measure of value of work is the amount of play in it, and the measure of value of play is the amount of work there is in it.

## পল্লী \*

এই গ্রন্থে কবির পল্লীসম্পর্কিত কবিতাগুলি ছাপা হইয়াছে বলিয়া “নিবেদনে” উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কতকগুলি কবিতার সঙ্গে “পল্লীর” বিশেষ সম্পর্ক নাই। এগুলি বাদ না দেওয়াতে নির্দোষ-শাস্ত্রের ক্রটি লক্ষিত হয়। আর কতকগুলি কবিতা বস্তু ছাড়িয়া গুণবিশেষের ধারণাকে বিষয়ীভূত করিয়া রচিত হওয়াতে গ্রন্থকলেবরের অধিকাংশের বস্তুমূলক প্রকৃতি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কবিতাগুলির অধিকাংশের মধ্যে কেবল কবি-হৃদয়ে অনুভূত রস উছলিয়া উঠিয়াছে, সংসারের সহস্র জটিল সমস্যার সমাধানের চেষ্টা নিহিত নাই। তরুণ কবির প্রথম গ্রন্থে ইহাই স্বাভাবিক।

কিন্তু কেবল রসানুভূতির প্রকাশময় পরস্পর অসংশ্লিষ্ট কবিতার সমষ্টিমাত্র মনে করিলে পুস্তকখানির ঠিক পরিচয় পাওয়া যাইবে না। যে কবিতাগুলিকে প্রকৃতই পল্লীসম্পর্কিত বলা যাইতে পারে, সেগুলি একটি বিশেষ সম্বন্ধের বন্ধনে একতাবদ্ধ। যে কারণটি কবিতাতে এই সম্বন্ধ বর্তমান নাই, উহার ‘পল্লীর’ কলেবরের অন্তর্নিবিষ্ট হইলেও, বাস্তবিক পল্লীর কিছুই নহে; ‘পল্লীর’ কবি বাহা বলিতে চান, তাহার সহিত উহাদের কোন সম্পর্ক নাই।

পল্লীর কবিতাগুলির একতাবিধারক এই ভাবটি কি, কবি তাহা নিজেই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বর্তমান সভ্যতার জন্মস্থান নিদানভূত বিরাট প্রতিষ্ঠানসমূহাধিকৃত নগর-জীবনকে লোক-কল্যাণের প্রতিকূল বিবেচনা করিয়া বহুকাল অবজ্ঞাত পল্লীতে পুনরাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা আজ দেশে বিদেশে উচ্চারিত হইতেছে। পূর্ববঙ্গের এই তরুণ কবিও সেই আকাঙ্ক্ষার বাস্তব প্রচারিত করিয়াছেন। তবে তাঁহার পল্লী-অনুরাগ কোন বৈষয়িক প্রয়োজনে সজাত হয় নাই। আর একটি চিরন্তন প্রেরণা তাঁহার পল্লীপ্রেমের মূল। পল্লীতে কবি হৃদয়ে রসানুভূতি জাগাইয়া তুলিবার উপযুক্ত কি আছে, তাঁহার

পল্লীর কথায় আমাদের আকর্ষণ করিবার কি অধিকার আছে, কবি নিজেই তাহা প্রচারিত করিয়াছেন।

কবি কহিতেছেন, “প্রকৃতির বৃকে অতীব গোপন স্বর্গের স্বপ্নের মত মনোরম কি যে সত্য রহিয়াছে, তাহা ভেদ করিতে কবিরূপের যুগযুগান্ত ছুটিয়া শাস্ত হইয়াছে, কিন্তু সেই গূঢ় রহস্য ভেদ করিতে পারে নাই। কেবল এইটুকু বুঝিয়াছে যে, হৃষ্ট মহা আনন্দে দুটিয়া উঠিয়াছে। এই আনন্দের বিষয় আরও একটু বুঝিয়াছে যে, ‘আম্মার সনে দৃঢ় বন্ধনে জানি সে কেমনে বন্ধ।’ এই বন্ধনের হেতুতে এই আনন্দ দহের প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া আম্মার কানে অধীর ছন্দে বাহা গাহিয়া যায়, তাহার বিশিষ্ট অর্থ কিছু বুঝি না; শুধু তাহা যে আনন্দ এইটুকু বুঝি।

এই হৃষ্ট জগতের পল্লীদৃশ্যের প্রত্যেকটিতে এই আনন্দ ধৈ ধৈ প্রকাশিত রহিয়াছে, কিন্তু তবু (ভ্রান্ত) লোকে তাহা দেখিতে না পাইয়া কহে, সুখশান্তি কিছু নাই।

এই ভ্রান্তির কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, সাধারণ মানব কেবল (অধীর) মনের দ্বারা বিচার করে, তাই এইরূপ ভ্রমের কথা বলে। যদি অধীর মনকে শান্ত রাখিরা আম্মাকে দুটিয়া উঠিবার অবসর দেওয়া যায়,

“তখন দেখিবে প্রকৃতি ঐ

আনন্দের সে মুরতি

দেখিবে যাহাই, করিবে যাহাই

আনন্দ বিনে কোথা কিছু নাই।”

তাহা হইলে কবির বাণী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ধারণা করিতে হয়। সাধারণ মানুষ মন দিয়া জগতের বাহ্য গ্রহণ করে তাহাতে তাহার জগৎপন্থ্যে ধারণাতে সঙ্গীর্ণতা ঢুকিয়া পড়ে, জগতে সুখশান্তি দেখিতে পায় না। কবি প্রথম দৃষ্টিতেই জগৎপ্রকৃতির বৃকে আনন্দ দেখিতে পান। কিন্তু কবি তখন মনহারা হন নাই। মনের ক্রিয়া চলিতেছে বলিয়া তখনও প্রকৃতি একেবারে আনন্দময় হয় নাই।

\* ঐহুর্গামোহন কুশারী প্রণীত। মূল্য ৮০ আনা।

জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

মনের ক্রিয়াই প্রায় সর্বদা চলিতে থাকিলেও কবির মতঃ ভাগ্নক আত্মা মাঝে মাঝে উঁকি মারিয়া জগতে আনন্দের সন্ধান পাইয়াছে। ইহার পর কবির উন্নতি। ক্রমশঃ যখন মনের ক্রিয়া একেবারে ‘শীতল শান্ত’ হইয়া বন্ধ হইবে, কেবল আত্মাই অবশিষ্ট থাকিবে, তখন আত্মা ও প্রকৃতির সাক্ষাৎকার হইতে অজুত হইবে যে, প্রকৃতি কেবল আনন্দময়।”

এই মতের সহিত পল্লীর সম্পর্ক কি? কবি বোধ হয় বলিতে চান যে, পল্লীর সহজতা ও সরলতার মধ্যেই কবির আত্মা প্রথম আনন্দের সন্ধান পায়।

“বসন্তেরি রাগা সুপ্রভাতে

চরাচর উঠলে ভূমি ফুটি।

পঞ্চভূতে তোমার পেয়ে সাড়া

ঘরের বাহির হলেম আমি ছুটি।

পল্লি! ওগো আনন্দেরি ধনি!

\* \* \* \*

আত্মা ভব মুক্ত হয়ে আজি

মূল্য হাওয়া দিচ্ছে দশ দিকে।

শিখিল ক’রে দিচ্ছে যেন ক্রমে

জড় জীবের মর্ত্য বাধনটাকে।

আজকে তোমার স্নেহ-পরশ ধানি

সবার মাঝে স্বর্গ দিচ্ছে আনি।”

নগরের কৃত্রিম জীবনের মধ্যে মানসিক আবরণ আরও দুশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে। নাগরিক প্রতিবেশের অন্তরঙ্গোপনকারী কৃত্রিমতার আবরণের সঙ্গেই সর্বদা পরিচয় ঘটে বলিয়া মনের আবরণও আত্মার স্বরূপকে ক্রমশঃ গাঢ়তর ভাবে ঢাকিয়া ফেলে।

‘নিবেদনের’ লেখক ‘পল্লীর’ কবির ‘শব্দ-সম্পদ, ছন্দের উপর আশ্চর্য্য দখল, তাহার কবিতার সাবলীল অনায়াস প্রবাহ’ ইত্যাদির উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল প্রশংসোক্তি মাঝে মাঝে ‘কিন্তু’ সংযোগ করিবার প্রয়োজন থাকিতে পারে। হয়ত ছন্দের খেলা, শব্দ-সম্পদের

উপযুক্ত ব্যবহার সম্বন্ধে কবি এখনও শিক্ষানবীস। হয়ত বহু স্থলে কবিতা-প্রবাহে আবর্ত ও বাধ পড়িয়া উৎপাতের সৃষ্টি হইয়াছে, বিভিন্ন ধারার একত্র সংযোগে সামঞ্জস্যের অভাবে রসবোধের ব্যাঘাতও ঘটিয়াছে। কিন্তু “পল্লী” গ্রন্থের এই সমস্ত খুঁটি নাটি আলোচনা করিবার অবসর আমাদের নাই। পল্লী-প্রকৃতির রূপের যে প্রকাশ “পল্লীতে” স্থান পাইয়াছে উহাই পল্লীর বিশেষত্ব। অনেক লক্ষ্যশা কবি পল্লী-প্রকৃতির সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু সে বর্ণনায় কোন জীবন্ত প্রত্যক্ষের পরিচয় নাই,—যেন শোনা কণার বর্ণনা, অথবা সহরের ধনীর আবাসে সুবিভক্ত, কিন্তু শিল্পী-গঠিত, পল্লী-প্রকৃতির নকল মকসা। এই সকল প্রকৃতি-বর্ণনায় বাস্তব রূপের সম্পূর্ণ অভাব না হইলেও, যাহা থাকে তাহাতে দৃষ্ট-‘সামান্যের’ই পরিচয় পাওয়া যায়, পরন্তু কোন দৃষ্টবিশেষ বা বস্তুবিশেষের বিশিষ্টতা পাওয়া যায় না। এই সকল বর্ণনায় স্থান-কাল-পাকোচিত নিজস্ব লক্ষণ প্রায়ই দেখা যায় না। যে সকল প্রাকৃতিক পদার্থের কলিপ্রসিদ্ধ আছে সেগুলিই পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হয়, ভাষা-প্রয়োগে বা বস্তু-নির্দেশে কাব্যাস্তার পূর্বাচারিত ভাব্যতা লজ্জিত হয় না। গ্রামের প্রকৃতির ‘গ্রাম্য’তা যথাসম্ভব কাটিয়া ছাটিয়া নাগরিকের ফ্যাশন-দ্রুত ভ্রমণের পরিণত করা হয়। দুর্গামোহনের কবিত্বের বিশেষত্ব এই যে, তাহার কবিতায় পল্লী-প্রকৃতি কাটা কাগজের সাজান দৃষ্ট মাত্র নহে, তাহার পল্লী-দৃষ্টে বাস্তব মূলক বিশিষ্টতা বিস্তারিত থাকে, তাহার প্রকৃতি-বর্ণনায় প্রসিদ্ধাপ্রসিদ্ধ নিবিশেষে পূর্ববন্ধের পল্লী-দৃষ্টা-বলীর যথাযথ প্রকাশ স্থান পাইয়া থাকে। “পল্লী” গ্রন্থের “পল্লীপথ”, “শীত প্রভাতে,” “নারায়ণ সেবা,” “পল্লীপুকুর,” “প্রকাশিতা,” “প্রবাস বাত্মা,” “পল্লীস্মৃতি” প্রভৃতি কবিতা পাঠ করিলে এই মন্তব্যের বাধ্যতায় উপলব্ধি হইবে।

পল্লীর কোন কবিতায় পূর্ব কবির রচনা স্বরণ করাইয়া দেয় না, ইহা বলিতে চাহি না। এরূপ চাই একটি কাব্যতা

বাদ দিলে “পল্লী” নিখুঁত হইত ও সমুচিত নিৰ্দ্ধাৰণ-  
শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত, এ কথাও বলা আবশ্যিক  
মনে করি। কিন্তু এই শ্রেণীর দুই একটি কবিতার উল্লেখ  
করিলেই ‘পল্লীর’ মালোচনা শেষ হইবে না। “পল্লীতে”  
যাহা আছে তাহা আর কোথাও পাই না, তাই “পল্লীর”  
কথা দর্শককে জানাইতে বসিয়াছি। পূর্বেই বলিয়াছি  
যে “পল্লীর” বর্ণিত প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী নকল নকসা  
নহে, নিসর্গনিয়মে উদ্ভূত আসল, ইহা দেও বর্ণনায় কবি  
কাব্যপ্রসঙ্গের দাসত্ব স্বীকার করেন নাই—যেমন  
দেখিয়াছেন, সরস ভাবার জগতের অমূল্য মাহাত্ম্য  
তাহারই বর্ণনা করিয়াছেন। কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস  
ব্যতীত আর কাহারও বর্ণনায় প্রাকৃতের অপূর্ণ বৈচিত্র-  
পূর্ণ প্রত্যক্ষের একরূপ পরিচয় বিরল। ‘অস্ত্র মুকুলের  
গন্ধ’, ‘খনচ্ছায়াপূর্ণতরু’, ‘প্রচ্ছন্ন কুটীর’, ‘জীব অশথের  
অর্থর’, এমন কি ‘চীলের স্ত্রীত্ব ধ্বনি’ ‘আখের ক্ষেত’,  
‘কদলী সুপারি নিবিড় বাঁশের বন’ পর্য্যন্ত খ্যাতনামা  
কবিগণ অগ্রসর হইয়াছেন। বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের  
কবিতাতেই একবার একটী কল্পন দেখিয়াছি। কোন  
কোন নবীন কবির রচনায় দু একটি বাস্তবদৃশ্য না আছে  
এমন নহে—

“মাঠের কোণে যাবে দেখা  
বৃষ্টিধারার ‘চিকে’ ঢাকা  
কেয়া ঝাড়ের মাথার ‘পরে’  
নারিকেলের সারি  
শিল কুড়ানে বাঁধব ‘মোরা’  
লাল দেব ভূয়ে,  
কড় কড় কড় ডাকবে ‘দেয়া’  
আসব আসন করে।  
আকাশ ভাঙা মূলধার,  
বাঁশের ঝাড়ে কি তোলপাড়,  
পাকড় তেঁতুল ঝাড়ের ঝাড়  
পড়বে হুয়ে হুয়ে।”

এই কবিতায় বুঝি যে কবি প্রকৃতি দেবীর সৌন্দর্য্য  
দেখিয়াছেন এবং সুন্দর ভাবায় একটি বাস্তব দৃশ্যের  
বর্ণনা করিতেছেন। কিন্তু ইহাতে এমন কিছু নাই  
যাহা পল্লী-প্রকৃতির একটি দৃশ্য-‘সামান্তের’ ধারণাতে  
আসে না। কিন্তু

“ওরে বোনের পাড়ার প্রান্ত হতে পথটি আঁকা বাঁকা  
কোথা কালো ছায়ার মিশিয়ে গেছে যায় না বড় দেখা—  
কেমন নীরব অচল ছুটাছুটি বনের মাঝটা দিয়ে,  
শেষে হাঁপ ছাড়িয়ে লুকর খোলাধানের মাঠে গিয়ে;  
কোথা পুষ্পউজল বুদ্ধ হিজল দাঁড়িয়ে ধারে ধারে,  
ঐ বাঁশের আঁচল হুইয়ে গেছে রাগা ফুলের ভারে;  
ঐ দুই ধারেতে মাঝে মাঝে ভস্ম মেখে গায়,  
কত যোগময় লক্ষ বরুণ তপোবনের ছায়।  
ওরে আঁকে ও সব পল্লীপথের পাগল ছবি যত,  
আমার মনে পড়ছে থেকে থেকে স্বপন ছায়ার মত।  
কোথা মাদার গাছের ফাঁক দিয়ে সে কালো ডোবার গল,  
সেখা আপন মনে করছে খেলা বনবিহগের দল;  
কোথা ডাহক পাখীর ছেলেমেয়ে বেড়ায় নেচে নেচে,  
ছুটে মাতা ওদের মাথে, মাথে, পিতা ওদের পাছে;  
কোথা নলের বনে পাখীমুগল করছে প্রেমলাপ  
দুটি কোঁড়াল বসে তরুর শিরে করছে রে বিলাপ।  
কোথা টুনটুনরা কোঁপে ঝাড়ে করছে ফিসফিস  
কোথা দোয়েলেরা পাবের শাখায় দিচ্ছে বসে শিব  
ওরে আঁকে ও সব পল্লীপথের মধুর ছবি কত  
আমার মনে পড়ছে থেকে থেকে স্বপন ছায়ার মত।”

এই কবিতা পাঠ করিয়া বুঝি যে দুর্গাযোহনের  
পল্লীপ্রকৃতি পল্লীবাসে থাকিয়া নিজের চক্ষের প্রত্যক্ষ।  
আবার,

“অর্দ্ধময় বাগুচর

দূর আছে পড়ি, যেন দীর্ঘ জলচর—

রোজ পোহাইছে; হোথা ভাঙ্গা উচ্চ তাঁর;

খনচ্ছায়া পূর্ণ তরু; প্রচ্ছন্ন কুটীর;

বজ্র দীর্ঘ পথখানি দূর গ্রাম হতে  
শত ক্ষেত্র পার হয়ে নাথিরাছে স্রোতে  
ভূগর্ভ জিহবার মত ; গ্রামবধূগণ  
অকল ভাসারে ভলে আকর্ষ বগন  
করিছে কোড়ুকালাপ • • • ”

ইত্যাদি কবিতায় নিপুণ শিল্পী গঠিত প্রকৃতির সুন্দর  
মকল ও তাহার কাব্যোচিত পোষাকী ভাবের মাধুর্য্য  
বুদ্ধ হইতে হয়। কিন্তু একরূপ মনে করা বিচিত্র নহে যে  
কোনও সঙ্গদয় আরোহী চলন্ত পদ্মাসীমারে বা তরলী-বন্ধে  
আসীন থাকিয়া বাহা দেখিরাছেন, ইহা যেন তাহারই বর্ণনা  
—দূরস্থিত ও স্বল্পকালস্থায়ী দর্শনে যেন প্রাকৃতিকের অসংখ্য  
খুঁটিনাটি চক্ষে পড়ে নাই, তাই একটা সামান্য ধারণামাত্র  
অবশিষ্ট আছে। কিন্তু হুর্গামোহনের কবিতায় স্বতোজাত  
প্রাকৃতিক দৃষ্টের ‘বিশেষ’ বৈচিত্র্য ও তাহার বর্ণনায়  
প্রত্যক্ষ-নির্দেশক সহজ ভাবের পরিচয় উত্থতঃ প্রাপ্ত  
হওয়া যায়। এই বিশেষত্বের দাবী একদিন পূর্ববঙ্গের  
প্রবীণ কবি গোবিন্দচন্দ্রও করিয়াছিলেন, কিন্তু এতগুলি  
কবিতায় এবং এত অধিক পরিমাণে এই বিশেষত্ব  
হুর্গামোহনেই প্রথম দেখিতে পাট। এই বিশেষত্ব বিশিষ্ট  
একটি কবিতা তুলিয়া দিয়া আমরা বক্তব্য শেষ করিব।

#### নারায়ণ সেবা

বেলা আছে দশ চারি, একটু খানি আগে,  
এক ফসলা বৃষ্টি হ'লো একটা উড় মেঘে।  
সিনান করে উঠলো রবি কোন সাগরের তীরে,  
তারেই দেখে ধরা-মেঘে হেসে উঠলো কি রে ?  
গোমর দিয়ে সদ্য লেপা মস্ত উঠান পারে,  
নন্দহুলাল ফুলের বাগান সতনে বেড়ার ধারে,  
লালবর্ণ ফুল ফুটেছে, গন্ধ বাজে বয়ে  
পাড়ার বত ছেলেঘরে ছুটেছে পাগল হয়ে।

ফুলের গাছের গায়ে গায়ে দুর্কীষানের লতা,  
ফুটে উঠছে ফুলে ফুলে শায়ল সজলতা।  
পূজার লাগি গল্পীমেঘে দুর্কী ভোলে নিজে,  
পিছন দিকে ময়নামতির সুনীল শাড়ি ভিজে।

টপটপিয়ে পড়ছে পিঠে সঙ্গনে গাছের জল—  
দুর্কী গোছা হাতে মেঘে টানিছে অঞ্চল,  
উড়ে এসে বসল গাছে কোন বিদেশের কাক,  
ঝরঝরিয়ে জল ঝড়িল, মেঘের হল রাগ !

আঙ্গিনাতে কাসর ঘণ্টা, পূজার ভাঙ বাটী,  
চাকর এসে রেখে গেল কলার পাতা কাটি ;  
পাড়ায় আজি কি আনন্দ, বলতে পারে কেবা,  
আজ বাড়ীতে সন্ধ্যা হতে সতানারাগ সেবা।

করে। পূজার পরে উদর ভরে সিল্লি প্রসাদ পায়,  
গিল্লিরা সব লেগে গেছেন চালের গুঁড়ায় ;  
করে, ঠাকুর ঘরে লক্ষ্মী বোয়ে সেবার আয়োজন,  
ঢেঁকিশালার সধবারা, মেঘেরা করজন।

তুলসী তলায় জায়গা লেপে বিধবা সুন্দরী,  
মাড়িম ফুলের পাপড়ী ঝরে মুক্ত কেশোপরি।  
লক্ষ্মী পৈঁচার কিচিমিচি আত্মবুদ্ধি থেকে,  
মেঘের হাতের কাকন ধ্বনি চালের গুঁড়ি টেকে।

সন্ধ্যা হ'ল, পুরুষ এলেন, পুথি হবে পড়া  
সবাই বিলে পুথি পেলো, থাক না গলা ধরা।  
অতিথি বলে যাত্রা নাটক সব শুনেছি ভাই—  
নারায়ণ সেবার পুথির মত এমন কিছু নাই।

## ভাটিয়াল গান

( ৮ )

জান রে মন পঞ্চভব,  
ব্রজগোপীর ভাব নিরে বসে থাক রে।  
আমার মন গুরু ভজ রে।  
গুরুর জ্যোতে জ্যোত বিশাইয়ে,  
থাকরে মন ঐ রূপ ধইরে,  
গুরুরূপে গৌরহরি দেখা দেবে রে।  
আমার মন, গুরু ভজ রে।  
শোন মন, বলি তোরে,  
তীর্থে বাওয়ার কাজ কি ওরে,  
সর্বতীর্থ আছে গুরুর দরশনকমলে রে।  
আমার মন গুরু ভজ রে।

( ৯ )

ও নাগরী হেরুবি গো সদায়,  
তোরা দেখবি যদি আর।  
এমন গৌরাজ রূপ।  
সে যে হরি বলে নৃত্য করে  
শ্রীবাস আদিনায়।  
তোরা দেখবি যদি আর,  
এমন গৌরাজ রূপ।  
সে যে নগর দিয়ে বেটে বেড়ায়,  
সোনার সুপুর বাজে রাজা পায়।  
তোরা দেখবি যদি আর,  
এমন গৌরাজ রূপ।  
সে যে রথের শোভা মদনমোহন,  
মদনমোহন বাশরী বাজায়।  
তোরা হেরুবি যদি আর।  
এমন গৌরাজ রূপ।

( ১০ )

একদিন দেইখাছি যারে,  
তারে ভোলন না যায় গো।  
সবাই বলে যেখ যেখ,  
যেখ নয় গো আভা;

তোমরা নি দেইখাছ সই,  
যেখের আড়ে জবা গো।  
একদিন ... ... যায় গো।  
চরণে নুপুর বাজে, হাতে মোহন বাঁশী,  
(অ) তার গলে শোভে বনমালা,  
মুখে মৃৎ হাসি গো।  
চুড়ারে বসুন্দের পাখা  
করে ঝিকিঝিকি,  
তারে মনে বলে প্রাণ সই,  
একবার দেখে আসি গো।  
একদিন ... ... যায় গো।  
পীরতি পীরতি যতন,  
পীরতি গলার হার গো।  
এমন পীরতি যে জন করে,  
সফল জনম তার গো।  
একদিন ... ... যায় গো।  
আমার নয়ন নিল কালরূপে,  
মন নিল বাঁশী গো।  
যারে শুইলে স্বপনে দেখি,  
ভাগিনা না দেখি গো।  
একদিন ... ... যায় গো।

কৃষ্ণ প্রেমোন্মাদিনী রাধা নীরদবরণ শ্রামসুন্দরকে  
সদাই চোকে চোকে রাখিতে চায়। এমনই তাঁর রূপ  
যে একবার দেখিলে উহা আর ভুলিতে পারা যায় না,  
প্রাতিনিরন্তর ঐ রূপসাগরে ডুবিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়।  
যে কৃষ্ণপ্রেমে মজিয়াছে তার জীবন ধন; কৃষ্ণপ্রেম-  
হীন জীবনধারণ বৃথা।

( ১১ )

আমি দেখে এলেম গঙ্গার ঘাটে  
মহাভাবের ইষ্টবার।  
হরিদাস কেরানী আবু  
দয়াল নিতাইচাঁদ টিকেট মাষ্টার।



অবৈধ সিটি দিলে পরে,

অরি এসে কাহাজ ভিড়ে,

কেরানী কর কে নিবি রে,

হরিনামের টিকেট চমৎকার ।

আড়কাটা গৌরিন্দাস স্মজন,

চৌবটি খালসী (মোহর) যোজন,

রামানন্দ সারের নিপুণ,

জগাধাধা পেছেল্লার ।

কাহাজখানা দেখতে ভাল,

কোন্ কারিকর গড়েছিল,

গদাধর তার বিজ্ঞান আলো,

বিরাগ ভক্তি ইঞ্জিন তার ।

কাহাজখানা দেখতে নিপুণ,

কাহাজের কি কাহাজী গুণ,

রাধা প্রেমবিকারের আশুণ,

জলুতেছে তার অনিবার ।

গোসাই রামচন্দ্র কর স্মজন যারা,

টিকেট পেয়ে যাচ্ছে তারা,

অধীন চণ্ডী হ'ল টিকেটধারা,

কেমনে হইবে পার ।

গানটীর রচয়িতার নাম—চণ্ডী, রামচন্দ্র ইহার গুরু;  
কিন্তু ইহার যে কে তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না ।  
উক্ত গানটীতে প্রকৃত ভাবকের তীক্ষ্ণ অন্তর্ভূতি ও  
প্রকৃত ভক্তের প্রবল ভক্তির উচ্ছ্বাস সম্যকরূপে পরিস্ফুট  
হইয়াছে ।

( ১২ )

স্মজন কাহারো ধারে,

চিন্নাল' মন ডান কি বাও ।

মনমাকি তুই কেমনে বা'বি

পচা নাও ।

যে জন কাত-পাটনী হয়,

( অ ) তার তুফানে কি ভয়,

মতে সতে ঢেউ কাটিরে

টের পলুইতে হয় ।

সে বাতাস বুইরা নৌকা ছাড়ে,

ভাটী ছাইড়া উজান ধরে,

বাইয়া যায় প্রেম-পাথারে,

তার কি লাগুর পাওয়া যায় ।

ঐ নাও বাইরের নামে চলে উড়ে,

আর আমার নাও যে থাকে কুইড়ে,

সারানিশি তার জল ফালায় ।

আমার নাও হইয়াছে বুড়া ।

ও নায়ের লাইগাছে গুড়া,

অনেক দিনে হইল বুড়া,

ভাই পুরাণ মাস্তলায় ।

মন. সংসঙ্গ অঙ্গসরণ করিয়া ঠিক পথ চিনিয়া  
লও, যেন সংসারের বিভীষিকাপূর্ণ ভীষণ স্বপ্নের ভিতরে  
পড়িয়া নির্ভিয়ে উহাকে অতিক্রম করিয়া গন্তব্য  
স্থানে উপনীত হইতে পার ।

শ্রীগোপীনাথ দত্ত ।

- ৪৭১। আমরা কেরাকি,  
সেলাম করতে হাত তুলি,  
কুইত পাইলে ঘাড়ে ধরি।  
কুইত—সুযোগ।
- ৪৭২। কাকইরে কর কুড়ালে,রে,  
ভোর \* একটা ছেদ।  
ছেদা—ছিন্ন।
- ৪৭৩। খায় দায় বনের পাখী  
বনের দিকেই চায়।
- ৪৭৪। দাসীর কথা বাসী হইলে  
লাগে বড় ভাল।
- ৪৭৫। ঘরের ইন্দুরে কাটলে বান্  
দিয়া কি আর বার কুলান।  
বান্—বাঁধন।
- ৪৭৬। পুত্ৰ গা বিয়া করাইলাম  
বউগা বড় ভাল,  
গিরজাধান সইপা দিলাম  
কর্ত্তাধিধান গেল।
- ৪৭৭। খায় মাগীর গলা বেনী।  
নাখায় মাগীর কোপানি বেনী।
- ৪৭৮। ঘর করবে কুইড়া  
সারাবাড়ী কুইড়া।
- ৪৭৯। কাচার মা নোরাইলে বাশ,  
পাকলে করে টাস্ টাস্।  
কাচার—কাঁচাকালে।
- ৪৮০। ডাউকের ভেল আইলে  
মোজা বাড়ী হয় বাসা।
- ৪৮১। তাত হইতে যত কণ,  
আয়াস আছে তত কণ।
- ৪৮২। যত কণ খাস,  
তত কণ আশ।
- ৪৮৩। লাহে টাকা দিবে গৌরীসেন।

- ৪৮৪। আউলার পটা পাণ্ডে ভালে,  
বারইর পটা পাণ্ডে হালে।
- ৪৮৫। হাগা মাই \*  
ঘ্যাড়ারিই বেনী।
- ৪৮৬। আইছে পোনার বাপ ডাকে না,  
আইব পোনার আশ।  
আইছে—(বে) হইরাছে বে।
- ৪৮৭। জামাই আনছে এক সের,  
ঐ আমার পাচ সের। \*  
জামাই আনছে এক সের,  
ঐ আমার পাচ সের।

\* এক রমণীর দুইটা ঘেরে,—ঘেরে দুটীর বিবাহ  
হইয়াছে। এক জামাই চাকুরী করে—অপরটীর অবস্থা  
বিশেষ বর্ণিত নহে। চাকুরে জামাই মাঝে মাঝে  
খণ্ডর বাড়ী আসে, আর আদিবার সময় বাঁকিছু খাবার  
দ্রব্য কিনিয়া আনে। অপর জামাই কিন্তু তা'করে না।  
গত কল্য চাকুরে জামাই আসিয়াছিল,—প্রসন্না খাত্তরী  
আজ ঘানের ঘাটে জামায়ের গল্প বলিতে বলিতে  
বলিয়া উঠিল, 'এই দেখ আমার এ জামাই কি মানুষ।  
যখন আসে, তখনই কত কি নিয়া আসে—আর ঐ  
যে আট্টুড়ীর বেটার হাতে আমার এই ঘেরেটা দিয়াছি  
(বলা বাহুল্য যে ঐ ঘেরেটা তাহার সন্দেহ ছিল) সেটা  
কি একটা মানুষ? কাল আমার চাকুরে জামাই ১/৫  
সের খাবার আনিয়াছিল। বরফা ঘেরে দিবার স্বাধীন  
প্রতি কটক্তি ওমিয়া বড়ই লজ্জিত ও হুণ্ডিত হইয়াছিল;  
বিশেষ তাহার ভয়গণিত যে মাত্র ১/৫ সের জিনিষ  
আনিয়াছিল। তাই অভিমানিনী ঘনের বেগ  
সামলাইতে না পারিয়া উপহিত রমণী ঘনের  
দিকট বলিয়া ফেলিল—“হাঁ, ১/৫ সের জিনিষ আনিয়া  
হ'ল ১/৫ সের?” তা'এর সঙ্গে আশ্বাস লাগিল—রমণীগণ  
একে অস্তের মুখ চাইতে লাগিল—তাই—তখন ঐ রমণী  
বলিয়া উঠিল, 'তাতে তোর কি লো?'

- ৪৮৮। কিঞ্চিৎ লিখনং।  
বিবাহের কারণে।
- ৪৮৯। দারুণ দুঃখ,  
আকেন গুরুম্।
- ৪৯০। আভরা কলসীর  
চক্চকানীই বেশী।
- ৪৯১। বেশী কথা কর বে,  
কালে কয় জানা সে।
- ৪৯২। কানা কড়ির কোলা গোলাম।
- ৪৯৩। কান করবে গোপনে,  
তবে অস্ত্রে ঘেন না শোনে।  
বদি না পার কর্তে একা,  
হুইএ মিলে কর তা।  
হুইএর বেশী শুধলে কানে,  
সে কথা না রবে গোপনে।
- ৪৯৪। তোরের ভাতে পেট না ভরলে,  
বৈকাল্যা ভাতে কি পেট ভরে ?
- ৪৯৫। আমি রাখা ছুমি শ্রাম,  
আর আমি আছি কান্দে বাড়ি বলরাম।
- ৪৯৬। কাজের নামে কাজী নাই,  
আকামের লারখি।
- ৪৯৭। দাঁত থাকতে কে কামার বাড়ী বার ?  
আমার কলমে নি কালী পায়।
- ৪৯৮। ভিজ পোর কর কি ?  
ঘরে বসে ঠাকুরকি।
- ৪৯৯। কাইল বলে, ধরে কালে।
- ৫০০। রথ দেখা আর কলা বেচা।
- ৫০১। কামের নামে যোগ্যতা নাই,  
মাউগ কিলানের বম।
- ৫০২। • দিরা না কুটা চলে,  
হুই হাতে বন্দুক ঠেলে।
- ৫০৩। ওজার অ চার চিং হইরা তইতে।  
ওজার—কুক। অ—ও।
- ৫০৪। আমাইর বড় কোচার ফের,  
হু'বুড়ী কড়ি হুতার সের।
- ৫০৫। আসনের লগে দেখা নাই,  
হুদের কুটাকুটি।
- ৫০৬। পয়ের কাছে বন্দুক খুইরা  
কুটাইতে আর কি ?
- ৫০৭। পয়ের মাথার কিরাই তাল।
- ৫০৮। বার লাউ তের দাইড়্যা।  
কেউ নিল আমার আগলি কাইড়্যা।  
দাইড়্যা—বাহার্য হাটে বাজারে তোলা  
তোলে।
- ৫০৯। ধান নাই মোটে কালে  
গোলা ভরা ইন্দুর।
- ৫১০। গোয়াল গরু ভইস,  
তার লগে না পথ বইস,  
যদিও কখন পথ বইস,  
হাতে একখান লড়ি লইস।  
বইস—বহিস।
- ৫১১। চোরা বন্ধুর বাও,  
মুখে কর রও রও,  
পায় ঠেলে নাও।
- ৫১২। গাওের মধ্যে চেউ দেইখ্যা  
নৌক। ডুবায় কুলে ?
- ৫১৩। রাগের ঘরে বার দেবতা খাটে।
- ৫১৪। হস্ কাছার • বাড়ি।
- ৫১৫। আইগ্যা পাইছে হর,  
আগে আগন্ত বাইরে,  
এখন আগে ঘরে।  
আইগ্যা—হাপিরা।  
আগন্ত—হাপিত।

- বাইরে—বাহিরে ।  
 আগে—বাগে ।
- ৫১৬ । আউস থাকলে  
 বাতী আলাইরাও পাগে  
 আউস—হাউস ।  
 আলাইরা—আলাইয়া ।
- ৫১৭ । হু-দিল বান্দা কলমা চোর,  
 না পায় ভিত্তি, না পায় দোজগ ।
- ৫১৮ । হিন্দু যদি মুসলমান হয়,  
 মুরগী খাইতে যম হয় ।
- ৫১৯ । চোরে চোরে আলি,  
 এক চোরে বিয়া করে  
 আরেক চোরের হালী ।  
 হালী—শালী ।
- ৫২০ । গুটী শুদ্ধ \* নাই,  
 বোটার মত \* ।
- ৫২১ । দাদার যে সবুল  
 তা ত ভাবি না,  
 তবে যমে যে বাড়ী চিম্নল ।
- ৫২২ । দাদার অইছে দারোগা,  
 কোলদারী ত ধরেই ।  
 অইছে—হইয়াছে ।
- ৫২৩ । ল্যাংটা গদা পিতাধর,  
 সুগীর মাইয়া বিয়া কর ।
- ৫২৪ । বোবার শজ্ঞ নাই ।
- ৫২৫ । আভাগ্যার যদি চার,  
 সাগর শুকাইয়া যায় ।  
 আভাগ্যা--অভাগা ।
- ৫২৬ । বোয়াডা পাছের কাঠাল পাইয়া  
 নিতাই আসে ছালা লইয়া ।
- ৫২৭ । সাপ বর্গেও  
 ঘের এক ঘোড়া ।
- ৫২৮ । শালগেরামের  
 শোয়া বসা লমান ।
- ৫২৯ । ফাকি দিয়া  
 ছাগী বিমান ।
- ৫৩০ । মোল্লার দৌড়  
 মজিদ পর্যন্ত ।
- ৫৩১ । গেছে গেছে টোকাটা  
 শিখলাম ত টোকাটা ।
- ৫৩২ । টাকার কুঁমর ।  
 কুঁমর—কুমার ।
- ৫৩৩ । হয় যদি তিলটা ।  
 কয় তবে তালটা ।
- ৫৩৪ । পাগলারে । শাক লারিছ না ।  
 ভাল কথা মনে করছ ।
- ৫৩৫ । বুক তোমার নাম কি ?  
 ফলে পরিচয় ।
- ৫৩৬ । ধোপা নাপিত কামার কুমার,  
 যে বিশ্বাস করে সেও এক চাচার ।
- ৫৩৭ । একে ত বুড়ী নাচনী,  
 তার আবার তার নাতিনের বিয়া ।
- ৫৩৮ । ক্ষেতে গেলে কৃষকের বুদ্ধি ।
- ৫৩৯ । কইয়া বইয়া প্রেম,  
 আর বইসা মাইলা রূপ,  
 হুদিন পরে চূপ ।
- ৫৪০ । জলেও লাম্বন নাই,  
 সাতরও শিখন নাই ।
- ৫৪১ । বাজারে নাম লেখাইলে  
 জাতের ভয় কি ?
- ৫৪২ । যার নাম লর,  
 বাটের গোড়া হয় ।
- ৫৪৩ । অরের অধু কুইনাইনের বড়ী,  
 খাইয়া কালা তাড়াভাড়ি ।

৫৪৪। আঃ, রাই গার রে ?

৫৪৫। টাকা—বের দুখও মিলে।

৫৪৬। বাপক টা সিপাই কা খোড়া।

৫৪৭। বা পাই তা খাই  
দুখঃদরাদ কিছুই নাই।

৫৪৮। পাইও বুড়া, বিরানেরও শেব।

৫৪৯। ঠেকছি বধার, শিখছি তধার।

৫৫০। বাতাসাও পাইলাম,  
তম একটা ঠেলা খাইলাম।  
তম—তবুও

৫৫১। হয় কথা নয় করে, ওতাওতি সার করে।

৫৫২। পোলায় দিছে \* \* ছিইয়া  
বাকী রইছে নাতি।

৫৫৩। পাপে বাপেরেও ছাড় না।

৫৫৪। বাসুকে ভ্যাসুকে মিলে,  
ছোটকে দাড়ীকে মিলে।  
বাসুকে—বেমনে।  
ভ্যাসুকে—ভেমনে।

ছোটকে—অপরের প্রাপ্য ধৈ পরিশোধ  
করে না।  
দাড়ী—নিরজ্ঞ।

৫৫৫। বুক কাটে ত মুখ ফোটে না।

\* কোনও এক ব্যক্তির জানা ছিল যে রাধানাথ বড় পারক। রাধানাথ গান করিতেছে শুনিয়া তধার মাইরা গান শুনিয়া বাটী রওনা হইয়াছে। রাত্তার এক ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল ‘কি হে গান কেমন শুনিবে ?’ সে ব্যক্তি গানের কিছু বুঝিয়া থাকুক বা না থাকুক—পারক ত রাধানাথ। তাই সে তাবে গল্পক কণ্ঠে বলিয়া উঠিল ‘আঃ, রাধানাথ কি গার রে।’ অবনি এই অপরা ব্যক্তি বলিল ‘না, হে, ও ত রাধানাথ নয়।’ তহতরে প্রথম ব্যক্তি বলিল ‘এঁা রাধানাথ নয় ? তবে কেন আমি কাদি ?’

৫৫৬। কিবা বিয়ার বিয়া,  
সাতটা আনহুঁদিয়া,

৫৫৭। শকুনের শাপে কোন্ গরু মরে।

৫৫৮। যে করে পাণ,  
সে হয় সাত পোলায় বাপ।  
যে করে পুণ্য, তার হয় শূণ্য।

৫৫৯। টাকার নামে কাঠের পুংলাও হাঁ করে।  
পুংলা—পুতুল।

৫৬০। অদেটে থাকলে হাগে বাইজাও ও আসে  
অদেটে—অদুটে।  
হাগে—শাকে।

বাইজা—বাঝিরা, লাগিয়া।

৫৬১। কান কধার, মন যার।

৫৬২। বাকী থুইয়া যে লাভ পণে।  
ও খায় সে তার বাপের মনে।

৫৬৩। একে ত ফোঁস মনসা,  
তার আবার ধুন্যার গন্ধ।

৫৬৪। পুন্ডের দশ দশা,  
মাইরামাইন্বের এক দশা।  
মাইরামাইন্বের—দ্রীলোকের।  
একদশা—প্রসবকালীন অবস্থা।

৫৬৫। মুখটা যদি না থাকত,  
পাতিশিয়ালেই টাইত্তা নিত।  
টাইত্তা—টানিয়া।

৫৬৬। কিবা বিয়ার বিয়া,  
তার আবার চিংবাত।

৫৬৭। হোরা আইছে কি, হুই লাখের কম না।  
আলো না ! হুই কুড়ি অ খাইলাম না।  
হোরা—শ’না।

৫৬৮। হাগতে লাজ না দেথতে লাজ।

৫৬৯। বাহরের নাম কে না জানে ?  
কেবল লাজে কর না।  
বাহরের—তাহরের।











